পুরাণসংগ্রহ—১

প্রধান সম্পাদক
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদক
ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়

ভাষান্তর
অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ, ১৩৫৯

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : প্রসূন বসু
নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

প্রধান সম্পাদকের কথা

'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে'—এ কথা মহাভারত সম্বন্ধে বলা হলেও তা পুরাণ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ মহাভারতও 'পুরাণ' পদবাচ্য। মহাভারত নিজেকে 'মহোত্তম ইতিহাস' আখ্যা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 'পুরাণ' আখ্যাও দিয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্রে ইতিহাস ও পুরাণ সহচর শব্দ, কোথাও কোথাও সমার্থকও বটে। মনুসংহিতা অর্থশাস্ত্রাদি গ্রন্থে পুরাণকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে এবং বেদের সঙ্গে একাসনে বসানো হয়েছে। শাস্ত্রাদি-বোধের জন্যে পুরাণ ছিল রাজাদের অবশ্য পাঠ্য, পুরাণবেত্তা বা পৌরাণিকেরাও ছিলেন রাজসভায় বহু-আদৃত। আধুনিক কালেও পুরাণের গুরুত্ব কমে নি। আমরা সাধারণত পুরাণকে কল্পনাশ্রয়ী বলে মনে করলেও ইতিহাস রচনায় পুরাণে উঁকি না দিয়ে উপায় নেই। কারণ বহু স্থলেই বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্য দেখা যায় পুরাণে। সমাজতত্ত্ব, ধর্ম-তত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র—এ সব বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যেও আমাদের পুরাণের মুখাপেক্ষী হতে হবে। বহু-বিষয় সংবলিত বহু-লক্ষণ পুরাণকে ভারত-সংস্কৃতির বিশ্বকোষ বলাই সঙ্গত। সেদিক দিয়ে ভারত-সংস্কৃতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের সকলের পক্ষেই পুরাণপাঠ প্রয়োজনীয়। শুধু গবেষণা নয় নাট্যাদি চর্চাতেও পুরাণ অবশ্য পঠনীয়, কারণ বহু ঘটনা ও চরিত্রের নব মূল্যায়নে নূতন নাট্য বা কাব্যাদি রচিত হতে পারে পুরাণ আখ্যান অবলম্বনে।

সকলের কাছে পুরাণকে সহজলভ্য করে তোলাই অষ্টাদশ মহাপুরাণের এই অনুবাদ-প্রকাশের উদ্দেশ্য। আশা করব 'নবপত্র' গৃহীত 'সংস্কৃত সাহিত্য-সম্ভার'াদি প্রকল্পের মতো এটিও সাফল্য লাভ করবে সহৃদয় পাঠকদের সহযোগিতায়।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

ভুলক্রমে এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার উপরে ব্রহ্ম পুরাণের পরিবর্তে ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ মুদ্রিত হয়েছে। পাঠকেরা এই ত্রুটির জন্য মার্জনা করবেন।
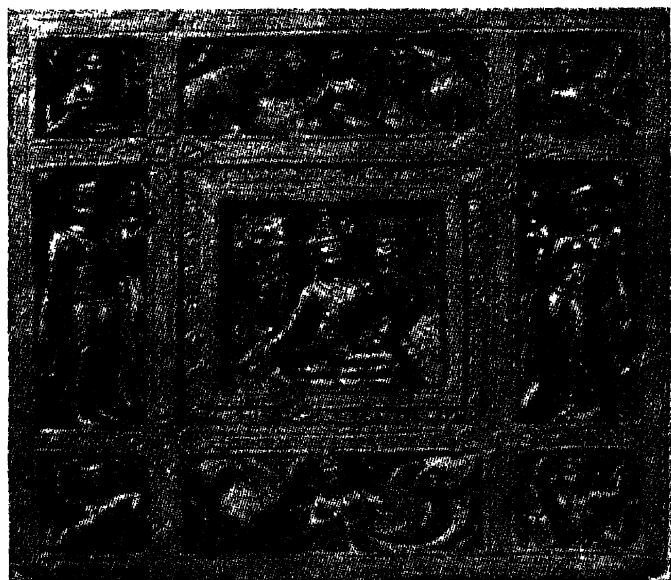
ভূমিকা

পুরাণ সাহিত্যের প্রাচীনতা

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় যে চৌদ্দ রকম বিদ্যার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে পুরাণ অন্যতম। সেখানে দেখতে পাই বৈদিক সাহিত্য, ন্যায় ও মীমাংসাশাস্ত্রের সঙ্গে পুরাণকে একই মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। পুরাণ সাহিত্যের প্রাচীনতা, তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এখানে স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়। অথর্ববেদের এক মন্ত্রে দেখা যায় যে, উচ্ছিষ্ট থেকে ঋক্, সাম, অথর্ব ও যজুর সঙ্গে পুরাণ উৎপন্ন হয়েছিল। এখানে 'উচ্ছিষ্ট' শব্দটি যজ্ঞের অবশিষ্ট বস্তুকে বোঝাতে পারে। বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়ণাচার্য 'উচ্ছিষ্ট' শব্দটির কিন্তু অন্য রকম ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি 'উচ্ছিষ্ট' শব্দে পরমাত্মাকে বুঝিয়েছেন; কারণ, সমস্ত পদার্থের বিনাশ যখন ঘটে তখন একমাত্র বর্তমান থাকে পরমাত্মা। অথর্ব-বেদের এই মন্ত্র থেকে এ কথাই প্রতীত হয় যে, ঋগ্বেদ প্রভৃতির মতো পুরাণসাহিত্যও অপৌরুষেয়। অথর্ববেদের আরেক মন্ত্রে জানা যায় যে, সত্যজ্ঞানী পুরুষ ছাড়া বর্তমান দৃশ্যমান ভূমির পূর্বের কল্পের অবস্থান আর কেউই জানতে পারে না; প্রথম কল্পে ভূমিভাগের অবস্থা কী ছিল তা যিনি সুনিশ্চিত ভাবে জানেন, তিনি পুরাণবিদ রূপে পরিচিত। পৌরাণিক যাবতীয় বৃত্তান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতি নিবিড়। এ মন্ত্র থেকে এ কথাই জানা যায় যে, অথর্ববেদের সময়ে পুরাণসাহিত্যের এবং পুরাণসাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও অস্তিত্ব ছিল। অথর্ববেদে ব্রাত্যস্তোমের প্রসঙ্গেও পুরাণের উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণসাহিত্যেও পুরাণের প্রচুর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে কমপক্ষে চারবার পুরাণের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম তিন ক্ষেত্রে ইতিহাস ও পুরাণ অভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু শেষের বার এই দুয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন সাহিত্যে পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা নির্দিষ্ট ছিল না; একই বিষয়কে কখনও পুরাণ কখনও ইতিহাস নামে চিহ্নিত হয়েছে। পারিপ্লব আখ্যানভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক আখ্যান থেকে অষ্টম রাত্রে ইতিহাসের এবং নবম রাত্রে পুরাণ প্রবচনের কথা জানতে পারি। তাহলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণযুগে ইতিহাস পুরাণের সম্মিলিত ভাবনা এবং পৃথক ভাবনা—এই উভয় চিন্তাধারাই প্রচলিত ছিল। অথর্ববেদের সঙ্গে সংযুক্ত গোপথ ব্রাহ্মণের একমন্ত্রে বলা হয়েছে যে, কল্প, রহস্য, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, অনাখ্যাত ও পুরাণের সঙ্গে সমস্ত বেদ নির্মিত হয়েছিল। আরেকটি মন্ত্রে ইতিহাস ও পুরাণকে বেদ বলে উল্লেখ করে তার সঙ্গে সর্পবেদ, পিশাচবেদ ও অসুরবেদের নির্মাণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সেই ব্রাহ্মণে পুরাণ অত্যন্ত মহত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণেও 'পুরাণ' মহত্ত্বপূর্ণ শাস্ত্র বলে বিবেচিত হয়েছে এবং অন্তত চারবার (৩।৪।১-২ ; ৭।১।২, ৪ ; ৭।২।১ এবং ৭।৭।১) পুরাণের উল্লেখ করে তার প্রাচীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইতিহাসপুরাণকে পরমাত্মার নিশ্বাসরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে এভাবে ঋষি কবি বুঝিয়েছেন, যেমন ভেজা জ্বালানির সঙ্গে

আগুনের সংযোগ ঘটলে আলাদা আলাদাভাবে ধোঁয়া বেরোয়, তেমনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ এবং ইতিহাসপুরাণ ঐ মহান সত্তার পৃথক পৃথক নিশ্বাস। বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই তথ্য ছান্দোগ্য উপনিষদের দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। দেবর্ষি নারদ কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন সে প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, নারদ বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন--যেমন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ এবং ইতিহাসপুরাণ অর্থাৎ পঞ্চম বেদ। এই উপনিষদেই অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে ইতিহাসপুরাণেরও ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করার কথা দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে বেদের মতো পুরাণসাহিত্যও সমান মর্যাদা ও মহত্ত্বের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

সূত্রসাহিত্যে বহুবার পুরাণের প্রাচীনত্ব ও মাহাত্ম্য উদ্ঘোষিত হয়েছে। সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১৬।২।২৭) আরণ্যক ও উপনিষদের মতো পুরাণকে পঞ্চমবেদরূপে পরিগণিত। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে পুরাণপাঠের উল্লেখ অনেকবার পাওয়া যায়। ইতিহাস ও পুরাণের অধ্যয়নকে এই গৃহ্যসূত্রে বেদাধ্যয়নের অন্তর্গত বলে গণ্য করা হয়েছে। আরেক মন্ত্রে জানা যায় যে, যে সব বিদ্বান ব্যক্তি ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন, তাঁরা দেবগণ ও পিতৃগণের অমৃতস্রোতে নিমজ্জমান হয়ে থাকেন। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে ঊর্ধ্বরেতা ব্যক্তির প্রশংসা প্রসঙ্গে কোন এক পুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে; এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্লোকের প্রায় অনুরূপ। এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের রচনার সময় আদর্শরূপে এক বা একের বেশী পুরাণ প্রচলিত ছিল; সেখান থেকেই ধর্মসূত্রকার উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। গৌতম ধর্মসূত্রেও দু'বার ইতিহাসপুরাণ অথবা পুরাণ পদের উল্লেখ আছে। বহুশ্রুত কাকে বলে তার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে পুরাণ পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বহুশ্রুত শব্দটির অর্থ বহু শাস্ত্রের জ্ঞাতা। গৌতম ধর্মসূত্রের মতে তাকেই বহুশ্রুত বলা যেতে পারে যে লোকব্যবহার, বেদ বেদাঙ্গ জানে এবং ইতিহাসপুরাণে পণ্ডিত। রাজাকে সুশাসক হতে হলে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে পুরাণ অধ্যয়নও অবশ্যই করতে হবে। প্রজাপালক রাজার ব্যবহার বেদ, ধর্মশাস্ত্র, অঙ্গ, উপবেদ এবং পুরাণের উপরই আশ্রিত। এভাবে গৌতম-ধর্মসূত্রে পুরাণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রের মতো রাজনীতি শাস্ত্রও পুরাণ-সাহিত্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বেশ কয়েকবার পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। উচ্ছৃঙ্খল প্রভুর চরিত্র সংশোধন প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, রাজা যখন ন্যায়পথ পরিত্যাগ করে ভ্রান্ত পথে বিচরণ করেন তখন রাজার হিতকামী ও অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত মন্ত্রিদের কর্তব্য হল এই উন্মার্গগামী প্রভুকে প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও পুরাণকথা শুনিয়ে সৎ ও শুদ্ধপথে নিয়ে আসা। এই অর্থশাস্ত্রেই অন্য এক জায়গায় দেখা যায় যে, রাজারা প্রত্যহ পুরাণইতিহাস পাঠ অবশ্যই করবেন।

বিভিন্ন ধর্মসংহিতাসমূহে বিভিন্ন পুরাণের প্রাচীনতা ও বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তরূপে ব্যাসসংহিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সংহিতাকার বলছেন যে, বেদবিদ্যায় পারদর্শী হতে গেলে কেবলমাত্র ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করলেই চলবে না, পরন্তু ইতিহাস পুরাণশাস্ত্রও যথোচিতভাবে অনুশীলন করা দরকার। উশনাসংহিতাতেও শিষ্যকে জ্ঞান দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কোন সাধারণ শিষ্যকে,

যার বংশপরিচয় কিংবা চরিত্র জানা নেই, তাকে বেদ, ধর্ম, পুরাণ ও তত্ত্বের উপদেশ করবে না। সুপ্রসিদ্ধ মনুসংহিতাও সমগ্র পুরাণের মাহাত্ম্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। যজমান শ্রাদ্ধের সময় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের বেদ, ধর্মশাস্ত্র, আখ্যাত, ইতিহাস ও সমগ্র পুরাণ শোনাবেন। মনু পুরাণসাহিত্যকে যে সম্মানের স্থান দান করেছেন তাতে ওই সাহিত্যের মাহাত্ম্য সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতের লব্ধকীর্তি দার্শনিক শবর-স্বামী, শংকরাচার্য এবং কুমারিল ভট্ট পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পুরাণের অস্তিত্ব, প্রাচীনত্ব এবং প্রামাণ্য স্বীকার করে নিয়েছেন। শবরস্বামী মীমাংসাসূত্রের উপর লিখিত ভাষ্যে এক জায়গায় যজ্ঞের সঙ্গে যে দেবতারা সংশ্লিষ্ট তাদের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল এ বিষয়ে ইতিহাসপুরাণে একই মত পাওয়া যায়। স্পষ্টতই এখানে দেখা যায় যে, ইতিহাসপুরাণকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়েছে। কুমারিল ভট্ট জৈমিনিসূত্রের সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রবার্তিক গ্রন্থের লেখক। তিনি এই গ্রন্থে অন্তত দু'বার ইতিহাসপুরাণের উল্লেখ করেছেন। কুমারিল ভট্ট পুরাণে বিবৃত আখ্যানসমূহ প্রামাণিক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তন্ত্রবার্তিক গ্রন্থে 'স্বর্গ' পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, যে প্রদেশে নক্ষত্ররাজির অবস্থান তাকেই কি স্বর্গ বলে, অথবা ইতিহাসপুরাণ প্রতিপাদিত মেরুপৃষ্ঠে অবস্থিত প্রদেশই স্বর্গ, নাকি কেবল সুখময় প্রদেশকেই স্বর্গ বলে। কুমারিল যে পৌরাণিক তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন, এ আলোচনা থেকে সে-কথাই প্রমাণিত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শংকরাচার্য তাঁর শারীরক ভাষ্যে অনেকবার পুরাণ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পুরাণের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তিনি যে সম্যকভাবে পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণও তিনি রেখেছেন। যদিও তিনি কোন বিশেষ পুরাণের নাম উল্লেখ করেন নি তাহলেও তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন পুরাণ থেকে যে সব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, সে সব উক্তি বর্তমানে প্রচলিত পুরাণসমূহে অবিকৃত-ভাবেই পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দেবতাদের সামর্থ্য প্রসঙ্গে অনেক পুরাণেই বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। সে প্রসঙ্গে শংকরাচার্য বলেছেন, দেবতাদের মধ্যে সামর্থ্যের সম্ভাবনা আছে ; কারণ, মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ থেকে জানা যায় যে, তাঁরা শরীর ধারণ করেন। উল্লেখ্য যে, শংকরাচার্যও পুরাণকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

ন্যায়সূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পুরাণের প্রামাণ্য নির্ণয় করতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। তাঁর মতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের যাঁরা দ্রষ্টা ও প্রবক্তা, তাঁরাই ইতিহাসপুরাণের এবং ধর্মশাস্ত্রের দ্রষ্টা এবং প্রবক্তা। সুতরাং দ্রষ্টা এবং প্রবক্তারূপে বিচার করলে এই তিনটির মধ্যে সমানতা খুঁজে পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, 'ইতিহাসপুরাণের দ্রষ্টা' এ কথা বলায় ইতিহাসপুরাণের অপৌরুষেয়ত্ব অর্থাৎ এগুলো যে কোন পুরুষের রচিত নয়, এ কথাই প্রমাণিত হয়। তবে এদের বিষয়বস্তু পৃথক।

রামায়ণ ও মহাভারতে 'পুরাণ' কথাটির প্রচুর উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতকার পুরাণ-সমূহকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করে তাদের সংখ্যা যে আঠারো এই তথ্যটিও পরিবেশন করেছেন ; মার্কণ্ডেয়, বায়ু এবং মৎস্য—এই তিনটি পুরাণের নাম মহাভারতে পাওয়া যায় ; শুধু তাই নয়, বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের কিছু বিষয়ের সঙ্গে যে মহাভারতকারের

পরিচয় ছিল, তার প্রমাণও পাওয়া যায়। কাজেই এ রকম ধারণা করা অনুচিত হবে না যে, এই পুরাণগুলো অন্তত প্রাচীন অবস্থাতে মহাভারতের পূর্বেই প্রচলিত ছিল এবং সম্যকভাবে পরিশীলিতও হয়েছিল। পুরাণের সংখ্যা যে আঠারোটি এই তথ্য মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে (৫।৪৫, ৪৬ ও ৬।৯৭) পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরাণের নাম মহাভারতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

রামায়ণকে আদিকাব্য বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে 'আদিকবি' এবং 'কবিগুরু' বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—'তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে'। বাল্মীকি যে কয়েকটি পুরাণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—এ কথা রামায়ণে তাঁর উক্তিই প্রমাণ করে। রামায়ণে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, যোগীরা পুরাণ, বেদ অথবা পঞ্চরাত্র দ্বারা প্রতিনিয়তই তাঁর ধ্যান করে এবং যজ্ঞের দ্বারা যজন করে থাকে। রামায়ণে অনেকবার সুমন্ত্রকে অতিপ্রসিদ্ধ পুরাণবেত্তারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সূত ছিলেন বলে পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। বোঝা যায় যে, বেশ প্রাচীন যুগেই পুরাণ কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থকে নির্দেশ করত এবং জনসমাজে এদের যথেষ্ট ব্যবহার ও প্রচলন ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের সাক্ষ্য পুরাণসাহিত্যের অস্তিত্ব ও গুরুত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র ভারতীয় সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই প্রাচীন গ্রন্থে এক জায়গায় ভরত পূর্ব-ভারতের কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের ভাষায় ঔড্রমাগধী ব্যবহার করে তার পরিচয় প্রদান করেছেন। সে প্রসঙ্গে ভরত বললেন, 'এ সব অঞ্চল বিশদভাবে একাধিক পুরাণে নির্দেশিত হয়েছে।' এই নাট্যশাস্ত্রেই অন্যত্র পাই 'প্রাচীন ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ বিখ্যাত পর্বত ছিল, তা বিভিন্ন পুরাণ পাঠ করলে জানা যায়।' পুরাণসাহিত্যের প্রাচীনতাকে ভরত শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করে নিয়েছেন।

হিন্দুশাস্ত্রসমূহ কিংবা বৈদিকসমাজই যে পুরাণসাহিত্যের প্রামাণিকতা এবং মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিয়েছে তা নয়; জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক সম্প্রদায়ের আচার্যগণও পুরাণসমূহের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করতে পারে নি। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিতবিস্তর' নিজেকে 'মহাপুরাণ' নামে অভিহিত করেছে। 'মিলিন্দপনহ' নামে বৌদ্ধদের আরেকটি বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থে রাজা মিলন্দরের সঙ্গে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের কথোপকথন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। সেখানে দেখি, রাজা মিলন্দর অশেষ শাস্ত্রে পণ্ডিত— সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, গণিত, গান্ধর্ব, চার বেদ, পুরাণ এবং ইতিহাস।

জৈনরা বৌদ্ধদের থেকে একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। তারা সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে অনেক গ্রন্থ রচনা করে সেগুলোকে 'পুরাণ' নামে চিহ্নিত করেছিল। এই জৈন পুরাণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলেন জৈন সন্ন্যাসী আচার্য বিমলসূরি। তিনি 'পউম চরিয়' নামে একটি বই লেখেন এবং তাকে 'পুরাণ' বলে চালানোর চেষ্টা করেন। আনুমানিক প্রথম খ্রীষ্টাব্দে এই বইটি রচিত হয়। রবিষেণ নামে একজন জৈন লেখক সংস্কৃত ভাষায় 'পদ্মপুরাণ' নামে একটি বই লেখেন। পণ্ডিতদের মতে এর রচনাকাল আনুমানিক ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। আঠারোটি মহাপুরাণের অন্যতম 'পদ্মপুরাণে'র সঙ্গে কেবলমাত্র নামের ঐক্যটুকু ছাড়া অবশ্য আর কোন কিছুতেই এর মিল নেই। গুণভদ্র নামে আরেকজন জৈন লেখক খ্রীষ্টীয় নবম শতকে 'উত্তরপুরাণ' নামে একটি বই লেখেন। এ সব তথ্য থেকে এ কথাই দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম খ্রীষ্টাব্দ থেকে জৈ

পণ্ডিতগণ পুরাণসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন প্রভূতভাবে।

তাহলে এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, খ্রীষ্টজন্মের অন্তত কয়েকশো বছর আগে থেকেই বেশ কয়েকটি পুরাণ জনসমাজে স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়েছিল। এদের জনপ্রিয়তা এবং সমাদরের মূলে জনমানসের প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সেই প্রস্তুতির ক্রমবিকাশ ঘটেছে ধীরে ধীরে। আখ্যান-উপাখ্যানের নবীনতায়, ঋষি রাজচরিতে, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিচিত্র পরিবেশনে, ভূমণ্ডলের ভৌগোলিক তত্ত্ববর্ণনে, প্রাচীন সময় নিরূপণে, ধর্মে, কর্মে, ধ্যানধারণায় পুরাণসমূহ জনমানসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল—তা মিথ্যা নয়। কালের কষ্টিপাথরে এদের মূল্য হয়েছে পরীক্ষিত। ভারতীয় ধর্ম ও চিন্তার অগ্রগতিতে ব্রাহ্মণদের দান অবিসংবাদিতভাবে উল্লেখ্য। বৈদিক সাহিত্য ছিল সেই ব্রাহ্মণ্যধারার ইতিহাস। অন্যান্য বিষয়ে দান ছিল ক্ষত্রিয়ের ও জনগণের; পুরাণসাহিত্য সেই ক্ষাত্রধারা ও জনস্রোতের ইতিহাস। এই উভয় ধারার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাস—ভারতবাসীর ইতিহাস। এদিক দিয়ে বিচার করলে পুরাণ-সাহিত্যকে সংস্কৃত-সাহিত্যমাল্যের তথা ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যমণি বলা যেতে পারে। চেতন সত্তার মতো এই পুরাণসমূহ জনগণের সামাজিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে নিজেদেরও পরিবর্তিত করেছে; এভাবেই তারা প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার উপাদান সযত্নে সঞ্চিত করে রেখেছে।

পুরাণের নাম, তালিকা ও বর্গীকরণ

পুরাণের সংখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সবাই পুরাণ আঠারোটি বলে স্বীকার করে থাকেন। পুরাণের সংখ্যা আঠারো হওয়ার পিছনে কিন্তু তাৎপর্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে আঠারো সংখ্যাটি অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকে; মহাভারতের পর্বসংখ্যাও তাই আঠারো। শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার অধ্যায়ও আঠারোটি; শ্রীমদ্‌ভাগবতে মোট আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে। অনুসন্ধান করলে এই বিশিষ্ট তাৎপর্য বোঝা যায়।

পুরাণ পঞ্চলক্ষণযুক্ত বা দশলক্ষণযুক্ত যা-ই হোক না কেন, প্রত্যেক পুরাণে প্রথমেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। পুরাণে প্রতিপাদিত সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে এই আঠারো সংখ্যাটির বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণের অষ্টম কাণ্ডে সৃষ্টি নামের এক ইষ্টির বিধান আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ১৭টি ইষ্টিযাগ করা দরকার; কারণ তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সৃষ্টিও সতেরো রকম এবং সেই সতেরো প্রকার সৃষ্টির মূলে উৎপত্তিস্থল প্রজাপতি। কার্য যে সৃষ্টি তা সতেরো, কারণ প্রজাপতিকে তার সঙ্গে যোগ করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় আঠারো। শতপথ ব্রাহ্মণে এ বিষয়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে,

> সংখ্যা বারো এবং ঋতুর সংখ্যা পাঁচ—এই সতেরো পদার্থের সমষ্টিই এক বছর। এর সঙ্গে যোগ করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় আঠারো।

সৃষ্টিপ্রসঙ্গে বেদে বৈদিক ছন্দের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে। বেদে প্রধানত সাত রকমের ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়; তার মধ্যে গায়ত্রী এবং বিরাট ছন্দই প্রধান। এই দুই ছন্দের সঙ্গে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে যে গায়ত্রী পৃথিবীরূপে উল্লিখিত এবং তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে 'বিরাট'কে অন্তরীক্ষরূপে উল্লেখ করা

হয়েছে। এই অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবী সৃষ্টির পিতা ও মাতা—এ কথা বেদের অনেক মন্ত্রে অনেকবার দেখা যায়। গায়ত্রী ছন্দে তিনটি পাদ থাকে। প্রত্যেক পাদে থাকে আটটি করে অক্ষর ; অনুরূপভাবে 'বিরাট' ছন্দের প্রত্যেক পাদে থাকে দশটি করে অক্ষর—দুটোকে একত্র করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় আঠারো। সেদিক দিয়ে বিচার করলেও আঠারো সংখ্যাটিরই প্রাধান্য। ছন্দসৃষ্টিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে সৃষ্টিপ্রতিপাদক পুরাণের সঙ্গে এই আঠারো সংখ্যাটির সম্বন্ধকে সার্থক বলে মনে হয়।

প্রাচীন সাহিত্যে ও দর্শনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনটি স্তরভেদ স্বীকৃত—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং আকাশ। প্রত্যেক পদার্থের ছ'টি অবস্থা—সত্তা, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম, হ্রাস ও বিনাশ। ষড় বেদাঙ্গের অন্যতম 'নিরুক্ত' গ্রন্থের লেখক যাস্কাচার্য পদার্থের এই ছটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ছয় অবস্থার সঙ্গে তিনটি লোকের সম্বন্ধ বিচার করলে মোট সংখ্যা পাই আঠারো। পুরাণসমূহ পদার্থের সৃষ্টি বিনাশ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে ; এদিকে দিয়েও বিচার করলে পুরাণের ক্ষেত্রে আঠারো সংখ্যাটি সার্থক।

সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করলে পুরাণের সংখ্যা আঠারো হওয়ার পিছনে অন্য কারণও খুঁজে পাওয়া যায়। পুরাণসাহিত্যে পুরাণ-পুরুষ পরমাত্মাই প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হয়েছেন। আত্ম স্বরূপত এক হলেও উপাধি বা অবস্থাভেদে আঠারো প্রকার। মূলভূত আত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ অন্তরাত্মা এবং ভূতাত্মা—এই তিন ভাগে বিভক্ত। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা আবার পরাৎপর, অব্যয়, অক্ষর ও ক্ষর—এই চার ভাগে বিভক্ত। অন্তরাত্মার পাঁচ প্রকার ভেদ—অব্যক্তাত্মা, মহানাত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, প্রজ্ঞানাত্মা ও প্রাণাত্মা। ভূতাত্মা মোট নয় প্রকার—প্রথমত ইনি শরীরাত্মা, হংসাত্মা এবং দিব্যাত্মা ভেদে তিন প্রকার। সেই দিব্যাত্মা বৈশ্বানর, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ—এই তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে আবার প্রাজ্ঞ তিন প্রকার—কর্মাত্মা, চিদাভাস এবং চিদাত্মা। চিদাত্মার তিন ভেদ—বিভূতিলক্ষণ, শ্রীলক্ষণ এবং ঊর্কলক্ষণ। তাহলে আত্মার এই আঠারো রকম ভেদ দেখা গেল, যেমন—১। পরাৎপর, ২। অব্যয়, ৩। অক্ষর, ৪। ক্ষর, ৫। অব্যক্তাত্মা, ৬। মহানাত্মা, ৭। বিজ্ঞানাত্মা, ৮। প্রজ্ঞানাত্মা, ৯। প্রাণাত্মা, ১০। শরীরাত্মা, ১১। হংসাত্মা, ১২। বৈশ্বানর, ১৩। তৈজস, ১৪। কর্মাত্মা, ১৫। চিদাভাস, ১৬। বিভূতিলক্ষণ, ১৭। শ্রীলক্ষণ, ১৮। ঊর্কলক্ষণ। এভাবে পুরাণপুরুষের আঠারো রকম ভেদ স্বীকার করা হয়েছে বলে পুরাণেরও আঠারো রকম ভেদ পরিকল্পনা অযৌক্তিক নয়।

অনেক পুরাণে সাংখ্যদর্শনসম্মত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার কথা অনেকবার বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে পঁচিশটি তত্ত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই পঁচিশটি তত্ত্বের মধ্যে কেবলমাত্র সাতটি 'তন্মাত্র'র সঙ্গেই মহাভূতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সমস্ত দিক দিয়ে এদের মধ্যে ঐক্য থাকলেও এক জায়গায় কেবল এদের মধ্যে পার্থক্য—তন্মাত্র হল সূক্ষ্ম এবং মহাভূত স্থূল। অতএব এই 'তন্মাত্র'র স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিলে মোট তত্ত্বসংখ্যা আঠারোই দাঁড়ায় (২৫—৭=১৮)। এই আঠারোটিই সৃজ্যমান তত্ত্ব। সৃষ্টি প্রতিপাদক পুরাণের সংখ্যাও আঠারো। তাই পুরাণের ক্ষেত্রে 'আঠারো' এই সংখ্যাটি নিরর্থক তো নয়ই বরং এর যথেষ্ট সার্থকতা এবং তাৎপর্য রয়েছে।

পণ্ডিতদের মধ্যে পুরাণের সংখ্যা নিয়ে যেমন কোন বিবাদ দেখা যায় না, তেমনি তাদের নাম নিয়েও তেমন কোন তীব্র মতবিরোধ নেই। বিভিন্ন পুরাণে এবং অন্যান্য গ্রন্থে পুরাণের যে তালিকা পাওয়া যায়, মোটামুটি তা একই রকম। এই পুরাণসমূহকে

সহজে মনে রাখার এক উপায় দেবী ভাগবতের একটি শ্লোকে পাওয়া যায়। শ্লোকটি এ রকম—

ম্দ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রত্রয়ং বচতুষ্টয়ম্।
অনাপলিঙ্গকূস্কানি পুরাণানি পৃথক্ পৃথক্॥ (১।৩।২১)

প্রত্যেক পুরাণের নামের প্রথম অক্ষরটি এখানে বলা হয়েছে। সেই অনুসারে আঠারোটি পুরাণ এ রকম—(১) ম-কার প্রথমে রয়েছে এমন দুই পুরাণ—মৎস্যপুরাণ এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণ, (২) ভ-কার প্রথমে রয়েছে এমন দুই পুরাণ—ভাগবতপুরাণ এবং ভবিষ্যপুরাণ, (৩) ব্র-কার প্রথমে আছে এমন তিনটি পুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; (৪) ব-কার প্রথমে আছে এমন চারটি পুরাণ—বামনপুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ, বায়ুপুরাণ এবং বরাহপুরাণ ; (৫) এ ছাড়া আরো সাতটি পুরাণ রয়েছে যাদের নামের প্রথম অক্ষর অ, না, প, লিং, গ, কূ এবং স্ক। যথাক্রমে এদের নাম—অগ্নিপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কূর্মপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ।

এ ছাড়াও বিভিন্ন পুরাণেই পুরাণসমূহের নাম শ্লোকের আকারে দেখতে পাওয়া যায়। পর পর সাজিয়ে নিলে পুরাণসমূহের নাম এ রকম দাঁড়ায়—১। ব্রহ্মপুরাণ, ২। পদ্মপুরাণ, ৩। বিষ্ণুপুরাণ, ৪। বায়ুপুরাণ, ৫। ভাগবতপুরাণ, ৬। নারদপুরাণ, ৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৮। অগ্নিপুরাণ, ৯। ভবিষ্যপুরাণ, ১০। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ১১। লিঙ্গপুরাণ, ১২। বরাহপুরাণ, ১৩। স্কন্দপুরাণ, ১৪। বামনপুরাণ, ১৫। কূর্মপুরাণ, ১৬। মৎস্যপুরাণ, ১৭। গরুড়পুরাণ এবং ১৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে আঠারোটি পুরাণের নাম যে ক্রমে উল্লিখিত হয়েছে এই তালিকার সঙ্গে তা প্রায় মিলে যায় ; কেবল-মাত্র সেখানে বায়ুপুরাণের স্থানে শিবপুরাণের নাম দেখতে পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণ এবং শিবপুরাণ—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি অষ্টাদশ পুরাণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এ নিয়ে পুরাণসমূহের মধ্যেই মতভেদ দেখা যায়। সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে শিবপুরাণের পক্ষে বেশী পুরাণেই সাক্ষ্য এবং সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন কূর্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ শিবপুরাণের পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছে। অপরপক্ষে নারদপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণ বায়ুপুরাণের পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছে। স্কন্দপুরাণ মধ্যপথ অবলম্বন করে উভয় মতের সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর মত গ্রহণযোগ্য নয় কোন-মতেই। এই শাস্ত্রীয় বিচারে সংখ্যাটাই বড় কথা নয় ; যুক্তি, তথ্য ও যথাযথ বিচারের দ্বারা বিষয়টির সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিস্তৃত বিচার এবং সূক্ষ্ম ও জটিল তর্কজালে জড়িয়ে না পড়ে আমরা বলতে পারি যে, বিষয়বস্তুর গুরুত্বে, পরবর্তী সাহিত্যের স্বীকৃতিতে এবং পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণের লক্ষণে লক্ষণান্বিত হওয়ার গুণে বায়ুপুরাণেরই আঠারোটি পুরাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে সমধিক।

এই আঠারোটি পুরাণের শ্রেণীবিভাগ কিন্তু কোন বিশেষ উপায়ে করা হয় নি, বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এদের বর্গীকরণ করা হয়েছে। উপায়ের বিভিন্নতার জন্য এদের শ্রেণীবিভাগও হয়েছে বিভিন্ন। মৎস্যপুরাণে সাত্বিক, রাজস এবং তামস—এই তিনভাগে পুরাণগুলো বিভক্ত। যে সব পুরাণে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বেশী করে বর্ণিত, সেই পুরাণসমূহ সাত্বিক পুরাণরূপে পরিচিত ; রাজস পুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্যই বহুলরূপে কীর্তিত এবং তামস পুরাণগুলোতে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

এই বিভাগ অনুসারে বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ—এই ছ'টি পুরাণ সাত্ত্বিক ; ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম—এই পুরাণগুলো রাজস এবং মৎস, কূর্ম, লিঙ্গ, বায়ু, স্কন্দ ও অগ্নি—এ ছ'টি পুরাণকে তামস পুরাণ বলা হয়।

এই শ্রেণীবিভাগের মূলে এমন কোন তাৎপর্য নেই যার থেকে এ কথা মনে হতে পারে যে, সাত্ত্বিক পুরাণগুলো শ্রেষ্ঠ, রাজস, মধ্যম এবং তামস পুরাণসমূহ নিকৃষ্ট। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণই অখিল বিশ্বজগতের উপাদান কারণ। সাংখ্যদর্শনে এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলা হয়েছে। পরমেশ্বর এই ত্রিগুণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপে পরিণত হন। ব্রহ্মা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদক, বিষ্ণু পালক এবং শিব সংহারক। সেজন্যই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিন দেবেরই এক মূর্তি। সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস ভেদে পুরাণের এই শ্রেণীবিভাগ সর্বসম্মতও নয় আর স্পষ্টও নয়। মৎস্যপুরাণের বিভাগ অনুযায়ী বায়ুপুরাণ তামস ; কারণ, বায়ুপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য অধিকরূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিবভক্তিপ্রতিপাদক বায়ুপুরাণকে গরুড়পুরাণের তালিকা অনুযায়ী সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত করা হয়েছে। বস্তুত এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে তেমন কোন কঠোরতা অবলম্বন করা হয় নি, শুধু তাই নয়, এর পিছনে প্রবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিরও নিতান্ত অভাব। সেজন্যই বিভিন্ন পুরাণে এই বর্গীকরণ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। মৎস্যপুরাণের মতো গরুড়পুরাণও পুরাণকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছে ; কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হয় নি। গরুড়পুরাণ মনে করে যে, এই সাত্ত্বিক পুরাণও তিন ভাগে বিভক্ত—সত্ত্বাধম, সাত্ত্বিকমধ্যম এবং সাত্ত্বিকউত্তম। প্রথম শ্রেণীতে মৎস্য ও কূর্ম (অন্য তালিকায় এ দুটোই তামস্য) দ্বিতীয় শ্রেণীতে বায়ু (অন্য তালিকা অনুসারে তামস) এবং তৃতীয় শ্রেণীতে বিষ্ণু, ভাগবত ও গরুড় পুরাণ অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন পুরাণে এই তিন রকম শ্রেণীবিভাগ ছাড়া আরও দু' রকম ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। যে, পুরাণে সরস্বতীর মাহাত্ম্য অধিকরূপে কীর্তিত হয়েছে, এবং যে পুরাণে পিতৃগণের প্রশংসা অধিকভাবে করা হয়েছে—এদের এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। আগেই আমরা বলেছি যে এই শ্রেণী বিভাজন অতি কৃত্রিম এবং অসঙ্গত। তার কারণ, সাত্ত্বিক পুরাণেও দেখতে পাই বিষ্ণু শিবের পূজা করছেন এবং শিবেরই মাহাত্ম্য সেই পুরাণের অনেক অংশ জুড়ে রয়েছে। এভাবে তথাকথিত তামস পুরাণেও দেখতে পাই পাতার পর পাতা জুড়ে শিবের বিষ্ণুভক্তি মাহাত্ম্য বর্ণনা চলেছে ; শিবের পরিবর্তে বিষ্ণুভক্তিরই এখানে প্রাধান্য।

স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে দেখা যায় পুরাণসমূহের অন্য এক রকম বিভাজন। স্কন্দপুরাণের মতে, আঠারোটি পুরাণের মধ্যে দশটিতে শিব, চারটিতে ব্রহ্মা, দুটিতে দেবী এবং দুটিতে হরিই প্রধানভাবে স্তুত হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন পুরাণে এই দেবতারা পূজিত হয়েছেন, তাদের নাম করা হয় নি। এই পুরাণের শিবরহস্য নামক খণ্ডের অন্তর্গত সম্ভব কাণ্ডে অন্য এক রকম বর্গীকরণ দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ড, বামন, কূর্ম, মৎস্য, স্কন্দ, বরাহ, লিঙ্গ, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও শিব (বায়ু)—এই দশটি পুরাণকে শিবপুরাণরূপে অভিহিত করা যেতে পারে, কারণ, এই পুরাণগুলোয় শিবেরই মাহাত্ম্য প্রকট হয়েছে। বিষ্ণু,

ভাগবত, নারদীয় ও গরুড়পুরাণ, বৈষ্ণবপুরাণ, ব্রহ্ম ও পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নি অগ্নিদেবতাবিষয়ক পুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সূর্যদেবতাবিষয়ক পুরাণ। আমরা পুরাণের এই বিভাজনকেও দুর্বল মনে করি; কারণ, উল্লিখিত দেবতাদের স্তুতির ক্রমটি সর্বথা রক্ষিত হয় নি কোন পুরাণেই।

প্রাচীন তামিল গ্রন্থে পুরাণসমূহ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই বিভাজনের মূলেও রয়েছে দেবতাদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য। ব্রহ্মার প্রাধান্য অনুসারে ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্ম পুরাণ, সূর্যের গুরুত্ব অনুসারে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, অগ্নির ব্যাপকতা অনুসারে অগ্নি-পুরাণ, শিব যেখানে প্রধানভাবে স্তুত হয়েছেন, সেগুলো শিবপুরাণ; যেমন—বায়ু, স্কন্দ, লিঙ্গ, কূর্ম, বামন, বরাহ, ভবিষ্য, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মাণ্ড এবং বিষ্ণুর প্রাধান্য অনুসারে নারদ, গরুড়, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ।

আধুনিক কালের কোন কোন পণ্ডিত পুরাণ-বিভাজনের অন্য এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যে সব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তাঁরা আঠারোটি পুরাণকে শ্রেণী-বিভক্ত করেছেন, সেগুলো এভাবে সাজানো যেতে পারে। প্রথমত, যে সব পুরাণে আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক বিদ্যা যথোচিতভাবে আলোচিত হয়েছে, তাদের প্রথম শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই শ্রেণীভুক্ত হবে গরুড়, অগ্নি এবং নারদীয় পুরাণ। দ্বিতীয়ত, যেখানে প্রধানভাবে তীর্থ ও ব্রত বর্ণিত হয়েছে, এই শ্রেণীভুক্ত হবে পদ্ম, স্কন্দ ও ভবিষ্য-পুরাণ। তৃতীয়ত, যেগুলোর মূলভাগের সঙ্গে কেন্দ্রস্থ ভাগের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই; এই শ্রেণীতে পড়বে ব্রহ্ম, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। চতুর্থত, যে সব পুরাণে প্রাচীন ইতিহাসের কথা বেশি করে বলা হয়েছে, এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে বায়ু, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং নিবিড় ঐক্য পর্যালোচনা করে বিখ্যাত জার্মান পুরাতত্ত্ববিদ কিরফেল তাঁর 'ডাস পুরাণ পঞ্চলক্ষণ' গ্রন্থে এই দুটোই একই স্রোত থেকে নির্গলিত হয়েছে—এ রকম উক্তি করেছেন। পঞ্চমত, যে সব পুরাণে বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা বেশি করে আলোচিত হয়েছে; এই শ্রেণীভুক্ত হবে লিঙ্গ, বামন ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ। ষষ্ঠত, কিছু কিছু পুরাণ আছে যাদের মূল পাঠ বারংবার পরিমার্জিত, সংশোধিত এবং পরিশীলিত হওয়ার ফলে প্রায় লুপ্ত; এদের এক শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এই শ্রেণীতে পড়বে মৎস্য, কূর্ম ও বরাহপুরাণ। যে যে যুক্তির উপর ভিত্তি করে পুরাণসমূহের এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, সেই যুক্তিগুলোকে সর্বাংশে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে বলতে পারি যে ঐতিহাসিক উপাদান কম-বেশী সব পুরাণেই রয়েছে; সুতরাং ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তিতে পুরাণের এই শ্রেণীবিভাগ অযথার্থ। আর তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি পুরাণই একাধিকবার পরিমার্জিত ও সংস্কৃত হয়েছে; সেজন্য সমস্ত পুরাণেই বহু পাঠ-ভেদ দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বেদের পাঠ সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও অবিকৃত রাখার জন্য সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, জটাপাঠ, ঘনপাঠ প্রভৃতি দশ রকম পাঠপ্রথা সে-যুগের ঋষিরা উদ্ভাবন করেছিলেন, তাতে বেদে কোন শব্দই প্রক্ষিপ্ত হতে পারে নি; কিন্তু পুরাণের পাঠ অবিকৃত রাখার জন্য সে-রকম কোন উপায় অবলম্বিত হয় নি। ফলস্বরূপ দেখা যায় একাধিক অধ্যায়—এমন কি সম্পূর্ণ খণ্ড পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে বহু অংশ সংযোজিত হয়েছে। প্রক্ষিপ্ত রূপটি কখনও বা অনায়াসেই বুঝে নেওয়া যায়, আবার কখনও বা তা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে প্রকরণ, প্রসঙ্গ ও বহুপাঠের জটিলতায়। সুতরাং

এই বর্গীকরণকেও সার্থক ও যুক্তিযুক্ত বলা যায় না।

মোট কথা, কোন ভাবেই পুরাণের বর্গীকরণ কিংবা শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। আসলে, পুরাণে এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সাম্যের ঐক্য-সূত্রে গেঁথে দেওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিন প্রধান দেবতার কথাই প্রত্যেকটি পুরাণে আলোচিত হয়েছে এ কথা সত্য ; কিন্তু কোন পুরাণেই বিশেষভাবে এই তিন প্রধানের কোন একজনের কথা বলা হয় নি, অন্য একজনের কথাও সেখানে এসে পড়েছে। তাই সেদিক দিয়েও ঐক্য আবিষ্কার করা যায় না। এ কথা বলা বোধ হয় অনুচিত হবে না যে, পুরাণের যে বিভাজনই করা হোক না কেন, পরিণামে তা অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক হতে বাধ্য।

পৌরাণিক ধর্ম

পুরাণসাহিত্য ভারতীয় মনীষার এক উজ্জ্বল সৃষ্টি, মানব প্রজ্ঞার এক অক্ষয় কীর্তি। ভারতীয় ধর্মের যে সরল এবং সনাতন রূপ পুরাণে পাওয়া যায়, আপামর জনসাধারণ তা সহজেই বুঝতে পারে। কঠিন ভাষার শৃঙ্খল এর স্বচ্ছন্দ বিচরণকে স্তব্ধ করতে পারে নি, সূক্ষ্ম এবং জটিল দার্শনিক বিচার এর সাবলীল বক্তব্যকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে নি। নিরলংকৃত, অনাড়ম্বর অথচ আকর্ষণীয় উপায়ে ভারতীয় সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব বিশদরূপে এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। পৌরাণিক ধর্ম বলতে সনাতন ভারতীয় ধর্মকেই বোঝায়। এই সনাতন ধর্মের স্বরূপ, ঈশ্বর, আত্মা, সৃষ্টি এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ্য কী—এ সমস্ত বিষয়ই পুরাণে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সম্পর্কে কোন একটি বিশেষ মতবাদ গৃহীত হয় নি। তবে ঈশ্বর সত্যিই জগতের স্রষ্টা কিনা, আত্মা নিত্য চেতন কিনা, মুক্তিতেই পরমাত্মার শাশ্বত আনন্দ কিনা—এ সমস্ত বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, পৌরাণিক ধর্মে মানবী বুদ্ধি ও হৃদয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। পুরাণ অনেক সময় এমন সব ব্যক্তিকে ঋষি বা অবতার রূপে কল্পনা করেছে, যাঁরা ঈশ্বর অথবা আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নি, অথচ তাঁরা প্রত্যেকেই মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন। মানব-ধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা, মানবতার জয়গান রচনা করা পুরাণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুরাণসাহিত্য নানান আখ্যান-উপাখ্যানের সাহায্যে এ কথাই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে চেয়েছে যে, মানুষ স্বরূপত সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্ত। মানবজীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ পুরুষার্থের স্বাধীনতা। কিন্তু এই স্বাধীনতা তাদের বাহ্য এবং আন্তরিক পরিস্থিতি অনুসারে দুর্লভ হয়ে ওঠে। অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের দিকে, মরণশীলতা থেকে অবিনশ্বরতার দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধি যাতে অগ্রসর হতে পারে, পুরাণসাহিত্যে তারই প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। এজন্যই এই পৌরাণিক ধর্ম কোন বিশিষ্ট দেবদেবীর পূজন, ভজন, উপাসনা, আরাধনা বা কোন বিশিষ্ট মতবাদরূপ বাহ্য আচার গ্রহণ করতে কখনই বাধ্য করে না। বিভিন্ন পুরাণে তাই দেখতে পাই অসংখ্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব—সাধনার ধারা তাদের ভিন্ন, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ সবই পৃথক—কিন্তু এই বিভেদের মধ্যেও অন্তর্লীন ঐক্যের সুরটি ধ্বনিত হয়ে চলেছে। গভীর মনোযোগ এবং পরম প্রযত্নের সঙ্গে পর্যালোচনা করলে পৌরাণিক ধর্মের শরীর বা আত্মা একই বলে

প্রতীত হয়। এ যেন এক অবিনশ্বর প্রাণী—ভেদ ও অভেদের সমন্বয়ে যার দেহ গঠিত। এই ভেদের মধ্যে অভিন্নতাই পৌরাণিক ধর্মের কেন্দ্র কথা।

যে সব পবিত্রচিত্ত মহামানবের জন্মের ফলে ভারতের ধার্মিক, রাজনীতিক, সামাজিক অথবা বৌদ্ধিক জীবন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে, পুরাণ তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বিষ্ণুপুরাণের ধরণীগীতায় পরাশর যদিও বলেছেন যে, যে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে অনেক দিন ধরে তপস্যা করেছিলেন, অমিতবলশালী যে ব্যক্তিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন, কাল তাঁদের সবাইকেই কথাবশেষ করেছেন ; তবু সেই 'কথাবশেষ' মহান ব্যক্তিদের প্রোজ্জ্বল চরিত্র অমর তুলিকায় পুরাণকার চিত্রিত করেছেন। কৃষ্ণ, জনক, হরিশ্চন্দ্র, ভীষ্ম, অর্জুন, কর্ণ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় বীর বর্তমান ও অনাগতকালের মানবসম্প্রদায়ের বিস্ময় তথা শ্রদ্ধার পাত্র। বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, কপিল, পরাশর, ব্যাস—এঁদের পূত জীবনচরিত, সমাজ সংস্কার, দর্শনের রহস্য উদ্ঘাটন, প্রাচীন আখ্যান-উপাখ্যানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ যুগ যুগ ধরে অনাগত মনীষাকে আকৃষ্ট করে। সীতা ও সাবিত্রীর পাতিব্রত্য, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর বৈদগ্ধ্য ভারতীয় মহিলা সমাজকে আবহমানকাল অনুপ্রাণিত করে আসছে। এই সব আদর্শ পুরুষ এবং নারীদের চরিত্র সম্বলিত বিভিন্ন রকম উৎসব ও ধার্মিক অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের সর্বত্র পালিত হয়। শহরে, গ্রামে, নগরে, বন্দরে, দেবালয়ে, মঠ-মিশনে কৃষ্ণলীলা, দাতা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও অর্জুনের বীরত্বগাথা প্রায়ই গীত হয়। পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যান ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকায়ত সংস্কৃতির মাধ্যমে ভারতীয় জনমানসে এখনও অম্লান হয়ে রয়েছে। পুরাণকাহিনীসম্বলিত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা আবহমানকাল ধরে ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যকে অটুট এবং সুদৃঢ় করে রেখেছে। যে যশস্বী মহাপুরুষগণ নিজেদের জীবনে ভারতীয় সনাতন ধারা প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, পুরাণ সেই বরেণ্যদের সমধিক মহত্ত্ব দিয়েছে। বালক ধ্রুব বা প্রহ্লাদের ভগবদভক্তিকে ভারতের চিরন্তন আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পুরাণকারগণ হয়তো কল্পনার আতিশয্যকে প্রকট করে তুলেছেন, অতিরঞ্জনকে মাত্রাতিরিক্ত করে তুলেছেন তবু এই মহনীয় দৃষ্টান্তসমূহ স্থাপনে তাঁদের আন্তরিক প্রয়াসকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

পৌরাণিক ধর্মের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দেওয়ার প্রয়াস। এটি প্রথম আমরা এই পুরাণসাহিত্যেই দেখতে পাই। বিশাল ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে নানা নগর, নদনদী, বন, পর্বত উপত্যকা প্রভৃতি। পুরাণ এই সব স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করে ভারতবাসীর মনে এদের প্রতি মহত্ত্ববোধ এবং শ্রদ্ধাভাব জাগিয়ে দিয়েছে। যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই হোন না তিনি শৈব কিংবা শাক্ত কিংবা বৌদ্ধ বা জৈন, নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য এই সব মাহাত্ম্য-মণ্ডিত স্থান দর্শন করেন। এই সম্প্রদায়গত সহনশীলতা ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করেছে। কিন্তু এই সব স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল কি ভাবে, জনসমাজে এদের মাহাত্ম্য কি ভাবে প্রচারিত হল—পুরাণ পাঠ করলে এ সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের এক প্রান্তকে অন্য প্রান্তের সঙ্গে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদায় মিলিয়ে দেওয়ার যে প্রয়াস পুরাণকারেরা করেছেন, তা সর্বথা অভিনন্দনীয়। গোদাবরী নদীর পুণ্য গাথা, মানস সরোবরের পবিত্র কাহিনী, নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য, উজ্জয়িনীর পবিত্র বিবরণ—

পুরাণকার সমস্তকেই মস্তকে ধারণ করেছেন; শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। এখানে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ভেদ নেই, সম্প্রদায়গত বিবাদ নেই, নেই প্রাত্যহিক তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও গ্লানি।

পৌরাণিক ধর্মের আরেক বড় বৈশিষ্ট্য হল এর সহনশীলতা। যদিও পুরাণের কোথাও কোথাও কোন দেবতাকে পরমেশ্বর বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাঁকেই একমাত্র উপাস্যরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে, তবুও এ কথা নিঃদ্বিধায় বলা যায় যে, পুরাণের মূল সুর এখানে ধ্বনিত হয় নি, একেই প্রতিপাদ্য তত্ত্বরূপে প্রমাণ করার চেষ্টা পুরাণকার করেন নি। সমস্তকে হৃদয়ে ধারণ, 'মহামহিমের অমর বীণায় প্রতিটি মানুষকে শুদ্ধনাদ ব্রহ্মরূপে আলাপন' এবং সর্বতোগ্রাহী ব্যাপকতা—পুরাণধর্মের এই-ই হল আসল কথা। মানবীয় আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি অথবা পূর্ণতার জন্য পরমেশ্বরের সাকাররূপে ভজনা কিংবা নিরাকার পরব্রহ্মের স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন কোন কিছুই অনিবার্য নয়। আত্মবিকাশের অনেক পথ ও উপায়—সবই সমান, সমস্তেরই মূল্য সমান। গন্তব্যস্থল এক, কিন্তু মত ও পথ ভিন্ন ; তবু এই ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের প্রত্যেকটিরই সমান গুরুত্ব এবং মর্যাদা রয়েছে। এই সমদর্শিতা এবং উদারতাই পৌরাণিক ধর্মকে মর্যাদামণ্ডিত, সুষমাময় এবং গ্রহণীয় করে তুলেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়েই ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনটি মুখ্য সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়েছে—প্রথমটি নির্বিশেষ ব্রহ্মপরক ; দ্বিতীয় পরমেশ্বর বিষয়ক এবং তৃতীয়, একই পরমেশ্বরের বহু দেবতা রূপে অভিব্যক্তি বিষয়ক। প্রথম ধারণা অনুযায়ী নির্বিশেষ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। এক পরমাত্মা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পরমাত্মা নেই, দ্বিতীয় পরমাত্মাই বা কেন, দ্বিতীয় কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপত নির্গুণ, অদ্বিতীয় এবং অপরিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয় ধারণা অনুযায়ী পরমেশ্বর অসীম শক্তি, অনন্ত জ্ঞান এবং অপরিসীম গুণাবলীর একমাত্র আধার। এই পরমেশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকারী এবং ধ্বংসকর্তা। এঁর কোন সুনির্দিষ্ট রূপ বা বিশিষ্ট নাম নেই। এই অ-নির্দিষ্ট ও অ-বিশিষ্ট পরমেশ্বরের চিন্তন সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অথচ মানবসম্প্রদায়ের বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশের মূলেই এই পরমেশ্বরের স্বীকৃতি। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নাম বা রূপে এঁকে অভিধান করতে পারে এ কথা সত্য, তাহলেও প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে, এই বহু বিচিত্র নাম বা বিভিন্ন রূপেই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের রূপ। আর তৃতীয় ধারণা অনুসারে একই পরমেশ্বর অনেক দেবতার রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন। এই তত্ত্ব বেদের সেই বিখ্যাত উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—একই পরমেশ্বরকে, একই সত্যকে পণ্ডিতগণ বহুধা বিভক্ত বা ব্যাকৃত বলে জানেন। এই তৃতীয় ধারণায় বিশ্বাসী ব্যক্তি মনে করেন একাধিক দেবতার মাধ্যমেই পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য, জ্ঞান, সৌন্দর্য প্রভৃতি প্রকটিত। এক এক দেবতা পরমেশ্বরের এক এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তির প্রতীক—এক একটি বিশিষ্ট গুণের আধার। এজন্যই এক দেবতা অন্য দেবতা থেকে পৃথক। প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, ভিন্ন ভিন্ন সাজসজ্জা, ভিন্ন ভিন্ন নাম ; প্রত্যেকের আরাধনা পদ্ধতিও পৃথক, মন্ত্রও পৃথক। কিন্তু যে যাঁকেই উপাসনা করুন না কেন, যে যাঁরই পূজক বা ভক্ত হোন না কেন—একের সঙ্গে অন্যের কোন বিরোধ নেই ; কেউ কারুর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না। এই সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা এবং ধর্মীয় উদারতা পুরাণসাহিত্যকে

এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। এই সাহিত্য সম্পর্কেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের এই কথা সার্থকভাবে প্রযোজ্য—

"তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া॥"

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে পৌরাণিক ধর্মকে সর্বাধিক মান্যতা দিতে হয়। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর শান্তিবিধানে, বিচ্ছিন্নতা ও আঞ্চলিকতাবাদের খাণ্ডবদহনে নিঃশেষে দগ্ধ সাম্প্রতিক ভারতবর্ষকে সমগ্রতা ও সুস্থতার ভাগীরথীধারায় অভিষিক্ত করবার জন্য পুরাণের ললিত বাণীর, পৌরাণিক ধর্মের উদারতার এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। পাশ্চাত্যপণ্ডিত গোল্ড স্টুকার হিন্দুধর্ম বলতে পুরাণের ধর্মকেই বুঝেছেন। তিনি বলছেন—It is creed... which, with further deteriorations, caused by the lapse of centuries, is still the main religion of the masses in India." দীর্ঘকালের ব্যবধানের জন্য এই পৌরাণিক ধর্মে যদিও কিছু অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটেছে, তবুও বলা যায় যে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এই ধর্মমতেই এখনও পুরোপুরি বিশ্বাসী।

পৌরাণিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময় একটা প্রয়োজনীয় কথা ভুললে চলবে না যে, এই ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ বেদানুগ। বলা হয়েছে, 'পুরাণং বেদসম্মতম্।' বেদপ্রতিপাদিত ধর্মের সঙ্গে এর মৌলিক কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। তবু যেটুকু পার্থক্য এই দুই ধর্মের মধ্যে আবিষ্কার করা যায় তা হল এই যে দেবমন্দির নদী, তীর্থ, দান ও অতিথি-সেবা—মূলত এই পাঁচটির মাহাত্ম্য কীর্তন পুরাণে বেশী করে দেখা যায়; শুধু তাই নয়, বৈদিক যাগযজ্ঞের তুলনায় এদের মূল্যকে বড় করে দেখানো হয়েছে। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছিল, ফলে তা জনসাধারণের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল। এজন্যই বৈদিক যজ্ঞধর্মের স্থানে পুরাণে এক নতুন জনধর্মের অভ্যুদয় হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা প্রভৃতি নদীর, কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক কিংবা রাজনীতিক জীবনে নিশ্চয়ই পুরাতনের কোন এক অংশকে বর্জন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই বৈদিক ধর্মের সব অংশই যথাযথ-ভাবে পৌরাণিক ধর্মে অনুসৃত হয় নি। পুরণোকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত নতুনের গ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি পৌরাণিক ধর্মে বিশেষ লক্ষ্যণীয়। পুরাণে দেখতে পাই নীরস বৈদিক কর্মকাণ্ডকে পরিত্যাগ করে মানুষ ভক্তিবাদের দিকে ঝুঁকেছে। এই কারণে পুরাণে ভক্তিরই প্রাবল্য দেখা যায়। তাই দেব-দেবীর পূজা, তীর্থস্থান দর্শনে ও ভক্তিভরে অতিথি-সেবাকে পুরাণ অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত দেবতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখি যে, কয়েকটি বৈদিক দেবতার পৌরাণিক যুগে এসে আকৃতি ও প্রকৃতিতে, স্তব ও স্তুতিতে, হোম ও পূজায় লক্ষ্যণীয় কিছু পার্থক্য ঘটেছে। বৈদিক যুগে প্রধানত ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতার 'হোম' করা হত; 'পূজা' শব্দের ব্যবহার বৈদিক সাহিত্যে নেই। দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়েই বৈদিকযুগে দেবতার উপাসনা করা হত। 'পূজা' শব্দটিও অনার্য-ভাষা গোষ্ঠী থেকে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু পুরাণে আমরা এই যজ্ঞের পরিবর্তে পূজার ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাই—যার মূলে নিহিত রয়েছে ভক্তিমন্দাকিনীর পূত ধারায়।

বৈদিক সাহিত্য প্রধানত ব্রাহ্মণ্যধারার ইতিহাসকেই বহন করে। সে যুগে বেদ ছিল মুনি, ঋষি, জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছাড়া অন্যান্য জনসাধারণের বেদমার্গে প্রবেশের অধিকার ছিল না। এদিক দিয়ে বিচার করলে বৈদিক ধর্ম বা বৈদিক সাহিত্যকে জনগণের ধর্ম বা সাহিত্য বলা যায় না। পুরাণ সেই ধর্মকে, সেই সাহিত্যকে লোকশিক্ষার বাহনরূপে সাধারণের মধ্যে প্রচার করল। সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের অধিবাসীদের সঙ্গে বেদের বা বেদশাসিত অনুশাসনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। সেজনাই দেখা যায় ভাষার কাঠিন্যকে দূর করে, শুষ্ক কর্মকাণ্ডকে ভক্তিরসে সঞ্জীবিত করে বৈদিক ধর্মেরই এক নবীন ভাষ্য পুরাণে রচিত হয়েছে। পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ধর্মকে অবজ্ঞা করেন নি, যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তার সংস্কার সাধন করেছেন মাত্র। হিন্দুত্ব, ধর্ম, জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাধারণীকরণ হল পুরাণের বিশেষ অবদান। সনাতন ভারতীয় ধর্মের এই যুগোপযোগী ধারাভাষ্য রচনা ব্যাসদেবেরই অন্যতম কীর্তি। বৈদিক চিন্তাধারাকে সাধারণের উপযোগী করে প্রচার করে ব্যাস এবং তাঁর অনুগামীরা বিশ্বমানবের যে কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন, সেজন্য অনাদি, অনন্ত কাল ধরে আপামর জনসাধারণ তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাবে। মূলত এঁদের প্রচেষ্টার গুণেই বৈদিক ঋষিদের সাধনালব্ধ এক অখণ্ড ব্রহ্ম পৌরাণিকদের প্রেমের দৃষ্টিতে ভক্তির মধুময় স্পর্শে অনেক হয়ে উঠল। একটিই পরমতত্ত্ব ভিন্ন রূপ ও নামে বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন, সামর্থ্যযুক্ত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে নিজেকে প্রকটিত করল, একেই সৃষ্টির লীলাবিলাস বলে। মানুষের ইতিহাস—বিশেষ করে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা পুরাণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিচক্ষণ ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে যদি কেউ বিচার করেন, তবে পুরাণে বর্ণিত কাহিনীসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের যত উপাদান আছে অন্য কোথাও তা পাওয়া যাবে না। 'সূত' দের বিশেষ কাজই ছিল দেবতা, ঋষি, রাজা ও মহান ব্যক্তিগণের বংশাবলী ও কাজকর্ম সম্পর্কে সঠিক বিবরণ সংরক্ষণ করা ; পুরাণের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে আমরা একেই চিহ্নিত করতে পারি। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পুরাণখানি যদি আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হত, তবে অনেক জিজ্ঞাসার সদুত্তর আমরা পেয়ে যেতে পারতাম। তাহলেও এ কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলোতে ভারতবর্ষের রাজবংশের যে ইতিহাস সংরক্ষিত আছে, তার এক বড় অংশের ঐতিহাসিক সত্যতাকে স্বীকার করে নিতেই হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Pargiter-ই প্রথম পুরাণগুলোর ঐতিহাসিক মূল্যের উপর আলোকপাত করেন। ইতিহাস-বর্ণনা পুরাণের অন্যতম লক্ষ্য হলেও এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সমস্ত সংসার শ্রীভগবানের লীলাবিলাস এ কথা প্রতিপন্ন করা। সুতরাং বৈদিক ধর্মকে লোকপ্রিয় করার যে পুণ্য তা পুরাণকারদেরই প্রাপ্য।

বৈদিক এবং পৌরাণিক ধর্মের মধ্যে প্রবহমান এই যে সাদৃশ্যের ধারা, বর্তমান কালের কোন কোন পণ্ডিত তাকে অস্বীকার করেন। তাঁরা এই অভিমত পোষণ করেন যে, এই দুই ধর্ম অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন, উভয়েই স্বাতন্ত্র্যের ধারক। আমাদের মনে হয় এই প্রাজ্ঞ সমালোচকেরা উভয় ধর্মের মৌলিক ঐক্যের সূত্রটিকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। যাঁরা বৈদিক ধর্মে শ্রদ্ধাবান হয়েও পুরাণকার প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে উন্নাসিক হয়ে ওঠেন, তাঁরা হিন্দুধর্মের মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ কী তা জানেন না। বৈদিক ধর্ম এবং

পৌরাণিক ধর্ম স্বরূপত এক ও অভিন্ন—কালের ব্যবধানই এদের মধ্যে আপাত দৃশ্যমান কিছু পার্থক্যের ছাপ রেখে দিয়েছে। স্পর্ধাভরে বরং এ কথা বলা যায় যে, বেদ কর্ম-কান্ডীদের পক্ষে পরম আশ্রয় হলেও সেখানে সূত্রাকারে ভক্তির কথা কোথাও কোথাও রয়েছে। পুরাণই ভক্তিরসের প্রকাশক, পুরাণেই ভক্তির কথা সীমাবদ্ধ, বৈদিক বাঙ্ময়ে ভক্তির চিহ্ন কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না—এই উক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন ভারতবর্ষে ভক্তিবাদ খৃষ্টধর্মের প্রভাবজাত। খৃষ্টধর্মের মূল কথা হল ঈশ্বরই অক্ষয় প্রেম এবং অপারিসীম ভক্তির উৎস। এই পণ্ডিতদের মতে খৃষ্টধর্ম পৃথিবীর সব সম্প্রদায়কেই ভক্তিরসে উদ্বুদ্ধ করেছে। এঁদের মতকে মেনে নিলে এ কথা বলতে হয় যে, ভক্তির কল্পনায় ভারতবর্ষ খৃষ্টানদের কাছে ঋণী। কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধানী এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে, পৌরাণিক এবং বৈদিক ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে, এই মতবাদকে খুবই অপ্রামাণিক এবং নিরাধার বলে মনে হয়। ভারতবর্ষ ভক্তিরসাশ্রিত, এর প্রত্যেক প্রান্ত ভক্তিরসে প্লাবিত, প্রতিটি ধূলিকণা ভক্তিরসের অমিয়ধারায় স্নাত। ভারতীয় সংস্কৃতির এই সনাতন ধারার সঙ্গে বৈদেশিক সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে এ কথা সত্য ; তবে সেই বৈদেশিক ভাবধারা মূল স্রোতে লীন হয়ে গেছে, তা ভারতীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে বরণ করে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মিথ্ বা পুরাতত্ত্ব নিয়ে বর্তমানে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। আধুনিক যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে পুরাণকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কালকূট-এর 'শাম্ব', নামক পুরাণ-ভিত্তিক উপন্যাস। লেখক সেখানে পুরাণের কয়েকটি প্রচলিত সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং কোথাও কোথাও তাঁর বিচার এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতি নবীন হয়েও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘন করে নি। কিংবা সুবোধ চক্রবর্তী মহাশয়ের 'পুরাভারতী' গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরাণের বহু বিষয়কে লেখক অভিনব ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রহ্লাদকে তিনি ভক্তের মর্যাদা দেন নি ; তাঁর মতে প্রহ্লাদ দেবতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে পিতৃহত্যার মাধ্যমে রাজ্যলাভ করেছেন। কিংবা ডঃ দীপক চন্দ্রের 'মহাবিশ্বে মধুকৈটভ' বা 'কৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়' প্রভৃতি বইয়ের কথাও উল্লেখ করা যায়। এই সব প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানানো উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যে, আধুনিকতার আলোকে পুরাণকে দেখাতে গিয়ে তার মূল সুরটিক আমরা যেন হারিয়ে না ফেলি, সনাতন ধারাটিকে যেন বিচ্ছিন্ন করে না দিই। ভারতীয় সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই মহীরূহটির আমরা যেন মূলোৎপাটন না করি।

পুরাণের ভূগোল

কোন দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে ঐ দেশের ভূগোল-আলোচনাও অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। প্রাচীন শাস্ত্রে যে সব নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির কথা উল্লেখ রয়েছে তাদের সঠিক অবস্থান জানতে পারলে যে কথাপ্রসঙ্গে তাদের নাম করা হয়েছে তার সঠিক সূত্র ও পরিমাপ বোঝা যায় ; ঐ সব স্থানের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কেও পাঠকের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হয়। ধার্মিক চেতনায়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন ধর্মক্ষেত্র, পুণ্যস্থান এবং তীর্থক্ষেত্রের মূল্য অপরিসীম।

ঋগ্বেদেই সর্বপ্রথম ভারত ও বৃহত্তর ভারতের ভূ-সংস্থানের কিছু পরিচয় পাওয়া

যায়। বিখ্যাত নদীসূক্তে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি সতেরোটি নদ-নদীর নাম পাই। অন্যান্য কিছু কিছু দেশের নামও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। তবে ভৌগোলিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে যে একাধিকভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, তার প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় অথর্ববেদ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সাক্ষ্যে। সেখানে দেখতে পাই যে, ধ্রুবমধ্যমা, প্রাচী, দক্ষিণা, উদীচী ও প্রতীচী—এই পাঁচটি ভাগে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য ব্রাহ্মণের সাক্ষ্য থেকে কাশী, কোশল, বিদেহ, মগধ এবং অঙ্গ প্রভৃতি দেশের নামও জানতে পারা যায়। তবে প্রাচীন ভারত, বৃহত্তর ভারত তথা পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিচয় প্রদানে পুরাণকাররাই সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। প্রাচীন ভূগোল পর্যালোচনার পক্ষে এই পুরাণগুলো অন্যতম প্রধান উপকরণ। পুরাণের ভূগোল পর্যালোচনায় প্রথমেই মেরুপর্বতের কথা আসে। পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত মেরুপর্বতের স্বরূপ না জানলে পুরাণের ভূগোল-জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বায়ুপুরাণের মতে মেরু অত্যন্ত উন্নত পর্বত; ব্রহ্মার নাভিবন্ধন থেকে নাকি এর উৎপত্তি। বহু বিস্তৃত এর আয়তন। এই পর্বতের পাশে পাশেই নানা বর্ণের লোকের বাস। এর পূর্ব দিক সাদা, তাই এদিকে ব্রাহ্মণদের বাস, দক্ষিণ দিক পীত রঙের, তাই এদিকে বৈশ্যদের বাস, পশ্চিম দিক কালো, তাই এদিকে শূদ্রদের বাস আর উত্তর দিক রক্তের মতো লাল বলে ওদিকে ক্ষত্রিয়দের বাস। এই পর্বত তরুলতায় শ্যামল, নানান রত্নে আঢ্য এবং স্বভাবতই রমণীয়। অব্যক্ত থেকে পৃথিবীরূপ পদ্মের আবির্ভাব, এই মেরুপর্বত ঐ পদ্মের কর্ণিকার মতো বিরাজমান।

অগ্নি এবং অন্যান্য পুরাণের সাক্ষ্য অনুসারে জম্বুদ্বীপের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ইলাবৃত বর্ষের মধ্যেই মেরুর অবস্থান। ইলাবৃত বর্ষের চারদিকে মেরুপর্বতেরই সহায়ক মন্দর, গন্ধমাদন, বিপুল এবং সুপার্শ্ব পর্বত যথাক্রমে পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর দিকে অবস্থিত। এ ছাড়া মেরুর চারদিকে আরও যে সব পর্বত রয়েছে, তাদের নামও বিভিন্ন পুরাণের মাধ্যমে জানা যায়। মেরুর উত্তরে নীল পর্বত, তার উত্তরে শ্বেত এবং তারও উত্তরে রয়েছে শৃঙ্গী পর্বত। পূর্ব দিকে জঠর পর্বত এবং দেবকূট পর্বত, দক্ষিণ দিকে নিষধ পর্বত, এই নিষধের দক্ষিণে হেমকুট পর্বত এবং হেমকূটেরও দক্ষিণে হিমবান পর্বত। মেরুর পশ্চিম দিকে আছে বিখ্যাত মাল্যবান পর্বত। বিভিন্ন পুরাণে এ সব পর্বতের নামের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও মেরুপর্বতের অবস্থান, মহত্ত্ব এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে প্রায় সব পুরাণেই মতৈক্য দেখতে পাওয়া যায়।

পুরাণে বর্ণিত মেরুপর্বতের ভৌগোলিক স্থিতির উপর ভিত্তি করে এর বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা খুব কঠিন হবে না। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই পামীর মালভূমিকে মেরুপর্বত বলে মনে করে থাকেন। তাঁদের এ রকম ধারণার ভিত্তি হল, পামীর পৃষ্ঠ থেকে চারদিকে পর্বতমালা প্রসারিত এবং মেরুপর্বতের চার পাশেও পর্বতমালা প্রসারিত রয়েছে। সুতরাং এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে পামীর মালভূমিকে মেরুপর্বত বলে মনে করা যেতে পারে। কারো কারো মতে অবশ্য উত্তর এশিয়ার সাইবেরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে অবস্থিত আলতাই পর্বতমালাই প্রাচীন মেরুপর্বতের সঙ্গে এক ও অভিন্ন। 'আলতাই' শব্দটি প্রাচীন মঙ্গোলীয় পদ 'আলতেন-উলা' থেকে আগত। এর অর্থ সুবর্ণ পর্বত। প্রায় সব পুরাণেই মেরুপর্বতকে সুবর্ণনির্মিত বলা হয়েছে। পৌরাণিক সাক্ষ্য অনুসারে হিমালয়ের উত্তরে হেমকূট, তার উত্তরে নিষধ এবং

তারই উত্তরে মেরুপর্বতের অবস্থিতি। বর্তমানে হিমালয় ও আলতাই পর্বতের মধ্যে থিএনশন এবং কুএনলুন পর্বতমালা রয়েছে। অতএব এ কথা মনে করা যেতে পারে যে, প্রাচীন হেমকূটই বর্তমানের কুএনলুন এবং নিষধ থিএনশন। পুরাণে মেরুপর্বতের যে ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা অনেক অংশেই আলতাই পর্বতমালার চারদিকের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে মিলে যায়। অনেকে মনে করেন যে, এই আলতাই পর্বত-শৃঙ্গের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ থেকেই আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। পুরাণে একেই পৃথিবীর স্বর্গ এবং দেবতাদের আবাসস্থল বলে কল্পনা করা হয়েছে। এ সব তথ্যের ভিত্তিতে এই অনুমানে আমরা আসতে পারি যে হিমালয়ের উত্তর দিকে সাইবেরিয়াতে অবস্থিত আলতাই পর্বতই মেরুপর্বত।

পৌরাণিক ভুবনকোশে পৃথিবীর দু' প্রকার বিভাগের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ধারণা অনুযায়ী পৃথিবী চারটি দ্বীপে বিভক্ত। এই বিভাগ থেকে 'চতুর্দ্বীপা বসুমতী'র ধারণাটি এসেছে। মেরুকে কেন্দ্র করে চারটি দ্বীপের অবস্থান এভাবে দেখানো হয়েছে। এর পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ব, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পশ্চিমে কেতুমাল এবং উত্তরে উত্তরকুরু। ভদ্রাশ্ব বলতে চীন, জম্বুদ্বীপ হল ভারতীয় উপমহাদেশ ও পশ্চিম এশিয়ার ছোট ছোট দেশ এবং কেতুমাল আর উত্তরকুরু বলতে আলতাই পর্বত থেকে আরম্ভ করে উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত সাইবেরিয়ার সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভাগকে বোঝায়। ভদ্রাশ্ব প্রভৃতি প্রত্যেকটি দ্বীপে বিশিষ্ট নদী, পর্বত, বন, সরোবর ইত্যাদি আছে। যদিও 'চতুর্দ্বীপা বসুমতী' এ রকম ধারণার পরিচয় পুরাণেই পাওয়া যায়, তাহলেও 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী' এই দ্বিতীয় ধারণাটি সর্বাধিক পরিচিত এবং সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত। পৃথিবীর ভৌগোলিক বিন্যাস সম্পর্কে যে সব পুরাণ আলোচনা করেছে, তাদের প্রত্যেকটিতেই সপ্তদ্বীপময়ী পৃথিবীর উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ বিশেষ করে এই সাতটি দ্বীপের বিশদ আলোচনা করেছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবী মোট সাতটি দ্বীপে বিভক্ত—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। এগুলো পরস্পর যথাক্রমে দ্বিগুণ বিস্তৃত। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ এবং জল—এই সাতটি সমুদ্র এই সাতটি দ্বীপকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এই সাগরগুলোও যথাক্রমে পরস্পর দ্বিগুণ বর্ধিত।

এই সাতটি দ্বীপের মধ্যে আবার জম্বুদ্বীপই প্রধান—বিস্তারে ও দৈর্ঘ্যে এক লক্ষ যোজন। হেমবান, হেমকূট, ঋষভ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী—এই সাতটি প্রধান পর্বত এই দ্বীপে রয়েছ। এই পর্বতগুলোকে 'বর্ষ' পর্বত বলা হয়। এই দ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থিত মহাপর্বত দুটি দু' লক্ষ যোজন বিস্তৃত। এদের দক্ষিণে ও উত্তরে যথাক্রমে দুটি দুটি করে যে পর্বত আছে, তাদের উচ্চতা দু' হাজার যোজন এবং বিস্তৃতিও প্রায় সে-রকম। এই দ্বীপের ছ'টি বর্ষপর্বত সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখানকার ভূমি দক্ষিণ ও উত্তরদিকে নীচু এবং এর মধ্যভাগ বন্ধুর। এই দ্বীপের দক্ষিণে তিনটি এবং উত্তরেও তিনটি বর্ষ। এদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ অর্ধচন্দ্রের আকারে অবস্থিত। এই দ্বীপের পূর্বে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ। ইলাবৃত বর্ষের মধ্যভাগে রয়েছে মেরুপর্বত। এই মেরুপর্বতের উপরে আট দিকে ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালদের সভা রয়েছে এবং সে সবের কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান ব্রহ্মার সভা। ঐ সভা বা ব্রহ্মলোকের বিস্তার চৌদ্দ হাজার যোজন। এই দ্বীপের পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি দিকে মন্দর, গন্ধমাদন, বিপুল,

সুপার্শ্ব প্রভৃতি অন্যান্য পর্বত যথাক্রমে দেখা যায়। এই সব পর্বতের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে ; পৌরাণিক পরিভাষায় এদের 'কেতুবৃক্ষ' বলা হয়। মন্দরের কেতুবৃক্ষ কদম্ব গন্ধমাদনের জম্বু, বিপুলের অশ্বত্থ এবং সুপার্শ্বের কেতুবৃক্ষ বট। এই পর্বতসমূহে বিস্তৃতির পরিমাণ মোট এক হাজার একশো যোজন।

জম্বুদ্বীপ ছাড়া আরও যে ছ'টি দ্বীপ রয়েছে তাদের মধ্যে কুশ এবং শাকদ্বীপ বিষয়েই পুরাণে কিছু তথ্য পাওয়া যায় ; কিন্তু অন্য চারটি দ্বীপ সম্বন্ধে পুরাণকা প্রায় নীরব। এদের মধ্যে শাক দ্বীপের ভৌগোলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পুরা ছাড়াও গ্রীক, আরব ও ইরাণীয় লেখকদের গ্রন্থ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে।

কুশদ্বীপের (কুশ নামক দেশের) এবং কুশদ্বীপনিবাসী কুশীয় অধিবাসিদের কথ প্রাচীন পারসী ভাষায় রচিত অনেক শিলালেখের মধ্যেই পাওয়া যায়। পারস্য সম্রা দারায়াসের (খৃষ্টপূর্ব ৫২২ থেকে ৪৮৬ পর্যন্ত) রাজ্যসীমা একটি লিপিতে বর্ণি হয়েছে ; সেখানে আমরা 'কুশ' শব্দটির উল্লেখ পাই। লিপিটির অর্থ এ রকম দাঁড়ায়- সেগ্দিয়ন (অক্সাস এবং জাক্সার্টেস—এ দুয়ের মধ্যবর্তী বুখর অঞ্চল) অতিক্রম করে কুশ যেখানে অবস্থিত সেখান থেকে সীদিয়রা এবং সিন্ধু থেকে স্পর্দ পর্যন্ত (এশিয় মাইনরে অবস্থিত সর্দি) এই বিস্তৃত ভূখণ্ড দারায়াসের রাজ্যের সীমা ছিল। কোন কো ঐতিহাসিক বর্তমান ইথিওপিয়াকেও, কেউ কেউ আবার বর্তমান সংযুক্ত আরব প্রজা তন্ত্রের কেন্দ্রস্থিত কোন ভূভাগকে কুশদেশ বলে মনে করেন। বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষ এবং বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে মোটামুটিভাবে, পুরাণপ্রসিদ্ধ কুশদ্বীপের অবস্থা বর্তমানে আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কোন এক স্থানে ছিল এ কথা বলা যায়।

শাকদ্বীপের ভৌগোলিক তথ্য বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে কুশ দ্বীপের মতো শাকদ্বীপেরও সাত পর্বত, সাত বর্ষ এবং সাতটি বিশিষ্ট নদীর না পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, এখানে প্রত্যেকটি পর্বত, বর্ষ এবং নদীর দুটো করে না দেওয়া হয়েছে। শাকদ্বীপে যে সাতটি পর্বত রয়েছে, তাদের নাম এ রকম—মেরু (অন নাম উদয়), জলধার (নামান্তর চন্দ্র, বিষ্ণুপুরাণে জলাধার), দুর্গশৈল (অন্য না নারদ), শ্যাম (অন্য নাম দুন্দুভি), অস্তগিরি (নামান্তর সোমক), আম্বিকে (নামান্তর সুমনস্) এবং বিভ্রাজ (অন্য নাম কেশব)। এই সাতটি পর্বতে কোন্ কোন বর্ষ রয়েছে, তাদের নামও করা হয়েছে। মেরুপর্বতে উদয় বর্ষ (নামান্তর জলধার বর্ষ অবস্থিত, জলধার পর্বতে সুকুমার বর্ষ (নামান্তর শৈশির), দুর্গ পর্বতে কৌমার ব (নামান্তর সুখোদয়), শ্যাম পর্বতে মণিচক বর্ষ (নামান্তর আনন্দক), অস্তগিরিতে কুসুমোৎকর বর্ষ (নামান্তর অসিত), আম্বিকেয় পর্বতে মৈনাক বর্ষ (নামান্তর ক্ষেম বর্ষ) এবং বিভ্রাজ পর্বতে বিভ্রাজ বর্ষ (নামান্তর ধ্রুব) অবস্থিত। শাকদ্বীপে বিখ্যাত সাতটি নদীর কথাও বলা হয়েছে পুরাণে। এই নদীসমূহের নাম—সুকুমার (নামান্তর মুনিতপ্তা), কুমারী (তপঃসিদ্ধা), নন্দা (পাবনী), শিবিকা (দ্বিবিধা) ইক্ষু (কুহু), বেণুকা (অমৃতা) এবং সুকৃতা (গভস্তি)। উল্লেখ্য যে, প্রসিদ্ধ গ্রীক ভূগোলতত্ত্ববিদ হেরোডটাস যে ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে শাকদ্বীপের এ ভৌগোলিক বিবরণ অনেক অংশেই মিলে যায়।

দ্বীপের অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিভাগের নাম বর্ষ। অন্যান্য দ্বীপের বর্ষ সম্পর্কে পুরাণে বিশেষ কিছু আলোচিত না হলেও ভারত নামের বর্ষটি যে দ্বীপে

অন্তর্গত সেই জম্বুদ্বীপের ন'টি বর্ষের কথা অধিকাংশ পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে। জম্বুদ্বীপের এই ন'টি বর্ষের নাম—ভদ্রাশ্ব বর্ষ, কেতুমাল বর্ষ, উত্তরকুরু বর্ষ, কিম্পুরুষ বর্ষ, হরি বর্ষ, ইলাবৃত বর্ষ, রম্যক বা রম্য বর্ষ, হিরন্ময় বা হিরণ্বান বর্ষ এবং ভারত বর্ষ। এদের মধ্যে ভদ্রাশ্ব বর্ষ সুমেরুর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এখানকার পাঁচটি কুল পর্বতের নাম—শ্বেতপর্ণ, নীল, শৈবাল, কৌরঞ্জ এবং পর্ণশালাগ্র। এই পাঁচটি প্রধান পর্বত ছাড়াও এখানে আরও অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে ; রয়েছে অনেক জনপদ। এই সব জনপদে শীতা, শঙ্খবতী, ভদ্রা, চক্রাবর্তা নদী প্রবাহিত। এই ভদ্রাশ্ব বর্ষের অধিবাসীরা বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও শঙ্খের মতো উজ্জ্বল। এদের স্বভাব পবিত্র এবং এরা দীর্ঘজীবী। এদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভেদ নেই। এখানে ভগবান জনার্দন ত্রিনেত্র-বিশিষ্ট অশ্বের মস্তকরূপে বিরাজ করেন। এই ভদ্রাশ্ব বর্ষ সম্ভবত চীনদেশের প্রতি ইঙ্গিত করে। চীনের জাতীয় চিহ্ন শ্বেত ড্রাগন এবং এই ড্রাগনের মুখের সঙ্গে অশ্বের মুখের সাদৃশ্য আছে। চীনদেশের অধিবাসীরা পীতাভ ; সোনার মতো তাদের গায়ের রঙ। চীন মেরুপর্বতের পূর্বপ্রান্তেই অবস্থিত। এ সব তথ্য পর্যালোচনা করলে বর্তমান চীনকেই ভদ্রাশ্ব বর্ষ বলে অভিহিত করতে হয়।

মেরুপর্বতের পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষের অবস্থান। বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, হরি, বিশোক ও বর্ধমান—এই সাতটি এখানকার কুলপর্বত। এ ছাড়াও রয়েছে আরও অনেক পর্বত। এই সব পর্বতে মৌল, মহাকায়, শাককপোত, করম্ভ, অঙ্গুল প্রভৃতি অনেক জনপদ প্রতিষ্ঠিত। এখানে রংক্ষু, শ্যামা, কম্বলা, অমোঘা, কামিনী ও অন্যান্য অনেক নদী প্রবাহিত। এখানকার অধিবাসীরাও দীর্ঘজীবী। ভগবান জনার্দন এখানে বরাহরূপে বিরাজ করেন। কেতুমাল বর্ষের পরিচয় এই দেশে প্রবাহিত রংক্ষু নদীর সনাক্তকরণের দ্বারাই পাওয়া যায়। এই নদীর বর্তমান নাম খুব সম্ভবত অক্সাস—যা অরল সাগরে গিয়ে মিশেছে।

মেরুর উত্তরে অবস্থিত বর্ষই উত্তরকুরু বর্ষ। এখানকার প্রত্যেকটি গাছই ফলে ফুলে পরিপূর্ণ। এখানে উত্তম বস্ত্র এবং অন্যান্য আভরণ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর ভূমি মণিময়, বায়ু সুগন্ধি। কোন কারণে দেবলোক থেকে যাঁরা ভ্রষ্ট হন, তাঁরাই এখানে এসে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেও মানুষেরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। এখানকার মানুষের পরমায়ু চৌদ্দ হাজার বছর। এর দুটি কুলপর্বতের নাম সূর্যকান্ত এবং চন্দ্রকান্ত। এই দুই পর্বতের মধ্য দিয়ে যে নদী প্রবাহিত, তার নাম ভদ্রসোমা ; এ ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক ছোট ছোট নদী। এখানকার সমুদ্রের মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ এবং ভদ্রদ্বীপ—এই দুটো দ্বীপই পরম পবিত্র বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। এখানে ভগবান বিষ্ণু প্রাক্‌শিরা মৎস্যরূপে অবস্থান করেন। এই বর্ষে মোট ন'টি নক্ষত্র আছে—সে জন্য এখানকার দিকও ন'টি ভাগে বিভক্ত। প্রসিদ্ধ গ্রীক লেখক টলেমি তাঁর ভূগোল গ্রন্থে (আনুমানিক ১৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত) যে 'ওত্তোরো কোরাই' অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছেন, তাই-ই সম্ভবত পৌরাণিক উত্তরকুরু। বর্তমান চীনীয় তুর্কিস্থানের তারিস অববাহিকা প্রদেশই সম্ভবত উত্তরকুরু বর্ষ।

কিম্পুরুষ বর্ষের স্থান মেরুপর্বতের দক্ষিণে। এখানে পুরুষমাত্রই সু-স্বাস্থ্যের ধিকারী, তাদের আয়ুর পরিমাণ দশ হাজার বছর। জরা কিংবা মৃত্যুর প্রাবল্য এখানে । এদেশের নারীরাও রোগহীন নিরাময় দেহে দীর্ঘদিন জীবন ধারণ করে। এরা

যৌবনবতী এবং এই যৌবন প্রায়ই স্থির থাকে। এদের শরীর থেকে পদ্মের সৌরভে মতো এক রকম সুগন্ধ বিনির্গত হয় এবং তা পুরুষদের উন্মাদনা এনে দেয়। কিম্পুরু বর্ষ কিন্নরদের দেশকেই বোঝায়। কিন্নরগণ হিমালয়ের প্রান্তভাগে বসবাস করে। পুরাণে এবং পরবর্তী সাহিত্যে কিন্নরদেশের তথা কিন্নরদের কথা পাওয়া যায়। মেরুপর্বতে দক্ষিণদিকে এর অবস্থান। কাজেই কিম্পুরুষ বর্ষ যে হিমালয়ের নিকটস্থ কোন অঞ্চলবে বোঝায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হরি বর্ষ মেরুপর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীদের গায়ের রং রুপোর মতো উজ্জ্বল। সাধারণত দেবলোক থেকে ভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই এখানে জন্মগ্রহণ করে জরা, রোগ, শোক প্রভৃতির কোন স্থান এখানে নেই। দীর্ঘদিন সুখ ভোগ করে এখানকা অধিবাসীরা। 'হরি' শব্দের একটি অর্থ অশ্ব। সুতরাং মেরুপর্বতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সুগদ্ বা বোখারা প্রদেশ যা অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ—তার সঙ্গে হরি বর্ষে অভিন্নতা স্থাপনের প্রয়াসকে খুব অনুচিত বলা যায় না।

এরপর ইলাবৃত বর্ষ। এই বর্ষেই মেরুপর্বত অবস্থিত। এখানকার অধিবাসী সৌম্যকান্তিবিশিষ্ট; তাদের বার্ধক্য কিংবা রোগশোক ভোগ করতে হয় না। প্রত্যেকে তেরো হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বর্তমানের মধ্য এশিয়ায় এর অবস্থিতি আধুনিক পামির পূর্ব তুর্কীস্থান ইলাবৃত বর্ষের অন্তর্গত। এই ইলাবৃত বর্ষেরই নাম 'স্বর্গ'। পুরাকালে এই ইলাবৃত বর্ষ অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। পরে নানা প্রাকৃতি দুর্যোগে সেখানকার সভ্যতা লুপ্ত হয়; সাইবেরিয়ার পর্বত থেকে বেরিয়ে যে ইলি নদ বৈকাল হ্রদে পতিত হয়েছে, সেই নদীর তটবর্তী কোন প্রদেশই সম্ভবত ইলাবৃত বর্ষ; কূ পুরাণের মতে জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর আগ্নীধ্রের ন'টি মহাবলশালী পুত্রের মধ্যে অন্যত ইলাবৃত যে বর্ষের অধিপতি হয়েছিলেন, তাঁর নামেই এই বর্ষের নাম ইলাবৃ হয়েছে।

এরপর রম্যক বা রম্য বর্ষের স্থান। মেরুপর্বতের উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থিতি। অধিবাসীরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। রম্য বা রম্যক বর্ষ খুব সম্ভবত রমি বা রূ অঞ্চলকেই বোঝায়; অবশ্য এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

এরপর হিরন্ময় বা হিরণ্বান বর্ষ। মেরুপর্বতের পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে এর অবস্থিতি এখানে হিরণ্বতী নদী প্রবাহিত। বলশালী এবং তেজস্বী মানুষেরাই এখানে জন্ম করে থাকেন। শুধু তাই নয়, এখানকার অধিবাসীরা সবাই প্রিয়দর্শন। পণ্ডিতে বর্তমানের 'বদকশা' প্রদেশকেই হিরন্ময় বা হিরণ্বান বর্ষ বলে থাকেন। এই প্রদে মূল্যবান রত্নরাজি এবং দুর্লভ ও দামী পাথর পাওয়া যায়। এ দিক দিয়ে বিচার করলে হিরণ্বয় বা হিরণ্বান এই নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

লক্ষ্যণীয় যে, যে আটটি বর্ষের উল্লেখ এখানে করা হল, সেগুলো এশিয়া অবস্থিত। শেষ বর্ষটি 'ভারত' নামে পরিচিত। এই ভারত বর্ষ মোট ন'টি ভাগে এই সমস্ত ভাগই সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকায় অগম্য। এই ন'টি ভাগের নাম—ইন্দ্রদ্বী কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব, বারুণ এবং কুমার (কুমারী দ্বীপ। এর পূর্বে কিরাত, পশ্চিমে যবন এবং মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এ শূদ্রদের বাস। এঁরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মে নিয়োজিত। এ কর্মের দ্বারাই তাঁরা ধর্ম এবং স্বর্গ ও অপবর্গ প্রভৃতি লাভ করে থাকেন। মহেন্দ্র,

সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিযাত্র (পারিপাত্র)—এই সাতটি এর কুলপর্বত। এ ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক পর্বত।

ভারতবর্ষের যে ন'টি বিভাগের কথা বলা হয়েছে তার বর্তমান পরিচয় এবং সঠিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নন। কেউ কেউ ব্রহ্মদেশকে, আবার কেউ কেউ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে ইন্দ্রদ্বীপ বলে মনে করেন। বর্তমান মালয়েশিয়াকে কশেরুমান, তামিলনাড়ু প্রদেশের তিন্নভেলী অঞ্চলকে তাম্রবর্ণ, সিংহল দ্বীপের সমীপস্থ কোন ছোটো দ্বীপকে গভস্তিমান, ভারতের দক্ষিণে জাফ্না দ্বীপকে প্রাচীন নাগদ্বীপ, বর্তমান মালয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে অবস্থিত 'কেডা' নামের এক স্থানকে সৌম্য, সিংহলকে গান্ধর্ব (নামান্তর সিংহল) বর্তমান পশ্চিমঘাটের কাছাকাছি কোন এক অঞ্চল বা বোর্ণিওকে বারুণ দ্বীপ বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি পর্যন্ত অঞ্চলকে অনেকে কুমার বা কুমারী দ্বীপ বলে মনে করেন। এই দৃষ্টিতে দেখলে সমগ্র ভারতবর্ষই এর অন্তর্গত হয়। তাহলে পৌরাণিক ভারতবর্ষের আয়তন আরও বেড়ে যায়।

এই ভারতবর্ষের সাতটি কুলপর্বত এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো পর্বত এবং সংশ্লিষ্ট নদী বিখ্যাত। পূর্বঘাট পর্বতমালার মহানদী থেকে গোদাবরী নদ পর্যন্ত অংশই প্রাচীন মহেন্দ্র পর্বত। এই পর্বতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পর্বত—বেঙ্কটগিরি (তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্র প্রদেশের সীমায় অবস্থিত), পুষ্পগিরি (চুড়াপ্পর আট মাইল উত্তরে) ও ঋষভ (কাবেরী ও মাদুরার মধ্যে অবস্থিত)।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নীলগিরি থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত পর্বতশৃঙ্গকেই মলয় পর্বত বলা হয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পর্বত—দদুর (বর্তমান নীলগিরি)।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশ, যা উত্তরে তাপ্তী থেকে দক্ষিণে নীলগিরি পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে, তাকেই প্রাচীন সহ্য পর্বত বলে চিহ্নিত করা হয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পর্বত—গোবর্ধন (বর্তমান নাসিকে অবস্থিত), দেবগিরি (দৌলতাবাদে অবস্থিত), কৃষ্ণগিরি (বর্তমান কন্হেরি), গোমন্ত (বর্তমান কর্ণাটকের কাছাকাছি)।

শুক্তিমান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বিন্ধ্য পর্বতমালাই প্রাচীনকালে ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিযাত্র—এই তিন ভাগে প্রচলিত ছিল। নর্মদার উত্তরে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বতমালার মধ্যভাগকেই ঋক্ষ পর্বত বলা হয়। পশ্চিমে গুজরাট থেকে আরম্ভ করে পূর্বে বিহারের গয়া পর্যন্ত বিন্ধ্য পর্বতের বিস্তৃতি। বর্তমান মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালের পশ্চিমস্থ বিন্ধ্য পর্বতের অবশিষ্ট অংশ এবং আরাবল্লী পর্বতমালাই পৌরাণিক পারিযাত্র (পারিপাত্র) পর্বত।

পশ্চিম বিন্ধ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পর্বত—উর্জয়ন্ত (বর্তমান জুনাগড়ের পূর্বপ্রান্তে গির্ণার পর্বত), অর্বুদ (বর্তমান আরাবল্লী পর্বতের আবুপাহাড়), গোবর্ধন (যমুনার তীরে অবস্থিত বিখ্যাত পর্বত)।

মধ্য বিন্ধ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পর্বত—অমরকণ্টক (মধ্যপ্রদেশের খয়রাগড় থেকে রেওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত), কোলাহল (বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের পান্না ও বিজয়বার অঞ্চল), চিত্রকূট এলাহাবাদের প্রায় একশ পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্বত)।

পূর্ব বিন্ধ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পর্বত—প্রবরগিরি বা গোরথগিরি (বর্তমানে বরাবর পর্বত), মন্দার (বর্তমান ভাগলপুর থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত)। পর্বতের সঙ্গে সম্বন্ধ কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদীর কথাও স্মরণীয়।

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে যে সব প্রসিদ্ধ নদী সমুদ্ভূত হয়েছে তাদের নাম—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বিতস্তা, ঐরাবতী (ইরাবতী), গোমতী, বিপাশা, রংক্ষু এবং গণ্ডকী প্রভৃতি।

পারিযাত্র পর্বত থেকে সমুদ্গত নদীগুলির মধ্যে বেত্রবতী, চর্মণ্বতী, তাপী, শিপ্রা বিখ্যাত।

ঋক্ষ পর্বতের পাদমূল থেকে প্রবাহিত হয়েছে—শোণ, নর্মদা, মন্দাকিনী, তমসা, চিত্রকুটা প্রভৃতি নদী।

আর শিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, বৈতরিণী, করতোয়া, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণ্বা, তুঙ্গভদ্রা ও কাবেরী প্রভৃতি নদীর উৎপত্তিস্থল হল বিন্ধ্য পর্বত।

পৌরাণিক বংশাবলী

পুরাণকে পঞ্চলক্ষণাত্মক বলা হয়েছে। যে পাঁচটি বিষয় নিয়ে পুরাণ আলোচনা করে তার মধ্যে প্রাচীন বংশ এবং বংশানুচরিত অর্থাৎ রাজা, ঋষিদের কাহিনী বর্ণনা অন্যতম। পৌরাণিক বংশাবলীকে কিছু কাল আগেও গালগল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া হত, কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বংশাবলীর আলোচনা অধিকাংশই ইতিহাসানুগ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণে বাকাটকদের যে ইতিহাস এবং নামসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তা অনেক অংশেই প্রাচীন শিলালেখ, তাম্রপট্ট এবং মুদ্রা প্রভৃতির সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত। যদিও এই নামসমূহের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তবু চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে অনায়াসেই। পুরাণকারের মতে রাজা বিন্ধ্যশক্তির পুত্র প্রবীর; বাকাটকের রাজনামমালায় যে নাম পাওয়া যায়, তা হল প্রবরসেন। এই প্রবরসেনের পুত্র গৌতমীপুত্র এবং সর্বসেন—এই দুই নাম পুরাণে এবং বাকাটকদের রাজনামমালায় এক। আন্ধ্রদের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বায়ুপুরাণে পুলোমা নামে এক আন্ধ্র রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁর পুত্র শাতকর্ণি—কন্হেরির শিলালেখ দ্বারা এই তথ্য সমর্থিত হয়েছে। শিশুনাগ, নন্দ, শুঙ্গ, কণ্ব, আন্ধ্রভৃত্য, নাগবংশী প্রভৃতি যে সব রাজবংশের নাম পুরাণে পাওয়া যায়, তার প্রায় সব ক'টিই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

সূতজাতির বিশেষ কাজই ছিল দেবতা, ঋষি, রাজা ও মহান ব্যক্তিদের বংশাবলী ও কর্ম সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সংরক্ষণ করা। পৌরাণিক বংশাবলীতে যাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা 'বংশবিদ' বলে সমাজে খ্যাতিলাভ করতেন। বংশকুশল, বংশবিত্তম, বংশচিন্তক, অনুবংশপুরাণজ্ঞ প্রভৃতি নামে এঁদের চিহ্নিত করা হত। বিভিন্ন পুরাণে এ সব পদের যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখে এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, পুরাণের যুগে রাজবংশাবলী এবং ঋষিবংশাবলীর চর্চা অব্যাহত ছিল। এই বংশবিদদের চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে পরীক্ষিতের রাজ্যলাভ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস জানতে হলে পুরাণগুলোই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

অবশ্য পুরাণ থেকে যে সব তথ্য আমরা পাই, তা যে সব সময় ঠিক এবং যুক্তিসিদ্ধ—এ কথা বলা যায় না। যাঁরা মুখে মুখে সেই প্রাচীন কাহিনীগুলোকে পুরুষানুক্রমে ধরে রেখেছিলেন, তাঁদের মুখে মুখেই সে সব কাহিনী তাঁদের অজ্ঞাতসারেই পাল্টে গিয়েছে।

তাছাড়া বিভিন্ন পুরাণেই রাজাদের নাম নিয়ে বিতর্ক এবং সন্দেহের অবকাশ আছে। কি রাজবংশ কি ঋষিবংশ—সব জায়গাতেই কিছু কিছু বিভ্রান্তি যে দেখা যায় না, তা নয়। এই বিভ্রান্তি বিভিন্নভাবে এই সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই বিভ্রান্তির মূলে যে সব কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন রাজা বা ঋষির একই নাম। পূর্ব-ভারতের আনববংশীয় রাজা বলি, আবার দৈত্যকুলে জাত খ্যাতনামা রাজার নামও বলি। দৈত্যবংশীয় বলিকে বৈরোচন 'বলি' বলা হয়। কিন্তু কয়েকটি পুরাণে (বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড এবং মৎস্যপুরাণ) আনববংশীয় বলির বর্ণনা এবং বৈরোচন বলির কাহিনী মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার আংশিক অভাব পৌরাণিক ঘটনাবলী এবং বাস্তব কার্যকলাপের যে বিভাগের সীমারেখা, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা পৌরবরাজ সংবরণের পত্নী তপতীর কাহিনী স্মরণ করতে পারি; ভাগবতপুরাণের বক্তব্য অনুযায়ী তপতী সূর্য অথবা তপনের মেয়ে। পৌরবরাজ সংবরণের পুরোহিত বসিষ্ঠ তাঁর যজমানের জন্য সূর্যের কাছে এই তপতীকে প্রার্থনা করেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখলে এই সূর্যকে কোন মানুষের নাম বলেই মনে হয়। অথচ এই বাস্তব ঘটনার উপর কল্পনার রঙ চাপিয়ে তপতীকে অলৌকিক করে তোলা হয়েছে।

বৌদ্ধ এবং জৈনদের বিবরণেও এই একই ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। পুরাকালে দীর্ঘ দিন ধরে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল। দেবতারা কিছুতেই অসুরদের পরাজিত করতে পারেন নি। তখন দেবতাদেরই প্রার্থনায় বিষ্ণু মায়ামোহ সৃষ্টি করলেন। অসুরেরা সেই সময় নর্মদা নদীর তীরে অবস্থান করছিল। মায়ামোহ তাদের কাছে গিয়ে স্বধর্ম এবং বেদ পরিত্যাগ করতে এবং বেদের নিন্দা করতে অনুরোধ করল। মায়ামোহের পরামর্শে অসুরেরা স্বধর্ম পরিত্যাগ করে 'অর্হত' রূপে পরিচিত হল এবং শেষে তারা দেবতাদের কাছে যুদ্ধে হেরে গেল। এই অর্হতেরা নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ এবং জৈন। ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী বেদাশ্রিত ধর্মের সঙ্গে অবৈদিক বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক মতান্তরই কাল্পনিক দেবাসুরের বিবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। কামরূপের রাজার সঙ্গে বঙ্গবিজয়ী বখতিয়ার খিলজীর যুদ্ধে পরাজয়ের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাহিনী পদ্মপুরাণে কল্পনাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা সুদূর অতীতের ঘটনাবলীরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। সে জন্য সেখানে কশ্যপ, গরুড় প্রভৃতির উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এই এক ভাবেই পিতৃবংশের কাহিনীও ইতিহাস এবং কল্পনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে পৌরাণিক গল্পকে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। হৈহয় বংশের সঙ্গে কাশীরাজদের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা প্রসঙ্গে হর-পার্বতীকে আনা হয়েছে। দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে কখনও কখনও রাজারূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাছাড়াও কয়েকজন পৌরাণিক রাজা এবং ঋষির নাম অনেক পরবর্তী সময়ে অন্যান্য নামের সঙ্গে এক হয়ে গেছে; এতেও বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। পুরাণে দেবতাদের গুরুরূপে আমরা বৃহস্পতির নাম পাই; অনেক পরবর্তী কালে রাজা ভরতের সময়ে আঙ্গিরস ঋষির জন্ম এবং তাঁর নামও বৃহস্পতি হওয়ায় একের কাহিনীকে অন্যের বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীনকালে মধু নামে এক দৈত্যের জন্ম হয়; বিষ্ণু তাকে কৈটভ নামের অন্য এক অসুরের সঙ্গে হত্যা করেন; পরবর্তীকালে যদুবংশে মধু নামে এক বিখ্যাত রাজা জন্মগ্রহণ করেন, সেজন্যই শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম

মাধব। কিন্তু এই দুই মধুর কাহিনী পুরাণে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। বংশবিদ পৌরাণিকেরাও আনুপূর্বিক কালের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সব সময় সচেতন ছিলেন না। সেজন্য একই রাজা বা ঋষি প্রায় অসম্ভব ভিন্ন ভিন্ন কালের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন। ভার্গব চ্যবন, বসিষ্ঠ, মার্কণ্ডেয় এবং জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম—পুরাণকারদের মতেই এঁদের হাজার হাজার বছরের ব্যবধান ; তবু এঁরা সবাই ভীষ্মের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা লাভ করলেন। এ রকম আরও অনেক অসঙ্গতি আছে।

বিভিন্ন পুরাণে গুণাবলীর ভিত্তিতে রাজাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যাঁদের আনুগত্য সবাই নির্বিবাদে মেনে নিত এবং যাঁরা প্রকৃতই মহান তাঁদের 'চক্রবর্তী' বলা হত। এ রকম 'চক্রবর্তী' শ্রেণীভুক্ত রাজারা নাকি সংখ্যায় মাত্র ষোলজন ছিলেন। আরেক শ্রেণীর নাম ছিল 'সম্রাট'। বায়ুপুরাণের মতে যারা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারবেন, তাঁদেরই 'সম্রাট' বলা যাবে। পশুদাতারূপে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের আরেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যাঁরা এই সম্রাট এবং পশুদাতারূপে খ্যাতিমান, তাঁদের সবারই নাম করা হয়েছে।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের যে দুই বিখ্যাত বংশের কথা শোনা যায়, তাদের নাম সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ। পুরাতত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহ্যগত দিক থেকে এদের গুরুত্ব কিন্তু সর্বাধিক ; যদিও এদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ হয়ে যায়। মোটামুটি ভাবে সূর্যবংশকে চারভাগে ভাগ করা যায়—বিদেহ, বৈশাল, শর্যাত এবং নাভাগ। বিদেহ বংশের সূত্রপাত ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি (অথবা নেমি) থেকে। রাজা বিশালের নামানুসারেই বৈশালবংশের নামকরণ হয়েছে। শর্যাতবংশের আদিপুরুষ মনুর পুত্র শর্যাত, আর মনুর পুত্র নাভাগের নামে নাভাগবংশের খ্যাতি। চন্দ্রবংশও মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এদের মধ্যে খ্যাতিমান বংশগুলো হল—হৈহয়, যদু, দ্রুহ্যু, তুর্বসু, পুরু এবং আনব বংশ। তাছাড়া কান্যকুব্জ, কাশী, উত্তর পঞ্চাল, দক্ষিণ পঞ্চাল প্রভৃতি চন্দ্রবংশের কয়েকটি শাখাও বিখ্যাত। চন্দ্রবংশের শাখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান হল যদুবংশ। ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ এই যদুবংশেরই রাজা ছিলেন।

এই যে সব বংশের কথা আলোচিত হল এগুলো সবই প্রাক্-মহাভারত কালের। যে কালের রাজবংশের তুলনায় মহাভারতোত্তর রাজবংশের বিবরণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বেশী প্রামাণিক। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী থেকে রাজবংশের ইতিহাস জানতে হলে পুরাণের সাহায্য নিতেই হয়। শুঙ্গ, কণ্ব এবং আন্ধ্র প্রভৃতি রাজবংশের নাম পুরাণেই দেখতে পাওয়া যায়। এ সব বংশের তালিকা, কাহিনী এবং মূল্যায়ন সর্বপ্রথম ভবিষ্য-পুরাণে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, গরুড় এবং ভাগবত পুরাণে বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজবংশ-সমূহের কথাই উল্লেখযোগ্য।

এদের মধ্যে প্রথম হল বার্হদ্রথ বংশ। এই বংশের প্রধান ও প্রাচীন রাজা সহদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মারা গেলে এঁর পুত্র সোমাধি রাজা হন। তারপর যাঁরা রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি—শ্রুতশ্রবা, সুক্ষত্র, বৃহৎকর্মা, বিভু, শুচি, ক্ষেম, সুব্রত, সুনেত্র, ধর্মনেত্র, দৃঢ়সেন সত্যজিৎ, বিশ্বজিৎ এবং রিপুঞ্জয় প্রভৃতি। মৎস্যপুরাণের মতে এই বংশের মোট রাজার সংখ্যা বত্রিশ।

এর পরে আসে প্রদ্যোত বংশের কথা। পুলিক (মুনিক বা সুনিক বা শুনক) ছিলেন বার্হদ্রথ বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয়ের মন্ত্রী। তিনি তাঁর প্রভু রিপুঞ্জয়কে হত্যা করে নিজের ছেলে প্রদ্যোতকে সিংহাসনে বসান। তাঁর নাম অনুসারে এই বংশের নাম হয় প্রদ্যোত। এই বংশে পর পর পাঁচজন রাজার নাম প্রদ্যোত, পালক, বিশাখযূপ, অজক এবং নন্দিবর্ধন ; এঁরা মোট ১৩৮ বছর রাজত্ব করেন।

তারপর শিশুনাগ প্রদ্যোত বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করে নিজ বংশ (শিশুনাগ বংশ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের মোট দশজন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁদের নাম এবং রাজত্বকাল পুরাণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এভাবে সাজানো যেতে পারে—শিশুনাগ—৪০ বছর ; কাকবর্ণ—৩৬ বছর ; ক্ষেমধর্মা—২০ বছর ; ক্ষত্রৌজ—৪০ বছর ; বিম্বসার—২৮ বছর ; অজাতশত্রু—২৫ বছর ; দর্শক—(দর্ভক বা বংশক)—২৫ বছর ; উদয়ী (উদয়াশ্ব বা উদাসী অথবা অজয়)—৩৩ বছর ; নন্দিবর্ধন—৪০ বছর এবং মহানন্দী (অথবা মহানন্দি)—৪৩ বছর।

মহানন্দীর উরসে শূদ্ররমণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মায়, তার নাম মহাপদ্ম (নন্দ)। ইনি একচ্ছত্র রাজারূপে পরিচিত হন পরবর্তী কালে। তাঁর নাম অনুসারেই এই বংশের নাম হয় নন্দবংশ। এঁর আটটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে সুকল্প (সহল্য বা সুমাত্য অথবা সুমাল্য বড়) মহাপদ্মের পর তিনি বারো বছর রাজত্ব করেছিলেন। তারপর কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ এই বংশকে ধ্বংস করে মৌর্যবংশের পত্তন করেন। বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনা রয়েছে।

নন্দবংশের পরে এলো মৌর্যবংশ। কৌটিল্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ২৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তার পর বিন্দুসার, অশোক এবং কুনাল যথাক্রমে ২৫ বছর, ৩৬ বছর এবং ৮ বছর রাজ্য শাসন করেন। এরপর কারা রাজত্ব করেছিলেন সে বিষয়ে পুরাণে দু'রকম মত দেখতে পাওয়া যায়। বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুসারে কুনালের পর ক্রমান্বয়ে রাজ্য শাসন করেন বন্ধুপালিত, ইন্দ্রপালিত, দেববর্মা, শতধনু এবং বৃহদ্রথ। কিন্তু মৎস্যপুরাণের মতানুসারে কুনালের পর যাঁরা রাজা হন তাঁদের নাম যথাক্রমে—বন্ধুপালিত, দশোন, দশরথ, সম্প্রতি, শালিশূক, দেবধর্মা, শতধন্বা এবং বৃহদ্রথ , মৌর্যবংশের শেষ রাজা যে বৃহদ্রথ ছিলেন, এ বিষয়ে কিন্তু সবাই একমত। এরপর শাসনভার চলে যায় শুঙ্গদের হাতে।

মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে অপসারিত করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রায় ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পর যাঁরা রাজ্য শাসন করেন তাঁদের নাম—অগ্নিমিত্র, বসুজ্যেষ্ঠ, বসুমিত্র, অন্ধ্রক, পুলিন্দক ঘোষ, বজ্রমিত্র, ভাগবত এবং দেবভূমি। পুষ্যমিত্র যে ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন সে-কথা অনেক সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারাই সমর্থিত হয়। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে এঁর উত্তরাধিকারীদের নাম পাওয়া যায়। অবশ্য ভাগবত ছাড়া অন্য কোন রাজার কাহিনী অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় নি। বেসনগরে যে গরুড় স্তম্ভ পাওয়া গেছে তাতে ভাগভদ্র রাজার উল্লেখ আছে ; ইনিই সম্ভবত শুঙ্গবংশীয় রাজা ভাগবত। এই বংশের শেষ রাজা দেবভূমির পর রাজ্য শাসনভার চলে যায় কণ্ববংশীয়দের হাতে।

এই কণ্ববংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বসুদেব। ইনি শুঙ্গবংশের রাজা দেবভূমিকে হত্যা করে এই বংশের সূত্রপাত করেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে ও বিষ্ণুপুরাণেও এঁর নাম

দেখতে পাওয়া যায়। তবে দেবভূমির পরিবর্তে দেবভূতি নামটি সেখানে পাওয়া যায়। বসুদেবের পর ভূনিমিত্র, তাঁর পর নারায়ণ এবং তারপর সুশর্মা রাজত্ব করেন।

এর পরে হল অন্ধ্র বংশের অভ্যুদয়। সাতবাহনবংশীয়দের পুরাণে অন্ধ্র বা অন্ধ্রজাতীয় বলা হয়েছে ; সাতবাহন সম্প্রদায়ের কোন অভিলেখে কিন্তু তাঁদের অন্ধ্র বলে উল্লেখ করা হয় নি। এঁরা তিনশো থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর পর্যন্ত নাকি রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের মূল নিবাসস্থান সম্ভবত গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা প্রদেশেই ছিল। মৎস্যপুরাণের মতে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক (শিশুক, সিন্দুক, শিপ্রক) সুশর্মার ভৃত্য ছিলেন ; প্রভুকে হত্যা করে তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজারা হলেন—কৃষ্ণ, শ্রীসাতকর্ণি, সাতকর্ণি, লম্বোদর, মেঘস্বাতি, স্বাতি, স্কন্দস্বাতি, পুলোমাবি, অরিষ্ট কর্ণ, হাল, সুন্দর সাতকর্ণি, চকোর সাতকর্ণি, শিবস্বাতি, গৌতমীপুত্র, পুলোমা, শিবস্কন্ধ সাতকর্ণি, যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি, বিজয়, আপীলক প্রভৃতি। নানাঘাট অভিলেখে প্রথম তিন জন সাতবাহন রাজার নাম পাওয়া যায়। গৌতমীপুত্র, পুলোমা, যজ্ঞশ্রী এই নামগুলোও বিভিন্ন মুদ্রা এবং অভিলেখের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এই বংশের রাজা হাল সুপ্রসিদ্ধ গাথা সপ্তশতীর লেখক। শিবস্কন্ধ, যজ্ঞশ্রী, সাতকর্ণি এবং বিজয় প্রভৃতির ঐতিহাসিকত্বও মুদ্রা প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

পুরাণে রাজবংশাবলীর সংকলন মূলত সাতবাহনের রাজত্বকালেই সম্পন্ন হয়ে যায় এবং সেজন্যই অন্যান্য বংশের রাজাদের নাম অথবা তাঁদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে পুরাণকার প্রায় নীরব। পরবর্তী রাজবংশাবলীর যে বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায়, তাও অতি সংক্ষিপ্ত এবং অকিঞ্চিৎকর। এদের মধ্যে আভীর, অন্ধ্রভৃত্য বংশীয়, শক, যবন, মুরুণ্ড এবং হূণ প্রভৃতি কয়েকজনের নামই করা হয়েছে। এ ছাড়া বাকাটক, মগ, নৈষধ, কোশল, বাহ্লীক এবং নাগবংশীয়দের সম্বন্ধেও কিছু কিছু কথা পাওয়া যায়। গুপ্তবংশের প্রারম্ভিক শাসনক্ষেত্র সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে যে কথা বলা হয়েছে তা সম্ভবত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত-কেই নির্দেশ করে ; এরপর গুপ্তবংশ সম্বন্ধে আর কোন কথা পাওয়া যায় না। অবশ্য সমসাময়িক তাম্রলিপ্ত, গুহ, কলিঙ্গ, মাহিষ, মহেন্দ্র, সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, মথুরা প্রভৃতি ভূখণ্ডের রাজাদের কথা আলোচিত হয়েছে। এ থেকে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনার এক সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এভাবে রাজবংশাবলীর চর্চা করে পুরাণসমূহ প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যুগিয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পৌরাণিক দেবতা

পুরাণসমূহে দেবতাসম্পর্কিত আলোচনা এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি পুরাণই কোন না কোন দেবতার উপাসনা এবং মাহাত্ম্যের কথা বিশেষ করে বলেছে। পুরাণে অসংখ্য দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক যুগের সঙ্গে পৌরাণিক যুগের এই দেবতার বিষয়ে কী পার্থক্য, পৌরাণিক যুগে এই বিশিষ্ট দেবতার স্বরূপ কী, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এদের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা প্রয়োজন কিনা, বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যানের দ্বারা সেই দেবতার মাহাত্ম্য কতখানি স্বীকৃত ও কত দূর বিস্তৃত হয়েছে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট দেবতার মূর্তিচিন্তন ও পূজা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

পুরাণকার কিভাবে নির্ণয় করেছেন—এ সব কথা বিশদভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে ভক্ত বা পূজকদের যে নিবিড় আত্মীয়তা দেখা যায়, বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কে সে-কথা বলা যায় না। সাংসারিক দুঃখ, দৈন্য, অশান্তি, অপূর্ণতা মানুষকে প্রায়ই বিচলিত করে, সে তখন তার দুঃখ বেদনা জানানোর জন্য খুব কাছাকাছি কারো অস্তিত্ব অনুভব করে এবং তাঁরই কাছে নিজের দুঃখ বেদনার প্রতিকার প্রার্থনা করে। পৌরাণিক দেবতারাও মাঝে মাঝে আকাশে বিচরণ করেন বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কখনই মানুষের সুখ দুঃখ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। মানুষের আহ্বানে প্রায়ই তাঁরা ঊর্ধ্বলোক থেকে পৃথিবীতে এসে মানুষের দুঃখ-বেদনা হরণ করতেন। অপরপক্ষে বৈদিক দেবতারা কিন্তু মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন নি; তাঁরা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, উদাসীন এবং নির্বিশেষ।

পুরাণে যে অসংখ্য দেবতাদের আবির্ভাব দেখি তার মধ্যে ভগবানের মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি দশটি অবতার অন্যতম। কুবের, কাম, কার্তিকেয়, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতার আরাধনা পুরাণেই সর্বপ্রথম দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা কিন্তু কেউই বৈদিক দেবতা নন। পুরাণে ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, কাশ্যপ, বসিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পর্বত, বালখিল্য, প্রভাস, বৈশ্বানর প্রভৃতি ঋষি-মহর্ষিরাও মহীদেব অর্থাৎ পৃথিবীতে দেবতা-স্থানীয় বলে উল্লিখিত হয়েছেন। হনুমান, গরুড় প্রভৃতি পশু পাখি; মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী, এমন কি ঢেঁকি প্রভৃতি অচেতন প্রাণীও পুরাণে দেবত্বে কল্পিত হয়েছে। তাই পুরাণে দেব-দেবীর সংখ্যার কোন শেষ নেই। তাহলেও বলা যায়, পুরাণে প্রধানত তিন দেবতার আরাধনার কথাই বলা হয়েছে। পুরাণে বিশেষভাবে ত্রিমূর্তিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—প্রধানত এই তিন দেবতাই পুরাণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

প্রথমেই আসে ব্রহ্মার কথা। ত্রিমূর্তির অন্যতম, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ। এই বৈদিক প্রজাপতি এবং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে পুরাণে কিন্তু অন্যভাবে পাওয়া যায়। এখানে তিনি লোকপিতামহ অবিনাশী, অব্যয়, অক্ষয়। তিনি নিত্য, অজ ও অমর। এখানে তিনি শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন, তিনি স্রষ্টা, পালয়িতা ও নাশক। স্রষ্টারূপে ব্রহ্মা স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত বিশ্বকে সৃষ্টি করেন; প্রত্যেক সৃষ্ট প্রাণীকে তিনি উপযুক্ত কর্মে নিয়োগও করেন। রামায়ণ এবং মহাভারতে তাঁকে লোককর্তা, লোকধাতা, জগৎস্রষ্টা, লোকপতি ও জগৎপতি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পালয়িতারূপে তিনি সৃষ্টির প্রথমে তাঁর পুত্র দেবতাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন—বিশেষত ইন্দ্রকে তিনি 'দেবরাজ' পদে অভিষিক্ত করেন। পরে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সঙ্গে তাঁর অখিল বিশ্বপালকরূপ উপাধি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সাধারণত ব্রহ্মলোকে তিনি বাস করলেও প্রায়ই প্রয়াগ, মহেন্দ্র, হিমবৎ, পুষ্কর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করে থাকেন। প্রতি মাসে একদিন করে তিনি নাকি পৃথিবীর স্বর্গ কুরুক্ষেত্রে আসেন। পৃথিবীর অন্নাভাব তিনি দূর করেন, নর-নারীকে তিনি সম্মিলিত করেন; আবার প্রাণীর সংহারও তিনি করে থাকেন।

পুরাণে ব্রহ্মার আকৃতির কথাও পাওয়া যায়। তিনি চতুর্মুখ, চতুরানন, চতুর্বক্ত্র। হাতে তাঁর কমণ্ডলু থাকে। বড় বিচিত্র তাঁর প্রকৃতি। তিনি সোমকে লতাদের প্রভু, ধ্রুবকে গ্রহ প্রভৃতির রাজা রূপে নিযুক্ত করেছিলেন এবং এদের নিম্নস্থ অগ্নির হাত থেকে রক্ষা করেন। বিষ্ণু এবং ইন্দ্র তাঁকে দেবতাদের প্রভুরূপে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন

করেন। স্বয়ং শিবও তাঁর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা মোট নয় প্রকার দার্শনিক সৃষ্টিরই মূলীভূত কারণ। বিশ্বকর্মা ও ত্বষ্টা তাঁরই কৃপাধন্য। ব্রহ্মার নিয়োগ অনুসারে এ'রা দ্বিতীয় বা গৌণ সৃষ্টিকর্তারূপে পরিচিতি লাভ করেছেন। পিতামহ ব্রহ্মার ইচ্ছানুসারেই এ'রা সোমের রথ, ইন্দ্রের ধনু, শিবের অলংকার, লংকানগরী, বিষ্ণুর শাঙ্গধনু প্রভৃতি অসংখ্য মূল্যবান এবং বিস্ময়কর বস্তুর সৃষ্টি করেছেন।

ব্রহ্মার মাহাত্ম্য প্রভৃতি সম্পর্কে পুরাণে অনেক আখ্যায়িকা দেখতে পাওয়া যায়। রসোত্তীর্ণ এবং মনোরঞ্জক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যানগুলো ব্রহ্মার অজরত্ব, অমরত্ব, ও নিত্যত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে সহজ, সরল ধারণা দেয় সাধারণ মানুষকে। ত্রিমূর্তির এই প্রথম মূর্তি কিন্তু ক্রমেই তাঁর গুরুত্ব হারালেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী কালে পঞ্চদেবতার কল্পনাতেও ব্রহ্মার কোন স্থান নেই। ভারতবর্ষের পুষ্করেই এখনও পর্যন্ত ব্রহ্মার নিত্য পুজো হয়ে থাকে। আর কোথাও তাঁর নিত্য পুজার প্রসিদ্ধি নেই।

ত্রিদেবের পরিকল্পনায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পরেই পালনকর্তা বিষ্ণুর স্থান। বিষ্ণু নিঃসন্দেহে বৈদিক দেবতা; নামোল্লেখের গুরুত্ব অনুযায়ী বেদে তাঁর স্থান অবশ্য চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে। বেদে মোট পাঁচটি সূক্তে বিষ্ণুর স্তুতি করা হয়েছে এবং মোট একশো-বার তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ত্রিভুবনের পালকত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী স্তরে তাঁকে যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম করে দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠতম এবং বরেণ্যতম দেবতা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, কারণ 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।' বৈদিক বিষ্ণুও সাধারণ মানুষের আপনজন নন।

পৌরাণিক বিষ্ণু কিন্তু মানুষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, আত্মার আত্মীয় তিনি। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে তাঁর জন্ম, ভাইদের মধ্যে তিনি ছোট। ইন্দ্রের সঙ্গে তার সংযোগ-টুকু কেবল অবশিষ্ট আছে; কারণ, পুরাণে ও রামায়ণ মহাভারতে তিনি বাসবানুজ। সেজন্যই ইন্দ্রকে মহেন্দ্র এবং বিষ্ণুকে উপেন্দ্র বলা হয়েছে। বৈদিক বিষ্ণুর কোন আকার নেই, তিনি অনির্দেশ্যবপু। পুরাণে দেখতে পাই তাঁর রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি চতুর্বাহু, চতুর্মূর্তি, চতুর্বেদবিদ এবং চতুর্জ্যোতি। আবার কখনও তিনি অষ্টবাহু, দশবাহু বা বহুবাহু রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। কখনও তিনি একপাদ, আবার কখনও তাঁর পায়ের সংখ্যা তিন। অনেক শৃঙ্গযুক্তরূপেও তাঁর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বহুমস্তক বিশিষ্ট, সহস্রচক্ষুসম্পন্ন, সপ্তজিহ্বা বা শতজিহ্বাসম্পন্ন। পবিত্রতা-বাচক তিন সংখ্যাটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ রয়েছে। তিনি ত্রিপদ, ত্রিধামযুক্ত এবং ত্রিযুগ। তিনি রক্তনেত্র, পদ্মপলাশনয়ন, তাঁর গায়ের রঙ কখনও সাদা, কখনও কালো, কখনও পীতাভ, কখনো বা রক্তিম। বিষ্ণুর মাহাত্ম্যকে বড় করে দেখানোর জন্য পুরাণকার তাঁকে বহুজনবিশিষ্ট, বহু মুখসম্পন্ন, বহু উদরযুক্ত এবং সর্বভুক রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আকৃতি নয়নাভিরাম। সৌম্যকান্তিবিশিষ্ট এই বিষ্ণুর পরিধানে থাকে কৌস্তুভমণি, দিব্য মণি, সমুদ্রজাত মণি এবং কিরীট। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র পীত কৌশেয়। পৃথিবীরূপ নাগকুণ্ডলীর ওপরে উপবিষ্ট বিষ্ণুকে নাগভোগ বলা হয়েছে। বিষ্ণুর গলায় বনফুলের মালা, তাই তিনি বনমালী। তাঁর কানে মণিমুক্তো খচিত অলংকার, বাহুতে রুচিরাঙ্গদ বা চন্দনাঙ্গদ বা কনকাঙ্গদ, বক্ষে শ্রীবৎস। চারটি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং ধনুক তিনি ধারণ করেন; কখনও বা নন্দক অসি ধারণ করেন।

বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য তাঁকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখানোর

চেষ্টা পুরাণে বারংবার করা হয়েছে। স্বয়ম্ভু, কাল, প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা, সূর্য, অগ্নি, বসু, বরুণ, শিব, বায়ু যম, দক্ষ, ইন্দ্র, সোম প্রভৃতিদের সঙ্গে তাঁকে অভিন্নরূপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর নাভি থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছেন, ললাটপ্রান্ত থেকে শিব, দক্ষিণপাশ্ব থেকে রুদ্র, বামপাশ্ব থেকে আদিত্য সৃষ্ট হয়েছেন। তা ছাড়াও বসু এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর কাছ থেকেই উৎপন্ন হয়েছেন।

পুরাণে বিষ্ণুর পত্নীরূপে লক্ষ্মী বা শ্রী'র নাম করা হয়েছে। কখনও এঁদের অভিন্নত্বের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে আবার কখনও বা এঁদের স্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হয়েছে। পুরাণে বিষ্ণুপত্নী শ্বেতবসনপরিহিতা, সমুদ্র থেকে উত্থিতা। দেবতা এবং অসুরেরা তাঁর বন্দনাগানে মুখর। তিনি ভক্তজনকে শ্রী, সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য প্রদান করেন।

বিষ্ণুর মহিমা অনন্ত ; বলে শেষ করা যায় না। তাঁর চরণস্পর্শে অনেক স্থান পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। উত্তরে এক বিষ্ণুপদক্ষেত্র প্রসিদ্ধ। কুরুক্ষেত্রকে বারাহতীর্থ বলা হয় ; বিষ্ণু এখানে বরাহরূপ ধারণ করে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। শালগ্রাম বিষ্ণুর পূজা বহুপ্রচলিত। পাঞ্জাবে অথবা কাশ্মীরেও যে বিষ্ণুর চরণস্পর্শে পূত স্থান রয়েছে, পুরাণকার তা স্বীকার করে নিয়েছেন। পুরাণকার বিষ্ণুর আর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। পুরাণের মতে বিষ্ণু জাতি ও বর্ণের রক্ষক। সেজন্য তিনি দাতার জাতি ও বর্ণ বিচার করে তার প্রদত্ত দান গ্রহণ করেন। এ ভাবে বিষ্ণুর অনন্ত বৈশিষ্ট্য এবং সর্বাতিশায়ী মাহাত্ম্যের কথা পুরাাণ বারংবার বলা হয়েছে।

ত্রিমূর্তির শেষ মূর্তি শিব প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবশালী দেবতা। ত্রিমূর্তি ধারণায় তাঁর মূল কাজ প্রলয় বা সংহার হলেও সৃষ্টি ও স্থিতির সঙ্গে তিনি একেবারে সম্পর্কহীন নন। ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি সম্পূর্ণ সূক্তে 'রুদ্র' এই নামে তাঁর স্তুতি পাওয়া যায়। মোট পঁচাত্তরবার তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে তাঁর ভয়ানক রূপটিই প্রকাশিত। বেদের এই উগ্ররূপী রুদ্রই পৌরাণিক যুগের মঙ্গলময় শিব রূপে পরিণত হয়েছেন। বৈদিক প্রলয়ংকর পুরাণে শুভংকর। বেদের রুদ্রই যে শিব এ কথা পুরাণে স্পষ্টই বলা হয়েছে। পৌরাণিক শিবের সঙ্গে অনেক মাহাত্ম্যপূর্ণ কর্মের যোগ রয়েছে। ব্রহ্মার অনুরোধে তিনি সমুদ্রমন্থনজাত হলাহল পান করে 'নীলকণ্ঠ' নামে বিখ্যাত হন। অন্ধক নামের দুর্দান্ত এক অসুরকে হত্যা করে 'অন্ধকান্তক' এই উপাধি লাভ করেন। তিনি কামদেব মদনকে ভস্মীভূত করেছেন, দক্ষের যজ্ঞ বিধ্বস্ত করেছেন। ভগীরথের আহ্বানে সুরনদী গঙ্গা যখন ভূতলে অবতীর্ণ হতে সম্মত হন, তখন তাঁর প্রবল বারিধারা শিবই মস্তকে ধারণ করেন। দক্ষ যজ্ঞে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি বলে দক্ষকে তিনি ক্রোধ ভরে বাণবিদ্ধ করেন। তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে যজ্ঞ-মৃগের রূপ ধরে পালায়। সেই যজ্ঞে সমাগত যে সব দেবতা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নি, তাঁদের তিনি সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর ক্রোধ থেকেই নাকি 'জ্বর' এর উৎপত্তি।

শিবের আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে পুরাণে বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি চতুরানন, শতজিহ্বাযুক্ত এবং সহস্রচরণবিশিষ্ট। তাঁর তৃতীয় নয়নটি সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। তিনি অষ্টমূর্তিবিশিষ্ট, একাদশতনুযুক্ত, কখনো বা ত্রিতনু, কখনো বা চতুস্তনুবিশিষ্ট। তিনিই 'অষ্টধাতু, সপ্তসাগর, সপ্তর্ষি, সমস্ত কাল। মোক্ষের উপায়ও তিনিই। তিনি মহাযোগী ও পরম জ্ঞানী। আর্ত মানবের দুঃখ তিনি দূর করেন ; জীবসমাজের তিনিই পালক। কখনো তিনি মালা পরেন গলায়, কখনো বা মেরুপর্বতের

গুহাকন্দরে উমার সঙ্গে তিনি লীলাবিলাসে মত্ত থাকেন। কেবলমাত্র সিদ্ধগণ ছাড়া আর কেউই তাঁর গতিবিধি সে সময় জানতে পারে না। কোথাও কোথাও তাঁকে অষ্টমূর্তি-বিশিষ্ট বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। সুকুমার কলা এবং ধ্রুপদী শিল্পের সঙ্গেও তাঁর যোগ নিবিড়। তিনি বহু গ্রন্থ ও সূত্রের রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ব্যাকরণ ও বেদাঙ্গ তাঁরই সৃষ্টি বলে পুরাণে উল্লিখিত। দেবর্ষি নারদকে তিনি তাঁর গায়কপদে অলংকৃত করেছিলেন। নৃত্য ও সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ পুরাণে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে; তিনিই 'নটরাজ', 'নটনাথ' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত। শিবের তাণ্ডবনৃত্য জনসমাজে বিশেষ পরিচিত।

উল্লেখ যে, পুরাণকার শিবের মহাযোগী, মহাতপস্বী চরিত্রটিকে প্রকাশিত করতে বিশেষ সচেষ্ট হয়েছেন। বামনপুরাণে এবং অন্যান্য পুরাণেও এ সম্পর্কে আখ্যায়িকা দেখা যায়। সেই সব আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে শিবের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর রূপটিই চিত্রিত হয়েছে। সেজন্য বর্তমানে বহু শৈবই তাঁদের আরাধ্য দেবতার অনুসরণে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে কঠোর তপস্যায় আত্মনিমগ্ন থাকেন।

শিবের অন্য এক মূর্তি অর্ধনারীশ্বরও পুরাণে বিখ্যাত। ভাগবতপুরাণের আখ্যায়িকা অনুসারে এক ভক্তের দৈন্যদশা দেখে শিব নিজের শরীরের অর্ধভাগে পার্বতীর রূপ ধারণ করেন, অন্য ভাগে তাঁর নিজস্ব রূপটিই বর্তমান থাকল। জটাজুটধারী, ছাই-মাখা দেহে শিব তাঁর অনুচর ভূতপ্রেতপিশাচদের সঙ্গে হাতে ত্রিশূল নিয়ে তাঁর ভক্তের কাছে উপস্থিত হয়ে ভক্তের শত্রুকে হত্যা করলেন। সেই থেকে তিনি অর্ধনারীশ্বর নামেও পরিচিত হন।

পুরাণে শিব বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়েছেন—অঘোর, ভৈরব, চন্দ্রশেখর, গঙ্গাধর, গিরীশ, ঈশান, ধূর্জটী, মৃত্যুঞ্জয়, মহাকাল, পশুপতি, শঙ্কর, হর, বিরূপাক্ষ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি। শিব-ভাবনা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিবকে সাধারণ মানুষরূপে কল্পনা করে পরবর্তী সাহিত্যে বিশেষত বাংলা সাহিত্যে শিবায়ন প্রভৃতি অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে শিবলিঙ্গের পূজা হয় না। এ থেকেই শিবের মাহাত্ম্য এবং আমাদের অধুনাতন ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা সহজেই বোঝা যায়।

ব্রহ্মপুরাণ

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মপুরাণই সকল পুরাণের মধ্যে প্রথম। ব্রহ্মার প্রাধান্য কীর্তিত হওয়ায় একে রাজসপুরাণের অন্তর্গত করা হয়েছে। এতে মোট ২৪৫টি অধ্যায় আছে। বিভিন্ন পুরাণের গণনা অনুসারে এর শ্লোকসংখ্যা তেরো হাজার বলে বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে ব্রহ্মপুরাণ পাওয়া যায় তার মোট শ্লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭৮৩।

ব্রহ্মপুরাণ আকারে বৃহৎ হলেও এবং আঠারোটি মহাপুরাণের মধ্যে একে প্রাথম্যের আসনে বসালেও এর খুব কম অংশই প্রাচীনত্বের এবং মৌলিকতার দাবী করতে পারে। এতে উড়িষ্যার অনেক তীর্থস্থানের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই তীর্থস্থানসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে শিব ও বিষ্ণুর আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উড়িষ্যায় শৈবধর্ম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে প্রবেশলাভ করে নি এবং বৈষ্ণবধর্মও তার বহু পরে প্রবেশ করেছে। সুতরাং এই পুরাণের যে অংশে শিব ও বিষ্ণুর আলোচনা স্থান পেয়েছে তা ঐ সময়ের অনেক পরে রচিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্মপুরাণে কোণারকের

সূর্যমন্দিরের উল্লেখ দেখা যায় ; ঐ সূর্যমন্দির ১২৪১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীরও পরের রচনা এতে স্থান পেয়েছে।

মহাভারত, হরিবংশ, বায়ুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব এই পুরাণের উপর পড়েছে। পণ্ডিতগণ অনেক পর্যালোচনা করে ঠিক করেছেন যে, ব্রহ্মপুরাণই এই সব পুরাণের অংশবিশেষ অবিকল আত্মসাৎ করেছে। পরবর্তী কালের অনেক স্মার্ত পণ্ডিত তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে ব্রহ্মপুরাণ থেকে যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বর্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণের সঙ্গে তার বেশির ভাগ অংশই মেলে না। এ থেকে মনে হয় যে, বর্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণটি আসল পুরাণ নয় ; এটি পরবর্তী-কালের রচনা এবং এতে প্রক্ষিপ্ত অংশই বেশী। মূল পুরাণটি যে কোন কারণেই হোক লুপ্ত হয়ে গেছে।

ব্রহ্মপুরাণের রচনা স্থান কি—সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে মনে হয় এর কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন স্থানে রচিত হয়েছিল। এই পুরাণের মতে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে দণ্ডকারণ্য প্রধান। এই দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়ে গোদাবরী নদী প্রবাহিত এবং এই নদীই নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মপুরাণের ৬৯ অধ্যায় থেকে ১৭৫ অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১০৬টি অধ্যায় জুড়ে এই নদীতীরে অবস্থিত সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ আছে। এই পুরাণকারের দণ্ডকারণ্যের বা গোদাবরী তটপ্রান্ত ভূখণ্ডের উপর বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করে বলা যায় যে, এই অধ্যায়গুলোর রচনা-স্থান গোদাবরী প্রদেশ। আবার প্রথম থেকে ঊনসত্তর অধ্যায় পর্যন্ত উড়িষ্যায় রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় ; কারণ, এই অধ্যায়গুলোয় পুরুষোত্তম ক্ষেত্র (বর্তমান পুরী), কোণাদিত্য (বর্তমান কোণারক), একাম্রক্ষেত্র (বর্তমান ভুবনেশ্বর) প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং গুণ্ডিবাযাত্রার কথাও বলা হয়েছে।

এর কালনির্ণয় প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এটি খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্বে কিছুতেই বিরচিত বা সংকলিত হয় নি। ব্রহ্মপুরাণে প্রারম্ভিক শ্লোকের পর সৃষ্টিতত্ত্ব, সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশে জাত রাজাদের কাহিনী সংক্ষেপে বিরচিত হয়েছে। তারপর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নানা তীর্থ, ভূগোল বর্ণনা প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে। দশটি অধ্যায় জুড়ে শিব ও পার্বতীর উপাখ্যান পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে রয়েছে 'গৌতমী মাহাত্ম্য'। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের তথা যদুবংশের বিস্তৃত বিবরণ বত্রিশটি অধ্যায় জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর কয়েকটি অধ্যায়ে নরকের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। কিছু অধ্যায়ে কর্মবিপাকের কথা, শ্রাদ্ধের কথা, ভবিষ্যৎ যুগের কথা, এবং সাংখ্য ও যোগদর্শনের কথা আলোচিত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, সাংখ্যদশ নের ব্যাখ্যা এখানে মহর্ষি বসিষ্ঠ করেছেন। সাধারণত সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বকে স্বীকার করা হয় ; কিন্তু এখানে সেই তত্ত্বের সংখ্যা ছাব্বিশ। পৌরাণিক সাংখ্য নিরীশ্বরবাদ প্রচার করে না ; বরং জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিকে সমন্বিত করার প্রয়াস এখানে দেখা যায়। এই পুরাণের শেষে পুরাণ-মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

এই পুরাণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ধর্মশাস্ত্রের উপযোগী অনেক তত্ত্বকথা এখানে আলোচিত হয়েছে। শ্রাদ্ধবিধান, অন্নদানের মহিমা, অশৌচবিচার, বর্ণ ধর্ম প্রতিষ্ঠা, সদাচার নিরূপণ, ধর্ম নিরূপণ, সংকর জাতিনির্ণয় প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। দু-একটি আখ্যায়িকার অভিনবত্ব এবং আধুনিকতাও লক্ষ্য করবার মতো। এ ছাড়া এই

পুরাণের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য সূক্তিরত্ন। তার কয়েকটি উল্লেখ করছি ঃ–

(১) "প্রবর্ততে বিনা হেতুং ন কোঽপি ক্বাপি জাতুচিৎ"–১১৬।৭
–কারণ ছাড়া কেউ কোনো কাজে প্রবৃত্ত হয় না।

(২) "সাপত্নং যোহনুমন্যেত তস্য জীবো নিরর্থকঃ"–৯৭।৭
–শত্রুর বা অপরের আনুগত্যকে যে মেনে নেয়, তার জীবনের কোনো অর্থই নেই।

(৩) "জীবন্তোঽপি মৃতাঃ সর্বে সুবর্ণেন বিনা নরাঃ।
নির্গুণোঽপি ধনী মান্যঃ সগুণোহপ্যধনো ন হি॥" ১২৮।৫৬
–যার সোনা দানা নেই, নেই ধনরত্ন, সে বেঁচে থেকেও মৃত। গুণহীন ধনীকে সবাই মান্য করে, কিন্তু গুণবান দরিদ্রকে কেউ সম্মান জানায় না।

(৪) "ক্ষণবিধ্বংসিনি সুখে কা নামাস্থা মহাত্মনাম্ ?" ১৩৮।১২
–যে সুখ ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্তেই বিনষ্ট হয়, মহান ব্যক্তিরা তাতে কোন রকম আস্থা স্থাপন করেন না।

(৫) "আনন্দয়ন্তি প্রমদাস্তাপয়ন্তি চ মানবম্ "–১২২।২৩
–নারীদের বৈশিষ্ট্যই এই যে তারা মানুষকে আনন্দ দেয় আবার দুঃখও দেয়।

(৬) "পরার্তিশমনাদন্যচ্ছ্রেয়ো ন ভুবনত্রয়ে"–১৭০।৭৩
–অপরের দুঃখ-বেদনা দূর করতে পারার মতো শ্রেষ্ঠ কাজ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

(৭) "সর্বমক্লসমায়াতং ন সুখায় মনীষিনাম্"–১৪৮।৩০
–যা স্বাভাবিক উপায়ে আসে না, যার জন্য কোন রকম চেষ্টা করতে হয় না, সে রকম বস্তু মানুষকে কখনই সুখ দিতে পারে না।

(৮) "বিড়ম্বয়তি কং বা ন কামো বাপি স্বভাবতঃ"–১৪১।১৫
–কামবেগ কাকে না পীড়িত করে ?

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

অধ্যায় ঃ এক

নারায়ণ, নরোত্তম নর এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে জয় উচ্চারণ করবে।

নৈমিষারণ্যের মহর্ষিরা একবার বারো বছর ব্যাপী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই নৈমিষারণ্য ছিল যজ্ঞানুষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল; কারণ এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই মনোরম। প্রশান্ত এই বনভূমিতে নানান্ রকমের ফুলের গাছ ছিল, ছিল হরেক রকমের ফলের গাছও। পর্যাপ্ত শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল এই পবিত্র অরণ্য। এখানে তাই পশু, পাখি থেকে শুরু করে ব্রহ্মচারী, তপস্বী প্রভৃতিদের বাস; বাস বিভিন্ন জাতের মানুষেরও। নানা দিক, দেশ থেকে অসংখ্য মুনি ঋষি সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। এঁদেরই সঙ্গে সূত (গল্পকথক) লোমহর্ষণও সেখানে এসে উপস্থিত হন। মুনিরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালে তিনিও মুনিদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। মুনিরা লোমহর্ষণের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে করতে একসময় তাঁকে জিগ্যেস করলেন—দেখুন, বেদ, আগম, ইতিহাস, পুরাণ—প্রত্যেকটি শাস্ত্রেই আপনার অসীম জ্ঞান। আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। দেব-দানব-যক্ষ-গন্ধর্ব সমন্বিত এই নিখিল জগতের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল, তা জানতে আমাদের খুব ইচ্ছে করছে। তাছাড়া কে এই বিশাল বিশ্বের পরিচালক, কে-ই বা ভবিষ্যতে এর প্রলয়ের কর্তা হয়ে উঠবে, এ সব জানার আগ্রহে আমরা অধীর হয়ে উঠেছি। দয়া করে সমস্ত কথা বিস্তৃতভাবে বলুন।

মুনিদের সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রথমে লোমহর্ষণ অখিল জগতের সৃষ্টিসংহার কর্তা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে এবং পরে বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী পরাশর পুত্র নিজ গুরু ব্যাসদেবকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বেদসম্মিত পুরাণকথা বলতে আরম্ভ রলেন—পুরাকালে দক্ষ প্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠদের প্রশ্নের উত্তরে পদ্মযোনি ব্রহ্মা যা বলেছিলেন, আমি সেই পাপনাশিনী পবিত্র কথাই আপনাদের শোনাব। এই বেদ-বিখ্যাত এবং অনেক অর্থযুক্ত কথা সমাহিত চিত্তে শুনলে উত্তমলোকে গতি হয়। যা অব্যক্ত কারণ, যা নিত্য, যাঁকে প্রধান পুরুষ রূপে অভিহিত করা হয়, সেই অসীম তেজস্বী ব্রহ্মাই এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা। মহান পুরুষ থেকে অহংকারের উদ্ভব, সেই অহংকার থেকেই আবার প্রাণীসমূহের উৎপত্তি—এভাবেই সনাতন সৃষ্টিপ্রবাহ চলেছে বয়ে। আমি আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে সেই প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব এবং কীর্তিমান পুরুষদের পুণ্য চরিতকথা আপনাদের আজ শোনাব।

তারপর ভগবান স্বয়ম্ভূ প্রজা সৃষ্টির মানসে সবার আগে জলের সৃষ্টি করলেন, এবং সেই জলে তিনি বীর্য নিক্ষেপ করলেন। জলকেই 'নারা' নামে অভিহিত করা হয়; সেই জলই পুরাকালে তাঁর অয়ন অর্থাৎ শয্যা হয়েছিল বলে তিনি নারায়ণ নামে খ্যাত হন। যাই হোক, সেই জলে যে রেতঃ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা ক্রমে হিরণ্যবর্ণ অণ্ডের আকারে পরিণত হয়। সেই হিরণ্যবর্ণ অণ্ডেই ব্রহ্মার জন্ম হয়। আমরা শুনেছি, সেই ব্রহ্মাই বয়ম্ভূ নামে অভিহিত হন। ব্রহ্মা সেই হিরণ্যগর্ভ অণ্ডে প্রায় এক বছর থাকার পর তাকে 'ভাগে বিভক্ত করেন। এ থেকেই স্বর্গ এবং পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই দুই লোকেই অর্থাৎ স্বর্গলোকে এবং পৃথিবীতে তিনি আকাশ সৃষ্টি করলেন; ক্রমে দশদিক, কাল,

মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ এবং রতি প্রভৃতির সৃষ্টি হল। তারপর তিনি মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ—এই ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। এঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে পরিচিত। এঁরা নারায়ণের অংশে জন্মগ্রহণ করেন ; তাই পুরাণে এঁদের বিশেষ প্রসিদ্ধি রয়েছে। এরপর ব্রহ্মা রুদ্র এবং সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেন। ক্রমে বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, ইন্দ্রধনু, যজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য ঋক্, যজু এবং সামবেদ, এবং অন্যান্য দেবতাদের সৃষ্টি হল। এত সব সৃষ্টি করার পরও প্রজাপতি আপব যখন দেখলেন যে, তাঁর সৃষ্ট প্রজাসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যাপ্তভাবে হচ্ছে না, তখন তিনি নিজের দেহকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। সেই দেহের এক অংশ থেকে পুরুষ এবং অন্য অংশ থেকে নারীর উৎপত্তি হল। সেই নারীর দ্বারাই ব্রহ্মা প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি করে চললেন। বিষ্ণু বিরাট পুরুষকে সৃষ্টি করেন, সেই বিরাট পুরুষ থেকে যাঁর জন্ম তিনি 'মনু' নামে প্রসিদ্ধ। এই মনুর অধিকৃত কালকে মন্বন্তর বলা হয়। এখন যে মন্বন্তর চলছে, তা দ্বিতীয় মানস মন্বন্তর নামে পরিচিত। এরপর সেই বিরাট পুরুষ থেকে জাত মনু প্রজাসৃষ্টির ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত করলেন। যারা এই আদি সৃষ্টির কথা জানে তারা দীর্ঘায়ু, কীর্তিমান এবং প্রজাবান হয়ে থাকে ; শুধু তাই নয়, পরিণামে তারা অভিলষিত ফল লাভ করতে পারে।

—ব্রহ্মপুরাণে 'আদিসর্গবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুই

সৃষ্টিবর্ণনাপ্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—শতরূপা নামে এক অযোনিসম্ভবা নারী দীর্ঘ দিনের কঠোর তপস্যার ফলে মনুকে পতিরূপে লাভ করেন ; এই মনুই স্বায়ম্ভুব নামে পরিচিত। তিনি যে একাত্তর যুগ পরিমিত কাল অধিকার করে থাকেন, তাকেই মন্বন্তর বলা হয়ে থাকে। শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর তিনটি পুত্র জন্মায় ; তাদের নাম—বীর, প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। প্রজাপতি আপব ছাড়াও ব্রহ্মা আরো কয়েকজন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের মধ্যে কর্দম প্রজাপতি নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন। মনুর বড় ছেলে বীরের সঙ্গে তিনি তাঁর মেয়ে কাম্যার বিয়ে দেন। বীরের চারটি ছেলে জন্মায়—সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু। আরেক প্রজাপতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ধর্মের কন্যা সুনৃতার সঙ্গে উত্তানপাদের বিয়ে হয়। সুনৃতার গর্ভে উত্তানপাদের ধ্রুব, কীর্তিমান, আয়ুষ্মান এবং বসু নামে চারটি ছেলে জন্মায়। পবিত্রচিত্ত এবং বিখ্যাত এই ধ্রুব দিব্য তিন হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সপ্তর্ষিদের অগ্রভাগে সম্মানজনক এবং অচল এক স্থান দান করেন। ধ্রুবের এই সম্মান, সমৃদ্ধি এবং মহিমায় দেবতা এবং অসুরদের আচার্য উশনা পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ধ্রুবের তিনটি ছেলে জন্মায় ; তাদের নাম—শিলষ্টি, ভব্য এবং শম্ভু। শিলষ্টির স্ত্রীর নাম সুচ্ছায়া ; এদের যে পাঁচজন ছেলে জন্মায় তাদের নাম—রিপু, রিপুঞ্জয়, বীর, বৃকল এবং বৃকতেজা। রিপুর স্ত্রীর নাম বৃহতী ; বৃহতীর গর্ভে চক্ষুষের জন্ম হয়। চক্ষুষ প্রজাপতি বীরণের মেয়ে পুষ্করিণীকে বিয়ে করেন ; এদের পুত্রের নাম চাক্ষুষ মনু। এই চাক্ষুষ মনু বৈরাজ প্রজাপতির মেয়ে নড়্বলাকে বিয়ে করেন। নড়্বলার গর্ভে চাক্ষুষ মনুর দশটি পুত্র

জন্মায় ; তাদের নাম—কুৎস, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক, কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন এবং অভিমন্যু। এদের মধ্যে পুরুর স্ত্রী আগ্নেয়ী ছ'টি মহাবলশালী পুত্রের জন্ম দেয় ; তাদের নাম—অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, আঙ্গিরস এবং গয়। অঙ্গের স্ত্রীর নাম সুনীথা ; সুনীথার একমাত্র পুত্র বেণ।

বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। মহর্ষিরা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ডান হাত মন্থন করেছিলেন। সেই মথিত হাত থেকে প্রজাকল্যাণের জন্য একটি পুত্রের জন্ম হয়। রাজা বেণের সেই পুত্র পৃথু নামে অভিহিত হন। এই দীপ্ততেজা রাজা ধনুক এবং কবচ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে প্রজানুরঞ্জনের জন্য ঋষিদের ইচ্ছাতেই তাঁর জন্ম হয়। পৃথিবীতে তিনিই প্রথম রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁর রাজত্বকালেই সূত ও মাগধ জাতির উৎপত্তি হয়। প্রজাদের বৃত্তিবিধানের জন্য ঋষি ও দেবতাদের সঙ্গে তিনিই গোরূপী এই পৃথিবীকে দোহন করে শস্যরাশি উৎপাদন করেন। তারপর পিতৃগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, সর্পগণ, মনুষ্যগণ এবং পর্বতসমূহ ক্রমান্বয়ে নিজ নিজ পাত্রে এই পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন। তার ফলে পৃথিবী পর্যাপ্ত ক্ষীর প্রদান করে ; তাতে প্রজাদের প্রাণ ধারণ সম্ভব হয়। পৃথুর দুটি ছেলে জন্মায়—অন্তর্দ্ধি ও পাতী। অন্তর্দ্ধির স্ত্রী শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধান নামে এক পুত্রের জন্ম দেয়। হবির্ধান অগ্নিকন্যা ধিষণার পাণিগ্রহণ করেন। ধিষণার গর্ভে হবির্দ্ধানের প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্ল, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ এবং অজিন নামে ছ'টি ছেলে জন্মায়। এদের মধ্যে প্রাচীনবর্হি একজন প্রধান প্রজাপতি ছিলেন। যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীনাগ্র কুশ বিস্তৃত করার জন্য তাঁর এই নাম হয়। এই প্রাচীনবর্হি এতই সুশাসক ছিলেন যে তাঁর রাজত্ব-কালে প্রজারা সুখে সমৃদ্ধিতে কাল যাপন করত। সমুদ্রকন্যা সবর্ণার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সবর্ণার গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশটি পুত্র জন্মায় ; এঁরাই প্রচেতা নামে পরিচিত। এই প্রচেতারা ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও তপস্যার জন্য দশ হাজার বছর ধরে সমুদ্রের জলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবী রক্ষার ভার যেহেতু এই প্রচেতাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাই এঁরা তপস্যায় প্রবৃত্ত হলে পর পৃথিবী শাসকহীন হয়ে পড়ল। ক্রমে প্রজা-সমূহ ক্ষয় পেতে লাগল ; পৃথিবী বিশাল বৃক্ষে এমন নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে গেল যে বায়ু পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারল না। ফলে, প্রজাক্ষয় বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রজাপুঞ্জের এহেন দুর্দশার কথা প্রচেতাদের কানে গিয়ে পেঁছিল। প্রচেতারা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নিকে সৃষ্টি করলেন। সেই ভীষণ বায়ুর প্রভাবে বৃক্ষসমূহ বিশুষ্ক হয়ে গেল ; তখন প্রচেতাদের মুখনিঃসৃত সেই অগ্নিতে বৃক্ষসমূহ দগ্ধ হতে লাগল। এভাবে প্রচুর বৃক্ষ নষ্ট হয়ে গেলে পৃথিবীতে যখন বৃক্ষের স্বল্পতা দেখা দিল তখন ভগবান সোম প্রচেতাদের কাছে গিয়ে বিনীতবাক্যে তাঁদেরকে ক্রোধ সংবরণ করতে অনুরোধ করলেন। সোম তাঁদের সামনে অপূর্ব সুন্দরী এক নারীকে রেখে বললেন—দেখুন, এই কন্যার নাম মারিষা, ইনি বৃক্ষসমূহের কন্যা। আমি তপস্যাবলে ভবিষ্যৎ-কথা জেনে আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা এঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। আপনাদের সম্মিলিত তেজপুঞ্জ এবং আমার তেজে এই কন্যার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি জন্মাবেন। তিনি আপনাদের সুনাম রক্ষা করে পৃথিবীকে সুশাসনে রাখবেন।

সোমের অনুরোধে প্রচেতারা ক্রোধ সংবরণ করে মারিষাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। কালক্রমে ভগবান সোমের তেজে মারিষার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হল। এই প্রজাপতি

দক্ষ মনের দ্বারা স্থাবর, জঙ্গম সৃষ্টি করলেন ; সৃষ্টি করলেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণী-সমূহ। তারপর তিনি পঞ্চাশটি কন্যা সন্তান সৃষ্টি করলেন। সেই পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে দশটি তিনি ধর্মকে দিলেন, তেরোটিকে কশ্যপের হাতে সমর্পণ করলেন এবং বাকি যে সাতাশটি কন্যা ছিল—যারা নক্ষত্র নামে পরিচিত, তাদের সোমের হাতেই সমর্পণ করলেন। সেই দক্ষকন্যাদের গর্ভে ক্রমে দেবতা, দানব, দৈত্য, গো, পক্ষি, নাগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং অন্যান্য অনেক জাতির উৎপত্তি হয়েছিল। তারপর থেকেই প্রজাদের উৎপত্তি মৈথুন ক্রিয়ার ফলে হতে লাগল।

লোমহর্ষণকে তাঁর কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে মুনিরা বললেন, আমরা শুনেছি যে প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্মগ্রহণ করেন এবং দক্ষের পত্নী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্মান। কিন্তু সেই তপস্বী দক্ষ কিভাবে প্রচেতারূপে পরিচিত হলেন, কি ভাবেই বা তিনি সোমের দৌহিত্র হয়ে আবার তাঁরই শ্বশুর হলেন—এ বিষয়ে শোনাব জন্য আমরা উৎসুক হয়ে রয়েছি। আপনি দয়া করে এ সব বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে আমাদের বলুন।

মুনিদের কথার উত্তরে লোমহর্ষণ বললেন—উৎপত্তি এবং বিনাশ প্রাণীদের পক্ষে নিত্য ; এতে ঋষিরা মোহগ্রস্ত হন না। যুগে যুগে দক্ষ প্রভৃতি রাজাদের আবির্ভাব এবং তিরোধান ঘটছে, বিদ্বান ব্যক্তি এতে মোহাচ্ছন্ন হন না। তাছাড়া প্রাচীন সৃষ্টির ব্যাপারে বড় বা ছোটর কোনো ব্যাপার ছিল না ; তপস্যা এবং ব্যক্তিগত প্রভাবকেই গৌরবের কারণ বলে মনে করা হত। এতে তো সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। দক্ষ প্রজাপতির এই বিবরণ অতি পবিত্র। যাঁরা এই কথা শোনেন তাঁরা দীর্ঘায়ু হন এবং শেষে স্বর্গলোকেই তাঁদের গতি হয়।

—ব্রহ্মপুরাণে 'সৃষ্টিকথন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : তিন

সৃষ্টিবর্ণনা প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—ভগবান স্বয়ম্ভুর নির্দেশে দক্ষপ্রজাপতি প্রথমে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ এবং রাক্ষস প্রভৃতি মানস প্রাণী সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, সেই মানস সৃষ্টি আর বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তখন তিনি মৈথুন ধর্ম অবলম্বনে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি প্রজাপতি বীরণের কন্যা অসিক্লীকে বিয়ে করলেন। অসিক্লীর গর্ভে দক্ষের পাঁচ হাজার পুত্রের জন্ম হল ; এরা সবাই হর্যশ্ব নামে পরিচিত। দেবর্ষি নারদ এই হর্যশ্বদের প্রতি কটুবাক্য ব্যবহার করেছিলেন ; তাতে হর্যশ্বরা সবাই অদৃশ্য হয়ে যান। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ নারদকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে স্বয়ং ব্রহ্মা এসে দক্ষকে ক্রোধ সংবরণ করতে অনুরোধ জানান। তখন দক্ষ এই প্রস্তাব রাখেন যে, যদি তাঁর কোনো কন্যার গর্ভে স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্ররূপে নারদ জন্ম গ্রহণ করেন তবেই তিনি নারদকে ক্ষমা করতে পারেন। অন্য উপায় না দেখে ব্রহ্মাকে সেই প্রস্তাবে রাজী হতে হয়। দক্ষ তাঁর প্রিয়া নামের এক কন্যাকে ব্রহ্মার হাতে সমর্পণ করেন ; দক্ষের অভিশাপ ভয়ে ভীত হয়ে নারদও সেই প্রিয়ার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন।

লোমহর্ষণের কথা শেষ হলে মুনিরা তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে, মহর্ষি নারদ কি এমন কথা বলেছিলেন যাতে হর্যশ্বরা অদৃশ্য হয়ে যান। মুনিদের জিজ্ঞাসার উত্তরে

লোমহর্ষণ বললেন—হর্যশ্বরা যখন প্রজা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে প্রযত্ন করতে লাগলেন তখন তাঁদের উদ্দেশ্যে নারদ বললেন—তোমরা নিতান্তই মূর্খ : পৃথিবীর পরিমাণ সম্পর্কে, তার ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। কী করে তোমরা প্রজা সৃষ্টি করবে ? যাও, আগে এ সম্পর্কে জান, পরে ইচ্ছামতো কাজ কর। নারদের কথা মতো হর্যশ্বরা নানান্ দিকে চলে যায় ভৌগোলিক জ্ঞান আহরণের জন্য। সাগর থেকে নদী যেমন কোনোদিনই ফিরে আসে না তেমনি এরাও আজ পর্যন্ত ফিরে আসে নি। এদিকে হর্যশ্বদের দেখতে না পেয়ে দক্ষ এবং অসিক্নী-উভয়েই চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন। বহু অনুসন্ধান করেও তাঁরা কিছুই জানতে পারলেন না। কালক্রমে দক্ষের আরও এক হাজার পুত্র জন্মাল ; এরা শবলাশ্ব নামে বিখ্যাত হয়। এরাও যখন বড় হয়ে ওঠে নারদ সেই একই কথা এদেরও বলেন। নারদের কথামতো এরাও ভাইদের মতো তাদেরই অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। আজও তারা ফিরে আসে নি। এদেরও ফিরে আসতে না দেখে দক্ষ আবার প্রজাসৃষ্টির জন্য যত্নবান হলেন। কালক্রমে অসিক্নীর গর্ভে দক্ষের ষাটটি কন্যা জন্মাল। সেই কন্যাগণ বড় হয়ে উঠলে পর ভগবান কশ্যপ সোম, ধর্ম এবং অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে তাঁদের পরিণয় হয়। দক্ষ প্রজাপতি ধর্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরোটি, সোমকে সাতাশটি, অরিষ্টনেমিকে চারটি, বহুপুত্র, আঙ্গিরস ও কৃশাশ্বকে দুটি করে কন্যা সম্প্রদান করেন। ধর্মকে দক্ষ যে দশটি কন্যা সম্প্রদান করেন তাদের নাম—অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা এবং বিশ্বা। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যার সাধ্যদেবগণ, মরুত্বতীর মরুত্বানগণ, বসুর বসুগণ, যামীর নাগবীথী, লম্বার ঘোষ, ভানুর ভানুসমূহ এবং মুহূর্তার গর্ভে মুহূর্ত নামে সন্তান সন্ততিগণ জন্মলাভ করে। অরুন্ধতীর গর্ভে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় জন্মগ্রহণ করে এবং সংকল্পার গর্ভ থেকে সংকল্পের উৎপত্তি হয়। যামীর কন্যা নাগবীথীর গর্ভে বৃষল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দক্ষ প্রজাপতি তাঁর যে সব কন্যাদের সোমের হাতে সমর্পণ করেন, তারা সবাই নক্ষত্র নামে পরিচিত। জ্যোতিঃশাস্ত্রে এদের কথা রয়েছে। বসুর গর্ভজাত সন্তানগণ 'বসু' নামেই পরিচিত—এরা সংখ্যায় আট ; এদের নাম—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, সলিল, অনল, প্রত্যূষ এবং প্রভাস। এই অষ্টবসুর মধ্যে আপের তিনটি পুত্র ছিল—বৈতণ্ড্য, শ্রম ও শ্রান্ত। ধ্রুবের পুত্রের নাম কাল ; ইনি অখিল লোকের ক্ষয়কারী। সোমের পুত্র বর্চা ; বর্চার পুত্র বর্চস্বী। ধরের পুত্র দ্রবিণ। অনলের তিনটি পুত্র ; তাদের নাম—শিশির ঘ্রাণ ও রমণ। অনিলের স্ত্রীর নাম শিবা। শিবা দুটি সন্তানের জন্ম দেয়—মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। অনলের পুত্রের নাম কুমার ; ইনি শরস্তম্বে জন্ম-গ্রহণ করেন। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় নামে এঁর তিনজন সহচর ছিল। এই কুমার কৃত্তিকাদের পুত্রবলে কার্তিকেয় নামে পরিচিত হন। প্রত্যূষের পুত্র দেবল, ইনি একজন ঋষি। দেবলের ক্ষমাবান এবং মনীষী নামে দুই পুত্র জন্মায়। প্রভাস বৃহস্পতির বোন যোগসিদ্ধাকে বিয়ে করেন। এই ব্রহ্মবাদিনী যোগসিদ্ধা যোগবলে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করতেন। এঁরই গর্ভে প্রভাসের বিশ্বকর্মা নামে এক পুত্র জন্মায়।

এই বিশ্বকর্মা বহুবিধ শিল্পের স্রষ্টা এবং অলংকারসমূহের নির্মাতা। এই শিল্পী শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা দেবসমাজের প্রধান স্থপতি। এঁরই শিল্পকর্মের অনুসরণে মনুষ্য শিল্পীরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কশ্যপের অন্যতম পত্নী সুরভি মহাদেবের তপস্যা করে তাঁরই বরে যে সন্তান লাভ করেন তাঁরা 'রুদ্র' নামে পরিচিত ; এঁরা সংখ্যায় একাদশ।

এঁদের নাম- অজৈকপাদহির্বধ্ন ত্বষ্টা, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব ও কপালী। পুরাণে এ রকম শত শত রুদ্রের উল্লেখ রয়েছে। কশ্যপের তেরোজন পত্নী ছিলেন ; এঁদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইলা, কদ্রু ও মুনি। এখন এই কশ্যপপত্নীদের গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিদের কথা বলছি। পূর্বকালে চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে তুষিত নামে বারোজন প্রধান দেবতা ছিলেন। প্রজাসমূহের কল্যাণের জন্য তাঁরা বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে কশ্যপপত্নী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে এঁদের নাম হয়—বিষ্ণু, শক্র, অর্যমা, ধাতা, বিধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্রাবরুণ, অংশ ও ভগ। এঁরা দ্বাদশ আদিত্য নামে পরিচিত। 'নক্ষত্র' নামে পরিচিত সোমের যে সাতাশটি পত্নীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা যে সব সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়েছিলেন, এবার তাদের কথাই বলছি। অরিষ্টনেমির পত্নীরা ষোলোটি পুত্রের জন্ম দেন, বহুপুত্রের চারটি পুত্র জন্মায় ; এঁরা বিদ্যুৎ নামে পরিচিত। অঙ্গিরার সন্তানগণ 'ঋক্' নামে পরিচিত। দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ 'দেবপ্রহরণ' নামে বিখ্যাত। আকাশে সূর্যের উদয় এবং অস্তগমনের মতো যুগে যুগে এই দেবতারা আবির্ভূত হন, এঁদের তিরোভাবও সেভাবেই ঘটে থাকে।

আমরা শুনেছি যে, কশ্যপের অন্যতম স্ত্রী দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুটি সন্তানের জন্ম হয়। এরা অতীব বলবান ছিল। দিতির সিংহিকা নামে একটি মেয়েও জন্মায়। বিপ্রচিত্তির সঙ্গে সিংহিকার বিয়ে হয় ; এই সিংহিকার গর্ভজাত সন্তানগণ 'সৈংহিকেয়' নামে বিখ্যাত হয়। হিরণ্যকশিপুর চারটি পুত্র জন্মায় ; এদের নাম—হ্রাদ, অনুহ্রাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্রাদ। হ্রাদের পুত্র হ্রদ, হ্রদের পুত্র মায়াবী, শিব ও কাল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। এই বলির একশোটি পুত্র জন্মায়, এদের মধ্যে বাণাসুরই বড়। বাণাসুরের ভাইদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম—ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য, চন্দ্রমা, চন্দ্রতাপন, কুম্ভনাভ, গর্দভাক্ষ ও কুক্ষি প্রভৃতি। এই বাণাসুর তপস্যায় শিবকে প্রসন্ন করে তাঁর পার্শ্বচর হিসেবে তাঁরই কাছে থাকার প্রার্থনা জানিয়েছিল। হিরণ্যাক্ষের পাঁচটি পুত্র জন্মায় ; এদের নাম—উর্জর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ এবং কালনাভ। দনুর একশোটি পুত্র জন্মায়, এরা সবাই মহাবলশালী। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি—দ্বিমূর্ধা, শঙ্কুকর্ণ, হয়শিরা, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মারীচি, মঘবান, ইল্বল, খসৃম, বিক্ষোভণ, কেতু, কেতুবীর্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সর্বজিৎ, বজ্রনাভ, একচক্র, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাশিরা, স্বর্ভানু, বৃষপর্বা ও বিপ্রচিত্তি। কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে এদের জন্ম হয়। এরা সবাই বলশালী হলেও এদের মধ্যে বিপ্রচিত্তিই শ্রেষ্ঠ। এদের পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সংখ্যায় এত বেশী যে সবার নাম উল্লেখ পর্যন্ত সম্ভব নয়। কয়েকজনের নামই উল্লেখ করছি মাত্র। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা, পুলোমার শচী, হয়শিরার উপদানবী, বৃষপর্বার শর্মিষ্ঠা এবং বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালকা। এদের মধ্যে পুলোমা এবং কালকাকে দানব মারীচি বিয়ে করেছিল। এরা ষাট হাজার পুত্র সন্তান প্রসব করে। তাছাড়াও মারীচি অনেক তপস্যা করে আরও চৌদ্দশ পুত্র লাভ করে। ঐ মারীচি-তনয়গণ সবাই হিরণ্য-পুরের অধিবাসী ছিল। এরা নিজেদের মায়ের নাম অনুসারে পৌলোম এবং কালকেয় নামে পরিচিত হয়। পিতামহ ব্রহ্মার প্রসাদে এরা দেবতাদের অবধ্য হলেও পরে সব্যসাচী এদের হত্যা করেন; কারণ এরা অত্যন্ত অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে যে দানবদের জন্ম হয় তারা সৈংহিকেয় নামে পরিচিত। এরা দৈত্য-দানবের সংযোগে উৎপন্ন বলে প্রচণ্ড বলবান হয়; এদের মধ্যে তেরোজনের নাম উল্লেখ করছি, এরা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। এদের নাম—বংশ্য, শল্য, নল, বল, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম অঞ্জিক, নরক কালনাভ, সরমান ও সুরকল্প। হ্রদের দুটি পুত্র জন্মায়; এদের নাম—মূক ও তুহুণ্ড। সুন্দের পত্নী তাড়কা মারীচ নামে এক পুত্রের জন্ম দেয়। সংহ্রাদের বংশে নিবাতকবচ নামে অনেক দানব জন্মায়। সংখ্যায় এই দানবেরা তিন কোটি; এরা মণিমতী পুরীর অধিবাসী ছিল। তাম্রার ক্রৌঞ্চা, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রী নামে ছ'টি কন্যা জন্মায়। এদের মধ্যে ক্রৌঞ্চার সন্তান উলূক ও প্রত্যুলূকগণ, শ্যেনীর শ্যেনগণ, ভাসীর ভাসগণ, গৃধ্রীর গৃধ্রগণ, শুচির জল-পক্ষীগণ এবং সুগ্রীবীর সন্তান ঘোড়া, উট ও গর্দভগণ। বিনতার দুটি ছেলে—অরুণ ও গরুড়। গরুড় নিজ শক্তি ও প্রভাবের বলে পাখিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। সুরসার গর্ভে অসংখ্য সাপের জন্ম হয়। কশ্যপপত্নী কদ্রুর সন্তানেরা 'নাগ' নামে পরিচিত। এরা বলশালী হলেও গরুড়ের বশীভূত। এদের মধ্যে অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদংষ্ট্র, দুর্মুখ, সুমুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা এবং মণি—এরাই প্রধান। কশ্যপের অন্যতম পত্নী ক্রোধবশার বংশধরেরা বায়ুভোজী নাগ নামে পরিচিত; এরা সংখ্যায় চোদ্দ হাজার। কশ্যপপত্নী ধরার সন্তানগণ জলপাখি নামে পরিচিত, সুরভির সন্তান—গরু ও মহিষগণ, ইলার সন্তান—বিবিধ গাছ, লতা, বল্লী ও তৃণসমূহ। খসার সন্তান—যক্ষ ও রক্ষোগণ, মুনির অপ্সরাগণ এবং অরিষ্টার সন্তান গন্ধর্বগণ। এরা সবাই কশ্যপের বংশধর বলে পরিচিত। এই সৃষ্টি বিস্তার স্বারোচিষ মনুর অধিকারকালে সম্পন্ন হয়।

বৈবস্বত মন্বন্তরে বিখ্যাত বারুণ যজ্ঞ আরম্ভ হয়। সেই যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হোতার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই সময়ে যে প্রজা সৃষ্টি হয় সে-কথাই এখন আপনাদের শোনাব। আগের সৃষ্টিতে যে সাতজন ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই বৈবস্বত মন্বন্তরেও তাঁরা ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতা ও দানবের ভীষণ সংঘর্ষে দিতির সব পুত্রেরাই বিনষ্ট হয়, তখন দিতি কশ্যপের আরাধনা করেন। দিতির আরাধনায় প্রীত হয়ে কশ্যপ তাঁকে বরদান করতে উদ্যত হলে দিতি তাঁর কাছে এমন এক পুত্র প্রার্থনা করেন যে ইন্দ্রকে বধ করতে সমর্থ হবে। কশ্যপ দিতিকে প্রার্থিত বর দান করে বললেন, তুমি যদি পবিত্রভাবে ব্রতপালন করে একশ বছর ধরে গর্ভ ধারণ করতে পারো, তাহলে তোমার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে সে ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে। কশ্যপের পরামর্শ মতো দিতি ভক্তি-ভরে গর্ভ ধারণ করতে লাগলেন।

এদিকে কশ্যপ দিতির গর্ভে নিজ তেজ নিহিত করে তপস্যার উদ্দেশ্যে পর্বত-প্রদেশে গমন করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এ ঘটনার কথা জানতে পেরে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। নিজের শত্রুকে গোকুলে বাড়তে দেখে অঙ্কুরেই তাকে বিনাশ করবার জন্যে ইন্দ্র দিতির ব্রত-ভঙ্গের ছিদ্র অন্বেষণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। দৈবক্রমে সেই সুযোগ এসে গেল। দিতি একবার পা না ধুয়েই বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং অচিরেই ঘুমিয়ে যান। ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম শরীরে দিতির উদরে প্রবেশ করে বজ্র দিয়ে দিতির গর্ভস্থ শিশুটিকে সাতভাগে কেটে ফেললেন। ইন্দ্রের কঠোর বজ্রের আঘাতে শিশুটি কাঁদতে লাগল।

ইন্দ্র তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে যখন কান্না থামাল না, তখন ইন্দ্র রেগে গিয়ে সেই সাত ভাগে বিভক্ত প্রত্যেকটি গর্ভকে আবার সাত সাত খণ্ডে বিভক্ত করলেন। এই উনপঞ্চাশটি গর্ভপিণ্ড দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করে ; এরা 'মরুৎ' নামে পরিচিত। ইন্দ্রের সহচারী এবং সহায়ক দেবতা হিসেবে এরা বিশেষভাবে পরিচিত। এভাবে প্রাণীবর্গের উৎপত্তি সংঘটিত হলে ভগবান হরি প্রত্যেক রাজ্যভাগের সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এক একজন প্রজাপতি নিয়োগ করলেন। রাজা পৃথুর আধিপত্যকাল থেকেই এই সব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ভগবান হরিই কৃষ্ণ, বিষ্ণু, প্রজাপতি, পার্জন্য এবং সূর্যরূপে প্রতীত হন। যে ব্যক্তি এই প্রজাসৃষ্টির কথা সম্যকভাবে জানেন, তাঁকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না ; তিনি অচিরেই মোক্ষলাভ করতে পারেন।

—ব্রহ্মপুরাণে 'দেব এবং অসুরদের উৎপত্তিকথন' নামে অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ চার

সৃষ্টি বর্ণনা প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—পিতামহ ব্রহ্মা বেণের পুত্র পৃথুকে রাজাধিরাজরূপে অভিষিক্ত করে ক্রমে ক্রমে রাজ্যসমূহ বিভক্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন। ব্রাহ্মণ, তরুলতা, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ এবং তপস্যার আধিপত্যে তিনি সোমকে অভিষিক্ত করলেন। এভাবে বরুণকে জলরাশির, কুবেরকে রাজাগণের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের, অগ্নিকে বসুগণের, দক্ষকে প্রজাপতিগণের, ইন্দ্রকে মরুৎগণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের, যমকে পিতৃগণের, শিবকে যক্ষ, রাক্ষস, সমস্ত প্রাণী ও পিশাচদের এবং হিমালয়কে পর্বতসমূহের আধিপত্যে নিযুক্ত করলেন। তারপর ব্রহ্মা সমুদ্রকে নদীসমূহের, চিত্ররথকে গন্ধর্বগণের, বাসুকিকে নাগগণের, তক্ষককে সর্পগণের, ঐরাবতকে হাতীসমূহের, উচ্চৈঃশ্রবাকে ঘোড়াদের, গরুড়কে পাখিদের, বাঘকে হরিণসমূহের, বৃষকে গোরুদের এবং অশ্বত্থ গাছকে বনস্পতিদের আধিপত্যে নিযুক্ত করলেন। এর পর বিভিন্ন দিকে দিক্‌পালদের স্থাপন করলেন। পূর্বদিকে প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র সুধন্বাকে, দক্ষিণদিকে কর্দম প্রজাপতির পুত্র রাজা শঙ্খপদকে, পশ্চিমদিকে রজের পুত্র রাজা কেতুমানকে এবং উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জন্যের পুত্র রাজা হিরণ্যরোমাকে দিক্‌পালরূপে নিযুক্ত করলেন। এই দিক্‌পালগণ আজও এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে প্রতিপালন করছেন। যে সব রাজার কথা এতক্ষণ ধরে বলেছি, এঁরা সবাই বৈদিক বিধি অনুসারে রাজ-চক্রবর্তী পৃথুকে রাজসূয়ে অভিষিক্ত করেন। এদিকে চাক্ষুষ মনুর অধিকার-কাল শেষ হয়ে গেল ; পৃথিবী রক্ষার ভার পড়ল বৈবস্বত মনুর উপর। পৌরাণিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এই মনুর অধিকার-কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। আপনাদের ইচ্ছে হলে আমি এই মনুর কথা শোনাতে পারি।

লোমহর্ষণের কথা শুনে মুনিরা বললেন—বৈবস্বত মনুর অধিকার-কালের কথা, পৃথুর জন্ম-বিবরণ—এ সবই আমরা আপনার কাছ থেকে শুনব। সেই মহাত্মা পৃথু কিভাবে এই পৃথিবীকে দোহন করেন, কে কি রকম পাত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং কেনই বা ক্রুদ্ধ মহর্ষিরা রাজা বেনের হস্ত মন্থন করেছিলেন, এ সমস্ত কথাই আপনি বিস্তৃতভাবে আমাদের শোনান।

মুনিদের অনুরোধে লোমহর্ষণ বলতে আরম্ভ করলেন—পুরাকালে অত্রিবংশে অত্রির

মতো প্রভাবশালী অঙ্গ নামে এক প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। বেণ নামে তাঁর একটি পুত্র জন্মায়। বেণের মায়ের নাম সুনীথা ; ইনি মৃত্যুর কন্যা। মৃত্যু কালাত্মজার পুত্র। বেণের মাতামহের বংশ অধর্ম আচরণের জন্যে বিখ্যাত ছিল। মাতামহদের প্রভাবে বেণ ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিন্দিত কাজ করতে লাগলেন। তিনি বেদবিহিত ধর্ম ত্যাগ করলেন, ধার্মিকদের মর্যাদা নষ্ট করলেন, এমন কি যাগযজ্ঞের কাজ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করে দিলেন যে, যজ্ঞীয় হবি যেন তাঁকেই প্রদান করা হয়। বেণের অধর্মাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে উঠল, তখন মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিরা বেণকে বললেন—অধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি সনাতন ধর্মের অনুবর্তী হও। প্রজাপালনে যত্নবান হয়ে অত্রি বংশের মর্যাদা রক্ষা কর। মহর্ষিদের কথা শুনে বেণ বিদ্রূপের সুরে তাঁদের বললেন—আমি ছাড়া ধর্মের সৃষ্টিকর্তা আর কে আছে ? বিদ্যায় বুদ্ধিতে, বিক্রমে, তপস্যায় আমার মতো আর কে আছে ? আপনারা মূর্খ বলেই আমার শক্তিমত্তা সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণাই নেই। আমি ইচ্ছা করলে পৃথিবীকে এবং স্বর্গকেও যে কোনো মুহূর্তে দগ্ধ করতে পারি। বেণের কথা শুনে মহর্ষিরা বুঝলেন যে, তাঁকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তখন মহর্ষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই বলগর্বী বেণকে নিগৃহীত করে তার ডান উরু মন্থন করতে লাগলেন। সেই উরু থেকে তখন এক পুরুষের আবির্ভাব হল। ঐ পুরুষ আকারে ছোট এবং তার গায়ের রঙ খুবই কালো। মহর্ষি অত্রি তাকে বিহ্বল দেখে বললেন—নিষীদ, অর্থাৎ উপবেশন কর। এই পুরুষই পরে নিষাদ বংশের সৃষ্টিকর্তা হয়েছিলেন। বেণের পাপাচরণের ফলেই জেলেদের উৎপত্তি হয়, উৎপত্তি হয় বিন্ধ্যাচলের অধিবাসী তুষার ও তুন্দুর প্রভৃতি অসভ্য জাতিসমূহের। মহর্ষিরা আবার বেণরাজের ডান হাত যজ্ঞীয় কাঠের মতো মন্থন করেন তার ফলে, সেই হাত থেকেই পৃথুর জন্ম হয়। পৃথু জন্মানো মাত্রই দীপ্ত অগ্নির মতো তেজে চারদিক আলোকিত করে ফেললেন। তাঁর হাতে ছিল বিখ্যাত আজগব ধনু, দিব্য বাণসমূহ এবং গায়ে ছিল উজ্জ্বল কবচ—যা দেহ রক্ষার কাজ করছিল। পৃথু জন্মানোর পর বেণ মারা গেলেন। পৃথুকে অভিষিক্ত করার জন্যে তখন সমুদ্র এবং নদীসমূহ হরেক রকম রত্ন নিয়ে উপস্থিত হল। সমস্ত দেবতা এবং অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা পৃথুকে অভিষিক্ত করে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পৃথু সুশাসনে প্রজাদের মন জয় করে ফেললেন। প্রজানুরঞ্জনের ফলে 'রাজা' নাম তাঁর ক্ষেত্রেই সার্থক হয়েছিল। তাঁর এতই প্রভাব ছিল যে, সমুদ্র এবং পর্বত পর্যন্ত তাঁর জন্যে সসম্ভ্রমে পথ করে দিত। পৃথিবী শস্যসম্ভারে ছিল পরিপূর্ণ, গাভীসমূহ ছিল দুগ্ধবতী এবং প্রজারা ছিল আনন্দ-মগ্ন।

এই সময়েই শুভ পৈতামহযজ্ঞ আরম্ভ হয়। ঐ যজ্ঞ থেকেই মহামতি সূতের জন্ম হয় ; তারপর মাগধজাতিও সেই যজ্ঞ থেকেই উৎপন্ন হয়। পৃথুরাজের স্তবকীর্তন করার জন্যই মহর্ষিরা সূত ও মাগধদের আহ্বান জানান। তারপর থেকেই মহর্ষিদের নির্দেশে সূত ও মাগধেরা পার্থিব রাজা এবং মহাত্মাদের স্তুতিকীর্তনে নিরত আছেন। মহর্ষিরা যখন সূত এবং মাগধদের পৃথুরাজার স্তবকীর্তন করতে বললেন, তখন তাঁরা মহর্ষিদের বললেন—দেখুন, এই রাজা নবজাত ; এঁর কোনো কীর্তিকলাপই প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। সুতরাং কী করে এঁর স্তবকীর্তন করব ? মহর্ষিরা সূতদের কথা

শুনে পৃথুরাজের ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর কথা বলতে লাগলেন। মহর্ষিদের কাছ থেকে সে কথা শুনে সূত এবং মাগধেরা পৃথুর গুণাবলী কীর্তন করলেন; সেই কীর্তিকথা ছড়িয়ে পড়ল ত্রিভুবনে। রাজা পৃথুর কীর্তিকথা শুনে প্রজারা তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাদের বৃত্তিবিধান করে দেওয়ার অনুরোধ জানাল। মহর্ষিদের উপদেশে পৃথু তখন ধনুর্বাণ নিয়ে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে উদ্যত হলেন। ভীতা পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করে পালাতে লাগলে পৃথু তার অনুসরণ করতে লাগলেন। পৃথিবী স্বর্গ থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গেল; কিন্তু কোথাও পরিত্রাণের পথ দেখতে পেল না। পৃথিবী তখন সবিনয়ে পৃথুকে বললে—মহারাজ, ক্রোধ সম্বরণ করুন। আপনি তো জানেন যে, স্ত্রীজাতিকে বধ করা হয় না; তা সত্ত্বেও আমাকে হত্যা করবার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন কেন? তাছাড়া আমাকে হত্যা করলে, আপনার প্রজাপুঞ্জই বা কী করে বেঁচে থাকবে? উত্তম উপায় অবলম্বন করলে অবশ্যই কার্যসিদ্ধি হয়; সুতরাং আপনার প্রজারা যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে, সেই ব্যবস্থাই করুন।

পৃথিবীর কথা শুনে পৃথুর ক্রোধ খানিকটা কমল। তিনি পৃথিবীকে বললেন—দেখ, একজনের জন্য অনেক জনকে হত্যা করলে পাপ হয়, কিন্তু যেক্ষেত্রে একজনকে মেরে ফেললে অনেক লোকের জীবন-যাত্রা সুখে-স্বচ্ছন্দে চলতে পারে, সেক্ষেত্রে পাপের কথাই ওঠে না। তুমি প্রজা ধারণ করতে সক্ষম বলে তোমাকে বলছি, তুমি আমার মেয়ের মতো আমার কথা মেনে চল। প্রজাসমূহের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হও। যদি আমার কথা না মেনে অন্য রকম আচরণ কর, তবে তোমাকে আমি মেরে ফেলব। পৃথুর কথা শুনে পৃথিবী তাঁকে বলল—দেখুন, আপনার সব কথাই আমি মেনে চলব। আমার একটি প্রার্থনা আছে। আপনি আমাকে একটি বৎস সংগ্রহ করে দিন; তাকে দিয়ে আমি ক্ষীরক্ষরণ করব। আরও এক কাজ আপনাকে করতে হবে। আপনি আমাকে এমনভাবে সমীকৃত করে দিন, যাতে সেই ক্ষীরধারা সর্বত্র সমানভাবে প্রবাহিত হতে পারে। পৃথিবীর কথা শুনে পৃথু ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে পর্বতসমূহকে উৎখাত করে স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত করে রাখায় ঐ পর্বতসমূহ আরও উঁচু হয়ে উঠল। আগে পৃথিবী সমতল-বিশিষ্ট ছিল না, তাই নগর ও গ্রামসমূহের বিভাগ ছিল না; ছিল না শস্যের উৎপাদন, গোরক্ষা, কৃষি প্রভৃতির সুব্যবস্থা। বৈবস্বত মন্বন্তরে পৃথুর রাজ্যকালেই এ-সবের সুব্যবস্থা হয়। ভূমি সমতল হওয়ার ফলে প্রজারা বসবাসের সুবিধা পেয়েছিল। আমরা শুনেছি যে, প্রথমে প্রজাদের আহার ছিল ফলমূল প্রভৃতি; তাও অতি কষ্টে সংগ্রহ করতে হত। পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে নিজের হাতে পৃথিবী থেকে নানা রকম শস্য দোহন করেন; তার পর থেকেই প্রজারা শস্যের দ্বারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছে। পৃথু ছাড়াও ঋষিরা, দেবতারা, দৈত্যেরা, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতিরাও আলাদা আলাদা ভাবে পৃথিবীকে দোহন করে। ঋষিদের দোহনের সময় সোম বৎস, বৃহস্পতি দোহনকারী, তপস্যা ও ব্রহ্ম ক্ষীর এবং ছন্দসমূহ পাত্র হয়েছিল। দেবতাদের দোহনের সময় কাঞ্চন পাত্র, ইন্দ্র বৎস, ক্ষীর উর্জস্কর এবং সূর্য দোহনকারী হয়েছিল। পিতৃগণের দোহনের সময় রূপো পাত্র, যম বৎস, অন্তক দোহনকারী এবং ক্ষীর সুধা হয়েছিল। নাগগণের দোহনের সময় তক্ষক বৎস, লাউ পাত্র, ঐরাবত নাগ দোহনকারী এবং ক্ষীর বিষ হয়েছিল। অসুরদের দোহনের সময় দোহনকারী হয়েছিল মধু নামক দৈত্য, ক্ষীর মায়াময়, বিরোচন বৎস এবং লোহার তৈরি পাত্র সেই মন্থন কার্যে ব্যবহৃত

হয়েছিল। যক্ষগণের সময় আম পাত্র, বৈশ্রবণ বৎস, দোহনকারী রজতনাভ এবং ক্ষীর হয়েছিল অন্তর্ধান। রাক্ষসদের দোহনের সময় সুমালী বৎসরূপে ব্যবহৃত হয়, প্রচুর রক্ত হয় ক্ষীর, রজতনাভ দোহনকারী এবং পাত্র হয়েছিল কপাল। গান্ধর্বদের দোহনের সময় চিত্ররথ বৎস, পঙ্কজ পাত্র, বসুরুচি দোহনকারী এবং ক্ষীর হয়েছিল পবিত্র গন্ধ। পর্বতদের দোহনের সময় পাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছিল শৈল, ক্ষীররূপে রত্নৌষধি, বৎসরূপে হিমবান, দোহনকারীরূপে মেরুপর্বত এবং বৃক্ষসমূহের ধরিত্রী দোহনকালে অশ্বত্থগাছ বৎস, শালগাছ দোহনকারী, পলাশপাতা পাত্র এবং কাটা ও পোড়া গাছের গজিয়ে-ওঠা-অঙ্কুর ক্ষীররূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই পৃথিবীই নানা প্রকার শস্যের জননীস্বরূপ। পুরাকালে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত মধু ও কৈটভ নামে দুজন দৈত্যের মেদ সমগ্র পৃথিবীতে পড়েছিল বলে, এই পৃথিবী মেদিনী নামেও পরিচিত।

রাজা পৃথুর শাসনে এই পৃথিবী প্রভূত শস্যশালিনী হয়। দিনে দিনে পৃথুর রাজ্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। এই পৃথুরাজ সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, যুদ্ধে নিপুণ এবং সকলের পুজ্য। রাজা পৃথুর এই মাহাত্ম্যের কথা, পৃথিবী দোহনের কথা—এ সবই আপনাদের বললাম। এখন বলুন, আপনারা আর কী শুনতে চান?

—ব্রহ্মপুরাণে 'পৃথুর জন্মমাহাত্ম্য কীর্তন' নামে অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ পাঁচ

লোমহর্ষণের প্রশ্নের উত্তরে মুনিরা বললেন—আমরা সমস্ত মন্বন্তরের কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছি; আপনি দয়া করে সেই মন্বন্তরের কথা আমাদের শোনান। মুনিদের অনুরোধে লোমহর্ষণ বললেন—আপনারা যখন শুনতে চেয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনাদের মন্বন্তরসমূহের কথা শোনাব। তবে সমস্ত মন্বন্তরের কথা একশ বছরেও শেষ করা যায় না; আমি সংক্ষেপেই মন্বন্তরসমূহের কথা আপনাদের শোনাব। এখন বৈবস্বত মুনির অধিকার কাল চলছে; এর আগে যে সব মনুরা ছিলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ। এ ছাড়াও বৈবস্বত, সাবর্ণি, রৈভ্য, রৌচ্য এবং চারজন মেরুসাবর্ণি মনুর উল্লেখ আমরা পাই। এই মনুদের কথা ছাড়াও দেবতা এবং ঋষিদের বংশবিবরণ আপনাদের শোনাব। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ—এই সাতজন ঋষি ব্রহ্মার পুত্ররূপে পরিচিত; উত্তরদিকে এঁদের অবস্থান। স্বায়ম্ভুব মনুর দশটি পুত্র জন্মায়; তাদের নাম—অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, মেধ্য, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিধান এবং হব্য প্রভৃতি। এই মনুর অধিকার-কাল প্রথম মন্বন্তর নামে পরিচিত। বায়ুর মতে ঔর্ব, বসিষ্ঠপুত্র, স্তম্ব, কশ্যপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত, অত্রি ও চ্যবন—এই মহর্ষিগণ মহাব্রত নামে পরিচিত। হবিঘ্ন, সুকৃতি, জ্যোতি, তাপ, মূর্তি, প্রতীত, নভস্য, নভ, ঊর্জ—এরা স্বারোচিষ মনুর পুত্র; এই মন্বন্তরে 'তুষিত' নামে দেবতারা ছিলেন। এ হল স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মনুর অধিকার-কালের কথা। এবার উত্তম নামক তৃতীয় মনুর অধিকার-কালের কথা বলছি। সপ্তর্ষিদের অন্যতম বসিষ্ঠের সাতজন পুত্র জন্মায়; এরা বাসিষ্ঠ নামে পরিচিত। ঊর্জা নামে হিরণ্যগর্ভেরও কয়েকজন মহা তেজস্বী পুত্র জন্মায়। উত্তম মনুর দশটি পুত্র জন্মায়; এদের নাম—ইষ, ঊর্জ, তনুর্জ, মধু, মাধব, সুচি, শুক্র, নভস্য ও নভ। এই

মন্বন্তরে ভানুগণ দেবতা ছিলেন। এবার চতুর্থ মন্বন্তরের কথা বলছি, শুনুন। এই মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান ও অকপীবান—এঁরাই সপ্তর্ষি নামে পরিচিত ছিলেন। পুরাণসমূহে এই সব সপ্তর্ষিদের পুত্র ও পৌত্রদের কথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। এই চতুর্থ মন্বন্তর তামস মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই মন্বন্তরে 'সত্য' নামে দেবতারা ছিলেন। তামস মনুর দশটি পুত্র ছিল ; এদের নাম—দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, সনাতন, তপোরতি, কল্মাষ, তন্বী, ধন্বী ও পরন্তপ। পঞ্চম মন্বন্তর রৈবত মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই মন্বন্তরে দেববাহু, যদুধ্র, দেবশিরা, হিরণ্যরোমা, পর্জন্য, ঊর্ধ্ববাহু ও সত্যনেত্র—এঁরা সপ্তর্ষি নামে পরিচিত ছিলেন। এই মন্বন্তরে দেবতারা এবং প্রজারা অভূতরজা নামে পরিচিত। রৈবত মনুরও দশটি পুত্র জন্মায় ; এদের নাম—ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, আরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক এবং কৃতী। চাক্ষুষ মনুর অধিকার-কালই চাক্ষুষ মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই মন্বন্তরে ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা এবং সহিষ্ণু প্রভৃতি সাতজন প্রধান ঋষি ছিলেন। এই মন্বন্তরে মহর্ষি অঙ্গিরার নড্বলা নামক পত্নীর গর্ভে রুরু প্রভৃতি দশটি পুত্র জন্মায়।

এবার বৈবস্বত নামে সপ্তম মন্বন্তরের কথা শুনুন। এই মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র এবং ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি—এই সাতজন প্রধান ঋষি ছিলেন। এই বৈবস্বত মনুর অধিকার-কালে সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, বসুগণ, মরুৎগণ, আদিত্যগণ ও বৈবস্বত অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিরাজ করেন। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশটি পুত্র জন্মায়। সমস্ত মন্বন্তরেই ধর্মের সুব্যবস্থা এবং লোকরক্ষার জন্য সপ্তর্ষিদের বিশেষ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। তারপর মন্বন্তর পার হয়ে গেলে ওই সাতজন ঋষির মধ্য থেকে চারজন সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং তার ফলে ব্রহ্মলোকে যান। অন্যান্যরা তপস্যা করে তাঁদের স্থান পূরণ করেন। অতীত এবং বর্তমানের ঋষিদের সম্বন্ধে ওই একই ক্রম প্রচলিত। ভবিষ্যতে যে মন্বন্তর আসবে তার সপ্তর্ষিরা এখন স্বর্গে রয়েছেন। পরশুরাম, ব্যাস, আত্রেয়, অশ্বত্থামা, গৌতমপুত্র শরদ্বান, কুশিকের পুত্র গালব এবং ধ্রুবের পুত্র কশ্যপ—এই সাতজন মহাত্মা ভবিষ্যতে মুনিশ্রেষ্ঠ হবেন। বৈরী, অধ্বরীবান শমন, ধৃতিমান, বসু, অরিষ্ট, অধৃষ্ট, বাজী এবং সুমতি—এঁরা সাবর্ণমনুর পুত্ররূপে উৎপন্ন হবেন। এই সব মন্বন্তরের কথা সংক্ষেপে আপনাদের বললাম ; এবার অনাগত মন্বন্তরসমূহের কথা শুনুন।

সাবর্ণমনু পাঁচজন ; তার মধ্যে চারজন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পুত্র। এঁরা মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত। এঁরা সবাই দক্ষকন্যা প্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং এঁরা সবাই দক্ষপ্রজাপতির দৌহিত্র। প্রজাপতি রুচির পুত্র রৌচ্যমনু নামে বিখ্যাত। রুচির পত্নী ভূতি ; এঁর গর্ভজাত পুত্রেরা ভৌত্যমনু নামে পরিচিত। এই যে সাতজন মনুর কথা বলা হল, এঁরা যুগ যুগ ধরে পৃথিবী পালন করবেন। প্রত্যেক যুগান্তেই প্রজাপতি তপশ্চাচরণ করেন। এই একাত্তরমহাযুগব্যাপী কালকে এক মন্বন্তর[১] বলা হয়।

১। এক মন্বন্তর=৭১টি মহাযুগ ; ১ মহাযুগ=১২,০০০ দৈব বৎসর অথবা ৪,৩২০,০০০ মনুষ্য বৎসর অথবা ব্রহ্মার $\frac{১}{১৪}$ দিন ; ব্রহ্মার সম্পূর্ণ একদিন একরাত নিয়ে হয় ২০০০ মহাযুগ।

যে চোদ্দজন মনুর কথা বললাম, এঁরা সবাই বেদ এবং পুরাণে কীর্তিশালী বলে উল্লিখিত এবং এঁরা প্রভু এবং প্রজাপতিপদবাচ্য। মন্বন্তরের পর সংহার হয় এবং সংহারের পর আবার সৃষ্টি হয়—এইভাবেই সৃষ্টির ক্রম চলে আসছে। শোনা যায় যে, মন্বন্তরের শেষে যখন সংহার হয়, তখন তপস্যা, ব্রহ্মচর্য এবং শাস্ত্রজ্ঞানবলে একমাত্র দেবতা এবং সপ্তর্ষিরাই থাকেন। এক হাজার যুগ শেষ হয়ে গেলে পর, এক কল্পের অবসান হয়। এই কল্পান্ত কালে অখিল প্রাণিবর্গ সূর্যকিরণে দগ্ধ হয়ে ব্রহ্মাকে সামনে রেখে দেবতাদের সঙ্গে দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের শরীরে প্রবেশ করে। প্রত্যেক কল্পের অবসানে বারংবার এ রকম ঘটনাই ঘটে থাকে। যিনি অব্যক্ত, শাশ্বত, দেবাদিদেব, তাঁরই লীলায় এ জগতের উৎপত্তি এবং ধ্বংস ঘটে থাকে। এখন আমি আপনাদের বৃষ্ণিকুলের অলংকারস্বরূপ হরি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈবস্বত মনুর সৃষ্টিবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলছি। আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

—ব্রহ্মপুরাণে 'মন্বন্তরকীর্তন' নামে অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ ছয়

সৃষ্টিবর্ণনা প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—কশ্যপের পত্নী দাক্ষায়নীর গর্ভে সূর্যের জন্ম হয় ; ইনি বিবস্বান নামেও পরিচিত। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে হয়। সূর্যের আরেক নাম মার্তণ্ড ; পুরাকালে কশ্যপ না জেনে স্নেহভরে বলেছিলেন—এ অণ্ড তো মরে নি। তাঁর ওই কথা থেকেই সূর্যের নাম মার্তণ্ড হয়েছিল। সংজ্ঞার গর্ভে সূর্যের তিনটি সন্তান জন্মায় ; তাদের মধ্যে দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। সূর্যের এই দুই পুত্রের নাম বৈবস্বত মনু এবং শ্রাদ্ধদেব বা যম ; এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রজাপতি। মেয়েটির নাম যমুনা। যমুনা এবং যম যমজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। যাই হোক, সূর্যের ঐ প্রচণ্ড তেজ ক্রমেই সংজ্ঞার অসহ্য হয়ে উঠল। সংজ্ঞা তখন মায়াবলে নিজের দেহাকৃতির অনুরূপ একটি ছায়ামূর্তির সৃষ্টি করে তাকে বললেন—দেখ, আমি সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি চলে যাচ্ছি। তুমি এখানে থাক এবং আমার ছেলেমেয়েদের যত্ন কর। তবে একটা কথা, এ ব্যাপার কাউকে কিন্তু জানিও না। বিশেষ করে, সূর্য যেন এ-কথার বিন্দু-বিসর্গও না জানতে পারেন। ছায়া সংজ্ঞাকে আশ্বস্ত করে বলল, আমার কেশগ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত এবং কোনো রকম অভিশাপ না ঘটা পর্যন্ত, তোমার কথা কাউকে আমি বলব না। সংজ্ঞা তখন বিশ্বকর্মার কাছে এসে সব কথা বললেন। বিশ্বকর্মা সমস্ত কথা শুনে সংজ্ঞাকে বারংবার শ্বশুর-বাড়িতে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু সংজ্ঞা সে-কথায় কান না দিয়ে এক স্ত্রী-ঘোড়ার রূপ ধারণ করে উত্তর কুরুদেশে চলে গেলেন।

এদিকে সূর্য ছায়াকেই সংজ্ঞা মনে করে তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। ছায়ার গর্ভে সূর্যের দুটি ছেলে জন্মায়। তার মধ্যে প্রথম পুত্র তেজে সূর্যের সমান ; ইনি পরে সাবর্ণ মনু নামে বিখ্যাত হন। পরের পুত্রটির নাম শনৈশ্চর। ছায়ার যখন নিজের সন্তান হল, তখন থেকে সপত্নী সন্তানদের প্রতি ক্রমেই তার অবহেলা বাড়ল। সাবর্ণ মনু শান্তস্বভাব, তিনি দেখেও এ সব ব্যাপার এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু যম যেহেতু বয়সে অল্প, তাই সহ্যশক্তি তাঁর স্বাভাবিকভাবেই কম হওয়ায় তিনি

মায়ের এই পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের পা তুলে আঘাত করার ইঙ্গিত করলেন। যমের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়া অভিশাপ দিলেন যে, যমের পা খসে পড়বে। যম তখন বাবার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। তিনি সূর্যের কাছে এই প্রার্থনা রাখলেন যে, মায়ের এই অভিশাপ যেন সফল না হয়; কারণ, তিনি তো মাকে পা দিয়ে আঘাত করেন নি, পা তুলেছিলেন মাত্র। সমস্ত কথা শুনে সূর্য বললেন—দেখ, নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনো নিগূঢ় কারণ আছে। সেজন্য তোমার মতো ধর্মজ্ঞ ও সত্যবাদী পুত্রকেও তোমার মা অভিশপ্ত করেছেন। এই অভিশাপ ব্যর্থ করার মতো শক্তি আমার নেই। তবে অভিশাপের উপশম যাতে হয়, সেই ব্যবস্থাটুকুই শুধু করতে পারি। তোমার মা তোমাকে এ রকম অভিশাপ দিয়েছেন যে, তোমার পা খসে মাটিতে পড়বে। তা হবে না, তোমার পায়ের কিছু মাংস কৃমিরা পৃথিবীতে নিয়ে যাবে; ফলে সব দিকই রক্ষা পাবে। তুমি তখন অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।

এদিকে সূর্য ছায়াকে জিজ্ঞেস করলেন—সব সন্তানই তো মায়ের কাছে সমান স্নেহের যোগ্য; তবে কেন তোমার এই পক্ষপাতমূলক আচরণ? সূর্যের প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর ছায়া দিতে পারলেন না। সূর্য তখন যোগবলে সমস্ত কথা জানতে পারলেন। তিনি ছায়াকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন এবং তাঁর কেশ গ্রহণ করলেন। তখন ছায়া সংজ্ঞাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সব কথা সূর্যকে খুলে বললেন। সূর্য সমস্ত শুনে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্মার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন। বিশ্বকর্মা সূর্যকে যথোচিতভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি দেখলেন যে, সূর্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। সূর্যকে বিনীত ভাবে বললেন—দেখুন, আপনার এই তেজ অতি প্রখর; সহনের যোগ্য নয়। যদি আপনি অনুমতি দেন তো, এই অসহনীয় রূপকে সহনীয় এবং কমনীয় করে দিতে পারি। বিশ্বকর্মার প্রস্তাবে সূর্য সম্মত হলে বিশ্বকর্মা তাঁকে ভ্রমি যন্ত্রে অর্থাৎ কুঁদে চাঁড়িয়ে প্রখর তেজকে সহনীয় করে দিলেন। তখন সংহত তেজে সূর্যের রূপ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সূর্য তখন যোগবলে জানতে পারলেন যে সংজ্ঞা বড়বা (স্ত্রী-ঘোড়া) রূপ ধারণ করে উত্তর কুরুদেশে বিচরণ করছেন। কেউই তাঁর স্পর্শ লাভ করতে পারে নি। সূর্য তখন উত্তর কুরুদেশে গিয়ে ঘোড়ার রূপ ধারণ করলেন এবং বড়বারূপী সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়ে মুখে মুখ দিয়ে শুক্রপাত করলেন। পর-পুরুষ মনে করে বড়বারূপী সংজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে সেই শুক্র উগরে ফেলে দিলেন। সেই শুক্র থেকেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়; এঁদের নাম নাসত্য ও দস্র। এঁরা দেবতাদের চিকিৎসক রূপে পরিচিত।

তারপর সূর্য সংজ্ঞাকে তাঁর কমনীয় রূপ দেখালেন, ফলে সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের মিলন হতে দেরী হল না। যম তারপর ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তিনি পরে পিতৃগণের অধিপতি এবং লোকপাল রূপে কাজ করতে থাকেন। যমের বিমাতার পুত্র সাবর্ণিও একজন প্রজাপতি। ভবিষ্যতে যে মন্বন্তর আসবে, তাতে ইনি মনুপদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং সেই মন্বন্তরের নাম হবে সাবর্ণিক মন্বন্তর। এই সাবর্ণ মনু আজও মেরু পৃষ্ঠে থেকে তপস্যা করছেন। এঁর ভাই শনি গ্রহরূপে পরিচিত। সূর্যের তেজে বিশ্বকর্মা বিষ্ণুচক্র নির্মাণ করেন। সূর্য-কন্যা যমী নদীরূপ লাভ করে যমুনা নামে পরিচিত হন। দেবতাদের এই উৎপত্তি-কথা পবিত্র; এ কথা সমাহিত চিত্তে শুনলে যশোলাভ হয়।

—ব্রহ্মপুরাণে 'আদিত্যউৎপত্তিকথন' নামে অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ সাত

সৃষ্টিবর্ণনাপ্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—পুরাকালে বৈবস্বত মনু পুত্রকামনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে তাঁর ন'টি পুত্র জন্মায় ; এদের নাম—ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, রিষ্ট, করুষ ও পৃষধ্র। ঐ যজ্ঞে বৈবস্বত মনু মিত্রাবরুণের উদ্দেশ্যে একটি আহুতি প্রদান করেন। ফলে, অপূর্ব সুন্দরী এক রমণীর জন্ম হয়। মনু তাকে ইলা নামে অভিহিত করেন এবং তাঁকেই অনুগমন করতে বলেন। ইলা মনুর অনুমতি নিয়ে প্রথমেই মিত্রাবরুণের কাছে যান। ইলা মিত্রা-বরুণকে বলেন, আমি আপনাদের উভয়ের অংশে জন্মগ্রহণ করেছি ; আপনাদের কি কাজ আমাকে করতে হবে বলুন। মনু আমাকে তাঁর অনুগমন করতে বলেছেন। ইলার কথা শুনে মিত্র ও বরুণ তাঁকে বললেন—তোমার এই ধর্ম, বিনয় এবং সত্যের দ্বারা আমরা প্রীত হয়েছি। তুমি আমাদের কন্যারূপে পরিচিত হবে। ত্রিভুবনে তুমি মনুরই বংশধর সুদ্যুম্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। মিত্র ও বরুণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইলা যখন নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথে সোমের পুত্র বুধের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। বুধ তাঁর সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; ইলা তাতে সম্মত হন। ফলে, পুরূরবা নামে এক পুত্র জন্মায়। পুত্র প্রসব করার পর ইলা সুদ্যুম্নত্ব লাভ করেন। রূপান্তর প্রাপ্ত সুদ্যুম্নের তিনটি পুত্র জন্মায়—উৎকল, গয় এবং বিনতাশ্ব। উৎকল ওড়িশা, বিনতাশ্ব পশ্চিমদেশ এবং গয় পূর্বদিকস্থিত গয়া প্রদেশ অধিকার করেন। এই বৈবস্বত মনু স্বর্গে গমন করলে পৃথিবী দশভাগে বিভক্ত হয়। তার মধ্যে মনুর বড় ছেলে ইক্ষাকু মধ্যদেশ লাভ করেন। সুদ্যুম্ন যেহেতু জন্মান্তরে ইলা নামে মিত্র ও বরুণের কন্যারূপে পরিচিত ছিলেন, তাই তিনি কোনো রাজ্য লাভ করতে পারলেন না। গুরু বশিষ্ঠের নির্দেশমতো তিনি প্রতিষ্ঠান নগরে বাস করতে লাগলেন। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠান রাজ্যের অধিপতি হয়ে, পুরূরবাকে তা দান করেন। বৈবস্বত মনুর ন'টি পুত্রের মধ্যে নরিষ্যন্ত শক নামে এক পুত্র লাভ করেন এবং নাভাগেরও অম্বরীষ নামে একটি পুত্র জন্মায়। ধৃষ্টির একটি পুত্র জন্মায় ; তার নাম ক্ষত্র। ক্ষত্র ধার্মিক এবং রণনিপুণ ছিলেন। করুষের পুত্রেরা কারুষ নামে বিখ্যাত হয়। নাভাগ এবং ধৃষ্টের বংশধরগণ ক্ষাত্রিয় হলেও বৈশ্যত্ব লাভ করেছিলেন। প্রাংশুর একটিমাত্র পুত্র হয় ; ইনি প্রজাপতি নামে খ্যাতিলাভ করেন। শর্যাতির একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মায় ; পুত্রের নাম আনর্ত এবং কন্যার নাম সুকন্যা। চ্যবন ঋষির সঙ্গে সুকন্যার বিয়ে হয়। কুশস্থলী নগরীতে আনর্তের রাজধানী ছিল। আনর্তের এক পুত্র জন্মায় ; তার নাম রৈব। রৈবের পুত্র রৈবত ; ককুদ্মী নামেও ইনি পরিচিত ছিলেন। ইনিই কুশস্থলী রাজ্য লাভ করেন। রাজা রৈবতের কন্যার নাম রেবতী। রৈবত রেবতীর সঙ্গে ব্রহ্মলোকে গিয়ে সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার কলার অনুশীলনে অনেক দিন অতিবাহিত করেন। তারপর তিনি দ্বারকায় আসেন ; ঐ দ্বারকা ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দ্বারকায় অনেক দিন থাকার পর রৈবত দ্বারকায় রাজপুত্র বলরামের সঙ্গে নিজ কন্যা রেবতীর বিয়ে দেন ; তারপর তপস্যার জন্য মেরু পর্বতে চলে যান।

মুনিরা লোমহর্ষণকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—একটা কথা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। রাজা রৈবত তো রেবতীর সঙ্গে অনেক দিন ব্রহ্মলোকে ছিলেন ; তা

সত্ত্বেও তাঁরা বৃদ্ধ হয়ে পড়েন নি। আরও এক কথা, রৈবত তো শর্যাতিরই বংশধর ছিলেন ; তিনি তপস্যার জন্য মেরুপর্বতে চলে গেলেন অথচ শর্যাতির অন্যান্য বংশধরেরা আজও পৃথিবীতে রাজত্ব করছেন—এ কি করে সম্ভব ? আপনি দয়া করে সব কথা খুলে বলুন।

মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে লোমহর্ষণ বললেন—দেখুন, ব্রহ্মলোকে জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা অন্যান্য কোনো রকম কষ্টই নেই। তাই সেখানে দীর্ঘ দিন থাকলেও বার্ধক্য কিংবা রোগ-শোক মানুষকে গ্রাস করে না। রৈবত তো ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাক্ষসগণ কুশস্থলীপুরীকে বিধ্বস্ত করল। রৈবতের একশ ভাই থাকা সত্ত্বেও রাক্ষসদের আক্রমণ থেকে তাঁরা কুশস্থলী নগরীকে রক্ষা করতে পারেন নি। রাক্ষসদের হাতে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত রৈবতের ভাইয়েরা যে যেদিকে পারলেন পালিয়ে গেলেন। তাঁরা যেখানে যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, সেখানে বসতি স্থাপন করলেন এবং সেখানেই তাঁদের বংশবিস্তার ঘটতে থাকে। আগেই আপনাদের বলেছি যে, নাভাগ এবং ধৃষ্টের দুই ছেলে প্রথমে বৈশ্য এবং পরে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। কারুষের পুত্রেরা ক্ষত্রিয় এবং রণনিপুণ ছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম পৃষধ্র ; গুরুর গাভীর প্রতি অন্যায় আচরণ করার ফলে গুরু তাঁকে অভিশাপ দেন। ফলে, তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে শূদ্র রূপে পরিচিত হন।

বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু নামে একটি পুত্র জন্মায় ; এই ইক্ষ্বাকুর আবার একশটি পুত্র জন্মায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বড় তাঁর নাম বিকুক্ষি। এই বীর বিকুক্ষি অযোধ্যার রাজারূপে রাজ্যশাসন করতেন। বিকুক্ষির শকুনি প্রমুখ পঁচিশটি পুত্র জন্মায় ; এদের মধ্যে আটান্ন জন উত্তরাপথের রক্ষা কার্যে নিযুক্ত হন। শশাদ প্রভৃতি অন্যান্য ভাইরা দক্ষিণদিক রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। 'শশাদ' এ রকম নাম হওয়ার পিছনে কিছু কাহিনী আছে। একবার ইক্ষ্বাকু অষ্টকাশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিকুক্ষিকে শ্রাদ্ধে প্রদান করার জন্য শশক মাংস আনতে বলেন। বিকুক্ষি কিন্তু শ্রাদ্ধ শেষ না হওয়ার আগেই শশকমাংস খেয়ে মৃগয়ায় যান ; সে থেকেই তাঁর নাম হয় শশাদ। শশাদের এ রকম ব্যবহারে ইক্ষ্বাকু রীতি-মতো বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি ইতিকর্তব্য বিষয়ে বশিষ্ঠকে জিজ্ঞেস করায় বশিষ্ঠ শশাদকে পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেন। বশিষ্ঠের পরামর্শ মতো ইক্ষ্বাকু শশাদকে ত্যাগ করেন। ইক্ষ্বাকুর পরলোকগমনের পর আবার শশাদ অযোধ্যায় এসে বসবাস করতে থাকেন। শশাদের একটি পুত্র হয়, তার নাম ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিষ্টরাশ্ব, বিষ্টরাশ্বের পুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। এই শ্রাবস্তই শ্রাবস্তীপুরীর নির্মাণকর্তা। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব। এই কুবলাশ্ব ধুন্ধু নামে দৈত্যকে হত্যা করে ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হয়।

এ কথা বলে লোমহর্ষণ থামলেন। মুনিরা তখন লোমহর্ষণকে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি ধুন্ধুবধের কথা শোনান। মুনিদের অনুরোধে লোমহর্ষণ ধুন্ধুবধের কথা এবং কুবলাশ্ব কী করে ধুন্ধুমার নামে পরিচিত হন, সে-কথা বলতে আরম্ভ করলেন। বৃহদশ্ব অনেক দিন রাজ্যশাসন করার পর পুত্র কুবলাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তারপর বানপ্রস্থে যেতে চাইলে ঋষি উতঙ্ক বৃহদশ্বকে বললেন—মহারাজ, আপনি এখনই বানপ্রস্থে যাবেন না। আপনার কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে। আমার আশ্রমের

কাছে সমতল প্রদেশে সমুদ্র-বালুকাময় এক ভূমিভাগ আছে। মধু নামক রাক্ষসের পুত্র ধুন্ধু সেই বালুকাস্তূপের ভেতরে লুকিয়ে থাকে। ধুন্ধু বলবান এবং দেবতাদেরও অবধ্য। লোকক্ষয়ের জন্যই সে তপশ্চারণ করে সেই বালুকাস্তূপের ভেতর লুকিয়ে থাকে। এক বছর পর পর সে একটি করে ভীষণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। সেই নিশ্বাস-বায়ুতে প্রচুর ধুলো আকাশে ওড়ে এবং অন্তত এক সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে, এক সপ্তাহ ধরে ভূমিকম্প হতে থাকে সেই প্রবল নিশ্বাসবায়ুতে। এতে আমার তপস্যা বিঘ্নিত হয়। তাই আপনাকে অনুরোধ, আপনি লোককল্যাণের জন্য সেই রাক্ষসকে বধ করুন। আপনি ছাড়া আর কেউই তাকে বধ করতে সমর্থ হবে না। আপনাকে আমি আমার তপস্যার তেজ প্রদান করব ; কারণ আমাকে বরদানের সময় ভগবান বিষ্ণু আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যে সেই ধুন্ধুকে বধ করবে তার তেজ যেন বাড়িয়ে দিই।

ঋষি উত্তঙ্কের কথা শুনে বৃহদশ্ব নিজ পুত্র কুবলাশ্বকে ধুন্ধুবধের জন্য পাঠালেন এবং নিজে ব্রত অবলম্বন করে তপশ্চারণের জন্য বনে চলে গেলেন। পিতার আদেশে শতপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে হত্যা করবার জন্য সেই বালুকাময় সমুদ্র প্রদেশে গিয়ে পেঁছিলেন। উত্তঙ্ক ঋষির অনুরোধে এবং লোককল্যাণের জন্য স্বয়ং বিষ্ণু তেজঃপ্রভাবে কুবলাশ্বের দেহে প্রবেশ করলেন। তখন সর্বত্র কুবলাশ্বের জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। কুবলাশ্ব সেই সমুদ্রতীরে পেঁছে প্রথমেই পুত্রদের সমুদ্র-খননে নিযুক্ত করলেন। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এক সময় সেই বলবান অসুরকে খুঁজে পেল। তাদের দেখে ধুন্ধু ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। চন্দ্রের উদয়ে সবেগে উৎক্ষিপ্ত মহাসমুদ্রের জলের মতো সেই ধুন্ধু কুবলাশ্বের পুত্রদের আক্রমণ করল ; তিনজন ছাড়া আর সবাই ধুন্ধুর হাতে নিহত হল। কুবলাশ্ব তখন ধুন্ধুর কাছে গিয়ে তার জলময় বেগ পান করে ফেললেন এবং তার মুখজাত অগ্নিকে যোগময় জলের দ্বারা প্রশমিত করলেন। ফলে, সেই অসুর হীনবল হয়ে সহজেই কুবলাশ্বের হাতে প্রাণ হারাল। ধুন্ধু নিহত হলে পর মহর্ষি উত্তঙ্ক খুশি হয়ে কুবলাশ্বকে নানা রকম বর দান করলেন। উত্তঙ্কের তপস্যার প্রভাবে কুবলাশ্বের নিহত পুত্রগণ স্বর্গে গমন করল।

ধুন্ধুর আক্রমণ থেকে কুবলাশ্বের যে তিন পুত্র অব্যাহতি পায় তাদের নাম দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব এবং কপিলাশ্ব। দৃঢ়াশ্বের হর্যশ্ব নামে এক পুত্র জন্মায়। হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব। সংহতাশ্বের আবার দুটি পুত্র জন্মায়—অকৃষাশ্ব ও কৃশাশ্ব। সংহতাশ্বের একটি মেয়েও ছিল ; তাঁর নাম হৈমবতী। হৈমবতী দৃষদ্বতী নামেও পরিচিত ছিলেন। হৈমবতীর পুত্রের নাম প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিতের স্ত্রী গৌরী। তিনি স্বামীর অভিশাপে বাহুদা নামক নদীতে পরিণত হন। প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র স্বনামধন্য মান্ধাতা। শশবিন্দুর কন্যা চৈত্ররথীর সঙ্গে মান্ধাতার বিয়ে হয় ; চৈত্ররথী বিন্দুমতী নামেও পরিচিত ছিলেন। এই সাধ্বী এবং রূপময়ী বিন্দুমতীর গর্ভে মান্ধাতার দুটি পুত্র জন্মায়—পুরুকুৎস এবং মুচুকুন্দ। পুরুকুৎসের পুত্র এসদস্যু। এসদস্যুর স্ত্রী নর্মদা। এঁদের সম্ভূত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সম্ভূতের পুত্র ত্রিধন্বা ; ত্রিধন্বার পুত্র এয্যারুণি। এয্যারুণির পুত্র সত্যব্রত অধর্মাচারী ছিলেন। তিনি পরস্ত্রী অপহরণ করেন এবং নিজের বিয়ের সময় মন্ত্রপাঠে বিঘ্ন উৎপাদন করেন। এ সব কারণে এয্যারুণি তাকে ত্যাগ করেন এবং চণ্ডালদের সঙ্গে

বসবাস করতে বলেন। পিতার নির্দেশে সত্যব্রত চণ্ডালদের সঙ্গেই বসবাস করতে থাকেন। এদিকে এয্যারুণিও বনে চলে গেলেন। অরাজক দেশে অধর্মের প্রাবল্য ঘটায় বারো বছর ধরে সে রাজ্যে বৃষ্টি হল না। বিশ্বামিত্র সেই রাজ্যেরই কোনো এক আশ্রমে নিজের স্ত্রী পুত্রদের রেখে সাগরতীরে গিয়ে তপস্যা করছিলেন। অনাবৃষ্টির জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ফলে, বিশ্বামিত্রের স্ত্রী তাঁর মেজো ছেলেটিকে গলায় দড়ি বেঁধে একশ গরুর বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের মেজো ছেলেটিকে এ রকম অবস্থায় দেখে তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। গলায় বাঁধা হয়েছিল বলে তাঁর নাম হয় গালব।

-ব্রহ্ম পুরাণে 'সূর্যবংশনিরূপণ' নামে অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ আট

সূর্যবংশবর্ণনাপ্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—সত্যব্রত নিজে অধর্মাচারী হলেও মানবিকতার খাতিরে বিশ্বামিত্রের পরিবার-পরিজনদের প্রতিপালন করতে লাগলেন। বনে এসে বারো বছর ধরে তিনি মৌন অবলম্বন করেন। সত্যব্রত তাঁর পিতার গুরু বশিষ্ঠের উপর রেগে ছিলেন। রাগের কারণ হল, সত্যব্রতের বাবা এয্যারুণি যখন তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন, তখন বশিষ্ঠ বাধা দেন নি। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারে যে নিয়ম সত্যব্রত উল্লংঘন করেছিলেন ; বশিষ্ঠ তা জানা সত্ত্বেও সেই নিয়ম লংঘনের ফলে যে পাপ হয়েছিল তা থেকে সত্যব্রতকে উদ্ধার করেন নি। বশিষ্ঠ অবশ্য এ সব সত্যব্রতের ভাবী মঙ্গলের জন্য করেছিলেন, কিন্তু সত্যব্রত সে-কথা না বুঝতে পেরেই তাঁর উপর রাগ করেন। এদিকে এয্যারুণিও বানপ্রস্থে চলে যান ; ফলে রাজ্যে দীর্ঘ দিন অনাবৃষ্টি হওয়ায় দেশে খাদ্যাভাব, বিশৃংখলতা দেখা দেয়। এ সব থেকে দেশকে তথা নিজের বংশকে বাঁচানোর জন্য সত্যব্রত কঠোর দীক্ষা নিয়ে বারো বছর পর্যন্ত মৌন অবলম্বন করেন। সত্যব্রত একবার প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে পড়ে, লোভের বশবর্তী হয়ে বশিষ্ঠের কামধেনুটিকে অপহরণ করলেন। এমনিতে তো বশিষ্ঠের উপর তিনি রেগে ছিলেন ; অবস্থার বিপর্যয়ে এবং ক্রোধে তিনি বশিষ্ঠের ঐ দুগ্ধবতী গাভীটিকে হত্যা করে নিজে ঐ মাংস খেলেন এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রদেরও খাওয়ালেন। বশিষ্ঠ যখন এ কথা শুনলেন, তখন তিনি সত্যব্রতের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তোর ঐ কাজের জন্য তোকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। এর ফলভোগ তোকে অবশ্যই করতে হবে। তোর পিতার অসন্তোষ, গুরুর গোহত্যা এবং যা ভোজনের যোগ্য নয় তাই ভোজন করার ফলে তিনটি শংকু অর্থাৎ দোষ তুই করে ফেলেছিস। আজ থেকে তুই তাই 'ত্রিশংকু' নামে পরিচিত হবি।

সত্যব্রত অত্যন্ত দুর্দিনে বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গকে পালন করেছিলেন। তাই বিশ্বামিত্র যখন ফিরে এলেন তিনি সত্যব্রতের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। সত্যব্রত বা ত্রিশংকু বিশ্বামিত্রের কাছে সশরীরে স্বর্গগমন প্রার্থনা করেছিলেন ; বিশ্বামিত্র ত্রিশংকুর সেই প্রার্থনা পূরণ করেন। অনাবৃষ্টির ভয় কেটে গেল ; তখন বিশ্বামিত্র ত্রিশংকুকে তাঁর পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং নিজে তাঁর পুরোহিত-রূপে কাজ করতে লাগলেন। দীর্ঘ দিন রাজত্ব করার পর বিশ্বামিত্রের প্রভাবে ত্রিশংকু সশরীরে স্বর্গে যান। ত্রিশংকু কেকয় রাজার মেয়ে সত্যরথাকে বিয়ে করেন ; ঐ সত্যরথার

গর্ভে ত্রিশংকুর একটি পুত্র জন্মায়—তাঁর নাম হরিশ্চন্দ্র। এই হরিশ্চন্দ্র রাজা হয়ে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং সম্রাট উপাধি লাভ করেন। হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে একটি পুত্র জন্মায় ; ঐ রোহিতের আবার হরিত, চঞ্চু ও হারীত নামে তিনটি পুত্র হয়। এদের মধ্যে চঞ্চুর পুত্রের নাম বিজয়, বিজয়ের পুত্র রুরুক, রুরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহু। হৈহয় এবং তালজংঘ রাজারা এই বাহুকে রাজ্যচ্যুত করেন। বাহুকে নিহত দেখে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী পালিয়ে গিয়ে ঔর্বের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাহুরাজের স্ত্রী ঔর্বের আশ্রমে একটি পুত্র প্রসব করেন ; গর বা বিষের সঙ্গে জন্ম হয় বলে তাঁর নাম হয় সগর। এই সগর ঔর্বের আশ্রমেই বড় হতে থাকেন ; পরে ঔর্বের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করে ইনি হৈহয়দের সঙ্গে তালজংঘ রাজাদেরও নিহত করেন। এভাবেই সগর পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেন। বাহুবলে সগর সমগ্র পৃথিবী জয় করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শক, পহ্লব, পারদ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেন।

মুনিরা তখন লোমহর্ষণকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা সগর রাজা বনের মধ্যে গরের সঙ্গে কিভাবে জন্মালেন ? কেনই বা তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দের ধর্মচ্যুত করলেন ? এর রহস্য আমরা বুঝতে পারছি না ; দয়া করে সমস্ত কথা আমাদের খুলে বলুন। মুনিদের জিজ্ঞাসার উত্তরে লোমহর্ষণ বললেন—বাহুরাজ অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত হয়ে পড়লে শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে এবং এক একটি প্রদেশ অধিকার করে নেয়। হৈহয় এবং তালজংঘরা এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয় ; শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ এবং পহ্লবগণ এ ব্যাপারে হৈহয়দের সহায়তা করেছিল। বাহুরাজের রাজ্য অপহৃত হলে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে দুঃখিতভাবে বনে চলে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাহুরাজ যখন রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে চলে যান, তখন তাঁর স্ত্রী যাদবী ছিলেন গর্ভবতী। যাদবীর সতীন কোনো এক সময় তাঁকে গর অর্থাৎ বিষ খেতে দিয়েছিল। ঐ বিষ অবিকৃত অবস্থাতেই যাদবীর উদরে ছিল। বাহুরাজ মারা গেলে পর যাদবী স্বামীর চিতাতেই প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হন। মহর্ষি ঔর্ব যাদবীকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দেন। ঔর্বের আশ্রমেই গর অর্থাৎ বিষের সঙ্গে যাদবী এক পুত্র প্রসব করেন ; ইনিই পরে সগর নামে বিখ্যাত হন। মহর্ষি ঔর্ব সগরের জাত-কর্ম প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন করে তাঁকে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করে তোলেন। তারপর তিনি সগরকে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়ে দেন। সেই সব প্রধান প্রধান আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভাবে সগর যুদ্ধে হৈহয়দের নিহত করেন। তারপর তিনি শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ এবং পহ্লবদের নির্মূল করতে উদ্যত হন। সগরের ভয়ে ভীত হয়ে এরা বশিষ্ঠের আশ্রয় নেয়। বশিষ্ঠের নির্দেশে সগর তাদের প্রাণে না মারলেও ধর্মনাশ করেন এবং দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটান। তিনি শকদের অর্ধেক মাথা এবং কাম্বোজ ও যবনদের পুরো মাথাই কামিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দেন। তাঁরই প্রভাবে পারদেরা কেশহীন হয় এবং পহ্লবেরা দাড়ি রাখতে শুরু করে। শক, যবন, কাম্বোজ ও পারদদের বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে কোনো অধিকার থাকল না। এ ছাড়াও বশিষ্ঠের আদেশ অনুসারে সগর কোণসর্প, মাহিষক, দর্ব, চোল ও কেরল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দেরও স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছিলেন। এভাবে সমগ্র পৃথিবী জয় করে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হলেন। যজ্ঞীয় অশ্বকে পৃথিবী ভ্রমণ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হল ; সগরের ষাট হাজার ছেলে সেই যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হল।

পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে করতে যজ্ঞীয় অশ্বটি পূর্ব-দক্ষিণ দিকের সমুদ্রবেলার

কাছাকাছি জায়গায় পেঁছিল। অশ্বটিকে রেখে সগর তনয়েরা যখন বিশ্রাম করছিলেন, তখন কে বা কারা সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঘোড়াটিকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে সগরের পুত্রেরা সমুদ্র খনন করতে প্রবৃত্ত হলেন। সমুদ্রের অভ্যন্তরে গিয়ে তাঁরা কপিলরূপী ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষ হরিকে দেখতে পেলেন। সগর-পুত্রদের কোলাহলে শান্ত যোগিবর সেই পুরুষের ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি চোখ মেলে চাইতেই সগরসন্তানগণ ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। মাত্র চারজন কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন ; সেই চারজনের নাম—বর্হিকেতু, সুকেতু, ধর্মরথ এবং পঞ্চজন। এঁরাই পরবর্তী কালে সগর বংশকে বিস্তৃত করেছিলেন। নারায়ণের বরে সমুদ্র অর্ঘ্য নিয়ে সগরকে বন্দনা করেন ; এ জন্যই সমুদ্র সাগর নামে পরিচিত। অশ্বমেধের জন্য যে ঘোড়াটিকে নির্বাচিত করা হয়, সেটি সমুদ্রের কাছ থেকেই সগর পেয়েছিলেন। শোনা যায় যে, সগর মোট একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

লোমহর্ষণকে থামিয়ে দিয়ে মুনিরা জিজ্ঞেস করলেন—একটা কথা জানবার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে উঠেছি ; সগর কিভাবে ষাট হাজার পুত্র-সন্তান লাভ করেন এবং সেই পুত্রগণ এত বলবানই বা কিভাবে হয়ে উঠেছিল ? আপনি দয়া করে আমাদের বুঝিয়ে বলুন। মুনিদের জিজ্ঞাসার উত্তরে লোমহর্ষণ বললেন—সগররাজের দুই পত্নীর মধ্যে বড়র নাম কেশিনী ; ইনি বিদর্ভরাজের কন্যা। এঁর রূপ-গুণের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। দীর্ঘ দিন এঁদের কোনো সন্তান না হওয়ায় এঁরা মহর্ষি ঔর্বের শরণাপন্ন হন। ঔর্ব এঁদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে দুজনকেই ডেকে বলেন—দেখ, তোমাদের মধ্যে একজন ষাট হাজার পুত্র সন্তান লাভ করবে এবং আরেকজন একটি মাত্র পুত্র লাভ করবে। চিন্তা করে বল, কে কোন্‌টা চাও। মুনির কথা শুনে দুজনেই অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। কেশিনী একটি মাত্র পুত্র লাভের প্রার্থনা জানালেন, আর সগরের কনিষ্ঠ পত্নী ষাট হাজার পুত্র-লাভের সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন। ঔর্বের বরে যথা সময়ে কেশিনীর একটি পুত্র জন্মাল ; তাঁর নাম পঞ্চজন। সগরের অন্য পত্নী একটি লাউ প্রসব করেন ; সেই লাউয়ের মধ্যে বীজের আকারে মাংস-পিণ্ডসমূহ ছিল। ওই বীজাকৃতি মাংসপিণ্ডসমূহকে ঘৃতপূর্ণ কলসীতে রাখা হয়। তারপর যথা সময়ে যথাক্রমে সেই মাংসপিণ্ড থেকে এক একটি পুত্রের জন্ম হয় ; এরা সংখ্যায় ষাট হাজার। যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত সেই সব সগর-সন্তানেরা কপিল মুনির দৃষ্টিজাত অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পর কেশিনীর একমাত্র পুত্র পঞ্চজনই রাজা হয়েছিলেন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান ; অংশুমানের পুত্র দিলীপ, ইনি খট্বাঙ্গ নামেও পরিচিত ছিলেন। দিলীপের পুত্র স্বনামধন্য ভগীরথ ; এই ভগীরথই গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন এবং সমুদ্রের সঙ্গে সম্মিলিত করে তাঁকে নিজের কন্যারূপে কল্পনা করেন। এ জন্যই গঙ্গাকে ভাগীরথী নামে অভিহিত করা হয়। ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র অযুতাজিৎ, অযুতাজিতের পুত্র ঋতুপর্ণ। এই ঋতুপর্ণ পাশাখেলায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, এবং নলরাজ ছিলেন এঁর বন্ধু। ঋতুপর্ণের পুত্র আর্ত্তিপর্ণি, আর্ত্তিপর্ণির পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত। কল্মাষপাদের পুত্র সর্বকর্মা, সর্বকর্মার পুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। এই নিঘ্নের আবার দুটি পুত্র জন্মায়—অনমিত্র ও রঘু। অনমিত্রের পুত্র দুলিদুহ। দুলিদুহের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র রঘু। রঘু ছিলেন অযোধ্যার স্বনামধন্য রাজা। রঘুর পুত্র অজ, অজের

পুত্র দশরথ। এই দশরথের পুত্র রাম ; যাঁর কীর্তি আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। রামের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। এই ক্ষেমধন্বার একটি পুত্র জন্মায় ; তার নাম দেবানীক। দেবানীকের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার পুত্র শল, শলের পুত্র উক্য, উক্যের পুত্র বজ্রনাভ, বজ্রনাভের পুত্র নল। পুরাণের বিবরণ অনুসারে নল নামে দুজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন—যিনি এখন ইক্ষ্বাকুকুলের বংশধর তিনি, আরেকজন বীরসেনের পুত্র। ইক্ষ্বাকুর বংশধরদের মধ্যে প্রধান প্রধান পুরুষদের কথা এতক্ষণ ধরে আপনাদের শোনালাম। এঁরা সবাই সূর্যবংশে জন্মেছিলেন। যারা সূর্য এবং প্রজাপতি শ্রাদ্ধদেব প্রভৃতির এই সৃষ্টিকথা পাঠ করে, তারা মৃত্যুর পর সূর্যলোকে গমন করে।

—ব্রহ্মপুরাণে 'সূর্যবংশানুকীর্তন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ নয়

সৃষ্টিবর্ণনা প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন- এখন আমি আপনাদের সোমের জন্মকথা শোনাব। ঋষি অত্রি ছিলেন সোমের পিতা। পুরাকালে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে তাঁর মন থেকে অত্রির উৎপত্তি হয়। এই অত্রি কঠোর তপস্যা করেছিলেন ; ফলে, তাঁর তেজ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় ; সেই তেজই পরে সোমরূপে পরিচিত হয়। অত্রির চোখ থেকে যে তেজ বিনিসৃত হয়, তাকে দশদিকপালেরাও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেন নি। ফলে, এই তেজ পৃথিবীতে পতিত হয় ; এবং এই ভূপতিত অত্রি-তেজই সোমরূপে পরিচিতি লাভ করে। পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবীর মঙ্গল কামনায় নিজের রথে সোমকে আরোহণ করান। সোম পৃথিবীতে পতিত হলে দেবতারা, ব্রহ্ম পুত্রেরা এবং শ্রেষ্ঠ মুনিরা তাঁকে স্তব করতে থাকেন। ধীরে ধীরে এই তেজ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সোমদেব ব্রহ্মার রথে চড়ে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীকে একুশবার প্রদক্ষিণ করেন। তাঁর যে তেজ ক্ষরিত হয়ে পৃথিবীতে পড়েছিল, তা ওষধিরূপে জন্মায়। ওষধিসমূহ পৃথিবীর অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। সোমদেব দেবতা ও ঋষিদের দ্বারা স্তুত হয়ে এবং লোক-কল্যাণের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেও নিজের কর্মে অবহেলা করেন নি। তিনি একশ পদ্ম[১] বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা তাঁকে যাবতীয় বীজ, ওষধি, ব্রাহ্মণ এবং জলরাশির অধিপতি নিযুক্ত করেন। এদের আধিপত্যে নিযুক্ত হয়ে সৌম্যদর্শন সোম রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। শোনা যায় যে, খ্যাতনামা ব্রহ্মর্ষিগণ সেই যজ্ঞে ঋত্বিকরূপে কাজ করেন। সোম সেই যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিকদের সমগ্র ত্রিভুবন দক্ষিণারূপে দান করেন। স্বয়ং ব্রহ্মা, মহর্ষি অত্রি, ভৃগু এবং হরি সেই যজ্ঞে ঋত্বিক ছিলেন। বীজ, ওষধি, ব্রাহ্মণদের অধিপতি হওয়ার পরে সিনী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্তি, ধৃতি এবং লক্ষ্মী—এই নব দেবী সোমকে সেবা করেন, ঋষিরা পর্যন্ত তাঁকে যথেষ্ট খাতির করতে লাগলেন। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং লোকপ্রশংসা সোমের আত্মাভিমান এবং অহংকারকে স্ফীত করে তুলল। ঐশ্বর্যমদে মত্ত হওয়ার ফলে তিনি ন্যায়নীতির পথ পরিত্যাগ করলেন। কামমোহিত হয়ে সোম দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ

১। পদ্ম=১০০০০০০০×১০০০০০০=১০০০০০০০০০০০০০

করলেন। দেবতা এবং ঋষিরা সোমকে বারংবার অনুরোধ জানালেন যাতে তিনি তারাকে ফিরিয়ে দেন। সোম কিন্তু কারোর কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। রুদ্র বৃহস্পতি পক্ষ অবলম্বন করলেন এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য অন্য দিকে রইলেন। দেবতা এবং দানবদের মধ্যে তখন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল ; সেই যুদ্ধ তারকাময় নামে খ্যাত। অবশেষে ব্রহ্মা রুদ্র এবং শুক্রাচার্যকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করেন এবং তারাকে বৃহস্পতির হাতে সমর্পণ করেন।

এদিকে তারা আসন্নপ্রসবা হয়ে উঠেছিলেন। বৃহস্পতি সে-কথা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং তারাকে তিরস্কার করলেন। তারা তখন ইষীকা নামে ঘাসের বনে গিয়ে সেই গর্ভ ত্যাগ করলেন। ফলে এক পুত্রের জন্ম হল। নিজের রূপের দীপ্তিতে সেই সদ্যোজাত সন্তান শোভা পেতে লাগল। দেবতারা তখন তারাকে ঐ পুত্রের আসল পিতা কে জিজ্ঞেস করলেন। বার বার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তারা কোনো উত্তর দিলেন না। শেষে ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে তারা স্বীকার করলেন যে সেই পুত্র সোমের। ব্রহ্মা তখন সেই নবজাত সন্তানকে 'বুধ' নামে অভিহিত করলেন। পরবর্তী কালে এই বুধ ইলার সঙ্গে মিলিত হন ; ফলে পুরুরবা নামে তাঁদের এক যশস্বী পুত্র জন্মায়। এই পুরুরবা আবার স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে বিয়ে করেন। যাই হোক, এতক্ষণ ধরে আপনাদের সোমজন্মের কথা শোনালাম ; এবার সোমের বংশ পরম্পরার কথা বলছি শুনুন। এই পবিত্র কথা শুনলে ধনলাভ এবং আয়ুলাভ হয়, সমস্ত পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়।

—ব্রহ্মপুরাণে 'সোমোৎপত্তিকথন' নামে অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দশ

সোমের বংশপরম্পরা বর্ণনা প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—বুধের পুত্র পুরুরবা ছিলেন দানশীল, তেজস্বী, বীর এবং সত্যবাদী। তাঁর রূপে এবং গুণে আকৃষ্ট হয়ে স্বর্গীয় অপ্সরা উর্বশী তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছিলেন। তাঁরা কখনো চৈত্ররথ বনে, কখনো মন্দাকিনীর তটে, কখনো অলকায়, কখনো বিশালায়, কখনো নন্দন বনে, কখনো উত্তর কুরুদেশে, কখনো গন্ধমাদন পর্বতের পাদদেশে আবার কখনো বা উত্তর মেরুদেশে সুখে সময় কাটাতে লাগলেন। প্রয়াগ ছিল পুরুরবার রাজধানী। এই উর্বশীর গর্ভে পুরুরবার সাতটি পুত্র জন্মায় ; এদের নাম—আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু এবং বহ্বায়ু। এদের মধ্যে অমাবসুর পুত্রের নাম ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভ, তাঁর পুত্র সুহোত্র। সুহোত্রের স্ত্রী কেশিনী জহ্নু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই জহ্নু সর্বমেধ নামে এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। এঁর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং গঙ্গা এঁকে পতিরূপে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু জহ্নু তাতে সম্মত না হওয়ায় গঙ্গা তাঁর যজ্ঞভূমি জলপ্লাবিত করেন। গঙ্গার এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে জহ্নু তাঁকে নিঃশেষে পান করেন। মহর্ষিরা তখন গঙ্গাকে জহ্নুর কন্যারূপে কল্পনা করেন এবং জহ্নুর ক্রোধ প্রশমিত করেন। সে থেকে গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবী। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিয়ে করেন। যুবনাশ্বের অভিশাপে এই কাবেরীকে গঙ্গার অর্ধেক অংশ দিয়ে নির্মাণ করা হয়। কাবেরী নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। এই কাবেরীর গর্ভে জহ্নুর সুনন্দ নামে

এক পুত্র জন্মায়। সুনন্দের পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র কুশ। কুশের চার ছেলে—কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব এবং মূর্তিমান। এই কুশিক রাজা হওয়ার পর ইন্দ্রের মতো অমিতবলশালী পুত্রলাভের বাসনায় কঠোর তপস্যায় নিরত হন। কুশিক হাজার বছর ধরে তপস্যা করার পর ইন্দ্র স্বয়ং তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মান্তরে তাঁর নাম হয় গাধি। কুশিকের পত্নী পৌরকুৎসার গর্ভে এই গাধির জন্ম হয়। পরবর্তী কালে এই গাধির একটি গুণবতী কন্যা জন্মায়—তার নাম সত্যবতী। গাধিরাজ সত্যবতীকে শুক্রাচার্যের পুত্র ঋচীকের হাতে সম্প্রদান করেন।

দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ঋচীকের কোনো সন্তান উৎপন্ন না হওয়ার জন্য সত্যবতী মনে মনে খুব দুঃখিত ছিলেন। এদিকে শুক্রাচার্যের পত্নীও চাইছিলেন তাঁর আর একটি সন্তান হোক। সত্যবতীর অনুরোধে ঋচীক এক চরু প্রস্তুত করেন এবং সত্যবতীকে বলেন—দেখ, তোমাদের জন্য আমি চরু প্রস্তু করে রেখেছি ; তুমি এবং তোমার শাশুড়ী দুজনেই এই চরু ভক্ষণ করবে। ঐ চরু খাওয়ার ফলে তোমার শাশুড়ী এক বীরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজার জননী হবেন আর তুমি হবে শমগুণসম্পন্ন ধৃতিমান এক তপস্বীর জননী। এরপর ঋচীক তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন। এর কিছু দিন পর গাধিরাজ তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে সস্ত্রীক ঋচীকাশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। কথাপ্রসঙ্গে সত্যবতী ঋচীকের তৈরি করা চরু শাশুড়ীকে দিলেন, তিনিই ভাগ করে খেতে দেবেন এই অভিপ্রায় নিয়ে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সত্যবতীর জন্য নির্দিষ্ট চরু তাঁর শাশুড়ী খেয়ে ফেললেন, আর শাশুড়ীর জন্য নির্দিষ্ট চরু খেলেন সত্যবতী। সমস্ত ঘটনা যোগবলে ঋচীক বুঝতে পারলেন এবং সত্যবতীকে সমস্ত কথা জানালেন। সত্যবতী যখন ঋচীকের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে ক্রূরকর্মা এক সন্তানকে তিনি প্রসব করতে চলেছেন, তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে স্বামীর কাছে এই প্রার্থনা রাখলেন যাতে তাঁকে ঐ রকম পুত্রের জননী না হতে হয়। সত্যবতীর কথা শুনে ঋচীক তাঁকে জানালেন যে ভবিতব্যকে খণ্ডানোর ক্ষমতা তাঁর নেই। তা সত্ত্বেও সত্যবতী যখন আবার ঋচীকের কাছে এই আবেদন রাখলেন যে, যদি সত্যিই সে-রকম ক্রূরকর্মা পুত্র জন্মায় তবে তা যেন তাঁর পুত্র না হয়ে পৌত্ররূপে জন্মায়, তখন ঋচীক সম্মত হয়ে সেই ব্যবস্থাই করলেন।

যথাসময়ে সত্যবতী এক পুত্র প্রসব করলেন, এঁর নাম হল জমদগ্নি ; ভৃগুর বংশধর বলে ইনি ভার্গব নামেও পরিচিত। ইনি শমগুণসম্পন্ন তপস্বী। এই সত্যবতী পুণ্যবতী ছিলেন ; ইনি এখন কৌশিকী নদী নামে পরিচিত এবং প্রবাহিত হন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রেণুর কন্যা রেণুকার সঙ্গে এই জমদগ্নির বিয়ে হয়। রেণুকার গর্ভে জমদগ্নির একটি পুত্র জন্মায় ; ইনি পরশুরাম নামে বিখ্যাত। ইনি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়কুলকে ইনি সংহার করেন। কুশিকের পুত্র গাধি ; এই গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। ইনি ব্রহ্মর্ষি ছিলেন এবং বিশ্বরথ নামেও ইনি পরিচিত ছিলেন। বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র জন্মায়। এদের মধ্যে দেবশ্রবা এবং কতি প্রভৃতিদের নাম করা যেতে পারে। এই কতিই কাত্যায়নগণের জনক। বিশ্বামিত্রের শালবতী নামে অন্য এক পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভজাত পুত্রদের নাম—হিরণ্যাক্ষ, রেণু, রেণুক, সংকৃতি, গালব, মুদগল, মধুচ্ছন্দ, জয়, অষ্টক, কচ্ছপ, দেবল ও হারীত। কৌশিকের পুত্রদের মধ্যে পাণি, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, বাস্কল, লোহিত, যমদূত ও কারুষক প্রভৃতিদের নাম করা যেতে পারে। বিশ্বামিত্রের সন্তানদের মধ্যে শুনঃশেফই

বড়, শুনঃপুচ্ছ ছোট। এই শুনঃশেফই হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে কল্পিত হন। পরে দেবতারা তাঁকে মুক্ত করে বিশ্বামিত্রের কাছেই পাঠিয়ে দেন। দেবতারা দিয়েছিলেন এজন্য শুনঃশেফ 'দেবরাত' নামে অভিহিত হন। বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি সাতটি পুত্র এবং দৃষদ্বতী নামে আরো একজন পত্নী ছিলেন। এই পত্নীর গর্ভজাত সন্তান 'অষ্টক' নামে পরিচিত ; অষ্টকের পুত্র লৌহি। জহ্নুবংশের কথা শেষ হল, এবার আয়ুর বংশ বর্ণনা করব।

—ব্রহ্মপুরাণে 'সোমবংশ এবং অমাবসু বংশানুকীর্তন' নামে অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ এগারো

লোমহর্ষণ আয়ুর বৃত্তান্ত মুনিদের বলে চললেন--এই আয়ুর পাঁচটি পুত্র জন্মায়। এঁরা সবাই বীর ছিলেন। আয়ুর স্ত্রী প্রভা স্বর্ভানুর কন্যা। এই পাঁচজনের মধ্যে প্রথম জন্ম হয় নহুষের, পরে বৃদ্ধশর্মার, তারপর রম্ভ, রজি ও অনেনার জন্ম হয়। রাজা রজির একশো পাঁচটি ছেলে জন্মায়। এই বিশাল ক্ষত্রিয়বংশ 'রাজেয়' নামে প্রসিদ্ধ হয়। অন্যের কথা কি, স্বয়ং ইন্দ্রও এঁদের ভয় করতেন। পুরাকালে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হলে উভয় পক্ষই ব্রহ্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—আমরা আপনার কাছ থেকে যথাযথ ভাবে শুনতে চাই কে আমাদের মধ্যে জয়ী হবে। ব্রহ্মা তাদের বললেন, যুদ্ধে রাজা রজি যাদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করবেন তারাই জয়ী হবে। যেখানে রাজা রজি, সেখানেই থাকে ধৃতি এবং যেখানে ধৃতি, সেখানেই লক্ষ্মী বিরাজ করেন। ধৃতি ও লক্ষ্মী যেখানে বিরাজ করেন, সেখানে ধর্ম এবং জয়ও বিরাজ করেন। ব্রহ্মার কথা শুনে উভয় পক্ষই জয় কামনা করে রজিকে নিজের নিজের দলে টানবার চেষ্টা করলেন। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভার গর্ভে রজির জন্ম হয়। চন্দ্রবংশের তিনি একজন নাম করা রাজা। দেবতা এবং অসুরেরা আনন্দিত মনে রজির কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সবিনয়ে বললেন—আমাদের জয়ের জন্য আপনি আমাদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করুন। রজি উভয়পক্ষের প্রার্থনাই শুনলেন। নিজের খ্যাতি প্রচারের জন্য এবং স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি দেবপক্ষকে বললেন—শোন ইন্দ্র! আমি যদি আমার পরাক্রমে দৈত্যদের পরাজিত করে স্বর্গের ইন্দ্র হতে পারি, তবেই আমি যুদ্ধ করব। রজির কথা শুনে দেবতারা আনন্দিত মনে তাঁদের সম্মতি জানিয়ে বললেন—আপনি যা চান, আমরা সানন্দে তাই করব। আপনার সন্তুষ্টি বিধানে আমরা সর্বদা তৎপর। দেবপক্ষের কথা শোনার পর রজি সেই একই কথা দানবদের বললেন। কিন্তু অসুরেরা গর্বভরে রজির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তারা উদ্ধতভাবে রজিকে বলল—আপনার প্রস্তাব আমরা গ্রাহ্য করি না। প্রহ্লাদই আমাদের ইন্দ্র ; তাঁরই জন্য আমরা বিজয় কামনা করি। যদি ইচ্ছা হয়, আপনি এই যুদ্ধে আমাদের বিপক্ষেই থাকুন। রজি অসুরদের কথা শুনে বললেন--ঠিক আছে, তবে তাই হোক। তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হল। রজি তখন ইন্দ্র হবার আশায় অসুরদের নিহত করতে লাগলেন। তিনি অসুরদের সমূলে ধ্বংস করে দেবতাদের বিনষ্ট জয়লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। অসুরেরা বিনষ্ট হওয়ার পর দেবতাদের সঙ্গে স্বয়ং ইন্দ্র রজির কাছে এসে তাঁকে বললেন—আজ থেকে আমি আপনার পুত্র হলাম। আপনি এখন দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হলেন। আমি দেবেন্দ্র ছিলাম, আপনার পুত্র হলাম। আমি

নিজের কাজের মাধ্যমে খ্যাতিলাভ করব। দেবতাদের মায়ায় বঞ্চিত হয়ে রাজা রজি ইন্দ্রের কথায় সম্মত হলেন এবং ইন্দ্ররূপে বিরাজ করতে লাগলেন। কিছু কাল পরে রাজর্ষি রজি দেহত্যাগ করে স্বর্গে গেলেন। রজির মৃত্যুর পর তাঁর পাঁচশো ছেলে ইন্দ্রপদ লাভের জন্য একযোগে স্বর্গ আক্রমণ করলেন। কেবল স্বর্গ নয়, স্বর্গ এবং মর্ত্য এই উভয়ই তাঁরা অধিকার করে রাখলেন। ক্রমে রজিপুত্রেরা মোহাচ্ছন্ন ও বিলাসব্যসনে খুব আসক্ত হয়ে পড়লেন। শিষ্টাচার ও নীতিবোধ তাঁরা হারিয়ে ফেললেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁরা অশোভন আচরণ করতে লাগলেন। এই সব নিন্দিত কাজে রত হওয়ায় তাঁদের বীরত্ব একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। রাজ্য সম্পদও একে একে নষ্ট হতে লাগল। তখন সহজেই ইন্দ্র তাঁর প্রিয়স্থান স্বর্গ অধিকার করলেন। ভ্রষ্টাচারী রজির পুত্রেরা ইন্দ্রের হাতে নিহত হল। ইন্দ্রের এই রাজ্য হারানো এবং পুনরায় তা ফিরে পাওয়ার কথা যে শোনে, সে কখনো কোনো কষ্ট ভোগ করে না।

লোমহর্ষণ সোমবংশের কথা বলে চললেন--রজির কথা এতক্ষণ আপনাদের শোনালাম ; এবার অন্যদের কথা বলি। রম্ভের কোনো পুত্র ছিল না। তাই এখন অনেনার বংশকথা বলছি। অনেনার পুত্র প্রতিক্ষত্র রাজা হয়েছিলেন ; তিনি যশস্বী পুরুষ। তাঁর পুত্র সঞ্জয়। সঞ্জয়ের পুত্র জয়, জয়ের পুত্র বিজয়। বিজয়ের যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে তার নাম রতি। রতির পুত্র হর্যত্বত, হর্যত্বতের পুত্র সহদেব। তাঁর পুত্র নদীন। এই নদীন অতি ধার্মিক রাজা ছিলেন। এঁর পুত্র জয়ৎসেন ; জয়ৎসেনের পুত্র সংকৃতি। সংকৃতিরই পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। ইনি পূর্বপুরুষ অনেনার মতো খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্র। সুনহোত্রের তিনজন পরম ধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করে ; তাদের নাম--কাশ, শল ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক। শুনকের পুত্র শৌনক। এই শুনক থেকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র--এই চার বর্ণের পুত্রই উৎপন্ন হয়েছিল। শলের পুত্র আর্ষ্টিষেণ, আর্ষ্টিষেণের পুত্র কাশ্যপ। কাশের পুত্র রাজা কাশিপ। কাশিপের পুত্র দীর্ঘতপা ; দীর্ঘতপার পুত্র ধনুঃ, ইনি ধন্বন্তরি নামে বিখ্যাত হন। দীর্ঘতপা দীর্ঘ দিন ধরে তপস্যা করেন। সেই তপস্যার ফলেই তাঁর বৃদ্ধ বয়সে দেবতা ধন্বন্তরি পৃথিবীতে এসে তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ধন্বন্তরি মহারাজ কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন ; তিনি সব রকমের রোগ সারিয়ে তুলতে সক্ষম। তিনি ভরদ্বাজের কাছ থেকে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করে পরে তা আট ভাগে বিভক্ত করেন এবং শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেন। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান নামে বিখ্যাত। তাঁর পুত্র বলবান ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র দিবোদাস ; ইনি একজন বিশিষ্ট প্রজাপালক রাজা ছিলেন। এঁর রাজধানী ছিল পবিত্র বারাণসী। একবার ক্ষেমক নামে এক রাক্ষস এসে বারাণসী জনশূন্য করে ফেলে। মহাত্মা নিকুম্ভ একবার এ রকম অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, বারাণসী এক হাজার বছর ধরে জনশূন্য হয়ে থাকবে। দিবোদাস যখন এই অভিশাপের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর রাজধানী বারাণসী থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিলেন। গোমতী নদীর তীরে দিবোদাস তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। দিবোদাস পূর্বে বারাণসীতে যে রাজধানী নির্মাণ করেন, তা ভদ্রশ্রেণ্য নামে এক রাজার অধিকারে ছিল। দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্য রাজার একশো ধনুর্ধারী পুত্র নিহত করে ওইখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন ; তাছাড়া ভদ্রশ্রেণ্যের সমস্ত রাজ্যই তিনি অধিকার করে নেন। দুর্দম নামে ভদ্রশ্রেণ্যের আরেকজন বিখ্যাত পুত্র ছিল। দিবোদাস তাকে বালক ভেবে ঘৃণার সঙ্গে

পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে সেই দুর্দম হৈহয়রাজ্য অধিকার করে রাজা হলেন এবং দিবোদাসের কাছ থেকেও তাঁর পৈতৃক রাজ্য নিয়ে নেন। দিবোদাসের স্ত্রীর নাম দৃষদ্বতী; তাঁর এক পুত্র জন্মায়—নাম প্রতর্দন। প্রতর্দন বালক বয়সেই পিতার নষ্ট রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করেন। প্রতর্দনের দুটি পুত্র জন্মায়। তাদের নাম—বৎস ও ভর্গ। বৎসের পুত্র অলর্ক, অলর্কের পুত্র সন্নতি। অলর্ক সত্যবাদী এবং ব্রহ্মজ্ঞানী। প্রাচীন ঋষিরা অলর্কের সম্বন্ধে এ রকম কথা বলে থাকেন যে, রাজা অলর্ক কাশিপকুলের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে ষাট হাজার ষাট শত বছর পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন। তিনি লোপামুদ্রার অনুগ্রহে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেন। অলর্ক রূপবান এবং অশেষ গুণবান ছিলেন। তাঁর রাজ্য ছিল বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। নিকুম্ভের অভিশাপের সময় উত্তীর্ণ হলে পর তিনি ক্ষেমক রাক্ষসকে হত্যা করে পুনরায় বারাণসীতে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা সন্নতির আরেক পুত্র সুনীথ। সুনীথের পুত্র ক্ষেম; তাঁর পুত্র কেতুমান নামে পরিচিত। কেতুমানের পুত্র সুকেতু, সুকেতুর পুত্র ধর্মকেতু, ধর্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু। সত্যকেতুর বিভু নামে একটি পুত্র হয়। বিভুর পুত্র আনর্ত; আনর্তের পুত্র সুকুমার। সুকুমারের পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁর পুত্র বেণুহোত্র। বেণুহোত্রের একটি পুত্র জন্মায়; তার নাম ভার্গ। এঁরা সবাই ধার্মিক এবং প্রজাপালক রাজা ছিলেন। বৎসের নামে বৎসভূমি এবং ভার্গের নামে ভার্গভূমির উৎপত্তি হয়। অঙ্গিরা, ভার্গব ও কাশ্যপবংশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বিস্তৃত বংশ কথা আপনাদের শোনালাম। এর পর আমি নহুষের কথা আপনাদের শোনাব; আপনারা ধৈর্য ধরে শুনুন।

—'সোমবংশে বৃদ্ধক্ষত্রপ্রসূতিনিরূপণ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায়ঃ বারো

নহুষের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ মুনিদের বলতে আরম্ভ করলেন—পিতৃ নামক রাজার কন্যা বিরজার সঙ্গে মহামতি নহুষের বিবাহ হয়। বিরজা ইন্দ্রের মতো তেজস্বী ছ'টি পুত্রের জন্ম দেন। তাঁদের নাম—যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, যাতি ও সুযাতি। এঁদের মধ্যে যদিও যতিই বড়, তাহলেও সবার ছোট যযাতিই রাজা হয়েছিলেন। ককুৎস্থের কন্যার সঙ্গে যযাতির বিয়ে হয়েছিল। যতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যযাতিই পৃথিবী জয় করেছিলেন। তিনি পরে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে এবং রাজা বৃষপর্বের মেয়ে শর্মিষ্ঠাকেও স্ত্রীরূপে লাভ করেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু নামে দুটি পুত্র জন্মায় এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিনটি পুত্র জন্মায়। শুক্রাচার্য প্রীত হয়ে যযাতিকে এক প্রদীপ্ত স্বর্ণময় রথ দান করেন। ঐ রথে এমন অশ্ব-সকল যুক্ত ছিল যে, সেই অশ্বগুলোর গতিবেগ ছিল মনের গতিবেগের মতো। সেই রথ সমস্ত কাজই সম্পন্ন করতে পারত। যযাতি সেই রথে আরোহণ করে ছয় রাত্রির মধ্যে এই পৃথিবী জয় করেছিলেন এবং বহু বছর ধরে দেবতা ও দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। পরে পুরুবংশের সব রাজারাই এই রথ ব্যবহার করেন। কুরুবংশধর পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের পরবর্তী সময়ে সেই রথ গর্গের অভিশাপে নষ্ট হয়ে যায়। একবার রাজা জনমেজয় গর্গের একটি শিশু পুত্রকে মেরে ফেলেন, তাতে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। সেই রাজর্ষির সমস্ত শরীর থেকে লোহার গন্ধ বের হতে থাকে। তিনি অনেক যত্ন

করেও কোথাও শান্তি পান নি। নগরবাসী এবং গ্রামবাসীরাও পর্যন্ত তাঁকে পরিত্যাগ করল। তখন তিনি শৌনকের শরণাপন্ন হলেন। জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ শৌনক রাজা জনমেজয়ের পবিত্রতার জন্য তাঁকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়ে নেন। সেই যজ্ঞের শেষে রাজার শরীর থেকে লোহার গন্ধ উবে যায়। সেই রথ চেদিপতি বৃহদ্রথ ইন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বৃহদ্রথের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এই রথ তাঁর ছেলে জরাসন্ধের করায়ত্ত হয়। ভীমসেন জরাসন্ধকে বধ করে সেই রথ প্রীতি-উপহার হিসেবে বাসুদেব কৃষ্ণকে দান করেন।

রাজা যযাতি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করে পরে নিজের রাজ্য পুত্রদের পাঁচভাগে ভাগ করে দিলেন। পূর্বদিকের রাজ্য দিলেন বড় ছেলে যদুকে, মধ্য ভাগ পুরুকে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকের রাজ্য তুর্বসুকে এবং উত্তর ও পশ্চিম দিকের রাজ্য দিলেন দ্রুহ্য ও অনুকে। তাঁরা আজো সেই বিভাগ মেনে চলছেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে পালন করছেন। এই রাজাদের বিশদ বিবরণ আমি আপনাদের পরে শোনাব। এখন যযাতির কথাই বলি। বহুদিন দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করার পর যযাতি কালক্রমে বৃদ্ধ হলেন। নিজের অস্ত্রশস্ত্র তিনি পরিত্যাগ করলেন। ছেলেদের হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করতে মনস্থ করলেন। তিনি তখন বড় ছেলে যদুকে ডেকে বললেন—যদু! তুমি আমার এই বার্ধক্যভার গ্রহণ কর। আমি বিশেষ একটি কাজের জন্য তোমাকে আমার বার্ধক্যভার দিয়ে যুবক হয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করব। পিতার এই কথা শুনে যদু তাঁকে বললেন—পিতা! আমি কোনো এক ব্রাহ্মণকে কোনো একটি অনির্দিষ্ট ভিক্ষা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সে কাজ সম্পন্ন না করে, প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ রেখে তো আমি আপনার বার্ধক্যভার গ্রহণ করতে পারি না। তাছাড়া অকালে বার্ধক্য বরণ করতে আমি চাইও না। বার্ধক্যে খাওয়া ঠিক মতো হয় না, বিভিন্ন বস্তুর যথাযথ আস্বাদন গ্রহণ হয় না এবং কোনো কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্য আসে না। আমি আপনার বার্ধক্যভার গ্রহণ করতে অক্ষম। আপনার অন্যান্য পুত্রদের বলুন; তারা তো আপনার প্রিয়তর। যদুর কথা শুনে যযাতি ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি যদুকে তিরস্কার করে বললেন—তুমি যখন গুরুজনকেও অবজ্ঞা কর, তখন তোমার ধর্ম, ন্যায় ও নীতিবোধের কোনো মূল্যই নেই। ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতি যদুকে অভিশাপ দিলেন—তোমার পুত্র কন্যাগণ কখনোই রাজ্যলাভ করতে পারবে না। যযাতি তারপর দ্রুহ্য, তুর্বসু ও অনুকে তাঁর বার্ধক্যভার গ্রহণ করতে বললে তাঁরাও একই ভাবে পিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। যযাতি তাদেরও অভিশাপ দিলেন। তারপর সবার শেষে পুরুকে ডেকে বললেন—তুমি যদি আমার বার্ধক্য গ্রহণ কর তাহলে তোমার তারুণ্য নিয়ে আমি পৃথিবীর ভোগ্যবস্তুসমূহ আস্বাদন করতে পারব। পুরু পিতার প্রস্তাবে তাঁর পূর্ণ সম্মতি জানিয়ে বার্ধক্য বরণ করলেন। যযাতি পুরুর তারুণ্য গ্রহণ করে বিষয় ভোগের চরম সীমা পাওয়ার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি বিশ্বাচী নামক সুন্দরী এবং যৌবনবতী রমণীর সঙ্গে চৈত্ররথ বনে অনেক দিন কাটালেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর কামনার শান্তি হল না। তিনি তখন পুরুর কাছে এসে নিজের বার্ধক্য, যা তিনি আগে ন্যস্ত করেছিলেন, পুনরায় গ্রহণ করলেন। বস্তুর সংস্পর্শে এসে কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নেয় তেমনই রাজা যযাতি পর্যাপ্ত বিষয় ভোগে বিরক্ত হয়ে তাঁর কামনা-বাসনার রাশ টেনে ধরলেন। তিনি বলেছিলেন যে, কামনার বস্তু উপভোগের মাধ্যমে কামনার কখনো নিবৃত্তি হয় না। আগুনে ঘি দিলে

আগুন যেমন ক্রমশই বাড়তে থাকে, তেমনই কামনার বস্তু উপভোগ করতে থাকলে কামনাও ক্রমশই বাড়তে থাকে। পৃথিবীতে যত শস্য, যত ধনরত্ন, যত স্ত্রীলোক আছে সে-সব একজনের ভোগের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়; সুতরাং সে-সবের জন্য বেশি চিন্তা করার এবং সে-সবের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়ারও কোনো যুক্তি নেই। কোনো ব্যক্তি তখনই ব্রহ্মের কাছাকাছি পেঁছিতে পারে, যখন সে তার কর্ম, মন এবং এমন কি বাক্যের দ্বারাও কারুর প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করে না। যখন কারো কাছ থেকে ভয় পাওয়ার মতো কিছু থাকে না এবং অন্যকে ভয় পাওয়ানোর মতো কিছু থাকে না, যখন ইচ্ছা বা দ্বেষ কোনো কিছুই থাকে না, তখনই ব্রহ্মের কাছাকাছি পেঁছিনো যায়। দুষ্ট লোকেরা যাকে ত্যাগ করতে পারে না, নিজের আধার প্রায় নষ্ট হয়ে গেলেও যা নিজে কখনোই বিনষ্ট হয় না, যাকে মানুষের এক ভয়ঙ্কর রোগ বলে মনে করা হয়, সেই তৃষ্ণা যিনি পরিত্যাগ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত অর্থে সুখ লাভ করতে পারেন। বৃদ্ধ ব্যক্তির চুল পেকে যায়, দাঁত পড়ে যায়, কিন্তু ধনসম্পদের জন্য আকাঙ্খা এবং বেঁচে থাকার আকাঙ্খা কোনো দিনই বুড়িয়ে যায় না বা ফুরিয়ে যায় না। বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা বা আকাঙ্খা নষ্ট হয়ে গেলে যে সুখ হয়, পৃথিবীতে যা কিছু কামনাজাত সুখ এবং স্বর্গীয় সুখলাভ তা ওই সুখের ষোলো ভাগের এক ভাগও নয়।

তারপর রাজর্ষি যযাতি বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বনে চলে গেলেন। তিনি অনেক দিন ধরে বনে থেকে তপস্যা করেছিলেন। পরে হিমালয়ের পবিত্র ভৃগু পর্বতে তপস্যা করে অনশনে দেহত্যাগ করলেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। তাঁর বংশধর পাঁচজন রাজর্ষি ছিলেন; সূর্যের কিরণের মতো তাঁরাই এই পৃথিবী জুড়ে রয়েছেন। বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হরির বংশকথা এরপর আমি আপনাদের শোনাব; এই বংশ যদু-বংশ নামে পরিচিত। যে প্রতি দিন যযাতির এই কাহিনী শোনে, সে আয়ুষ্মান ও কীর্তিমান হয়ে থাকে।

—'সোমবংশ যযাতিচরিত নিরূপণ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ তেরো

লোমহর্ষণ যদুবংশের কথা বলতে উদ্যত হলে নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিরা এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁকে অনুরোধ করলেন—আমরা পুরু, দ্রুহ্য, অনু, যদু ও তুর্বসুর বংশ বিবরণ আলাদা আলাদা ভাবে শুনতে চাই; আপনি দয়া করে তাদের কাহিনী শোনান। ঋষিদের অনুরোধের উত্তরে লোমহর্ষণ বললেন—তাহলে প্রথমেই আমি মহাত্মা পুরুর বংশ-কথা বিস্তৃত ভাবে আপনাদের শোনাচ্ছি। পুরু পিতার জরা ভার বহন করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এই পুরুর সুবীর নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুবীরের পুত্র মনস্যু; মনস্যুর পুত্র অভয়দ। অভয়দের যে পুত্র জন্মায় তার নাম সুধন্বা; সুধন্বার পুত্র সুবাহু। সুবাহুর পুত্রের নাম রৌদ্রাশ্ব; এই রৌদ্রাশ্বের দশ ছেলে ও দশ মেয়ে জন্মায়। তাদের মধ্যে পুত্রদের নাম—দশার্ণেয়ু, কৃকণেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, ঋচেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, ধনেয়ু ও বনেয়ু। কন্যাদের নাম—ভদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, খলদা, নলদা, সুরসা, গোচপলা ও রত্নকূটা। অত্রিবংশে প্রভাকর নামে এক ঋষি ছিলেন; তাঁরই সঙ্গে রৌদ্রাশ্বের ভদ্রা প্রভৃতি দশ মেয়ের বিয়ে হয়। ভদ্রার গর্ভে স্বয়ং সোম প্রভাকরের

পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাকালে রাহু নামক দৈত্য যখন সূর্যকে আহত করে, তখন সূর্য পৃথিবীতে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। সূর্যের পড়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীতে ঘন অন্ধকার নেমে আসে ; প্রভাকর ঋষিই তখন সূর্যের দীপ্তি বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে পতন থেকে রক্ষা করেন। সূর্যকে প্রায় পড়ে যেতে দেখে প্রভাকর তাঁকে বলেছিলেন—তোমার মঙ্গল হোক। তাঁর এই কথাতেই কাজ হয়। সূর্য নিজের জায়গায় থেকে গেলেন। সেই প্রভাকর থেকেই সব গোত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মর্ষি প্রভাকর তাঁর দশ স্ত্রীর গর্ভেই ক্রমান্বয়ে দশ পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁরা সকলেই মহান, বলশালী এবং কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। এই পুত্রেরাই গোত্রকর, ঋষি, বেদপারগ ও আত্রেয় নামে পরিচিত। রৌদ্রাশ্বের দশ ছেলের মধ্যে কক্ষেয়ু বড়। তাঁর তিনটি ছেলে হয়—সভানর, চাক্ষুষ ও পরমনু্য। সভানরের পুত্র আবার কালানল। কালানলের পুত্র সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয়ের যে পুত্র জন্মায় তার নাম পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়। জনমেজয় রাজা হয়েও ঋষির মতো ছিলেন। এঁর পুত্র মহাশাল। দেবসমাজে এই মহাশালের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। এঁর ছেলে মহামনা। দেবতারা পর্যন্ত এই মহামনাকে সম্মান করতেন। মহামনার যে দুজন পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাদের নাম উশীনর এবং তিতিক্ষু। উশীনর ধর্মজ্ঞ এবং তিতিক্ষু ছিলেন মহাবলশালী। উশীনরের পাঁচ স্ত্রী—নৃগা, কৃমি, নবা, দর্বা ও দৃষদ্বতী। এঁরা সবাই রাজর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। উশীনর দীর্ঘদিন তপস্যা করার পর বৃদ্ধ বয়সে ঐ পাঁচ স্ত্রীর গর্ভে তাঁর পাঁচটি পুত্র জন্মায়। নৃগার পুত্র নৃগ, কৃমির পুত্র কৃমি, নবার পুত্র নব, দর্বার পুত্র সুব্রত এবং দৃষদ্বতীর পুত্র শিবি। শিবির শিবিগণ, নৃগের যৌধেয়গণ, নবের নবরাষ্ট্র, সুব্রতের অম্বষ্ঠা এবং কৃমির কৃমিলা পুরী পুরাণে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

এবার আমি আপনাদের শিবির পুত্রদের কথা বলব। শিবির চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে—বৃষদর্ভ, সুধীর, কেকয় এবং মদ্রক। এদের চারজনের নামেই চারটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। এবার তিতিক্ষুর সন্তান-সন্ততিদের কথা আপনাদের শোনাচ্ছি। তিতিক্ষু রাজত্ব করতেন পূর্বদিকে। তাঁর পুত্র উষদ্রথ ; ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। উষদ্রথের ফেন নামে এক পুত্র হয়। ফেনের পুত্র সুতপা, সুতপার পুত্র বলি। এই বলি মহাযোগী ছিলেন। বলির পাঁচটি পুত্র হয় ; তাদের নাম—অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ ও বঙ্গ। এদের মধ্যে অঙ্গ বড় এবং বঙ্গ ছোট। এঁরা 'বালেয়' নামে বিখ্যাত ছিলেন। বালেয় নামক ব্রাহ্মণেরাও বলিরাজার বংশধর বলে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুরাকালে ব্রহ্মা বলির উপর সন্তুষ্ট হয়ে এ রকম বর দিয়েছিলেন—বলি ! তুমি যোগশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করবে, যুগান্ত পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকবে। ধর্মে তোমার অসাধারণ তত্ত্বদৃষ্টি জন্মাবে, যুদ্ধে তোমাকে কেউই পরাজিত করতে পারবে না। তুমি চার প্রকার বর্ণ ও আশ্রমের সৃষ্টি করবে। ব্রহ্মার বরে বহুকাল ধরে নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করে বলি যুগান্তে দেহত্যাগ করে স্বর্গে গেলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের নামে পাঁচটি রাজ্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাদের মধ্যে এখন অঙ্গরাজের বংশ-কথা আপনাদের শোনাচ্ছি। দধিবাহন নামে অঙ্গরাজের এক পুত্র ছিলেন ; ইনি 'রাজেন্দ্র' নামেও পরিচিত। এই দধিবাহনের একটি পুত্র জন্মায়, তার নাম দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্মরথ ; ইনি ইন্দ্রের মতোই বীর ছিলেন। ধর্মরথের পুত্রের নাম চিত্ররথ। ইনি একবার কালঞ্জর পর্বতে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইন্দ্র সেই যজ্ঞে সোমপান করেছিলেন। চিত্ররথের পুত্র দশরথ। ইনি লোমপাদ নামে পরিচিত। শান্তা নামে এঁর একটি কন্যা জন্মায়। দশরথের পুত্র চতুরঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির অনুগ্রহে দশরথের এই পুত্র জন্মায়। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। পৃথুলাক্ষের পুত্র চম্প। রাজা চম্পের রাজধানী 'চম্পা' নামে পরিচিত; পূর্বে এর নাম ছিল মালিনী। পূর্ণভদ্রের অনুগ্রহে চম্পরাজের হর্য্যাঙ্গ নামে এক পুত্র হয়। ইনি মন্ত্রবলে বৈভাণ্ডকি নামে ঐরাবতের মতো বলবান একটা হাতীকে পৃথিবীতে নামান। এই হাতীই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ বাহন। হর্য্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ; ভদ্ররথের পুত্র বৃহৎকর্মা। তাঁর পুত্র বৃহদর্ভ, এঁর পুত্র বৃহন্মনার পুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথ যে পুত্রের জন্ম দেন, তার নাম দৃঢ়রথ। দৃঢ়রথের পুত্র বিশ্বজয়ী জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র বৈকর্ণ; তাঁর পুত্র বিকর্ণ। বিকর্ণের একশো পুত্র জন্মায়। অঙ্গবংশের এই রাজারা সবাই সত্যব্রত. মহান ও মহাবীর ছিলেন।

এবার আমি আপনাদের রৌদ্রাশ্বের পুত্র রাজা ঋচেয়ুর বংশ বিবরণ শোনাচ্ছি। ঋচেয়ুর পুত্র মতিনার। মতিনারের তিনজন পুত্র জন্মায়—বসুরোধ, প্রতিরথ ও সুবাহু। এই পুত্রগণ সকলেই সত্যবাদী. ধর্মজ্ঞ, বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। পূর্বে আমি ইলার কথা বলেছি। এই ইলার বিয়ে হয় রাজা তংসুর সঙ্গে। তংসুর পুত্র রাজর্ষি ধর্মনেত্র। ধর্মনেত্রের স্ত্রীর নাম উপদানবী। উপদানবী দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারটি ছেলের জন্ম দেয়। এদের মধ্যে দুষ্মন্তের একটি পুত্র জন্মায়; তার নাম ভরত। ভরত প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন; এঁর অন্য নাম সর্বদমন। ইনি রাজচক্রবর্তীরূপে পরবর্তীকালে পরিচিত হন। শকুন্তলা ছিলেন এই ভরতের মা। এই ভরতের নাম অনুসারেই আমাদের দেশের নাম 'ভারত' হয়েছে। মায়েদের ক্রোধে ভরতের ছেলেরা মারা গিয়েছিল—এ কথা আমি আগেই আপনাদের বলেছি। অঙ্গিরার পুত্র ভরদ্বাজ রাজা ভরতকে দিয়ে এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। পূর্বে পুত্র জন্ম বিতথ বা নিষ্ফল হয়েছিল। এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার পর যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ভরত তার নাম রাখেন বিতথ। বিতথের জন্মের পরই রাজা ভরত স্বর্গারোহণ করেন। বিতথের রাজ্যাভিষেক হওয়ার পর ভরদ্বাজও বনে চলে যান। যথাসময়ে বিতথের সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল নামে পাঁচটি পুত্র জন্মায়। তাদের মধ্যে সুহোত্রের কালিক ও গৃৎসমতি নামে দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। গৃৎসমিতর যে সব পুত্র জন্মায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ. কেউ কেউ ক্ষত্রিয়, আর কেউ কেউ বৈশ্য হয়েছিল। কাশিকের পুত্র কাশেয়। কাশেয়ের পুত্র ধন্বন্তরি; ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান। তাঁর পুত্র ভীমরথ. ভীমরথের পুত্র দিবোদাস। ইনি সমস্ত ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করেন; বারাণসী ছিল এঁর রাজধানী। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন। প্রতর্দনের পুত্র বৎস ও ভার্গব। রাজপুত্র অলর্ক এবং রাজা সম্মতিমান—এঁরা হৈহয় রাজার রাজ্য কেড়ে নেন। রাজা দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন; ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্মদ নিজের পৈতৃক রাজ্য দিবোদাসের কাছ থেকে উদ্ধার করেন। দিবোদাস এই দুর্মদকে বালক ভেবে উপেক্ষা করেছিলেন। ভীমরথের অষ্টারথ নামে আরেকজন পুত্র জন্মায়। অষ্টারথ পূর্বোক্ত বালকের রাজ্য অপহরণ করে। কাশিরাজ অলর্ক ব্রহ্মজ্ঞ এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। ইনি ষাটহাজার বছর ও ষাটশো বছর ধরে কাশিবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে রাজত্ব করেছিলেন। লোপামুদ্রার অনুগ্রহে ইনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন। পরে ইনি ক্ষেমক নামক রাক্ষসীকে বধ করে সুন্দরী বারাণসীকে পুনরায় স্ব মহিমায় স্থাপন করেন। এঁর পুত্র ক্ষেমক, ক্ষেমকের পুত্র বর্ষকেতু, বর্ষকেতুর পুত্র প্রজাপতি বিভু, বিভুর পুত্র আনর্ত; তাঁর পুত্র সুকুমার। সুকুমারের পুত্র সত্যকেতু,

তাঁর পুত্র মহারথ। বৎস থেকে বৎসভূমি এবং ভর্গ থেকে ভর্গভূমির উৎপত্তি হয়। এই যাঁদের কথা আপনাদের বললাম এঁরা সবাই অঙ্গিরার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা সবাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়েছিলেন।

এবার আজমীঢ় বংশের কথা শুনুন। সুহোত্রের বৃহৎ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। বৃহতের তিনটি পুত্র জন্মায়—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের তিন স্ত্রী—নালী, কেশিনী ও ধূমিনী। কেশিনীর গর্ভে জহ্নুর জন্ম হয়। ইনি সর্বমেধ নামে এক মহাযজ্ঞ করেন। গঙ্গা এঁকে পতিরূপে বরণ করার জন্য বিনীতভাবে তাঁর প্রার্থনা জানান। জহ্নু গঙ্গার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। গঙ্গা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর যজ্ঞভূমি প্লাবিত করেন। গঙ্গার এ রকম আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে জহ্নু তাঁকে বললেন—আমি পৃথিবীতে তোমার বিস্তার সংকুচিত করার জন্য তোমার জলরাশি পান করব। তোমার এই দুর্ব্যবহারের সমুচিত ফল তুমি অচিরেই পাবে। জহ্নু গঙ্গাকে ক্রোধবশে যখন পান করে ফেললেন দেবতারা তখন গঙ্গাকে তাঁর কন্যারূপে কল্পনা করলেন। জহ্নু যুবনাশ্বের কাবেরী নামক কন্যাকে বিয়ে করেন। জহ্নুর প্রিয়পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব; তাঁর পুত্র কুশিক। ইনি মৃগয়া করতে ভালোবাসতেন। বনচর পহ্নবেরা বিপুলভাবে এঁর সংবর্ধনা করে। পরে ইনি ইন্দ্রের মতো পুত্র কামনা করে তপস্যা করেন; তাতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ইন্দ্র তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুশিকের এই পুত্র গাধি নামে বিখ্যাত হন; ইনি রাজা হয়েছিলেন। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র; বিশ্বামিত্রের পুত্র অষ্টক। এই অষ্টকের যে পুত্র জন্মায় তার নাম লৌহি। জহ্নুর এই বংশকথা আমি আগেই আপনাদের বলেছি।

এখন অজমীঢ় বংশের কথা আপনাদের শোনাচ্ছি। অজমীঢ়ের স্ত্রীর নাম নীলা। নীলা যে পুত্রের জন্ম দেন তার নাম 'সুশান্তি'; সুশান্তির পুত্র পুরুজাতি। পুরুজাতির যে পুত্র জন্মায় তার নাম বাহ্যাশ্ব। বাহ্যাশ্বের পাঁচটি পুত্র জন্মায়; তাঁদের নাম—মুদ্‌গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর এবং কৃমিলাশ্ব। যে রাজ্যে এঁরা রাজত্ব করতেন তা পঞ্চাল নামে পরিচিত। এই রাজ্য সুসমৃদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে মুদ্‌গলের মৌদ্‌গল্য নামে একটি পুত্র জন্মায়। মৌদ্‌গল্যের স্ত্রীর নাম ইন্দ্রসেনা। ইন্দ্রসেনা ব্রধ্নশ্ব নামে একটি পুত্রের জন্ম দেয়। সৃঞ্জয়ের পুত্র পঞ্চজন; পঞ্চজনের পুত্র সোমদত্ত। সোমদত্তের যে পুত্র জন্মায় তার নাম সহদেব। সহদেবের পুত্র সোমক। অজমীঢ় বংশ যখন প্রায় বিলুপ্তির মুখে তখন সোমকের জন্ম হয়। সোমকের পুত্র জন্তু। জন্তুর একশো ছেলে হয়; তাদের মধ্যে বড়র নাম পৃষত। পৃষতের পুত্র ইতিহাসখ্যাত দ্রুপদ। রাজা অজমীঢ়ের রানী ধূমিনীর অনেক দিন পর্যন্ত কোনো সন্তান হয় নি। সে জন্য তিনি পুত্র কামনা করে দীর্ঘ দিন ধরে কঠোর তপস্যা করেন। এই ধূমিনী ছিলেন সৌভাগ্যবতী, সাধ্বী এবং উচ্চ বংশে এঁর জন্ম হয়। ধূমিনী এক সময় যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি দিয়ে যজ্ঞকুণ্ডের কাছেই কুশের বিছানায় শুয়ে আছেন, এমন সময় রাজা অজমীঢ় এসে তাঁর সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হন। এর ফলে ধূমিনীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মায়; তার নাম ঋক্ষ। ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ, সম্বরণের পুত্র কুরু। এই কুরু পৃথিবী পরিভ্রমণকালে প্রয়াগ অতিক্রম করে কুরুক্ষেত্র নামে এক পুণ্যস্থান আবিষ্কার করেন। কুরুক্ষেত্র পবিত্র এবং সুন্দর। কুরুর বিশাল বংশ তাঁরই নাম অনুসারে 'কৌরব' নামে অভিহিত হয়। কুরুর চারটি পুত্র জন্মায়—সুধন্বা, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও অরিমেজয়। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। এঁরা সবাই বলবান এবং সৌভাগ্যবান। জনমেজয়ের

দুই পুত্র—সুরথ ও মতিমান। সুরথের পুত্র বিদুরথ। বিদুরথের পুত্র ঋক্ষ। সোমবংশে ঋক্ষ নামে দুজন, পরীক্ষিৎ নামে দুজন, ভীমসেন নামে তিনজন এবং জনমেজয় নামে দুজন রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় ঋক্ষের ভীমসেন নামে এক পুত্র জন্মায়। ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ; প্রতীপের তিনটি পুত্র হয়। এদের নাম—শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক। এদের মধ্যে শান্তনুই বড় এবং সবার সেরা। এঁরই পুত্র ভীষ্ম, ইতিহাসে যার নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। বাহ্লিকের পুত্র সোমদত্ত। সোমদত্তের তিনটি পুত্র জন্মায়—ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। দেবাপি ছিলেন দেবতাদের আচার্য। মহাত্মা চ্যবনের কৃতক নামে একটি পুত্র জন্মায়; এই কৃতক দেবাপির খুব প্রিয় ছিল।

এবার শান্তনুর বংশ-কথা আপনাদেব শোনাচ্ছি। দেবনদী গঙ্গা শান্তনুকে পতিরূপে বরণ করেন। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর যে পুত্র জন্মায় তার নাম দেবব্রত। দেবব্রত পাণ্ডবদের পিতামহ এবং তিনি ভীষ্ম নামে পরিচিত। শান্তনুর আরেক স্ত্রীর নাম কালী কালীর গর্ভে শান্তনুর আরেকটি পুত্র জন্মায়, তার নাম বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তখন শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে বৈমাত্রেয় ভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকার সঙ্গে মিলিত হন। তার ফলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিনটি পুত্র জন্মায়। ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী। ইনি শত পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন বড়। পাণ্ডুর পুত্র ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের স্ত্রী সুভদ্রা যে পুত্রের জন্ম দেন, তার নাম অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের স্ত্রী কাশ্যা। কাশ্যার গর্ভে পরীক্ষিতের দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে; এদের নাম চন্দ্রাপীড় এবং সূর্যাপীড়। চন্দ্রাপীড়ের একশত পুত্র জন্মায়। এদের মধ্যে বড় সত্যকর্ণ। ইনি হস্তিনাপুরে এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সত্যকর্ণের পুত্র শ্বেতকর্ণ; এঁর কোনো সন্তান হয় নি। সেজন্য ইনি রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যান। এঁর স্ত্রী মালিনী ছিলেন যদুবংশের অন্যতম রাজা সুবাহুর মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে বনে যেতে যেতে পথেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হয়। পথের মধ্যেই তিনি যে পুত্র সন্তান প্রসব করেন, সে দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। মালিনী এই নবজাতককে পথের মধ্যে ফেলেই রাজার পিছন পিছন বনে চলতে লাগলেন। মাতৃপরিত্যক্ত এই নবজাতক গিরিকুঞ্জের মধ্যে কাঁদতে লাগল। শ্রবিষ্ঠার দুজন ছেলে পৈপ্পলাদি ও কৌশিক সেই শিশুকে অসহায় দেখে দয়াবশে তাকে নিয়ে আগে জলে স্নান করিয়ে দিলেন এবং পরে তার শরীরের দু'পাশ শিলাতলে পিষ্ট করতে লাগলেন। এ রকম করার ফলে সেই শিলাতল রক্তে রাঙা হয়ে গেল। পাথরে ঘষার ফলে ওই শিশুর দেহ ছাগলের মতো কালো হয়ে গেল। সেজন্য ওই শিশু 'অজপার্শ্ব' নামে পরিচিত। ঘটনাচক্রে ঐ অজপার্শ্ব রেমকের বাড়িতে প্রতিপালিত হতে থাকলেন। দুজন ব্রাহ্মণ তাঁকে পালন করতেন। রেমকের বাড়িতে তিনি রেমতীর পুত্র হিসাবে প্রতিপালিত হতে থাকেন। কালক্রমে অজপার্শ্ব যখন রাজা হন, তখন প্রতিপালক ওই দুজন ব্রাহ্মণ তাঁর মন্ত্রী হন। তাঁদের ছেলে এবং নাতিরাই পুরুবংশকে বিস্তৃত করেন। পাণ্ডবেরাই ওই পৌরববংশের প্রতিষ্ঠাতা। এমন একটা কথা শোনা যায় যে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী প্রভৃতি যত দিন থাকবে, তত দিন পর্যন্তই পৃথিবীতে পৌরবেরা থাকবে। বিখ্যাত পৌরব বংশের কথা আপনাদের বললাম, এবার আমি আপনাদের তুর্বসু, অনু ও যদুর বংশ-কথা শোনাচ্ছি।

প্রথমে তুর্বসুর বংশ-কথা শুনুন। এই তুর্বসুর বহ্নি নামে একটি পুত্র জন্মায়

বহ্নির পুত্র গোভানু, তাঁর পুত্র ঐশানু ; ঐশানুর পুত্র করন্ধম। করন্ধমের যে পুত্র জন্মায় তার নাম মরুত্ত। এই মরুত্তের অপর নাম অবিক্ষিত। এঁর কোন পুত্র ছিল না, সংযতা নামে একটি কন্যা ছিল। মরুত্ত যক্ষের দক্ষিণারূপে সেই কন্যাকে মহাত্মা সংবর্তের হাতে সম্প্রদান করলেন এবং পৌরব দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে লাভ করেন। পূর্বে জরাগ্রহণে অসম্মত তুর্বসুকে পুরু যে অভিশাপ দিয়েছিলেন দুষ্মন্তের জন্মের পর সে অভিশাপ কেটে যায়। দুষ্মন্তের করুরোম নামে এক পুত্র জন্মায়। করুরোমের পুত্র অহ্নীদ ; অহ্নীদের চারজন ছেলে জন্মায়—পাণ্ড্য, কেরল, কোল এবং চোল। দ্রুহ্যের পুত্র বভ্রু ও সেতু। সেতুর পুত্র অঙ্গারসেতু ; এঁর অন্য নাম ছিল মরুৎপতি। রাজা চোদ্দ বছর এবং চোদ্দমাস ধরে প্রবল যুদ্ধ করে শেষে বহুকষ্টে অঙ্গারসেতুকে হত্যা করেন। অঙ্গারসেতুর গান্ধার নামে এক পুত্র ছিল। এঁর নাম অনুসারে গান্ধার রাজ্যের নামকরণ হয়। এই গান্ধারদেশের ঘোড়া খুব বিখ্যাত। অনুর পুত্র ধর্ম, তাঁর পুত্র দ্যুত ; দ্যুতের পুত্র অনদুহ এবং অনদুহের পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার যে পুত্র জন্মায় তার নাম সুচেতা। এই আপনাদের তুর্বসু, অনু এবং দ্রুহ্যের বংশ-কথা শোনালাম। এবার যদুবংশের কথা আপনাদের শোনাব।

যদুর পাঁচটি পুত্র জন্মায়। তাদের নাম—সহস্রাদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল এবং অঞ্জিক। এদের মধ্যে সহস্রাদের হৈহয়, হয় ও বেনুহয় নামে তিনটি ধার্মিক পুত্র জন্মায়। হৈহয়ের ধর্মনেত্র নামে একজন বিখ্যাত পুত্র জন্মায়। ধর্মনেত্রের পুত্র কার্ত, কার্তের পুত্র সাহঞ্জ। এই সাহঞ্জের নাম অনুসারে সাহঞ্জনীপুরী প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে যে ভদ্রশ্রেণ্য রাজার কথা আপনাদের বলেছি, তিনি ছিলেন রাজা মহিষ্মানের পুত্র। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দম। দুর্দমের পুত্র কনক। কনকের চার পুত্র—কৃতবীর্য, কৃতৌজা, কৃতধন্বা এবং কৃতাগ্নি। এদের মধ্যে কৃতবীর্যের এক পুত্র জন্মায়, ঐ পুত্র সহস্রবাহু অর্জুন নামে খ্যাত। সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর আধিপত্য ছিল প্রতিষ্ঠিত। তিনি একাই সূর্যকিরণের মতো দীপ্তিমান এক রথে চড়ে পৃথিবী জয় করেন। ইনি কৃতবীর্যের পুত্র বলে কার্তবীর্য নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি অনেক দিন ধরে কঠোর তপস্যা করে দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করেছিলেন। এই দত্তাত্রেয় ঋষি বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ ছিলেন। কার্তবীর্যের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দত্তাত্রেয় তাঁকে চারটি বর দান করেন। প্রথম বরে, রাজ্যের মধ্যে কেউ অধর্ম বিষয় চিন্তা করলে কার্তবীর্যের নাম স্মরণ করলেই তার সেই অধর্ম কার্যে আর প্রবৃত্তি হবে না। দ্বিতীয় বরে, অত্যধিক ধর্মবলে সমগ্র পৃথিবী জয় করে কার্তবীর্য প্রজাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবেন। তৃতীয় বরে, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অসংখ্য শত্রুসৈন্য হত্যা করতে সমর্থ হবেন। চতুর্থ বরে, কার্তবীর্য যখনই যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হবেন, তখনই তাঁর হাজারটা হাত গজাবে। বর পেয়ে কার্তবীর্য সমগ্র পৃথিবী জয় করেন। নদী, সমুদ্র, পর্বত এবং নগর-নগরী —সবই তিনি নিজ বাহুবলে জয় করে নেন। আমরা শুনেছি যে, কার্তবীর্যার্জুন পৃথিবীতে বিধিসম্মতভাবে শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দান করেছিলেন। ঐ যজ্ঞসমূহের যূপ এবং বেদি স্বর্ণময় হয়েছিল। বিমান-চারী দেবতারা, গন্ধর্বেরা এবং অপ্সরারা ঐ যজ্ঞবেদিগুলোকে অলংকৃত করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং নারদ তাঁর যজ্ঞস্থলে এসে এ রকম গাথা গান করেছিলেন যে, যজ্ঞে, দানে, তপস্যায়, বিক্রমে বা শাস্ত্রজ্ঞানে কার্তবীর্যের মতো খ্যাতি পৃথিবীতে অন্য কোন রাজাই পাবেন না। পৃথিবীর লোকেরা তাঁর প্রতিভার বিভিন্ন

পরিচয় পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে ; কখনো বাগ্মীরূপে, কখনো অস্ত্রধারী যোদ্ধারূপে, কখনো দুষ্টের ভয়াল শত্রুরূপে কখনো বা যোগীরূপে। তাঁর শাসনে কারোর কোনো জিনিসই নষ্ট হত না, শোক বা মোহ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তিনি রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন তাঁর আপন প্রতিভার গুণেই। তিনি নিজেই পশুপাল, ক্ষেত্রপাল এবং মেষ-রূপে বিরাজ করতেন। তাঁর এক হাজার হাতের চামড়া ধনুকের আঘাতে কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন ঐ এক হাজার হাত নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তখন তাঁকে অসংখ্য কিরণ বিকিরণকারী শরৎকালের সূর্যের মতো মনে হত। তিনি কর্কোটক নাগদের পরাজিত করে মাহিষ্মতী পুরীতে আটকে রাখেন। তিনি বর্ষাকালে সমুদ্রের স্রোতের বেগ নিরুদ্ধ করে যেন খেলার ছলেই হাত দিয়ে তার গতিপথকে ভিন্নমুখী করাতেন। কার্তবীর্য যখন জলে খেলা করার জন্য নর্মদায় নামতেন, তখন খরস্রোতা নর্মদা যেন ভয়ে ভয়ে প্রবাহিত হত, পাছে কার্তবীর্যের কোন অসুবিধা হয়। তাঁর হাজার হাতের আঘাতে সমুদ্র ক্ষিপ্ত হলে পাতালের বলশালী অসুরেরা ভয়ে লুকিয়ে পড়ত। তিনি যখন তাঁর এক হাজার হাত দিয়ে সমুদ্রের জলকে আলোড়িত করতেন, তখন তিমি প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণিরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ত। তখন সমুদ্রের জলে ভয়াবহ আবর্তের সৃষ্টি হত। এ সব দেখে মনে হত, বুঝি বা দেবতা ও অসুরেরা ক্ষীরোদ সমুদ্রে মন্দর পর্বতকে নিক্ষেপ করেছেন। সামুদ্রিক সাপেরা সেই আলোড়নে ভীত, চকিত হয়ে পড়ত, এবং সমুদ্রে মন্দর পর্বতকে পড়তে দেখে তারা মনে করত, আবার বোধ হয় সমুদ্র মন্থন হবে। এই ভয়ে তারা ইতস্তত ছোটাছুটি করে যখন সেই মহাবলশালী রাজাকে দেখত, তখন আপনা থেকেই তারা শান্ত হয়ে পড়ত ; তাদের মাথা নত হয়ে যেত কার্তবীর্যের সামনে। তাদের সেই রকম অবস্থায় দেখে মনে হত যেন বাতাসের বেগে সন্ধ্যাবেলা কলাগাছগুলো কাঁপছে। তিনি ধনুক নিয়ে মাত্র পাঁচটি তীর রাবণের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন ; তাতেই রাবণ তাঁর বশীভূত হয়ে সৈন্যদের সঙ্গে মাহিষ্মতী পুরীতে বন্দী হয়েছিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য ছিলেন রাবণের পিতামহ। তিনি যখন শুনলেন যে রাবণ কার্তবীর্যার্জুনের হাতে বন্দী হয়েছে, তখন তিনি কার্তবীর্যের সঙ্গে দেখা করেন এবং বলে কয়ে রাবণকে বন্ধনমুক্ত করেন। সেই কার্তবীর্যের ধনুকের আকর্ষণ যুগান্তকালের মেঘের শব্দ বা বিকট বজ্রের শব্দের মতো মনে হত। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভার্গব ঋষি সেই মহাবলশালী কার্তবীর্যের সহস্র হাত স্বর্ণময় তালবনের মতো অক্লেশে কেটে দিয়েছিলেন। কি করে এ রকম আশ্চর্যজনক এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল, তা বলছি। একবার অগ্নি তৃষ্ণার্ত হয়ে কার্তবীর্যের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। কার্তবীর্য তখন সমগ্র পৃথিবীই অগ্নিকে দান করেন। অগ্নি, রাজার অনুমতি পেয়ে কার্তবীর্যের সমগ্র রাজ্যই দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। অগ্নি কার্তবীর্যের ক্রীড়াশৈল ও ক্রীড়াকানন প্রভৃতি সবই পুড়িয়ে ফেললেন। বশিষ্ঠের একটি সুন্দর আশ্রম ছিল ; অগ্নি সেই আশ্রমকেও পুড়িয়ে ফেললেন। এই বশিষ্ঠই পুরাকালে বরুণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বসিষ্ঠ ও আপব নামে পরিচিত হন। 'অপ্' শব্দের অর্থ জল ; বরুণকে জলের অধিপতি বলে মনে করা হয়। তাঁর পুত্র বলে 'আপব' নামে পরিচিত। আশ্রম পুড়ে গেলে পর আপব ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে কার্তবীর্যকে এ রকম অভিশাপ দেন যে, যেহেতু তুমি আমার আশ্রমকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছ, সেজন্য তুমি জমদগ্নির পুত্র পরশুরামের হাতে নিহত হবে। ভৃগুবংশের সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণ তোমার সহস্র হাত কেটে ফেলবেন। প্রজা-

কল্যাণকামী সেই রাজাও বশিষ্ঠের অভিশাপে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কার্তবীর্য আগে একটি বরলাভ করেছিলেন। সেই বরের প্রভাবে তাঁর একশোটি ছেলে জন্মায়। তাদের মধ্যে শূরসেন, শূর, বৃষণ, মধুপধ্বজ ও জয়ধ্বজ নামে পাঁচটি পুত্র জীবিত ছিল। এঁরা সবাই মহান, বলবান এবং যশস্বী ছিলেন। রাজা জয়ধ্বজ অবন্তীদেশে রাজত্ব করেন। জয়ধ্বজের একটি পুত্র জন্মায়; তার নাম তালজঙ্ঘ। ইনি বলবান এবং সুযোদ্ধা ছিলেন। তালজঙ্ঘের একশোটি পুত্র জন্মায়; এরাও তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত। হৈহয়দের বংশধরেরা ক্রমে বীতিহোত্র, সুব্রত, ভোজ, অবন্তী, তৌণ্ডিকেব, তালজঙ্ঘ, ভরত ও সুজাত প্রভৃতি বহু বংশে বিভক্ত ও বিখ্যাত হন। আলাদা আলাদা ভাবে এঁদের প্রত্যেকের বংশ-বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়; কেননা, সংখ্যায় এঁরা বহু। বৃষ প্রভৃতি যদুবংশের রাজারা সবাই পুণ্য-কর্মকারী ছিলেন। এদের মধ্যে বৃষই একমাত্র বংশধর পুত্র। বৃষের পুত্র মধু, মধুর আবার একশোটি ছেলে জন্মায়। এদের মধ্যে বৃষণের পুত্রেরা 'বৃষ্ণি' নামে, মধুর পুত্রেরা 'মাধব' এবং যদুর পুত্রেরা 'যাদব' নামে বিখ্যাত হয়। এরা সবাই হৈহয় বংশের শাখাস্বরূপ। কার্তবীর্যের এই জন্ম এবং কীর্তিকথা যে প্রত্যহ শোনে এবং কীর্তন করে, তার সম্পদ নষ্ট হয় না। আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে লোক-বিখ্যাত যযাতি-পুত্রদের বংশ-কথা বললাম। এই পাঁচজনের বংশ-কথা যে শোনে সে ঈশ্বর লাভ করে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাঁচটি বর লাভ করে। সেই বরে আয়ু, কীর্তি, পুত্র, ধনসম্পদ এবং ঐশ্বর্যলাভ ঘটে। এখন আমি আপনাদের ক্রোষ্টুর বংশ-কথা শোনাব। ইনি যদুর বংশধর এবং পুণ্য-কর্মকারী। এই ক্রোষ্টুবংশের কথা শুনলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই ক্রোষ্টু বংশের সংস্পর্শেই বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিষ্ণু জন্মেছিলেন।

—'যযাতি বংশানুকীর্তন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায়ঃ চৌদ্দ

লোমহর্ষণ ক্রোষ্টুর বংশ-কথা মুনিদের বলে চললেন। ক্রোষ্টুর গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে গান্ধারীর গর্ভে অনমিত্র নামে এক পুত্র জন্মায় এবং মাদ্রীর গর্ভে দুজন পুত্র জন্মায়। তাদের নাম—যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষ। মাদ্রী আরো দুজন পুত্রের জন্ম দেন; তাদের নাম বৃষ্ণি ও অন্ধক। এঁদের মধ্যে বৃষ্ণির যে দুজন পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাদের নাম শ্বফল্ক ও চিত্রক। শ্বফল্ক যেখানে থাকতেন, সেখানে ব্যাধি বা অনাবৃষ্টির কোনো ভয় থাকত না। একবার একটানা তিন বছর ধরে কাশিরাজের রাজ্যে বৃষ্টি হল না; ফলে রাজ্যের অবস্থা হয়ে উঠল সঙ্গীন। কাশিরাজ উপায়ান্তর না দেখে শ্বফল্ককে তাঁর রাজ্যে থাকতে অনুরোধ করেন। শ্বফল্ক সেখানে এসে থাকার পর কাশিরাজ্যে বৃষ্টি হয়েছিল। শ্বফল্ক কাশিরাজের মেয়ে গান্দিনীকে বিয়ে করেন। গান্দিনী খুবই ধর্মপ্রাণা ছিলেন। তিনি প্রত্যহই ব্রাহ্মণদের একটি করে গোরু দান করতেন। গান্দিনীর একটি পুত্র জন্মায়; তার নাম অক্রূর। এই অক্রূর দাতা, যজ্ঞকারী, বীর, বিদ্বান এবং অতিথিপ্রিয় ছিলেন। এদিকে অন্ধকের আবার চোদ্দ জন পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মায়। সেই পুত্রদের নাম—উপমদ্গু, মদ্গু, মেদুর, অরিমেজয়, অবিক্ষিত, আক্ষেপ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দন, ধর্মধৃক্, যতিধর্মা, ধর্মোক্ষা, অন্ধকরু, আবহ ও প্রতিবাহ এবং কন্যার নাম সুন্দরী। অক্রূরের স্ত্রীর নাম উগ্রসেনা। এই উগ্রসেনার গর্ভে

অক্রুরের দুটি ছেলে হয়—প্রসেন ও উপদেব। চিত্রকের বারোটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে জন্মায়। তাদের নাম—পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, স্বপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্মা, ধর্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু এবং মেয়েদের নাম যথাক্রমে শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা। দেবমীঢ়ুষের স্ত্রীর নাম অসিক্নী। অসিক্নীর গর্ভে দেবমীঢ়ুষের শূর নামে একটি পুত্র জন্মায়। এই শূর ভোজরাজের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর দশটি পুত্র জন্মায়। তাদের মধ্যে একজনের নাম বসুদেব ; ইনি বলবান রাজা ছিলেন। এঁর অন্য নাম আনকদুন্দুভি। তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে দেবদুন্দুভি, আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বেজেছিল এবং তাঁর জন্মস্থানে পুষ্পবৃষ্টিও হয়েছিল। এজন্যই এঁর এরূপ নাম হয়। তাঁর মতো রূপবান ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্লভ। ক্রমে সেই প্রতাপশালী রাজা বসুদেব বড় হয়ে উঠলেন। তাঁর ন'টি ছেলে এবং পাঁচটি মেয়ে জন্মায়। ছেলেদের নাম—দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান, গৃঞ্জম, শ্যাম, শমীক, ভগণ্ডূষ এবং মেয়েদের নাম—পৃথুকীর্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী। এদের মধ্যে শ্রুতশ্রবা যে পুত্র প্রসব করেন তার নাম হয় শিশুপাল। ইনি চেদি দেশের রাজা হন। পৃথুকীর্তির বিয়ে হয় বৃদ্ধশর্মার সঙ্গে। এঁদেরই সন্তান হিরণ্যকশিপু ; পুরাণে যিনি দৈত্যরাজ নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন। কুরুপাধিপতি মহাবলশালী দন্তবক্রের পৃথা নামে একটি কন্যা ছিল ; এর অপর নাম কুন্তী। রাজা পাণ্ডুর সঙ্গে পৃথার বিয়ে হয়। সেই কুন্তীর গর্ভে ধর্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীম এবং ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনের জন্ম হয়। পৃথিবীতে অর্জুনের মতো বীর যোদ্ধা খুব কমই পাওয়া যায়। বৃষ্ণিবংশের কনিষ্ঠ সন্তান অনমিত্র। তাঁর পুত্র শিনি। শিনির পুত্র সত্যক এবং সত্যকের পুত্র সাত্যকি যুযুধান। দেবভাগের পুত্র উদ্ধব। এই উদ্ধব বিদ্বান বলে পরিচিত। অনাধৃষ্টির পুত্র অশ্মচ্য। শ্রুতদেবার পুত্র শত্রুঘ্ন। ইনি একলব্য নামে পরিচিত। এঁকে ব্যাধেরা প্রতিপালন করেছিল। বৎসবৎ রাজা অপুত্রক ছিলেন। বসুদেব তাঁর হাতে কৌণিক নামক নিজের পুত্রকে সমর্পণ করেন। রাজা গণ্ডূষও অপুত্রক ছিলেন। বিষ্ককসেন গণ্ডূষকে চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ ও পঞ্চাল প্রভৃতি পুত্রদের দান করেন। রৌক্মিণেয় ছিলেন সবার ছোট। তিনি যুদ্ধ শেষ না করে কখনই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসতেন না এবং তিনি যখন কোথাও যেতেন তখন তাঁর পিছন পিছন কাকেরা যেত। কনবকের দুই পুত্র ছিল—তন্ত্রিজ ও তন্ত্রিপাল। শ্যামের পুত্র সমীক ; ইনি রাজা হয়েছিলেন। তিনি ভোজবংশের রাজা ছিলেন। এই ভোজবংশ নিন্দিত ছিল বলে শমীক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই শমীকের পুত্র অজাতশত্রু।

এবার আমি আপনাদের বসুদেবের পুত্রদের কথা শোনাব। বৃষ্ণির তিন বংশেরই শাখা প্রশাখা বহু বিস্তৃত। ঐ তিন বংশই মহাপরাক্রান্ত। বসুদেবের স্ত্রীর সংখ্যা চৌদ্দ। এঁদের মধ্যে প্রধান যাঁরা তাঁদের নাম—পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, বৈশাখী, ভদ্রা, সহদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবী, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী। এঁদের দুজন পরিচারিকা ছিল—সুতনু ও বড়বা। বসুদেবের স্ত্রীদের মধ্যে দেবকীর স্থান সপ্তম এবং রোহিণীর স্থান প্রথম। এই রোহিণীর গর্ভে রাম, শরণ্য, শঠ, দুর্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনর নামে আটজন পুত্র এবং চিত্রা নামে একটি কন্যা উৎপন্ন হয়। এই চিত্রা পরে সুভদ্রা নামে বিখ্যাত হয়। দেবকী শৌরি নামে যশস্বী এক পুত্রের জন্ম দেন। রামের স্ত্রী রেবতী। এঁর পুত্রের নাম নিশঠ। সুভদ্রার বিয়ে হয় পাণ্ডুতনয়

পার্থের সঙ্গে। এঁদের পুত্র অভিমন্যু। অক্রুরের বিয়ে হয় কাশিরাজের মেয়ের সঙ্গে। এঁদের সন্তান সত্যকেতু। বসুদেবের স্ত্রী দেবকী প্রভৃতিরা ভাগ্যবতী ছিলেন। তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানদের কথা বলছি। শান্তিদেবা ভোজ ও বিজয় নামে দুজন পুত্রের জন্ম দেন। সুনামা নামে বসুদেবের আরেক স্ত্রী ছিলেন। ইনি যে দুজন পুত্রের জন্ম দেন তাদের নাম—বৃকদেব ও গদ। বৃকদেবের পুত্র অগাবহ। ত্রিগর্তরাজার কন্যার নাম জিজ্ঞাসা। রাজা শিশিরায়ণির সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়। এঁদের কোন সন্তান না হওয়ায় রাজা শিশিরায়ণি গার্গ্যমুনিকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে পুত্র উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন। বারো বছর ধরে জিজ্ঞাসার সঙ্গে সহবাস করেও গার্গ্যের গর্ভধারণের উপযোগী বীর্যপাত হল না। তখন নিজের পৌরুষকে ধিক্কার জানিয়ে গার্গ্য ক্রুদ্ধ হয়ে এক ঘোষ কন্যার সঙ্গে মৈথুন আরম্ভ করলেন। ঘোষকন্যা রূপে আসলে সে ছিল এক অপ্সরা। শিবের নিয়োগ অনুসারে ঘটনাক্রমে সে গার্গ্যের স্ত্রী হয়। এঁদের একটি পুত্র জন্মায়; তাঁর নাম কালযবন। ইনি সিংহের মতো পরাক্রমশালী ছিলেন। এঁর দেহের ঊর্ধ্বভাগ ছিল খানিকটা গোলাকার। কালযবন জন্মগ্রহণের পর জিজ্ঞাসা ও শিশিরায়ণির পুত্ররূপে রাজার অন্তঃপুরেই প্রতিপালিত হতে থাকেন। কালক্রমে ইনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। যুদ্ধকামী হয়ে ইনি নারদকে তাঁর প্রতিযোগিদের নাম জিজ্ঞাসা করলে নারদ তাঁকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দের কথা বলেন। তখন কালযবন অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে মথুরার দিকে যাত্রা করলেন এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকদের কাছে দূত পাঠালেন। কালযবনের পরাক্রমের কথা কারোরই অজানা ছিল না। তাঁর দূতের কাছ থেকে সব কথা শুনে বৃষ্ণি ও অন্ধকেরা মিলিত হয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ঠিক করলেন যে তাঁরা মথুরা ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু সমস্যা হল, যাবেন কোথায়? অবশেষে সবাই মিলে ঠিক করলেন যে তাঁরা মহাদেবের বন্দনা করে কুশস্থলী দ্বারাবতী নগরীতে গিয়ে বাস করবেন। যিনি পবিত্রভাবে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে এই কৃষ্ণজন্ম বিবরণ শোনেন বা শোনান, তিনি বিত্তবান এবং সুখী হন।

—'কৃষ্ণজন্মানুকীর্তন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় : পনেরো

লোমহর্ষণ বৃষ্ণিবংশের কথা বলে চললেন—বৃজিনীবান নামে ক্রোষ্টুর আরেক যশস্বী পুত্র ছিলেন। তাঁর পুত্র স্বাহি; ইনি যজ্ঞকর্মানুষ্ঠানে ছিলেন পটু। স্বাহির পুত্র উষদগু; ইনি রাজা হন। পুত্রকামনায় ইনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বিভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উষদগুর পুত্র চিত্ররথ। ইনি ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা। চিত্ররথের যে পুত্র হয় তার নাম শশবিন্দু। পূর্ব রাজর্ষিগণের পূতঃ কর্মসমূহের ইনি অনুগমন করেন এবং প্রচুর যজ্ঞকার্যের অনুষ্ঠান করেন। শশবিন্দুর পুত্র পৃথুশ্রবা। পুরাণ-বিশারদগণ বলেছেন যে ঐ পৃথুশ্রবার অন্তর নামে এক পুত্র জন্মায়। অন্তরের পুত্র সুযজ্ঞ, সুযজ্ঞের পুত্র উষত। ইনি প্রচুর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। উষতের পুত্র শিনেয়ু; শিনেয়ুর পুত্র মরুত; ইনি রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি মরুতের যে পুত্র জন্মায় তার নাম কম্বল-বর্হিষ। রাজা কম্বলবর্হিষের কোনো পুত্র না হওয়ায় তিনি প্রচুর যজ্ঞকার্যের অনুষ্ঠান করেন। ফলে তাঁর এক পুত্র জন্মায়; তার নাম রুক্মকবচ। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য শর

বর্ষণ করে শত শত যোদ্ধাকে হত্যা করেন। ফলে উত্তম জয়লক্ষ্মী লাভ করেন। রুক্ম-কবচের পুত্র পরাজিৎ। পরাজিতের পাঁচটি পুত্র জন্মায়; এদের নাম—রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি। এঁরা সবাই বলবান। এঁদের মধ্যে পালিত ও হরি বিদেহ দেশের রাজা হন। রুক্মেষু তাঁর ভাই পৃথুরুক্মের সঙ্গে নিজের রাজ্যে রাজত্ব করেন। এঁরা দু ভাই একযোগে অন্য ভাই জ্যামঘকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলে তিনি এক আশ্রমে গিয়ে বাস করেন। সেই আশ্রমের ব্রাহ্মণেরা তাঁকে ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য উৎসাহিত করেন। তখন তিনি সৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে অন্য কোন রাজার সাহায্য ছাড়াই নর্মদা তীরবর্তী মেকলা রাজ্য, মৃত্তিকাবতী পুরী এবং ঋক্ষবান পর্বত জয় করে নেন; তারপর শুক্তিমতী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করে তিনি সেখানে বাস করতে থাকেন। তাঁর স্ত্রীর নাম শৈব্যা। শৈব্যা পতিব্রতা ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও রাজা জ্যামঘ অন্য কোন নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন নি। একবার কোন এক যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি একটি কন্যা লাভ করেন। তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে এসে রাজা শৈব্যাকে বলেন শোন শৈব্যা, এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ হবে। শৈব্যা সে কথা শুনে রাজাকে বললেন—আপনি কি বলছেন ? কে কার পুত্রবধূ হবে ? রানীর কথা শুনে মৃদু হেসে রাজা বললেন—তোমার যে পুত্র হবে, এই কন্যা সেই পুত্রেরই স্ত্রী হবে।

পরবর্তী কালে এই কন্যা দীর্ঘদিন ধরে কঠোর তপস্যা করেন। তার ফলে শৈব্যা বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র প্রসব করেন। ইনি বিদর্ভ নামে বিখ্যাত হন। তারপর সেই বিদর্ভের সঙ্গে যুদ্ধলব্ধ সেই কন্যার বিয়ে হয়। তাঁদের পুত্র ক্রথ ও কৌশিক। এঁরা বিদ্বান, বীর ও যুদ্ধপটু ছিলেন। বিদর্ভের ভীম নামে আরেকটি পুত্র জন্মায়। ভীমের পুত্র কুন্তি। কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট্র। ধৃষ্ট্রের তিনটি পুত্র জন্মায়; এঁদের নাম—আবন্ত, দশার্হ ও বিষহর। এদের মধ্যে দশার্হের পুত্র ব্যোমা, ব্যোমার পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্র বিকৃতি, বিকৃতির পুত্র ভীমরথ। ভীমরথের যে পুত্র হয় তার নাম নবরথ। নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র শকুনি, শকুনির পুত্র করম্ভ, করম্ভের পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের বৃদ্ধক্ষত্র নামে এক পুত্র জন্মায়। বৃদ্ধক্ষত্রের একটি পুত্র জন্মায়, তার নাম মধু। এই মধু খুবই সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। ইনিই মধুদের বংশধর। মধুর স্ত্রী বৈদর্ভী। এঁদের পুত্র পুরুদ্বান। মধুর আরেক স্ত্রী ঐক্ষ্বাকী। ইনি যে পুত্রের জন্ম দেন তার নাম সত্ত্বান। এই সত্ত্বানের পুত্রেরাই সাত্বত নামে পরিচিত। যে জ্যামঘ রাজার এই বংশ-কথা শোনে সে সর্বদাই আনন্দে থাকে। সত্ত্বানের স্ত্রী কৌশল্যা। ইনি যে সন্তানদের জন্ম দেন তাঁদের নাম—ভাগিন, ভজমান, দিব্য, দেবাবৃধ, অন্ধক ও বৃষ্ণি। এদের মধ্যে চারজনের বংশ-বিবরণ পুরাণে বলা হয়েছে। ভজমানের দুজন স্ত্রী—একজনের নাম সৃঞ্জয়ী বাহ্যকা ও আরেকজনের নাম সৃঞ্জয়ী উপবাহ্যকা। এঁরা বহু পুত্রের জননী। সৃঞ্জয়ী বাহ্যকার পুত্রদের নাম—ক্রিমি, ক্রমণ, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয়। সৃঞ্জয়ী উপবাহ্যকার পুত্রদের নাম—আযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতাজিৎ ও দাসক। রাজা দেবাবৃধ একটি সর্বগুণযুক্ত পুত্রলাভের কামনায় বিপুল যাগযজ্ঞ ও তপস্যা করেন। তিনি পর্ণাশা নামক নদীর জল স্পর্শ করে তপস্যা করতেন। রাজার প্রতি মমত্ববশে পর্ণাশা রাজার অভীষ্ট পূরণ করবার জন্য সুন্দরী কুমারী মূর্তি ধারণ করলেন। তপস্যারত রাজার কাছে গিয়ে পর্ণাশা প্রেম নিবেদন করলেন। রাজাও তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে সহবাস

করলেন। কালক্রমে তাঁদের একটি পুত্র জন্মায়। তার নাম বভ্রু। পুরাণবিশারদগণ এই বভ্রুবংশের ও মহাত্মা দেবাবৃধের গুণগাথা গান করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে দেবাবৃধ ও তাঁর পুত্র বভ্রুর কথা আমরা দূর থেকে যেমন শুনি, কাছে এসেও ঠিক তেমনিই শুনি। এ'রা অনেক দিন পর্যন্ত অমর হয়েছিলেন। এই বংশের রাজারা সবাই বুদ্ধিতে, ধনুর্বিদ্যায়, দানে, যজ্ঞে ও ব্রহ্মজ্ঞানে প্রধান স্থান অধিকার করেন। অন্ধকের চারজন পুত্র জন্মায়; এদের নাম—কুকুর, ভজমান, সসক ও বলবর্হিষ। এদের মধ্যে কুকুরের পুত্র বৃষ্টি. বৃষ্টির পুত্র কপোতরোমা, কপোতরোমার পুত্র তিলিরি। তিলিরি যে পুত্রের জন্ম দেন তার নাম পুনর্বসু। পুনর্বসুর পুত্র অভিজিৎ। অভিজিতের দুটি যমজ পুত্র হয়; এদের নাম আহুক ও শ্রাহুক। পুরাণজ্ঞগণ আহুক সম্পর্কে এ রকম কথা বলে থাকেন যে, এই আহুক বর্মে আবৃত হয়ে যুদ্ধে যাত্রা করবেন। এ'দের বংশে এমন কেউই জন্মাবে না যে দাতা হবে না, শুদ্ধকর্মকারী হবে না, যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হবে না এবং ভোজরাজ্য আক্রমণ করবে না। এ'রা সবাই পূর্বদিকস্থ ভোজরাজ্য আক্রমণ করেন। এ'দের মধ্যে অনেকে দশ হাজার রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে একুশ হাজার রথে চড়ে উত্তর দিকে অভিযান করেন। আহুকবংশীয়দের আক্রমণে ভোজগণ সিংহাসনচ্যুত হন। কথিত আছে যে, অন্ধকেরা নিজের ভগিনীকে অবন্তীরাজের হাতে সমর্পণ করেন। আহুকের স্ত্রী কাশ্যা। এ'দের দুজন পুত্র জন্মায়—দেবক ও উগ্রসেন। এ'দের মধ্যে দেবকের চারটি পুত্র হয়; এদের নাম—দেববান, উপদেব, সংদেব ও দেবরক্ষিত। এছাড়া তাঁর সাতটি কন্যা জন্মায়; এদের নাম—দেবকী, শান্তিদেবা, সুদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনাম্নী। এই সাতজনকেই বসুদেবের হাতে অর্পণ করা হয়। উগ্রসেনের ন'জন পুত্র হয়। এদের মধ্যে কংস বড়। অন্যান্য পুত্রদের নাম—ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, সুভূষণ, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, অনাবৃষ্টি ও পুষ্টিমান। এছাড়া উগ্রসেনের পাঁচটি কন্যাও জন্মায়। এদের নাম—কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা। সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে উগ্রসেন কুকুরবংশীয় বলে বিখ্যাত হন। —'বৃষ্ণিবংশানুকীর্তন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় : ষোল

লোমহর্ষণ অন্ধকবংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে চললেন—ভজমানের পুত্র বিদূরথ; বিদূরথের পুত্র বলবান রাজাধিদেব। এ'র আটটি পুত্র ও দুটি কন্যা জন্মায়। পুত্রদের নাম—দত্ত, অতিদত্ত, সোনাশ্চ, শ্বেতবাহন, শমী, দণ্ডশর্মা, দন্তশত্রু ও শত্রুজিৎ। কন্যাদের নাম—শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা। এদের মধ্যে শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র স্বয়ম্ভোজ, স্বয়ম্ভোজের পুত্র হৃদিক। হৃদিকের অনেক পুত্র ছিল। তাদের নাম—কৃতবর্মা, সতধন্বা, দেবান্ত, নরান্ত, ভিষক, বৈতরণ, সুদান্ত, অতিদান্ত, নিকাশ্য ও কামদম্ভ। এদের মধ্যে দেবান্তের পুত্র বিদ্বান কম্বলবর্হিষ। কম্বলবর্হিষের পুত্র অসমৌজা ও নাসমৌজা। অসমৌজার কোন পুত্র হয় নি। তাঁকে তিনটি পুত্র দেওয়া হয়—সুদংষ্ট্র, সুচারু ও কৃষ্ণ। এ'রা সবাই অন্ধকবংশীয় বলে বিখ্যাত।

আগেই বলেছি ক্রোষ্টুর দুজন স্ত্রী—গান্ধারী ও মাদ্রী। গান্ধারী অনমিত্র নামে এক মহাবলশালী পুত্রের জন্ম দেয়। মাদ্রীর পুত্র যুধাজিৎ। যুধাজিতের পুত্র দেবমীঢ়ুষ। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন; নিঘ্নের দুজন পুত্র—প্রসেন ও সত্রাজিৎ। প্রসেন দ্বারকাপুরীতে

বাস করতেন। তিনি সূর্যের কাছ থেকে 'স্যমন্তক' নামে একটি দিব্যমণি লাভ করেন। সূর্য সত্রাজিতের প্রাণোপম বন্ধু ছিলেন। সত্রাজিৎ একবার রাত্রিশেষে রথে আরোহণ করে তোয়কূল নদীর জলে সূর্য পূজো করতে গিয়েছিলেন। তিনি সূর্যের পুজো করতে আরম্ভ করলে সূর্য স্বয়ং তাঁর সামনে এসে আবির্ভূত হলেন। তখন রাজা সত্রাজিৎ সূর্যকে সামনে দেখে তাঁকে বললেন—আপনি জ্যোতিঃপুঞ্জের আধার। আমি আকাশে আপনাকে যেমন জ্যোতিষ্মান দেখি, আমার সামনে এখানেও তেমনিই দেখছি। আপনি বন্ধুভাবে আমার কাছে এলেন, অথচ আপনার মূর্তির কোন বিশেষত্ব তো দেখছি না। বন্ধু সত্রাজিতের কথা শুনে সূর্য মৃদু হাসলেন। তারপর নিজের গলা থেকে স্যমন্তক মণিটি একপাশে রাখলেন। তখন সত্রাজিৎ সূর্যকে সৌম্যমূর্তিবিশিষ্ট পুরুষরূপে দেখে প্রীত হলেন। তারপর সূর্য যখন সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন তখন সত্রাজিৎ তাঁকে বললেন—আপনি যার প্রভাবে সব সময় সমস্ত লোক সমুদ্ভাসিত করেন সেই মণিটি আমাকে দিয়ে যান। বন্ধুর অনুরোধ সূর্য এড়াতে পারলেন না; তিনি সেই স্যমন্তক মণিটি সত্রাজিৎকে দিয়ে দিলেন। সত্রাজিৎ মণি নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন। সেই মণির প্রভাবে সত্রাজিৎকে সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান মনে হচ্ছিল। লোকে তাঁকে সূর্য মনে করে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। পরে অবশ্য লোকের ভুল ভাঙে। পরে সত্রাজিৎ সেই মণিটি নিজের ভাই প্রসেনকে দিয়ে দেন। সেই মণি বৃষ্ণি ও অন্ধকদের রাজধানীতে প্রদীপ্ত হতে লাগল। তার প্রভাবে যথাকালে বৃষ্টি হত, কোথাও কোন অসুখ-বিসুখ হত না; সর্বত্রই সুখ-শান্তি বিরাজ করত। সেই মণিটির এ রকম কার্যকারিতা দেখে স্বয়ং কৃষ্ণ তাকে পেতে ইচ্ছা করলেন, অথচ ক্ষমতাসত্ত্বেও তা কেড়ে নিলেন না।

একবার প্রসেন সেই মণিটি নিয়ে মৃগয়া করতে গেলেন। একটি সিংহ সেই স্যমন্তক মণিটিকে দেখে তা পেতে ইচ্ছা করল। সে তখন রাজা প্রসেনকে হত্যা করল। সিংহ মণিটি নিয়ে যাচ্ছিল, বলশালী ভল্লুকরাজ তাকে মেরে ফেলে সেই মণি নিয়ে গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করল। প্রসেনের মৃত্যুর খবর রাজধানীতে পেঁছিল। কৃষ্ণ যে মণিটিকে লোভ করতেন, এ কথা মোটামুটি সবাই জানত। তাই বৃষ্ণি এবং অন্ধকেরা কৃষ্ণকেই প্রসেনের হত্যাকারী বলে মনে করল। কৃষ্ণ জনসাধারণের এই অমূলক সন্দেহ দূর করার জন্য মণিটি উদ্ধার করে আনবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বনে গেলেন। প্রসেনের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সৈন্যদের সঙ্গে কৃষ্ণ বনপথ দিয়ে যেতে যেতে ক্রমে ঋক্ষবান পর্বত এবং বিন্ধ্যাচলের নানা স্থান পরিভ্রমণ করলেন। তাঁরা যখন পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম করছিলেন, তখন দেখলেন যে প্রসেন তাঁর ঘোড়াটির সঙ্গে পড়ে আছেন। অনুসন্ধান করতে করতে কৃষ্ণ দেখলেন যে প্রসেনের মৃতদেহের অদূরেই একটি সিংহের মৃতদেহও পড়ে আছে। পদচিহ্ন দেখে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে কোন ভালুক সিংহটিকে মেরে ফেলেছে। এবার ভালুকটির পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে কৃষ্ণ তার গুহার পাশে গিয়ে পেঁছিলেন। তিনি সেই গুহার ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ শুনতে পেলেন। সেই নারীকণ্ঠ আসলে সিংহের হত্যাকারী ভালুকের ধাইয়ের। সে ভালুকরাজের ক্রন্দনরত পুত্রকে এই কথা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিল—সুকুমারক! তুমি কেঁদো না। সিংহ প্রসেনকে হত্যা করেছিল, তোমার বাবা জাম্ববান তাকে হত্যা করে এই স্যমন্তক মণি তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন, সে তো তোমারই জন্য। এই মণি তোমারই। কৃষ্ণ এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেই

গুহার মধ্যে ঢুকলেন। গুহার দোরগোড়ায় রেখে গেলেন বলরামসহ কয়েকজন যাদবকে। ভেতরে ঢুকেই তিনি জাম্ববানকে দেখতে পেলেন। জাম্ববানের সঙ্গে কৃষ্ণের দারুণ যুদ্ধ লাগল। একুশ দিন ধরে সেই যুদ্ধ চলতে লাগল। এদিকে বলরামের সঙ্গে যাঁরা ঐ গুহার দোরগোড়ায় ছিলেন তাঁরা কৃষ্ণের ভেতরে ঢোকার পরমুহূর্তেই দ্বারকায় এসে রটিয়ে দিলেন যে, কৃষ্ণ জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছেন। তারপর কিছু দিনের মধ্যেই কৃষ্ণ জাম্ববানকে পরাজিত করলেন এবং তার সুন্দরী কন্যা জাম্ববতীকে বিয়ে করে আত্মবিশুদ্ধির জন্য স্যমন্তক মণি নিয়ে কয়েকজন অনুগতের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরে এলেন। তারপর সাত্ত্বতদের সামনেই সেই মণি সত্রাজিতকে দিয়ে দিলেন। এ ভাবেই তিনি জনাপবাদ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। সত্রাজিতের দশটি স্ত্রী এবং একশো জন পুত্র ছিল। ঐ শত পুত্রের মধ্যে তিন জন বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁদের নাম—ভঙ্গকার, বাত ও বসুমেধ। সত্রাজিতের তিনটি কন্যাও ছিল। তাদের মধ্যে সত্যভামাই শ্রেষ্ঠ। সত্রাজিৎ তাঁর তিনটি কন্যাকেই কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেন। ভঙ্গকারের দুজন পুত্র জন্মায়—সভাক্ষ ও নারো। এঁরা রূপে-গুণে জনসমাজে বিশেষ খ্যাত। মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিতের বৃষ্ণি নামে একটি পুত্র জন্মায়। বৃষ্ণির আবার দুজন পুত্র জন্মায়—শ্বফল্ক ও চিত্রক। কাশিরাজের কন্যা গান্দিনীর সঙ্গে শ্বফল্কের বিয়ে হয়। গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়; ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, অতিথিপ্রিয় ও বলশালী ছিলেন। এ ছাড়াও গান্দিনীর গর্ভে আরো কয়েকটি পুত্র জন্মায়। তাদের নাম—উপমদ্গু, মদ্গু, অরিমর্দন, আরিক্ষেপ, উপেক্ষ, শত্রুহা, অরিমেজয়, ধর্মভৃৎ, ধর্মা, গৃধ্রভোজান্ধক, আবাহ ও প্রতিবাহ। গান্দিনীর গর্ভে একটি কন্যা জন্মায়; তার নাম সুন্দরী। বিশ্রুতাশ্বের সঙ্গে সুন্দরীর বিয়ে হয়। সুন্দরীর একটি কন্যা জন্মায়, তার নাম বসুন্ধরা। ইনি রূপে-গুণে, চারিত্রিক বৈশিষ্টে ছিলেন অতুলনীয়া। অক্রূরের স্ত্রীর নাম উগ্রসেনা। উগ্রসেনা দুই পুত্রের জননী—বসুদেব ও উপদেব। বৃষ্ণিতনয় চিত্রকের দুজন স্ত্রী—শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা। এই দুজন এগারোটি পুত্রের জননী। এদের নাম—পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, ধর্ম, ধর্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু। যে কৃষ্ণের উপর এই মিথ্যা অপবাদের কথা জানে, মিথ্যা অভিশাপ কখনোই তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

—'স্যমন্তকপ্রত্যানয়নিরূপণ অধ্যায়' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ সতেরো

সোমবংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—অক্রূর সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাকে পত্নীরূপে পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর কামনা কিন্তু পূরণ হয় নি। পরে কৃষ্ণ সত্রাজিৎকে যে স্যমন্তক মণি এনে দিয়েছিলেন ভোজবংশীয় শতধন্বার সাহায্যে সেই মণি তিনি অপহরণ করে নেন। সত্রাজিতের কাছ থেকে মণি নেওয়ার জন্য আগে থেকেই তিনি সত্রাজিতের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। বলবান শতধন্বা রাত্রিতে সত্রাজিৎকে হত্যা করে সেই মণি এনে অক্রূরকে দিয়ে দেন। সেই মণি নিয়ে অক্রূর শতধন্বাকে দিয়ে এই শপথ করিয়ে নেন যে, তিনি এই ঘটনা আর কারুরই কাছে প্রকাশ করবেন না, সেই মণির প্রভাবে সেদিন থেকে দ্বারকা তাঁর অধিকারে থাকবে এবং সেজন্য কৃষ্ণ যদি তাঁকে আক্রমণ করেন তবে অক্রূররা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করবেন। পিতার মৃত্যুর

সংবাদ পেয়ে সত্যভামা দুঃখিত হয়ে, রথে আরোহণ করে বারণাবত নগরে চলে গেলেন ; কৃষ্ণ ছিলেন বারণাবতে। সত্যভামা কৃষ্ণকে সব কথা বললেন এবং পিতার শোকে কাঁদতে লাগলেন। কৃষ্ণ সে-কথা শুনে নিহত পাণ্ডবদের তর্পণ শেষ করে তাঁদের অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করার জন্য সাত্যকিকে নিযুক্ত করলেন এবং নিজে দ্বারকায় এসে দাদা বলরামকে সব কথা বললেন। তাঁর মত হল সিংহ প্রসেনকে হত্যা করেছে এবং শতধন্বা হত্যা করেছে সত্রাজিৎকে—এ সবই স্যমন্তক মণির জন্য। সুতরাং এই মণি এখন আমার প্রাপ্য, আমিই এর প্রভু। অতএব আপনি শীগগিরই রথে আরোহণ করুন। ভোজতনয় শতধন্বাকে হত্যা করে আমরাই এখন স্যমন্তক মণির অধিকারী হব। তারপর শতধন্বার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হল। শতধন্বা অক্রূরের সাহায্য লাভের জন্য খুবই উদ্গ্রীব ছিলেন। এদিকে অক্রূর দেখলেন যে কৃষ্ণ ও শতধন্বা উভয়েই যুদ্ধরত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অক্রূর শতধন্বাকে সাহায্য করলেন না। অক্রূরের কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে শতধন্বা ভয় পেয়ে এক বুদ্ধি আঁটলেন। তাঁর একটি ঘোটকী ছিল। সে শত যোজন পথ অনায়াসে অতিক্রম করতে পারত। তিনি সেই বড়বার সাহায্যে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধ করতে করতে কৃষ্ণ দেখলেন শতধন্বার ঘোটকী হৃদয়া শত যোজন পথ অতিক্রম করে ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। তখন তিনি শতধন্বাকে অধিকভাবে পীড়িত করতে লাগলেন। এদিকে অধিক শ্রমে ও ক্লান্তিতে হৃদয়া মৃত্যুমুখে পতিত হল। তখন কৃষ্ণ বলরামকে বললেন—আপনি এখানে থাকুন। যুদ্ধে পরিশ্রমের জন্য আমাদের ঘোড়াগুলো হীনবল হয়ে পড়েছে। আমি পায়ে হেঁটে গিয়েই মণি-রত্ন স্যমন্তক হরণ করে আনছি। তারপর কৃষ্ণ পায়ে হেঁটেই দূরবর্তী মিথিলা নগরীতে গিয়ে শতধন্বাকে বধ করলেন। কিন্তু মণির অনুসন্ধান করেও তা পেলেন না। কৃষ্ণ মণি না পেয়েই ফিরে এলেন। বলরাম তাঁকে মণির কথা জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণ বললেন যে তিনি স্যমন্তক মণি পান নি। বলরাম কৃষ্ণকে ধিক্কার দিয়ে বললেন—ভাই বলে তোমায় আমি ক্ষমা করে দিলাম। তোমার মঙ্গল হোক। বৃষ্ণিদের দিয়ে আমার কোন কাজই হবে না। আমি চললাম। এই কথা বলে বলরাম মিথিলায় গেলেন। মিথিলার রাজা বিভিন্ন উপহার দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এদিকে স্যমন্তক মণির জন্য পাছে প্রাণ হারাতে হয়, এ কথা ভেবে অক্রূর নানা রকম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি দিব্যকবচ ধারণ করে যজ্ঞকার্যে রত হলেন। তিনি ষাট বছর ধরে ক্রমাগত যজ্ঞ করেছিলেন। ঐ যজ্ঞ সকল 'অক্রূরযজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়। ঐ যজ্ঞে প্রার্থীর কোন প্রার্থনাই পূরণ হয় নি। রাজা দুর্যোধন ঐ সময় মিথিলায় গিয়ে বলরামের কাছে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। তারপর কৃষ্ণ যখন খবর পেলেন যে বলরাম মিথিলায় আছেন, তখন তিনি এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বলরামকে প্রসন্ন করে মিথিলা থেকে তাঁকে দ্বারকায় নিয়ে এলেন। এদিকে অক্রূরও অন্ধকদের সঙ্গে দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করলেন। কৃষ্ণ এই ঘটনা দেখেও জ্ঞাতিভেদ ভয়ে তাঁকে তখন দেখেও দেখলেন না। অক্রূর চলে গেলে পর সে রাজ্যে আর বৃষ্টি হল না। অনাবৃষ্টির জন্য রাজ্যে বিভিন্ন রকম অশান্তি দেখা দিল। তখন কুকুর ও অন্ধকবংশীয়-গণ অক্রূরকে প্রসন্ন করে দ্বারকায় নিয়ে এলেন। তিনি ফিরে এলে পর দ্বারাবতী আবার পূর্ব-সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। কিছু দিন পর অক্রূর বাসুদেবের প্রীতির জন্য নিজের কন্যা ও ভগ্নীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন। কৃষ্ণ যোগবলে জানলেন যে

স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছেই আছে। এ কথা জানার পর সভামধ্যে একদিন কৃষ্ণ অক্রূরকে বললেন—আমি জানতে পেরেছি যে সেই স্যমন্তক মণি আপনার কাছেই আছে। আপনি আমার সঙ্গে অসদাচরণ করবেন না ; মণিটি আমায় দিয়ে দিন। আপনি জানেন না যে, গত ষাট বছর ধরে এই মণির জন্য কী মানসিক এবং শারীরিক ক্লেশ আমায় সহ্য করতে হয়েছে। আর অপেক্ষা করার সময় নেই। আপনি স্যমন্তক আমার হাতে অর্পণ করুন। অক্রূর তখন সাত্ত্বতদের সামনেই সেই স্যমন্তক মণি কৃষ্ণের হাতে দিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ সেই মণি নিয়ে আনন্দিত হলেন এবং পুনরায় তা অক্রূরকেই ফিরিয়ে দিলেন। সেই মণির প্রভাবে গান্দিনীনন্দন অক্রূর সূর্যের মতো তেজস্বী হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন।

—'সোমবংশকথন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ আঠারো

লোমহর্ষণের কাছ থেকে এই সমস্ত কাহিনী শোনার পর মুনিরা তাঁকে বললেন—আপনি আজ আমাদের যে সব কাহিনী শোনালেন গৌরবে তাদের কোন তুলনা নেই। ভরতবংশীয় সমস্ত রাজা, দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, দৈত্য, সিদ্ধ ও গুহ্যক—এদের আশ্চর্য-জনক কর্মসমূহ, পরাক্রম, ধর্ম, দিব্যকথা ও অপূর্ব জন্মকথা, প্রজাপতির সৃষ্টি কথা—এ সবই আপনি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রজাপতি, গুহ্যক ও অপ্সরাদের সৃষ্টি-বৃত্তান্ত এবং এই চরাচর বিশ্বজগতের উৎপত্তি কথা আপনি আমাদের বলেছেন। আপনি অতি সরলভাবে পুণ্যফলপ্রদ পৌরাণিক কথা আমাদের কাছে বলেছেন। সে-সব কথা অমৃতের মতো আমাদের আনন্দদান করছে। আমাদের আকাঙ্খা এখন আপনার অনুগ্রহ পেয়ে বলবতী হয়ে উঠেছে। আমরা আপনার কাছ থেকে সমগ্র বিশ্বের বিবরণ শুনতে চাই। আপনি দয়া করে আমাদের সে কথা বলুন। এ কথা শোনার জন্য আমরা খুবই কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। এই পৃথিবীতে যে সব সমুদ্র, দ্বীপ, বর্ষ, পর্বত, বন, উপবন ও দেব-সরোবর প্রভৃতি আছে এবং এই জগতের সংস্থান যত পরিমাণ, এর যা আধার—এ সমস্ত আপনি সম্যকভাবে আমাদের বলুন। আমরা আগ্রহসহকারে আপনার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।

মুনিদের অনুরোধে লোমহর্ষণ তখন বিশ্বচরাচরের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমি সংক্ষেপে বিশ্বচরাচরের কথা আপনাদের শোনাব। কেননা, এ সব কথা বলতে গেলে একশো বছরেও তা বলে শেষ করা যাবে না। এই পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপ আছে ; তাদের নাম—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শক ও পুষ্কর। এই সাতটি দ্বীপ লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি সাতটি সাগরে পরিবৃত। জম্বু দ্বীপ সমস্ত দ্বীপের মধ্যভাগে বিরাজিত। ঐ জম্বু দ্বীপের মধ্যভাগে কনকাচল মেরু বিরাজমান। উহার বিস্তৃতি চুরাশি হাজার যোজন। উহা নিজের দিকে ষোল যোজন বিস্তৃত এবং উপর দিকে বত্রিশ যোজন বিস্তৃত। মেরুর মূলভাগের বিস্তার চারদিকে যোলো হাজার যোজন। মেরুপর্বত পৃথিবীরূপ পদ্মের ফলত্বক আকারে বিরাজ করিতেছে। এর দক্ষিণ দিকে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তর দিকে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী নামক বর্ষ পর্বত সকল বিরাজমান। ঐ সকল পর্বতের মধ্যবর্তী দুটি

পর্বতের প্রমাণ লক্ষ যোজন ; অন্যান্য পর্বত সকলের প্রমাণ এর থেকে দশ যোজন কম। ওইসব বর্ষ পর্বতের উচ্চতা দু হাজার যোজন এবং বিস্তৃতিও সেই পরিমাণ। বর্ষসমূহের মধ্যে প্রথম বর্ষ ভারত, দ্বিতীয় কিম্পুরুষ ও তৃতীয় হরিবর্ষ। হরিবর্ষ মেরুর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। রম্যক বর্ষ মেরুর উত্তর দিকে অবস্থিত। তারপর হিরন্ময়, তারপর উত্তর কুরু। এই উত্তর কুরু ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাজমান। যে যে বর্ষের কথা বলা হয়, প্রত্যেকটিরই বিস্তৃতি ন'হাজার যোজন পর্যন্ত। এর পর আরো উত্তর দিকে ইলাবৃত বর্ষ। এই বর্ষের মধ্যে কনকাচল মেরু সমুন্নত। এই মেরুপর্বতের চারদিকের বিস্তৃতি ন' হাজার যোজন। ইলাবৃত বর্ষে চারটি পর্বত আছে। মেরু গিরির আয়তন অযুত যোজন পর্যন্ত। ইলাবৃতের পূর্বে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তর দিকে সুপার্শ্ব পর্বত বিরাজমান। এই চারটি পর্বতে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল এবং বট নামক চারটি বিশিষ্ট গাছ আছে। এই সব গাছের দৈর্ঘ্য এগারশ' যোজন। এগুলো যেন এই চারটি পর্বতের পতাকারূপে বিরাজমান। জম্বু গাছের নাম অনুসারেই জম্বু দ্বীপ বিখ্যাত। এই বিশাল জম্বু গাছের এক একটি ফল বিশাল এক একটি হাতীর মতো। এই ফলগুলি পর্বতের পৃষ্ঠদেশে পড়ে ফেটে যায়। তাদের রস প্রবাহে জম্বু নদী নামে একটি নদীর উৎপত্তি হয়। সেখানকার অধিবাসীরা সেই নদীর জল পান করে। জল পানে সেখানকার লোকদের মন প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্য ভালো হয়। সেই নদীর জল পানের ফলে তাদের দুঃখ, বার্ধক্য কিংবা ইন্দ্রিয় বৈকল্য ঘটে না। ঐ নদীতীরের মাটি সেই রস-সংসর্গ পেয়ে পরে বাতাসে শুকিয়ে যায় ; তাতে জাম্বুনদ নামে এক প্রকার বিশুদ্ধ সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ সম্প্রদায় সেই সুবর্ণ অলঙ্কার রূপে ব্যবহার করে। মেরুর পূর্ব দিকে ভদ্রাশ্চ বর্ষ এবং পশ্চিম দিকে কেতুমান বর্ষ রয়েছে। এই দুই বর্ষের মধ্যবর্তী স্থান ইলাবৃত বর্ষ নামে বিখ্যাত। এর পূর্বদিকে চৈত্ররথ কানন, দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্বত, পশ্চিমে বৈভ্রাজ এবং উত্তরে নন্দনবন রয়েছে। সেখানে চারটি সরোবর রয়েছে ; তাদের নাম—অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ ও মানস। এই সব সরোবরের তীরে দেবতারা বাস করেন। শান্তবান, চক্রকুঞ্জ, কুররী, মাল্যবান ও বৈকঙ্ক প্রভৃতি পর্বত মেরুর পূর্ব দিকের কেসরাচল রূপে বিরাজিতা ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক ও নিষধ প্রভৃতি পর্বত মেরুর দক্ষিণ দিকের ; শিখিবাস, বৈদূর্য, কপিল, গন্ধমাদন ও জারুধি প্রভৃতি পশ্চিম দিকের এবং শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস, নাগ ও কালঞ্জর প্রভৃতি মেরুর উত্তর দিকের কেসরাচল রূপে বিরাজ করে। মেরুর উপরে স্বর্গভূমিতে ব্রহ্মার এক মহাপুরী রয়েছে। ওই মহাপুরী চোদ্দ হাজার যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই ব্রহ্মপুরীর চারদিকে ইন্দ্র প্রভৃতি আট দিকপালের আটটি বিখ্যাত পুরী রয়েছে। বিষ্ণুর চরণ থেকে উৎপন্ন ভগবতী গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডলকে প্লাবিত করে ব্রহ্ম পুরীর চারদিক দিয়ে স্বর্গভূমিতে পতিত হয়েছেন। তিনি সেখানে পতিত হয়ে চারদিকে চার ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। গঙ্গার সেই চারটি ধারার নাম—সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। প্রথম ধারা সীতা পূর্ব দিক দিয়ে পর্বত থেকে পর্বতে উপনীত হয়ে অন্তরীক্ষ পথে পতিত হয়েছে এবং ভদ্রাশ্চ নামক পূর্বদিগবর্তী বর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে। অলকনন্দা দক্ষিণ দিক দিয়ে ভারতবর্ষে এসে সাতটি ধারায় সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়েছে। চক্ষু নামক তৃতীয় ধারাটি পশ্চিম দিগবর্তী সমস্ত পর্বত অতিক্রম করে কেতুমাল নামক পশ্চিমবর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে। ভদ্রা নামক চতুর্থ ধারাটি উত্তরদিগবর্তী সমস্ত পর্বত ও উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম করে সাগরে এসে

মিলিত হয়েছে। মাল্যবান এবং গন্ধমাদন এই পর্বত দুটি নীল ও নিষধ পর্বতের মতো প্রসারিত। ওই উভয় পর্বতের মধ্যভাগে মেরু পর্বত রয়েছে। ভারত, কেতুমাল, ভদ্রাশ্চ ও কুরুবর্ষ লোকশৈল নামক সীমা নির্দেশক পর্বতের বাইরের দিকে রয়েছে। জঠর ও দেবকূট এ দুটি পর্বতও সীমা নির্দেশক পর্বত। এরা দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে প্রসারিত এবং এদের দৈর্ঘ্য নীল ও নিষধ পর্বতের মতোই। গন্ধমাদন ও কৈলাস পর্বত মেরুর পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এদের প্রত্যেকের বিস্তৃতি আশী যোজন। এই দুইটি পর্বত সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। নিষধ ও পারিযাত্র সীমা নির্দেশক পর্বত। এদের দৈর্ঘ্যও নীল ও নিষধের পর্বতের মতো এবং দক্ষিণ ও উত্তর দিকে প্রসারিত এবং গন্ধমাদন ও কৈলাস পর্বতের মতো পশ্চিমদিগ ভাবে অবস্থিত। ত্রিশৃঙ্গ এবং জারুধি উত্তর বর্ষপর্বত নামে অভিহিত। এরা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রসারিত এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যে সীমা নির্দেশক পর্বতগুলোর কথা আপনাদের বললাম, এদের মধ্যে দুটো দুটো করে পর্বত মেরুর চারদিকে রয়েছে। মেরুর চারদিকের যে সব পর্বতের নাম আগেই করা হয়েছে সেগুলোর উপত্যকাগুলো প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে রমণীয়। সিদ্ধচারণ প্রভৃতিরা সেখানে থাকেন। ওই সব উপত্যকার মধ্যে লক্ষ্মী, বিষ্ণু অগ্নি, সূর্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেব-দেবীর সুন্দর নগর এবং কানন রয়েছে। এর মধ্যে মানুষ ও কিন্নরেরা বাস করে। এই সব পার্বত্য উপত্যকাই ধার্মিকদের পার্থিব স্বর্গ-স্থান। যারা পাপ আচরণ করে, তারা কোন দিনই ওই জায়গায় যেতে পারে না। ভদ্রাশ্চ বর্ষে স্বয়ং বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপে বিরাজ করেন। তিনি কেতুমাল বর্ষে বরাহ, ভারতবর্ষে কূর্ম, কুরুবংসে মাছ এবং অন্য সব জায়গায় বিশ্ব-রূপে বিরাজ করেন। তিনিই জগতের অধীশ্বর এবং সকলের আধার রূপে বিরাজমান। কিম্পুরুষ প্রভৃতি আটটি বর্ষে শোক, কষ্ট, উদ্বেগ, ক্ষুধা বা ভয় প্রভৃতির লেশমাত্রই নেই। সেখানকার সব প্রজা সুস্থ, নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত। সেখানকার প্রজাদের আয়ুর পরিমাণ তাদের কাজ অনুসারে দশ ও বারো হাজার বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট। সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি যুগের যে ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত, তা ঐ সব বর্ষে দেখা যায় না। যে সাতটি বর্ষের কথা বলা হল, সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই এক একটি করে কুলপর্বত রয়েছে। ঐ সব কুলপর্বত থেকে অসংখ্য নদীর উৎপত্তি হয়েছে।

—'ভুবনকোশদ্বীপবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ উনিশ

সপ্তদ্বীপময়ী পৃথিবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমাচলের দক্ষিণে যে বর্ষ রয়েছে, তার নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষই ভারতীপ্রজার বাসভূমি। এই ভারতবর্ষের বিস্তার ন' হাজার যোজন। যাঁরা স্বর্গ এবং অপবর্গ ইচ্ছা করেন, এই ভারতবর্ষই তাঁদের কর্মভূমি। এখানে মহেন্দ্র, মলা, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিযাত্র নামে সাতটি কুলপর্বত রয়েছে। এখান থেকেই স্বর্গ এবং মুক্তি পাওয়া যায়। এখান থেকেই মানুষেরা কর্মানুযায়ী গতি লাভ করে থাকে। এখানে ন'টি বিভিন্ন দ্বীপ রয়েছে। সেগুলোর নাম—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব ও বারুণ, নবম দ্বীপ সাগর-পরিবৃত। এই দ্বীপের পরিমাণ দক্ষিণ ও উত্তর দিকে হাজার যোজন বিস্তৃত। ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে কিরাত এবং পশ্চিমে যবনদের

নিবাস। এই বর্ষ মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা যথাযথ বিভাগ অনুসারে অবস্থিত। যজন-যাজন, যুদ্ধ ও বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিতে এরা নিযুক্ত। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী, পারিযাত্র থেকে বেদস্মৃতি প্রভৃতি নদী, বিন্ধ্য পর্বত থেকে নর্মদা ও সুরমা প্রভৃতি নদী এবং ঋক্ষ পর্বতের পাদদেশ থেকে তাপী, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা ও কাবেরী প্রভৃতি নদী উৎপন্ন হয়েছে। এই সব নদীর নাম শুনলেও পাপ নষ্ট হয়। এ ছাড়া সহ্য পর্বতের পাদদেশ থেকে গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণ্যা প্রভৃতি নদী উৎপন্ন হয়েছে। মলয় পর্বতের পাদদেশ থেকে কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি নদী, মহেন্দ্র পর্বতের পাদদেশ থেকে ত্রিসান্ধ্য নদ ও ঋষিকুল্যাদি নদী এবং শুক্তিমান পর্বতের পাদদেশ থেকে ঋষিকুল্যা ও কুমার প্রভৃতি নদনদী উৎপন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও এখানে আরো অনেক নদী ও উপনদী আছে। এই সব নদীর তীরে কুরু, পাঞ্চাল ও মধ্যদেশ প্রভৃতি জনপদ রয়েছে। কামরূপবাসী পূর্বদেশীয়গণ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ, দাক্ষিণাত্য, অপরান্ত্য, সৌরাষ্ট্র, শূদ্র, আভীর, অর্বুদ, 'মারুক প্রভৃতিরা, পারিযাত্রনিবাসী মালবগণ, এ ছাড়া সৌবীর, সৈন্ধব, শাল্ব, শাকলবাসী মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীক প্রভৃতি নানাদেশবাসী নানান লোক ওই সব নদীর জল পান করে এবং ঐ নদীসমূহের তীরে বসবাস করে থাকে। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় এবং এখানকার জনপদসমূহ সমৃদ্ধ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগ রয়েছে এখানে। এখানে তাপসেরা তপশ্চর্যা করেন এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মে নিরত থাকেন। পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পুরুষেরা এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রভূত দান করে। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু সর্বদাই পূজিত হয়ে থাকেন এবং অন্যান্য দ্বীপেও বিষ্ণু অর্চিত হয়ে থাকেন। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারত-বর্ষই শ্রেষ্ঠ। এর শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে কর্মের প্রতি এই বর্ষবাসীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা। অন্যান্য বর্ষে রয়েছে ভোগের প্রাচুর্য। তাই সেগুলো ভোগভূমি নামে পরিচিত। এখানে হাজার হাজার জন্মের পর কদাচিৎ কোন জীব পুণ্য অর্জনের ফলে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। দেবতাদের মধ্যে এমন কথা প্রচলিত আছে যে, যাঁরা স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের কারণস্বরূপ এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, জগতে তাঁরাই ধন্য বলে পরিগণিত হন। যাঁরা সমূহ কর্ম এবং সংকল্পিত কর্মের ফল পরমাত্মাস্বরূপ বিষ্ণুকে সমর্পণ করেন, তাঁরাই কর্মভূমি ভারতে এসে পুনরায় তাঁতেই বিলীন হয়ে থাকেন। যে সব জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্মসমূহ বিষ্ণুতে বিলীন হলে পর পুনরায় ভারতে এসে শরীর ধারণ করবেন, তাঁরাও ধন্য। আমরা তাঁদের কথা জানি না। জম্বুদ্বীপ ন'টি বর্ষে বিভক্ত এবং তা লক্ষ যোজন বিস্তৃত। আমি সংক্ষেপে এই দ্বীপের বিবরণ আপনাদের বললাম। এই দ্বীপের চারদিকে লবণ সমুদ্র বলয় আকারে বিরাজ করছে।

—'জম্বুদ্বীপ নিরূপণ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ কুড়ি

দ্বীপসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ বলে চললেন—লবণ সমুদ্র যেমন জম্বুদ্বীপকে বেষ্টন করে আছে, প্লক্ষ দ্বীপ তেমনি ঐ লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করে অবস্থান করছে। জম্বুদ্বীপের বিস্তৃতি এক লক্ষ যোজন। প্লক্ষ দ্বীপের বিস্তৃতি তারও দ্বিগুণ। এই প্লক্ষ দ্বীপের অধিপতি মেধাতিথি। তাঁর সাতটি পুত্র—শান্তময়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ,

শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব। মেধাতিথির মৃত্যুর পর এঁরাই প্লক্ষ দ্বীপের অধীশ্বর হন। প্লক্ষ দ্বীপে যে সাতটি বর্ষ আছে, তাদের নাম ওই সাতজন পুত্রের নাম অনুসারে করা হয়েছে। ওই সাতটি বর্ষের সীমারূপে সাতটি বর্ষ পর্বত রয়েছে। ওই পর্বতগুলোর নাম—গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা ও বৈভ্রাজ। এই বর্ষ ও বর্ষ পর্বতসমূহে প্রজারা, দেবতারা ও গন্ধর্বেরা মহাসুখে বাস করছে। এখানে যারা বাস করে, তাদের মৃত্যু নেই, ব্যাধি প্রভৃতি কোন উপদ্রবই তাদের ভোগ করতে হয় না। এরা সুখে শান্তিতে বাস করে। ঐ সাতটি বর্ষে সাতটি সমুদ্রগামী নদী আছে। তাদের নাম—অনুতপ্তা, শিখা, বিপ্রাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অনৃতা ও সুকৃতা। এ ছাড়াও প্লক্ষ দ্বীপে আরো অনেক পর্বত, নদী প্রভৃতি রয়েছে। এখানকার সব নদীই নিম্নগামী। এখানে কোন যুগ-বিভাগ নেই। এখানে ত্রেতাযুগের মতো সুখময় কাল সর্বদাই বিরাজমান। প্লক্ষ দ্বীপ ও শাক দ্বীপের অধিবাসী জনগণ পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত নিরাময় হয়ে জীবন ধারণ করে। সেখানে চার বর্ণের লোক এবং তাদের চতুরাশ্রম ব্যবস্থা রয়েছে। আপনাদের কাছে এখন তাঁদের কথাই আমি বলব। এই দ্বীপে আর্যক, কুরু, বিবিশ্চ ও ভাবী নামে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের লোক বাস করে। জম্বু দ্বীপের মতো এই প্লক্ষ দ্বীপেও একটি প্লক্ষ গাছ আছে ; এরই নাম অনুসারে দ্বীপের নাম প্লক্ষ হয়েছে। এই দ্বীপের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের লোকেরা সোমরূপী হরিকে পূজা করে থাকেন। এই প্লক্ষ দ্বীপকে বেষ্টন করে রয়েছে ইক্ষু সমুদ্রের জল। প্লক্ষ দ্বীপের কথা সংক্ষেপে আপনাদের বললাম ; এখন শাল্মল দ্বীপের কথা আপনাদের বলছি।

শাল্মল দ্বীপের অধিপতি বপুষ্মান। এই বপুষ্মানের সাতটি পুত্র—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত মানস ও সুপ্রভ। এঁদের নাম অনুসারেই ঐ দ্বীপের সাতটি বর্ষ বিভক্ত। ইক্ষু সাগর একে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এই দ্বীপেও সাতটি বর্ষ পর্বত রয়েছে ; এদের নাম—কুমুদ, উন্নত, বলাহক দ্রোণ, কংক, মহিষ ও ককুখান। এই সাতটি বর্ষ পর্বত থেকে সাতটি নদী প্রবাহিত হয়ে রয়েছে—শ্রোণী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্রা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি। এদের নাম স্মরণ করলে পাপ নষ্ট হয়। এই পর্বতসমূহে চার বর্ণেরই বাস আছে। শাল্মল দ্বীপের অধিবাসী ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার জাত যথাক্রমে কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ এই চার বর্ণবিশিষ্ট। এঁরা সবাই ভগবান বিষ্ণুর অর্চনা করে থাকেন। এই মনোরম দ্বীপে দেবতারাও বাস করেন। এই দ্বীপে একটি বড় শাল্মলী গাছ আছে ; সেজন্যই দ্বীপের নাম এরূপ হয়েছে। এই দ্বীপ সুরা সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সমুদ্রের বিস্তার শাল্মল দ্বীপের মতোই।

এবার আপনাদের কুশ দ্বীপের কথা বলি, শুনুন। এই দ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মান। তাঁরও সাতজন পুত্র—উদ্ভিদ, বেণুমান, স্বৈরথ, রম্ধন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। ঐ দ্বীপের বর্ষগুলোর নাম এদের নাম অনুসারেই করা হয়েছে। এখানে সাতটি বর্ষ পর্বতও রয়েছে ; তাদেরও ঐ একই নাম। মানুষের সঙ্গে দৈত্য-দানবেরাও সেখানে বাস করছে। এখানকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি চার জাত যথাক্রমে দমী, শুষ্মী, স্নেহ ও মান্দ্যহ নামে পরিচিত। কুশ দ্বীপের অধিবাসীরা সবাই নিজের নিজের কর্তব্য-কর্মে নিরত থাকে এবং তারা ভগবান বিষ্ণুর অর্চনা করে। এই কুশ দ্বীপে সাতটি প্রধান পর্বত রয়েছে—বিদ্রুম, হেম, দ্যুতিমান, পুষ্টিমান, কুশেশয়, হরি ও মন্দর। সেখানে সাতটি নদীও রয়েছে—ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুৎ, অম্ভ ও

মহী। এ ছাড়াও অনেক ছোট ছোট পাহাড়, নদী প্রভৃতি সেখানে আছে। কুশ দ্বীপে কুশস্তম্ভ রয়েছে ; এরই নাম অনুসারে দ্বীপের এই নাম হয়েছে। এই দ্বীপ ঘৃত সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই ঘৃত সমুদ্র ক্রৌঞ্চ দ্বীপকেও পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

ক্রৌঞ্চ দ্বীপ অন্যতম মহা দ্বীপ। এই দ্বীপের বিস্তার কুশ দ্বীপের দ্বিগুণ। এই দ্বীপের অধিপতি রাজা দ্যুতিমান। তাঁরও সাতজন পুত্র। এঁদের নাম অনুসারেই এই দ্বীপ সাতটি বর্ষে বিভক্ত। দ্যুতিমানের এই পুত্রদের নাম যথাক্রমে—কুশগ, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি। এই দ্বীপেও সাতটি বর্ষ পর্বত রয়েছে। এদের নাম—ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবব্রত, ধম, পুণ্ডরীকবান ও দুন্দুভি। এই পর্বতসমূহ একে অন্যের থেকে দ্বিগুণ বড়। অন্য যে সব পর্বত ও দ্বীপ আছে তা এই সব বর্ষ ও বর্ষ পর্বতের অন্তর্গত। এই বর্ষসমূহে প্রজারা ও দেবতারা নিরাপদে বাস করেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের লোকেরা এখানে 'পুষ্কর' নামে অভিহিত। এই দ্বীপে যে সব নদী আছে, লোকেরা তার জল পান করে। এখানে সাতটি প্রধান নদী রয়েছে—গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা। চার বর্ণের লোকেরা এখানে ধ্যানযোগে যজ্ঞ করে রুদ্ররূপী ভগবান বিষ্ণুর পুজা করে থাকে। এই ক্রৌঞ্চ দ্বীপকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে দধি সমুদ্র। শাক দ্বীপের কিছু অংশকেও এই দধি সমুদ্র বেষ্টন করে রয়েছে।

এবার শাক দ্বীপের কথা আপনাদের শোনাব। এই শাক দ্বীপ ক্রৌঞ্চ দ্বীপের চেয়ে দ্বিগুণ বড়। এই দ্বীপের অধিপতি ভব্য। তাঁর সাতটি পুত্র—জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীরক, কুসমোদ, মোদাকি ও মহাদ্রুম। এঁরা এই দ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষের অধিপতি। সাতটি বর্ষের নাম এঁদের নাম অনুসারেই করা হয়েছে। এখানে সাতটি বর্ষ পর্বত রয়েছে, এগুলিই এই দ্বীপের সীমা নির্ধারণ করে। এগুলোর নাম—উদয়, জলধর, রৈবতক, শ্যাম, অস্ত, আম্বিকেয় ও কেশরী। এই দ্বীপে শাক নামে একটি বিশাল গাছ রয়েছে। ঐ বিশাল গাছের বাতাসে এক অপূর্ব আমোদ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানে চতুর্বর্ণবিশিষ্ট পুণ্য জনপদ রয়েছে ; এরা নিরাপদে এবং সুখে এখানে বাস করে। এখানে সাতটি নদী প্রবাহিত। এদের নাম—সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, ইক্ষু, ধেনুকা ও গভস্তী। এ ছাড়া আরো অনেক ছোট ছোট নদী শাক দ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। আগে যে সাতটি পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে, তাছাড়াও অনেক পাহাড় রয়েছে এখানে। শাক দ্বীপের লোকেরা ঐ সব নদীসমূহের জল পান করে থাকে। এখানকার নদীসমূহ পুণ্যজনক। এগুলো স্বর্গ থেকে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছে। শাক দ্বীপের লোকেরা কোন রকম সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না ; তাদের শোক নেই। তারা পরস্পর কেউই নিজের নিজের মর্যাদা অতিক্রম করে না। এই দ্বীপের অধিবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারটি বর্ণ যথাক্রমে মগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ নামে অভিহিত। ভগবান বিষ্ণু সূর্যরূপ ধারণ করে শাক দ্বীপে বিরাজ করেন। সেখানকার লোকেরা তাঁর পুজা করেন। শাক দ্বীপকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে আছে ক্ষীরোদ সাগর। এই ক্ষীর সমুদ্র আবার পুষ্কর দ্বীপের অনেক অংশকে বেষ্টন করে আছে।

এই পুষ্কর দ্বীপ শাক দ্বীপ থেকে দ্বিগুণ বড়। এই দ্বীপের অধিপতি সবন। সবনের দুই পুত্র—মহাবীত ও ধাতকি। এই দুজনের নাম অনুসারে এখানে দুটি বর্ষ রয়েছে। তাদের নাম মহাবীতখণ্ড ও ধাতকিখণ্ড। এই দ্বীপে একটি মাত্র বর্ষ পর্বত

রয়েছে ; তার নাম মানসোত্তর। এই বর্ষ পর্বত দ্বীপের মধ্যে বলয় আকারে বিরাজ করে। এই পর্বত হাজার যোজন বিস্তৃত এবং ঊর্ধ্বে পঞ্চাশ যোজন পর্যন্ত উত্থিত। এই বর্ষ পর্বত পুষ্ক দ্বীপকে যেন মধ্যভাগে বিভাগ করেই বিরাজ করছে। ওই দ্বীপের অধিবাসী মানুষেরা দশ হাজার বছর পর্যন্ত জীবন ধারণ করে। এদের দুঃখ, শোক নেই। ঈর্ষা, রোগ, ভয়, লোভ প্রভৃতি এদের মধ্যে নেই। এই বর্ষদ্বয়ে দেবতা এবং দৈত্যেরা থাকে। এখানে বসবাসকারী দেবতা ও মানুষদের আকৃতির মধ্যে তারতম্য কিছুই নেই। যদিও এখানে বর্ণাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার নেই, ধর্মানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না এবং ত্রয়ীবার্তা, দণ্ডনীতি প্রভৃতি কিছুই নেই, তাহলেও এই বর্ষদ্বয় উত্তম পার্থিব স্বর্গ নামে পরিচিত ; এখানে সমস্ত সুখ বর্তমান। জরা, রোগ প্রভৃতি কিছুই এখানে নেই। এই পুষ্কর দ্বীপে একটি বটগাছ আছে। ব্রহ্মা এই গাছে বাস করেন। এই দ্বীপের লোকেরা ব্রহ্মাকেই পূজা করে। সুস্বাদু জলবিশিষ্ট সমুদ্র এই পুষ্কর দ্বীপকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এভাবে সাতটি দ্বীপই পর পর সাতটি সাগর দিয়ে পরিবেষ্টিত। দ্বীপ এবং সমুদ্র পরস্পর অপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐ সাত সাগরের জল পরস্পর সমান। আগুনের তাপে পাত্রস্থ জল যেমন উপচে পড়ে তেমনি চন্দ্রকলার আকর্ষণে সেই সব সাগরের জল উচ্ছ্বসিত হয় বটে, কিন্তু তার কোনো হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষেই চন্দ্রের উদয় এবং অস্তগমনে সমুদ্রের একশো পনেরো আঙুল পরিমাণ জলের বৃদ্ধি ও ক্ষয় দেখা যায়। পুষ্কর দ্বীপে খাদ্যবস্তুর কখনোই কোনো অভাব হয় না। সুস্বাদু জলবিশিষ্ট সমুদ্রের পরপারেও লোকের বসবাস দেখা যায়। সেখানকার মাটি কাঁচা সোনার মতো। সেই ভূমির বিস্তার পুষ্কর দ্বীপের দ্বিগুণ। সেখানে কোনো জীবজন্তুর বসবাস নেই। তারপর অযুত যোজন বিস্তৃত লোকালোক পর্বত রয়েছে। এই পর্বতের উচ্চতা তার বিস্তার পরিমাণেরই সমান। ঘন অন্ধকার ঐ পর্বতকে আবৃত করে রয়েছে। অন্ধকারের এই আবরণকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকোষ। এভাবে এই পৃথিবী-দ্বীপ, পর্বত, ব্রহ্মাণ্ডকোষ সহ পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত। এই পৃথিবী সমস্ত কিছুর আধার-ভূত।

'সমুদ্রদ্বীপপরিমাণবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় : একুশ

পৃথিবীর বিস্তার পরিমাণ বলার পর লোমহর্ষণ মুনিদের পাতালসমূহের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সাতটি পাতালের নাম আমরা শুনতে পাই—অতল, বিতল, নিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সব পাতালে কৃষ্ণা, শুক্লা, অরুণা, পীতা, শর্করা ও শৈলকাঞ্চনী ভূমি রয়েছে। এই ভূমিসমূহে উন্নত প্রাসাদসমূহ বিদ্যমান। এই প্রাসাদে অসংখ্য দৈত্য, দানব ও বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট সর্প পরিবারসমূহ বাস করে। একবার মহর্ষি নারদ পাতাল পরিভ্রমণের পর স্বর্গসভায় এসে বললেন, আমি পাতাল দেখে এসেছি, স্বর্গ থেকেও তা রমণীয় ; আনন্দজনক সে স্থান। সেখানে আনন্দজনক এবং জ্যোতির্ময় অসংখ্য মণি রয়েছে। ঐ সব মণি নাগদের দেহের অলঙ্কার। যে পাতালের নানান জায়গায় দৈত্য ও দানব কন্যারা বিচরণ করছে, সে-রকম পাতালে কোন্ মুক্ত পুরুষের না আনন্দ হয়ে থাকে ? যেখানে প্রতি দিনই সূর্য উদিত হয় কিন্তু অধিক তাপ বিকিরণ করে না,

যেখানে চন্দ্র কেবলমাত্র শোভা বর্ধনের জন্যই উদিত হন, অধিক শীত বিতরণ করেন না, যেখানে দনুপুত্রেরা সুস্বাদু খাদ্য ও উত্তম পানীয় গ্রহণ করে মত্ত হন এবং সেজন্য কালের গতি কিছুই অনুভব করতে পারেন না, যেখানে সুন্দর সুন্দর বন, সুন্দর নদী এবং প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহে আকীর্ণ সরোবর রয়েছে, যেখানে পুংস্কোকিল প্রভৃতি পাখিদের মধুর কূজন সর্বদাই শোনা যায়, যেখানকার আকাশ রমণীয়, অলংকারসমূহ সুন্দর এবং অনুলেপনসমূহ সুগন্ধময়, যেখানে বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনি সব সময়ই শোনা যায়, সেই পাতাল কার না ভালো লাগে ? পাতালবাসী দানব, দৈত্য ও সর্পগণ ভোগ্যবস্তুসমূহ সর্বদাই ভোগ করছে। পাতালের নিচে বিষ্ণুর শেষ নামক তামসী তনু আছে ; এঁকে 'শেষ' নামে অভিহিত করা হয়। দৈত্য ও দানবেরা এঁর গুণরাজি বর্ণনা করতে পারেন না। ইনি 'অনন্ত' নামে পরিচিত। এঁকে সিদ্ধ, দেব ও দেবর্ষি সম্প্রদায় পূজা করে থাকেন। ইনি সহস্রমস্তক-বিশিষ্ট, নানা মাঙ্গল্য অলংকারে অলংকৃত হয়ে সহস্র ফণা মণির দ্বারা চারদিক উদ্ভাসিত করেন। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি অসুরদের শক্তি নাশ করেন। এঁর চোখ মদাবেশে ঘূর্ণিত হয়, ইনি মুকুট ধারণ করে অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্বতের মতো প্রতিভাত হন। ইনি নীল বসন পরিধান করেন, শ্বেতহারে ইনি শোভা পান। ইনি হাতে লাঙ্গল ও মুসল ধারণ করেন। মূর্তিমতী কান্তি ও বারুণী এঁকে উপাসনা করেন। কল্পের শেষে তাঁর সহস্র মুখ থেকে রুদ্রদেব বেরিয়ে আসেন। এই রুদ্রদেব সংকর্ষণ নামে পরিচিত ; ইনি ত্রিভুবনকে গ্রাস করে থাকেন। এই শেষদেব মস্তকে পাহাড় ধারণ করে পাতালমূলে অবস্থান করেন। দেবতারাও তাঁর প্রভাব, বীরত্ব, স্বরূপ, বা রূপ জানতে বা বর্ণনা করতে পারেন না। এই সমগ্র পৃথিবী তাঁরই ফণার মণিরূপ শিখায় রঞ্জিত ফুলের মালার মতো বিরাজ করে। সেই অনন্ত যখন মদাবেশে ঘূর্ণিত চোখে হাই তোলেন, তখন এই পর্বত, সমুদ্র এবং বন পরিপূর্ণ পৃথিবী বিচলিত হয়ে পড়ে। গন্ধর্ব, সিদ্ধ, অপ্সর, কিন্নর ও সর্পগণ তাঁর গুণাবলীর কথা বলে শেষ করতে পারে না, তাই সেই অব্যয় পুরুষ 'অনন্ত' নামে অভিহিত। সেই অনন্তনাগের গায়ে নাগবধূরা হরিচন্দন মাখিয়ে দিলে তা সেই নাগের শ্বাসবায়ুতে মিলিয়ে যায়। পুরাণ ঋষি গর্গ তাঁর আরাধনা করে জ্যোতিতত্ত্ব জেনেছিলেন। তিনিই তাঁর মাথায় এই পৃথিবীকে ধারণ করছেন এবং তিনিই দেবতা, দানব ও মানুষে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী পালন করেন।

—'পাতালপ্রমাণকীর্তন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ বাইশ

তারপর লোমহর্ষণ মুনিদের রৌরব প্রভৃতি নরকের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। যমরাজের অধিকারে যে সব ভয়ানক নরক রয়েছে সেগুলোর নাম—রৌরব, শৌকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুড্য, মহালোভ, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বসাতপ্ত, কৃমীশ, কৃমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ, দারুণ, পূয়বহ, পাপ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কৃষ্ণ-সূত্র, তম, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও মারীচি। এ ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক নরক। ওই সব নরক ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র, আগুন ও বিষে পরিপূর্ণ। যারা পাপ কাজ করে তারা পরিণামে ঐ সব নরকে পতিত হয়ে থাকে। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে, অসত্যভাষণ করে, ভ্রূণহত্যা করে, নগর ধ্বংস করে, কিংবা গো-হত্যা করে, তারা ভয়ানক রৌরব নরকে পতিত

হয়। যারা অত্যধিক সুরা পান করে, ব্রহ্মহত্যা কাজে রত হয়, সোনা চুরি করে অথবা ওই নিন্দিত কর্মকারী লোকের সংস্পর্শে থাকে, তারা শৌকর নরকে পতিত হয়। যারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদের হত্যা করে গুরুপত্নীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রচনা করে, বোনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়, রাজসৈন্য হত্যা করে, তারা তপ্ত কুম্ভে পতিত হয়। যারা মধু বিক্রয় করে, বধযোগ্য পশু পরিপালন করে, চুল বিক্রয় করে, অনুগত জনকে ত্যাগ করে, তারা তপ্ত লোহায় পতিত হয়। যারা নিজের কন্যা বা পুত্রবধূর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রচনা করে তারা 'মহাজ্বাল' নামক নরকে পতিত হয়। যারা গুরুজনকে অবমাননা করে বা গুরুজনের প্রতি হিংসা করে, বেদের নিন্দা করে, বেদ বিক্রয় করে বা নিন্দিত বস্তুর প্রাপ্তিতে নিরত হয়, তারা বিভিন্ন নরকে পতিত হয়। যারা চোর, সমাজের মর্যাদা যারা লঙ্ঘন করে, তারা 'বিমোহন' নামক নরকে পতিত হয়। যারা দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং পিতাকে অবমাননা করে এবং যারা রত্ন চুরি করে, তারা 'কৃমিভোজন' নামক নরকে পতিত হয়। যারা বিধিমতো যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করে না, তারা 'কৃমীশ' নামক নরকে পতিত হয়। পিতা এবং অতিথির অবমাননাকারী ব্যক্তি 'লালাভক্ষ' নামক নরকে গমন করে। যারা তীর প্রভৃতি হিংস্র অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে, তারা ভয়ানক 'বেধক' নামক নরকে পতিত হয়। যারা খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র নির্মাণ করে, তারা ভয়ানক 'বিশসন' নামক নরকে পতিত হয়। যারা অব্যবহারযোগ্য বস্তু দান করে, তারা 'অধোমুখ' নামক নরকে পতিত হয়। যারা অনুপযুক্ত বস্তু সহযোগে যজ্ঞ করে, যারা নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের গতিবিধি জানে, যারা গোপনে উত্তম খাদ্যদ্রব্য একাই ভোজন করে, তারা 'কৃমিপূয়' নামক নরকে পতিত হয়। যারা লাক্ষা, মাংস, রস, তিল বা লবণ প্রভৃতি বিক্রয় করে এবং যে ব্রাহ্মণ বিড়াল, মোরগ, ছাগল, কুকুর, শুয়োর বা পাখি পালন করে, তারাও ঐ 'কৃমিপূয়' নরকে পতিত হয়। যে ব্রাহ্মণ অভিনয়কে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে, মাছের ব্যবসা করে, যে কোন রকম পাত্রে ভোজন করে, বিষ প্রয়োগ করে, যারা সূচ প্রভৃতির ব্যবসা করে, মহিষ পালন করে, পর্বদিনে স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হয়, ঘর পুড়িয়ে দেয়, বন্ধু হত্যা করে, নিজের গ্রামে যজন করে, সোম বিক্রয় করে, তারা 'রুধিরান্ধ' নামক নরকে পতিত হয়। যারা মধু অপহরণ করে, গ্রামের উপদ্রব ঘটায়, তারা বৈতরণী নদীতে পতিত হয়। যারা বীর্য পান করে, শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে, অপবিত্র প্রতারণাই যাদের জীবিকা, তারা 'কৃচ্ছ্র' নামক নরকে পতিত হয়। যারা অকারণে বন কেটে সাফ করে দেয়, তারা 'অসিপত্রবন' নামক নরকে পতিত হয়। যারা মেষ পালন করে বা মৃগ হত্যা করে, তারা 'বহ্নিজ্বাল' নামক নরকে পতিত হয়। যে ব্রাহ্মণ যেখানে সেখানে অগ্নির ব্যবহার করে, সেও ঐ নরকে গমন করে। যারা ব্রত গ্রহণ করে তা পালন করে না এবং যারা নিজের জাতিধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, তারা 'সন্দংশ' নামক নরকে পতিত হয়। যে ব্রহ্মচারী দিনের বেলায় স্বপ্নে বীর্যপাত করে এবং যে ব্যক্তি নিজের পুত্রের কাছে পড়াশোনা করে—এরা উভয়েই 'শ্বভোজন' নামক নরকে পতিত হয়। এ রকম আরো অনেক নরক আছে, যেখানে দুষ্কৃতকারীরা গিয়ে বিষম যাতনা ভোগ করে। যারা কর্ম, মন ও বাক্য দিয়ে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধ কাজ করে, তারা নিন্দিত নরকসমূহে যায়। পাপ আচরণকারী ব্যক্তিরা নতমস্তকে স্বর্গস্থ পুণ্যবান দেবতাদের দেখে এবং স্বর্গের লোকেরা এদের নীচের দিকে মুখ করে দেখে। আপনারা প্রজ্ঞাবান ব্রাহ্মণ, ঋষি। আপনারা এ কথা নিশ্চিত ভাবেই জানবেন যে, স্থাবর, জঙ্গম, কৃমি, জলজ, স্থলজ, পশু, পক্ষী, মানুষ—এরা সবাই কর্ম অনুসারে ধার্মিক হতে

পারে ; এমন কি, এরা এদের কাজের জন্য দেবত্ব ও মুক্তি পর্যন্ত পেতে পারে। যত প্রাণী স্বর্গে আছে, নরকেও তত প্রাণী আছে। যে সব পাপ আচরণকারী প্রায়শ্চিত্ত করে না, তারাই নরক ভোগ করে। ঋষিরা অনেক চিন্তা করে পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন। গুরু পাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং লঘু পাপে লঘু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রয়েছে।

স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুরা অনেক রকম প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু সে সবের মধ্যে কৃষ্ণকে স্মরণ করাই প্রধান। পাপ কাজ করে যে ব্যক্তি পরে সেজন্য অনুতাপ করে, তার পক্ষেই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়। পাপী ব্যক্তি সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় নারায়ণের নাম স্মরণ করলে তাঁকেই লাভ করে থাকে। ওই নাম করতে করতে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায় এবং তাতে সে মুক্তি পর্যন্ত পেয়ে থাকে। জপ, হোম, পূজা প্রভৃতি ব্যাপারে যে নারায়ণে মন সমর্পণ করে, মুক্তিলাভ কিংবা ইন্দ্রত্ব লাভের আকাংখা তার কাছে বাধা রূপে উপস্থিত হয়। পুনরায় সংসারে ফিরে আসার জন্য স্বর্গে যাওয়া কোথায়, আর সংসার থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পাওয়াই বা কোথায় ? তাই দিনরাত বিষ্ণুকেই স্মরণ করা উচিত। বিষ্ণুর স্মরণে বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ হলে কারুরই আর নরক-প্রাপ্তি ঘটে না। স্বর্গ মানুষের প্রীতিকর, নরক তার বিপরীত। পাপ ও পুণ্য এ দুটি বস্তুকেই নরক ও স্বর্গ নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুত কোন কিছুই চিরকালের জন্য দুঃখজনক হয় না ; কারণ একই বস্তু একবার সুখের, একবার দুঃখের, একবার ঈর্ষার, একবার আনন্দের কারণ হয়ে থাকে। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কেবল মনেরই পরিণতি মাত্র। জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম, আর অজ্ঞানই সমস্ত রকম বন্ধনের কারণ। এই বিশ্ব জ্ঞানের আধার, জ্ঞানের মতো এত বড় বন্ধু আর কিছুই নেই। আপনারা জ্ঞানকেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলে জানবেন। আপনাদের কাছে এতক্ষণ ধরে আমি সমস্ত পাতাল, বিশ্ব, নরক, সাগর, পর্বত, দ্বীপ, বর্ষ ও নদী প্রভৃতির কথা সংক্ষেপে বললাম। আর কি আপনারা শুনতে চান, আমাকে বলুন। আমি আপনাদের ইচ্ছা পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

—'পাতালনরককীর্তন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ তেইশ

লোমহর্ষণের প্রশ্নে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে মুনিরা সবিনয়ে তাঁকে বললেন—আপনি মহান, আমাদের অনুরোধে আপনি সব কথাই একে একে আমাদের বলেছেন। আপনার সহানুভূতি ও উদারতা আমাদের আকাংখাকে অধিক সাহসী করে তুলেছে। আপনি দয়া করে বিভিন্ন লোকসমূহের বিবরণ, গ্রহসমূহের সংস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কে যথাযথ ভাবে আমাদের বলুন।

লোমহর্ষণ মুনিদের অনুরোধে পরবর্তী কাহিনী বলে চললেন—সূর্য ও চন্দ্রের কিরণে যে পরিমাণ অংশ আলোকিত হয় সে স্থানই সমুদ্র-পর্বতবিশিষ্ট পৃথিবী বলে পরিচিত। পৃথিবীর বিস্তার যত, আকাশের বিস্তারও সে পর্যন্তই। পৃথিবীর লক্ষ যোজন উপরে সৌরমণ্ডল রয়েছে। চন্দ্রমণ্ডল সৌরমণ্ডল থেকেও লক্ষ যোজন দূরে রয়েছে। চন্দ্র থেকে এক হাজার একশো যোজন উপরে নক্ষত্র মণ্ডল রয়েছে। নক্ষত্র মণ্ডলেরও দু' লক্ষ যোজন দূরত্বে বুধ গ্রহের অবস্থান। বুধ গ্রহের অবস্থান থেকে ঠিক সেই পরিমাণ দূরত্বে রয়েছে

শুক্র ; শুক্রের অবস্থান থেকে দু' লক্ষ যোজন দূরত্বে রয়েছে মঙ্গল। মঙ্গলের দু' লক্ষ যোজন দূরে রয়েছে বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির দু' লক্ষ যোজন দূরে শনি। শনির ঠিক এক লক্ষ যোজন দূরে রয়েছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক হাজার যোজন দূরে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্রীভূত ধ্রুবমণ্ডল অবস্থিত। সংক্ষেপে ত্রিলোকের কথা আপনাদের বললাম। এই ধ্রুবলোক সমস্ত যজ্ঞীয় ফলের আধার। ধ্রুবলোকের উপরে মহর্লোক ; এই লোকে কল্পবাসীদের বাস। এই মহর্লোকের বিস্তার এক কোটি যোজন। জনলোকের বিস্তার দু' কোটি যোজন ; এই লোকে সনন্দন প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রেরা বাস করেন। জনলোক থেকে চারগুণ উপরে রয়েছে তপোলোক। এই তপলোকে বৈরাজ নামক অশরীরী দেবতারা বাস করেন। তপোলোক থেকে ছ' গুণ উপরে সত্যলোক রয়েছে। এই লোকে সিদ্ধ মুনিরা বাস করেন। এখানে এলে পুনরায় মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না।

ভূর্লোক তাকেই বলে যেখানে পায়ের নাগালে পাওয়া যায় এমন পার্থিব বস্তু রয়েছে। এই ভূর্লোকের বিস্তার আমি আগেই বলেছি। ভূমি ও সূর্যের মাঝখানে যে স্থান রয়েছে, তার নাম ভুবর্লোক ; এখানে সিদ্ধ মুনিরা বাস করেন। ধ্রুবলোক ও সূর্যের মাঝখানে যে চোদ্দ নিযুত যোজন পরিমাণ স্থান রয়েছে, তাকেই স্বর্লোক বলা হয়। প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই তিন লোককে 'কৃতক' এবং পরবর্তী তিন লোক অর্থাৎ জন, তপ ও সত্যলোককে 'অকৃতক' নামে অভিহিত করেন। এই দুই ত্রিলোকের মাঝখানে যে মহর্লোক রয়েছে তা 'কৃতকাকৃতক' নামে পরিচিত। এই মহর্লোক শূন্যময়, কিন্তু কল্পের শেষেও এর বিনাশ নেই। এই সাত মহালোক, সাত পাতাল ও ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার আপনাদের বললাম। এই ব্রহ্মাণ্ড কয়েতবেলের বীজের মতো বিশাল অণ্ডকোষ দিয়ে চারদিকে ঢাকা রয়েছে। এই অণ্ডকোষ আবার দশ গুণের বেশী জল দিয়ে বেষ্টিত রয়েছে। সেই জলবেষ্টন তার চেয়েও দশ গুণ বেশী আগুন দিয়ে ঢাকা রয়েছে। সেই আগুন আবার তার চেয়ে দশ গুণ বেশী বায়ু দিয়ে পরিবেষ্টিত রয়েছে, সেই বায়ু আবার তার চেয়েও দশ গুণ বেশী আকাশ দিয়ে বেষ্টিত রয়েছে। সেই আকাশ তার চেয়েও দশ গুণ বেশী মহত্তত্ত্ব দিয়ে রয়েছে বেষ্টিত। এই মহত্তত্ত্বকে বেষ্টন করে রয়েছে প্রধান বা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অনন্ত, কারণ প্রমাণের দ্বারা একে প্রতিপাদিত করা যায় না। ওই পরম প্রকৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপ। এ রকম হাজার হাজার, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঐ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে রয়েছে। কাঠে যেমন আগুন থাকে সুপ্তভাবে এবং তিলে যেমন তেল থাকে, ঠিক তেমনি ভাবেই চৈতন্য আত্মা সর্বব্যাপী পুরুষ এই প্রকৃতিতে থাকেন সম্মিলিত-ভাবে। প্রধান এবং পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে থাকে। এই প্রধান এবং পুরুষ বিষ্ণুশক্তি দ্বারা বিধৃত। আগে যে প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলা হয়েছে, এদের মধ্যে প্রকৃতি পুরুষ থেকে স্বতন্ত্রভাবে সকলের কারণ হয়ে থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ওই প্রকৃতিই কম্পনের কারণ হয়। জলকণিকায় যে শীতত্ব রয়েছে বায়ু যেমন তা ধারণ করে, উল্লিখিত বিষ্ণুশক্তি তেমনি প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎকে ধারণ করে থাকে। মূল, স্কন্ধ ও শাখাযুক্ত গাছ প্রথমে বীজ থেকে উদ্ভূত হয়। ওই গাছ থেকে অন্যান্য বীজ উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং ওই বীজ থেকে আবার গাছ উৎপন্ন হয়। এই গাছ আবার সেই সেই লক্ষণসম্পন্ন বস্তু ও কারণের অনুগত হয়ে থাকে। এভাবে অবিকৃত মূল প্রকৃতি থেকেই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং তা থেকেই দেবতা, দানব প্রভৃতির উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই দেবতারা আবার তাঁদের পুত্র প্রভৃতির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে থাকেন। বৃক্ষের বীজ থেকে বৃক্ষ

এবং তার শাখা-প্রশাখা উদ্ভূত হলে যেমন বৃক্ষের বিনাশ হয় না, তেমনি প্রাণী থেকে প্রাণীর সৃষ্টিতে প্রাণীর ক্ষয় হয় না। যেমন সংসর্গবশত আকাশ ও কাল প্রভৃতি বৃক্ষের কারণ হয়, তেমনি ভগবান বিষ্ণুই এই দৃশ্য বিশ্বের কারণ ; এই কারণ কিন্তু ক্ষয়হীন। ধানের বীজ থেকে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোশ, পুষ্প, ক্ষীর, চাল, তুষ ও কণাসমূহ উৎপন্ন হয়, তেমনি আত্মা থেকেই এই দৃশ্যমান বিশ্ব উৎপন্ন হয়। দেবতাদের শরীর বৃদ্ধি পেয়ে একীকৃত হয় এবং তা বিভিন্ন কল্যাণজনক কর্মে লিপ্ত থাকে। ওই দেবদেহ বিষ্ণুশক্তি সহযোগেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। তিনিই এই জগতের কারণ। তিনিই সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত, তাঁতেই এই জগৎ অবস্থিত এবং তাঁতেই আবার পরিণামে বিলীন হয়ে যায়। সেই ব্রহ্মই সৎ ও অসৎস্বরূপ পরম বস্তু। এই চরাচর সমগ্র জগৎ তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে রয়েছে। তিনিই মূল প্রকৃতি, এই জগৎই তাঁর ব্যক্ত রূপ ; তিনি এই জগতের মধ্য দিয়েই নিজেকে ব্যক্ত করেন। সমস্ত রকম কর্মের তিনি কর্তা। তিনি যজ্ঞরূপে পূজিত হয়ে থাকেন। তিনিই যজ্ঞের ফল। যুগ, কাল প্রভৃতি সমস্ত কিছুই সেই অনন্ত হরি থেকে উৎপন্ন, তাঁর অতিরিক্ত কিছুই নেই।

—'ভূর্ভুবস্বরাদিকীর্তন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ চব্বিশ

ভগবান বিষ্ণুর মহিমা বর্ণনা করে চললেন লোমহর্ষণ—ভগবান হরির যে তারকাময় স্বর্গীয় শুশুক সদৃশ রূপ রয়েছে, তার লেজের দিকে ধ্রুব অবস্থান করে। তিনি ভ্রমণ করতে থাকলে সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমণ করে। তাঁর পরিভ্রমণের সময় নক্ষত্র পুঞ্জ চাকার মতো গোলাকারে তাঁর অনুসরণ করে। সূর্য, চন্দ্র, তারা ও নক্ষত্রপুঞ্জ অন্যান্য গ্রহ সহ ধ্রুবের সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ। স্বর্গে শুশুকের মতো আকৃতি বিশিষ্ট যে জ্যোতিষ্করূপ বর্ণিত আছে, স্বয়ং নারায়ণই তার আধার। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব প্রজাপতির আরাধনা করেছিলেন, তার ফলে তিনি সেই তারাময় শুশুকের পুচ্ছদেশে (বিষ্ণুর শরীরাংশে) স্থান লাভ করেন। ভগবান বিষ্ণু শিশুমারের আধার, ধ্রুবের আধার শুশুক এবং সূর্যের আধার ধ্রুব। সূর্য ধ্রুবেই অবস্থান করেন। যেভাবে এই দেবতা. দানব, মানুষ পরিবৃত জগৎ সূর্যে অবস্থান করে, সে কথা আমার কাছ থেকে আপনারা শুনুন।

সূর্য ক্রমাগত আট মাস ধরে রস গ্রহণ করে তারপর সেই রস জলরূপে বর্ষণ করেন। সেই জল বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নেমে আসে। সেই জল থেকে শস্য উৎপন্ন হয় এবং সেই শস্যের দ্বারাই সমগ্র জগৎ প্রতিপালিত হয়ে থাকে। সূর্য নিজের কিরণসমূহের দ্বারা পৃথিবী থেকে জল গ্রহণ করে তা দিয়ে চন্দ্রকে পরিপুষ্ট করেন। চন্দ্র সেই জল নিয়ে ধূম, জ্যোতি ও বায়ুর সমষ্টিভূত মেঘ সৃষ্টি করেন ; এই মেঘের অন্য নাম অভ্র। জলরাশি এ থেকে ভ্রষ্ট হয় না বলে এর এ রকম নাম হয়েছে। মেঘসমূহে যে জল থাকে, তা কালপ্রবাহে পরিপুষ্ট হয় এবং বাতাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়ে থাকে। জল চার প্রকার—নদীস্থিত, সমুদ্রস্থিত, ভূমিস্থিত এবং প্রাণিস্থিত। সূর্য এই চার রকম জলই গ্রহণ করে থাকেন। এ ছাড়া সূর্য আকাশগঙ্গার জল আহরণ করে নিজের রশ্মির সাহায্যে তা পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সেই জলের সংস্পর্শে কোন কোন মানুষের পাপ

ধুয়ে যায় ; সেজন্য তাদের আর নরকে পতিত হতে হয় না। ওই আকাশগঙ্গার জল সূর্যের সংস্পর্শে এসে বিনা মেঘেই স্বর্গ থেকে ভূতলে পতিত হয়। আকাশ থেকে যে জল কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্রে পতিত হয়, তা ওই আকাশগঙ্গারই জল। যুগ্ম নক্ষত্রে আকাশ থেকে যে জল পতিত হয়, তা সূর্যরশ্মির দ্বারাই প্রেরিত হয়। আকাশগঙ্গার এই জল অত্যন্ত পবিত্র, পাপনাশক এবং ঐ জলের স্পর্শেই দিব্যস্নান সম্পন্ন হয়ে যায়। এ ছাড়াও মেঘ যে জল দান করে তাতে ওষধিসমূহ পরিপুষ্ট হয়ে থাকে এবং তাতে প্রাণিকুলের জীবনধারণ সম্ভব হয়। ফল পেকে গেলেই ওষধির মৃত্যু হয় ; ওষধিই প্রজাদের জীবন-ধারণের প্রধান উপায়। শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ ওষধির সাহায্যেই যথাবিধি যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করে থাকেন এবং দেবতাদের তৃপ্তিবিধান করেন। কি যজ্ঞ, কি বেদ, কি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের লোক, কি দেবতা, কি পশু, কি প্রাণী—সকলকেই এই ওষধি প্রাণধারণের রসদ জুগিয়ে তৃপ্ত করে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, এই চরাচর দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র বৃষ্টির দ্বারাই বিধৃত হয়ে থাকে। সেই সূর্য, যিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ, ধ্রুবের আধারে অধিষ্ঠিত। ধ্রুবের আধার শুশুক এবং শুশুকের আধার স্বয়ং নারায়ণ। নারায়ণ এই জ্যোতিঃপুঞ্জরূপ শুশুকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। তিনিই সমস্ত প্রাণীর ভাগ্য বিধান করেন ; তিনিই আদি, সনাতন। এই পৃথিবী ও সাগরবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনাদের বললাম। এরপর আপনারা আরো কি শুনতে চান, বলুন।

—'ধ্রুবসংস্থিতি নিরূপণ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ পঁচিশ

কাহিনীর চুম্বক ঋষিদের আরো কাহিনী শোনার জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল করে তুলল। তাঁরা লোমহর্ষণকে অনুরোধ জানালেন—পৃথিবীতে যত তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, সে-সবের কথা শোনার জন্য আমাদের মন ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। আপনি সে-কথা বিস্তৃত ভাবে আমাদের বলুন। ঋষিদের অনুরোধে লোমহর্ষণ তীর্থ প্রভৃতির কথা বলতে আরম্ভ করলেন। যাঁর বিদ্যা, কীর্তি ও তপস্যা রয়েছে এবং যিনি সংযতেন্দ্রিয়, তিনিই তীর্থফল পেয়ে থাকেন। বিশুদ্ধ মন, বাকসংযম ও ইন্দ্রিয়-সংযম—এগুলোই তীর্থপদবাচ্য। এই তীর্থই স্বর্গের পথ নির্দেশ করে। অপবিত্র সুরাপাত্রকে অসংখ্যবার জল দিয়ে ধুলেও যেমন তা পবিত্র হয় না, তেমনি যার মন অপবিত্র, তীর্থস্নানে তার কখনোই শুদ্ধিলাভ হয় না। তীর্থ, দান, ব্রত বা আশ্রম—কোনো কিছুই ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকের বিশুদ্ধি ঘটাতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করে মানুষ যেখানেই বাস করুক না কেন, সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্কর তীর্থ রূপে তার পক্ষে পরিগণিত হয়। পৃথিবীতে যত তীর্থ ও পবিত্র দেবস্থান রয়েছে, সে-সবের কথা এখন আপনাদের বলছি। পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের বিবরণ একশো বছরেও বলা যায় না ; তাই আমি সংক্ষেপেই তীর্থসমূহের বিবরণ আপনাদের সামনে রাখছি।

পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, ধর্মারণ্য, ধেনুক, চম্পকারণ্য, সৈন্ধবারণ্য, মগধারণ্য, দণ্ডকারণ্য, গয়া, প্রভাস, শ্রীতীর্থ, কনখল, ভৃগুতুঙ্গ, হিরণ্যাক্ষ, ভীমারণ্য, কুশস্থলী, লোহাকুল, কেদার, মন্দরারণ্য, মহাবল, কোটিতীর্থ, রূপতীর্থ, শূকরব, চক্রতীর্থ, যোগ-তীর্থ, সোমতীর্থ, সাহোটক, কোকামুখ, বদরীশৈল, তুঙ্গকূট, স্কন্দাশ্রম, অগ্নিপদ, পঞ্চশিখ

তীর্থ, ধর্মোদ্ভব, বাধপ্রমোচন, গঙ্গাদ্বার, পঞ্চকূট, পঞ্চশিখ, মধ্যকেশর। চক্রপ্রভ, মতঙ্গ, ক্রুশদণ্ড, দংষ্ট্রাকুণ্ড, বিষ্ণুতীর্থ, মৎস্যাতিল, সুপ্রভ, ব্রহ্মকুণ্ড, বহ্নিকুণ্ড, সত্যপদ, চতুঃস্রোত, চতুঃশৃঙ্গ, দ্বাদশধারক, মানস, স্থূলশৃঙ্গ, স্থূলদণ্ড, উর্বশীতীর্থ, লোকপাল, মনুবর, সোমাহ্ব শৈল, মেরুকুণ্ড, সোমাভিষেক, মহাস্রোত, কোটরক, পঞ্চধার, ত্রিধারক, সপ্তধার, একধার, অমরকণ্টক, শালগ্রাম চক্রতীর্থ, কোটিদ্রুম, বিল্বপ্রভ, দেবহ্রদ, বিষ্ণুহ্রদ, শঙ্খপ্রভ, দেবকুণ্ড, বজ্রায়ুধ, অগ্নিপ্রভ, পুন্নাগ, দেবপ্রভ, বিদ্যাধর, গান্ধর্ব, ব্রহ্মহ্রদ, লোকপাল তীর্থ, মণিপুরগিরি, পঞ্চহ্রদ, পবিত্র পিণ্ডারক, মালব্য, গোপ্রভাব, গোবর, বটমূলক, স্নানদণ্ড, প্রয়াগ, গুহ্য বিষ্ণুপদ, কন্যাশ্রম, বায়ুকুণ্ড, জম্বুমার্গ, গভস্তিতীর্থ, যযাতি-পতন, ভদ্রবট, মহাকালবন, নর্মদাতীর্থ, বজ্রতীর্থ, অর্বুদ, পিঙ্গু, বাশিষ্ঠ, পৃথু-সঙ্গম, দৌবাসিক, পিঞ্জরক, ঋষিতীর্থ, ব্রহ্মতুঙ্গ, বসুতীর্থ, কুমারিক, শত্রুতীর্থ, পঞ্চনদ, রেণুকাতীর্থ, বিমল পৈতামহ, উত্তম রুদ্রপাদ, মণিমত্ত, কামাখ্য কৃষ্ণতীর্থ, কুশাবিল, যজন, যাজন, ব্রহ্মবালুক। পুষ্পন্যাস, পুণ্ডরীক, মণিপুর, উত্তর দীর্ঘসত্র, হয়পদ, অনশন, গঙ্গোদ্ভব, শিবোদ্ভেদ, নর্মদোদ্ভেদ, বস্ত্রাপদ, দারুবল, ছায়ারোহণ, সিদ্ধেশ্বর মিত্রবল, কালিকাশ্রম, বটাবট ভদ্রবট, কৌশাম্বী, দিবাকর, সারস্বত দ্বীপ, বিজয়, কামদ, রুদ্রকোটি, সুমনস, সদ্রাবনামিত, স্যমন্তপঞ্চক, ব্রহ্মতীর্থ, সুদর্শন, পৃথিবীসর্গ, পারিপ্লব, পৃথুদক, দশাশ্বমেধিক, সর্পিজ, বিষয়ান্তিক, কোটিতীর্থ পঞ্চনদ, বরাহ, যাক্ষিণীহ্রদ, পুণ্ডরীক, সোমতীর্থ মুঞ্জবট, বদরীবন, রত্নমূলক, লোকদ্বার, পঞ্চতীর্থ, কপিলাতীর্থ সূর্যতীর্থ, শঙ্খিনীতীর্থ, গোভবনতীর্থ, যক্ষরাজ তীর্থ, সুতীর্থ, ব্রহ্মাবর্ত, কামেশ্বর মাতৃতীর্থ, শীতবন, স্নানলোমাপহ, মাসসংসরক, দশাশ্বমেধ, কেদার, ব্রহ্মোদুম্বর, সপ্তর্ষিকুণ্ড, দেবীতীর্থ, সুজম্বুক, ঈটাস্পদ, কোটিকূট, কিন্দান, কিঞ্জপ, কারণ্ডব, অবেধ্য, ত্রিবিষ্টপ, পাণিখাত, মিশ্রক, মধুবট, মনোহর, কৌশিকী, দেবতীর্থ, ঋণমোচন, মৃগধূম, বিষ্ণুপদ, কোটিতীর্থ অমরহ্রদ, শ্রীকুঞ্জ, শালিতীর্থ, নৈমিষেয়, ব্রহ্মস্থান, সোমতীর্থ, কন্যাতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ, মনস্তীর্থ, কুরুপাবন ; সৌগন্ধিকবন, মণিতীর্থ, সরস্বতীতীর্থ, ঈশানতীর্থ, পাণ্ডযজ্ঞিক, ত্রিশূলধার, মাহেন্দ্র, দেবস্থান, কৃতালয়, দেবতীর্থ, শাকম্ভরী, সুবর্ণতীর্থ, কালাহ্রদ, ক্ষীরস্রব, বিরূপাক্ষ, ভৃগুতীর্থ, কুশোদ্ভব, ব্রহ্মতীর্থ, ব্রহ্মযোনি, নীলাচল, কুব্জাম্রক, ভদ্রবট, বাশিষ্ঠপদ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, কালিকাশ্রম, রুদ্রাবর্ত, সুগন্ধাশ্ব, কপিলাবন, ভদ্রকর্ণ হ্রদ, শঙ্কুকর্ণ হ্রদ। সপ্তসারস্বত, ঔশনস, কপালমোচন, অবকীর্ণ, কাম্যক, চতুঃসামুদ্রিক, শতিক, সহস্রিক, রেণুক, পঞ্চবটক, বিমোচন, ঔজস, স্থাণুতীর্থ, কুরুতীর্থ, স্বর্গদ্বার, কুশধ্বজ, বিশ্বেশ্বর, মানবক কূপ, নারায়ণাশ্রম, গঙ্গাহ্রদ, বট, বদরী-পাটন, ইন্দ্রমার্গ, একরাত্র, ক্ষীরকাবাস, সোমতীর্থ, দধীচিতীর্থ, শ্রুততীর্থ, কোটিতীর্থ-স্থলী, ভদ্রকালী হ্রদ, অরুন্ধতী বন, ব্রহ্মাবর্ত, অশ্ববেদী, কুব্জাবন, যমুনাপ্রভব, বীরপ্রমোক্ষ, সিন্ধুত্থ, ঋষিকুল্যা, কৃত্তিকা, উর্বীসংক্রমণ, মায়াবিদ্যোদ্ভব, মহাশ্রম বৈতসিকারূপ, সুন্দরিকাশ্রম, বাহুতীর্থ, চারুনদী, বিমলাশোক, পঞ্চনদ ধীমান মার্কণ্ডেয়ের সোমতীর্থ, সিতোদ, মৎস্যোদরী, সূর্যপ্রভ, সূর্যতীর্থ, অশোকবন, অরুণাস্পদ, কামদ, শুক্রতীর্থ, বালুক, পিশাচমোচন, সুভদ্রা হ্রদ, বিমলাদণ্ড কুণ্ড, চণ্ডেশ্বরতীর্থ, জ্যেষ্ঠস্থানহ্রদ, পুণ্য ব্রহ্মসর, জৈগীষব্যগুহা, ঘণ্টাকর্ণ হ্রদ, পুণ্ডরীক হ্রদ, কর্কোটিকবাপী, সুবর্ণোদপান, শ্বেততীর্থ হ্রদ, ঘর্ঘরিকাকুণ্ড, শ্যামাকূপ, চন্দ্রিকাতীর্থ, শ্মশানস্তম্ভকূপ, বিনায়ক হ্রদ, সিন্দুভব কূপ, রুদ্রবাস, নাগতীর্থ, পুলোমক, ভক্ত হ্রদ,

ক্ষীরসর, প্রেতাধার, কুমারক, ব্রহ্মাবর্ত, কুশাবর্ত, দধিকর্ণোদপানক, শৃঙ্গতীর্থ, মহাতীর্থ, মহানদী, দিব্যপুণ্য ব্রহ্মসর, গয়াশীর্ষ, অক্ষয়বট, দক্ষিণ ও উত্তর গোময়, রূপশীতিক, কপিলা হ্রদ, গৃধ্রবট, সাবিত্রী হ্রদ, প্রভাসন, সীতবন, যোনিদ্বার, ধেনুক, ধন্যক, কোকিলা মতঙ্গ হ্রদ, পিতৃকূপ, রুদ্রতীর্থ, শক্রতীর্থ, সুমালী, ব্রহ্মস্থান, সপ্তকুণ্ড, মণিরত্ন হ্রদ, কৌশিক্য, জ্যেষ্ঠালিকা, বিশ্বেশ্বর, কল্পসর, কন্যাসংবেদ, নিশ্চিবাপ্রভব, বশিষ্ঠাশ্রম, দেবকূট, বশিষ্ঠাশ্রমকূপ, বীরাশ্রম, ব্রহ্মবীর, অবকাপিলী, কুমারধারা, শ্রীধারা, গৌরীশিখর, শবকুণ্ড, নন্দিতীর্থ, কুমারবাস, শ্রীবাস, কুম্ভকর্ণ হ্রদ, কৌশিকী হ্রদ, ধর্মতীর্থ, কামতীর্থ, উদ্দালকতীর্থ, সন্ধ্যাতীর্থ, কারতোয়, কপিল, লোহিতার্ণব, শোণোদ্ভব, বংশগুল্ম, ঋষভ, ফলতীর্থ, পুণ্যাবতী হ্রদ, বদরিকাশ্রম, রামতীর্থ, পিতৃবন, বিরজাতীর্থ, মার্কণ্ডেয় বন, কৃষ্ণতীর্থ, রোহিণীকূপ প্রবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সর, সানুগর্ত, মাহেন্দ্র, শ্রীতীর্থ, শ্রীনদ, ইষুতীর্থ, ঋষভতীর্থ, কাবেরী হ্রদ, কন্যাতীর্থ, গোকর্ণ, গায়ত্রীস্থান, বদরী হ্রদ, মধ্যস্থান, বিকর্ণ, জাতী হ্রদ, দেবকূপ, কুশপ্রবণ, সর্বদেবব্রত, কন্যাশ্রম হ্রদ, বালখিল্য হ্রদ, মহর্ষি হ্রদ ও অখণ্ডিত হ্রদ।

যে সব সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি উপবাস করে শ্রদ্ধাসহকারে ওই সব তীর্থে স্নান করে এবং দেবতা, ঋষি ও পিতাদের তর্পণ করে প্রতি তীর্থে তিন তিন রাত্রি কাটায়, সে পৃথক্ পৃথক ভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে এই উত্তম তীর্থমহিমা শোনে, পাঠ করে কিংবা শোনায়, সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়।

—'তীর্থমাহাত্ম্যবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ ছাব্বিশ

লোমহর্ষণের মুখ থেকে তীর্থ বিবরণ শোনার পর মুনিরা তাঁকে পুনরায় অনুরোধ করলেন—আপনি তো আমাদের তীর্থসমূহের কথা শোনালেন, এখন দয়া করে সেই স্থানের কথা বলুন যা ধর্ম, কাম ও মোক্ষজনক এবং যা তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মুনিদের অনুরোধের উত্তরে লোমহর্ষণ বললেন—আপনারা আমায় যে প্রশ্ন করলেন, আজ থেকে অনেক দিন আগে আমার গুরুকে তদানীন্তন মুনিরা এই একই প্রশ্ন করেছিলেন। সে যা হোক, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করছি, আপনারা নিবিষ্ট চিত্তে শুনুন।

একবার মহর্ষি বেদব্যাস কুরুক্ষেত্রস্থ নিজের আশ্রমে বসে ছিলেন। তাঁর আশ্রম নানান গাছে পরিপূর্ণ; সেই গাছে ফোটে হরেক রকম ফুল। হরিণরা সেখানে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে রয়েছে পুন্নাগ, কর্ণিকার, সরল, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, কাঁঠাল, ধব, খদির, পাটল, অশোক, বকুল, করবী, চাঁপা ও আরো অনেক রকম গাছ। আমার গুরুদেব বেদব্যাস প্রাজ্ঞদের বরেণ্য, মহাভারতের প্রণেতা, সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, অধ্যাত্মজ্ঞানে তৎপর, সকল জীবের কল্যাণ কামনায় নিরত। তিনি পুরাণ ও আগমশাস্ত্রের প্রবক্তা এবং বেদ ও বেদাঙ্গে ছিলেন পারদর্শী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য মুনিরা তাঁর আশ্রমে আসেন। যে মুনিরা তাঁর কাছে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান মুনিদের নাম বলছি—কশ্যপ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, জৈমিনি, ধৌম্য, মার্কণ্ডেয়, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, বাৎস্য, গার্গ্য, আসুরি, সুমন্ত, ভার্গব, কণ্ব, মেধাতিথি, মাণ্ডব্য,

চ্যবন, ধূম্র, অসিত, দেবল, মৌদগল্য, তৃণযজ্ঞ, পিপ্পলাদ, অকৃতব্রণ, সম্বর্ত, কৌশিক, রৈভ্য, মৈত্রেয়, হারিত, শাণ্ডিল্য, বিভাম্র, দুর্বাসা, লোমশ, নারদ, পর্বত, বৈশম্পায়ন, গালব, ভাস্করি, পূরণ, সুত, পুলস্ত্য, কপিল, উলূক, পুলহ, বায়ু, দেবস্থান, চতুর্ভুজ, সনৎকুমার, পৈল, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণানু ভৌতিক। এই সব মুনি ও অন্যান্য মুনিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ব্যাসদেব নক্ষত্র পরিবৃত চন্দ্রমার মতো বিরাজ করছিলেন। ব্যাসদেব সেই মুনিদের যথোচিত সৎকার করলেন, তাঁরা ব্যাসদেবকে প্রণাম করে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হলেন। কথা শেষে সেই মুনিরা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকে তাঁদের সংশয়ের বিষয় জিগ্যেস করলেন—আপনি বেদজ্ঞ ; পুরাণ, আগম প্রভৃতি শাস্ত্রে আপনার পারদর্শিতা অসামান্য। অতীত, বর্তমান ও অনাগত কালের কথা আপনার মতো যোগীর অজানা নেই। এই সংসার দুঃখময় ; এখানে সার কোন কিছুই নেই। এই ভবসমুদ্র বিষয়-জলে পরিপূর্ণ, রাগরূপ জলজন্তু গণে সমাকুল, এতে ইন্দ্রিয়রূপ আবর্ত রয়েছে, দৃশ্যসমূহ এর ঊর্মিমালা, মোহরূপ পঙ্কে এই সমুদ্র কলুষিত হয়ে রয়েছে এবং লোভরূপ গাম্ভীর্যবশত এতে অবগাহন করা কষ্টকর। আমরা এ রকম ভীষণ ভবসমুদ্রে এই নিরাশ্রয় জড় জগৎকে নিমগ্ন দেখে আপনাকে জিগ্যেস করছি যে, এই ভীষণ সংসারে প্রকৃত মঙ্গল কি ? আমরা এ বিষয়ে জানতে খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। দয়া করে আমাদের সংশয় দূর করুন। পৃথিবীর মধ্যে মোক্ষদায়ক অথচ উৎকৃষ্ট কর্মময় ভূমি কি এবং কোথায় তা রয়েছে সে-কথা আমাদের বলুন। লোকেরা যে জায়গায় বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে পরম সিদ্ধি লাভ করে এবং বিহিত অনুষ্ঠান না করে নরকে গমন করে, সুধী পুরুষেরা যেখানে মোক্ষলাভ করে থাকেন, সে জায়গার কথা আপনি আমাদের বলুন। ভগবান বেদব্যাস মুনিদের কথা শুনে তাঁদের বললেন—আপনারা যা যা আমাকে জিগ্যেস করলেন, সে ব্যাপারে ব্রহ্মার সঙ্গে ঋষিদের যে কথাবার্তা হয়েছিল, তাই আপনাদের বলছি।

যে স্থান নানান রত্নে অলংকৃত, নানান বৃক্ষ ও লতায় সমাকীর্ণ, নানান ফুলে শোভিত, নানা রকম পাখি যেখানে সর্বদা কূজন করে, অসংখ্য প্রাণী বিরাজ করে, নানান শিলাখণ্ডে অলংকৃত হয়ে রয়েছে যার প্রতিটি নদীতট, যেখানে নানান মুনি তপস্যা করেন, সেই রকম বিস্তীর্ণ, সুন্দর মেরুপৃষ্ঠে চতুরানন ব্রহ্মা এক সময় বসে ছিলেন। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, সর্প, মুনি, সিদ্ধ ও অপ্সরা প্রভৃতি স্বর্গবাসীরা সেই জগৎপতি ব্রহ্মার চারদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর স্তব এবং গুণগান করছিলেন। কেউ কেউ বিভিন্ন রকম বাজনা বাজাচ্ছিলেন, কেউ কেউ আবার আনন্দে নৃত্য করছিলেন। সেখানে ফুলের গন্ধ নিয়ে দক্ষিণের বাতাস বইছিলমৃদু মন্দ ভাবে। সেই সময় ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরা পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করে এই বিষয় জিগ্যেস করলেন। তাঁরা বললেন—হে পিতামহ, দেবাদিদেব ! পৃথিবীতে যা কর্মক্ষেত্র অথচ দুর্লভ মোক্ষক্ষেত্র বলে বিখ্যাত, তার কথা শোনার জন্য আমরা উৎসুক হয়েছি। আপনি আমাদের সে-কথা বলুন। ব্রহ্মা মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে যা যা বলেছিলেন সে কথাই ব্যাসদেব তাঁর আশ্রমে সমবেত মুনিদের বললেন।

—'স্বয়ম্ভূব্রহ্মর্ষিসংবাদে প্রশ্ননিরূপণ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় : সাতাশ

ব্রহ্মা মুনিদের বলতে আরম্ভ করলেন—পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষই কর্মভূমি বলে বিখ্যাত। কেবল কর্মভূমি নয়; ভারতে কর্মের জন্য স্বর্গ, নরক প্রভৃতি ফল পাওয়া যায় বলে ভারতবর্ষ কর্মফলভূমি নামেও বিখ্যাত। ভারতবর্ষে মানুষেরা পাপ বা পুণ্য করে অবশ্যই তার সমুচিত ফল ভোগ করে। ভারতবর্ষে যে সব ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁরা সংযত হয়ে নিজের নিজের নির্দিষ্ট কাজ করে পরম সিদ্ধি লাভ করে থাকেন। এখানকার লোকেরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার প্রকার ফল লাভ করেন। এখানকার এতই মাহাত্ম্য যে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও এই ভারতবর্ষেই শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে দেবত্ব লাভ করেছিলেন। এ ছাড়াও আরো কত যে জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, বীতরাগ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে মোক্ষলাভ করেছেন, তার কোনো হিসেব নেই। স্বর্গে যে সব বিমানচারী দেবতারা আছেন, তাঁরাও ভারতবর্ষে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেই স্বর্গে ঠাঁই পেতে পেরেছেন। দেবতারা চিরদিনই এই ভারতবর্ষে বাস করার আকাঙ্খা করেন এবং তাঁরা মনে মনে এ রকম কামনা করে থাকেন যে, কবে তাঁরা ভারতবর্ষ দেখবেন, কবে ভারতবর্ষে যেতে পারবেন।

ব্রহ্মার কথা শুনে মুনিরা বললেন—আপনি যে বললেন, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও পাপ বা পুণ্য নেই এবং ভারতবর্ষেই স্বর্গ, মোক্ষ ও মধ্যগতি পাওয়া যায়, এ কথা আমরা স্বীকার করছি। এখন তবে আমাদের ভারত-কথাই বিস্তৃতভাবে বলুন। ভারতবর্ষের অবস্থান, সেখানকার যত বর্ষ পর্বত ও তাদের যত ভেদ রয়েছে, সে-সবই আমাদের দয়া করে বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা ভারত-কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ভারতবর্ষে ন'টি দ্বীপ রয়েছে—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব, বারুণ ও সাগরসংবৃত। শেষের এই দ্বীপটি দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত এবং হাজার যোজন বিস্তৃত। ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে কিরাত ও পশ্চিম দিকে যবনদের বাস। এর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের অবস্থান। এই চার বর্ণের লোকেরা যথাক্রমে যজন-যাজন, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি কাজে সব সময়ই ব্যাপৃত থাকে। ভারতবর্ষ স্বর্গ ও অপবর্গের কারণ এবং পুণ্য বা পাপের উৎপত্তি স্থান। তবে ওই পাপ বা পুণ্য মানুষ তার কর্ম অনুসারেই লাভ করে থাকে। ভারতবর্ষে সাতটি বর্ষ পর্বত রয়েছে; এদের নাম—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র। এই বর্ষ পর্বত ছাড়া আরো অনেক পর্বত রয়েছে। সেই পর্বতসমূহও বিস্তৃত, উন্নত, সুন্দর, বিশাল ও বিচিত্র। সেই অসংখ্য পর্বতের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি পর্বতের নাম বলছি—কোলাহল, মন্দর, বৈভ্রাজ, দর্দুর, বাতন্ধয়, বৈদ্যুত, মৈনাক, সুরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, গোবর্ধন, পাণ্ডর, পুষ্পগিরি, বৈজয়ন্তী, রৈবত, অর্বুদ, ঋষ্যমূক, গোমন্থ, কৃতশৈল, কৃতাচল, শ্রীপর্বত, চকোর প্রভৃতি। এই সব পর্বতের পাশে, নীচে এবং কোথাও কোথাও মাঝখানে অসংখ্য জনপদ রয়েছে। এই সব জনপদে ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতি আলাদা আলাদা ভাবে বাস করে। ওই সব জনপদবাসীরা যে সব নদীর জল পান করে থাকে, এবার সেই নদীসমূহের নাম বলছি—গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিপাশা, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহূ, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, চক্ষু, নিষ্ঠীবা, গণ্ডকী ও কৌশিক। এই নদীগুলো হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দেবস্মৃতি, দেববতী

বাতঘ্নী, সিন্ধু, বেণ্যা, চন্দনা, সদানীরা, মহী, চর্মণ্বতী, বৃষা, বিদিশা, বেদবতী, সিপ্রা ও অবন্তী—এই নদীগুলো পারিযাত্র পর্বত থেকে উৎপন্ন। শোণা, মহানদী, নর্মদা, সুরথা, ক্রিয়া, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, চিত্রোৎপলা, বেত্রবতী, করমোদা, পিশাচিকা, অতিলঘুশ্রোণী, বিপাপ্না, শৈবলা, সধেরুজা, শুক্তিমতী, শকুনী, ত্রিদিবা, ক্রমু ও বেগ-বাহিনী—এই সব নদী ঋক্ষ পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সিপ্রা, পয়োষ্ঠী, নির্বিন্ধ্যা, তাপী, বেণা, বৈতরণী, সিনীবালী, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা ও অন্তঃশিলা—এই সব নদী আবার বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও পাপনাশিনী—এই সব নদী সহ্য পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্যজ্ঞা ও প্রত্যলাবতী—এই নদীগুলো উৎপন্ন হয়েছে মলয় পর্বতের পাদদেশ থেকে। এদের জল শীতল ও অতি পবিত্র। পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, ঋষিকুল্যা, বঞ্জুলা, ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী ও বংশকরা—এই সব নদী মহেন্দ্র পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। শুক্তিমান পর্বতের পাদদেশ থেকে যে সব নদী উৎপন্ন হয়েছে, সেগুলোর নাম—সুবিকালা, কুমারী, মনুগা, মন্দগামিনী ও ক্ষয়াপ-লাসিনী। এই সব নদীই পুণ্যজনক; সবগুলোই গঙ্গা ও সরস্বতীর সমকক্ষ। এই নদীগুলি জগতের মাতার মতো। এছাড়াও আরো অনেক ছোট ছোট নদী রয়েছে ভারত-বর্ষে। এগুলোর মধ্যে কতকগুলো বর্ষাকালে প্রবাহিত হয় এবং কতকগুলো সর্বদাই প্রবাহিত হয়ে থাকে।

মৎস্য, মুকুটকুল্য, কুণ্ডল, কাশী, কোশল, অশ্মক, কলিঙ্গ, শমক ও বৃক প্রভৃতি ভারতবর্ষের মধ্যদেশীয় জনপদ বলে পরিচিত। সহ্য পর্বতের উত্তর দিকে যে দেশ আছে, যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হচ্ছে; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই দেশ অতি মনোরম। সেখানে মহাত্মা ভার্গবের রমণীয় গোবর্ধনপুর রয়েছে। ভারতবর্ষের উত্তর দিকে যে সব দেশ রয়েছে তাদের নাম—বাহ্লীক, বাটধান, সুতীর, কালতোয়দ, অপরান্ত, শূদ্র, বাহ্লিক, কেরল, গান্ধার যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শতদ্রুহ, কলিঙ্গ, পারদ, হারমূষিক, মাঠর, কনক, কৈকেয়, দণ্ডমালিক, ক্ষত্রিয়োপম দেশ, বৈশ্য ও শূদ্রকুল, কাম্বোজ, বর্বর, লৌকিক, বীর, তুষার, পহ্লব, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, পুষ্কল, দশেরক, লম্পক, শূনশোক, কুলিক, জাঙ্গল, ঔষধ্য, চলচন্দ্র, কিরাত, তোমর, হংসমার্গ, কাশ্মীর, করুণ, শূলিক, কুহক ও মাগধ। এখন ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে যে সব দেশ রয়েছে, তাদের নাম বলছি—অন্ধ, বামঙ্কুরাক, বল্লক, মখান্তক, অঙ্গ, বঙ্গ, মলদ, মালবর্তিক, ভদ্রতুঙ্গ, প্রতিজয়, ভার্যাঙ্গ, চাপামর্দক, প্রাগজ্যোতিষ, মদ্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মল্ল, মাগধক ও নন্দ। দক্ষিণাপথে যে সব জনপদ রয়েছে তাদের নাম—পূর্ণ, কেরল, গোলাঙ্গুল, ঋষিক, মূষিক, কুমার, রামঠ, শক, মহারাষ্ট্র, মাহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈশিক্য, অটব্য, সবর, পুলিন্দ, মৌলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌলিক, মৌলিক, অশ্মক, ভোজবর্ধন, কৌলিক, কুন্তল, দণ্ডক ও নীল-কালক। পশ্চিম দিকে যে সব দেশ রয়েছে তাদের নাম—শূর্পারিক, কালিধন, লোল ও তালকট। এবার বিন্ধ্য পর্বতের সন্নিহিত দেশ সমূহের নাম বলছি, শুনুন—মলজ, কর্কশ মেলক, চোলক, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিঙ্কিকম্প্য, তোষল, কোশল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুম্বুর, চর, যবন, পবন, অভয়, রুণ্ডিকের, চর্চর, হোত্রধাতি প্রভৃতি। পর্বতকে আশ্রয় করে যে দেশগুলো রয়েছে, তাদের নাম বলছি—নীহার, তুষমার্গ, কুরব, তঙ্গণ, খস, কর্ণপ্রাবরণ, ঊর্ণ, দর্ঘ, কুন্তক, চিত্রমার্গ, মালব, কিরাত ও তোমর।

ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত। এর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সমুদ্র রয়েছে এবং উত্তর দিকে ধনুর্গুণের আকারে রয়েছে হিমালয়। ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব এবং ইন্দ্রত্ব লাভ পর্যন্ত এই ভারতবর্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কর্ম অনুসারে প্রাণীগণ এখানে মৃগ, যক্ষ, অপ্সরা, সরীসৃপ প্রভৃতি ইতর প্রাণীতে পরিণত হয়। জগতে এই ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন কর্মভূমি নেই। দেবতারাও এমন ইচ্ছা করে থাকেন যে, আমরা যখন দেবত্ব থেকে ভ্রষ্ট হব, তখন আমরা ভারতভূমিতে গিয়েই মনুষ্যত্ব লাভ করব। ভারতবর্ষের জিতেন্দ্রিয় মানুষেরা যে কাজ করতে পারে, কর্মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ দেবতারাও সে-কাজ করতে পারেন না। এই ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের লোকেরা অভীষ্ট ফল পেয়ে থাকে। যাঁরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরাই মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁরা ধন্য। তাঁরা ধর্ম, কাম ও মোক্ষের চরম উৎকর্ষ লাভ করে থাকেন। দেবতারা তাই সাগ্রহে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্খা পোষণ করেন। বিবিধ ব্রত, নানান শাস্ত্রের অধ্যয়ণ, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি চার আশ্রম পালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও জনকল্যাণ এবং অন্য সব রকম মঙ্গল-জনক কর্মেরই ফল লাভ এখানে করা যায়। ভারতবর্ষের এত গুণ যে তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। ভারতবর্ষের কথা সমস্ত রকম পাপ নাশ করে। এই কাহিনী পুণ্যময় ও বুদ্ধি বিকাশে সহায়ক। যে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে প্রত্যহ এই ভারত-কথা শোনে, সে-সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করে।

—'ভারতবর্ষানুকীর্তন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ আটাশ

ব্রহ্মা সেই মুনিদের বলে চললেন—এই ভারতবর্ষের দক্ষিণে যে সমুদ্র রয়েছে, তার কাছেই ওড্র নামে একটি বিখ্যাত দেশ আছে। ওই দেশ স্বর্গ ও মোক্ষদায়ক। সমুদ্রের উত্তরে বিরজমণ্ডল পর্যন্ত যে দেশ বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, তা পুণ্যচারী জনগণের অধ্যুষিত দেশ বলে প্রসিদ্ধ। সে দেশে যে সব জিতেন্দ্রিয় ও তপস্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা সকলেরই পূজ্য এবং বন্দনীয়। পৌরোহিত্য কর্মে তাঁরা অগ্রগণ্য। সেখানকার ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ, ইতিহাসবিদ, পুরাণে পটু, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও ক্রোধহীন ; সততই এঁরা যজ্ঞকর্মে নিরত থাকেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বৈদিক কর্মে রত এবং অনেকে স্মার্ত কর্মে নিরত। ব্রাহ্মণেরা দাতা, সত্যবাদী এবং পুত্রবান ; এঁরা উৎকল দেশে বসবাস করেন। এই উৎকল দেশে সর্বদাই যজ্ঞকার্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য তিন বর্ণের লোকেরাও এখানে নিজের নিজের নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে। এই উৎকল দেশে কোণাদিত্য নামে একটি সূর্যমূর্তি রয়েছে। মর্ত্যবাসিরা সেই মূর্তি দর্শন করলে সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়।

মুনিরা তখন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন—সেই উৎকল দেশের ঠিক কোনখানে সূর্য-দেবের ঐ মূর্তি রয়েছে, তা আমাদের বলুন।

মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—লবণ সমুদ্রের পবিত্র তীরদেশে সূর্যের মনোহর ক্ষেত্র বিরাজিত। এখানকার চারদিক বালিতে ঢাকা রয়েছে। এখানে রয়েছে চাঁপা অশোক, বকুল, নাগকেশর, তগর, ধববাণ, অতিমুক্ত, কুব্জক, মালতী, কুন্দ ও মল্লিকা এবং আরো অনেক ফুলের গাছ। কেতকী, কদম্ব, লকুচ, শাল, কাঁঠাল, দেবদারু, সরল,

মুচকুন্দ, চন্দন, অশ্বত্থ, সপ্তপর্ণ, আম, আম্রাতক, তাল, পুগফল, নারিকেল, কয়েৎবেল প্রভৃতি আরো অনেক গাছ রয়েছে সেখানে। এর চারদিকের বিস্তৃতি-পরিমাণ এক যোজন। স্বয়ং সূর্য ঐ স্থানে 'কোণাদিত্য' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। তিনি সাধকদের ভোগ ও মোক্ষ দান করে থাকেন। মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমী তিথিতে উপবাসী থেকে বিধিমতো সমুদ্রে স্নান করে, শুদ্ধ হয়ে সেই সূর্যের পুজা করতে হয়। পর দিন ভোরবেলা আবার সমুদ্রে বিধিমতো স্নান করে দেবতা, পিতা, ঋষি ও মানুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে, পরিষ্কার দু'খানা কাপড় পরে আচমন করবে এবং সংযতমনা হয়ে সমুদ্রতীরে উপবেশন করবে। তারপর সূর্যোদয়ের সময় পূর্ব দিকে মুখ করে রক্তচন্দন দিয়ে মাটিতে একটি পদ্মফুল আঁকবে। ওই পদ্মের আটটি পাতা ও কেশর থাকবে। পদ্মের ফলত্বকগুলো উপর দিকে মুখ করে থাকবে। ওই পদ্মের উপর একটি তামার পাত্র রেখে তাতে তিল, চাল, জল, রক্তচন্দন, লাল ফুল ও কুশ ফেলে দেবে। যদি তামার পাত্র না পাওয়া যায় তবে অর্কপাতায় তিল রেখে অন্য পাত্র দিয়ে ঢেকে এক জায়গায় রেখে দেবে। তারপর বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস প্রভৃতি করে আত্মাকে সূর্যমূর্তিরূপে ধ্যান করে সাধক অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশান কোণে এবং মধ্যভাগে সূর্যকে পুজা করবে। পরমারাধ্য সূর্যকে আকাশ থেকে পদ্মের উপর আবাহন করে পুজা করবে ; তারপর ওই পদ্মের ফলত্বকের উপর তাঁকে স্থাপন করে মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। পুজা শেষ করে সূর্যকে এভাবে ধ্যান করবে। এই সূর্য তেজস্বরূপ ; ইনি সাদা পদ্মের উপর উপবিষ্ট। তাঁর চোখ পিঙ্গলবর্ণের ; তাঁর দুটোই হাত রয়েছে। জবাফুলের মতো তাঁর রঙ। রাঙা কাপড় তাঁর পরিধানে রয়েছে। তিনি সমস্ত অলংকারে অলংকৃত, রূপবান, শান্ত ও কিরণ-মণ্ডলে মণ্ডিত। এভাবে ধ্যান করার পর সিঁদুর-রাঙা সূর্যকে উদিত দেখে সেই অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করবে। নতজানু হয়ে, নিজের মাথার উপর ওই পাত্র ধারণ করে, তন্ময় চিত্তে তিন অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রে সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করবে। অর্ঘ্যপ্রদানকারী যদি অদীক্ষিত থাকেন, তাহলে শ্রদ্ধা সহকারে সূর্যের নাম উচ্চারণ করেই অর্ঘ্যদান করবে। এতেই সূর্যপুজা সম্পূর্ণ হবে। কারণ, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই সূর্যকে লাভ করা যায়। তারপর অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঈশান, মধ্য ও পূর্ব দিকের অধিপতি যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের পুজা করবে। সেই সঙ্গে হৃদয়, শির, শিখা, বর্ম ও চোখ প্রভৃতি অঙ্গের পুজাও করে রাখতে হবে। পরে গন্ধ, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য শেষ করে জপ, স্তব, নমস্কার ও মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। সবার শেষে বিসর্জন।

এভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা স্ত্রীলোক যেই হোক না কেন, যদি ভক্তিভরে, বিশুদ্ধচিত্তে এবং সংযতেন্দ্রিয় হয়ে সূর্যের অর্ঘ্য প্রদান করে, তাহলে ইহলোকে পরম সুখ ভোগ করে শেষে পরম গতি লাভ করে থাকে। যারা ত্রিভুবনের প্রদীপস্বরূপ গগনবিহারী সেই সূর্যকে ভক্তিভরে পুজা করে, তারা সুখ লাভ করে থাকে। সূর্যকে যথাবিধি অর্ঘ্য দান না করা পর্যন্ত বিষ্ণু, শিব বা সুরেশ্বর কারুরই পুজা করা যায় না। তাই যত্ন সহকারে প্রত্যহ পবিত্র হয়ে সুন্দর ফুল ও গন্ধদ্রব্য দিয়ে আদিত্যকে অর্ঘ্য দান করতে হবে। যে সপ্তমী তিথিতে এভাবে স্নানের পর পবিত্রভাবে আদিত্যকে অর্ঘ্য দেয়, তার ঈপ্সিত ফল লাভ হয়। সূর্যকে বিধিমতো অর্ঘ্য দিলে রোগী রোগ থেকে মুক্ত হয়, ধনকামী ধন লাভ করে, বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে এবং পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্রলাভ করে। মানব কিংবা মানবী সমুদ্রে স্নান করে সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করলে সমস্ত রকম কামনার

ফল পেয়ে থাকে। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি বাক্য সংযত করে, হাতে ফুল নিয়ে সূর্যালয়ে যাবে এবং সেখানে তিনবার প্রদক্ষিণ করে সূর্যের অর্চনা করবে। গন্ধ, ধূপ, ফুল, দীপ ও নৈবেদ্য দিয়ে সূর্যকে প্রণাম করবে এবং স্তবে সূর্যকে সন্তুষ্ট করলে মানুষ সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যৌবন লাভ করে এবং দশাশ্বমেধ-জনিত ফল লাভ করে। কোণাদিত্যের অর্চনার ফলস্বরূপ মানুষ পূর্ব এবং পশ্চাৎভাবী সাত পুরুষকে উদ্ধার করে থাকে এবং সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং বেগবান বিমানে আরোহণ করে, গন্ধর্বদের দ্বারা স্তুত হয়ে সূর্যলোকে উপনীত হয়। সেখানে প্রলয়কাল পর্যন্ত তারা সুখে বাস করে এবং পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হলে পর পৃথিবীতে এসে ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করে। কালক্রমে এরাই বেদজ্ঞ পবিত্র ব্রাহ্মণ হয়ে থাকে এবং পরিণামে সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোক্ষলাভ করে। শাস্ত্রে 'দমনভঞ্জিকা' নামক যাত্রার উল্লেখ আছে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে এর অনুষ্ঠান করতে হয়। যে ওই যাত্রার অনুষ্ঠান করে, সমস্ত ফলই তার হস্তগত হয়ে থাকে। সূর্যের শয়ন, উত্থান, বিষুব সংক্রান্তি, রবিবার ; সপ্তমী তিথি বা কোন পর্বকালে যারা জিতেন্দ্রিয় হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ওই যাত্রার অনুষ্ঠান করে, তারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে সূর্যলোকে গমন করে। সেই সমুদ্রতীরে মহাদেব আছেন, তিনি 'রামেশ্বর' নামে বিখ্যাত। যারা বিধিমতো সমুদ্রে স্নান করে, সেই শিবকে দর্শন করে এবং গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, স্তোত্র, গান ও বাজনা সহকারে তাঁর পূজা করে তারা বাজিমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে ; এমন কি তারা পরম সিদ্ধি পর্যন্ত লাভ করে থাকে। তরা সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং বেগবান বিমানে আরোহণ করে সূর্য-লোকে গমন করে এবং পুণ্যক্ষয়ে ব্রাহ্মণকুলে এসে জন্মগ্রহণ করে। পরে শৈব যোগ অবলম্বনে তদের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। যারা সেই সূর্যক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে, তারা সূর্য-লোক লাভ করে স্বর্গে দেবতার মতো বিচরণ করে। তারপর পুণ্যক্ষয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করে ধর্মনিষ্ঠ রাজা হয় এবং শেষে সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয় এবং মোক্ষলাভ করে। সমুদ্রতীরের পুণ্য ক্ষেত্র কোণার্ক বা কোণারকের কথা এতক্ষণ ধরে আপনাদের বললাম। এই পুণ্যকথা আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে।

—স্বয়ম্ভূ-ঋষি সংবাদে 'কোণাদিত্যমাহাত্ম্যকীর্তন নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ ঊনত্রিশ

ব্রহ্মার কাছ থেকে কোণারকের কথা শোনার পর মুনিরা তাঁকে সবিনয়ে বললেন—আপনি আমাদের সূর্য-ক্ষেত্রের কথা বলেছেন। এই পবিত্র কথা আমরা যতই শুনি না কেন, তবু আমাদের তৃপ্তি হয় না। দেবতা পূজার কি ফল, দানের কি ফল, প্রণাম, ধূপ, দীপ প্রদানের কি ফল, সম্মার্জন করার কি পদ্ধতি, উপবাস ও রাত্রিতে ভোজনের কি ফল—সে-সব কথা আমাদের বলুন। এ ছাড়া কি রকম অর্ঘ্য কোথায় কি ভাবে দিতে হয়, কি ভাবে সূর্য প্রসন্ন হন—এ সব কথা আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই ; আপনি দয়া করে সব কথা আমাদের বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা তাদের বলতে আরম্ভ করলেন—ভগবান সূর্যের অর্ঘ্য, পূজা-বিধি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সমাধির কথা আপনাদের এখন বলছি। মনের দ্বারা ভগবদ্বিষয়ক যে ভাবনা, তাকে বলে 'ভক্তি' এবং সে বিষয়ে যে মানসিক ইচ্ছা তাকে 'শ্রদ্ধা' নামে অভিহিত

করা হয়। এ ছাড়া অন্য যে ধ্যান, তার নাম সমাধি। আপনারা একাগ্র চিত্তে ভক্তির কথা শুনুন। ভগবানের কথা যিনি শোনেন ও শোনান, অথবা অগ্নি পরিচর্যা করেন, তিনিই প্রকৃত ভক্ত। যার মন সর্বদাই ভগবানে নিরত, যে দেবপুজো ও দেবকর্মে কাল অতিবাহিত করে, সে-ই প্রকৃত ভক্ত। যে দেবপুজো প্রভৃতিতে রত থাকে, কিংবা ভগবানের নাম কীর্তন করে, সে-ই ভক্ততর। ভগবানের যারা ভক্ত, তাদের যে হিংসা করে না, কিংবা তার উপাস্য ছাড়া অন্য দেবতার নিন্দা করে না এবং যে সূর্যব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে-ই প্রকৃত ভক্ত। যে চলার সময়, বসার সময়, ঘুমোনোর সময়, ঘ্রাণ নেবার সময়, চোখ খোলা এবং বন্ধ করার সময় এবং অন্যান্য সমস্ত কাজে সূর্যকে স্মরণ করে, সে-ই ভক্ততর। ভক্তি, ধ্যান এবং স্তবের দ্বারা দেবতা ও পিতাদের যা দান করা হয়, তা তাঁরা গ্রহণ করে থাকেন। ভক্তিভরে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল প্রভৃতি যা কিছু দেবতাকে নিবেদন করা হয়, দেবতারা তা গ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবানে যারা বিশ্বাস রাখে না, তাদের দান ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। নিয়ম ও আচার সহকারে ভাবশুদ্ধি প্রয়োগ করা কর্তব্য ; যা ভাবশুদ্ধির দ্বারা করা হয়, তা সফল হয়ে থাকে। ভক্তিভরে উপবাস করে স্তুতি, জপ ও পুজো উপহার দিয়ে সূর্যের আরাধনা করলে সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যে মাটিতে মাথা নত করে সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে, সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। যে মানুষ ভক্তিযুক্ত হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সে এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করে। যে ভক্তিভরে, দিনে একবার মাত্র আহার করে ষষ্ঠী তিথিতে সূর্যকে পুজো করে ও ব্রত অনুষ্ঠান করে অথবা যে অষ্টমী তিথিতে দিন-রাত উপোস করে সূর্যের পুজো করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের যা ফল তাই লাভ করে থাকে। সপ্তমী হোক বা ষষ্ঠী হোক, যে তিথিতেই হোক না কেন, সূর্যের পুজোয় পরম গতি পাওয়া যায়। যে ইন্দ্রিয়কে সংযত করে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উপবাসী হয়ে সমস্ত রকম রত্ন উপহার সহ সূর্যের পুজো করে, সে পদ্মের মতো সুন্দর ও উজ্জ্বল যানে আরোহণ করে সূর্যলোকে উপনীত হয়ে থাকে। যে শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উপবাস করে সমস্ত রকম শুক্ল উপহারের সঙ্গে সূর্যের পুজো করে, সে সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সূর্যলোকে গমন করে থাকে।

এবার আপনাদের অর্ক সপ্তমী ব্রতের কথা বলছি। অর্কপত্রপুটে প্রত্যেক সপ্তমী তিথিতে ক্রমশ এক এক করে বাড়িয়ে চব্বিশবার পর্যন্ত সূর্যের নাম নিয়ে জল পান করতে হয়। এভাবে দু'বছর পর্যন্ত নিয়ম পালন করে চললে ব্রত-পূর্তি ঘটে। এই ব্রত প্রশস্ত এবং সমস্ত কামনা পূরণ করে। রোববার যদি শুক্ল সপ্তমী হয়, তবে সেই সপ্তমী 'বিজয়া' নামে পরিচিত হয়। এই বিজয়া সপ্তমীতে স্নান, দান, তপ, হোম ও উপবাস প্রভৃতি যা কিছু করা হয়, তা উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করে। এমন কি, এতে মহা পাপ পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। যারা রোববারে শ্রাদ্ধ বা দেবপুজো করে, তারা অভীষ্ট ফল লাভ করে। যারা সমস্ত ধর্ম, সমস্ত কর্ম সূর্যকে উদ্দেশ্য করে সম্পন্ন করে, তাদের বংশে কেউই দরিদ্র থাকে না ; ব্যাধিও তাদের পীড়িত করে না। সাদা, লাল বা গেরুয়া মাটি দিয়ে যারা সূর্যস্থান উপলেপন করে, তারাও অভীষ্ট ফল লাভ করে। যে উপবাসী থেকে বিচিত্র পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা সূর্যের পুজো করে সে ঈপ্সিত ফল লাভ করে থাকে। যে ঘি কিংবা তিলের তেলে প্রদীপ জেলে সূর্যকে পুজো করে, তার চোখ কখনো নষ্ট হয় না। এভাবে যে সূর্যকে প্রদীপ জেলে পুজো করে সে জ্ঞানী হয়। তিল, পবিত্র তেল এবং

তিলধেনু—এই তিনটি দান প্রশস্ত। তিল দিয়ে আগুনে আহুতি দিলে এবং তিলের তেলে দীপ জেলে দেবতাকে নিবেদন করলে, মহাপাপও নষ্ট হয়। যারা চতুষ্পথ ও দেবালয়ে প্রত্যহ দীপ জেলে নিবেদন করে তারা রূপবান ও ঐশ্বর্যশালী হয়। ঘি দিয়ে দীপ প্রজ্বালনই প্রশস্ত ; ঘিয়ের অভাবে ওষধি-রসে দীপ প্রজ্বলিত করা যায়। বসা, মেদ, অস্থি প্রভৃতি সহ কখনোই প্রদীপ জ্বালানো এবং দেবতাকে তা নিবেদন করা সঙ্গত নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে দীপের শিখা যেন উপরের দিকে থাকে, কোন ক্রমেই যেন নীচের দিকে না হয়। প্রদীপ জ্বলতে থাকলে, কখনোই তাকে চুরি করে নেওয়া বা নিভিয়ে দেওয়া যাবে না। যারা এ রকম করে তারা নিকৃষ্ট গতি লাভ করে থাকে। পরন্তু প্রদীপ সহ পূজাকারী ব্যক্তি প্রদীপের মতো দীপ্তিলাভ করে। যে প্রত্যহ কুঙ্কুম ও অগুরু চন্দন গায়ে দেয়, সে পরজন্মে যশস্বী ও ধনী হয়ে থাকে। যে পবিত্র ভাবে সূর্যোদয়ের সময় লাল ফুলের সঙ্গে লাল চন্দন মিশিয়ে অর্ঘ্য দান করে সে সিদ্ধি লাভ করে থাকে। সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সূর্যের দিকে মুখ রেখে যে কোন মন্ত্র, জপ বা স্তোত্র পাঠ করা কর্তব্য। এরূপ অনুষ্ঠানের নাম আদিত্যব্রত। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করলে মহাপাপও নষ্ট হয়। সূর্যের উদয়ের সময় শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্ঘ্যদান করলে সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যে সূর্যকে অর্ঘ্য দান করে, সে সাত জন্ম পর্যন্ত সোনা, গরু, বলদ, বিবিধ বস্ত্র এবং এমন কি, পৃথিবীকে পর্যন্ত লাভ করে থাকে। অগ্নিতে, জলে, অন্তরীক্ষে, পুণ্যক্ষেত্রে এবং প্রতিমায় যত্নের সঙ্গে সূর্যার্ঘ্য দান করা উচিত। বাম বা ডান এভাবে না দিয়ে ভক্তির সঙ্গে ঠিক সূর্যের অভিমুখেই ঘি, গুগ্গুল ইত্যাদি দিয়ে সূর্যার্ঘ্য দান করবে। এ রকম অর্ঘ্য দান করলে সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সূর্যকে লাক্ষা, দেবদারু, কর্পূর, অগুরু, ধূপ প্রভৃতি দান করলে স্বর্গলাভ হয়। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গতিপ্রাপ্ত সূর্যকে পূজা করলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। যে ভক্তিভরে সূর্যের পূজা করে, তার সূর্যলোকে গতি হয়। খিচুড়ি, পায়স, পিঠে, ফল, মূল ও ঘৃতমিশ্রিত অন্ন দিয়ে সূর্যকে পূজা করলে সমস্ত রকম কামনার ফলপ্রাপ্তি ঘটে। সূর্যকে ঘি দিয়ে তর্পণ করলে মানুষ সব রকম সিদ্ধি লাভ করে থাকে, ক্ষীর দিয়ে তর্পণ করলে মনস্তাপ হয় না। দধি দিয়ে তর্পণ করলে কাজের ফল পাওয়া যায়। যে সমাহিত হয়ে সূর্যকে স্নান করানোর জন্য জল আহরণ করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ছাতা, পতাকা, চন্দ্রাতপ বা চামর—এই সব বস্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে সূর্যকে সমর্পণ করলে অভীষ্ট গতি লাভ করা যায়। ভক্তির সঙ্গে মানুষ সূর্যকে যে দ্রব্য দান করে, সূর্য তার সেই দ্রব্য শত, সহস্র গুণে বর্ধিত করে দেন। মানসিক, বাচিক বা কায়িক যে কোন দুষ্কর্মই হোক, সূর্যের অনুগ্রহে সে সবই আমূল নষ্ট হয়ে যায়। একদিন সূর্য পূজা করলে যে ফল লাভ করা যায়, প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারাও সেই ফল লাভ করা যায় না।

—'সূর্যপূজাদি' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ তিরিশ

সূর্য পূজা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ শোনার পর মুনিরা ব্রহ্মাকে আরো কাহিনী শোনার জন্য বললেন। প্রথমে তাঁরা তাঁদের মনে উত্থিত একটি সংশয়ের কথা ব্রহ্মাকে জিগ্যেস করলেন—সূর্যের দুর্লভ মাহাত্ম্য আপনি আমাদের বলেছেন। কিন্তু সব কথা শুনেও

আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে, গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী এবং ভিক্ষুক, এ'দের মধ্যে কেউ যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কোন্ দেবতার আরাধনা করবেন ? কি ভাবে তাঁর অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, কি করলেই বা সে পরম মঙ্গল পেতে পারে, এবং স্বর্গগত ব্যক্তিই বা এমন কি কাজ করবেন, যাতে পুনরায় আর তাঁকে সেখান থেকে ভ্রষ্ট হতে হয় না ? যিনি দেবতাদের দেবতা, পিতাদেরও পিতা, যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউই নেই, তিনি কে ? এই সমগ্র বিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন, ধ্বংসকালে এই বিশ্ব যাঁকে আশ্রয় করবে, সেই পরমপুরুষের কথা আপনি দয়া করে আমাদের বলুন।

মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—যে দেবতা পূর্বাকাশে প্রত্যহ উদিত হয়ে নিজের কিরণে পৃথিবীর অন্ধকার দূর করেন, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো দেবতা নেই। এ'র আদি নেই, অন্ত নেই, ইনিই সনাতন, অব্যয় পুরুষ। ইনিই প্রখর রূপ ধারণ করে রশ্মি-সমূহের দ্বারা এই ত্রিভুবন তাপিত করেন। সমস্ত দেবতা এ'র মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করেন। সমগ্র দৃশ্যমান জগতের ইনি অধিপতি, সমগ্র প্রাণিকুলের যাবতীয় কর্মের সাক্ষী। প্রাণিকুলের স্রষ্টাও ইনি, আবার একে সংহারও করেন ইনি। কিরণসমূহের দ্বারা এ'কে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। ইনি জগতকে যেমন উত্তপ্ত করেন, বর্ষণ দিয়ে তৃপ্তও করেন। এ'র মণ্ডল কখনোই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ইনি পিতাদেরও পিতা এবং দেবতাদেরও দেবতা। ইনিই সেই পবিত্র ধ্রুবস্থান। সৃষ্টিকালে সমগ্র জগৎ সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়, আবার প্রলয়ে তাঁতেই বিলীন হয়ে যায়। অসংখ্য যোগী পুরুষ নিজের নিজের শরীর পরিত্যাগ করে তেজোময় এই সূর্যে বিলীন হয়ে গেছেন। গাছ যেমন মহাশূন্যে তার শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করে দেয়, সূর্যও তেমনি অগণিত রশ্মিজাল বিস্তৃত করে রয়েছেন ; আর এই রশ্মিকে আশ্রয় করে দেবতারা এবং সিদ্ধ পুরুষেরা অবস্থান করেন। গৃহী অথচ যোগপথ অবলম্বনকারী জনক প্রভৃতি রাজা, বালখিল্য প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ঋষি, অন্যান্য বাণপ্রস্থ অবলম্বনকারী মুনি, এবং ব্যাস প্রমুখ সর্বত্যাগী সাধু ব্যক্তি—এ'রা সবাই যোগপথ অবলম্বন করে সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করেছেন। ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীমান শুকদেবও যোগধর্ম আশ্রয় করে সূর্যের করুণা লাভ করেছেন এবং পুনর্জন্ম এড়াতে পেরেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতারা এই পরম দেবতা সূর্যেরই অংশ বিশেষ। অতএব একমাত্র সূর্যেই ভক্তি স্থাপন করা উচিত। বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যান্য যে দেবতা রয়েছেন, তাঁরা কেউই দৃষ্টি-গোচর নন। তাই বলছি, এই প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যকেই আপনারা সর্বথা আরাধনা করবেন। তিনিই মাতা, তিনিই পিতা এবং তিনিই সমগ্র জগতের একমাত্র গুরু। সকলেরই বন্ধু ও কল্যাণকারী রূপে তিনি বিরাজ করেন। আদি দেবতা, নিত্য এবং অব্যয় ব্রহ্মা সূর্য ছাড়া আর কেউ নন। তিনিই ব্রহ্মারূপে সাগর ও দ্বীপবিশিষ্ট চতুর্দশ ভুবনের সৃষ্টি করে লোককল্যাণের জন্য অবস্থান করছেন এবং তিনিই সমস্ত প্রজাপতি ও প্রজাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। নিজেকে বারো ভাগে বিভক্ত করে তিনি সূর্যরূপে প্রতিভাত হন। ইন্দ্র, ধাতা, পর্জন্য, ত্বষ্টা, পূষা, অর্যমা, ভগ, বিবস্বান, বিষ্ণু, অংশ, বরুণ ও মিত্র—এই বারোটি মূর্তির মধ্য দিয়ে সূর্যই এই সমগ্র জগৎ ব্যেপে বিরাজ করছেন। সেই ইন্দ্রের যে ইন্দ্র নামক প্রথম মূর্তি, তিনিই দেবতাদের শত্রু নিধন করে 'দেবরাজ' এই আখ্যায় বিভূষিত হন। তাঁর দ্বিতীয় মূর্তি 'ধাতা' প্রজাপতি রূপে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন। 'পর্জন্য' নামক তৃতীয় যে মূর্তি তিনি মেঘ রূপে পৃথিবীকে বৃষ্টিদান করেন। 'ত্বষ্টা' নামক যে চতুর্থ মূর্তি তিনি বনস্পতি ও ওষধিসমূহে বিরাজ করেন। 'পূষা' নামে সূর্যের যে পঞ্চম

মূর্তি তা শস্যসমূহে অবস্থান করে প্রজাদের পোষণ করেন। সূর্যের 'অর্যমা' নামক ষষ্ঠ মূর্তি বায়ুর আকারে দেবদেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। 'ভগ' নামক সপ্তম মূর্তি পৃথিবীতে এবং শরীরীদের দেহের মধ্যে বিরাজ করে। 'বিবস্বান' নামক অষ্টম মূর্তি অগ্নিরূপে প্রাণিদের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করছে। 'বিষ্ণু' নামক নবম মূর্তি দেবতাদের শত্রু নিধনের জন্য আবির্ভূত হন। 'অংশুমান' নামক সূর্যের যে দশম মূর্তি তা বায়ুরূপে প্রজাপুঞ্জের আনন্দ বিধান করে। সূর্যের 'বরুণ' নামক একাদশ মূর্তি জলে অবস্থান করে প্রজা পালন করেন। সূর্যের 'মিত্র' নামে যে দ্বাদশ মূর্তি রয়েছে তা লোককল্যাণের জন্য চন্দ্রে এবং সমুদ্রে অবস্থান করে। মিত্র বায়ু ভক্ষণ করে তপস্যা করেন এবং প্রসন্ন দৃষ্টিতে ভক্তদের বিবিধ বর দিয়ে অনুগৃহীত করেন। তিনি মিত্র নামে অবস্থিত, তাই তিনি সকলেরই প্রিয়। পরমাত্মা সবিতা এই বারো রকম মূর্তির মধ্য দিয়ে সমগ্র জগৎ জুড়ে রয়েছেন। এ জনাই ভক্তিমান মানুষ তন্ময়চিত্তে তাঁকে দ্বাদশ মূর্তিরূপে ধ্যান ও নমস্কার করবেন। যে দ্বাদশ সূর্যকে নমস্কার নিবেদন করে এবং সেই দ্বাদশ নাম শোনে ও পাঠ করে, পরিণামে সূর্যলোকে তার গতি হয়ে থাকে।

দ্বাদশ আদিত্য সম্পর্কে ব্রহ্মার কাছ থেকে সব কথা শুনে মুনিরা তাঁকে জিগ্যেস করলেন—এই সূর্যই যদি আদিদেবতা এবং সনাতন পুরুষ হন, তবে তিনি কেন বর কামনা করে সাধারণ মানুষের মতো তপস্যা করেছিলেন? সবই তো তিনি পেতে পারতেন, কারণ, সকল সিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত। আপনি দয়া করে আমাদের এই সংশয় দূর করুন।

মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—অগ্নি সম্বন্ধে পূর্বে মিত্রদেব নারদকে যা যা জিগ্যেস করেছিলেন, আমি এখন সে সব নিগূঢ় তত্ত্ব আপনাদের কাছে প্রকাশ করছি। সূর্যের দ্বাদশ মূর্তির কথা আগেই আমি আপনাদের বলেছি। সেই দ্বাদশ মূর্তির মধ্যে মিত্র ও বরুণ—এই দুজন তপস্যায় নিরত হন। তাঁদের মধ্যে বরুণ কেবলমাত্র জলপান করে পশ্চিম সাগরে আর মিত্র এখানকার মিত্রবনে কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করে বিরাজ করছিলেন। একবার মহাযোগী নারদ মেরুগিরির শৃঙ্গ গন্ধমাদন থেকে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে করতে, মিত্র যেখানে তপস্যা করছিলেন, সেখানে এসে পেঁছিলেন। নারদ মিত্রকে তপস্যা করতে দেখে কৌতূহলী হয়ে নিজের মনে মনে এ রকম চিন্তা করতে লাগলেন যে, যিনি অক্ষয়, অব্যয়, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সনাতন পুরুষ, যিনি একাই এই ত্রিভুবনকে পোষণ করেন, যিনি বিশ্বের পিতা ও পরম প্রভু, তিনি আবার কোন্ দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তপস্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন? এ রকম চিন্তা এবং কৌতূহলে আক্রান্ত হয়ে নারদ মিত্রকে জিগ্যেস করলেন—আপনি মহান, অজ, শাশ্বত; অঙ্গ সহ সমস্ত বেদ ও পুরাণ আপনি সম্যক ভাবে অধ্যয়ণ করেছেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সবই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। চতুর্বর্ণের লোকেরা আপনাকেই সর্বদা পূজা করে থাকেন। আপনি বিশ্বের পিতা। সুতরাং আপনি আবার কোন্ দেবতা বা পিতৃপুরুষকে পূজা করছেন?

নারদের প্রশ্নের উত্তরে মিত্র বললেন—আপনি এ রকম চিন্তা মনেও আনবেন না। আমার এই তপস্যার কি অর্থ, তা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। যা শাশ্বত, তা আমি আপনার মতো ভক্তলোকের কাছে সম্যক ভাবে বলছি। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল ও ধ্রুব বস্তু; সব প্রাণীর যিনি অগোচর, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সকলের অন্তরাত্মা বলে পরিচিত। তিনি ত্রিগুণাতীত ভগবান হিরণ্যগর্ভ, তিনিই 'বুদ্ধি' নামে অভিহিত

হন। তিনি মহান এবং প্রধান বলে কথিত। সাংখ্যমতবাদীরা তাঁর বহু নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি ত্রিরূপী, বিশ্বাত্মা, শর্ব ও অক্ষর নামে অভিহিত হন। ত্রিভুবনকে তিনি ধারণ করে রয়েছেন। তিনি নিজে অশরীরী হয়েও সবার শরীরে রয়েছেন। তিনি শরীরের মধ্যে থাকেন বটে, কিন্তু কোনো কর্মে তিনি লিপ্ত হন না। তুমি, আমি ও অন্যান্য দেহধারী সকলেরই তিনি সাক্ষীভূত অন্তরাত্মা। তিনি সগুণ অথচ নির্গুণ ; একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাঁকে জানতে পারা যায়। তাঁর সব দিকেই চক্ষু, সর্বত্রই তিনি যেতে পারেন, সব কিছুই তিনি আহরণ করতে পারেন অসংখ্য বাহু দিয়ে। অসংখ্য কর্ণবিশিষ্ট তিনি, সব কথাই শুনতে পান ; এমন কি, যে কথা সঙ্গোপনে হৃদয়েই শুধু উচ্চারিত হয়, তাও তিনি শুনতে পান। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদন করে তিনি বিশ্ব চরাচর ব্যেপে রয়েছেন। তাঁর মস্তক, তাঁর বাহু, তাঁর চরণ, তাঁর চোখ তাঁর নাসিকা সমগ্র বিশ্বে রয়েছে ক্রিয়াশীল হয়ে। তিনি একাই স্বেচ্ছায় এই শরীর মধ্যে যথাসুখে বিচরণ করছেন। শরীরকেই ক্ষেত্র বলা হয়। ওই যোগী পুরুষ সমস্ত শরীরে সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করেন, তাই তিনি 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে পরিচিত। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্বদাই অব্যক্ত পুরে শয়ন করে রয়েছেন। বিশ্বের সর্বত্রই তিনি বিরাজিত। বিশ্ব বহুরূপে বর্তমান ; তাই তিনি বিশ্বরূপ নামে পরিচিত। সেই একমাত্র সনাতন পুরুষই মহাপুরুষ নামে অভিহিত। তিনিই আত্মাকে শতরূপে, সহস্ররূপে, কোটিরূপে সৃষ্টি করেন। আকাশ থেকে পতিত জল যেমন মাটির রসভেদে পৃথক স্বাদবিশিষ্ট হয়, সেই পুরুষ তেমনি গুণভেদে বিভিন্ন আকারে প্রতীয়মান হন। একই বায়ু যেমন দেহে পাঁচ ভাগে বিভক্ত, তেমনি একত্ব ও পৃথকত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মী হয়েও তাঁর মধ্যে বিরাজ করে। স্থানভেদে অগ্নি যেমন নানা সংজ্ঞা লাভ করেন, ঐ সনাতন পুরুষও তেমনি হরি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে থাকেন। একই প্রদীপ থেকে যেমন হাজার হাজার প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, তেমনি সেই একই সনাতন পুরুষ থেকে সহস্র সহস্র পুরুষ সৃষ্ট হয়। তিনি যখন আত্মজ্ঞান লাভ করেন তখন একাই তা করেন ; তখন তিনি একত্বে অবস্থিত। একত্বের অবসানে তাঁর বহুত্ব আবার প্রকটিত হয়। এই সমগ্র দৃশ্যমান চরাচরে কোন বস্তুই নিত্য নয়, একমাত্র সেই অক্ষয় অপ্রমেয়, সর্বব্যাপী সনাতন পুরুষই নিত্য বলে অভিহিত হন। তিনি ব্যক্ত এবং অব্যক্তভাবে অবস্থান করেন, তিনিই ব্যক্ত এবং অব্যক্তের জন্মদাতা। তিনিই প্রকৃতি নামে কথিত হন. সেই প্রকৃতিই ব্রহ্মযোনি। যিনি সৎ ও অসৎ রূপে বিদ্যমান, যিনি সমস্ত কাজকর্মে পূজিত হয়ে থাকেন, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম কোন দেবতা নেই। আত্মাই, প্রকারান্তরে জ্ঞানই তাঁকে জানতে সাহায্য করে। সুতরাং তাঁকেই আমি পূজা করছি। যাঁরা স্বর্গে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ যদি সেই পুরুষের পূজা করেন, তবে তাঁরাও নিজেদের অভীষ্ট গতি লাভ করে থাকেন।

বিভিন্ন মূর্তিধারণকারী দেবতারা নিজের নিজের আশ্রমে থেকে ভক্তিভরে সেই আদি-দেব সূর্যের পূজা করে থাকেন ; তিনিও তাঁদের অভীষ্ট পূরণ করে থাকেন। সেই সূর্যই সর্বগামী ও নির্গুণ বলে কথিত। তাই আমি সেই সূর্যেরই পূজা করছি। যাঁরা সূর্যভাবনায় ভাবিত হয়ে এক তত্ত্ব আশ্রয় করেন, তাঁরা একই গতি লাভ করেন। আপনি প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ঋষি। আপনিও তাঁকে পরমগতি রূপে জানেন। দেবতারা এবং প্রাচীন ঋষিরা তাঁকে পরমপুরুষ বলে জানেন এবং তাঁর পূজা করে থাকেন। নারদ এবং সূর্যের মধ্যে যে গূঢ় বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল সে-কথাই এতক্ষণ ধরে আপনাদের বললাম। সূর্যের প্রতি যাদের ভক্তি নেই, তাদের কাছে এই কথা কখনো বলা চলে না। যে এই

কাহিনী শোনে বা শোনায় সে সূর্যের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। এই সূর্য-কথা আগাগোড়া শুনলে আর্তব্যক্তি রোগ থেকে মুক্ত হয় এবং জিজ্ঞাসু লোক জ্ঞান ও ইষ্টগতি লাভ করে থাকে। যে এই সূর্য-কাহিনী পাঠ করে, অল্প সময়ের মধ্যেই তার সদ্‌গতি লাভ হয়; তাদের সমস্ত কামনা অচিরেই পূর্ণ হয়। আপনারাও ভগবান সূর্যকে সব সময় স্মরণ করবেন।

—'আদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ একত্রিশ

সূর্যের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলে চললেন—সূর্যকেই আপনারা ত্রিভুবনের মূল বলে জানবেন। দেবতা, দানব এবং মনুষ্যবিশিষ্ট সমগ্র জগৎ সূর্য থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এই সূর্যই রুদ্র, উপেন্দ্র ও মহেন্দ্র প্রভৃতি তেজোময় দেবতাদের আধারভূত। সূর্যই সকলের আত্মা স্বরূপ, ত্রিভুবনের অধিপতি ও দেবাদিদেব প্রজাপতি। তিনিই পরম দেব। অগ্নিতে সম্যকভাবে আহুতি দিলে আদিত্য তৃপ্ত হন। আদিত্য বা সূর্য থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে হয় অন্ন এবং অন্ন দ্বারা প্রজারা প্রতিপালিত হয়ে থাকে। সূর্য থেকেই সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থ এবং প্রাণীকুল উৎপন্ন হয় এবং পরিণামে সূর্যেই সব কিছু বিলীন হয়ে যায়। একমাত্র সূর্যই ধ্যানীদের ধ্যান এবং মুমুক্ষুদের মোক্ষ। মুক্তিকামী ব্যক্তিরা তাঁতেই নির্বাণ লাভ করেন এবং বার বার এই সূর্য থেকেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। সূর্য না থাকলে ক্ষণ, মুহূর্ত, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বছর, ঋতু ও যুগ—এদের কোন পরিমাপ নেই। কাল না থাকলে কোন নিয়মই থাকে না; অগ্নির ক্রিয়া লুপ্ত হয়; ঋতু-সমূহের কোন বিভাগ ক্রম থাকে না। সুতরাং ফুল-ফলের উৎপত্তি, শস্যসমূহের উৎপত্তি অথবা তৃণ ও ওষধিবর্গের স্থিতিও থাকে না। কালের অভাবে দেবতা ও মানুষদের ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং সূর্য না থাকলে পৃথিবীরই কোন অস্তিত্ব থাকে না। সূর্য বারিবর্ষণের দ্বারাই স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়ে থাকেন। ইনি বসন্তে কপিল, গ্রীষ্মে কাঞ্চন, বর্ষায় সাদা, শরতে পাণ্ডুর, হেমন্তে তাম্র এবং শীতে লোহিত বর্ণ ধারণ করে থাকেন। ইনি মানবসমাজের কল্যাণে সততই তৎপর থাকেন। সূর্যের বারোটি নাম আছে—আদিত্য, সবিতা, সূর্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর ও রবি। এ ছাড়াও সূর্যের আরো বারোটি নাম আছে—বিষ্ণু, ধাতা, ভগ, পূষা, মিত্র ইন্দ্র, বরুণ, অর্যমা, বিবস্বান, অংশুমান, ত্বষ্টা ও পর্জন্য। এই দ্বাদশ আদিত্য পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিত। বারো মাসে ক্রমে ওই বারোটি সূর্যের আবির্ভাব ঘটে; তাদের মধ্যে বিষ্ণু চৈত্রে, অর্যমা বৈশাখে, বিবস্বান জ্যৈষ্ঠে, অংশুমান আষাঢ়ে, পর্জন্য শ্রাবণে, বরুণ ভাদ্রে, ইন্দ্র আশ্বিনে, ধাতা কার্তিকে, মিত্র অঘ্রাণে, পূষা পৌষে, ভগ মাঘে এবং ত্বষ্টা ফাল্গুন মাসে তাপ দান করে থাকেন। বিষ্ণু বারোশ, অর্যমা এক হাজার তিনশো, বিবস্বান বাহাত্তর, অংশুমান পনেরো, পর্জন্য বাহাত্তর, বরুণ এক হাজার তিনশো, ত্বষ্টা এক হাজার একশো, ইন্দ্র তার দ্বিগুণ, ধাতা এগারশো, মিত্র এক হাজার এবং পূষা ন'শো রশ্মি দ্বারা দীপ্তি পেয়ে থাকেন। সূর্যরশ্মিসমূহের তেজ উত্তরায়ণে বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণায়ণে কমে যায়। এই চব্বিশটি নাম ছাড়াও সূর্যের আরো এক হাজার নাম বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত আছে।

ব্রহ্মার কাছ থেকে সূর্যের এই চব্বিশটি নাম শোনার পর মুনিরা তাঁকে জিজ্ঞেস

করেন—আপনি বলেছেন যে সূর্যের আরো এক হাজার নাম আছে। যারা ওই সহস্র নামে সূর্যের স্তব করে, তাদের কি পুণ্য বা কোথায় গতি হয়, দয়া করে সে কথা আমাদের বলুন।

মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—আপনারা সারভূত সনাতন স্তব শুনুন ; এই শুভ স্তব শুনলে সহস্র নাম পাঠ বা শোনার আর কোন প্রয়োজন হয় না। সূর্যের যে সব নাম পবিত্র ও শুভ, সে সব একে একে বলছি, আপনারা একাগ্রচিত্তে তা শুনুন। সূর্যের একুশটি নাম বলছি—বিকর্তন, বিবস্বান, মার্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক, শ্রীমান, লোকচক্ষু, মহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, কর্তা, হর্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মা ও সর্বদেবনমস্কৃত—এই একুশটি নাম সূর্যের খুব প্রিয়। এই স্তব দৈহিক আরোগ্য এনে দেয়, ধন বৃদ্ধি ঘটায় ও যশ আনয়ন করে। যে সকালে ও সন্ধ্যায় পবিত্র হয়ে সূর্যের স্তব করে, সে সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্তি পায়। এই স্তব সূর্যের উপস্থিতিতে একবার মাত্র পাঠ করলেই কায়িক, বাচিক, মানসিক সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। এই স্তব পাঠেই জপ, হোম, উপাসনা, বলি প্রভৃতির ফল পাওয়া যায়। অন্নদান, ধনদান, প্রদক্ষিণ প্রভৃতি ব্যাপারে এই সর্বপাপহর শুভ মহামন্ত্রই প্রশস্ত। আপনাদেরও বলি, এই স্তব পাঠ করেই আপনারা সূর্যকে প্রসন্ন করুন। তাহলে কোন কামনাই আপনাদের আর অপূর্ণ থাকবে না।

—'মার্তণ্ডের একবিংশতিনামানুকীর্তন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ বত্রিশ

ব্রহ্মার কাছ থেকে সূর্যের বিভিন্ন নাম শোনার পর মুনিরা সূর্যবিষয়ে আরো বেশি জানার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি জগতের পিতামহ। আপনি সব কিছুই জানেন। আমাদের এক বিষয়ে সংশয় জন্মেছে। আপনি ভগবান সূর্যকে নির্গুণ, শাশ্বত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দ্বাদশ মূর্তির কথাও আমরা আপনার কাছ থেকে শুনেছি। কিন্তু আমাদের সংশয় এই যে, এই তেজোময়, মহাদ্যুতি সূর্যদেব কিভাবে নারীগর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন ? আপনি দয়া করে আমাদের সংশয় দূর করুন।

মুনিদের সংশয়ের কথা শুনে ব্রহ্মা তাঁদের সূর্যের জন্মবৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন—দক্ষ প্রজাপতির অদিতি, দিতি, দনু ও বিনতা প্রভৃতি যাটটি কন্যা জন্মায়। ওই কন্যারা সবাই সুন্দরী ছিলেন। তাদের মধ্যে দক্ষ তাঁর তেরোটি কন্যাকে কশ্যপের হাতে সমর্পণ করেন। কশ্যপের স্ত্রী অদিতি। তিনি তিন পুত্রের জননী হন। দিতির গর্ভে দৈত্যরা, দনুর গর্ভে বলদর্পী দানবেরা এবং বিনতা প্রভৃতি অন্যান্য পত্নীরাও অনেক সন্তান সন্ততির জন্ম দেন। তাঁরাই এই সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন। এদের মধ্যে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবতারাই প্রধান। এছাড়াও রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট আরো অনেক সন্তানের জন্ম হয়। দেবতারা যজ্ঞের অংশগ্রহণকারী এবং ত্রিভুবনের অধিপতি হন। এঁদের মধ্যে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাই ব্রহ্মবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রাণীরও স্রষ্টা তিনি। দৈত্য এবং দানবেরা শত্রুতাবশে দেবতাদের উপর সব সময়ই উৎপীড়ন চালাত। অদিতি দেখলেন যে দৈত্য ও দানবেরা তাঁর পুত্রদের বিতাড়িত করছে। সমস্ত ত্রিভুবনকে দৈত্যরা অধিকার করে নিয়েছে। তারা ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট ভোগ করছে। অদিতি সে

সব দেখে নিজের পুত্রদের জন্য যজ্ঞভাগ আহরণ করলেন এবং ভগবান সূর্যের আরাধনা করার জন্য বিশেষ যত্ন করতে লাগলেন। অদিতি আহার সংযত করে একাগ্রমনে তেজস্বী সূর্যের স্তব পাঠ করতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তুমি পৃথিবীপতি। তুমি পরম সূক্ষ্ম পদার্থ হয়েও পবিত্র তেজ ধারণ কর। তুমি তেজস্বীদের প্রভু ও সর্বতেজের আধার। তুমি নিত্য পুরুষ, তোমাকে নমস্কার। আমি জগতের উপকারের জন্য তোমার স্তব করছি। তুমি তীব্র রূপ ধারণ কর; আমি তোমার সেই রূপের উদ্দেশ্যেই নমস্কার নিবেদন করি। আটমাস ধরে জলময় রস গ্রহণের সময় তোমার অতি তীব্র যে রূপ হয়, আমি সেই রূপকে প্রণাম জানাই। অগ্নি ও সোমের সঙ্গে তোমার যে গুণময় রূপ প্রকাশ পায়, যা ঋক্, যজুঃ ও সামময়ও বটে, সেই রূপকে নমস্কার জানাই। তোমার যে ত্রয়ীসংজ্ঞক বিশ্বরূপ, তাকে আমার নমস্কার জানাই। তোমার যে ওংকারময় রূপ তাকে আমার নমস্কার। তোমার যে রূপ অস্থূল, স্থূল ও নির্মল, তাকেও আমি নমস্কার জানাই।

অদিতি এভাবে দিনরাত একাগ্রমনে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন। তারপর বহুকাল অতীত হলে পর ভগবান সূর্যদেব অদিতির দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হলেন। অদিতি দেখলেন, তাঁর সামনে সারা আকাশ ছেয়ে যেন বিপুল পর্বতশৃঙ্গের মতো তেজোরাশি আবির্ভূত হল। তিনি এত উজ্জ্বল যে, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করা কষ্টকর। অদিতি সেই প্রচণ্ড তেজঃপুঞ্জ দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে বললেন—তুমি পৃথিবীর মূল কারণ। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার প্রকৃত রূপ দর্শন করি। আমার পুত্রেরা তোমার পরম ভক্ত; তারা বিপন্ন, তুমি তাদের রক্ষা কর।

তারপর সেই তেজোরাশি থেকে সূর্য আবির্ভূত হলেন। তখন তাঁকে উত্তপ্ত তামার মতো মনে হচ্ছিল। সূর্য অদিতির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বললেন—তোমার স্তবে আমি প্রীত হয়েছি। তুমি আমার কাছ থেকে অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। অদিতি তখন নতজানু হয়ে মাটিতে মাথা নুইয়ে সূর্যকে প্রণাম করলেন এবং বললেন—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। প্রবল দৈত্যেরা আমার পুত্রদের রাজ্যচ্যুত করেছে এবং তাদের যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করেছে। তুমি আমার পুত্রদের ভ্রাতৃপ্রতিম দৃষ্টিতে দেখ এবং তাদের যারা শত্রু তাদের বিনাশ সাধন কর। আমার পুত্রেরা আবার যাতে তাদের হৃত ক্ষমতা ফিরে পায় এবং যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করতে পারে, তুমি সে ব্যবস্থাই কর। তুমিই তো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তা; তুমি এদের প্রতি প্রসন্ন হও। অদিতির প্রার্থনায় সূর্যের চিত্ত বিগলিত হল। তিনি অদিতিকে বললেন, আমি সহস্র অংশে তোমার গর্ভে উৎপন্ন হয়ে তোমার পুত্রের যারা শত্রু, তাদের হত্যা করব। সূর্য এ কথা বলেই অদৃশ্য হলেন। অদিতিও সূর্যের আশ্বাস পেয়ে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

তারপর এক বছর পেরিয়ে গেল। সূর্য কথামতো তাঁর অন্যতম রশ্মি সুষুম্নার সাহায্যে অদিতির গর্ভে ভ্রূণরূপে বাড়তে লাগলেন। অদিতিও সমাহিতভাবে কষ্টকর চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত পালন করতে তৎপর হলেন। অদিতিকে কৃচ্ছ্রসাধনে তৎপর দেখে কশ্যপ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করলেন—এভাবে দিন দিন উপবাসে থেকে তুমি কি তোমার গর্ভধৃত সন্তানকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছ না? অদিতিও স্বামীর কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—না, আমি তা করি নি। এই গর্ভজাত সন্তানই দেবতাদের শত্রুকে নিধন

করবে। এদিকে সন্তান-প্রসবের সময়ও হয়ে গিয়েছিল। অদিতির গর্ভ থেকে তখন তেজোময় এক সন্তানের জন্ম হল। তেজোদীপ্ত এবং সুলক্ষণযুক্ত সেই নবজাতককে দেখে কশ্যপ তাঁর স্তুতি করতে প্রবৃত্ত হলেন। ওই নবজাতকের গায়ের রঙ পদ্ম পাতার মতো মসৃণ; তার তেজ দিকমণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করল। ওই সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর মেঘ-গম্ভীরস্বর বিশিষ্ট এক আকাশবাণী শোনা গেল। কশ্যপকে সম্বোধন করে ওই আকাশ-বাণী ধ্বনিত হল—যেহেতু আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে অদিতির গর্ভস্থ অণ্ডের মৃত্যু আশংকা করে-ছিলেন তাই এই নবজাতকের নাম হবে মার্তণ্ড। যজ্ঞের অংশ হরণকারী অসুরদের ইনি বিনষ্ট করবেন।

এই আকাশবাণী শুনে দেবতারা আনন্দিত হলেন আর অসুরেরা হয়ে পড়ল তেজো-হীন, হতোদ্যম। কালক্রমে সেই মার্তণ্ড বড় হয়ে উঠলেন। এদিকে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র যুদ্ধের জন্য দৈত্য ও দানবদের আহ্বান জানালেন। দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের দারুণ যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরদের প্রতি মার্তণ্ড যেই দৃষ্টিপাত করলেন, অমনি তাঁর দৃষ্টির তেজে বলবান অসুরেরা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন দেবতারা অত্যন্ত খুশি হলেন এবং স্বয়ং মার্তণ্ড ও অদিতিকে স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন। দেবতারা তাঁদের অধিকার ফিরে পেলেন। ভগবান মার্তণ্ডও নিজের রশ্মির দ্বারা কদম ফুলের মতো নিম্ন ও ঊর্ধ্বদেশ আবৃত করে অগ্নিপিণ্ডের মতো শরীর ধারণ করলেন।

ব্রহ্মার কাছ থেকে সূর্যের জন্মবৃত্তান্ত শোনার পরও মুনিদের এক বিষয়ে সংশয় থেকে গেল। তাঁরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন—মার্তণ্ডের জন্মকথা শুনলাম। কিন্তু কিভাবে সূর্যের কদম-ফুলের মতো গোলাকার সেই তেজস্বী রূপে কমনীয় হয়েছিল, দয়া করে সে কথা আমাদের বলুন।

মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলে চললেন—প্রজাপতি বিশ্বকর্মা সূর্যকে প্রসন্ন করে নিজের কন্যা সংজ্ঞাকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করেন। সংজ্ঞার গর্ভে সূর্যের দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জন্মায়। মেয়ের নাম যমুনা। মার্তণ্ডের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সেই তেজে সমগ্র ত্রিভুবনকে তাপিত করতে থাকেন। সূর্যের সেই গোলাকার ও তেজস্বী রূপ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা নিজেরই মতো এক ছায়ামূর্তি নির্মাণ করে তাকে সূর্যের বাড়িতে রেখে গেলেন। তাঁর ছেলেমেয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ল ছায়ার উপর। সংজ্ঞা ছায়াকে বললেন যে, তাঁর বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা এবং অন্য সমস্ত কথা তিনি যেন সূর্যকে না জানান। ছায়া তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কেশ-গ্রহণ হয় এবং তাঁকে অভিশাপ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ তিনি কোন কথাই সূর্যকে বলবেন না। সংজ্ঞা তারপর বাপের বাড়ি চলে গেলেন এবং সেখানে অনেক দিন থাকার পর বিশ্বকর্মা সব কথা শুনে কন্যাকে তিরস্কার করলেন এবং সূর্যের কাছে যেতে বললেন। পিতার তিরস্কার শুনেও সংজ্ঞা কিন্তু সূর্যের কাছে গেলেন না। তিনি উত্তরকুরু দেশে গিয়ে অনশনে তপস্যা করতে লাগলেন। এদিকে ছায়াকেই সংজ্ঞা ভেবে সূর্য তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। ছায়ার গর্ভে সূর্যের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মায়। ছায়া নিজের সন্তানদের প্রতি যে রকম স্নেহ করতেন সংজ্ঞার সন্তানদের সে-রকম স্নেহ করতেন না। সূর্যপুত্র যম, যিনি সংজ্ঞার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ছায়ার এই অসম ব্যবহারে অত্যন্ত পীড়িত হলেন এবং এই দুর্ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে তিনি ছায়াকে নিজের পা তুলে দেখান। যমের এই ব্যবহারে ছায়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে এই

অভিশাপ দেন যে, গুরুজনের প্রতি এই অশোভন আচরণের জন্য যমের পা মাটিতে পতিত হবে। ছায়ার অভিশাপে যম খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি নিজের ভাই মনুর সঙ্গে পরামর্শ করে পিতা সূর্যের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। সূর্য সব শুনে যমকে বললেন, তোমার মতো ধর্মজ্ঞ লোকও যখন ক্রুদ্ধ হয়েছে, তখন এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। তুমি যে এঁকে তোমার জননী নয় বলে সন্দেহ করছ, সে বিষয়েও চিন্তা করার কারণ রয়েছে। যা হোক, তোমার মা যখন তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন, তাকে ব্যর্থ করবার সাধ্য আমার নেই। তবে একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তোমার মাংস নিয়ে কৃমিরা পৃথিবীতে যাবে; তাতে উভয় দিকই রক্ষা পাবে।

তারপর সূর্য ছায়াকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি মা হয়ে সন্তানদের প্রতি স্নেহের তারতম্য করছ কেন? মনে হয়, মনে হয় কেন, তুমি নিশ্চয়ই এদের মা নও। মা হয়ে সন্তানকে কেউ কখনো অভিশাপ দিতে পারে? ছায়া তখন অভিশপ্ত হবার ভয়ে সূর্যের কাছে সব কথা খুলে বললেন। সূর্য সব কথা শোনার পর বিশ্বকর্মার বাড়িতে এলেন। বিশ্বকর্মা যথাযোগ্য অর্চনায় সূর্যকে পরিতৃপ্ত করতে সচেষ্ট হলেন। সূর্য কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে দগ্ধ করতে উদ্যত হলে বিশ্বকর্মা সূর্যকে সবিনয়ে বললেন—আপনি প্রসন্ন হন। আপনার প্রখর তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা সেই তেজকে কমনীয় করার জন্য তপস্যায় রত আছে। আপনি যদি ক্রুদ্ধ না হন, তবে আপনার রূপ আমি কমনীয় করে দিতে পারি। সূর্য সব কথা শুনে বিশ্বকর্মার কথায় সম্মত হলেন। পূর্বে সূর্যের রূপ ছিল পরিমণ্ডলের আকৃতিবিশিষ্ট। বিশ্বকর্মা সূর্যের অনুমতি পাবার পর তাঁকে শাকদ্বীপে নিয়ে গেলেন এবং ভ্রমিযন্ত্রে ফেলে তাঁর তেজকে ক্ষীণ করে দিলেন। সূর্য পৃথিবী পরিক্রমা করতে থাকলে চাঁদ, গ্রহ ও তারকাসমূহের সঙ্গে গোটা আকাশটা হয়ে উঠল আকুল। সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। পাহাড়-পর্বতগুলো বিদীর্ণ হয়ে গেল। প্রলয়কালীন মেঘের মতো মেঘখণ্ডগুলো চারদিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়তে লাগল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এ রকম অবস্থা দেখে দেবর্ষি ও দেবতারা ভীত হয়ে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন—তুমি সব দেবতার আগে জন্মগ্রহণ করেছ; পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যই তোমার আবির্ভাব। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সময় তুমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে বিরাজ কর। তুমি মুমুক্ষুদের মোক্ষ, ধ্যানীদের ধ্যানের যোগ্য। তোমার কৃপায় আমাদের মঙ্গল হোক। এভাবে যক্ষ, বিদ্যাধর, রাক্ষস ও সাপেরা কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্যের স্তব করলেন। তারপর সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হাহা, হুহু, নারদ ও তুম্বুরু প্রভৃতিরা তাল ও সুন্দর স্বরযোগে সূর্যের কীর্তি-কথা গান করতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা যখন ভ্রমিযন্ত্রে সূর্যের তেজ ক্ষীণ করার প্রয়াসে ছিলেন নিরত, তখন বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, মেনকা, নহজন্যা ও রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরারা লীলা-বিলাসে নৃত্য করতে লাগলেন। বেণু, বীণা, ঝর্ঝর, পণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, দেবদুন্দুভি ও শঙ্খ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সে সময় বাজতে লাগল। দেবতাকুল ভক্তিভরে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন। এভাবে বিভিন্ন জনের আগমনের ফলে এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দের মধ্যে বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজকে ক্ষীণ করে দিতে লাগলেন। তখন সূর্যের রূপ কমনীয় থেকে আরো কমনীয় হয়ে উঠল। সূর্যের তেজ ক্ষীণ করার এই ঘটনা যিনি শোনেন, মৃত্যুর পরে তার সূর্যলোকে গতি হয়। সূর্যের জন্ম এবং কমনীয় রূপ প্রাপ্তির ঘটনা আমি যেমন শুনেছি, সেভাবেই আপনাদের কাছে পরিবেশন করলাম।

—'মার্তণ্ডজন্মশরীরলিখন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ তেত্রিশ

ব্রহ্মার কাছ থেকে সূর্য জন্ম-কথা শোনার পর মুনিরা তাঁকে সূর্য বিষয়ে আরো কিছু কথা বলতে অনুরোধ জানালেন। ব্রহ্মা তখন মুনিদের সূর্যকাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন সমস্ত জগৎ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হয় ও স্থাবর জঙ্গম প্রলয়ের প্রকোপে পড়ে, তখন প্রকৃতি থেকে সবার আগে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে, এই বুদ্ধি গুণের কারণ স্বরূপ। বুদ্ধি থেকে অহংকার, পরে বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, ভূমি এবং তারপর অণ্ড উৎপন্ন হয়। ঐ অণ্ডেই সাত পৃথিবী, সাত দ্বীপ এবং সাত সমুদ্র অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে। আমি, বিষ্ণু ও শিব-আমরা তিনজনই সেই অণ্ডে অবস্থান করছিলাম। অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মোহগ্রস্ত লোকেরা তখন ঈশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। তারপর তেজোময় সূর্যের আবির্ভাব ঘটে ; আমরা তখন ধ্যানযোগে তাঁকে 'সবিতা' বলে জানলাম এবং তাঁকে পরমাত্মা রূপে জেনে তাঁর স্তব করতে আরম্ভ করলাম—তুমি আদি দেবতা, তুমি ঈশ্বর ; কারণ তোমার ঐশ্বর্য রয়েছে। তুমি প্রাণীগণের সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, মুনি, কিন্নর, সিদ্ধ, ও পাখিদের জীবন। ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রজাপতি, বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্র, সোম, বিবস্বান, বরুণ, কাল, সৃষ্টিকর্তা, হর্তা, ভর্তা, প্রভু, সরিৎ, সাগর, শৈল, বিদ্যুৎ, ইন্দ্রধনু প্রলয়, প্রভব, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সনাতন প্রভৃতি রূপে তুমি প্রতিভাত হও। ঈশ্বর থেকে বিদ্যা বড়, বিদ্যা থেকে শিব বড়, এবং শিব থেকেও বড় তুমি। সর্বত্রই তুমি যেতে পারো, সমস্ত কিছুই তুমি আহরণ করতে পারো, তোমার দৃষ্টি সর্বত্রই প্রসারিত এবং সব কিছুই তুমি ভক্ষণ করতে পারো। তুমিই প্রাণীসমূহের মধ্যে প্রথম এবং ভূ, ভূব, স্ব, মহ, সত্য, তপ ও জন—এ সবই তুমি। তোমার যে প্রদীপ্ত রূপকে দেবতারা সহজে দর্শন করতে পারেন না, সেই রূপকে আমরা নমস্কার করি। দেবতারা ও সিদ্ধেরা যার সেবা করে থাকেন এবং ভৃগু, অত্রি ও পুলহ প্রভৃতি ঋষিরা যাঁর স্তব করে থাকেন, তোমার সেই অব্যক্ত রূপকে নমস্কার করি। বেদবিদ ব্যক্তিরা যাকে জ্ঞানরূপে জেনে থাকেন, তোমার সেই রূপকে নমস্কার করি। তোমার যে রূপ বিশ্ব সৃষ্টি করে বৈশ্বানর যাঁর অর্চনা করে থাকেন, যা বিশ্বে অবস্থান করে, যা অচিন্ত্য, যা যজ্ঞ থেকে, বেদ থেকে, লোক থেকে ও স্বর্গ থেকেও বড়, যা পরমাত্মা নামে অভিহিত, যাকে জানা যায় না, যাকে নষ্ট করা যায় না, যার কোন ক্ষয় নেই, যার আদি নেই, অন্ত নেই, তোমার সেই রূপকে নমস্কার জানাই। তুমি সমস্ত কারণের কারণ, সমস্ত রকম পাপকে বিনষ্ট কর, দৈত্যদের বিনাশ সাধন কর, রোগ-ব্যাধি দূর কর ; তুমি সমস্ত বরপ্রদান কর, সমস্ত সুখ দান কর, সমস্ত রকম ঐশ্বর্য দান কর, সৎ, অসৎ বিবেচনা শক্তি দান কর ; তোমাকে আমাদের নমস্কার জানাই।

দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে সূর্য তেজোময় রূপ ধারণ করে কল্যাণকর বাক্যে তাঁদের বললেন—তোমাদের স্তবগানে আমি প্রীত হয়েছি। তোমরা কি বর চাও বল। সূর্যের কথায় দেবতারা নিজেদেরকে কৃত-কৃতার্থ মনে করে বললেন—তোমার অত্যুজ্জ্বল রূপ কেউ সইতে পারে না ; আমাদের তাই প্রার্থনা, পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তোমার এই রূপ সকলের কাছে সহনীয় হোক। দেবতাদের অনুরোধে সূর্য নিজের রূপকে সকলের সহনীয় করে তুললেন। যাঁরা সাংখ্যমতে বিশ্বাসী, যোগপথের পথিক বা ধ্যানী, তাঁরা এবং অন্যান্য মুক্তিকামী ব্যক্তিরা সকলেই সূর্যকে ধ্যান করে থাকেন নিজেদের অন্তরে।

অতি পাপী এবং অসৎ লোকও সূর্যের শরণাপন্ন হলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। সূর্যের প্রতি ভক্তি থাকলে এবং সূর্যকে প্রণাম করলে যে ফল পাওয়া যায় অগ্নিহোত্র, বেদপাঠ বা বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা তার ষোলোভাগের একভাগও পাওয়া যায় না। যারা সূর্যের শরণাপন্ন হয় বা তাঁকে নমস্কার করে, তারা পরম তীর্থ, পরম মঙ্গল ও পরম পবিত্রতা লাভ করে এবং শেষে সূর্যলোকে গমন করে।

তারপর মুনিরা ব্রহ্মাকে সূর্যের একশো আট নাম বলতে অনুরোধ করলে ব্রহ্মা একে একে বলতে আরম্ভ করলেন—সূর্য, অর্চনা, ভগবান, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজ, আকাশ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্র, স্কন্দ, বৈশ্রবণ, যম, বৈদ্যুত, জাঠর, অগ্নি, ঐন্ধন, তেজঃপতি, ধর্মধ্বজ, বেদকর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সর্বসুরাশ্রয়, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, ক্ষপা, যাম ও ক্ষণ, সংবৎসর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, শাশ্বত পুরুষ ও যোগী, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, সর্বলোকনমস্কৃত, স্রষ্টা, সম্বর্তক বহ্নি, সর্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, সর্বতোমুখ, জয়, বিশাল, বরদ, সর্বভূতসেবিত, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণধারণ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, অদিতিনন্দন, দ্বাদশাত্মা, রবি, দক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা মৈত্রেয় এবং করুণান্বিত। দেবতারা, পিতারা ও তক্ষেরা যাঁর সেবা করে থাকেন, অসুর, নিশাচর ও সিদ্ধেরা যাঁকে বন্দনা করেন, সেই স্বর্ণবর্ণ ও আগুনের মতো দীপ্তিমান সূর্যকে আমি প্রণাম জানাই। যিনি সমাহিত হয়ে সূর্যোদয়ে এই নামগুলি পাঠ করেন, তিনি পুত্র, স্ত্রী, ধনসম্পদ, জাতিস্মরত্ব, স্মৃতি ও প্রখর মেধা লাভ করে থাকেন, শোকে তিনি মুহ্যমান হন না এবং অভীষ্ট বস্তু লাভ করে থাকেন।

—'সূর্যনামাষ্টোত্তরশতম্' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ চৌত্রিশ

সূর্যকথা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলে চললেন—যিনি সর্বব্যাপী, দেবাদিদেব, ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন, উমাপতি, চন্দ্রমৌলি, রুদ্র, যাঁর ভয়ে দক্ষযজ্ঞে আগত দেবতা, সিদ্ধ বিদ্যাধর, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও নাগ প্রভৃতি পুরাকালে পলায়ন করেছিলেন, যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন, যাঁর প্রতাপে সন্তপ্ত হয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা কোথাও শান্তিলাভ করতে পারেন নি এবং কৈলাসপর্বতে গিয়ে যাঁর শরণ গ্রহণ করেন, সেই বরপ্রদাতা পিণাকপাণি, শূলপাণি, দক্ষযজ্ঞধ্বংসকারী বৃষধ্বজ উৎকলদেশের একাম্রকাননে সর্বকামনা প্রদান করে অবস্থান করছেন।

ব্রহ্মার কথা শুনে মুনিরা তাঁকে অনুরোধ করলেন—কিসের জন্য শিব সেই দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে দিয়েছিলেন, সে-কথা আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। আমাদের মনে হয়, এ রকম কাজ নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণে হয়েছে।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা সেই প্রাচীন-কথা বলতে আরম্ভ করলেন—দক্ষ প্রজাপতির

আটটি কন্যা জন্মায়। তাদের বিয়ে হয় বিভিন্ন দেবতাদের সঙ্গে। দক্ষ তাঁর আয়োজিত যজ্ঞে সব কন্যাদের নিজের বাড়িতে এনে বিশেষভাবে আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেয়ের নাম সতী। মহাদেবের স্ত্রী। দক্ষ শিবের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সতীকে আমন্ত্রণ করেন নি। স্বভাবতেজস্বী দেবতা মহাদেবও দক্ষের এ রকম ব্যবহার সহ্য করতে পারেন নি। সতী কিন্তু পরে জানলেন যে সব বোনেরা বাড়িতে এলেও তাঁকে বাবা ডাকেন নি। তিনি নিমন্ত্রণ ছাড়াই বাপের বাড়ি চললেন। দক্ষ সতীর প্রতি অশ্রদ্ধাভরে অপমানজনক ব্যবহারই করলেন। তাতে সতী ক্রুদ্ধ হয়ে বাবাকে বললেন–আমি আপনার বড় মেয়ে, অথচ আমাকে আপনি ডাকেন নি। আমি যেচে আপনার বাড়ি এলেও আমাকে আপনি অপমানিত করলেন। সতীর কথায় দক্ষ অসন্তুষ্ট হলেন। তুমি আমার বড় মেয়ে হলেও আমার অন্যান্য মেয়েরা তোমার থেকে সম্মানে, পদমর্যাদায় বড় এবং এ কারণে তারা আপ্যায়ণের যোগ্য। এদের সঙ্গে যে সব দেবতাদের বিয়ে হয়েছে তারাও সম্মাননীয়। শিবের চেয়ে তাঁরা সবাই ব্রহ্মনিষ্ঠ, মহাযোগরত, ধার্মিক, গুণবান এবং আপ্যায়ণের যোগ্য। বশিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু ও মরীচি-এরা আমার জামাই। তোমার স্বামী শিবের সঙ্গে এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। তাই তোমায় আমি হীন চোখেই দেখি। আর তোমার স্বামী শিব, সে তো আমার পরম শত্রু।

বাবার কথায় সতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন–আমি বাক্যে, মনে এবং কাজে কোন দোষ কোন দিন করি নি ; তবু আপনি আমায় এ রকম কথা বললেন। এতে আমি নিজেকে চরম অপমানিত বোধ করছি। এ দেহ আর আমি রাখব না। এই অপমান-জর্জর দেহের আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

সতী এ কথা বলে স্বয়ম্ভূ শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। তিনি বললেন–আমি এই দেহ পরিত্যাগ করে পুনরায় শিবেরই স্ত্রী হব। তারপর সতী বাপের বাড়িতেই সমাধিমগ্ন হয়ে যোগবলে তাঁর দেহ থেকেই উৎপন্ন আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ফেললেন। শিবের কানে সব কথাই পেঁছিল। দক্ষের ব্যবহারে তিনি যত ক্রুদ্ধ হলেন সতীর মৃত্যুতে তেমনি ভীষণ ভাবে দুঃখও পেলেন। ক্রুদ্ধ শিব তখন দক্ষের বিনাশে তৎপর হলেন। শিব দক্ষকে বললেন–সতী আপনা থেকে যেচে এখানে এলেও আপনি তাকে অপমানিত করলেন আর আপনার অন্যান্য মেয়েরা যথোচিত ভাবে সম্মানিত হল। এ রকম পক্ষপাত-মূলক অসম আচরণের জন্য আপনার এই জামাইরা চাক্ষুষ মনুর অন্তরে বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে আপনার অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যজ্ঞে অযোনিজ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আর আপনি চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে মানুষ হয়ে জন্মাবেন এবং রাজা হবেন। আপনার বাবা প্রচেতা এবং মা বৃক্ষকন্যা মারিষা হবেন। তখন আপনার নাম হবে দক্ষ। তখন আপনি যে সব যজ্ঞকাজের অনুষ্ঠান করবেন, তাতে আমি বার বার বাধা দেব। শিবের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ প্রজাপতিও তাঁকে এই বলে অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু তুমি আমার কৃতকর্মের জন্য আমার জামাই ঋষিদের এই কথা বললে, সে জন্য ব্রাহ্মণেরা দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞে তোমার পুজো করবেন না। যজ্ঞ কাজে তোমার আহুতি দিয়ে হোতারা জল স্পর্শ করবেন। যুগক্ষয়ে স্বর্গ-ত্যাগ করে তুমি এই লোকেই বাস করবে। দেবতাদের সঙ্গে কখনোই তোমার পুজো হবে না।

দক্ষের এরূপ অভিশাপ-বাণী শুনে শিব বললেন–দেবতাদের মধ্যে চার বর্ণের ভাগ

আছে। তাঁরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে থাকেন। আমি তাঁদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খাওয়া-দাওয়া করব না, আলাদা ভাবেই করব। সমস্ত লোকের মধ্যে ভূর্লোকই প্রথম ; আমি ধারণ করে থাকলে এই লোকে সবাই অবস্থান করতে পারে। তাই এই লোকেই আমি থাকব। তবে এ সব আপনার আদেশে নয়। সব কিছুই আমি নিজের ইচ্ছা অনুসারে করি।

শিবের অভিশাপে দক্ষ প্রজাপতি মানুষ হয়ে জন্মালেন। দক্ষ যখন সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর প্রভুকে অর্চনা করেন, সে সময় বৈবস্বত মন্বতর উপস্থিত হলে সতী হিমালয়ের স্ত্রী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে তাঁর নাম হয় উমা। সতী শিবের সঙ্গে সর্বদাই সম্মিলিত থাকেন। তিনি যত কাল ইচ্ছা, সমস্ত মন্বন্তরেই সতীর সঙ্গে বিরাজ করেন। অদিতি যেমন কশ্যপকে, শ্রী যেমন নারায়ণকে, শচী যেমন ইন্দ্রকে, কীর্তি যেমন বিষ্ণুকে, উষা যেমন সূর্যকে, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠকে কখনো পরিত্যাগ করেন না, তেমনি সতীও শিবকে কখনো পরিত্যাগ করেন না। আমরা শুনেছি যে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রচেতার স্ত্রী মারিষার গর্ভে দক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরাও সেভাবেই জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে বৈবস্বত মন্বন্তরের আগে ত্রেতাযুগের আদিতে যজ্ঞস্থলে মহাদেব বারুণীতনু ধারণ করেন। এভাবে দক্ষ এবং শিব উভয়েই বিভিন্ন ভাবে জন্মগ্রহণ করে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাই বলি, জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়ে কারও কখনো অনুতাপ করা উচিত নয়। নিজের মঙ্গলকামী অভিজ্ঞ লোক কখনো সে রকম কাজ করেন না।

এতক্ষণ বলার পর ব্রহ্মা থামলেন। মুনিরা তখন তাঁকে অনুরোধ করলেন—আপনি দয়া করে আমাদের গোটাকয়েক প্রশ্নের উত্তর দিন। পূর্বে দক্ষকন্যা সতী কিভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের দেহ পরিত্যাগ করে পুনরায় হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, দেহান্তরেও কিভাবে তিনি পূর্বের দেহ ধারণ করেন, শিবের সঙ্গে কিভাবে তাঁর যোগাযোগ ঘটে, কিভাবে তাঁদের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়—এ সব বৃত্তান্ত আপনি বিস্তৃত ভাবে আমাদের বলুন। আমরা ওই পুণ্যজনক কাহিনী শোনার জন্য খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা তাঁদের উমা-শঙ্করের সেই পবিত্র কথা বলতে আরম্ভ করলেন —কশ্যপ একবার হিমালয়ে এলে নগাধিরাজ তাঁকে জিগ্যেস করেন—পৃথিবীতে মঙ্গলজনক ও খ্যাতিকর কাজ কি? কি করলে অক্ষয়লোক, পরমকীর্তি ও সাধু সমাজে পূজ্যতা পাওয়া যায়, এ সব কথা আমায় দয়া করে বলুন। হিমালয়ের প্রশ্নের উত্তরে কশ্যপ বললেন —আপনি যে সব বিষয়ের উল্লেখ করলেন, একমাত্র অপত্যলাভের দ্বারাই এ সব পাওয়া যায়। এই দেখুন না, আমাকে এবং অন্যান্য ঋষিদের পুত্ররূপে লাভ করে ব্রহ্মা কি রকম খ্যাতিলাভ করেছেন। যা হোক, এ সম্বন্ধে পূর্বে আমি যা দেখেছি, তা আপনাকে বিস্তৃতরূপে বলছি। আমি একবার বারাণসী গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম অন্তরীক্ষে এক সুন্দর বিমান রয়েছে ; তার নিচেই ছিল গর্ত। সেই গর্তের মধ্যে একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। আমি তপোবলে জানলাম আসল ব্যাপারটা কি। তখন এক নৈষ্ঠিক তপস্বী ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন। একটা বাঘ দেখে তিনি ভয় পান এবং সেই গর্তের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণ দেখলেন যে সেই গর্তের মধ্যে লম্বমান তৃণদণ্ডে অনেক মুনি নীচের দিকে মুখ করে ঝুলে আছেন। তিনি তাঁদের সেই অবস্থায় দেখে জিগ্যেস করলেন—আপনারা কারা? কেন এমন ভাবে কষ্ট পাচ্ছেন? কি করলে আপনাদের

এই দৈন্যদশা ঘোচে ? সেই মুনিরা বললেন—আমরা তোমার মতো পুণ্যবান ব্যক্তির পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ। তোমার জন্যই আমরা এভাবে কষ্টভোগ করছি। এই গর্তরূপ নরকে তুমিই এই লম্বমান তৃণদণ্ড ; তোমাকে ধরেই আমরা লম্বমান রয়েছি। তুমি যত দিন জীবিত থাকবে. আমরাও তত দিনই বেঁচে থাকব। তুমি মরলে আমরা নরকে পতিত হব। যদি তুমি বিয়ে কর এবং যদি তোমার গুণবান পুত্র জন্মায়, তবে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পাব। এ ছাড়া আমাদের মুক্তির আর কোন উপায় নেই। অতএব তুমি এই কাজ কর এবং আমাদের ভয় থেকে রক্ষা কর।

তখন সেই ব্রাহ্মণ পিতৃপুরুষদের কথায় সম্মত হয়ে শিবের আরাধনা করে তাঁদের সেই গর্ত থেকে উদ্ধার করে দিলেন এবং তাঁদের গণাধিপতি করে দিলেন। নিজেও সুরেশ নামে শিবের প্রিয়তম গণাধিপতি হলেন। এজন্যই বলছি, তুমি তপস্যা করে গুণবান পুত্র ও সুন্দরী কন্যার জনক হও।

কশ্যপের উপদেশে হিমালয় নিয়ম অবলম্বন করে তপস্যা আরম্ভ করলেন। তাতে আমি খুব প্রীত হয়ে হিমালয়কে বললাম—আমি বরদান করতে এসেছি, আমি এই তপস্যা সন্তুষ্ট। বল, তোমার কি প্রার্থনীয় বস্তু আছে ? হিমালয় বললেন—যদি আপনি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমি যাতে গুণবান একটি পুত্র লাভ করতে পারি, সেই বর দিন। হিমালয়ের প্রার্থনার উত্তরে তাকে এ কথাই আমি বললাম—এই তপস্যার ফলে তোমার একটি কন্যা জন্মাবে। সেই কন্যার প্রভাবে পৃথিবীতে তুমি অতুল কীর্তি অর্জন করবে। তোমার চারদিকে গড়ে উঠবে অসংখ্য তীর্থস্থান ; দেবতারাও তোমায় অর্চনা করবেন। তোমার তিনটি শুভ লক্ষণযুক্ত কন্যা জন্মাবে, তাদের মধ্যে বড় কন্যাই চারদিকে তোমার যশ ছড়িয়ে দেবে। কালক্রমে হিমালয়ের স্ত্রী মেনকার গর্ভে অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা নামে তিনটি মেয়ে জন্মায়। তাদের মধ্যে একপর্ণা একটি বট পাতা ও একটি মাত্র পাটল পাতা আহার করে হাজার বছর ধরে দুশ্চর তপস্যা করেন। একপাটলা একটি মাত্র পাটল পাতা আহার করে এক হাজার বছর পর্যন্ত তপস্যায় রত থাকেন। অপর্ণা কিন্তু অনাহারে থেকেই কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর এই কঠোর তপঃ প্রয়াস দেখে মা মেনকা স্নেহভরে 'উমা' বলে তাঁকে তপস্যা করতে নিষেধ করেন। মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি কঠোর তপস্যা করেন, এজন্য পরে তিনি 'উমা' নামেই বিখ্যাত হন। বিশ্ব চরাচরে এই তিন কন্যার নাম বিঘোষিত হয়। এদের কথা যত দিন পৃথিবী আছে তত দিনই থাকবে। সেই তিন কন্যা যোগ অবলম্বন করেন। তাঁরা সকলেই ভাগ্যবতী ছিলেন ; তাঁদের যৌবন ছিল স্থির। তাঁরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন। উমা যোগ প্রভাবে মহাদেবের আরাধনা করেন। ভৃগুর পুত্র উশনার সঙ্গে একপর্ণার বিবাহ হয়। একপর্ণার পুত্র দেবল। একপাটলার বিয়ে হয় অলর্কের পুত্র জৈগীষব্যের সঙ্গে। তাঁর শঙ্খ ও লিখিত নামে দুটি অযোনিজ পুত্র জন্মায়। এদিকে উমার তপস্যায় সমগ্র জগৎ পরিতপ্ত হয়েছিল। সেজন্য আমি তাকে গিয়ে বললাম-কেন তুমি লোকদের পরিতপ্ত করছ ? এ জগৎ তোমারই সৃষ্টি ; তুমি একে ধ্বংস কোরো না। তুমি যে নিজের তেজে এই পৃথিবীকে ধারণ করছ, সে আমি জানি। তোমার প্রার্থনা কি, সে কথা আমায় খুলে বল। আমার প্রশ্নের উত্তরে উমা বললেন—আমি যে কারণে এই তপশ্চারণ করছি, তা তো আপনার অজানা নয়, তাহলে আপনি এ কথা জিগ্যেস করছেন কেন ? আমি তখন উমাকে বললাম—যার জন্য তুমি তপস্যা করছ, তিনি নিজেই এখানে এসে তোমায় বরণ করবেন। শিবই

সর্বলোকের ঈশ্বর। আমরা তাঁর বশীভূত দাস মাত্র। সেই দেবাদিদেব স্বয়ম্ভু শিব নিজেই তোমার কাছে আসবেন। তিনি উদার, তিনি বিরূপাক্ষ, তিনি দেবাদিদেব। তিনি মহেশ ; পর্বতে তাঁর বাস। তিনি চরাচরের ঈশ্বর, তিনি আদি, কোনো প্রমাণের দ্বারাই তাঁকে জানা যায় না। ইন্দ্রের মতো দীপ্তি তাঁর। চন্দ্র ছাড়া তিনি যেন ভীষণরূপ ধারণ করে থাকেন।

—'স্বয়ম্ভূ-ঋষি সংবাদ' অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ পঁয়ত্রিশ

তপস্যায় নিরত উমাকে আমি এ কথা বলার পর দেবতারাও উমাকে বললেন—অচিরেই নীল-লোহিত শংকর আপনার পতি হবেন। তাই আপনাকে অনুরোধ জানাই, আপনি আর তপস্যা করবেন না। দেবতাদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে উমা তপস্যা থেকে বিরত হলেন। তাঁর আশ্রমের সামনেই ছিল একটি অশোক গাছ। তিনি সেই গাছের নীচে অবস্থান করতে লাগলেন। তারপর এক সময় শিব বিকৃত রূপ ধারণ করে উমার আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন ; তাঁর হাত ছোট, নাক ভাঙা, চুল পিঙ্গলবর্ণের। তিনি কুঁজোর মতো এসে উমাকে বললেন—তোমার আর তপস্যার প্রয়োজন নেই ; তোমায় আমি বরণ করলাম। যোগসিদ্ধা উমা তখন যোগবলে সব কথাই জানতে পারলেন। ছদ্মবেশী শিবের কৃপালাভের আশায় উমা তাঁকে অর্ঘ্য, পাদ্য, মধুপর্ক ও ফুলের দ্বারা অর্চনা করলেন। তিনি বললেন—দেখুন, আমি স্বাধীন নই। আমার বাবা আছেন। কন্যাদান বিষয়ে পিতারই যে পূর্ণ অধিকার —এ কথা তো আপনার জানা আছে। আমার পিতা হিমালয়। আপনি তাঁকে আপনার এই সংকল্পের কথা বলুন। তিনি যদি আপনাকে আমায় দান করেন, তবেই আপনার সংকল্প সিদ্ধ হবে আর আমার পক্ষেও তা সঙ্গত হবে। তারপর দেবাদিদেব সেই বিকৃত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে হিমালয়ের কাছে গিয়ে তাঁর সংকল্পের কথা জানালেন। হিমালয়ও ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকে চিনতে পেরে শাপ ভয়ে ভীত হয়ে বললেন—দেখুন, ব্রাহ্মণদের আমি শ্রদ্ধা করে থাকি। তবে কন্যাদান বিষয়ে আমার একটা পূর্ব-সংকল্প রয়েছে। আমি ঠিক করেছি কন্যার বিবাহের জন্য আমি এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করব ; সেখানে ব্রাহ্মণেরাও থাকবেন। সেখানে আমার কন্যা যাঁকে বরণ করবে, তাঁরই হাতে কন্যাকে আমি সম্প্রদান করব।

হিমালয়ের কথা শুনে ব্রাহ্মণবেশী শিব উমার কাছে এসে সব কথা বললেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সেই স্বয়ম্বর সভায় তুমি রূপবান বর পরিত্যাগ করে অযোগ্য বরকে বরণ করবে কি ? শিবের প্রশ্নে উমা মনে মনে তাঁকেই পতি ভেবে দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানালেন, তোমাকেই আমি পতিরূপে বরণ করব। যদি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে, এখানেই তোমাকে আমি বরণ করছি। এই কথা বলে উমা হাতে অশোকস্তবক নিয়ে, শিবের কাঁধে রেখে বললেন—এই তোমায় আমি বরণ করলাম। উমা শিবকে বরণ করলে পরে শিব তখন সেই অশোকতরুকে সম্বোধন করে বললেন—যেহেতু তোমার পবিত্র স্তবক দিয়ে আমাকে বরণ করা হল এজন্য তুমি অমর হয়ে থাকবে। তুমি কামরূপী ; কামদেবের পঞ্চ পুষ্পবাণের তুমি অন্যতম। তুমি আজ থেকে আমার প্রিয় ফুল হলে। দেবতাদের কাছে তুমি সর্বাভরণ পুষ্পরূপে পরিচিত হবে। তোমার স্বাদ হবে অমৃতের মতো, সকলের

গন্ধবহরূপে তুমি পরিচিত হবে। দেবতারাও তোমায় শ্রদ্ধা করবেন। এই আশ্রম চিত্রকূট নামে পরিচিত হবে। যে ব্যক্তি পুণ্য অর্জনের জন্য এখানে আসবে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করবে এবং এখানে মরলে ব্রহ্মলোকে তার গতি হবে। যে এখানে এসে নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করে দেহত্যাগ করবে, সে মহাগণপতি পদে অধিষ্ঠিত হবে। এ কথা বলে শিব সেখান থেকে চলে গেলেন।

শিব চলে যাওয়ার পর উমা দুঃখিত হয়ে আশ্রমের কাছে এক শিলাখণ্ডের উপর বসে রইলেন ; তাঁকে চন্দ্রহীন রাতের মতো ম্লান দেখাচ্ছিল। এই সময় তিনি আশ্রমের অদূরে একটি সরোবর থেকে একটি বালকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। সেই আর্ত চিৎকার অনুসরণ করে তিনি সেদিকে চলতে লাগলেন। এদিকে শিব নিজেই বালকরূপ ধারণ করে সেই সরোবরে স্নান করছিলেন। সে সময় এক কুমীর তাঁকে আক্রমণ করে। তিনি বালক-বেশেই চিৎকার করে বলতে লাগলেন—কুমীর আমায় আক্রমণ করেছে, আমাকে রক্ষা কর ! আমি বালক, এখনো আমার কোন ইচ্ছাই পূরণ হয় নি ; পৃথিবীর কিছুই আমার ভোগ করা হয় নি। তাছাড়া আমার দরিদ্র বাবা মা আছেন। তাঁদের জন্যও আমার বাঁচা দরকার। আমিই বাবা-মার একমাত্র পুত্র। আমার মৃত্যুর খবর শুনলে তাঁরাও মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। কোন আশ্রম কাজ না করেই আমি মরতে বসলাম। কেউ আমায় রক্ষা কর ! উমা সেখানে এসে দেখলেন যে বালক দেখতে সুন্দর এবং তেজস্বী। উমাকে আসতে দেখে কুমীরটি বালকটিকে নিয়ে সরোবরের মাঝখানে চলে গেল। বালক তেজস্বী হলেও কুমীরের আকর্ষণে ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং আর্তনাদ করতে লাগল। উমা বালকটির করুণ অবস্থা দেখে নিতান্তই দুঃখিত হলেন এবং কুমীরটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তুমি একে ছেড়ে দাও। অসহায় বালকের প্রতি তোমার এ হিংসা কেন ? কুমীরটি উমাকে জানাল—শুনুন, পূর্বকালে লোককর্তারা আমার সম্বন্ধে এ রকম নিয়ম করেছেন যে, দিনের ষষ্ঠ বেলায় অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় যে আমার কাছে আসবে, তাকে আমি আহার্যরূপে গ্রহণ করব। এই বালকটি সেই সময়েই আমার কাছে এসেছে, সুতরাং আমি একে কিছুতেই ছাড়ব না।

কুমীরের কথা শুনে উমা তাকে বললেন—তুমি ধর্মজ্ঞ, তোমায় আমি নমস্কার করি। কিন্তু আমার কথা তুমি শোন। হিমালয়ের শৃঙ্গে থেকে বহু দিন ধরে যে তপস্যা আমি করেছি, তার বলেই তোমায় বলছি, তুমি একে ছেড়ে দাও। কুমীরটি তখন উমাকে বলল—তুমি তপস্যার শক্তিক্ষয় কোরো না ; যা বলি, তাই কর। তাতেই এই বালক মুক্ত হবে। কুমীরের কথায় সম্মত হয়ে উমা তাকে বললেন—ব্রাহ্মণেরা আমার খুব প্রিয়। সুতরাং এই ব্রাহ্মণ বালকের রক্ষার জন্য যে কাজই হোক না কেন, তুমি বল, আমি তা সর্বাগ্রে করব। কুমীরটি তখন উমাকে বলল—তুমি যা কিছু উত্তম তপস্যা করেছ, তা আমায় দাও। আমি বালকটিকে মুক্ত করে দিচ্ছি। উমা কুমীরের প্রস্তাবে তাঁর তপস্যার শক্তি অর্পণ করতে সম্মত হলেন। তখন সেই কুমীরটি উমার তপস্যার শক্তিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। দুপুর-বেলার সূর্যের মতো তার দীপ্তি প্রকাশ পেতে লাগল। সে সন্তুষ্ট হয়ে উমাকে বলল—তুমি কিন্তু ভালো কাজ করলে না। ভেবে দেখ, কত কষ্টে তপস্যা করতে হয়। তবু সেই কষ্টে অর্জিত তপস্যার শক্তি তুমি আজ আমায় দান করলে। ব্রাহ্মণের প্রতি তোমার এই ভক্তিতে আমি প্রীত হয়েছি। আমি তোমায় বরদান করছি। তুমি তোমার তপস্যা এবং এই বালক—উভয়ই গ্রহণ কর।

কুমীরের কথা শুনে উমা তাকে বললেন—দেখ, দেহপাত করেও ব্রাহ্মণ বালককে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। যত্ন করলে, তপস্যা করে পুণ্য অর্জন করা যাবে। আমি সব কথা চিন্তা করে বালকের মুক্তিই কামনা করেছি। কারণ, ব্রাহ্মণের থেকে তপস্যা কখনোই বড় হতে পারে না। আমার মতে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। আমি তোমায় তপস্যা দান করেছি; তা আর ফিরিয়ে নিতে পারি না। কারণ দান করে আর তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এ তপস্যা তোমাতেই প্রতিভাত হোক। তখন সেই কুমীর উমার প্রশংসা করে, বালকটিকে মুক্ত করে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। মুক্ত হয়ে সেই বালকটিও স্বপ্নে পাওয়া ওষুধের মতো সহসা অন্তর্হিত হল। এদিকে উমাও তপস্যার শক্তি ক্ষয় হয়েছে জেনে আবার তপস্যা করতে প্রবৃত্ত হলে শংকর তাঁকে বললেন—তোমাকে আর তপস্যা করতে হবে না। আমাকেই তুমি তোমার সেই তপস্যা দান করেছ। দানের ফলে সেই তপস্যা অক্ষয় হয়ে রইল। তপস্যার অক্ষয়ত্ব লাভ করে উমা আসন্ন স্বয়ম্বরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যে ব্যক্তি শংকরের এই বালকভাবের কাহিনী শোনে, দেহত্যাগ করে সে গণেশের মতোই কুমার হয়ে থাকে।

—'স্বয়ম্ভূ ঋষিসংবাদে পার্বতীর সত্ত্বদর্শন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ ছত্রিশ

কালক্রমে হিমাচলপৃষ্ঠ উমার স্বয়ম্বরকে কেন্দ্র করে অসংখ্য বিমানে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হিমালয় যদিও ধ্যানযোগে মহাদেবের সঙ্গে উমার বিয়ের ব্যাপার জেনেছিলেন, তবুও নিজের প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তিনি তাঁর কন্যা উমার স্বয়ম্বরের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি মনে করলেন, সমস্ত লোকের অধিবাসী দেবতা, দানব ও সিদ্ধদের সামনে যদি আমার কন্যা শিবকে বরণ করে নেয়, তাহলে তা আমি আমার পক্ষে সম্মানজনক বলে মনে করব এবং তাতে করে বিশ্বে আমার সামাজিক তথা বৌদ্ধিক সমৃদ্ধি সম্পন্ন হবে। উমার স্বয়ম্বরের কথা ঘোষণা করে হিমালয় সমগ্র রাজ্যকে রত্নসম্ভারে সাজালেন। স্বয়ম্বরের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর দেবতারা বিবিধ বেশভূষা ধারণ করে হিমালয়ে এলেন। আমিও হিমালয়ের নিমন্ত্রণে পদ্মাসনে বসে সিদ্ধ, যোগী ও দেবতাদের সঙ্গে সেখানে গেলাম। মহনীয় মূর্তি ইন্দ্র অপূর্ব হার ও মালা প্রভৃতি ধারণ করে মদজলের ধারা বর্ষণকারী নিজের বাহন ঐরাবতে চেপে, বজ্র হাতে নিয়ে দেবতাদের সামনে সামনে চলতে লাগলেন। ইন্দ্রের থেকেও তেজস্বী সূর্য সমস্ত দিক উদ্ভাসিত করে পতাকাযুক্ত সোনার রথে চেপে দ্রুতবেগে সেখানে এলেন। ভগ নামধারী কশ্যপের পুত্র আদিত্য একাকী মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো প্রদীপ্ত বিমানে চেপে স্বয়ম্বর সভায় এসে পৌঁছলেন। যাঁর প্রভাব তাঁর তেজ, বল ও আজ্ঞার অনুরূপ সেই দণ্ডধারী যম ভীষণাকার মহিষের উপর চেপে সবেগে স্বয়ম্বর সভায় এলেন। পর্বতের উচ্চতার মতো পীনতনু, সমস্ত পৃথিবীর পালক পবনদেব বিবিধ রত্নালংকারে নিজের সুন্দর বেশকে সুন্দরতর করে সেই স্বয়ম্বর সভায় এসে উপস্থিত হলেন। তেজের আধার প্রদীপ্ত অগ্নিদেব সুসজ্জিত হয়ে সুর এবং অসুরদের সন্তপ্ত করে স্বয়ম্বর সভায় এলেন। যাঁর সারা গায়ে রত্নরাজির ছড়াছড়ি সেই ধনাধিপতি কুবের দিব্য বিমানে চেপে স্বয়ম্বর সভায় এসে উপস্থিত হলেন। সৌন্দর্যের আধারভূত চন্দ্র কান্ত-

বেশে রত্নখচিত বিমানে চেপে সেখানে যোগদান করতে এলেন। শ্যামাঙ্গ বিষ্ণু সর্বাঙ্গে সুগন্ধি মালা পরিধান করে গরুড়ের উপর চেপে সেখানে পৌঁছলেন। উজ্জ্বল এবং সুন্দর বেশ পরিধান করে দেবতাদের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় একই বিমানে সেখানে এসে পৌঁছলেন। অগ্নি ও সূর্যের মতো তেজোবিশিষ্ট সহস্রনাগ অন্যান্য নাগদের সঙ্গে বিমানে আরোহণ করে স্বয়ম্বরে যোগদান করতে এলেন। তারপর অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র ও পবনের মতো দীপ্তিশালী দৈত্যগণ বরের যোগ্য বেশ ধারণ করে দেবতাদের আগে আগে স্বয়ম্বর সভায় এসে উপস্থিত হলেন। মনোহর বেশধারী গন্ধর্বরাজ দিব্য অলংকারসমূহে অলংকৃত হয়ে দিব্য বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রের আদেশে অন্যান্য গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সঙ্গে সেখানে এসে পৌঁছলেন। অন্যান্য দেবতারা, গন্ধর্বেরা, যক্ষ, সর্প ও কিন্নরেরা বিভিন্ন মনোজ্ঞ বেশ ধারণ করে স্বর্গ থেকে বিমানে আরোহণ করে হিমালয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

সমাগত অতিথিদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র সবচেয়ে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হলেন এবং আজ্ঞা, বল ও ঐশ্বর্যে সবাইকে আনন্দিত করে সেই স্বয়ম্বর সভা অলংকৃত করতে লাগলেন। যিনি ত্রিলোকের কারণস্বরূপ, জগতের প্রসূতি, দৈত্য ও দানবদের মাতা, পুরুষপ্রধান শিবের স্ত্রী এবং পুরাণে যাঁকে 'পরাপ্রকৃতি' বলা হয়, সেই ভগবতী সতী দক্ষের ক্রোধে স্বর্গবাসিদের কার্য সাধনের জন্য হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিমালয়-কন্যা উমা তখন মণিময় বিমানে আরোহণ করে চামরের বাতাস সেবন করতে করতে স্বয়ম্বর স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে ছিল সুগন্ধ ফুলের মালা। মালায় ছিল সমস্ত ঋতুর ফুল। উমা মালা হাতে নিয়ে স্বয়ম্বর সভায় এসে যখন পৌঁছলেন, তখন শংকর তাঁর অভিপ্রায় বোঝার জন্য একটি শিশুর আকৃতি ধারণ করে উমার কোলে সুপ্তভাবে অবস্থান বরতে লাগলেন। সেই শিশুর মাথায় ছিল পাঁচটি শিখা অর্থাৎ চুলের গোছা। সতী সেই শিশুকে দেখলেন এবং ধ্যানবলে তাকে চিনতে পেরে আনন্দিত মনে তাকে গ্রহণ করলেন। কাঙিখত পতি লাভ করে সতী সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। তখন দেবতারা সেই শিশুকে দেবীর কোলে দেখে, তার পরিচয় জানতে চেয়ে সতীর কাছ থেকে কোন উত্তর পেলেন না। তাঁরা তখন সেই শিশুর প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাকে মারবার জন্য ইন্দ্র বজ্র তুললেন, কিন্তু সে বজ্র তাঁর হাতেই রয়ে গেল। কেবল তাঁর হাতেই যে বজ্র রয়ে গেল তাই নয়, তিনি চলবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন। তখন 'ভগ' নামক বলবান আদিত্য সেই শিশুকে মারবার জন্য উজ্জ্বল অস্ত্র তুলেও 'মোহ' প্রাপ্ত হলেন। তিনি তাকে মারতে পারলেন না। শংকর তাঁর বল, তেজ এবং এমন কি যোগ-প্রভাবকেও সেই মুহূর্তে নষ্ট করে ফেললেন। বিষ্ণু সেই শিশুরূপী শংকরকে দেখতে লাগলেন। সমগ্র দেবসমাজ যখন এভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে অবস্থান করছিল, আমি তখন ধ্যানযোগে জানলাম যে, দেবাদিদেব শঙ্করই উমার কোলে শিশুরূপে রয়েছেন। এ কথা জানতে পেরে আমি সেই মুহূর্তে আসন ছেড়ে তাঁর চরণ বন্দনা করলাম। আমি সামগানের দ্বারা এবং বিবিধ প্রাচীন আখ্যানের দ্বারা তাঁর স্তব করলাম--তুমি অজ, স্রষ্টা, বিভু, পরাৎপর, প্রধান, পুরুষ এবং ধ্যেয় অক্ষর পরব্রহ্ম। তোমার মৃত্যু নেই। তুমি পরমাত্মা, পরম কারণ ঈশ্বর। ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তাও তুমি। প্রকৃতি সৃষ্টিকার্যের জন্য তোমারই পত্নীত্ব গ্রহণ করে সমগ্র জগতের কারণরূপে উপস্থিত হয়েছেন। দেবীর সঙ্গে তোমাকে আমি প্রণাম জানাই। তোমার নিয়োগক্রমে, তোমারই অনুগ্রহে আমি এই

নিখিল প্রজা সৃষ্টি করেছি। তোমারই যোগমায়ায় এই প্রজাপুঞ্জ বিমূঢ়। তুমি প্রসন্ন হও। এঁরা আবার আগের মতো প্রকৃতিস্থ হোন।

মহাদেবের স্তুতি করে আমি সেই মোহগ্রস্ত দেবতাদের বললাম—তোমরা সবাই মোহ প্রাপ্ত হয়েছ। ইনি দেবাদিদেব শংকর; এঁকে তোমরা চিনতে পারো নি। আমার কথা শোন, আমার সঙ্গে এসে তোমরা সবাই এই দেবাদিদেব অব্যয় মহাদেবের শরণাপন্ন হও। আমার কথায় সমস্ত দেবতারা মিলিত হয়ে ভাবশুদ্ধ চিত্তে মনঃসংযোগ করে ভগবান মহাদেবকে প্রণতি জানালেন। মহাদেব তখন তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর করুণায় মোহগ্রস্ত দেবতারা পুনরায় আগের অবস্থা ফিরে পেলেন। তারপর দেবাদিদেব সেই শিশুর আকৃতি পরিত্যাগ করে ত্রিলোচনরূপ ধারণ করলেন। তাঁর শরীরের তেজে সবাই চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর এই তেজোময় রূপ সবাই যাতে প্রত্যক্ষ করতে পারে, মহাদেব সভাস্থ সকলকে সে-রকম দৃষ্টি দান করলেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সমবেত জনতা ভগবান ত্রিলোচনের সেই নয়ন-মনোহর রূপ দেখতে লাগলেন। উমা তখন দেবতাদের সামনে আনন্দিত মনে মহাদেবের চরণকমলে বরমাল্য স্থাপন করলে, সবাই 'সাধু সাধু' বলে উঠলেন। তাঁরা হর-গৌরীকে প্রণতি জানালেন। আমি তখন হিমালয়কে বললাম—ভগবান মহাদেব আপনার জামাই হলেন; এতে আপনার অভ্যুদয় হল। আপনি সকলেরই সম্মাননীয় ও পূজ্য রূপে পরিগণিত হবেন। আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। আনুষ্ঠানিক বিবাহের আয়োজন করুন। হিমালয় আমাকে তখন বললেন—আপনিই আমার সমস্ত অভ্যুদয়ের কারণ। আপনিই বলুন কিভাবে বিবাহের কার্য নিষ্পন্ন হবে। আমি তখন মহাদেবের সম্মতি আদায় করলাম।

তারপর মহেশের বিবাহের জন্য নানা রত্নময় একটি পুরী নির্মিত হল। বিচিত্র মরকতভূমি সোনার স্তম্ভে সুশোভিত হয়ে উঠল। সেই মনোহর পুরীর দ্বারদেশে দুটি মহামণি চন্দ্র ও সূর্যের মতো শৈত্য এবং তাপ বিতরণ করতে লাগল। বাতাসও সুগন্ধ বহন করে সেখানে প্রবাহিত হল। চার সমুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতারা, সমস্ত দেবনদী, মহানদী, সিদ্ধ ও মুনি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস, জলচর, খেচর, কিন্নর, দেবচারণগণ এবং নারদ, তুম্বরু হাহা ও হূহূ প্রভৃতি সামগায়ী গান্ধর্ব বিদ্যাবিদগণ বিভিন্ন মধুর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সেই পুরীতে এলেন। তপোধন ঋষিরা বেদ-কথা আলোচনা করতে লাগলেন, অনেকে আবার আনন্দিত মনে পবিত্র বৈবাহিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। শংকরের বিবাহের দিনে দেবকন্যারা আনন্দিত চিত্তে বিবিধ মাঙ্গলিক সঙ্গীত গান করতে লাগলেন। শংকরের বিয়ে হবে বলে একই সময়ে ছয় ঋতু মূর্তিমান হয়ে উপস্থিত হল এবং বিবিধ গন্ধ বহন করতে লাগল। নবীন মেঘের মতো ময়ূরেরা মন্দ্রধ্বনি শুনে আনন্দিত হয়ে চারদিকে কেকারব তুলে নৃত্য করতে লাগল। এই সময় বর্ষা এসে পিঙ্গলবর্ণ, সুস্পষ্ট বিদ্যুল্লেখার মতো শোভা পেতে লাগল। কুমুদ-কুসুমে নির্মিত শ্বেতবর্ণের শিরোভূষণের মতো তুষারশুভ্র বলাকাশ্রেণী আকাশে ভ্রমণ করতে লাগল। স্থানে স্থানে শিলিন্ধ্র, কদলী প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ-লতা সদ্যোজাত পত্রে সুশোভিত হতে লাগল। কোথাও নিতান্ত অলস ব্যাঙেরা নবজলধারাপাতে আনন্দিত হয়ে কলরব করতে লাগল। কোথাও ময়ূরেরা মনোরম কেকাধ্বনি করতে লাগল; তাতে প্রিয়তমের প্রতি কপট অভিমানে অভিমানিনী নারীদের মান মুহূর্তেই দূরীভূত হয়ে গেল। তখন চন্দ্রলেখার মতো বাঁকা, বিবিধ বর্ণে

উজ্জ্বল, মনোরম ইন্দ্রধনুসমূহ মেঘের সামনে অধিকভাবে শোভা পেতে লাগল। বিচিত্র পুষ্পসমূহের গন্ধবাহী সমীরণ, নবজলধারায় সুশীতল হয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। দেবনারীদের সুন্দর অলকদাম সেই সান্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে কম্পিত হতে লাগল। গর্জায়মান মেঘসমূহ চন্দ্রকে আবৃত করে দিল। নবজলধারাবর্ষণে দূর্বাদল সিক্ত হল। পথিক-বধূরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই বর্ষাসমাগম দেখতে লাগল। বর্ষাকে মনে হল বিকশিতযৌবনা নারীর মতো ; হংসনিনাদ তার নূপুর-ধ্বনি, সমুন্নত মেঘমালা তার স্তন, চঞ্চল বিদ্যুল্লতা তার হার এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন তার লোচনদ্বয়। শ্যাম মেঘের ধীর ধ্বনি শুনে হাঁসেরা বিত্রস্ত হল, অবিরাম বারিধারায় পদ্মের সম্মুখভাগ নম্র হয়ে পড়ল, সুরভি কুসুমরেণুসমূহে সর্বাঙ্গ লিপ্ত হয়ে গেল। উমার বিয়ের দিনে এমনি করেই বর্ষার সমাগম ঘটল।

বর্ষা চলে গেল। অনুরাগিণী নারীর মতো শরৎ এসে উপস্থিত হল। মেঘের ঘনঘটা সরে গেল। স্তনের মতো কোমলকোষ ফুটে উঠল। নূপুরধ্বনির মতো হংসনিনাদ শোনা গেল। আর তটরূপ কটিদেশ বিস্তীর্ণ হল। কলরবমুখর সারসেরা মেখলার মতো শোভা পেতে লাগল। নীল পদ্মের মতো তার নীল চোখ প্রতিভাত হল। শরৎ-বধূ মনোরম শোভায় বিরাজ করতে লাগল। পাকা বেল যেন তার অধর, কুন্দকুসুমরাজি যেন তার দন্তপংক্তি, নবজাত শ্যামলতা যেন তার শ্যাম রোমরাজি। শরৎ চন্দ্রের কিরণ সমূহ যেন তার গলার হার। শরৎ-বধূকে সমাগত দেখে স্বর্গবাসীদের চিত্ত আনন্দিত হয়ে উঠল। মধুপানোন্মত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন যেন শরৎ-বধূর সুমধুর সম্ভাষণ। চঞ্চল কুমুদসমূহ যেন তার মনোরম কুণ্ডল, রক্ত অশোকের পাতা যেন তার আঙুল, অশোক-পুষ্প যেন তার বসন, লাল পদ্ম যেন তার পায়ের সম্মুখভাগ, জাতিপুষ্পসমূহ যেন তার নখ, কলাগাছ যেন তার সুন্দর উরু এবং উদিত চন্দ্র যেন শরৎ-বধূর সুন্দর আননের শোভা ধারণ করছিল। শরৎ যেন সমস্ত অলংকারে অলঙ্কৃতা প্রেমিকা নারীর মতো সকলের মন আকর্ষণ করল। উমার বিবাহের দিনে শরৎ-রমণী হংসনাদরূপ নূপুরের শব্দে চতুর্দিক মুখরিত করে আবির্ভূত হল। মেঘের আবরণ তখন সরে গিয়েছে, সেই রমণীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো, তার চোখ নীল পদ্মের মতো, তার স্তন সূর্যকরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো, তার গায়ে রয়েছে বিচিত্র পুষ্পের সুগন্ধ।

তারপর অতি প্রখর হেমন্ত ও শীতঋতু শীতরূপ জলে সমস্ত দিক প্লাবিত করেই যেন আবির্ভূত হল। তুষারপাত হতে লাগল অবিরাম, তাতে হিমালয়কে যেন ক্ষীরসমুদ্রের মতো মনে হল। সাধু ব্যক্তির সংস্পর্শে দুর্জন যেমন নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনি সেই হিমালয়ে সহসা ঋতুবিপর্যয় ঘটল। হিমালয়ের শৃঙ্গসমূহ তুষারে সমাচ্ছাদিত হল। হিমালয়ের এ রকম অবস্থা দেখে মনে হল রাজা বিশাল সাদা ছাতায় সমাচ্ছাদিত হয়ে বিরাজ করছেন। এ সময় দেবতা ও দেব-নারীদের কামনা উদ্রেককারী বাতাস ধীরে ধীরে বইতে লাগল। সরোবরসমূহ জলে পরিপূর্ণ এবং পদ্মফুলে সুশোভিত হয়ে উঠল।

উমার বিয়েতে তারপর বসন্ত ঋতুর ঘটল আবির্ভাব। তখন রমণীদের স্তনাগ্রভাগ যেন কিছুটা স্ফীত হয়ে উঠল। সে সময় রমণীদের দৈহিক সুষমা দর্শনীয় হয়ে উঠল। সরোবরের জল পদ্মরেণুতে রক্তাভ হয়ে উঠল। জলাশয়ে চক্রবাকদম্পতীসমূহ কূজন করতে লাগল। দেবতাদের হাতীগুলো আনন্দিত হয়ে চলতে লাগল। প্রিয়ঙ্গু গাছ ও আম গাছ নিজের নিজের মঞ্জরী দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করে যেন বিকশিত হল।

হিমালয়ের সাদা শৃঙ্গে পুষ্পবর্ষণকারী তিলকগাছগুলো যেন কার্য উপলক্ষে সমাগত বৃদ্ধলোকের ন্যায় শোভা পেতে লাগল। শালগাছকে আশ্রয় করে রয়েছে যে অশোকবল্লরী-সমূহ তাদের দেখে মনে হল, যেন প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না হয়ে রয়েছে যৌবনবতী রমণী। বসন্ত সমাগমে কদম, তাল, তমাল, সরল, অশোক, সর্জ, অর্জুন, কোবিদার, পুন্নাগ, নাগেশ্বর, কর্ণিকার, লবঙ্গ, অগুরু, সপ্তপর্ণ, বট, শোভাঞ্জন ও নারকেল প্রভৃতি গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। জলাশয়ের জল স্বচ্ছ শোভা ধারণ করল। চক্রবাক, কারণ্ডব, হাঁস, সাদা সারস, ডাহুক ও বলাকাশ্রেণী ওই সকল জলাশয়ে বিচরণ করতে লাগল। বিভিন্ন রকম পাখিদের দেহ বিবিধ অলংকারে অলংকৃত বলে মনে হল। তারা কামশরে পীড়িত হয়ে অন্যান্য পাখিদের যেন অসহিষ্ণুভাবে তিরস্কার করতে করতে কূজন করতে লাগল। উমার বিবাহের দিনে সুশীতল মলয় পুষ্প গন্ধে আমোদিত হয়ে ধীরে ধীরে বইতে লাগল। জলাশয়ের জল কোথাও ভ্রমর-পরিবৃত নীলপদ্মে নীল, কোথাও সাদা পদ্মে সাদা, কোথাও বা লালপদ্মে লাল হয়ে শোভা পাচ্ছিল। পুষ্করিণীতে পদ্ম ফুটে শোভা বিস্তার করছিল। হিমালয়ের শৃঙ্গসমূহ কর্ণিকার ফুলে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। পুষ্পরেণুতে দিকসমূহ রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। পাখির কূজনে মুখরিত হয়ে অশোকবন পর্বতের সানুদেশে বিরাজ করতে লাগল। হিমালয়ে এত তমাল গাছ ছিল যে তাদের দেখে মনে হল যেন পর্বতগাত্রে স্থানে স্থানে মেঘমালা লেগে রয়েছে।

হিমালয়ে প্রচুর চন্দন এবং চাঁপাগাছ ছিল; তাতে অজস্র ফুল ফুটে উঠল। স্থানে স্থানে উন্মত্ত পুংস্কোকিলের কলকাকলী মধুরভাবে শোনা যেতে লাগল। কোকিলের মধুর কলধ্বনি শুনে ময়ূরেরাও কেকাধ্বনি করতে লাগল। সেই শব্দ শুনে শক্তি সঞ্চয় করে কামদেব তাঁর কুসুমধনু ধারণ করলেন এবং দেবাঙ্গনাদের সেই ধনুকে বিদ্ধ করতে মনস্থ করলেন। ক্রমে সূর্যের কিরণ প্রখর হয়ে উঠল, জলাশয় শুকিয়ে গেল। উমার বিবাহের সময় হিমাচলে গ্রীষ্ম এসে উপস্থিত হল। এই গ্রীষ্মের দিনেও হিমালয়ের শৃঙ্গ-স্থিত গাছে প্রচুর ফুল ফুটে উঠল। কদম, অর্জুন প্রভৃতি গাছে যে ফুল ফুটেছিল, বাতাস তার গন্ধ বহন করে সমগ্র স্থানকে আমোদিত করে রেখেছিল। পুষ্করিণীসমূহ প্রস্ফুটিত পদ্মসকলের কেশর পতনে অরুণ হয়ে উঠেছিল। সেই পুকুরগুলোর তীরে কলহংস প্রভৃতি জলচর পাখিরা কলরব করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কুরুবক গাছে অজস্র ফুল ফুটে উঠল; ফোটা ফুলের নিমন্ত্রণ পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ভোমরার দল সেখানে এসে পেঁছিল। বকুল পর্বতের সানুদেশে ফুল ছড়িয়ে দিতে লাগল। সমস্ত গাছে ফুল ফুটে উঠল, নানা জাতের পাখির মধুর শব্দে সেই প্রদেশ রমণীয় হয়ে উঠল। এভাবে পার্বতীর বিয়েতে ছয় ঋতুরই সমাবেশ ঘটল। বিভিন্ন বাজনা উঠল বেজে। আমি উমাকে যথাযোগ্য অলংকারে অলংকৃত করে নিজেই তাকে বিবাহস্থানে নিয়ে এলাম। তারপর শংকরকে বললাম—শুনুন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমি উপাধ্যায়ের কাজ করতে পারি। সমস্ত বৈবাহিক-ক্রিয়া আমি সম্পন্ন করতে পারি। শংকর আমার কথায় সানন্দে সম্মত হলে আমি কুশমুষ্টি এনে 'হর ও গৌরী'র হাত যোগবন্ধনে বেঁধে দিলাম। অগ্নি নিজেই সেখানে হাতজোড় করে অবস্থান করছিলেন। আমি যথাবিধি হোম সম্পন্ন করে তাঁদের সেই বৈবাহিক অগ্নি প্রদক্ষিণ করালাম এবং তাঁদের হাতের বাঁধন খুলে দিলাম। তারপর বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হলে মহাদেবকে নমস্কার করলাম। এভাবে যোগবলে উমা-মহেশ্বরের বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হল; কিন্তু দেবতারা এ তত্ত্ব বুঝতে পারলেন না।

দেবাদিদেবের বিয়ের ব্যাপারে আরও অপূর্ব কথা আছে, শুনুন।

—'উমামহেশ্বরের বিবাহনিরূপণ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ সাঁইত্রিশ

ভগবান শংকরের বিবাহ নিষ্পন্ন হল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তখন আনন্দিত হয়ে মহেশ্বরের স্তবগানে মুখর হলেন। তুমি সমস্ত পর্বতের কারণস্বরূপ, পর্বতের অধিপতি তুমি। বায়ুর মতো গতিবেগ তোমার। তোমার কোন দৃশ্যমান রূপ নেই; তোমাকে কেউই পরাজিত করতে পারে না। তুমি নিখিল জগতের ক্লেশ হরণ কর। মানুষকে তুমি শুভ বস্তু দান কর। হে নীলশিখণ্ড, অম্বিকাপতি. তোমাকে নমস্কার জানাই। তুমি বায়ুর মতো অশরীরী, অনেক রূপ ধারণ করেও তুমি বিরাজ কর। তোমার অগণিত চোখ, অগণিত পা রয়েছে। সর্বত্রই তুমি গমন করতে পারো। তুমি দেবতাদের বিদূষক। অতি ভীষণ রূপ ধারণ করেও কখনো কখনো তুমি লোকের ভীতির কারণ হয়ে থাক। তুমি অতীতে ইন্দ্রের বজ্রধারণকারী হাত অকেজো করে দিয়েছিলে। সমগ্র বেদের তুমি বীজস্বরূপ, সমগ্র চরাচরের তুমি অধিপতি। তুমি দুষ্টজনের যম, জলে তোমার লিঙ্গশরীর শায়িত থাকে। নরকপাল তোমার মালা, সে কপাল তুমি হাতেও ধরে থাক। তোমার হাতে রয়েছে দণ্ড, গদা। তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, হাতে রয়েছে তোমার খট্বাঙ্গ; তুমি ভূত-পিশাচদের আর্তি দূর কর। তোমাকে বারবার নমস্কার জানাই। তুমি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেছ, কৃষ্ণকেশের অপহারক। তুমি 'ভগ' নামক দৈত্যের চক্ষু উৎপাটন করেছ, পূষার দাঁত তুমি তুলে নিয়েছ। তুমি ডমরু, শূল, অসি, খড়্গ ও মুগুর ধারণ করে থাক। তুমি মহাকালেরও যমস্বরূপ। তোমার তিনটি চোখ রয়েছে। পর্বতে তুমি বাস কর। তোমার বীর্য স্বর্ণময়। তুমি কুণ্ডল ধারণ করে থাক। দৈত্যদের যোগ তুমি নষ্ট করে দাও। তুমি যোগীদের গুরু; চন্দ্র ও সূর্য তোমার চোখ, তুমি গৃহী হয়ে সাধুর মতো জীবন যাপন কর। তুমি শ্মশানে বাস কর, শ্মশানেই বর দান কর। তুমি ত্র্যম্বক, জটিল, ব্রহ্মচারী, পশুপতি, যোগ ও ঐশ্বর্যদায়ক, শান্ত. দান্ত, রুদ্র, বসু, আদিত্য, পিতা, সাংখ্য, বিশ্বদেব, শর্ব, উগ্র, শিব, বরদ, ভীম, সেনানী, প্রধান, অপ্রমেয়, শুচি, শত্রুনাশক, সদ্যোজাত, কার্য, কারণ, মহাদেব, চিত্র, বিচিত্র, পুরুষ, পুরুষসংযোগ, প্রধান গুণকর্তা, প্রকৃতির প্রবর্তক, কৃত ও অকৃতের সৎকর্তা, ফলদাতা, কালজ্ঞ, বৈষম্যকারী ও গুণ এবং বৃত্তিদাতা। —তোমাকে আমরা বারবার নমস্কার জানাই। তোমার সৌম্যমূর্তি নিয়ে তুমি আমাদের সামনে অবস্থান কর।

দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শংকর তাঁদের বর দিতে চাইলেন। দেবতারা তখন শংকরকে বিনীতভাবে জানালেন—আমাদের স্তব-গানে আপনি প্রীত হয়েছেন জেনে আমরা নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করছি। কিন্তু এ বর এখন আপনার কাছেই থাকুক। আমাদের প্রয়োজন হলে, আমরা আপনার কাছ থেকে তা চেয়ে নেব। 'তাই হোক' বলে শংকর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভূতদের সঙ্গে নিজের বাসস্থানে চলে গেলেন। যে ব্যক্তি মহাদেবের এই বিবাহ-বৃত্তান্ত দেবতাদের সামনে গান করে, সে মৃত্যুর পর গণেশের মতো সুখী হয়। যে এই স্তব শোনে বা পাঠ করে, দেবতারা ইন্দ্রের মতো তাকেই স্তুতি করে থাকেন।

—'শিবস্তুতিনিরূপণ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ আটত্রিশ

তারপর দেবাদিদেব নিজের বাড়িতে প্রবেশ করে আসনে বসলে পর সেই কুটিলমনা মন্মথ তাঁর পুষ্পধনু দিয়ে মহাদেবকে বিদ্ধ করতে উদ্যত হল। মন্মথ দুরাচার, দুরাত্মা ও অধম ; সমস্ত লোককে পীড়ন করাই এর স্বভাব। ঋষিদের তপস্যা প্রভৃতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করাই এর কাজ। কামদেব মন্মথ তখন চক্রবাকদম্পতীর রূপ ধরে রতির সঙ্গে মহাদেব যেখানে বসে আছেন, সেখানে এসে উপস্থিত হল। মহাদেব দেখলেন, কামদেব তার ধনুকে তীর যোজনা করেছে। তিনি তাঁর ললাটস্থিত তৃতীয় নয়নে অবজ্ঞা ভরে যেই কামদেবকে দেখলেন, অমনি সেই নয়ন থেকে আগুন বেরিয়ে গিয়ে মন্মথকে পুড়িয়ে ফেলল। দগ্ধ মদন যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে কাঁদতে লাগল এবং সেই অবস্থাতেই মহাদেবকে প্রসন্ন করতে চেষ্টা করল। কিন্তু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অল্প কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। কামদেবের স্ত্রী রতি তখন অতি দুঃখে বিলাপ করতে লাগল এবং মহাদেব ও উমার কাছ থেকে পতির প্রাণ ভিক্ষা করল। রতিকে দুঃখিত দেখে তাঁদের দয়া হল। তাঁরা রতিকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমার স্বামীর শরীর পুড়ে গেছে ; তার আর বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা নেই। তোমার স্বামী অশরীরী হয়েও সমস্ত কাজ করবে। যখন ভগবান বিষ্ণু বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন, তখন তাঁর পুত্রকে তুমি স্বামীরূপে লাভ করবে। রতি বর লাভ করে সেখান থেকে চলে গেল।

এদিকে মহাদেব কামদেব মদনকে পুড়িয়ে ফেলে আনন্দিত মনে উমার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। সুন্দর গিরিকন্দরে, জলাশয়ে, গুহায়, ঝরণায়, কর্ণিকার ফুলের বনে, নদীতীরে, কিন্নরদের রমণীয় দেশে, পর্বতশৃঙ্গে, সরোবরসমূহে, রমণীয় বনানীতে, পবিত্র তপোবনে উমার সঙ্গে আনন্দে বিচরণ করতে লাগলেন। বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, যক্ষ ও দেবতারা যে যে জায়গায় বিহার করেছেন মহাদেবও উমার সঙ্গে সেই সেই জায়গায় বিচরণ করতে লাগলেন। সবার সঙ্গে মহাদেব সেই হিমালয়ে অত্যন্ত আনন্দে কাল কাটালেন। তখন অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগল, দেবতারাও আনন্দিত হলেন। গন্ধর্বেরা নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগল। কেউ কেউ আবার মহাদেবের স্তব করতে প্রবৃত্ত হল। এভাবে সবার সঙ্গে মহাদেব সেখানেই—সেই হিমালয়েই রয়ে গেলেন।

ঋষিরা ব্রহ্মাকে থামিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলেন—মহাদেব উমার সঙ্গে সেখানে বাস করে কোন্ কাজ করছিলেন, সে-কথা আমরা জানতে চাই। দয়া করে তা আমাদের বলুন।

ঋষিদের অনুরোধে ব্রহ্মা তাঁদের বললেন—ভগবান মহাদেব উমার প্রিয় কামনায় সেই হিমালয়ে অবস্থান করে, বিবিধ গণেশমূর্তি ধারণ করে তাঁকে আনন্দ দান করছিলেন এবং নিজেও আনন্দ অনুভব করছিলেন। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। একবার উমা তাঁর মা মেনকার কাছে গেলেন। মেনকা তাঁকে বসবার জন্য এক মহামূল্য আসন দান করলেন। উমা সেই আসনে বসলে মেনকা মেয়েকে বললেন—তুমি অনেক দিন পর এলে। তোমাদের সব মঙ্গল তো ? তুমি স্বামীর সঙ্গে আনন্দে খেলা করে থাক তো ? যারা নিরাশ্রয় দরিদ্র, তারা তোমার স্বামীর মতো ক্রীড়া করে থাকে। মায়ের কথা শুনে উমার ক্রোধ হলেও তিনি মাকে কিছু না বলে সেখান থেকে চলে এলেন। স্বামীকে তিনি সব কথা খুলে বললেন এবং তাঁকে অন্যত্র গিয়ে বাস করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মহাদেব উমার সব কথা শুনে তাঁকে বললেন—দেখ, তোমাকে আমি আগে অন্যত্র বাস করার কথা বলেছি,

কিন্তু তুমিই যেতে চাও নি। আজ নিজেই চলে যেতে চাইছ, এর কারণ কি ? হঠাৎ তোমার ইচ্ছার পরিবর্তন হল কেন ?

মহাদেবের প্রশ্নে উমা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—আমি আজ মায়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমায় বললেন যে, তোমার স্বামী চিরদরিদ্র হয়েও ক্রীড়া করেন ; দেবসমাজে আর কেউ কিন্তু এ রকম করেন না। আমার মনে হয়, আপনি যে গণদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, আমার মা তা পছন্দ করেন না। উমার কথায় মহাদেব হেসে তাঁকে বললেন—তোমার মা যা বলেছেন তা সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার এতে দৈন্য বা ক্রোধ হয় কেন ? আমি তো চিরদিনই এভাবে থাকি। বাঘছাল আমার পরিধেয়, শ্মশান আমার বাসস্থান। আমার কোথাও ঘর নেই। আমি চিরদিনই বনে বনে, পর্বতের গুহায় ভূত-প্রেতদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। তোমার মা তো সত্যি কথাই বলেছেন। তুমি এতে রাগ করছ কেন ? এ কথা জানবে যে, পৃথিবীতে মায়ের মতো বন্ধু নেই। উমা তখন বললেন—আমার বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজন নেই ; যাতে আমি সুখে বাস করতে পারি, তাই আপনি করুন।

উমার প্রীতির জন্য মহাদেব তখন হিমালয় পরিত্যাগ করে অনুচরদের সঙ্গে সুমেরু পর্বতে চলে গেলেন। এখানে দেবতা ও সিদ্ধেরা বাস করেন।

—'উমা মহেশ্বরের হিমালয় পরিত্যাগ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ উনচল্লিশ

এতক্ষণ উমা মহেশ্বরের বিবাহ এবং হিমালয়-পরিত্যাগের ঘটনা প্রভৃতি বলার পর ব্রহ্মা যখন থামলেন, তখন ঋষিরা তাঁকে অনুরোধ জানালেন—বৈবস্বত মন্বন্তরে দক্ষ প্রজাপতির অশ্বমেধ যজ্ঞ কিভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল, সে কথা আমরা জানতে চাই। মহাদেবের ক্রোধ-বহ্নি সেই যজ্ঞকে এবং তার আয়োজককে কিভাবে পুড়িয়ে ফেলেছিল, দয়া করে তা আমাদের বলুন।

ঋষিদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—সতীর ইচ্ছানুসারে এবং অপমানের প্রতিশোধস্পৃহায় মহাদেব যেভাবে দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করেছিলেন সে কথা বলছি, শুনুন। সুমেরু পর্বতে জ্যোতিঃস্থল নামে এক রত্নময় বিচিত্র শৃঙ্গ আছে। ওই শৃঙ্গ সর্বলোকের নমস্কৃত, অপ্রমেয় ; ত্রিলোকবাসীরা এর পূজা করে থাকে। পুরাকালে দেবাদিদেব শঙ্কর ওই রত্নখচিত পর্যাঙ্কের মতো বিস্তীর্ণ গিরিতটে একবার উপবিষ্ট ছিলেন। উমাও তাঁর পাশেই বসেছিলেন ; কারণ গৌরী কখনো হরকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। দেবতারা, বসুরা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং যক্ষপতি কৈলাসবাসী রাজা বৈশ্রবণ তাঁদের উপাসনা করছিলেন। এমন সময় মহামুনি উশনা, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিরা অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিরা এবং গন্ধর্ব, বিশ্বাবসু, নারদ, পর্বত ও অপ্সরারা সেখানে এসে পৌঁছলেন। গন্ধবহ সুখস্পর্শ বায়ু ধীরে ধীরে বইতে লাগল। বৃক্ষসমূহ সমস্ত ঋতুর ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে সুগন্ধ বিতরণ করতে লাগল। বিদ্যাধর, সিদ্ধ, সাধ্য, তপোধন এবং নানা রূপধারণ-কারী অন্যান্য প্রাণীরা, রাক্ষসেরা, বলশালী পিশাচেরা, নানা রকম অস্ত্রধারী দেবানুচরেরা, শূলধারী নন্দীশ্বর, সর্বতীর্থময়ী শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গা—এঁরা সবাই মহাদেবের উপাসনায় ছিলেন তৎপর। এদিকে দক্ষ প্রজাপতিও যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত

দেবতারা স্বর্গ থেকে দক্ষের যজ্ঞসভায় এসে উপস্থিত হলেন। শুনেছি, যে তাঁরা উজ্জ্বল, সুন্দর বিমানে আরোহণ করে সেই যজ্ঞসভায় এসেছিলেন। পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও স্বর্গে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা সবাই প্রণত হয়ে দক্ষ প্রজাপতির উপাসনা করতে লাগলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুৎ প্রভৃতি যে সব যজ্ঞভাগী দেবতারা, তাঁরা সবাই বিষ্ণুর সঙ্গে সেখানে এলেন। গরম পানীয় যারা পান করে, যারা ধূমই পান করে, যারা যজ্ঞের ঘি পান করে তারা, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুৎগণ সেই যজ্ঞে এসে উপস্থিত হলেন। যোনিজাত, অণ্ডজাত, ঘর্মজাত ও উদ্ভিদজাত বহু প্রাণীও সেই যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হল। যজ্ঞের ঋত্বিক ঋষিরা এবং সস্ত্রীক বহু দেবতা নিমন্ত্রিত হয়ে সেই যজ্ঞস্থানে এসে পেঁছিলেন।

সেই সমাগত যজ্ঞের দর্শকদের দেখে মুনি দধীচি সক্রোধে বললেন—অপূজ্যের পূজা করলে এবং পূজ্যের পূজা না করলে লোকে পাপভাক হয়ে থাকে। দধীচি এ কথা বলার পর দক্ষকে ডেকে বললেন—দেখ দক্ষ, ভগবান পশুপতি সকলেরই পূজা-পাত্র ; অথচ তুমি তাঁর পূজা করছ না কেন ? উত্তরে দক্ষ বললেন—দেখুন মহর্ষি, আমার এখানে এগারো জন রুদ্র আছেন, এঁরা শূল ধারণ করেন, এঁদের জটাও রয়েছে। এঁরা পূজা-পাত্র। এ ছাড়া অন্য কোন রুদ্রকে আমি চিনি না। দক্ষের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে দধীচি তাঁকে বললেন—সকলেরই পরমারাধ্য শংকর এ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নি। আমি যদি শংকর ছাড়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা না করে থাকি, তাহলে এ কথা আমি সত্যি করে বলছি যে, তোমার এই বিপুল যজ্ঞ স্থায়ী হবে না। দক্ষও দমবার পাত্র নন, দধীচিকে তিনি শুনিয়ে দিলেন—বিষ্ণুকে যজ্ঞের ভাগ দান করা হয়েছে, রুদ্রদেরও যজ্ঞভাগ দান করেছি। অন্যান্য দেবতারাও নিজের নিজের ভাগ লাভ করেছেন ; কিন্তু শংকরকে আমি যজ্ঞভাগ দান করব না।

এদিকে বাবার আয়োজিত যজ্ঞে সবাই গেছেন, কিন্তু সতী নেমন্তন্ন পেলেন না। তিনি শংকরকে জিগ্যেস করলেন—শুনতে পাচ্ছি পিতা নাকি যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। অথচ আমরা কেন এখনো নিমন্ত্রণ পেলাম না ? আপনি কেন যজ্ঞে যাচ্ছেন না ? কোন বাধা আছে কি ? মহাদেব তখন সতীকে বললেন—দেখ, দেবতারা সবাই মিলে এই যজ্ঞের আয়োজন করেছেন ; সমস্ত যজ্ঞেই আমার নির্দিষ্ট ভাগ তাঁরা আমাকে দেবেন না বলে ঠিক করেছেন। আমাকে আমার নিজস্ব পথেই চলতে হবে। তখন উমা বললেন, গুণে এবং প্রভাবে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে আপনিই প্রধান। তেজ, যশ ও সমৃদ্ধির দ্বারা সকলেরই আপনি অজেয়। আপনাকে এই যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করায় আমি নিতান্ত দুঃখ পেলাম। আমি এমন কি তপস্যা বা নিয়ম পালন করব, যাতে আপনি আবার ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞের ভাগ পাবেন, দয়া করে আমায় সে-কথা বলুন। সতীকে দুঃখিত দেখে মহাদেব বললেন—তোমার এ কথা বলা সাজে না। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আমারই উদ্দেশ্যে স্তব-গান রচনা করে থাকেন। ধ্যানে তাঁরা আমার স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেন। আমার ক্রোধে সমগ্র ত্রিভুবনই বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মণেরা আমাকেই যজ্ঞেশ্বর রূপে স্তব করেন। আমারই উদ্দেশে উৎকৃষ্ট সামগীত হয়। অধ্বর্যুরা ব্রহ্মমন্ত্রে আমার অর্চনা করেন ও আমার জন্য যজ্ঞভাগ কল্পনা করে থাকেন। মহাদেবের কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে সতী বললেন—আপনি স্ত্রী-সমাজে সাধারণ লোকের মতো নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন। শংকর তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—দেখ, আমি নিজেই নিজের প্রশংসা করছি না। তুমি দেখ না, এক্ষুনি আমি আমার ভাগ রক্ষার জন্য এক প্রাণী সৃষ্টি করছি। এই কথা বলে ক্রোধে

শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। তাঁর মুখজাত ক্রোধ-বহ্নি থেকে উৎপত্তি হল এক ভীষণাকৃতি প্রাণী। শঙ্কর তাকে বললেন—তোমায় আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি দক্ষ যজ্ঞে যাও এবং সেই যজ্ঞ ধ্বংস কর।

মহাদেবের ক্রোধ-বহ্নি থেকে উৎপন্ন সেই প্রাণীর আকৃতি অনেকটা সিংহের মতো। সে শিবশম্ভুর আদেশে ভদ্রকালীকে সহচরী রূপে সঙ্গে নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করতে চলল। তার নাম হল বীরভদ্র। সেই বীরভদ্র নিজেই নিজের রোমকূপ থেকে শঙ্করের মতো শক্তিশালী অসংখ্য অনুচর সৃষ্টি করল। তারা হাজারে হাজারে ভীষণ বিচিত্র শব্দ করতে করতে ধ্বংসের উন্মাদনায় মেতে উঠল। তাদের ভয়ংকর শব্দে সমস্ত স্বর্গবাসী ভীত, ত্রস্ত হয়ে পড়ল। পর্বতসমূহ বিদীর্ণ হয়ে গেল। পৃথিবী কাঁপতে লাগল। বাতাস বেগে বইতে লাগল, জলরাশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, আগুন নিভে গিয়ে ঘোর অন্ধকার চারদিক ছেয়ে ফেলল। সূর্য ম্লান হয়ে গেল। গ্রহ, নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ সকলেরই জ্যোতি ম্লান হয়ে গেল এবং ঋষি, দেবতা ও দানব—সবাই নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ওই রুদ্রানুচর গণেশ্বরগণ যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করল। তারা যজ্ঞস্থলে গিয়ে যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠসমূহ উৎপাটিত করল। একদল সিংহের মতো চিৎকার করতে লাগল, অন্য দল ভীষণ অঙ্গভঙ্গি করে বায়ুর মতো বেগে ধাবিত হল। তারা যজ্ঞপাত্র আছড়ে ভেঙে ফেলল। যজ্ঞে সংগৃহীত সুপ্রচুর অন্ন, পানীয়, দুধ, ঘি, পায়স, মধু, মিষ্টান্ন, বিভিন্ন রকম মিষ্টি, মাংস স্তূপ, চর্ব্য চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন সামগ্রী সমস্তই রুদ্রের অনুচরেরা খেয়ে ফেলল এবং যা খেতে পারল না, তা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। মহাদেবের ক্রোধ থেকে জাত সেই গণেরা কালাগ্নির মতো প্রদীপ্ত হতে লাগল ; তাদের মধ্যে কেউ কেউ যজ্ঞে আনীত দ্রব্য-সমূহ খেতে লাগল, কেউ কেউ ভয় দেখাতে লাগল সবাইকে, কেউ কেউ বিবিধ রকম খেলা করতে লাগল, কেউ কেউ আবার সুরসুন্দরীদের ধরে ধরে নানাদিকে নিক্ষেপ করতে লাগল।

মহাদেবের আদেশ পেয়ে সেই ভয়ংকর গণাধিপ বীরভদ্র দুর্ধর্ষ রুদ্রানুচরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, ভদ্রকালীর সামনেই সেই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে ফেলল। দক্ষের মাথা তারা কেটে ফেলল। রুদ্রের অনুচরেরা জয়ের উল্লাসে ভীষণ গর্জন করে উঠল। এই ভয়ংকর ধ্বংসকর্ম দেখে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা এবং স্বয়ং দক্ষ প্রজাপতি বীরভদ্রকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে বীরভদ্র বলল—আমি দেবতা নই, দৈত্য নই, বা কোন কিছু ভাগ করতে এখানে আসি নি। কোন কৌতূহলবশতও আমি এখানে আসি নি। দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করাই আমার উদ্দেশ্য, সেজন্যই আমি এখানে এসেছি। আমার নাম বীরভদ্র ; ভগবান শঙ্করের ক্রোধ থেকে আমার জন্ম ; আর ইনি আমার সহচরী ; এঁর নাম ভদ্রকালী। সতীর ক্রোধ থেকে এঁর জন্ম। তুমি দেরি না করে শীগগিরই ভগবান শঙ্করের শরণাপন্ন হও। কারণ, শঙ্করের ক্রোধ বরং ভালো, কিন্তু তাঁর অনুচরদের অনুগ্রহও তোমার পক্ষে অত্যাচারেরই সামিল।

দক্ষের আয়োজিত যজ্ঞ তখন সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হয়ে গেল। যজ্ঞীয় যূপ উৎপাটিত হয়ে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে গেল। শকুনি প্রভৃতি আমিষলোলুপ পাখিরা চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেয়ালরা চারদিকে অমঙ্গলসূচক ধ্বনি করতে লাগল। যজ্ঞ তখন মৃগ-রূপ ধারণ করে আকাশপথে যেতে লাগলে গণেশ্বর তা বুঝতে পেরে ধনুকবাণ ধারণ করল এবং তাকে অবরুদ্ধ করতে অগ্রসর হল। ক্রোধবশত গণপতির কপাল থেকে

এক বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ল। সেই ঘামের ফোঁটা পৃথিবীতে পড়া মাত্রই সেখানে কালানলের মতো প্রচণ্ড আগুন দেখা দিল। সেই আগুনের ভেতর থেকে তখন এক পুরুষ উৎপন্ন হলেন। সেই পুরুষ আকারে ছোট, তার চোখ লাল, দাড়ি-গোঁফ খয়েরী রঙের. চুল উপরের দিকে উঠানো, তার দর্শন অতি ভয়ংকর। সেই পুরুষের সর্বাঙ্গ রোমরাজিতে পরিপূর্ণ, তার কান লাল, গায়ের রঙ ঘোর কালো এবং পরিধানের কাপড় লাল। সেই অগ্নিবর্ণ পুরুষ পলায়মান যজ্ঞকে পুড়িয়ে ফেললেন। তখন দেবতারা ভীত হয়ে দশ দিকে পলায়ন করতে লাগল। সেই ভয়ংকর পুরুষ সেখানে বিক্রমের সঙ্গে বেড়াতে থাকলে সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী কাঁপতে লাগল। এ রকম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে আমি মহাদেবকে স্তব করে বললাম–দেবাদিদেব, আপনি ক্রোধ পরিহার করুন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সমস্ত দেবতা আপনাকে যজ্ঞভাগ দান করবেন। আপনার ক্রোধে এই দেবতা এবং ঋষিরা শান্তিলাভ করতে পারছেন না। আপনার ঘাম থেকে এই যে পুরুষের জন্ম হয়েছে, ইনি 'জ্বর' নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হবেন। আপনার এই তেজ-অংশ একীভূত থাকলে সমস্ত পৃথিবী একত্র হলেও তা ধারণ করতে সমর্থ হবে না ; তাই আমার অনুরোধ, একে আপনি বহুভাগে বিভক্ত করুন।

আমার আবেদনে মহাদেব পরম প্রীত হয়ে সেই 'জ্বর'কে বহু ভাগে বিভক্ত করলেন। তাঁর যজ্ঞভাগও নির্ধারিত হল। দক্ষ মনে মনে প্রাণ, অপান বায়ু নিরোধ করে ভগবান শংকরের শরণাপন্ন হলেন। শংকর শরণাপন্ন দক্ষের প্রতি প্রসন্ন হলেন। দক্ষ অঞ্জলিবদ্ধ করে ভীতভাবে শংকরকে বললেন–আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, আমি যদি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র হই, তাহলে আমি দীর্ঘকাল ধরে অতি যত্নে যে রাশি রাশি ভোজন সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলাম, যা আপনার অনুচরেরা নষ্ট করেছে, তা যেন আপনার অনুগ্রহে ব্যর্থ না হয়। প্রসন্ন মহাদেব বললেন 'তাই হোক'। দক্ষ প্রজাপতি তখন এক হাজার আট নাম উচ্চারণ করে মহাদেবকে স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন।

–'দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় : চল্লিশ

দক্ষ প্রজাপতি প্রণত হয়ে দেবাদিদেবের স্তব করতে শুরু করলেন–তোমার সহস্র চোখ রয়েছে আবার তিনটি চোখও রয়েছে ; কুবেরের তুমি প্রিয়। সমস্ত দিকেই তোমার হাত-পা রয়েছে, সমস্ত দিকেই রয়েছে তোমার চোখ, মাথা, মুখ এবং কান। এ পৃথিবীতে তুমি সমস্ত কিছু ব্যেপে বিরাজ করছ। তুমি শংকুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ, শতকর্ণ ; তোমায় আমি নমস্কার করি। তোমার শত উদর রয়েছে, শত জিহ্বা রয়েছে ; তুমি সনাতন। বেদগায়কগণ তোমারই গান করেন, সূর্যের উপাসকেরা তোমারই উপাসনা করে থাকেন। তুমি দেব ও দানবদের রক্ষক, তুমি ব্রহ্মা ; তুমি শতক্রতু। তুমি মূর্তিমান, মহামূর্তি ও জলনিধি। গোরুরা যেমন গোষ্ঠে বাস করে, তেমনি তোমাতেই সমস্ত দেবতা রয়েছে অধিষ্ঠিত। তোমার দেহে আমি সোম, অগ্নি, বরুণ, আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ক্রিয়া, করণ, কার্য, কর্তা, কারণ, অসৎ, সৎ, সদসৎ, প্রভব ও অব্যয়–সবাইকেই দেখছি। তুমি ভব, শর্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, অন্ধকনাশন, ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ ত্রিশূলী, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র, ত্রিপুরঘ্ন ; তোমায় আমি বার বার নমস্কার করি। তুমি চণ্ড,

মুণ্ড, বিশ্ব চণ্ডধর, দণ্ডী, শংকুকর্ণ, দণ্ডিদণ্ড, অর্ধদণ্ডিকেশ, শুষ্ক, বিকৃত, বিলোহিত, ধূম্র, নীলগ্রীব, অপ্রতিরূপ, বিরূপ, শিব, সূর্য, সূর্যপতি, সূর্যধ্বজপতাকী, প্রমথনাশন, বৃষস্কন্ধ, হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যকৃত-চূড়, হিরণ্যপতি, শত্রুঘাত, চণ্ড, পর্ণসংঘশয়, স্তুত, স্তুতি, স্তূয়মান, সর্ব, সর্বভক্ষ, সর্বভূতাত্মরাত্মা, হোম, মন্ত্র, শুক্লধ্বজপতাকী, নম্য, অনম্য ও কিলকিলা, তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি শয়মান শয়িত, উত্থিত, স্থিত, ধাবমান, কুব্জ, কুটিল, নর্তনশীল, মুখবাদ্যকারী, বাধাপহ, লুব্ধ, গীতবাদ্যকারী, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলপ্রমথন, উগ্র ও দশবাহু, তোমাকে বারবার নমস্কার জানাই। তুমি কপালহস্ত, শুভ্রভস্মপ্রিয়, বিভীষণ, ভীম, ভীষ্ম, ব্রতধর, নানাবিকৃতবক্ত্র, খড়্গজিহ্ব, তীক্ষ্ন দাঁত রয়েছে তোমার। তুমি পক্ষ, মাস, লব, তুম্বীবীণাপ্রিয়, অঘোর, ঘোররূপ, ঘোরাঘোরতর, শিব, শান্ত, শান্ততম, বুদ্ধ, শুদ্ধ, সম্বিভাগপ্রিয়, পবন, পতঙ্গ, সাংখ্যপর, চণ্ডৈকঘণ্ট, ঘণ্টাজল্প, ঘণ্টী, সহস্রশতঘণ্ট, ঘণ্টামালাপ্রিয়, বাণদণ্ড, নিত্য, লোহিত, হুহুংকার, রুদ্র, ভগাকারপ্রিয়, অপারবান, গিরিবৃক্ষপ্রিয়, যজ্ঞাধিপতি, ভূত, প্রস্তুত, যজ্ঞবাদ, দান্ত, তপ্য, ভগ, তট, তটা, তটিনীপতি, অন্নদ, অন্নপতি, অন্নভুজ, সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রোদ্ধত-শূল, সহস্রনয়ন, বালার্কবর্ণ, বালরূপধর, বালার্করূপ, কালক্রীড়নক, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ক্ষোভণ, ক্ষয়, তরঙ্গাঙ্কিতকেশ, মুক্তকেশ, ষটকর্মনিষ্ঠ, ত্রিকর্মনিয়ত, বর্ণাশ্রমসমূহের পৃথক পৃথক ধর্মপ্রবর্তক, শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, কলকল, শ্বেতপিঙ্গল নেত্র, কৃষ্ণরক্তেক্ষণ, ধর্ম কাম, অর্থ ও মোক্ষ, ক্রথ, ক্রথন, সাংখ্য, সাংখ্যমুখ্য, যোগাধিপতি, রথ্য, অধিরথ্য, চতুষ্পথ ও পথ; তোমাকে নমস্কার করি।

কৃষ্ণাজিন তোমার উত্তরীয়, তুমি ব্যালযজ্ঞোপবীতী, ঈশান, রুদ্র, সংঘাত, হরিকেশ, ত্র্যম্বক, অম্বিকানাথ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, কাল, কামদ, কামঘ্ন দুষ্টবিনাশক, সর্ব, সর্বগর্হিতঘ্ন ও সদ্যোজাত তোমায় বারবার নমস্কার করি। তুমি উন্মাদন শতাবর্ত, গঙ্গাজলে তোমার চুল ভিজে যায়, তুমি মাথায় অর্ধচন্দ্র ধারণ কর, তুমি মেঘাবর্ত, অন্নদানকর্তা, অন্নদানপ্রভু, অন্নভোক্তা, গোপ্তা, প্রলয়ানল; তুমি যোনিজাত, অণ্ডজাত, ঘাম থেকে তোমার জন্ম এবং উদ্ভিদ থেকে তুমি জন্মগ্রহণ কর; তোমায় বারংবার নমস্কার জানাই। তুমি দেবাদিদেব, চরাচরের স্রষ্টা, ও পালক। তুমিই ব্রহ্মা, বিশ্বেশ, ব্রহ্ম, সকলের পরমযোনি, সুধাংশু ও জ্যোতির্নিধি। ব্রহ্মবাদীরা তোমাকেই ঋক, সাম ও ওংকার নামে অভিহিত করেন; সুরশ্রেষ্ঠগণ ও সামগায়ী ব্রহ্মবিদগণ 'হায়ি হায়ি, হরে হায়ি, হুব, হাব' ইত্যাদি মন্ত্রে তোমারই নাম বারংবার গান করে থাকেন। কল্পশাস্ত্র এবং উপনিষৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞেরা তোমাকে যজুর্ময়, ঋংময়, সাম ও অথর্বময় নামে অভিহিত করে থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—চার আশ্রমের তুমিই আশ্রমী। তুমি বিদ্যুৎ, তুমি স্তনিত এবং তুমিই সম্বৎসর। ঋতু, মাস, পক্ষ, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, নক্ষত্র ও যুগ তুমিই। তুমিই বৃষসমূহের ককুদ, পর্বতসমূহের শিখর, মৃগসমূহের সিংহ, তক্ষক ও অনন্ত প্রভৃতি সর্পসমূহের পতি, সাগরসমূহের মধ্যে ক্ষীরোদ সমুদ্র এবং মন্ত্রের মধ্যে প্রণব বা ওংকার।

তুমি অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ব্রতসমূহের মধ্যে সত্য। তুমি ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ, মোহ, শম, ক্ষমা, ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম, ক্রোধ, জয় ও অজয়। তুমিই গদা, তীর, ধনুক, খট্বাঙ্গ, মুগুর প্রভৃতি ধারণ করে থাক। তুমি ছেদন কর, বিদীর্ণ কর, প্রহার কর; তুমিই নেতা এবং মন্তা। তুমি ইন্দ্র, সমুদ্র, সরিৎ, পুষ্করিণী, সরোবর লতা, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগ, পক্ষী এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্মের আরম্ভ। কাল অনুযায়ী তুমি পুষ্প প্রদান

কর। তুমি আদি, অন্ত, মধ্য গায়ত্রী, ওঙ্কার, সবুজ, লাল, কালো, নীল, পীত, অরুণ, কদ্রু, কপিল, বভ্রু, কপোত, মৎসাক। তোমার বীর্য সোনার মতো; তুমিই সুবর্ণ, সুবর্ণনামা, সুবর্ণপ্রিয়, যম, বরুণ, ধনদানকারী, অনল, উৎফুল্ল, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, ভানু, হোত্র, হোতা, হোম্য, হুত, প্রভু, ত্রিসৌপর্ণ, যজুর্বেদের শতরুদ্রিয়, পবিত্রসমূহের পবিত্র ও মঙ্গলসমূহের মঙ্গল। তুমি প্রাণ, রজ, তম ও সত্ত্বযুক্ত, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও জৃম্ভা। তুমি লোহিতাঙ্গ, দংষ্ট্রী, মহাবক্ত্র, মহোদর, শুচিরোমা তোমার প্রিয় হল গান বাজনা। তুমি মৎস্য, জাল, জল; তোমাকে জয় করা যায় না। তুমি জলব্যাল, কুটীচর, বিকাল, সুকাল, দুষ্কাল, কালনাশন, মৃত্যু, অক্ষয়, অন্ত, ক্ষমাকর, মায়াকর, সম্বর্ত, বর্তক, সম্বর্তক, বলাহক, ঘন্টাকী, ঘন্টকী, ঘন্টী, চূড়াল, লবণসমুদ্র, ব্রহ্মা, কালাগ্নিবক্ত্র, মুণ্ড, ত্রিদণ্ডধৃক, চতুর্যুগ, চার বেদ, চার হোতা, চতুষ্পথ, চতুরাশ্রমের নেতা, চতুর্বর্ণকর, ক্ষর, অক্ষর, প্রিয়, ধূর্ত, গণ, গণ্য, গণাধিপ, রক্তমাল্যাম্বরধর, গিরীশ, গিরিজাপ্রিয়, শিল্পীশ, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, সর্বশিল্পিপ্রবর্তক, ভগনেত্রান্তক, চণ্ড, স্বাহা, স্বধা, বষটকার, নমস্কার, গূঢ়ব্রত, গূঢ়, গূঢ়ব্রতনিষেবিত, তরুণ ও তারণ। তুমি ধাতা, বিধাতা, সংধাতা, নিধাতা, ধরণ, ধর, তপস্যা, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অকৌটিল্য, ভূতাত্মা, ভূতকৃৎ, ভূত, ভব্য, উদ্ভব, ভূ, ভূব, স্বর, স্বরিত, অগ্নি, ব্রহ্মাবর্ত, সুরাবর্ত, কামাবর্ত, কামবিম্বহন্তা, কর্ণিকারমালাপ্রিয়, গোনেতা, গোপ্রচার, গোবৃষেশ্বরবাহন, ত্রৈলোক্যগোপ্তা, গোবিন্দ, গোপ্তা, গোবর্গ, অখণ্ডচন্দ্রাভিমুখ, সুমুখ, দুর্মুখ, অমুখ, চতুর্মুখ, বহুমুখ, সদারণাভিমুখ, হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, অর্থপতি, বিরাট অধর্মহা, মহাদক্ষ, দণ্ডধর, স্থিত, রণপ্রিয়, স্থির, স্থাণু, নিষ্কম্প, সুনিশ্চল, দুর্বারণ, দুর্বিষহ, দুঃসহ, দুরতিক্রম, দুদ্ধর্ষ, দুর্বশ, নিত্য, দুদর্প, বিজয়, জয়, শশ, শশংকনয়ন, শীতোষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, আধি, ব্যাধি, ব্যাধিহা, ব্যাধিপ, সহ্য, যজ্ঞমৃগব্যাধ, ব্যাধিনাম, কারোৎকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকাবলোকন, চক্রদণ্ড, রৌদ্রভাগবিনাশন, বিষপ, অমৃতপ, সুরাপ, ক্ষীরসোমপ, মধুপ, আপপ, সর্বপ, বলাবল, বৃষাঙ্গরাম্ভ, বৃষভ, বৃষভলোচন, লোকবিখ্যাত।

সূর্য ও চন্দ্র তোমার দুচোখ, পিতামহ ব্রহ্মা তোমার হৃদয়, অগ্নিষ্টোম তোমার দেহ। ব্রহ্মা, গোবিন্দ এবং পুরাণ—ঋষিরা কেউই তোমার মাহাত্ম্য যথাযথরূপে জানেন না। তোমার যে সব সূক্ষ্ম শিবমূর্তি, তা আমার দৃষ্টিগোচর হোক। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তুমি তেমনি ওই সব মূর্তি দিয়ে আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমার রক্ষণীয়; তুমি আমায় রক্ষা কর। তোমায় নমস্কার করি। আমি তোমার ভক্ত। যিনি সমুদ্রসলিলে অবস্থান করেন, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। নিদ্রাজয়ী, শ্বাসজয়ী, সমদর্শী, সত্ত্বগুণ অবলম্বনকারী সাধুরা যোগরত হয়ে যে জ্যোতিঃপদার্থকে অবলোকন করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার করি। যিনি যুগান্তকালে সমস্ত প্রাণীকে ভক্ষণ করে জলের মধ্যে শয়ন করেন, সেই জলশায়ী পুরুষের শরণাপন্ন হলাম। যিনি পূর্ণিমায় রাহুর মুখে প্রবেশ করে চাঁদকে এবং অমাবস্যায় স্বর্ভানু হয়ে সূর্যকে গ্রাস করেন, যিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে বিরাজ করেন, তাঁরা আমায় প্রতিনিয়ত রক্ষা করুন। যাঁর জন্য প্রাণীরা জন্মমাত্রই রোদন, হর্ষ, ও বিষাদ ভোগ করে, তাঁকে আমার নমস্কার জানাই। তোমার যে অংশ সমুদ্রে, নদীতে, পর্বতে, পর্বতগুহায়, বৃক্ষমূলে, গোষ্ঠে, গহনকান্তারে, চতুষ্পথে, রথ্যায়, চত্বরে, সভায়, হস্তী ও অশ্বসমূহে, রথশালায়, জীর্ণ উদ্যানালয়ে,

পঞ্চভূতে, দিগন্তে, ইন্দ্রে, সূর্যে, চাঁদে ও সূর্যের কিরণে এবং রসাতলে অনুস্যূত হয়ে আছে, সেই অংশকে আমি বারংবার নমস্কার করি। তুমি সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা, এজন্যই তোমায় আমি আলাদাভাবে নিমন্ত্রণ করি নি। ত্রিলোকবাসী সবাই তোমাকে যজ্ঞে অর্চনা করে থাকে। তুমিই সকলের কর্তা। তোমার সূক্ষ্ম মায়ায় আমি মোহিত হয়েছিলাম, তাই তোমায় আমি নিমন্ত্রণ করি নি। তুমি আমার গতি, আমার প্রতিষ্ঠা তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই, এ কথা জানি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

দক্ষের স্তবে প্রীত হয়ে শংকর তাঁকে বললেন—সুব্রত, তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। বেশি আর কি বলব, আমার লোকেই তোমার গতি হবে। শোন দক্ষ, তোমার যজ্ঞ ধ্বংস হয়েছে বলে তুমি দুঃখ কোরো না। আমার বরে তুমি সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করবে। তুমি ছয় অঙ্গের সঙ্গে বেদ, সাংখ্য ও যোগ অধ্যয়ন কর। আমি বারো বছর ধরে বিপুল তপস্যা করে যে গূঢ়, অনিন্দিত, বর্ণাশ্রমের অবিরোধী, সর্বপাপহর ও শুভ 'পাশুপত ব্রত' আবিষ্কার করেছি, তার যথাযথ অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, তুমি সেই ফল লাভ কর। তারপর অনুচরদের সঙ্গে শিব সেখান থেকে চলে গেলেন। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য সৃষ্ট সেই 'জ্বর'কে শিব বহু ভাগে বিভক্ত করলেন। এর মধ্যে নাগদের জ্বর শিখার উত্তাপ, পর্বতের শিলাজতু, জলের জ্বর নীলিকা, সর্পসমূহের জ্বর খোলস, সুরভিদ্রব্য সমূহের খোরক, পৃথিবীতলে উখর, কুকুরের জ্বর দৃষ্টির প্রতিরোধ, ঘোড়ার রন্ধ্রগত, ময়ূরদের শিখার জন্ম, কোকিলদের জ্বর নেত্ররাগ, সাধুব্যক্তিদের জ্বর দ্বেষ, শুকদের হিক্কিকা এবং বাঘেদের জ্বর পরিশ্রম। মানুষদের মধ্যে এর পরিচিতি 'জ্বর' নামেই। জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু—সব সময়ই ঐ জ্বর মানুষের গায়ে থাকে। যে সুসমাহিত চিত্তে জ্বরের উৎপত্তির এই কথা শোনে সে রোগবিমুক্ত হয়ে সমস্ত কামনা লাভ করে থাকে।

যে ব্যক্তি দক্ষকৃত এই শিবস্তব পাঠ করে বা শোনে, তার কোন অমঙ্গল হয় না। সে দীর্ঘায়ু হয়। যেমন সমস্ত দেবতার মধ্যে শিবই বরণীয়তম, তেমনি সমস্ত স্তবের মধ্যে এই স্তোত্রই শ্রেষ্ঠ। যারা যশ, স্বর্গ, ঐশ্বর্য, বিত্ত ও বিদ্যা পেতে চায়, তারা ভক্তিভরে এই স্তোত্র পাঠ করবে। ব্যাধি পীড়িত হোক, দুঃখিত হোক কিংবা ভীত হোক—সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করে থাকে এই স্তোত্র পাঠ করলে। এই স্তবপাঠক ব্যক্তি গণেশ্বর মহাদেবের কাছ থেকে সুখলাভ করে; গাণপত্য লাভ করতেও পারে। যে বাড়িতে এই স্তোত্র পাঠ করা হয়, সেখানে যক্ষ, পিশাচ ও নাগেরা কোন রকম বিঘ্নই ঘটাতে পারে না। যে নারী ভক্তিভরে এই স্তব শোনে, সে স্বামীর কাছে সমাদৃত হয়ে থাকে। যিনি এই স্তব আগাগোড়া পড়েন, তাঁর সব কাজই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সংযত হয়ে এবং নিয়ম পালন করে গুহ ও নন্দীশ্বরের সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবকে বলি প্রদান করে পরে এই স্তব পাঠ করতে হয়। এ রকম করলে মানুষের সব অভীষ্টই লভ্য হয় এবং মৃত্যুর পর সস্ত্রীক স্বর্গে যেতে পারা যায়। এই স্তোত্র পাঠ করলে পাপী ব্যক্তিও পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং মৃত্যুর পর গণদের সাযুজ্য লাভ করে। যিনি এই স্তব পাঠ করেন, তিনি বৃষযুক্ত বিমানে বিরাজ করেন এবং কল্পান্ত পর্যন্ত রুদ্রের অনুচর হয়ে থাকেন।

একমাত্র ব্যাসদেবই এ কথা জানতেন। তিনিই তা মুনিদের বলেছিলেন। এই স্তোত্র পাঠ করলে সবাই রুদ্রলোকে যেতে পারে।

—স্বয়ম্ভু ঋষি সংবাদে 'দক্ষস্তব নিরূপণ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ একচল্লিশ

নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের লোমহর্ষণ বললেন—ব্যাসদেবের কাছ থেকে পার্বতীর ক্রোধ, শংকরের রোষ, বীরভদ্রের উৎপত্তি, ভদ্রকালীর জন্ম, দক্ষযজ্ঞের বিনাশ, শংকরের বীর্যবত্তা, রুদ্রের যজ্ঞভাগ লাভ ও দক্ষের যজ্ঞের ফললাভ—এ সব কথা শুনে মুনিরা প্রীত এবং বিস্মিতও হলেন। তাঁরা এ বিষয়ে আরো কিছু শোনবার জন্য ব্যাসদেবকে পুনরায় অনুরোধ জানালেন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস তাঁদের একাম্রক্ষেত্রের বিবরণ পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন।

ব্রহ্মার কথা শুনে সেই ঋষিরা পরম সন্তোষ লাভ করলেন। তাঁরা ব্রহ্মার কাছ থেকে একাম্রক্ষেত্রের বিবরণ শুনতে চাইলেন। ব্রহ্মা তখন ঋষিদের বললেন—সেই ক্ষেত্র পৃথিবীতে যত পাপ, তা বিনাশ করে। সেই সর্বপাপহর পরমক্ষেত্রের কথা সংক্ষেপে বলছি। ব্রহ্মার কাছ থেকে যেভাবে সে-কথা শুনেছি সে ভাবেই আমি আপনাদের বলব।

একাম্র নামক বিখ্যাত ক্ষেত্র অষ্টতীর্থে সমন্বিত। বারাণসীর মতো এই তীর্থক্ষেত্র অতি পবিত্র। ওই ক্ষেত্রে আগে একটি আম গাছ ছিল। তারই নাম অনুসারে ওই তীর্থ-ক্ষেত্রের এ রকম নাম হয়। এখানে সুখী মানুষেরা বাস করে। বিম্বান মানুষেরা এই তীর্থক্ষেত্রে বাস করেন। ধন এবং ধান্যে এই ক্ষেত্র সমৃদ্ধ। বড় বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি রয়েছে এখানে। সে-সব বাড়ি নানা মণি-রত্নে সুশোভিত। সুদৃঢ় প্রাকারে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে এই স্থান। নগরের চারদিকে রয়েছে গভীর পরিখা--যাতে সহজে শত্রু আক্রমণ করতে না পারে। বড় বড় বাড়ির উপরে রয়েছে বিভিন্ন রঙের পতাকা। এখানে উৎসব ও আনন্দ লেগেই রয়েছে। ওই নগরের প্রাসাদোপম বাড়িতে নানান বাজনার বিচিত্র ধ্বনি শোনা যায়—কোথাও বীণা, কোথাও বাঁশী, কোথাও মৃদঙ্গ। ওই স্থানের রমণীরা দেখতে সুন্দর ; তাদের কটিদেশ ক্ষীণ এবং দেহসৌষ্ঠব কমনীয়। তারা আনন্দে সব সময় নানা ক্রীড়ায় যেতে থাকে। ঐ নারীদের গলায় রয়েছে সুদৃশ্য হার। তাদের চোখ পদ্মপাতার মতো টানা, স্তন স্ফীত, মুখ পূর্ণচাঁদের মতো, কেশদাম স্থির, পায়ে রয়েছে নূপুর, তাদের উরু সুন্দর এবং স্ফীত,—চোখ কান পর্যন্ত টানা। তাদের পরনে রয়েছে সূক্ষ্ম বসন, গায়ে রয়েছে নানা অলঙ্কার। এদের মধ্যে কারো কারো গায়ের রঙ সাদা, কারোর সোনার মতো, কেউ কেউ রাজহাঁসের মতো গতিশীল, কেউ কেউ আবার স্তনভারে একটু নত। এদের মুখে সব সময় হাসি লেগেই রয়েছে। এদের মধ্যে কারুর কারুর দাঁত মুক্তোর মতো, কারুর গলার স্বর মধুর, কারুর বা ঠোঁট পান খাওয়ার ফলে রাঙা হয়ে আছে। এরা সবাই বিদুষী, দেখতে সুন্দর, ঐশ্বর্যশালিনী এবং এদের যৌবন কখনো অস্তমিত হয় না। অপ্সরার মতো ওই যৌবনবতীরা সর্বদাই নানা ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে আছে। তাছাড়া সেখানে রূপবান এবং মণি ও কুণ্ডলধারণ-ধারী অনেক তরুণ দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা সেখানে নিজের নিজের ধর্মে নিরত থাকে। ঘৃতাচী, প্রম্লোচা তিলোত্তমা, ঊর্বশী, বিপ্রচিত্তি, বিশ্বাচী এবং মেনকার মতো বারবনিতারা এখানে বাস করে। এদের মুখে সর্বদা হাসি লেগে রয়েছে, কলাকৌশলে এরা নিপুণ, নাচ-গানে দক্ষ। এরা কিন্তু কেউই কু-চরিত্রের নয়, অন্যের প্রতি এরা হিংসা পোষণ করে না। মানুষ এদের কটাক্ষেই মোহপ্রাপ্ত হয়। সেই স্থানে কেউই দরিদ্র, মূর্খ, হিংসুক, রোগী, মায়াবী বা দুর্বৃত্ত নেই। সেই ক্ষেত্রের নানা জায়গায় কর্ণিকার,

কাঠাল, চাঁপা, নাগকেশর, পাটল, অশোক, বকুল, কয়েৎবেল, আম, ধব, নিম, কদম, খদির ও বিভিন্ন ফুলন্ত লতা রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে শাল, তাল, তমাল, নারকেল, শোভাঞ্জন, অর্জুন, সপর্ণ, কোবিদার, পিপুল, লকুচ, সরল, লোধ্র, হেঁতাল, দেবদারু, পলাশ, মুচুকুন্দ, পারিজাত, কুব্জক, কলা, জাম, পূগ কেতকী, করবী, অতিমুক্ত, কিংশুক, মন্দার, কুন্দ এবং অন্যান্য গাছ-গাছড়ায় সে-স্থান পরিপূর্ণ হয়ে আছে। নন্দনবনের মতো কত উদ্যান রয়েছে সেখানে, সে সব উদ্যানে গাছে গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে। চক্রবাক, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, কলবিঙ্ক, ময়ূর, প্রিয়পুত্র, শুক, জীবঞ্জীবক, হারীত, চাতক প্রভৃতি বিভিন্ন পাখি মধুর স্বরে কূজন করে। সেখানকার জলাশয়সমূহ পদ্মফুলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। ওই সরোবরে মধুর লোভে এবং খেলা করার জন্য কাদাখোঁচা, চক্রবাক, জলমোরগ, কারণ্ডব ও বিভিন্ন রকম হাঁস সেখানে সর্বদাই বিচরণ করছে। সেই একাম্রক্ষেত্রে মুক্তিদাতা শিব সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য অবস্থান করেন। পৃথিবীতে যত পুণ্যতীর্থ আছে এবং যত নদ, নদী, সরোবর, পুষ্করিণী, কূপ ও সাগর আছে, ভগবান শঙ্কর ঋষিদের সঙ্গে সে সব থেকে পৃথক পৃথক ভাবে বিন্দু বিন্দু জল আহরণ করে লোককল্যাণের জন্য একটি তীর্থ নির্মাণ করেছেন। সেই তীর্থের নাম বিন্দুসর। অঘ্রাণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বা বিষুব সংক্রান্তিতে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়ে যথাবিধি বিন্দুসর তীর্থে যায় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে সেখানে স্নান করে এবং দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ এবং মানুষদের তিলোদকের দ্বারা নাম, গোত্র উল্লেখ করে তর্পণ করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণের সময়, ষড়শীতি সংক্রান্তিতে, কোন যাগ-যজ্ঞ বা অন্য কোন পুণ্যতিথি উপলক্ষে সেখানে ব্রাহ্মণদের ধন দান করলে অন্যান্য তীর্থের চেয়ে শতগুণ ফল লাভ করা যায়। এই বিন্দুসরের তীরে যারা পিতৃলোককে পিণ্ড দান করে, তাদের পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন। তারপর জিতেন্দ্রিয় ও মৌনী হয়ে, শিবের মন্দিরে গিয়ে শিবলিঙ্গকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, ঘি ও ক্ষীর দিয়ে লিঙ্গকে স্নান করাবে; তারপর তার পূজা করবে। চন্দন, কুংকুম প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য, নানা রকম ফুল, প্রচুর বেলপাতা, অর্কপাতা ও আমলকী দিয়ে আগমকথিত মন্ত্রে শিবের পূজা করতে হয়। যারা দীক্ষিত নয়, তারা শুধু শিবের নাম উচ্চারণ করে পূজা করবে। এভাবে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য সহকারে পূজা করে, পরে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে এবং গান, বাজনা ও স্তব পাঠ করে 'জয়' শব্দের উচ্চারণ করবে ও লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করবে। এভাবে শিবের পূজা করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়; যৌবন অটুট থাকে এবং সমস্ত অলংকারে অলংকৃত হয়ে সোনার বিমানে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের স্তুতিগান শুনতে শুনতে শিবলোকে যাওয়া যায়। সেখানে পুণ্যক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত শিবপূজক বাস করে এবং পুণ্যক্ষয় প্রাপ্ত হলে পুনরায় পৃথিবীতে এসে বেদবিদ্ যোগিদের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে এবং তারপর পাশুপত যোগ প্রাপ্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করে। যারা শোয়ার সময়, ঘুম থেকে ওঠার সময়, সংক্রান্তিতে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে অশোকাষ্টমীতে, ও পবিত্র দিনে শিবের দর্শন লাভ করে তারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে চেপে শিবলোকে পৌঁছায়।

যারা কেবলমাত্র সেই দেবাদিদেবকে দর্শন করে, তারাও শিবলোকে পৌঁছায়। সেই শিবক্ষেত্রের পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে আড়াই যোজন পরিমিত স্থানে ও যে কাজ করা হয়, তা মুক্তির নিমিত্ত হয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে 'ভাস্করেশ্বর' নামে এক

শিবলিঙ্গ আছে। পুরাকালে সূর্য তার পূজো করেছিলেন। যারা সেখানকার কুণ্ডে স্নান করে দেবাদিদেবকে দর্শন করে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং উত্তম বিমানে আরোহণ করে বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করে এবং শেষে শিবলোকে উপনীত হয়। পুণ্যক্ষয়ের পর তারা পৃথিবীতে উচ্চবংশে এসে জন্মগ্রহণ করে অথবা যোগীদের বংশে জন্মগ্রহণ করে বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী, জনকল্যাণকামী ব্রাহ্মণ রূপে শাস্ত্রানুমোদিত কাজ করে। শেষে শান্তযোগে মোক্ষ লাভ করে। সেই পবিত্র ক্ষেত্রের যেখানে যত শিবলিঙ্গ আছে, সুসমাহিত চিত্তে সেই লিঙ্গকে স্নান করিয়ে গন্ধ, ধূপে প্রভৃতির দ্বারা তার পূজো করবে। এভাবে লিঙ্গের পূজো করলে শিবলোকে গতি হয়। মেয়েরাও শ্রদ্ধাসহকারে পূজো করলে ওই সমস্ত ফল লাভ করে থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একমাত্র দেবাদিদেব শংকর ছাড়া সেই একাম্রক্ষেত্রের গুণ কেউ বর্ণনা করতে পারে না। শ্রদ্ধা কিংবা অশ্রদ্ধায় হোক, পুরুষ কিংবা নারী যদি সেই পুণ্যক্ষেত্রে গিয়ে যে কোন তিথিতে বিন্দুসরের জলে স্নান করে বিরূপাক্ষ, বরদা দেবী, শিবা, চণ্ডগণ, কার্তিকেয়, গণেশ, বৃষভ, কল্পতরু ও সাবিত্রীকে দর্শন করে, তাহলে তাদের শিবলোকে গতি হয়। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়ে সেখানে স্তম্ভ আরোহণ করে, সে একুশ কুল উদ্ধার করে শিবলোকে উপনীত হতে পারে। এই একাম্রক শিবক্ষেত্র বারাণসীর মতো পবিত্র। যে ব্যক্তি সেখানে স্নান করে, তার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—স্বয়ম্ভু ঋষি সংবাদে 'একাম্রক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ বিয়াল্লিশ

একাম্রক্ষেত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলে চললেন—বিরজক্ষেত্রে বিরজা নামে জগন্মাতা ব্রহ্মাণী প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁকে দর্শন করলেই মানুষ নিজের সাতকুল পর্যন্ত পবিত্র করে থাকে। তাঁকে দর্শন করে পূজো করলে ব্রহ্মলোকে গতিলাভ হয়। ওই বিরজক্ষেত্রে আরো অনেক লোকমাতা রয়েছেন। তাঁরা সবাই পাপ নাশন করেন বর দান করেন এবং তাঁরা ভক্তবৎসলও বটে। সেখানে বৈতরণী নামে এক সর্বপাপহারিণী নদী আছে, ওই নদীতে স্নান করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। সেখানে বরাহমূর্তিধারী হরি বিরাজ করেন ; ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলে বিষ্ণুধামে যাওয়া যায়। বিরজক্ষেত্রের মধ্যে গোগ্রহ, সোম, অলাবু, মৃত্যুঞ্জয়, ক্রোড়, বাসুক ও সিদ্ধেশ্বর নামে আরো আটটি তীর্থ রয়েছে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ওই তীর্থসমূহে গিয়ে স্নান করলে এবং সেখানকার দেবতাদের প্রণাম করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং পরিণামে বিমানে আরোহণ করে ব্রহ্মলোকে এসে বিহার করতে পারে। বিরজ নামক ক্ষেত্রে যে পিণ্ড দান করে, সে পিতৃদের অক্ষয় তৃপ্তি উৎপাদন করতে পারে। এখানে যারা দেহত্যাগ করে, তাদের মোক্ষলাভ ঘটে। যে ব্যক্তি সাগরে স্নান করে প্রথমে কপিলদেবকে দর্শন করে এবং পরে বারাহী দেবীকে দর্শন করে, তার স্বর্গে গতি হয়ে থাকে। সেই বিরজ ক্ষেত্রে আরো অনেক পুণ্য তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে।

সমুদ্রের উত্তরে এক পাপহর ও মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র আছে, সেখানকার সমস্ত স্থানই বালুকাময়। ওই ক্ষেত্র পবিত্র ও সমস্ত কামনার পরিপূরক। এর বিস্তার প্রায় দশ যোজন। ওই ক্ষেত্রের চারদিকে রয়েছে অশোক, অর্জুন, পুন্নাগ, বকুল, সরল, কাঁঠাল,

নারকেল, শাল, তাল, কয়েতবেল, চাঁপা, কর্ণিকার, আম, বেল, পাটল, কদম, কোবিদার, নাগকেশর আমলকী, লোধ্র, খদির, ভূর্জ, তমাল, দেবদারু, মন্দার, পারিজাত, অগুরু, চন্দন, পলাশ, অশ্বত্থ, মুচুকুন্দ, সপ্তপর্ণ, বিভীতক প্রভৃতি সমস্ত ঋতুজাত গাছ। ওই সব গাছে বিভিন্ন পাখি বিচিত্র রকম শব্দ করে ওই স্থানকে মুখরিত করে রাখে। পদ্মফুলে পরিপূর্ণ অনেক জলাশয় রয়েছে সেখানে। পদ্ম ছাড়াও বিভিন্ন ফুল ফুটে রয়েছে ওই সরোবরগুলিতে। সারস, জলমোরগ, ডাহুক, বিভিন্ন রকমের হাঁস প্রভৃতি জলচর পাখিরা ওই জলাশয়গুলোয় ঘুরে বেড়ায়। চারবর্ণের মানুষ রয়েছে সেখানে, এবং তাদের মধ্যে আশ্রম-ব্যবস্থা প্রচলিত। বিদ্বান ব্যক্তিদের বাস রয়েছে সেখানে। ওই ক্ষেত্র সমস্ত ধর্ম এবং সমস্ত গুণের আকরস্থান। সেই ক্ষেত্রে বিখ্যাত পুরুষোত্তম রয়েছেন। দিগ-বিভাগ অনুসারে যত দূরে পর্যন্ত উৎকল দেশের সীমা নির্দিষ্ট, তত দূরে পর্যন্তই সমস্ত স্থান পবিত্র। জগদ্ব্যাপী জগন্নাথ সেইখানেই অবস্থান করে রয়েছেন। আমি, রুদ্র, ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ দেবতারা সবাই সেখানে বাস করি। গন্ধর্ব, অপ্সরা, পিতৃগণ, দেবতা ও মানুষেরা, যক্ষেরা, বিদ্যাধরেরা, সিদ্ধেরা, মুনিরা, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিরা, কশ্যপ প্রভৃতি প্রজাপতিরা, কিন্নরেরা, নাগেরা, অন্যান্য স্বর্গবাসীরা, অঙ্গসহ চার বেদ, বিভিন্ন শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ, যজ্ঞসমূহ, বিবিধ পবিত্র নদীসমূহ, নানা তীর্থ ও আয়তন, সাগরসমূহ এবং পর্বতসমূহ—সবই সেখানে রয়েছে। এই ক্ষেত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান হিসেবে বিবেচিত। এই দেশে স্বয়ং মুক্তিপ্রদাতা পুরুষোত্তম অবস্থান করেন। যারা উৎকলদেশে বাস করে, তারা জগতে ধন্য। এখানকার প্রধান তীর্থ জলে স্নান করে যারা পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, তারা স্বর্গে গমন করে। যাঁর নয়ন আয়ত, ভ্রূ সুন্দর, যিনি কেশ ও মুকুটে সুশোভিত, যাঁর হাসি সুন্দর, কপোল ও ললাট সুন্দর, সেই শ্রীকৃষ্ণকে যারা প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয়ে দর্শন করে, তারা ধন্য।

—'উৎকলক্ষেত্রবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ তেতাল্লিশ

সত্যযুগে ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী, যজ্ঞকারী, শুচি, দক্ষ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, রূপবান, সৌভাগ্যশালী, বীর, দাতা, ভোক্তা, প্রিয়ভাষী, সমস্ত বেদে পারদর্শী, পূর্ণচন্দ্রের মতো পুরুষ ও নারীদের নয়নরঞ্জক, সূর্যের মতো তেজস্বী, শত্রুর ভয়ঙ্কর, বিষ্ণুর ভক্ত, ক্রোধজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের অধ্যয়নকারী, ধর্মতৎপর ও মুমুক্ষু বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রজাপালনে তিনি সদাই তৎপর। একবার হরির আরাধনার জন্য তাঁর চিত্ত খুব ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে মনে তিনি ভাবলেন,—আমি কিভাবে কোন্ ক্ষেত্রে, তীর্থে অথবা কোন্ নদীর তীরে বা আশ্রমে বিষ্ণুকে আরাধনা করব? এ রকম চিন্তা করে তিনি মনে মনে সমস্ত পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত তীর্থক্ষেত্র ও পুর, নগর প্রভৃতি দেখলেন। সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করার পর তিনি মুক্তিদায়ক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকেই বিষ্ণু আরাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে ঠিক করলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে সেই প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন এবং প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করে যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। পরে সেখানে এক উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে তার মধ্যে বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে স্থাপন

করলেন। পরে যথাবিধি পঞ্চতীর্থ প্রতিষ্ঠা করে স্নান, দান, তপস্যা, হোম ও দেবদর্শন করতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিনই যথাবিধি পুরুষোত্তমের আরাধনা করতেন এবং এভাবে আরাধনা করার পর শেষে তিনি মোক্ষলাভ করেন। সেখানে মার্কণ্ডেয়, কৃষ্ণ ও বলরাম আছেন; তাছাড়া রয়েছে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নামে সাগর। সেই সাগরে স্নান করলে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়।

মুনিরা ব্রহ্মাকে থামিয়ে দিয়ে তাঁকে জিগ্যেস করলেন—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কি কারণে সেই মুক্তিপ্রদ পরমক্ষেত্র পুরুষোত্তম ধামে গিয়েছিলেন? তিনি সেখানে গিয়ে কিভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, কিভাবে পুরুষোত্তম দেবের পূজা করলেন, কিভাবেই বা ওই প্রাসাদ নির্মাণ করে সেখানে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি স্থাপন করলেন? —এ সমস্ত ঘটনা দয়া করে আমাদের বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা বললেন—আপনারা যে ভোগ ও মোক্ষপ্রদ পৌরাণিক পুণ্য বৃত্তান্ত শুনতে চেয়েছেন, সেজন্য আপনাদের আমি সাধুবাদ জানাই। আমি সেই সত্যযুগের কথা যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে আপনাদের শোনাতে চেষ্টা করব। মালবদেশে অবন্তী নামে এক পৃথিবী বিখ্যাত নগরী আছে। সেই অবন্তী ছিল রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন সমস্ত পৃথিবীরই অধীশ্বর। তাঁর রাজধানী অবন্তী ছিল সমৃদ্ধময়ী নগরী। এই নগরীর চারদিক পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সেখানে নানা দেশের নানান বণিক সম্প্রদায় রাশি রাশি দ্রব্যসম্ভার নিয়ে বাণিজ্য করতে আসত। নানান পথ ও নানান সুসজ্জিত দোকান রয়েছে সেখানে। রাজহাঁসের মতো সাদা ও চিত্র বিচিত্র অসংখ্য প্রাসাদ সেই নগরীর শোভা বর্ধন করে। রাজার হাতী, ঘোড়া ও সৈন্যসামন্তের কোন অভাব ছিল না। প্রায়ই সেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত। আনন্দের অবিচ্ছিন্ন ধারা নিত্যই সেখানে প্রবহমান। বহু বিদ্বান ব্যক্তির বাস সেখানে। সেখানকার জনগণ সর্বদাই আনন্দিত মনে কাল কাটায়। পুরুষেরা সবাই সুন্দর বেশ ধারণ করে, সবাই রূপবান, গুণবান, অলঙ্কার পরিহিত। তারা সমস্ত শাস্ত্রবিদ এবং সমস্ত সম্পদ তারা ভোগ করে। সেখানকার মেয়েরা খুবই সুন্দর। তাদের চলার ভঙ্গি হাঁস ও হাতীর চলাকে অনুকরণ করে। তাদের চোখ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো, কটিদেশ সুন্দর, স্তন স্ফীত ও উন্নত, তাদের ঠোঁট পাকা ডালিম ফলের মতো, মুখে লেগে রয়েছে পানের দাগ। সমস্ত গায়ে রয়েছে বিবিধ অলঙ্কার। তাদের নূপুরধ্বনি সুমিষ্ট সঙ্গীতের সৃষ্টি করে। তারা এমন সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করে যে, তার সুবাসে চারদিক আমোদিত থাকে। তারা প্রিয়দর্শন, রূপ ও লাবণ্য তাদের সারা অঙ্গে; হাসি লেগে রয়েছে তাদের মুখে সর্বদাই। তারা বিভিন্ন ক্রীড়ায় সর্বদাই নিরত থাকে। তারা সভায় বা মুক্ত প্রাঙ্গণে গান, বাজনা ও মধুর আলাপে সবার প্রীতি উৎপাদন করে। সেখানকার বারবনিতারা নাচে, গানে ও অন্যান্য সুকুমার কলায় দক্ষ, ও আলাপে সুনিপুণ। এ ছাড়া সেখানকার যে কুলবধূরা রয়েছে তারা পতিব্রতা। সেখানে কত যে নানা কুসুম-শোভিত পবিত্র দেবালয়, পবিত্র বন ও উপবন এবং মনোরম উদ্যান রয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। সেখানে নেই এমন গাছ বা লতা-গুল্ম নেই। ফুলের গাছে সব সময় ফুল ফুটে রয়েছে আর ফলের গাছ ফলভারে আনত হয়ে রয়েছে। সেই পুষ্প-ফল-সুশোভিত উদ্যানে চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গার, প্রিয়পুত্র, চড়ুই, ময়ূর, শুক, কোকিল, কপোত ও অন্যান্য অনেক পাখি মধুর শব্দে কূজন করে। অসংখ্য জলাশয় রয়েছে সেখানে; সেই জলাশয়সমূহে পদ্ম, কুমুদ

নারকেল, শাল, তাল, কয়েতবেল, চাঁপা, কর্ণিকার, আম, বেল, পাটল, কদম, কোবিদার, নাগকেশর আমলকী, লোধ্র, খদির, ভূর্জ, তমাল, দেবদারু, মন্দার, পারিজাত, অগুরু, চন্দন, পলাশ, অশ্বত্থ, মুচুকুন্দ, সপ্তপর্ণ, বিভীতক প্রভৃতি সমস্ত ঋতুজাত গাছ। ওই সব গাছে বিভিন্ন পাখি বিচিত্র রকম শব্দ করে ওই স্থানকে মুখরিত করে রাখে। পদ্মফুলে পরিপূর্ণ অনেক জলাশয় রয়েছে সেখানে। পদ্ম ছাড়াও বিভিন্ন ফুল ফুটে রয়েছে ওই সরোবরগুলিতে। সারস, জলমোরগ, ডাহুক, বিভিন্ন রকমের হাঁস প্রভৃতি জলচর পাখিরা ওই জলাশয়গুলোয় ঘুরে বেড়ায়। চারবর্ণের মানুষ রয়েছে সেখানে, এবং তাদের মধ্যে আশ্রম-ব্যবস্থা প্রচলিত। বিদ্বান ব্যক্তিদের বাস রয়েছে সেখানে। ওই ক্ষেত্র সমস্ত ধর্ম এবং সমস্ত গুণের আকরস্থান। সেই ক্ষেত্রে বিখ্যাত পুরুষোত্তম রয়েছেন। দিগ-বিভাগ অনুসারে যত দূর পর্যন্ত উৎকল দেশের সীমা নির্দিষ্ট, তত দূর পর্যন্তই সমস্ত স্থান পবিত্র। জগদ্ব্যাপী জগন্নাথ সেইখানেই অবস্থান করে রয়েছেন। আমি, রুদ্র, ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ দেবতারা সবাই সেখানে বাস করি। গন্ধর্ব, অপ্সরা, পিতৃগণ, দেবতা ও মানুষেরা, যক্ষেরা, বিদ্যাধরেরা, সিদ্ধেরা, মুনিরা, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিরা, কশ্যপ প্রভৃতি প্রজাপতিরা, কিন্নরেরা, নাগেরা, অন্যান্য স্বর্গবাসীরা, অঙ্গসহ চার বেদ, বিভিন্ন শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ, যজ্ঞসমূহ, বিবিধ পবিত্র নদীসমূহ, নানা তীর্থ ও আয়তন, সাগরসমূহ এবং পর্বতসমূহ—সবই সেখানে রয়েছে। এই ক্ষেত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান হিসেবে বিবেচিত। এই দেশে স্বয়ং মুক্তিপ্রদাতা পুরুষোত্তম অবস্থান করেন। যারা উৎকলদেশে বাস করে, তারা জগতে ধন্য। এখানকার প্রধান তীর্থ জলে স্নান করে যারা পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, তারা স্বর্গে গমন করে। যাঁর নয়ন আয়ত, ভ্রূ সুন্দর, যিনি কেশ ও মুকুটে সুশোভিত, যাঁর হাসি সুন্দর, কপোল ও ললাট সুন্দর, সেই শ্রীকৃষ্ণকে যারা প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয়ে দর্শন করে, তারা ধন্য।

—'উৎকলক্ষেত্রবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় : তেতাল্লিশ

সত্যযুগে ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী, যজ্ঞকারী, শুচি, দক্ষ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, রূপবান, সৌভাগ্যশালী, বীর, দাতা, ভোক্তা, প্রিয়ভাষী, সমস্ত বেদে পারদর্শী, পূর্ণচন্দ্রের মতো পুরুষ ও নারীদের নয়নরঞ্জক, সূর্যের মতো তেজস্বী, শত্রুর ভয়ংকর, বিষ্ণুর ভক্ত, ক্রোধজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের অধ্যয়নকারী, ধর্মতৎপর ও মুমুক্ষু বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রজাপালনে তিনি সদাই তৎপর। একবার হরির আরাধনার জন্য তাঁর চিত্ত খুব ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে মনে তিনি ভাবলেন,—আমি কিভাবে কোন্ ক্ষেত্রে, তীর্থে অথবা কোন্ নদীর তীরে বা আশ্রমে বিষ্ণুকে আরাধনা করব? এ রকম চিন্তা করে তিনি মনে মনে সমস্ত পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত তীর্থক্ষেত্র ও পুর, নগর প্রভৃতি দেখলেন। সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করার পর তিনি মুক্তিদায়ক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকেই বিষ্ণু আরাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে ঠিক করলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে সেই প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন এবং প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করে যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। পরে সেখানে এক উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে তার মধ্যে বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে স্থাপন

করলেন। পরে যথাবিধি পঞ্চতীর্থ প্রতিষ্ঠা করে স্নান, দান, তপস্যা, হোম ও দেবদর্শন করতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিনই যথাবিধি পুরুষোত্তমের আরাধনা করতেন এবং এভাবে আরাধনা করার পর শেষে তিনি মোক্ষলাভ করেন। সেখানে মার্কণ্ডেয়, কৃষ্ণ ও বলরাম আছেন ; তাছাড়া রয়েছে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নামে সাগর। সেই সাগরে স্নান করলে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়।

মুনিরা ব্রহ্মাকে থামিয়ে দিয়ে তাঁকে জিগ্যেস করলেন—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কি কারণে সেই মুক্তিপ্রদ পরমক্ষেত্র পুরুষোত্তম ধামে গিয়েছিলেন ? তিনি সেখানে গিয়ে কিভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, কিভাবে পুরুষোত্তম দেবের পুজা করলেন, কিভাবেই বা ওই প্রাসাদ নির্মাণ করে সেখানে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি স্থাপন করলেন ? —এ সমস্ত ঘটনা দয়া করে আমাদের বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা বললেন—আপনারা যে ভোগ ও মোক্ষপ্রদ পৌরাণিক পুণ্য বৃত্তান্ত শুনতে চেয়েছেন, সেজন্য আপনাদের আমি সাধুবাদ জানাই। আমি সেই সত্যযুগের কথা যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে আপনাদের শোনাতে চেষ্টা করব। মালবদেশে অবন্তী নামে এক পৃথিবী বিখ্যাত নগরী আছে। সেই অবন্তী ছিল রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন সমস্ত পৃথিবীরই অধীশ্বর। তাঁর রাজধানী অবন্তী ছিল সমৃদ্ধময়ী নগরী।. এই নগরীর চারদিক পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সেখানে নানা দেশের নানান বণিক সম্প্রদায় রাশি রাশি দ্রব্যসম্ভার নিয়ে বাণিজ্য করতে আসত। নানান পথ ও নানান সুসজ্জিত দোকান রয়েছে সেখানে। রাজহাঁসের মতো সাদা ও চিত্র বিচিত্র অসংখ্য প্রাসাদ সেই নগরীর শোভা বর্ধন করে। রাজার হাতী, ঘোড়া ও সৈন্যসামন্তের কোন অভাব ছিল না। প্রায়ই সেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত। আনন্দের অবিচ্ছিন্ন ধারা নিত্যই সেখানে প্রবহমান। বহু বিদ্বান ব্যক্তির বাস সেখানে। সেখানকার জনগণ সর্বদাই আনন্দিত মনে কাল কাটায়। পুরুষেরা সবাই সুন্দর বেশ ধারণ করে, সবাই রূপবান, গুণবান, অলংকার পরিহিত। তারা সমস্ত শাস্ত্রবিদ এবং সমস্ত সম্পদ তারা ভোগ করে। সেখানকার মেয়েরা খুবই সুন্দর। তাদের চলার ভঙ্গি হাঁস ও হাতীর চলাকে অনুকরণ করে। তাদের চোখ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো, কটিদেশ সুন্দর, স্তন স্ফীত ও উন্নত, তাদের ঠোঁট পাকা ডালিম ফলের মতো, মুখে লেগে রয়েছে পানের দাগ। সমস্ত গায়ে রয়েছে বিবিধ অলংকার। তাদের নূপুরধ্বনি সুমিষ্ট সঙ্গীতের সৃষ্টি করে। তারা এমন সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করে যে, তার সুবাসে চারদিক আমোদিত থাকে। তারা প্রিয়দর্শন, রূপ ও লাবণ্য তাদের সারা অঙ্গে ; হাসি লেগে রয়েছে তাদের মুখে সর্বদাই। তারা বিভিন্ন ক্রীড়ায় সর্বদাই নিরত থাকে। তারা সভায় বা মুক্ত প্রাঙ্গণে গান, বাজনা ও মধুর আলাপে সবার প্রীতি উৎপাদন করে। সেখানকার বারবনিতারা নাচে, গানে ও অন্যান্য সুকুমার কলায় দক্ষ, ও আলাপে সুনিপুণ। এ ছাড়া সেখানকার যে কুলবধূরা রয়েছে তারা পতিব্রতা। সেখানে কত যে নানা কুসুম-শোভিত পবিত্র দেবালয়, পবিত্র বন ও উপবন এবং মনোরম উদ্যান রয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। সেখানে নেই এমন গাছ বা লতা-গুল্ম নেই। ফুলের গাছে সব সময় ফুল ফুটে রয়েছে আর ফলের গাছ ফলভারে আনত হয়ে রয়েছে। সেই পুষ্প-ফল-সুশোভিত উদ্যানে চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গার, প্রিয়পুত্র, চড়ুই, ময়ূর, শুক, কোকিল, কপোত ও অন্যান্য অনেক পাখি মধুর শব্দে কূজন করে। অসংখ্য জলাশয় রয়েছে সেখানে ; সেই জলাশয়সমূহে পদ্ম, কুমুদ

প্রভৃতি নানা ফুল রয়েছে ফুটে। ওই জলাশয়সমূহ হাঁস, সারস প্রভৃতি জলচর প্রাণি-সমূহে পরিপূর্ণ।

সেই নগরীতে 'মহাকাল' নামে ভগবান শিব বিরাজ করেন। সেখানকার পাপহর শিবকুণ্ডে যথাবিধি স্নান করে যদি কেউ দেবতা, ঋষি ও পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ নিবেদন করে, তবে তারা শিবের অনুগ্রহ লাভ করে। স্নান করার পর ওই মন্দিরে ঢুকে তিনবার শিবলিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করতে হয়; তারপর ফুল, গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য উপহার, গান, বাজনা, প্রণাম সহকারে যথাবিধি 'মহাকাল' নামক ওই শিবকে পূজা করলে হাজারটা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ওই শিব-পূজকের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। সে সমস্ত কামনা প্রদানকারী দিব্য বিমানে আরোহণ করে শিবলোকে গমন করে এবং সেখানে প্রলয়কাল পর্যন্ত উত্তম দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে। পুণ্যক্ষয় হলে সে শিবলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এসে কোন পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে। তারপর যথাকালে বেদ অধ্যয়ন করে পাশুপত যোগ অবলম্বন করে এবং শেষে মোক্ষ লাভ করে। সেই অবন্তী নগরীর কাছ দিয়ে পবিত্র শিপ্রা নদী বয়ে চলেছে। মানুষ যদি ওর নদীতে স্নান করে যথাবিধি পিতৃ ও দেবতাগণকে তর্পণ দান করে, তাহলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিমানে আরোহণ করে স্বর্গে যায় এবং উত্তম দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে। সেখানে 'গোবিন্দস্বামী' নামে মুক্তিদায়ক ভগবান বিষ্ণু বিরাজমান। তাঁকে দর্শন করলেই মানুষ একুশ পুরুষের সঙ্গে মোক্ষ লাভ করে এবং সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং সেখানে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করে। তারপর পুণ্যক্ষয়ে কালক্রমে পৃথিবীতে এসে যোগিদের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে এবং শেষে বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করে মোক্ষ লাভ করে। সেখানে 'বিক্রমস্বামী' নামে বিষ্ণু বিরাজ করেন। তাঁকে দর্শন করলেই মানুষ পূর্বোক্ত ফল লাভ করে। সেখানে ইন্দ্রপ্রমুখ অন্যান্য দেবতারা ও সমস্ত কামনার ফলদায়ক মাতৃগণ অবস্থিত। তাঁদেরকে যথাবিধি দর্শন করলে এবং তাঁদের পূজা করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। সর্বদাই উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা সেই রম্য নগরী ইন্দ্রের অমরাবতীর সঙ্গেই তুলনীয়। সেখানে চওড়া রাজপথ রয়েছে, পৃথিবী বিখ্যাত বীরেরা রয়েছে। সেখানে সিদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেদের সর্বদাই সমাগম ঘটে, বহু বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তি সেই অবন্তী নগরীকে অলংকৃত করেন। অবন্তী নগরীতে সর্বদাই বেদধ্বনি শোনা যায়। ইতিহাস, পুরাণ ও কাব্যালাপ কথা সর্বদাই সেই নগরীর পথে পথে, জনসমাগম স্থানে শোনা যায়।

—স্বয়ম্ভূঋষি সংবাদে 'অবন্তিকাবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ চুয়াল্লিশ

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই অবন্তী নগরীতে থেকে নিজের পুত্রের মতো প্রজাশাসন করতেন। তিনি সত্যবাদী, প্রাজ্ঞ, বীর, ধার্মিক, শস্ত্রনিপুণ, শীলবান। তিনি তেজে আদিত্য, রূপে অশ্বিনীকুমার, বুদ্ধিবত্তায় বৃহস্পতি, পরাক্রমে ইন্দ্র এবং সুলক্ষণে শরৎচন্দ্রের মতো বিরাজ করতেন। তিনি অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু যজ্ঞ করেছিলেন। কি দানে, কি যজ্ঞানুষ্ঠানে, কি তপস্যায় তাঁর সমকক্ষ কোন রাজাই পৃথিবীতে ছিলেন না। প্রত্যেক যজ্ঞেই তিনি

ব্রাহ্মণদের সোনা, মণি, মুক্তো প্রভৃতি দান করতেন। এই সমৃদ্ধ রাজা সুখেই রাজ্যশাসন করতেন। হরির আরাধনার জন্য তাঁর মন একবার ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি তখন সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত তন্ত্র, বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, সমগ্র ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করে সযত্নে গুরু ও বেদবিদ ব্রাহ্মণদের যথোচিত সৎকার করলেন। বাসুদেবকেই পরম তত্ত্ব বলে জেনে তিনি সৈন্য সামন্ত সহ তাঁর পূজার জন্য রাজধানী উজ্জয়িনী থেকে যাত্রা করলেন। বিমানের মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন রথে চড়ে বীরবৃন্দ তাঁর সামনে চলতে লাগল। বায়ুর মতো বেগবান ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যরা প্রাস, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে চলল। অসংখ্য গজারোহী সৈন্য উত্তম হাতীর পিঠে চড়ে তাঁর অনুগমন করল। ধনুক, প্রাস ও তরবারি হাতে নিয়ে অসংখ্য শক্তিশালী পদাতিক সৈন্য বয়সে যারা তরুণ, ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে চলল। অন্তঃপুরের সুন্দরী রমণীরাও চলল রাজার সঙ্গে। তাদের গায়ে বিভিন্ন অলংকার শোভা পাচ্ছিল, পরিধানে ছিল সূক্ষ্ম বসন, ঠোঁটে লেগেছিল পানের দাগ। দৃষ্টির আনন্দদায়ক সেই নারীদের বেষ্টন করে চলেছিল বলবান পুরুষেরা, তাদের হাতে ছিল বেত। তাছাড়াও রাজ্যের আপামর জনসাধারণ যেমন বণিক সম্প্রদায়, অস্ত্র-বিক্রেতা, পান বিক্রয়কারী, ঘাস বিক্রেতা, কাঠ ব্যবসায়ী, অভিনেতা ও অন্যান্য কলা-কুশলীবৃন্দ, মাংস ব্যবসায়ী, তেল ও কাপড় ব্যবসায়ী, ফুল ব্যবসায়ী, বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়ী, ধোপা, গোয়ালা, নাপিত, মেষপালক, ছাগপালক, হংসপালক, ধান ব্যবসায়ী, গুড় ব্যবসায়ী, লবণ ব্যবসায়ী, গায়ক, নর্তক, মঙ্গলপাঠক, পুরাণ পণ্ডিত, কথক, কবি, কাব্য-কোবিদগণ, বিষনাশক ব্যক্তিগণ, রত্নপরীক্ষক, তামার নির্মাতা, কাঁসার নির্মাতা, কাঠুরিয়া, চিত্রকর, কুমোর, অস্ত্রনির্মাতা, মদ ব্যবসায়ী, মল্লেরা, কায়স্থেরা, অন্যান্য কর্মচারিরা, তন্তুবায়গণ, রূপকার, বার্তিক, শস্য কর্তন করে যারা বেঁচে থাকে তারা, মৃগ ও পাখি ব্যবসায়ী, হস্তিবৈদ্য, চিকিৎসক, বৃক্ষ-চিকিৎসক, গো-চিকিৎসক প্রভৃতি রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলল। এভাবে অনেক দিন চলার পর তাঁরা দক্ষিণ সমুদ্রের তীরদেশে পেঁছিলেন। দেখলেন যে, চঞ্চল তরঙ্গমালায় পরিবৃত হয়ে সমুদ্র যেন নৃত্য করছে। সমুদ্র নানা রত্নের আধার এবং বিভিন্ন জলজন্তুতে সমাকীর্ণ। ওই সমুদ্রে রয়েছে অসংখ্য মৎস্য, কূর্ম, শঙ্খ, শুক্তি, কুমীর, শুশুক ও বিষধর সাপ। ওই সমুদ্রে হরি শয়ন করেন, সমস্ত পাপ নাশ করে, পবিত্র, গম্ভীর, দেবযোনি ও সমস্ত তীর্থের মধ্যে উত্তম তীর্থস্থান। চন্দ্রের বৃদ্ধি ও হ্রাস অনুসারে এর পরিমাণ নির্দিষ্ট। ওই সমুদ্র দেবতাদের অমৃতময় বাসস্থান স্বরূপ। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এ রকম লবণ সমুদ্র দেখে বিস্মিত হলেন এবং সেখানকার বেলাভূমিতে পেঁছে সেখানে বাস করতে লাগলেন। তারপর ওই সমুদ্রের কাছাকাছি একটা জায়গা তিনি দেখলেন যা তিনি তাঁদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। ওই স্থানের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে দশ যোজন এবং প্রস্থে পাঁচ যোজন। সমস্ত রকম ফল ও ফুলের গাছ রয়েছে ওই স্থানে। ওই গাছগুলোয় নানা রকম ফুল এবং ঋতুজাত নানা রকম ফল সব সময়ই দেখা যায়। নানা দেশের নানা পাখি আসে ওই ফল ও ফুলের লোভে। সেখানকার নানা স্থানে বাস করে বিদ্যাধর, সিদ্ধ, চারণ, অপ্সরা, কিন্নর, মুনি প্রভৃতিরা। সেখানকার বনভূমিতে যেমন হিংস্র শ্বাপদ জন্তু-জানোয়ার রয়েছে, তেমনি বহু বিচিত্র ও সুন্দর প্রাণিসমূহও রয়েছে। সেখানকার জলাশয়সমূহ পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে এবং ওই প্রফুল্ল জলাশয়সমূহে হাঁস, সারস, ডাহুক প্রভৃতি

জলচর পাখিরা খেলা করে। তিনি সেই পরম দুর্লভ স্থান দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হলেন।

—'ক্ষেত্রদর্শন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ পঁয়তাল্লিশ

ব্রহ্মাকে তাঁর কথা বলার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে মুনিরা জিগ্যেস করলেন আচ্ছা, আমরা আপনার কাছ থেকে আগেই শুনেছি যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেখানে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের প্রশ্ন হল তাহলে এর আগে সেই পবিত্র বৈষ্ণব ক্ষেত্র পুরুষোত্তমে কি কোন বৈষ্ণবী প্রতিমা ছিল না? আমাদের এ বিষয়ে সংশয় জন্মেছে, আপনি দয়া করে সেই সংশয় দূর করুন।

ব্রহ্মা মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—আপনাদের সংশয় দূর করার চেষ্টা করছি আমি। সেই পবিত্র প্রাচীন কথা আপনারা শুনুন। পুরাকালে লক্ষ্মী হরিকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, তা আমি সংক্ষেপে বলছি। সুমেরু পর্বতের সোনার মতো উজ্জ্বল শৃঙ্গে সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মুনি, কশ্যপ প্রভৃতি প্রজাপতিরা ও বালখিল্য প্রভৃতি মুনিরা সর্বদাই আনন্দে বাস করেন। সেখানে সমস্ত ঋতুজাত অজস্র ফুলের সমারোহ দেখা যায়। নানা মধুরকণ্ঠ পাখিরা সেখানে সর্বদাই কূজন করে। পুংস্কোকিলদের মধুর কূজনে এবং ময়ূরদের কেকারবে মুখরিত হয়ে আছে সেই স্থান। দেবদুর্লভ সেই সুমেরু শৃঙ্গে এক সময় জগৎপতি, অব্যয় পুরুষ ভগবান বাসুদেব অবস্থিত ছিলেন। তখন লক্ষ্মী বিষ্ণুকে প্রণাম করে তাঁকে জিগ্যেস করলেন—আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, আপনি তা দূর করুন। এই দুর্লভ কর্মক্ষেত্র মর্ত্যলোক লোভ, মোহ ও কাম, ক্রোধ প্রভৃতি জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ হয়ে মহাসমুদ্রের মতো প্রতিভাত হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হল, এই সংসারসমুদ্র থেকে কি ভাবে মানুষেরা মুক্ত হবে? আপনি ছাড়া এ সংশয় আর কে দূর করতে পারবে। তাই বলছি, দয়া করে আমার সংশয় দূর করুন।

লক্ষ্মীর প্রশ্নে মৃদু হেসে বিষ্ণু তাঁকে বললেন—এই মর্ত্যভূমিতে যত তীর্থ আছে, তার মধ্যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই মুখ্যরূপে উপাস্য, মনোরম এবং সৎফলের জনক বলে বিখ্যাত। সেই পরম ক্ষেত্রের নাম উচ্চারণ করলেও পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। দেবতা, দানব, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিরাও এই তীর্থের কথা জানেন না। এই শ্রেষ্ঠ তীর্থের কথা তোমার কাছে আমি গোপনে বলছি। পুরাকালে কল্পকাল উপস্থিত হলে সমগ্র বিশ্ব চরাচর ধ্বংস হয়ে গেল। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরগণ পর্যন্ত সবাই নষ্ট হয়ে গেল। সমগ্র পৃথিবীতে নেমে এলো গাঢ় অন্ধকার। তখন একমাত্র পরমাত্মস্বরূপ ভগবান হরিই জাগ্রত এবং জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন যোগনিদ্রায় মগ্ন; তাঁর ঘুম ভাঙার পর তিনি তাঁর নাভিপদ্মে অব্যয় ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এভাবে সৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে পঞ্চভূতময় সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হলেন। স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম—এই চার প্রকার প্রাণীবৃন্দ তিনি সৃষ্টি করলেন। ক্রমে পিতামহ ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি মুনিদের, সমস্ত দেবতা, দানব, পিতৃগণ, যক্ষ, বিদ্যাধর প্রভৃতি স্বর্গীয় অধিবাসীদের, গঙ্গা প্রভৃতি নদীদের, মানুষ, বানর, সিংহ, বিভিন্ন পাখিদের, যোনিজাত, অণ্ডজাত; ঘাম থেকে ও উদ্ভিদ থেকে জাত প্রাণীদের, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য নীচ জাতের

আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি করলেন। ঘাস, লতাপাতা থেকে পিঁপড়ে পর্যন্ত সমস্ত কিছুই সেই পিতামহ সৃষ্টি করলেন। পরে ব্রহ্মা আত্মাকে চিন্তা করে তাঁর দক্ষিণ অঙ্গে পুরুষ ও বাম অঙ্গে নারী—এই দুই রকম প্রাণীর কল্পনা করলেন। তারপর থেকেই উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীর প্রাণীরা পৃথিবীতে নারীপুরুষের জৈবিক মিলন থেকে উৎপন্ন হতে লাগল। তারপর পিতামহ ব্রহ্মা ধ্যান অবলম্বনে বাসুদেব মূর্তিকে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর চিন্তার ফলশ্রুতি হিসেবে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী ভগাবান বিষ্ণু ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলে পর ব্রহ্মা তাঁকে পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়ে বন্দনা করতে লাগলেন। আমি তখন কমলযোনি ব্রহ্মাকে জিগ্যেস করলাম—আমাকে ধ্যান করার কারণ কি? আমার প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—যজ্ঞ, দান, ব্রত, যোগ, সত্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা ও বিবিধ তীর্থ দর্শন—এ সমস্তকেই স্বর্গলাভের পথ বলে মনে করা হয়, এ আমি জানি। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান কি আছে যেখানে গেলে এ সমস্তের অনুষ্ঠান না করেও স্বর্গলাভ করা যায়? যদি তেমন কোন ক্ষেত্র পৃথিবীতে থাকে, দয়া করে আমাকে তা বলুন।

ব্রহ্মার কথা শুনে আমি তাঁকে এ কথাই বললাম যে, পৃথিবীতে যা দুর্লভ ও নির্মল, যা সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধন্য, পুণ্য, গোব্রাহ্মণের মঙ্গলজনক, চার বর্ণের সুখবর্ধক, মোক্ষদায়ক ও পবিত্র সে-রকম ক্ষেত্র পৃথিবীতেই আছে; তারই কথা বলছি শুনুন। পূর্বে সমস্ত লোকে বিখ্যাত একটি শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল; দেবতা, দানব, ঋষি ব্রহ্মচারী, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী এবং সমগ্র জগতের মধ্যে এই ক্ষেত্র পুরুষের মতো আবির্ভূত; তাই ওই ক্ষেত্র 'পুরুষোত্তম' নামে প্রখ্যাত। দক্ষিণ সাগরের তীরে যেখানে বটগাছ রয়েছে, সেখানে দশ যোজন বিস্তৃত পরম দুর্লভ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র অবস্থিত। ওই ক্ষেত্রের গাছগুলো প্রলয়কালের প্রচণ্ড উল্কাপাতেও নষ্ট হয় না। আমি নিজেই সেখানে বাস করে থাকি। সেই বটগাছকে দর্শন করলে এবং তার ছায়ায় বারবার বসলে অন্যান্য পাপের কথা কি, ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। যারা ওই গাছকে প্রদক্ষিণ করে ও নমস্কার করে তারা সবাই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে যায়। ওই বটগাছের উত্তরে ও বিষ্ণুলোকের খানিক দক্ষিণে পুরুষোত্তম প্রাসাদ বিরাজমান। সেই প্রাসাদ ধর্মের আশ্রয়স্থল। তার মধ্যে স্বয়ং দেবতা কর্তৃক নির্মিত প্রতিমা আছে, সেই প্রতিমাকে দর্শন করলে লোকেরা অনায়াসেই বিষ্ণুলোকে যেতে পারে। একবার ধর্মরাজ যম লোকদের বিষ্ণুলোকে আসতে দেখে আমাকে প্রণাম করে আমার স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন—তুমি ক্ষীরোদবাসী, বর, বরেণ্য, বরদ, কর্তা, বিশ্বেশ্বর, অজ, সর্বজ্ঞ, অপরাজিত পুণ্ডরীকাক্ষ, নির্গুণ, অব্যয়, পুরাণপুরুষ, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, সনাতন, জগদগুরু, অচল সর্বব্যাপী, ঈশ্বর জগন্নাথ ও প্রভু; আপনাকে আমি প্রণাম করি।

ধর্মরাজকে জোড়হাতে স্তব করতে দেখে আমি জিগ্যেস করলাম—আপনি কিসের জন্য আমাকে স্তব করছেন? আপনি তো সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং ভগবান সূর্যের পুত্র। আপনার প্রার্থনীয় কি-ই বা আর থাকতে পারে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে যম বললেন—আপনি তো সবই জানেন; আপনার অজানা কিছুই নেই। তবু যখন জিগ্যেস করছেন, তখন বলছি। এই পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমস্ত কামনা প্রদানকারী ইন্দ্রনীলমণির মতো উজ্জ্বল যে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা রয়েছে, শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সঙ্গে তাকে দর্শন করলে মানুষেরা 'শ্বেত' নামক ভবনে গমন করে থাকে। তারা আর আমার লোকে আসছে না; সেজন্য আমি আমার পদের উপযোগী কাজ করতে

পারছি না। তাই আমার প্রার্থনা, এই প্রতিমাটিকে আপনি এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যান।

যমের কথা শুনে তাকে বললাম—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ওই প্রতিমাটিকে আমি বালি দিয়ে ঢেকে রাখব। তারপর সেই প্রতিমাটিকে আমি যাতে স্বর্গকামী লোকেরা না দেখতে পায়, সেভাবে গোপন করে রাখলাম।

ব্রহ্মা মুনিদের বলে চললেন—এ সমস্ত কথা আমি ভগবান বিষ্ণুর কাছ থেকে শুনেছি। সেই ইন্দ্রনীলমণির মতো উজ্জ্বল প্রতিমা লোকের দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় যে সব ঘটনা ওই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ঘটেছিল, ভগবান বিষ্ণু সে-সব কথাই লক্ষ্মীকে বলেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীকে যে সব কাহিনী বলেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে—ইন্দ্রদ্যুম্নের ক্ষেত্র-দর্শন, প্রাসাদ নির্মাণ, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, স্বপ্ন দেখা, লবণ সাগরের তীরে কাঠ দেখা, শিল্পীশ্রেষ্ঠ বাসুদেবের দর্শন, প্রতিমা নির্মাণ, মার্কণ্ডেয় চরিত, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন,, সুভদ্রার মাহাত্ম্য, নরসিংহ দর্শন, শ্বেতমাধবীয় মাহাত্ম্য, স্বর্গদ্বার দর্শন, সমুদ্র দর্শন, সমুদ্রে স্নান, তর্পণ, ইন্দ্রদ্যুম্নের মাহাত্ম্য, পঞ্চতীর্থের ফল, কৃষ্ণ ও বলরামের পর্বযাত্রা ফল ও বিষ্ণুলোকের বর্ণনা।

—'পূর্ববৃত্তানুবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ ছেচল্লিশ

মুনিরা ব্রহ্মাকে অনুরোধ জানালেন—আমরা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা আরো শুনতে চাই। সেই ক্ষেত্রে গিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন আর কি কি করেছিলেন, দয়া করে সে-কথা আমাদের বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা তাঁদের ইন্দ্রদ্যুম্নের ক্ষেত্রদর্শন কথা সংক্ষেপে বলতে আরম্ভ করলেন—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে রমণীয় স্থান ও নদীসমূহ দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে সেখানে বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন 'মহানদী' নামক নদী বয়ে চলেছে সাগরের দিকে। সেই নদী পবিত্র এবং খরস্রোতা। এর অন্য নাম চিত্রোপলা। দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে ওই নদী পতিত হয়েছে। ওই মহানদীর উভয় তীরে কত গ্রাম ও কত নগর দেখতে পাওয়া যায়। ওই গ্রাম এবং নগরসমূহ সমৃদ্ধ এবং জনাকীর্ণ। সেখানে চার বর্ণের লোকের বাস; তারা কখনো স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না। সেখানকার ব্রাহ্মণদের কথাই বেদবাক্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অগ্নিহোত্র-কর্মে নিরত, কেউ কেউ সমস্ত শাস্ত্রে নিপুণ, কেউ কেউ যাগশীল। সেখানকার রাজপথে, বনে, উপবনে, সভামণ্ডপে, প্রাসাদসমূহে এবং দেবালয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা পরস্পর মিলিত হয়ে ইতিহাস, পুরাণ অঙ্গসহ বেদ ও বিবিধ কাব্য-শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন। সেখানকার রমণীরা রূপবতী ও যৌবনবতী। তাদের আচার-আচরণ নম্র। তাদের রূপ ও গুণ দেবাঙ্গনাদেরও হার মানায়। শরৎকালের চাঁদের মতো তাদের মুখ, স্তন, স্ফীত ও উন্নত, গায়ে রয়েছে বিচিত্র অলংকার, চোখ তাদের টানা টানা। গলায় রয়েছে মালা এবং তাদের দেহ থেকে যেন বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়। বিভিন্ন রকম গান এবং বাজনায় তারা পটু এবং তার চর্চাতেই তারা কাল কাটায়। এ ছাড়াও সেখানে অনেক ভিক্ষুক, সিদ্ধ, স্নাতক, ব্রহ্মচারী ও মন্ত্রসিদ্ধ, তপসিদ্ধ ও অসংখ্য সাধুপুরুষ বিরাজ করেন।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এ রকম পরম শোভন ক্ষেত্র দেখে স্থির করলেন যে সেখানেই তিনি

ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করবেন। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে বিরাট বটগাছ রয়েছে, যার কথা আমরা আগেই বলেছি, তার কাছেই ভগবান বিষ্ণু ওই ইন্দ্রনীলমণির মতো উজ্জ্বল প্রতিমা গোপনে রেখেছিলেন। সেখানে আর কোন বৈষ্ণবী প্রতিমা দেখা যায় না। সেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, অধ্যয়ণ, উপবাস প্রভৃতির দ্বারা তদ্গত চিত্তে বিষ্ণুর ভবন নির্মাণ করতে সচেষ্ট হলেন।

—স্বয়ম্ভূঋষিসংবাদে 'ক্ষেত্রবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ সাতচল্লিশ

বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করতে প্রবৃত্ত হয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বহু শাস্ত্রজ্ঞ গণক আচার্যদের এনে, সযত্নে ভূমি শোধন করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও বাস্তুবিদ্যাবিশারদ অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে ওই স্থানের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। তারপর চন্দ্র-তারা-শুদ্ধ ও সুগ্রহের আনুকূল্যযুক্ত শুভ দিনে, শুভ মুহূর্তে জয় ও মঙ্গলধ্বনি উচ্চারণ করে, মনোরম বাজনা বাজিয়ে, বেদধ্বনি ও সুমধুর সঙ্গীত সহকারে পূর্ণকলস ও প্রদীপ স্থাপন করে, ফুল, খই, আলোচাল ও গন্ধদ্রব্যের দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্ঘ্য দান করলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যথাবিধি অর্ঘ্য দান করে কলিঙ্গ, উৎকল ও কোশলদেশের রাজাকে সেখানে এনে তাঁদের অনুরোধ করলেন—আপনারা অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে শীগগির প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ুন। শিলাকর্মনিপুণ শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে তার সানুদেশ বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করে উৎকৃষ্ট পাথর কেটে কেটে রথ ও নৌকায় করে এখানে পাঠাতে থাকুন, দেরি করবেন না। ইন্দ্রদ্যুম্ন তারপর তাঁর মন্ত্রী ও পুরোহিতদের ডেকে বললেন—পৃথিবীতে যেখানে যত রাজা আছেন, সবার কাছে দূত পাঠিয়ে এই মন্দির নির্মাণের কথা জানিয়ে দিন এবং তাঁদেরকে বলুন যে তাঁরা যেন নিজেদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমার এখানে এসে পৌঁছন। ইন্দ্রদ্যুম্নের বার্তা পেয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকনিবাসী রাজারা, প্রত্যন্তবাসী রাজারা, পর্বতবাসী ও দ্বীপবাসী রাজারা সবাই রথারোহী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে বহু ধনরত্ন নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁদের সমাগত দেখে ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন—শুনুন, আমি মনস্থ করেছি যে, এই ভোগ ও মোক্ষপ্রদ ক্ষেত্রে একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করব। দুটোই, বিশেষ করে, বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ কষ্টকর কাজ। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে আমার বিশ্বাস, আমি এ কাজ নিশ্চয়ই সম্পন্ন করতে পারব।

রাজার আবেদনে কাজ হল। সমবেত রাজন্যবৃন্দ নিজের নিজের সামর্থ মতো অসংখ্য ধনরত্ন, সোনা, মণিমুক্তো, উত্তম কাপড়-চোপড়, উৎকৃষ্ট শস্যসম্ভার, রাশি রাশি তণ্ডুল ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী দান করলেন। এই বিপুল যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তপস্বী, মহর্ষি, স্নাতক ; আচার্য, উপাধ্যায়, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ও উৎকৃষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দেখে তাঁর পুরোহিতদের বললেন—আপনারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। রাজার আদেশে পুরোহিতরা যজ্ঞকর্মে নিপুণ ব্রাহ্মণদের সামনে রেখে যজ্ঞস্থানে গেলেন এবং প্রতোলী ও বিটঙ্ক প্রভৃতি যজ্ঞকর্মের উপযোগী বস্তু নির্মাণ করে যথাবিধি যজ্ঞপথ তৈরি করলেন। সেখানে মণিরত্নখচিত অসংখ্য প্রাসাদ, স্তম্ভ ও বড় বড় তোরণ নির্মিত

হল। রাজপুরোহিত লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে সমস্ত যজ্ঞস্থলী খাঁটি সোনা দিয়ে নির্মাণ করলেন এবং নানান দেশের রাজাদের অন্তঃপুর ও নানা দেশবাসী ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের অনেক বাড়ি সেখানে তৈরি করে দিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্নের আয়োজিত সেই যজ্ঞে দেশ বিদেশ থেকে কত প্রধান প্রধান রাজা ও রমণীরা বিবিধ রত্ন নিয়ে এলেন। সেই মহাত্মারা নিজের নিজের শিবিরে প্রবেশ করার সময় গর্জনশীল সমুদ্রের মতো আকাশস্পর্শী সম্মান ধ্বনি শোনা গেল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজেই যথাযোগ্য স্থান, আসন, শয্যা ও উত্তম ভোজ্যসামগ্রী দিয়ে সমবেত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালেন। সেই মহাযজ্ঞে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা শিষ্যসহ এসেছিলেন। রাজা নিজেই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান পর্যন্ত তাঁদের পিছন পিছন গেলেন। তারপর শিল্পীরা তাঁদের কাজ শেষ হয়েছে বলে রাজাকে জানালেন। যজ্ঞ আরম্ভ হলে পর হেতু-বাদী বাগ্মীরা হেতুবাদ উত্থাপন করে বিচারকার্যে প্রবৃত্ত হলেন। সমবেত রাজন্যবৃন্দ যজ্ঞস্থ সমস্ত বস্তুকেই সোনার তৈরি বলে দেখতে পেলেন। দেখা গেল যে সোনার তৈরি যজ্ঞের যূপকাঠ মন্ত্র উচ্চারণ করে সেখানে পোঁতা হচ্ছে। স্থলভাগের এবং জলভাগের সমস্ত পশুকে সেখানে আনা হয়েছে। তাঁরা দেখলেন যে, নানা প্রাণী এমন কি পাখি পর্যন্ত সেখানে রয়েছে। রাজারা সব দিক দিয়ে যজ্ঞের সমৃদ্ধি দেখে বিস্মিত হলেন। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন সমাপ্ত হওয়ার পর বারবার মেঘের মতো গম্ভীর দুন্দুভিধ্বনি শোনা যেতে লাগল। ওই দুন্দুভিধ্বনি প্রত্যেক দিনই শোনা যেতে লাগল। ওই যজ্ঞ উপলক্ষে সমগ্র জম্বুদ্বীপ নানা জনপদে পরিবৃত দেখা গেল। সে সব জনপদের সমস্ত ব্রাহ্মণই সেই রাজকীয় মহাযজ্ঞে যোগদান করেন। ব্রাহ্মণগণ উত্তম ভোজ্য দ্বারা আপ্যায়িত হলেন। যজ্ঞে সমাগত সমস্ত ব্রাহ্মণ, রাজন্য এবং স্তুতিগায়কদের রাজা যথোচিত সৎকার করলেন। সেই রাজার এক হাজার একশো স্ত্রী ছিলেন। এরা সবাই সৎকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের রূপ ও গুণের কোন তুলনা নেই। স্বর্গীয় বেশ-বাস পরিধান করে রাজা চন্দ্রের মতো কান্তিমান হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, বিশাল বিশাল হাতীগুলো যজ্ঞে আনীত হয়েছে, তাদের দীর্ঘ দাঁত অলংকারের মতো শোভা পাচ্ছে। বাতাসের মতো বেগবান সিন্ধুদেশের সুন্দর সুন্দর ঘোড়া রয়েছে। অসংখ্য পদাতিক সৈন্যও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজা এভাবে বিস্তর যজ্ঞ-সম্ভার দেখে খুব খুশি হলেন এবং আনন্দে কর্মচারীদের বললেন, তোমরা শীগগির সমস্ত লক্ষণযুক্ত উৎকৃষ্ট ঘোড়া নিয়ে এসো এবং পৃথিবী পর্যটন করার জন্য তাদের ছেড়ে দাও। এই ঘোড়াগুলো রক্ষার ভার দাও জিতেন্দ্রিয় রাজপুত্রদের উপর। বিদ্বান এবং ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর হোমকর্মের ভার দাও। কালো ছাগল, মোষ, কৃষ্ণসার, বলদ, গাভী এবং অন্যান্য পশু সংগ্রহ কর। প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করে দাও। স্ত্রী, রত্ন, গ্রাম, নগর ও অন্যান্য অভীষ্ট দ্রব্য ব্রাহ্মণদের দান কর। সমস্ত অর্থীদের ধন-রত্ন প্রভৃতি দান কর ; কাউকেই যেন ফিরে যেতে না হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না দেবতাকে আমি দেখতে পাই বা এই যজ্ঞে তাঁর আবির্ভাব না ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই যজ্ঞ চলতে থাকুক। স্বয়ং রাজা কোটি কোটি সোনা দান করতে লাগলেন। তিনি বেদবিদ ব্রাহ্মণদের হাজার হাজার হাতী, ঘোড়া ও সুলক্ষণযুক্ত গাভী দান করলেন। এ ছাড়া বহুমূল্য কাপড়-চোপড়, সাদা রংকু হরিণের ছাল, উৎকৃষ্ট প্রবাল মণি, নানা রকম রত্ন, হীরে, বৈদূর্য, মাণিক্য, ও পাঁচশো সুন্দরী কুমারী দান করলেন। ওই যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা যে সব রমণীদের দান হিসেবে পেলেন, তারা স্ফীত স্তনভারে আনত,

মধ্যদেশ ক্ষীণ ও সুন্দর এবং সমস্ত অলংকারে তারা অলংকৃত। সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যত ধন-রত্ন ও টাকাকড়ি দিলেন, তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সেই যজ্ঞের সমৃদ্ধি দেখে সবাই বিস্মিত হলেন এবং যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে দেখে রাজারা আনন্দিত হলেন। সেই যজ্ঞের প্রভাবে সেই দেশে অকালমৃত্যু, রোগ, কোন প্রাকৃতিক উপদ্রব বা অন্য কোন কিছু উপসর্গ দেখা গেল না। এ রকম সমৃদ্ধ যজ্ঞ আর কখনো হয় নি। এভাবে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ মহাসমারোহে সমাপ্ত হল।

—স্বয়ম্ভূঋষিসংবাদে 'প্রাসাদকরণ' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ আটচল্লিশ

যজ্ঞকথা এবং প্রাসাদ নির্মাণের কথা শুনে মুনিরা ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন- আপনি আমাদের বিষ্ণুমন্দির নির্মাণের কথা ইত্যাদি সবই বলেছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন যেভাবে সেই প্রতিমা পূর্বে নির্মাণ করিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে-কথা দয়া করে আমাদের বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা সেই প্রাচীন কথা বলতে আরম্ভ করলেন—যখন সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হল এবং বিষ্ণুমন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেল, তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিমা নির্মাণের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। মূর্তির উপাদান, তার নির্মাতা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে তিনি এতই অধীর হয়ে পড়লেন যে, তিনি কিছুই খেতে পারলেন না, ঘুমোতেও পারলেন না। চান করা, বেশ-বাস করা, রাজকার্যে বসা—কোন কিছুই তিনি করতে পারলেন না। কোন গান-বাজনা, কোন রকম আমোদ প্রমোদ তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট মনে কোন রেখাপাতই করতে পারল না। পাথর, মাটি বা কাঠ—কোন্‌টি প্রতিমার ঠিক উপাদান এ ব্যাপারে চিন্তা করেও তিনি কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। তখন তিনি পঞ্চরাত্র বিধানে ভগবান বিষ্ণুর অর্চনা করে তাঁর স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন।

—'প্রতিমা নির্মাণবিধান' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ উনপঞ্চাশ

ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান বিষ্ণুর স্তবগাথা উচ্চারণ করতে লাগলেন—তুমি বাসুদেব, তুমি মোক্ষের কারণ। তোমাকে আমি নমস্কার জানাই। তুমি সংসার রূপ এই সমুদ্র থেকে আমাকে উদ্ধার কর। নির্মল আকাশের মতো তোমার মূর্তি উদার। তুমি পুরুষোত্তম, সঙ্কর্ষণ, পৃথিবীর ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার জানাই। আমায় তুমি রক্ষা কর। তুমি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের মতো দীপ্তিসম্পন্ন, তোমার দৈহিক আকৃতি অনুপম। তুমিই সম্বর নামক অসুরকে হত্যা করেছ, তোমায় নমস্কার করি। তুমি ভক্তজনের প্রতি সর্বদাই স্নেহপরায়ণ, তুমি অনিরুদ্ধ; স্বর্গবাসীদের তুমি প্রিয়তম। আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর। লাঙ্গল তোমার অন্যতম অস্ত্র, তুমি প্রপিতামহ; তোমার চার চারটে মুখ রয়েছে, নীল মেঘের মতো তোমার গায়ের রঙ। দেবতারা তোমায় পুজো করেন, জগতের নাথ বা ঈশ্বর তুমি, তোমায় বারংবার নমস্কার জানাই। আমায় তুমি রক্ষা কর। প্রলয়কালের ভীষণ অগ্নির মতো তুমি ভয়ংকর, তুমি নরসিংহ, তুমিই হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছ। তোমায় বারংবার নমস্কার জানাই। পুরাকালে রসাতল থেকে তুমিই বরাহরূপে পৃথিবীকে

উদ্ধার করেছ, আমাকে এই দুঃখসাগর থেকে রক্ষা কর।

বলরাম প্রভৃতি যত দেবতা আছেন, সে সবই তুমি ; তুমিই ওই সকল রূপে পৃথক ভাবে অবস্থিত। গরুড় তোমার বাহন এবং কেশব প্রভৃতি দিকপাল তোমার অস্ত্রসমূহ। মনীষীরা তোমার যে সব মূর্তি স্থির করেছেন, আমি তোমার সেই অনন্ত, অসংখ্য মূর্তির অর্চনা, স্তব ও নমস্কার করছি। তুমি আমায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ বর প্রদান কর। পরমার্থ দৃষ্টিতে তোমার কোন ভেদই নেই ; তবুও তোমার যে বিভিন্ন রূপ তা কেবল উপচারবশেই ; তুমি প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত, দ্বৈত বলে কেউ কি তোমায় নির্দেশ করতে পারে ? তুমি এক, অদ্বয়, সর্বব্যাপী, চিৎস্বভাব, নিরঞ্জন, তোমার পরম রূপ ভাব এবং অভাব রহিত, তুমি নির্গুণ, শ্রেষ্ঠ, অবিচল, স্থির, সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত এবং মুক্ত সত্তারূপে বিরাজ কর। দেবতারাও তোমার সেই রূপের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। আমি ক্ষুদ্র মানুষ হয়ে কি করে সে-কথা জানব ? তোমার যে আর এক রূপ তাতে দেখতে পাই তুমি পীত রঙের কাপড় পরে আছ, তোমার চারটে হাত রয়েছে, ওই চার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। তুমি মুকুট এবং অঙ্গদ ধারণ করে থাক, বুকে তোমার আঁকা রয়েছে শ্রীবৎসের পায়ের দাগ, গলায় তোমার বনমালা দোলে। দেবতারা এবং তোমার ভক্তেরা তোমার সেই রূপেরই অর্চনা করে থাকেন। তুমি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভক্তজনকে তুমি অভয় দান কর, তোমার চোখ পদ্মপাতার মতো ; আমি বিষয়-সমুদ্রে ডুবে রয়েছি, আমায় তুমি রক্ষা কর। ত্রিভুবনে তোমাকে ছাড়া আর কারুরই আশ্রয় নেওয়া যায় না। তোমার আশ্রয় আমি গ্রহণ করেছি, আমায় তুমি রক্ষা কর। আমি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছি, নানা দুঃখে পীড়িত হচ্ছি সদা সর্বদাই ; অসংখ্য কর্মজালে আমি আবদ্ধ। অতি ভীষণ সংসার সমুদ্রে আমি পতিত হয়েছি। এই সংসার সমুদ্র দুঃখে পরিপূর্ণ, তাই এই সমুদ্র পার হওয়া যায় না, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি মাছ রয়েছে এই সমুদ্রে, ইন্দ্রিয়রূপ আবর্তে গভীর এবং তৃষ্ণা ও শোকরূপ অসংখ্য ঢেউয়ে ভরা। এতে কোন আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই বা সারও নেই। আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে আমি এই সংসার-সমুদ্রে দীর্ঘ দিন ঘুরে মরছি, বারবার জন্মগ্রহণ করতে হচ্ছে আমাকে। আমি অঙ্গসমেত দেবসমূহের অধ্যয়ন করেছি ; তাছাড়াও বিবিধ শাস্ত্র, নানা ইতিহাস, পুরাণ এবং অনেক শিল্পশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছি। অনেক দুঃখ, বেদনা, আনন্দ ও সুখও পেয়েছি। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধবের বিয়োগব্যথাও সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। কতবার কত স্ত্রীগর্ভে আমাকে ভ্রূণ-রূপে থাকতে হয়েছে। বাল্যকালে এবং যৌবনের সময়েও যে যে দুঃখ আমাকে ভোগ করতে হয়েছে বার্ধক্যেও আমার সেই সেই দুঃখ উপস্থিত হয়েছে। মৃত্যুর পর যমালয়ে যে যে দুঃখ ভোগ করতে হয়, সে সব দুঃখই আমাকে ভোগ করতে হয়েছে। নরকযন্ত্রণা যে কী ভীষণ, সে অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে। ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীদের বাড়িতে আমাকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। কখনো প্রভু, কখনো চাকর, কখনো ধনী, কখনো গরীব প্রভৃতি বহু ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে বারংবার। কখনো আমি নিজেই হত্যা করেছি, কখনো বা অন্যকে দিয়ে মানুষকে হত্যা করিয়েছি আমি। আমি অন্যকে অনেকবার দান করেছি, অন্যেরাও আমাকে অনেকবার দান করেছে। আমি ঘৃণা, লজ্জা পরিত্যাগ করে সংসারের স্বার্থে অনেক কুকর্মই করেছি। সমগ্র বিশ্ব চরাচরে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে আমি যাই নি। এভাবে কখনো স্বর্গে, কখনো নরকে গিয়েছি ; কখনো পৃথিবীতে

আবার কখনো বা তির্যগ যোনিতে আমাকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। জলযন্ত্রে দাঁড়িতে বাঁধা ঘটি যেমন কখনো উপরে, কখনো মাঝখানে এবং কখনো নিচের দিকে যায়, আমিও তেমনি কর্মরূপ দড়িতে আবদ্ধ হয়ে উপরে, মধ্যদেশে, নীচ দেশে ঘুরে মরছি। এভাবে এই ভীষণ ও বিশাল সংসারচক্রে অনন্তকাল ঘুরে বেড়িয়েও এর শেষ কোথাও দেখছি না। আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। কি কর্তব্য আমার, তাও বুঝতে পারছি না। শোকে ও তৃষ্ণায় আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমার চেতনা বিলুপ্তপ্রায়। বিহ্বল হয়ে আমি তোমারই আশ্রয় নিলাম। আমাকে যদি তুমি ভক্ত বলে মনে কর, তবে আমাকে দয়া কর। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে, যে আমার কথা এমন করে ভাববে। তোমাকে যখন পরিত্রাতারূপে পেয়েছি, তখন আর আমার কোন ভয় নেই। যারা তোমায় বিধিমতো পূজা করে না, এই সংসার বন্ধন থেকে কেমন করে তাদের মুক্তি ঘটবে? তোমার প্রতি যাদের ভক্তি জন্মে না, তাদের বংশ, চরিত্র, বিদ্যা ও জীবন ধারণেই বা কি ফল? যারা মূর্খের মতো তোমার নিন্দায় মুখর হয়, তারা বারংবার জন্ম নিয়ে ঘোর নরকে পতিত হয়। তোমার দোষারোপ যারা করে, নরক থেকে তাদের কোন মুক্তি নেই। তোমার কাছে এই শুধু আমার প্রার্থনা, আমার কর্ম অনুসারে যেখানেই আমার জন্ম হোক, তোমার প্রতি ভক্তি যেন আমার অটুট থাকে। সবাই তোমার আরাধনা করে মুক্তিলাভ করে থাকে।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারাও যখন তোমার স্তব ঠিকভাবে করতে পারেন না, তখন আমি ক্ষুদ্র মানুষ, আমি কিভাবে তোমার স্তব করব? তবু, অন্তরের প্রেরণাতেই তোমার যে স্তব আমি করলাম, নিশ্চয় জানি, তাতে অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে। এই অজ্ঞতাজনিত ত্রুটি তুমি ক্ষমা করে দাও। যাঁরা সাধু ব্যক্তি, তাঁরা অজ্ঞতাবশে অপরাধ করে ফেললে এমন লোকদের দোষ তুমি ক্ষমা করে দাও। আমি ভক্তিনম্র চিত্তে তোমার যে স্তব করেছি, তাতে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এই আমার প্রার্থনা।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্তবে ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর অভীষ্ট বস্তু প্রদান করলেন। যে প্রতিদিন জগন্নাথকে পূজা করে এই স্তব পাঠ করে, নিশ্চয়ই তার মোক্ষ লাভ হয়। যে পবিত্র হয়ে ত্রিসন্ধ্যায় এই স্তোত্র পাঠ করে, সে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করে। যে সমাহিত হয়ে এই স্তোত্র পাঠ করে কিংবা পাঠ করে শোনায়, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে পৌঁছায়। নাস্তিক, মূর্খ, কৃতঘ্ন, অভিমানী, দুষ্টবুদ্ধি কিংবা অভক্ত ব্যক্তিকে এই স্তব কখনো দেওয়া উচিৎ নয়। এই সমৃদ্ধ স্তোত্র 'কারুণ্য' নামে পরিচিত। এই স্তোত্র সমস্ত সুখ, মোক্ষ এবং অভীষ্ট ফল দান করে থাকে। যে পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিরা সেই অতি সূক্ষ্ম, নিত্য, পুরাণ পুরুষ মুরারিকে ধ্যান করেন, তাঁরা মুক্তিলাভ করে যজ্ঞীয় আগুনে মন্ত্রের সঙ্গে প্রদত্ত ঘিয়ের মতো বিষ্ণুতেই প্রবেশ করে থাকেন। সেই পরমপুরুষই পার্থিব দুঃখের ঘাতক। তিনি ছাড়া অন্য কোন কর্তা নেই, স্রষ্টা নেই, নাশক নেই। তিনিই নিখিল সংসারের সারভূত বিষ্ণু। ভগবান বিষ্ণুর প্রতি যাদের ভক্তি নেই, তাদের বিদ্যা, গুণ, যজ্ঞ, দান বা তপস্যারও কোন মূল্য নেই। পরন্তু যারা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান, তারাই ধন্য, পবিত্র, বিদ্বান এবং প্রকৃত জ্ঞাতা, দাতা ও সত্যবাদী।

—'কারুণ্যস্তববর্ণন' নামে অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ পঞ্চাশ

সমস্ত কামনা ও ফলের দাতা বাসুদেব জগন্নাথকে এভাবে স্তুতি ও প্রণতি করে চিন্তাবিষ্ট রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মাটিতে কুশ ও কাপড় বিছিয়ে তদ্গতচিত্তে শয়ন করলেন। বিষ্ণুর দর্শন আকাঙ্খায় তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। রাজা সুপ্ত হয়ে বিষ্ণুর চিন্তায় তন্ময় হয়ে রয়েছেন, এমন সময় জগৎগুরু বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারীরূপে তাঁর দৃষ্টিগোচর হলেন। রাজা আনন্দিতচিত্তে সেই শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুকে দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন, বিষ্ণু গরুড়পৃষ্ঠে বসে রয়েছেন, তাঁর বর্ণপ্রভা যুগান্তকালীন সূর্যের মতো প্রতিভাত হল। তিনি নীলবর্ণ বৈদূর্যমণির মতো দীপ্তি ধারণ করেন। তাঁর আটটি হাত রয়েছে, তিনি গদা ও বাণ ধারণ করেন। তাঁর আকৃতি যেন প্রদীপ্ত জ্যোতির্মণ্ডল। সেই বিষ্ণু রাজাকে বললেন--তোমার এই দিব্যযজ্ঞ এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বৃথা কেন অনুশোচনা করছ? এখানে এক প্রসিদ্ধ প্রতিমা আছে, কেমন করে তুমি তা পাবে, সে কথা বলছি। আজ রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের পর লবণ সমুদ্রের কাছে তরঙ্গসমাকুল এক জায়গা তুমি দেখতে পাবে। তারই তীরে একটি বড় গাছ দেখতে পাবে, যার অর্ধেক জলে, এবং বাকী অর্ধেকটা স্থলে। সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে আহত হয়েও সেই গাছ কাঁপে না। তুমি কুড়ুল নিয়ে একাই সেখানে যাবে, গেলেই সেই গাছ দেখতে পাবে। চেনবার যে যে উপায় তোমায় বললাম, সে-সব উপায়ে সেই গাছকে খুঁজে তুমি তা কেটে ফেলবে এবং দেখবে সকাল হলেই সেই কাটা গাছ অদ্ভুত আকারে পরিণত হবে। সেই গাছ থেকে তুমি ওই দিব্য প্রতিমা নির্মাণ করিয়ে নেবে। সুতরাং তোমার চিন্তা করার কোন দরকার নেই।

ভগবান বিষ্ণু রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে এ কথা বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। রাজা জেগে দেখলেন বিষ্ণু অন্তর্হিত হয়েছেন। স্বপ্নের কথা চিন্তা করে তিনি আনন্দিত হলেন। সারারাত তিনি বৈষ্ণব মন্ত্র ও বৈষ্ণবসূক্ত উচ্চারণ করে কাটিয়ে দিলেন। তারপর সকালবেলায় সমুদ্রে গিয়ে, স্নান করলেন। ব্রাহ্মণদের ধন-রত্ন, গ্রাম ও নগর প্রভৃতি দান করে, আহ্নিক কর্ম করে, সেখানে থেকে চলে এলেন। তারপর একাই স্বপ্নে-দেখা সেই জায়গায় গিয়ে ওই বিশাল গাছটিকে দেখতে পেলেন। দেখলেন যে, অনেকটা জায়গা জুড়ে সেই গাছ গাঢ় অঞ্জনের মতো কান্তিবিশিষ্ট হয়ে জলের মধ্যে যেন প্রসুপ্ত হয়ে আছে। গাছটিকে খুঁজে পেয়ে রাজা ভীষণ খুশি হলেন এবং ধারালো কুড়ুল দিয়ে গাছটিকে কেটে ফেললেন। গাছটি কাটার পর রাজা যখন তাকে দু'ভাগে ভাগ করার জন্য উদ্যত, তখন হঠাৎ দেখলেন যে দুজন ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁরা যেন নিজেদের তেজে সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছিলেন। তাঁরা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বললেন--এ আপনি কি করলেন? এই মহাসমুদ্রের তীরে নির্জন বনে এই একটি মাত্র বনস্পতি ছিল, একে আপনি কেন কেটে ফেললেন?

আসলে সেই দুজন ব্রাহ্মণ ছিলেন বিষ্ণু ও বিশ্বকর্মা। তাঁদের কথা শুনে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন খুবই আনন্দিত হলেন এবং বিনীতভাবে বললেন--আমাকে মার্জনা করবেন। আমি অনাদি, অনন্ত বিষ্ণুকে আরাধনা করার জন্য একখানা প্রতিমা নির্মাণ করব, এই আমার অভিপ্রায়। সেজন্যই গাছ কাটছি। ভগবান বিষ্ণু স্বপ্নে আমাকে এ রকম আদেশই দিয়েছেন।

ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা শুনে ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু হেসে তাঁকে বললেন—তোমার যে এই বুদ্ধি জন্মেছে, সে-জন্য তোমায় সাধুবাদ জানাই। এই চঞ্চল সংসার-সমুদ্র অতীব ভয়াবহ। কাম, ক্রোধ ও দুঃখ-পরম্পরায় এই সংসার সমাকুল, ইন্দ্রিয়রূপ আবর্তে পরিপূর্ণ, জলবুদ্বুদের মতো অস্থির ও অসংখ্য ব্যাধিতে পরিপূর্ণ। এ রকম সংসারে থেকেও বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তোমার যে এই মতি উৎপন্ন হয়েছে সে-জন্য সত্যিই তুমি ধন্যবাদের যোগ্য। তুমি সমস্ত গুণে অলংকৃত। তোমার মতো প্রজাপালক রাজাকে পেয়ে পৃথিবীও ধন্য হয়েছে। এসো, এই গাছের ছায়ায় আমরা বসি এবং কথা বলি। আমার সঙ্গে যাঁকে দেখছ, ইনি শিল্পকর্মে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মার মতো এবং সমস্ত কাজে সুদক্ষ। ইনিই প্রতিমা নির্মাণ করবেন। সুতরাং তুমি এখান থেকে চলে যাও। রাজা সেই ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণুর আদেশে সেখান থেকে চলে গেলেন। বিষ্ণু তখন বিশ্বকর্মাকে প্রতিমা নির্মাণ করতে বললেন—প্রথম প্রতিমা কৃষ্ণের; এই মূর্তি শান্ত, পদ্মপাতার মতো এঁর চোখ, বুকে থাকবে এঁর শ্রীবৎসের পদচিহ্ন, চার হাতে থাকবে শংখ, চক্র, গদা ও পদ্ম। দ্বিতীয় প্রতিমা—অনন্ত-মূর্তি, এটি গৌরাঙ্গ। দুধের মতো এর রঙ, স্বস্তিকাচিহ্ন থাকবে ও হাতে থাকবে লাঙ্গল। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব যক্ষ, বিদ্যাধর ও নাগেরা পর্যন্ত এর শেষ জানতে পারেন না বলে, ইনি 'অনন্ত' আখ্যায় অভিহিত হয়ে থাকেন। আর তৃতীয় প্রতিমা—সুভদ্রামূর্তি; ইনি উজ্জ্বলবর্ণের, সুশোভন ও সমস্ত শুভলক্ষণে লক্ষিত হবেন। এই সুভদ্রা কৃষ্ণের বোন।

ভগবান বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বকর্মা তখন প্রতিমাসমূহ নির্মাণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। ক্রমে তিনটি মূর্তিই নির্মিত হল—প্রথম মূর্তি বলদেব বলরামের। এঁর গায়ের রঙ সাদা, শরৎকালের চাঁদের মতো এর দীপ্তি, চোখ লাল, বিশাল আকার, মাথায় ফণা মেলে রয়েছে শ্রেষ্ঠ নাগ, পরনে নীল কাপড়, বলগর্বে ইনি গর্বিত, একটি মাত্র কুণ্ডল ধারণ করে রয়েছেন, হাতে রয়েছে গদা ও মুষল। দ্বিতীয় মূর্তি ভগবান বিষ্ণুর—নীল মেঘের মতো তাঁর গায়ের রঙ, সাদা পদ্মের মতো, অতসী ফুলের মতো, পদ্মপত্রের মতো তাঁর চোখ। তাঁর পরনে রয়েছে পীত রঙের কাপড়, বুকে রয়েছে শ্রীবৎসের পায়ের ছাপ, সৌম্যরূপধারী, হাতে রয়েছে চক্র। তৃতীয় মূর্তি সুভদ্রার—সোনার মতো তাঁর গায়ের রঙ, পদ্ম এবং পলাশের মতো তাঁর চোখ, অঙ্গে তাঁর বিচিত্র বর্ণের কাপড়, গলায় রয়েছে হার, অঙ্গে রয়েছে কেয়ূর। আরো বিচিত্র অলঙ্কার তাঁর গায়ে রয়েছে। তিনি গলায় রত্নহার পরে রয়েছেন, স্তনযুগল স্ফীত ও উন্নত। রাজা দেখলেন যে, ক্ষণেকের মধ্যেই মনোরম তিনটি প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। তিনি এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিস্মিত হলেন এবং তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনারা কি ব্রাহ্মণবেশী কোন দেবতা? অথবা অদ্ভুতকর্মকারী দেবোপম মানুষ? দেবতা, মানুষ, যক্ষ, বিদ্যাধর, ব্রহ্মর্ষি কিংবা অশ্বিনীকুমার, যেই হোন না কেন, আপনাদের তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। মনে হয়, আপনারা মায়ারূপে অবস্থান করছেন। আপনাদের আমি শরণাপন্ন হলাম; আপনারা আত্মপ্রকাশ করুন।

—স্বয়ম্ভূঋষিসংবাদে 'প্রতিমোৎপত্তি কথন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায়ঃ একান্ন

ইন্দ্রদ্যুম্নের আবেদনে সাড়া দিয়ে ভগবান বিষ্ণু বললেন—আমি দেবতা, যক্ষ, দৈত্য, দেবরাজ, ব্রহ্মা বা রুদ্র, কেউই নই। আমাকে তুমি পুরুষোত্তম বলেই জানবে। আমার

বল ও পৌরুষ অনন্ত। সমস্ত প্রাণীই আমাকে আরাধনা করে থাকে। সমস্ত শাস্ত্রেই তুমি আমার কথা পাবে, বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ আমাকেই প্রধানরূপে প্রতিপাদিত করে। যোগীরা আমাকেই জ্ঞানগম্য এবং বাসুদেব নামে নির্দেশ করে থাকেন। আমিই স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং আমিই দেবরাজ ইন্দ্র ও জগতের নিয়মবিধায়ক যম। সমস্ত প্রাণী, সমস্ত লোক, অগ্নি, বরুণ—এ সমস্তই আমি। ত্রিভুবনে যা কিছু বাঙময়, যা কিছু স্থাবর জঙ্গম, জগৎ এবং চরাচর বিশ্ব-সে সবই আমি। আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমার ঈপ্সিত যা, তা তোমায় আমি প্রদান করছি। যারা পাপী তারা স্বপ্নেও আমাকে দেখতে পায় না। তুমি ভক্তিমান, তাই তুমি আমায় প্রত্যক্ষ করতে পেরেছ।

বিষ্ণুর কথা শুনে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রোমাঞ্চ হল। পুলকিত হয়ে তিনি বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন—তুমি লক্ষ্মীর পতি। পরিধানে তোমার পীত বসন, তুমি মঙ্গল ও সৌভাগ্য দান কর। স্বয়ং লক্ষ্মী তোমাতেই অধিষ্ঠিত, তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমিই প্রথম, ঈশান, পুরুষ, কলঙ্কশূন্য, সনাতন, পরমদেব; তোমায় বারংবার প্রণাম জানাই। তুমি শব্দের অতীত, গুণের অতীত, তোমার ভাব, অভাব কিছুই নেই। তুমি নির্গুণ, নির্লেপ, সূক্ষ্ম, সর্বজ্ঞ, বর্ষাকালের মেঘের মতো, গোরু এবং ব্রাহ্মণের কল্যাণে নিয়োজিত, সর্বব্যাপী, শঙ্খ, চক্র এবং গদা ধারণ করে রয়েছ, নীল পদ্মের মতো তোমার গায়ের রঙ, তুমি বর দান কর, তুমি সমস্ত দেবতারও দেবতা, তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্তনাগের রচিত শয্যায় শয়ন কর, সমস্ত পাপ তুমি নাশ কর, তোমায় আমি নমস্কার জানাই। তুমি মোক্ষের কারণ, অব্যয় বিষ্ণু, তোমায় বারংবার নমস্কার জানাই। তুমি যদি সত্যিই প্রীত হয়ে থাক আমার স্তবে, তবে এই প্রার্থনাই তোমার কাছে আমি রাখছি যে, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সিদ্ধ, বিদ্যাধর কিন্নর, মহাভাগ ঋষি এবং নানা শাস্ত্রজ্ঞ সাধুগণ, পরিব্রাজক, যোগিরা অন্যান্য মণীষির নির্মল, নির্গুণ, শান্ত ও পরম পদকে ধ্যান ও দর্শন করে থাকেন, আমি আপনার অনুগ্রহে সেই দুর্লভ পরম পদই যেন লাভ করি।

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনার উত্তরে ভগবান বিষ্ণু বললেন—তোমার মঙ্গল হোক। সমস্ত অভীষ্ট বস্তুই তুমি লাভ কর। তুমি দশহাজার ন'শো বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজ্য শাসন কর। তারপর তুমি দেবতা ও অসুরদের পক্ষে দুর্লভ দিব্য পদ লাভ করবে। যে পূর্ণ, শান্ত, অব্যক্ত, পরাৎপর, সূক্ষ্ম, ধ্রুব ও ক্রিয়া কারণবর্জিত এবং যা পেলে তুমি আনন্দময় পরম গতি লাভ করতে পারবে, সেই পরম পদ তোমায় আমি দেখাব। যত দিন পর্যন্ত আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা, সাতসমুদ্র ও মেরু প্রভৃতি পৃথিবীতে থাকবে, স্বর্গে দেবতারা যত দিন থাকবেন, তত দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর সর্বত্র তোমার অক্ষয় কীর্তি ঘোষিত হবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নামে এক তীর্থ পৃথিবীতে বিখ্যাত হবে, তাতে একবার মাত্র স্নান করলেই মানুষ ইন্দ্রলোকে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে এবং চৌদ্দজন ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্যন্ত তারা অপ্সরাগণ কর্তৃক পূজিত ও গন্ধর্বগণ কর্তৃক আপ্যায়িত হয়ে সুখে সেখানে বাস করবে। ওই সরোবরের দক্ষিণভাগে নৈঋত কোণে যে বটগাছ আছে, তার কাছাকাছি একটি মণ্ডপ আছে। ওই মণ্ডপ নানা রকম ফুলে এবং ফলের গাছে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মঘা নক্ষত্রে ওই মণ্ডপে আমাদের নিয়ে গিয়ে সাতদিন ধরে সেখানে স্থাপন করে রাখবে।

নাকে বিভিন্ন রকম সুন্দর বেশভূষায় আমাদের সাজাবে, নাচগানের দ্বারা আমাদের প্যায়িত করবে এবং সোনার দণ্ড, রত্নালংকার ও চামর দিয়ে ব্যজন করবে। সে সময় ব্রহ্মচারী, যতি, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ, সিদ্ধ এবং অন্যান্যরা নানা স্তোত্র পাঠ করে এবং ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে আমাদের স্তব করবেন। লোকে রাম ও কৃষ্ণকে দর্শন, প্রণাম ও ভক্তিভরে স্তব করলে দিব্য অযুত বছর পর্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করবে এবং বিষ্ণুর অনুচররূপে তারা সেখানে সুখে বিষ্ণুর সঙ্গে থাকবে। সেখানে উত্তমভাবে সুখ ভোগ করার পর তপস্যার ক্ষয়ে পৃথিবীতে এসে কোটি ধনপতি চার বেদে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

ভগবান বিষ্ণু এভাবে বর দান করে বিশ্বকর্মার সঙ্গে অন্যত্র চলে গেলেন। অভীষ্ট দেবতার দর্শন লাভ করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করলেন। তারপর মন্ত্রী ও পুরোহিতদের সঙ্গে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে মণি ও কাঞ্চনময় বিমানের মতো রথে চাপিয়ে মহা মঙ্গলধ্বনি করতে করতে নিয়ে এলেন। পরে নানা রকম বাজনা বাজিয়ে ও বেদধ্বনির উচ্চারণে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যথাবিধি পবিত্র তিথি, পবিত্র নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্তে ওই মূর্তি তিনটি স্থাপন করলেন। ওই কাজে নিযুক্ত আচার্যদের তিনি যথোচিত দক্ষিণা দিয়ে অভ্যর্থিত করলেন। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অন্যান্য প্রার্থীদেরও সাধ্যমত ধন দান করা হয়। প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে তিনি প্রার্থীদের যেমন অনেক বস্তু দান করলেন, তেমনি অনেক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করলেন। পরিণামে, সমস্ত কাজের অবসানে তিনি বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করলেন।

এতক্ষণ ধরে আপনাদের আমি ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলাম। আপনারা আর কি শুনতে চান, বলুন।

যে ব্রহ্মার জন্ম-কথা কেউ বলতে পারে না, তাঁর কাছ থেকে এই পবিত্র পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের কথা শুনে মুনিরা খুব খুশি হয়ে তাঁকেই আবার জিগ্যেস করলেন—আপনি আমাদের সব অনুরোধই রক্ষা করেছেন ; দয়া করে বলুন কোন্ সময়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যেতে হয় এবং কোন্ বিধি অনুসারেই বা পঞ্চতীর্থকৃত্য করতে হয় ? ওই পঞ্চতীর্থের এক একটি তীর্থে স্নান, দান ও দেবতা দর্শন করলে যে যে ফল লাভ করা যায়, সে-সব কথা আলাদা আলাদা ভাবে বলুন।

মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও ক্রোধ জয় করে সাত অযুত বছর ধরে কুরুক্ষেত্রে তপস্যা করে এবং জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্ল দ্বাদশী দিনে উপবাসী থেকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র দর্শন করে, সে সবচেয়ে বেশী পুণ্য লাভ করে। স্বর্গকামী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজাতিরা সংযত হয়ে ওই দিনে পুরুষোত্তম দর্শন করবেন। তীর্থ পর্যটনকারীরা বিধিমতো পঞ্চতীর্থ দর্শন করবেন। যারা জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিযুক্ত দিনে পুরুষোত্তমকে দর্শন করে তারা বিষ্ণুলোকে গিয়ে কখনো সেখান থেকে ফিরে আসে না। পঞ্চতীর্থ করার পরই পুরুষোত্তম জগন্নাথের দর্শন বিধিসম্মত। যে ব্যক্তি দূরে থেকেও প্রতি দিন পবিত্র মনে পুরুষোত্তমের নাম নেয়, সেও বিষ্ণুলোকে যায় এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। ওই পুরুষোত্তম জগন্নাথের মন্দিরের উপরে যে চক্র আছে, মানুষ দূর থেকে তাকে দর্শন করে ভক্তিভরে প্রণাম করলে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

'—পুরুষোত্তমবর্ণন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ বাহান্ন

ব্রহ্মা বলে চললেন—পুরাকালে মহাপ্রলয় উপস্থিত হলে, চারদিকে ঘোর অন্ধকার ছা আর কিছুই ছিল না। সে সময় না ছিল চন্দ্র, না সূর্য, না স্থাবর, জঙ্গম, কো কিছুই। তখন প্রলয়কালীন আদিত্যের উদয় হল। প্রচণ্ড গর্জন শোনা যেতে লাগল বিদ্যুৎ এবং অগ্নিতাপে গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত সমস্ত কিছুই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল লোকসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেল। বড় বড় উল্কাপাত হতে লাগল। নদী, সরোব প্রভৃতি সব রকমের জলাশয় শুকিয়ে গেল। ওই সময় বাতাস ও সূর্যের সহযোগে ভীষ সম্বর্তক বহ্নি সব জায়গায় দেখা গেল। ওই আগুন পরে পৃথিবী ভেদ করে রসাত গিয়ে দেবতা, দানব ও যক্ষদের ভয় উৎপাদন করল। তার প্রভাবে নাগলোক পুড়ে গে এবং এই পৃথিবীতে যা কিছু ছিল, তাও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন দ্রুতগাম বায়ু ও সেই সম্বর্তক বহ্নি, ক্ষণকালের মধ্যেই হাজার হাজার যোজন স্থান পুড়ি ফেলল। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই সেই জ্বলন সম্বর্তক অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমরা শুনেছি যে, ওই ঘোর শব্দকার কোটি সূর্যের মতো জ্বলন্ত সম্বর্তক নামক অগ্নি সমগ্র ত্রিভুবনকে পুড়িয়ে করে দিল। ওই রকম মহাপ্রলয়ের সময় একমাত্র পরমধর্মা মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ধ্যাননিষ্ঠ হ অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তখন তিনি মোহপাশে আবদ্ধ ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হ পড়লেন। সেই সম্বর্তক নামক আগুন দেখে তাঁর গলা, ঠোঁট ও তালু শুকিয়ে গেল তিনি তৃষ্ণার্ত ও ভয়বিহ্বল হয়ে তপস্যা থেকে বিচ্যুত হলেন এবং প্রায়-অচেতন হ পড়লেন। সেই অবস্থায় কি করবেন বুঝে উঠতে না পেরে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়া লাগলেন। কিন্তু কোথাও তিনি শান্তি পেলেন না। সেই অবস্থায় তিনি সেই সনাত পুরুষোত্তম ও শ্রেষ্ঠ দেবতাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করতে লাগলেন। এই রকম চিন্ত করতে করতে তিনি এক জায়গায় একটি বটগাছ দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে গাছের নীচে গিয়ে বসলেন। দেখলেন, সেখানে ওই সম্বর্তক অগ্নির ভয়, অঙ্গার বর্ষণ ব বজ্রপাত প্রভৃতি কিছুই নেই।

—স্বয়ম্ভূ ঋষিসংবাদে 'মার্কণ্ডেয় কর্তৃক বটদর্শন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত

অধ্যায় ঃ তিপান্ন

তারপর বিভিন্ন আকৃতির মেঘে আকাশ ছেয়ে এলো। ঘন ঘন বিদ্যুতের স্ফুরণ দেখ দিল। ওই মেঘের মধ্যে কতকগুলো নীল পদ্মের মতো শ্যামল, কতকগুলো কুমুদে মতো সাদা, কতকগুলো পদ্মরেণুর মতো, কতকগুলো পীতরঙের, কতকগুলো সীম ব কড়াইশুঁটি গাছের মতো, কতকগুলো পদ্ম ও পলাশের মতো, কতকগুলো হাল্ক লালরঙের, কতকগুলো সিঁদুরের মতো, কতকগুলো প্রাসাদের মতো উঁচু, কতকগুলে পাহাড়ের মতো উঁচু, কতকগুলো মরকতমণির মতো দীপ্তিসম্পন্ন এবং কতকগুলোর আ বিদ্যুন্মালায় মণ্ডিত। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। সমগ্র পৃথিবী ওই মেঘে পরিপূ হয়ে গেল। জলপ্রবাহে সমস্ত দিক প্লাবিত হয়ে গেল। যে বিধ্বংসী সম্বর্তক নাম আগুন সমগ্র ভূভাগকে দগ্ধ করেছিল, এই মেঘসমূহ প্রবল বারিবর্ষণে সেই আগু

নিভিয়ে ফেলল। পৃথিবী দহনজ্বালা থেকে মুক্তি পেল। বারো বছর ধরে অবিরাম বৃষ্টিপাতে পৃথিবী প্লাবিত হয়ে গেল। সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করল, পর্বতসমূহ বিশীর্ণ হয়ে গেল। গর্জন করে আকাশে ঘুরতে লাগল বর্ষণশালী মেঘমালা। অবশেষে প্রবল বায়ুবেগে সমাহত হয়ে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেল। আদি দেবতা বিষ্ণু তখন ওই ভীষণ বায়ু পান করে সেই বিখ্যাত একার্ণবে শয়ন করলেন। স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে গেল। দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস-কারুরই কোন অস্তিত্ব রইল না। সে-সময় সেই মার্কণ্ডেয় মুনি বিশ্রাম লাভ করে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে ধ্যান করলেন। ধ্যানের শেষে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, সমগ্র পৃথিবী জলময় হয়ে রয়েছে। যে বটগাছের নীচে তিনি বসে ছিলেন, সেই গাছ, কিংবা সূর্য, চাঁদ, আগুন, বাতাসের প্রাবল্য, অসুর প্রভৃতি কিছুই নেই। সেই ঘোর একার্ণবে কোন আশ্রয়স্থলই নেই, সর্বত্রই অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। মার্কণ্ডেয় তখন অনন্যোপায় হয়ে সেই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত জলরাশি থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সফল হতে পারলেন না। তিনি আর্তভাবে জলের উপর ভাসতে ভাসতে বহুকাল ঘুরে বেড়ালেন। তাঁকে সে-রকম অবস্থায় দেখে পুরুষোত্তম বিষ্ণু বললেন--মার্কণ্ডেয়, তুমি আমার ভক্ত। তুমি পরিশ্রান্ত ; তোমার কোন ভয় নেই ; তুমি আমার কাছেই এসেছ। তুমি নিতান্তই বালক, আমি তোমার রক্ষার ব্যবস্থা করছি।

নিঃসহায় অবস্থায় ওই জলরাশির মধ্যে ভাসতে ভাসতে এ রকম অবজ্ঞাজনক কথা শুনে মার্কণ্ডেয় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন-কে আমার তপস্যার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে আমার নাম ধরে ডাকল ? কার এত স্পর্ধা ? দেবসমাজে তো কই এ রকম অনৈতিক ব্যবহার দেখা যায় না ! তাছাড়া স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘায়ু বলে অভিহিত করেছেন। কে আমার নাম ধরে অবজ্ঞাভরে ডেকে নিজের মৃত্যু কামনা করল ? মার্কণ্ডেয় কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। তখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন যে ওই কণ্ঠস্বর কি তিনি সত্যিই শুনেছেন, নাকি তা মোহ। চিন্তা করেও কিছুই খুঁজে পেলেন না। তখন অনন্যোপায় হয়ে তিনি পুরুষোত্তম বিষ্ণুর শরণ নিলেন। তখন দেখলেন, সেই বটগাছ জলের উপর ভাসমান রয়েছে। সেই বিশাল বটগাছের বিশাল শাখায় যেন বিশ্বকর্মার তৈরি করা সোনার পালঙ্ক রয়েছে। ওই পালঙ্ক বিবিধ রত্নে অলঙ্কৃত, নানান আবরণে আচ্ছাদিত এবং দীপ্তিসম্পন্ন। সেই রত্নখচিত পালঙ্কের উপর বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করছেন। তাঁর শরীর থেকে যেন কোটি সূর্যের দীপ্তি বেরুচ্ছে। তাঁর চারটে হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তাঁর চোখ পদ্মপাতার মতো আয়ত। তাঁর বুকে শ্রীবৎসের পায়ের ছাপ রয়েছে, গলায় বনমালা, নানা দিব্য রত্ন পরিধান করে রয়েছেন তিনি। মার্কণ্ডেয় সেই বালককে দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন ; এ রকম চারদিক ব্যাপী জলে এই বালক কিভাবে নির্ভয়ে রয়েছে। যদিও মার্কণ্ডেয় প্রাজ্ঞ ও অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ব্যাপারে অভিজ্ঞ, তবুও তিনি দৈবী মায়ায় মোহিত হয়ে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি নিজেকে তিরস্কৃত করলেন।

এ রকম চিন্তা করতে করতে তিনি কিছুই বুঝতে না পেরে জলে ভাসতে লাগলেন। সেই বালকের তেজ এতই যে, মার্কণ্ডেয় তাঁর দিকে চাইতে পারলেন না। তখন সেই বালক মুনিকে ভেসে আসতে দেখে হেসে মেঘের মতো গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি তোমায় জানতে পেরেছি, তুমি শ্রান্ত হয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়েছ।

তুমি শীগগির আমার শরীরে প্রবেশ কর। তাতে তোমার বিশ্রাম লাভ ঘটবে।

সেই বালকের কথা শুনে মার্কণ্ডেয় কিছুই বলতে পারলেন না ; মোহবশে বিবশ হয়ে তাঁর হাঁ-করা মুখে আশ্রয় নিলেন।

—'মার্কণ্ডেয়প্রলয়দর্শন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায় ঃ চুয়ান্ন

মার্কণ্ডেয় সেই বালকের উদরে প্রবেশ করে তার মধ্যে নানা জনপদে পরিবৃত সমগ্র পৃথিবী, সাত সমুদ্র, জম্বু প্রভৃতি সাতটি দ্বীপ, ভারত প্রভৃতি নানা বর্ষ, এবং পাহাড়-পর্বতসমূহ দেখতে পেলেন। তিনি মনোরম সুমেরু পর্বত দেখতে পেলেন—সেই সুমেরু পর্বতে নানা রত্ন রয়েছে ; বহু কন্দর, গুহা রয়েছে ওই পর্বতে। সেই পর্বত নানা মুনি-জনে সমাকীর্ণ, নানা গাছপালায় ভরা, নানা পশু-পাখিতে পরিপূর্ণ। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা, সিদ্ধ, চারণ, মুনি, যক্ষ ও অপ্সরারা রয়েছেন সেই পর্বতে। এভাবে মার্কণ্ডেয় সেই বালকের উদরে বিচরণ করতে করতে হিমালয়, হেমকূট, গন্ধমাদন, শ্বেত, দর্দুর, নীল, কৈলাস, মন্দর, মহেন্দ্র, মলয়, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, অর্বুদ, শুক্তিমান, মৈনাক এবং বক্র প্রভৃতি অনেক পর্বত দেখলেন। এ ছাড়া কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মৎস্য, মদ্র, কেকয়, বাহ্লীক, শূরসেন, কাশ্মীর, তঙ্গণ, খস, পার্বত্য, কিরাত, কর্ণপ্রাবরণ ও মরু দেশ এবং বিভিন্ন জাতের মানুষ, হরিণ, বানর, সিংহ, খরগোশ, হাতী প্রভৃতি অনেক প্রাণী দেখতে পেলেন। পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ, গ্রাম, নগর, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কেনাবেচা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই তিনি ওই বালকের উদরে দেখতে পেলেন। এক কথায় ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সব কিছুই তিনি দেখতে পেলেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অনুগ্রহে তিনি সেই বালকের উদরস্থ সমস্ত জগতেই ভ্রমণ করলেন, কিন্তু সেই বিষ্ণুদেহের শেষ পেলেন না। কিছুই বুঝতে না পেরে তিনি সেই পুরুষোত্তমের শরণাপন্ন হলেন। শরণ নেওয়ার পরের মুহূর্তেই ওই মহাপুরুষের মুখগহ্বর থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন।

—'মার্কণ্ডেয়ের ভগবৎকুক্ষি পরিবর্তন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ পঞ্চান্ন

মার্কণ্ডেয় সেই বালকের উদর থেকে বেরিয়ে এসে আবার সেই জলে জলাকার পৃথিবী এবং সেই বটগাছের শাখায় পালঙ্কের উপর সেই শিশুরূপী পুরুষোত্তমকে দেখতে পেলেন। এদিকে সেই বালকরূপধারী বিষ্ণু মার্কণ্ডেয়কে ভেসে আসতে দেখে হেসে বললেন—তুমি আমার উদরে বাস করে বিশ্রাম লাভ করেছ কি ? এবং সেখানে বিচরণ করতে করতে কোন আশ্চর্যজনক বস্তু বা দৃশ্য তোমার চোখে পড়েছে কি ? তুমি আমার ভক্ত ; শ্রান্ত হয়ে আমায় তুমি আশ্রয় করেছ। তাই তোমার উপকারের জন্য তোমায় বলি—তুমি এখন আমায় অবলোকন কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে মার্কণ্ডেয় মুনি আনন্দিত হলেন এবং রত্ন ও অলংকার মণ্ডিত সেই পুরুষকে দেখলেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহে তাঁর দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা গেল বেড়ে। মার্কণ্ডেয় ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম করে জোড়হাতে তাঁর স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন—তুমি জগতের পতি, বালকের রূপ ধারণ করে বিশ্বকে মোহিত

কর ; আমি শরণাগত, দুঃখিত, আমায় তুমি ত্রাণ কর। আমি 'সম্বর্তক' নামক বহ্নির প্রভাবে তাপিত হয়েছি, আমায় তুমি রক্ষা কর। প্রবল বায়ুবেগে আমি বিহ্বল ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কোথাও শান্তিলাভ করতে পারছি না। আমি তৃষিত, ক্ষুধার্ত এবং দুঃখিত ; তোমাকে ছাড়া পরিত্রাতারূপে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমায় রক্ষা কর। তোমার উদরে এই চরাচর সমস্ত বস্তু আমি দেখেছি, তা দেখে আমি বিস্মিত ও বিষন্ন হয়ে পড়েছি। এই আশ্রয়বিহীন সংসারে আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। তুমি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবতাদের তুমি প্রিয়, সমস্ত লোকের অধিপতি ও সমগ্র জগতের কারণ। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি সর্বকৃৎ, মধুসূদন, কমলাকান্ত ; জলই তোমার আবাসস্থল, কংসহন্তা, শত্রুনাশক, দৈত্যহন্তা ও কৃষ্ণ। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। মথুরা তোমার আবাস, তুমি যদুনন্দন, অব্যয়, বরদানকারী ; তুমিই পৃথিবী, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, মন, অহংকার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, ও সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ। তুমি জগদ্ব্যাপী পুরুষ, পুরুষোত্তম, সমস্ত ইন্দ্রিয়, শব্দ প্রভৃতি বিষয়, দিক, কাল, ধর্ম, বেদ, যজ্ঞ, ইন্দ্র, শিব, যজ্ঞীয় হবি, অগ্নি, যম, রাক্ষসদের অধিপতি, জলপতি বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, অনন্ত, গণেশ, কার্তিক, বসু, রুদ্র, সূর্য, পাখি, দানব, যক্ষ, দৈত্য, মরুৎগণ, সিদ্ধ, অপ্সরা, নাগ, গন্ধর্ব, চারণ, বালখিল্যগণ, প্রজাপতিগণ, মুনিগণ, ঋষিগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নিশাচরগণ এবং অন্যান্য যে সব জাতি ও জীব রয়েছে, সে সবই তুমি। ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত কিছুকেই তুমি ব্যাপ্ত করে রয়েছ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সমস্ত কালই তুমি। তোমার যে কূটস্থ, অচল ও স্থির রূপ রয়েছে, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারাই তা জানেন না ; সুতরাং আমার মতো অল্পবুদ্ধি লোক কি করে জানবে ? তুমি শুদ্ধস্বভাব, নিত্য, প্রকৃতির অতীত, অব্যক্ত, শাশ্বত, অনন্ত, সর্বব্যাপী, মহেশ্বর, পরম শান্ত, আকাশ, অজ, অব্যয়, বিভু, নির্গুণ ও নিরঞ্জন পুরুষ ; কে তোমার স্তব করতে পারে ? নিতান্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি ; যদি কোথাও কোন ত্রুটি আমার হয়ে থাকে, তো করুণার দৃষ্টিতে তা ক্ষমা করে দিও।

—'ভগবৎস্তব-নিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ ছাপান্ন

মার্কণ্ডেয় মুনির স্তবে প্রীত হয়ে ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বললেন—তোমার ঈপ্সিত কি, তা আমায় খুলে বল। আমি তোমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। তখন সেই শিশুরূপী বিষ্ণুর কথা শুনে মার্কণ্ডেয় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন—তোমার যে শ্রেষ্ঠ মায়া তা আমি সম্যকরূপে জানতে ইচ্ছা করি। তুমি এ রকমই কর যাতে আমার স্মৃতিশক্তি কখনো বিলুপ্ত না হয়। তোমার স্বরূপ আমি জানতে ইচ্ছা করি। তুমি এখানে শিশুরূপে কেন অবস্থান করছ, সে-কথা আমায় বল। এই সমগ্র জগৎ তোমার দেহে কেন রয়েছে, আর কত কালই বা তুমি এখানে এভাবে অবস্থান করবে ?—এ সবই তোমার কাছ থেকে আমি জানতে ইচ্ছা করি।

মুনি মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনে সেই দীপ্তিমান দেবতা বিষ্ণু তাঁকে সান্ত্বনা দান করে বললেন—শোন মার্কণ্ডেয় ; দেবতারাও আমায় সম্যকভাবে জানেন না। তোমার উপর খুশি হয়ে তোমায় আমি সব কিছুই বলব। তুমি পিতৃভক্ত, বিশেষত আমার শরণাগত।

তাই তোমার উপর আমি সন্তুষ্ট। তোমার যে অসাধারণ ব্রহ্মচর্য, সে-কথাও আমার জানা। পুরাকালে আমি জলকে 'নার' এই সংজ্ঞায় অভিহিত করি, সেজন্য আমার নাম নারায়ণ; কারণ, সেই নারই আমার অয়ন। আমি অব্যয়, শাশ্বত, সমস্ত প্রাণীর বিধাতা ও সৃষ্টি-কর্তা। আমিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, শিব, সোম, প্রজাপতি কশ্যপ ও যজ্ঞ। অগ্নি আমার মুখ; পৃথিবী আমার দুই পা, চন্দ্র ও সূর্য আমার চোখ, উপরের ভূমি আমার মাথা, আকাশ ও দিক আমার দুই কান; জলরাশি আমার ঘাম, দিক ও গগনতল আমার দেহ, বায়ু আমার মনে অবস্থান করে রয়েছে। অসংখ্য যজ্ঞের আমি কর্তা; বেদবিদগণ আমাকেই অর্চনা করেন। ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রাজারা এবং জয়কামী বৈশ্যেরা স্বর্গলোক কামনা করে আমাকেই পূজা করে থাকেন। এই মেরু ও পর্বত বিশিষ্ট পৃথিবীকে আমিই শেষ-মূর্তিতে ধারণ করে থাকি। পুরাকালে এই জলমগ্ন পৃথিবীকে আমিই বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলাম। 'বাড়ব' অগ্নি হয়ে আমি জলরাশি পান করি, আবার তাতেই সমাবিষ্ট হয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করে থাকি। ব্রাহ্মণ আমার মুখ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আমার হাত ও উরু এবং শূদ্র আমার পদদ্বয়। ঋগবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—এই চার বেদ আমার কাছ থেকেই উৎপন্ন হয়ে পুনরায় আমার মধ্যেই প্রবেশ করে। যাঁরা শমগুণ অবলম্বন করেন, সংযত যাঁদের আত্মা, যাঁরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যাঁদের কাম, ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতি কোন কিছুই নেই, যাঁরা সঙ্গহীন, নিষ্পাপ, নিরহঙ্কার, সে-রকম ব্রাহ্মণেরা তন্ময় ভাবনায় আমারই উপাসনা করেন। আমিই 'সম্বর্তক' নামক জ্যোতি, সম্বর্তক নামক অগ্নিও আমি। আমিই সম্বর্তক নামক সূর্য এবং সম্বর্তক নামক বায়ু। ওই যে আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী দেখছ, এদের তুমি আমার রোমকূপ বলেই জানবে। সমুদ্র, চার দিক, বসন, শয়ন, নিলয়, কাম, ক্রোধ, আনন্দ, ভয় ও মোহ—এ সবই আমার রূপ। মানুষ যে সত্য, দান, কঠোর তপস্যা ও সমস্ত প্রাণীতে অহিংসা প্রভৃতি কাজের দ্বারা মঙ্গল লাভ করে, আমিই তার মূল কারণ। পৃথিবীর সব শরীরধারী প্রাণীই আমার নিয়ম মেনে চলে। আমার মায়াতেই তাদের তত্ত্ববিজ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে। যারা ভালো ভাবে বেদ অধ্যয়ন করেন এবং বিবিধ যজ্ঞের অর্চনা করেন, সেই শান্তচিত্ত, জিতক্রোধ ব্যক্তিরা আমাকেই লাভ করে থাকেন। যারা দুষ্কর্ম করে, তারা আমায় কখনো লাভ করতে পারে না। তাছাড়াও যারা লোভে অভিভূত, কৃপণ ও অনার্য তারা আমায় লাভ করতে পারে না। যোগী পুরুষেরা আমাকেই লাভ করে থাকেন, পরন্তু যারা বিমূঢ় ব্যক্তি তারা আমাকে পায় না। পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাবল্য ঘটবে, তখনই আমি পৃথিবীতে আবির্ভূত হব। যখন দৈত্যগণ হিংসাপরায়ণ হয়ে দেবতাদের অবধ্য হয়ে উঠবে এবং দারুণ প্রকৃতির রাক্ষসেরা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবে, তখন আমি পুণ্যবান ব্যক্তিদের বাড়িতে মানুষের দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করব। আমিই দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস ও চরাচর সমগ্র বস্তু ও প্রাণী সৃষ্টি করে আবার নিজেরই মায়ায় সে সব নষ্ট করে থাকি। ধর্ম ও মর্যাদা স্থাপনের জন্য আমিই মানুষের দেহ ধারণ করি। পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আমি যে মূর্তি ধারণ করি তা সত্যযুগে সাদা, ত্রেতায় শ্যাম, দ্বাপরে লাল ও কলিতে কালো রঙের। এই কলি যুগে অধর্ম, অসত্য ও অন্যায়ের প্রাবল্য বেশী। পৃথিবীর ধ্বংসের সময় হলে আমিই অতি দারুণ কাল হয়ে একাকী সমস্ত বিশ্বচরাচর সংহার করে থাকি। সমগ্র বিশ্বের আত্মা আমিই, আমি সর্বত্র গমন করি, আমিই অনন্ত, হৃষীকেশ; সমগ্র বিশ্ব আমার পদসঞ্চারে আহত হয়। আমিই কালচক্রের প্রবর্তন করে থাকি; আমি ব্রহ্মস্বরূপ।

আত্মাই সমগ্র বিশ্বের নিখিল প্রাণীবর্গে অনুস্যূত হয়ে আছে। ভক্তেরা আমায় ভক্তিভরে পূজা করে থাকে। যে সব কণ্টকর অবস্থার মধ্যে তোমার দিন কেটেছে তা পরিণামে তোমার পক্ষে ভালোই হবে। আমিই শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী নারায়ণ। যত পর্যন্ত না হাজারটা যুগ অতিক্রান্ত হচ্ছে, তত দিন আমিই সমগ্র বিশ্বকে মোহিত করে রাখি। ব্রহ্ম প্রবুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি শিশুরূপে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করি। আমিই বিষ্ণুরূপধারী ব্রহ্ম ; তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তোমায় বরদান করছি। আমার উদরে প্রবেশ করে তুমি সমস্ত পৃথিবী দেখেছ ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব কি তখনো তা তোমার জানা ছিল না ; আমি তোমায় আমার মুখবিবর দিয়ে শীগগিরই বের করে দিই। আমার এই আত্মতত্ত্ব দেবতা এবং অসুরদের দুর্জ্ঞেয় হলেও তোমার কাছে আমি তা প্রকাশ করলাম। সেই মহাতপা ব্রহ্মা যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হন, ততক্ষণ তুমি এখানে বিশ্বস্ত ভাবে সুখে বিচরণ কর। তারপর যখন সেই পিতামহ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হবেন, তখন আমি একাই সমস্ত সৃষ্টি আবার বিস্তার করব।

তারপর হাজার যুগ পেরিয়ে গেলে মার্কণ্ডেয়কে বিষ্ণু পুনরায় বললেন—তুমি যে অভীষ্ট বস্তু লাভ করবার জন্য, আমার স্তব করেছ তা আমার কাছে এখন প্রকাশ কর। আমি তোমার অভীষ্ট পূরণ করব। তবে তোমায় আমি আশীর্বাদ করি, তুমি আরো দীর্ঘায়ু হও।

ভগবান বিষ্ণুর কথা শুনে পরম আনন্দিত মার্কণ্ডেয় তাঁকে প্রণাম করে বললেন—তোমার রূপ আমি প্রত্যক্ষ করলাম। তোমায় দেখে আমার মোহ দূরীভূত হল। তোমার অনুগ্রহে লোকের মঙ্গলের জন্য এই পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শৈব ও বৈষ্ণবদের বিবাদ-প্রতিষেধক একটি শিবমন্দির নির্মাণ করতে ইচ্ছা করেছি। এখানে শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে, লোকে জানতে পারবে যে, শিব ও বিষ্ণু আলাদা নন : এঁরা বস্তুত একই।

সমস্ত কথা শুনে ভগবান জগন্নাথ মার্কণ্ডেয়কে বললেন—তুমি অতি উত্তম প্রস্তাব করেছ। আমার আদেশে লোকের আরাধনার জন্য পরম কারণ ভুবনেশ্বর দেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর। শিবকে এখানে স্থাপিত করলে আমাকেও স্থাপিত করা হবে। বিষ্ণু ও শিব—এ উভয়ের মধ্যে বস্তুত কোন পার্থক্য নেই। একই মূর্তি শুধু দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। যিনি রুদ্র, তিনিই স্বয়ং বিষ্ণু ; আর যিনি বিষ্ণু তিনিই মহেশ্বর। বাতাস ও আকাশের মতো তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মূঢ় ব্যক্তি জানে না যে, গরুড় যাঁর বাহন, বৃষও তাঁরই বাহন এবং তিনিই ত্রিপুর নামক অসুরের হত্যাকারী ত্রিলোচন। তোমারই নামে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উত্তর দিকে একটি হ্রদ খনন কর। ওই হ্রদ মার্কণ্ডেয় নামে বিখ্যাত হবে। ওই মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান করলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

মার্কণ্ডেয়কে এই কথা বলে ভগবান বিষ্ণু তখনই অদৃশ্য হলেন।

—'মার্কণ্ডেয়ের শ্রীভগবদ্দর্শন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ সাতান্ন

ব্রহ্মা তারপর মুনিদের পঞ্চতীর্থবিধি এবং ওই সব তীর্থে গিয়ে স্নান, দান ও মূর্তিদর্শন করলে যে ফল হয়, তা বলতে আরম্ভ করলেন। তীর্থসেবী মানুষ প্রথমত মার্কণ্ডেয় হ্রদে

গিয়ে উত্তর দিকে মুখ করে তিন বার তাতে ডুব দেবে এবং 'সংসারসাগরে মগ্নং' এই মূল মন্ত্র পাঠ করবে। স্নান করার পর নাভি পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বিধিমতো দেবতা ও ঋষিদের এবং তিলোদক দিয়ে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করে পুনরায় স্নান করবে। তারপর আচমন করে সেখান থেকে শিবমন্দিরে যাবে। শিবমন্দিরকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে মূলমন্ত্রে মার্কণ্ডেয়েশ্বরকে পূজা করবে। 'ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু' (ত্রিলোচন, তোমাকে নমস্কার জানাই) এই মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর করুণা ভিক্ষা করবে। এভাবে মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান করে শিবের দর্শন করলে মানুষ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে থাকে এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে শিবলোকে উপস্থিত হয়। সেখানে অনেক দিন সুখে বাস করার পর পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের বাড়িতে জন্মলাভ করে এবং শৈব যোগ অবলম্বন করে মোক্ষ লাভ করে। তারপর ওই বিশাল বটগাছের কাছে গিয়ে, তাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে 'ওঁ নমো ব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়কারিণে' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করবে। ওই বটগাছ কল্পতরু নামে বিখ্যাত। যে ওই কল্পবটগাছকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করে, সে খোলস-খসা সাপের মতো সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। যে কেবলমাত্র ওই বটগাছের ছায়া স্পর্শ করে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্তি পেতে পারে। কৃষ্ণাঙ্গ থেকে উৎপন্ন, ব্রহ্মতেজোময় ওই বটগাছের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বিষ্ণুকে প্রণাম করলে, লোকে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও বেশী ফল লাভ করে এবং নিজের বংশ উদ্ধার করে বিষ্ণুলোক লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের বাহন বিনতার পুত্র গরুড়কে প্রণাম করলে, মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। বটগাছ ও গরুড়কে দর্শন করে যে পুরুষোত্তম, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, সে পরম গতি লাভ করে থাকে। বিষ্ণুমন্দিরকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে উপযুক্ত মন্ত্রে বলরামের পূজা করবে। তারপর 'নমস্তে হলধৃক্ রাম' এই মন্ত্রে বলরামের করুণা ভিক্ষা করবে। এভাবে অনন্ত, অজেয় কৈলাসশিখরের মতো আকৃতিবিশিষ্ট, চাঁদ থেকেও দেখতে মনোরম, নীল কাপড় পরিধানকারী, কুণ্ডলমণ্ডিত ও মহাবলশালী রোহিনীনন্দন বলরামকে ভক্তিভরে প্রসন্ন করলে মানুষ অভিমত ফল লাভ করে এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। তারপর বহুকাল সেখানে সুখভোগ করে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় ইহলোকে এসে যোগীদের বংশে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে দুর্লভ মুক্তি লাভ করে।

তারপর সুসমাহিত হয়ে বারো অক্ষরযুক্ত মন্ত্রে পুরুষোত্তম দেবের অর্চনা করবে। যে সব ধীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ভক্তিভরে সেই মন্ত্রে পুরুষোত্তমকে অর্চনা করেন, তাঁরা মোক্ষলাভ করে থাকেন। তাঁরা যে গতি লাভ করেন, দেবতারা, যোগীরা, সোমপায়ী ব্যক্তিরা সে-গতি কখনো লাভ করতে পারে না। সেই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে ভক্তিভরে গন্ধ ও পুষ্প সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে 'জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ' ও 'জয় সর্বাঘনাশন' প্রভৃতি মন্ত্রে তাঁর করুণা প্রার্থনা করবে। এভাবে ভক্তবৎসল, সমস্ত কামনা পূরণকারী ও বনমালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলে ও দণ্ডবৎ প্রণাম করলে হাজারটা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। সমস্ত তীর্থে স্নান করলে ও সমস্ত দ্রব্য দান করলে, যে ফল লাভ করা যায় একমাত্র কৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করলেই সেই ফল লাভ করা যায়। প্রচুর রত্ন ও সোনা দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ করলে, সব রকমের দান, ব্রত ও নিয়ম আচরণ করলে, কঠোর তপস্যা করলে, ব্রহ্মচর্য পালন করলে, বাণপ্রস্থ পালন করলে, যথাবিধি সন্যাস পালন করলে, মানুষ যে ফল লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করলে, সেই সমস্ত ফলই পাওয়া যায়। ভক্তিভরে

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেই মানুষের সুনিশ্চিতভাবে মোক্ষলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেই মানুষ কোটিজন্মের পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং নিজের একুশ কুলকে উদ্ধার করে উজ্জ্বল বিমানে বিষ্ণুপুরে উপনীত হয়ে থাকে। পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে সর্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে পরে বৈষ্ণব জ্ঞান লাভ করে এবং মুক্তি পায়। তারপর উপযুক্ত মন্ত্রে ভক্তবৎসল সুভদ্রা দেবীকে পূজা করবে এবং 'নমস্তে সর্বগে দেবি' প্রভৃতি মন্ত্রে তাঁর করুণা প্রার্থনা করবে। এভাবে সুভদ্রার পূজা করলে মানুষ বিষ্ণুপুরে গমন করে এবং পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে। তারপর বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করে মোক্ষলাভ করে।

—'কৃষ্ণদর্শনমাহাত্ম্য' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ আটান্ন

এভাবে বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে দর্শন ও প্রণিপাত করে মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভ করে থাকে। যেখানে বালির নীচে ইন্দ্রনীলময় বিষ্ণু অবস্থান করছেন, সেখানে নমস্কার করলে, মানুষ বিষ্ণুপুরে উপনীত হয়। যিনি অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন, সেই নরসিংহ মূর্তি ভগবান সেখানে অবস্থান করছেন। সেই নরসিংহদেবকে ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করলে মর্ত্যবাসী মানুষ, সমস্ত পাপ থেকে নিশ্চয় মুক্ত হয়। যারা নরসিংহের ভক্ত, তারা কামনা অনুযায়ী ফল লাভ করে। সুতরাং সমস্ত যত্নে তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কারণ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ফলের তিনিই একমাত্র প্রদাতা।

ব্রহ্মার কাছ থেকে নৃসিংহদেবের কথা শুনে মুনিরা তাঁকে অনুরোধ জানালেন, আপনার কাছ থেকে নৃসিংহদেবের মাহাত্ম্যের কথা শুনে, তাঁর কৃপায় ভক্তদের যে সব সিদ্ধি ঘটে থাকে, আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে সে সব কথা বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা সেই নৃসিংহদেবের কথা বলতে আরম্ভ করলেন—নৃসিংহরূপী বিষ্ণু অজিত, অপ্রমেয় ও মুক্তিদায়ক। তাঁর সব গুণ বর্ণনা করতে পারে, এমন ক্ষমতা কার আছে? তাহলেও সেই পবিত্র কথা আপনাদের অনুরোধে সংক্ষেপে বলছি। সমস্ত রকম সিদ্ধিই সেই নরসিংহদেবের অনুগ্রহে ঘটে থাকে। তাঁর অনুগ্রহেই সব জায়গায় যাওয়া যায়। পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই, যা সেই নৃসিংহদেবের অসাধ্য। তিনি যে ভাবে ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, সেই মঙ্গলকর বিধানের কথা বলছি। দেবতারাও যে কথা জানেন না, নৃসিংহদেবের সেই তত্ত্বকথা আপনাদের বলছি, শুনুন। যারা কৌপীন ধারণ করে, ধ্যাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে, কেবলমাত্র জল পান করে শাক, যব, ফল-মূল, তেলের তৈরি পিঠে প্রভৃতি দিয়ে অরণ্যে, নির্জন স্থানে, পর্বতে, সমুদ্র-সঙ্গমে, উর্বর জায়গায় কিংবা প্রসিদ্ধ নরসিংহ আশ্রমে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং যথাবিধি পূজা করে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে উপবাসী থেকে সংযত চিত্তে একলক্ষ বার নৃসিংহমন্ত্র জপ করেন, তাঁদের সব রকম পাপ নষ্ট হয়ে যায়। সেই নরসিংহকে প্রদক্ষিণ করে গন্ধদ্রব্য, ধূপ ও প্রদীপ সহকারে পূজা করবে। সাধক ব্যক্তি নৃসিংহদেবের মাথায় কর্পূর ও চন্দন মেশানো ফুল দিলে, সিদ্ধি লাভ করেন। ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা তাঁর তেজ সহ্য করতে সমর্থ হন না। সুতরাং দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, মানুষ,

বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতিরা যে একেবারেই অক্ষম, সে-কথা বলাই বাহুল্য। অসুরদের উপদ্রব নিবারণের জন্য যাঁরা এই নৃসিংহমন্ত্র জপ করেন, তাঁদের দেখলেই অসুরেরা বিনষ্ট হয়ে যায়। নৃসিংহ কবচ একবার মাত্র জপ করলে সমস্ত উপদ্রব প্রশমিত হয়ে যায়, দু'বার জপ করলে দেবতা ও দানবদের উপদ্রব নিবারিত হয়ে যায়। তিনবার নৃসিংহকবচ জপ করলে সমস্ত বাধাই দূর হয়ে যায়। এমন কি, এই কবচ জপ করলে বারো যোজনের মধ্যেও দেবতা ও দানবদের কোন উপদ্রব থাকে না। মহাবলশালী ভগবান নৃসিংহদেব স্বয়ং সে-সব স্থান রক্ষা করে থাকেন।

তারপর গর্তের মুখে গিয়ে তিন রাত উপবাস করে, দু'শো পলাশ কাঠ বষট্‌কার মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রজ্বলিত আগুনে আহুতি দেবে। এ রকম করলে তখনই গর্তের মুখ খুলে যাবে। তখন নৃসিংহকবচধারণকারী বিচক্ষণ সাধক নির্ভয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করবেন। প্রবেশ পথে তাঁর কোন বাধা বিঘ্ন থাকবে না। তখন সাধক এক বিস্তীর্ণ পথ দেখতে পাবেন। নৃসিংহদেবকে স্মরণ করে, সেই পথে পাতালে প্রবেশ করবেন এবং সেখানে গিয়ে অব্যর নরসিংহমন্ত্র জপ করবেন। তখন হাজার হাজার মেয়ে বীণা বাজাতে বাজাতে সাধককে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবে এবং তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে যাবে এবং দিব্যরসায়ন পান করাবে। সেই রসায়ন পান করলে সাধক তখন মহাবলশালী ও দিব্যদেহধারী হয়ে প্রলয়কাল পর্যন্ত রমণীদের সঙ্গে সুখে বাস করবেন এবং দেহত্যাগ করে বাসুদেবে বিলীন হয়ে যাবেন। যদি সাধক সেখানে থাকতে না চান, তাহলে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। এবং পট্ট, শূল, খড়্গ, মণি, রস, রসায়ন, পাদুকা, অঞ্জন, কৃষ্ণাজিন, কমণ্ডলু, অক্ষসূত্র, সঞ্জীবনী দণ্ড, সিদ্ধবিদ্যা ও শাস্ত্রসমূহ গ্রহণ করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা পরিবৃত ও ত্রিশূলাকার নৃসিংহমন্ত্র একবার মাত্র জপ করলেই তাঁর কোটি জন্মের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। ওই নৃসিংহমন্ত্র বিষে ন্যস্ত করলে বিষ নষ্ট হয় এবং দেহে ন্যস্ত করলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়ে যায়। সাধক নিজের শরীরে ওই মন্ত্র ন্যস্ত করলে ভ্রূণহত্যার পাপও নষ্ট হয়ে যায়। গ্রহের দশা থাকলে ওই মন্ত্র হৃদয়মধ্যে উজ্জ্বলভাবে রয়েছে বলে মনে করবে। এ রকম করলে সেই গ্রহ শীগগিরই নষ্ট হয়ে যাবে। শিশুদের গলায় ওই কবচ যদি বেঁধে দেওয়া হয়, তবে তাদের রক্ষা-বিধান করা হয় এবং গণ্ড পিণ্ডক প্রভৃতি যাবতীয় শিশুরোগ শীগগিরই নষ্ট হয়ে যায়। যদি রোগ উৎপন্ন হয়, তাহলে একমাস ধরে প্রতি দিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় ঘি ও ক্ষীর সমিধের সঙ্গে মিশিয়ে হোম করলে, এতেই সমস্ত রোগ নষ্ট হয়ে যাবে। এই মন্ত্রের প্রভাবে পৃথিবীতে অসাধ্য কিছুই থাকে না।

সাধক ব্যক্তি উইয়ের ঢিপি, শ্মশান এবং চতুষ্পথে সাত মুঠো মাটি নিয়ে তা লাল চন্দনের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। তারপর গোরুর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সেই মাটি দিয়ে ছ' আঙুল প্রমাণ প্রতিমা নির্মাণ করে একশো আটবার সেই নৃসিংহপ্রতিমাকে পুজো করবেন। ভূর্জপাতায় রোচনা দিয়ে নরসিংহমন্ত্র লিখে কবচ আকারে গলায় ধারণ করে মন্ত্রজ্ঞ সাধক জলাশয়ের মধ্যে নৃসিংহদেবের মন্ত্র যদি অসংখ্যবার জপ করেন, তবে মুহূর্তের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবী জলপ্লাবিত হতে পারে। অথবা শুকনো গাছের আগায় যদি নৃসিংহ-দেবকে পুজো করা হয় এবং একশো আট বার তাঁর মন্ত্র জপ করা হয়, তাহলে সাধক বৃষ্টিপাত নিবারিত করতে পারেন। সাধক যদি ওই মন্ত্র পিঞ্জরে আবদ্ধ করে ভ্রমণ করান, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়। আবার ওই মন্ত্র সাতবার জপ করে, কণ্ঠে ধারণ করে সাধক যদি নৃসিংহপ্রতিমা ও জল দিয়ে কারো বাড়ির দোরগোড়া

খোঁড়েন, তবে তার বংশ অচিরেই বিলুপ্ত হবে এবং পুনরায় তা তুলে নেওয়া হলে শান্তি স্থাপিত হবে। অতএব এই প্রভাবশালী নরসিংহদেবকে ভক্তিভরে পুজো করা দরকার। তাঁকে পুজো করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। যারাই নৃসিংহদেবের পুজো করে, তারাই কোটি জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হয়। নৃসিংহদেবের উপাসকের কাছে কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না। নৃসিংহদেবের পুজো করলে মানুষ রাজ্য, স্বর্গ এবং এমন কি, মোক্ষ পর্যন্ত পেতে পারে। একবার মাত্র তাঁকে দর্শন করলেই মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। সংগ্রামে, বিপদে, দুর্গম প্রদেশে এবং অন্যান্য সমস্ত রকম উপদ্রবে নরসিংহদেবকে স্মরণ করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, তেমনি নৃসিংহদেবকে দর্শন করলে সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হয়ে যায়। সেই নৃসিংহদেবকে দেখে ভক্তিভরে পুজো করলে এবং প্রণাম করলে একশোটা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। তিনি অমর ও অজর হন। পরিণামে উজ্জ্বল বিমানে একুশ কুলের উদ্ধার সাধন করে সাধক বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়ে থাকেন। সেখানে অনেক দিন সুখে বাস করার পর পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে বেদবিদ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে বৈষ্ণবযোগ অবলম্বনে মোক্ষলাভ করেন।

—'নরসিংহমাহাত্ম্যবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ ঊনষাট

মানুষমাত্রই 'অনন্ত' নামক বাসুদেবকে দর্শন ও ভক্তিভরে প্রণাম করলে, সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরম পদ লাভ করে। প্রথমে আমি এঁকে আরাধনা করি ; পরে ইন্দ্র, তারপর বিভীষণ ও রামচন্দ্র এঁকে আরাধনা করেন। যে শ্বেতগঙ্গায় স্নান করে পরে শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধবকে দর্শন করে, তার শ্বেতদ্বীপে গতি হয়ে থাকে।

ব্রহ্মার কথা শুনে মুনিরা তাঁকে অনুরোধ করলেন—আপনি শ্বেতমাধবের মাহাত্ম্য ও তাঁর প্রতিমার কথা বিস্তৃতরূপে আমাদের বলুন। সেই পৃথিবী বিখ্যাত পবিত্র ক্ষেত্রে শ্বেতমাধব দেবকে কে স্থাপন করেছিলেন, সে-কথাও আমাদের দয়া করে বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা সেই শ্বেতমাধব দেবের পবিত্র কথা বলতে আরম্ভ করলেন—পুরাকালে সত্যযুগে শ্বেত নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন ; তিনি বুদ্ধিমান, ধর্মজ্ঞ বীর, সত্যসন্ধ ও দৃঢ়ব্রত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মানুষের দশ হাজার বছর পরমায়ু ছিল। শিশুকালে কেউই তখন মারা যেত না। এভাবেই দিন কাটছিল। একবার কপালগৌতম নামে একজন পরম ধার্মিক ঋষির একটি পুত্র জন্মায়। সে তার দাঁত ওঠার আগেই মারা যায়। ঋষি সেই মৃত সন্তানকে নিয়ে রাজা শ্বেতের কাছে গেলেন। মুনির কাছ থেকে সব কথা শুনে সেই মৃত বালকের সামনে রাজা এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি যদি সাত রাতের মধ্যে ওই বালকের জীবন ফিরিয়ে দিতে না পারেন, তাহলে জ্বলন্ত আগুনে তিনি প্রাণ ত্যাগ করবেন। এ রকম প্রতিজ্ঞা করে রাজা এক হাজার একশো নীল পদ্ম দিয়ে মহাদেবের পুজো করে শিব-মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। তাঁর পুজায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং মহাদেব উমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা দেখলেন যে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহাদেব—সারা গায়ে ছাই মাখা, শরৎকালের চন্দ্রের মতো তাঁর দেহ সৌন্দর্য তাঁর পরিধানে রয়েছে বাঘের চামড়া। তাঁকে দেখে রাজা প্রণাম করে বললেন—আমার উপর

আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার প্রার্থনা, আমার রাজ্যে যে ব্রাহ্মণ বালক মারা গেছে, তাকে আপনি বাঁচিয়ে দিন এবং শুধু তাই নয়, তাকে যথাযোগ্য আয়ু প্রদান করে তার যাতে মঙ্গল হয়, সে ব্যবস্থা করুন।

রাজা শ্বেতের কথা শুনে মহাদেব আনন্দিত হলেন এবং যমদূত কালকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন ঋষিকুমারকে বাঁচিয়ে দেন। মহাদেবের কৃপায় ঋষিকুমার বেঁচে উঠল। এভাবেই রাজা শ্বেত তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

মুনিরা তখন ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন—আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনি দয়া করে শ্বেতমাধবের পরম তথ্য খুলে বলুন। সে-কথা শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

ব্রহ্মা তখন মুনিদের বললেন—আপনাদের প্রশ্ন অনুসারে সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলজনক মাধবমাহাত্ম্য বর্ণনা করছি। এই মাহাত্ম্যকথা সমস্ত পাপ নষ্ট করে। এই পবিত্র মাহাত্ম্য-কথা শুনলে মানুষ তার অভিমত কামনা লাভ করে থাকে। পুরাকালে ঋষিরাও এই পবিত্র কথা শুনেছেন। সেই মহান রাজা শ্বেত হাজার বছর রাজত্ব করে বিবিধ বৈদিক ও লৌকিক কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তিনি কেশবের আরাধনায় ব্রত অবলম্বন করে অবস্থান করেন, তারপর দক্ষিণ সাগরের তীরস্থ পরমক্ষেত্র পুরুষোত্তমে এসে পৌঁছান। তিনি সেখানে পবিত্র ও রমণীয় দেশে জগন্নাথ মন্দিরের কাছেই শুভলক্ষণযুক্ত ও একশো ধনুক পরিমাণ স্থানে বিস্তৃত একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। জগন্নাথের দক্ষিণ দিকে এই প্রাসাদ শ্বেতপাথরে নির্মিত হল। রাজা শ্বেত চাঁদের মতো সাদা মাধবমূর্তি নির্মাণ করিয়ে সেই প্রাসাদের মধ্যে যথাবিধি তাঁর প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও অন্যান্য তপস্বীদের বহু ধন দান করলেন। তারপর রাজা শ্বেত মাধবকে প্রণাম করে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করতে লাগলেন এবং সমাধিযোগে মৌনী হয়ে একমাস ধরে অনাহারে থেকে বিষ্ণুর ধ্যানে রত হলেন। জপ শেষ করে তিনি মাধবকে স্তব করতে লাগলেন—তুমি বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ; তোমাকে আমি নমস্কার জানাই। যিনি বিশ্বরূপ, বিধাতা, নির্গুণ, পবিত্র, তর্কের দ্বারা যাঁকে লাভ করা যায় না—তাঁকেও আমি বারংবার নমস্কার জানাই। যাঁর নাভিতে পদ্ম, পদ্মগর্ভ থেকে যাঁর জন্ম, পদ্মের মতো যাঁর বর্ণ, যাঁর হাতে পদ্ম শোভা পায়, তাঁকে আমি বারবার নমস্কার জানাই। যাঁর হাজারটা চোখ, হাজারটা পা ও হাজারটা হাত রয়েছে এবং নিজেই যজ্ঞস্বরূপ, তাঁকে আমি বারবার নমস্কার করি। বরাহরূপধারী, বরদানকারী, মূর্তিমান, শ্রেষ্ঠ, বরণীয়, শরণযোগ্য, অচ্যুত, বালক-রূপধারী, নবোদিত সূর্যের মতো দীপ্তিমান, ধীমান, কেশব, মাধব ও গোবিন্দকে আমি বারংবার নমস্কার করি। যিনি বিষ্ণু, মধুসূদন, শুদ্ধ, অনন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিবিক্রম, পীতবসন পরিধানকারী, সৃষ্টিকর্তা, বামনরূপধারী, বামনের মতো কাজ যিনি করেন, বামনের মতো যাঁর চোখ, বামনকে যিনি বহন করেন, অব্যক্ত সংসার-সাগরের তরণী, প্রশান্ত, শিব, সৌম্য, রুদ্র, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, ধ্বংসকর্তা, দিব্যরূপধারী, চন্দ্র ও সূর্য যাঁর চুল, গোরু ও ব্রাহ্মণের কল্যাণে যাঁর প্রাণ নিয়োজিত, যিনি স্বয়ং ঋক্, ঋকমন্ত্র যাঁকে স্তুতি করে, যিনি যজুঃমন্ত্রকে ধারণ করে থাকেন, যজুর্মন্ত্রের দ্বারা যাঁকে পুজো করা যায়, সৌভাগ্যের অধীশ্বর, সৌভাগ্য ধারণ করেন, তাঁকে প্রণাম জানাই। যোগীরা যাঁকে অনন্যমনা হয়ে চিন্তা করেন, যিনি সামরূপ, সামযোগবিদ, সামযজ্ঞে অভিজ্ঞ, অথর্ববেদ যাঁর মাথা, যিনি স্বয়ং অথর্ব স্বরূপ, অথর্ব যাঁর পা, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যকে যিনি বধ করেন,

সমুদ্রজলে যিনি শয়ন করেন, বেদের সংকলন যিনি করেন ও হৃষীকেশ, তাঁকে আমি বারংবার নমস্কার জানাই। দেবতারা যাঁর স্তব করেন, যিনি বসুকর্তা, যোগী, সবেগে যিনি লাঙ্গল ধারণ করেন, যিনি জ্ঞানীদেরও জ্ঞান, তাঁকে আমি নমস্কার করি। তুমি ছাড়া নরক থেকে উদ্ধার করতে পারে, এমন কোন বন্ধুই নেই। তুমি প্রণত ব্যক্তির প্রতি দয়া করে থাক ; তোমার চরণে আমি আশ্রয় নিলাম। আমি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে তোমারই আশ্রয় নিয়েছি। এই সংসারকে আমি আপদ ও দুঃখবহুল বলে মনে করি। সংসারে থেকে ত্রিবিধ তাপে সর্বদাই আমি কষ্ট পাচ্ছি। তোমারই মায়ায় এই সমগ্র জগৎ বিমোহিত হয়ে রয়েছে। যা যা করলে তোমাতে চিত্ত নিবিষ্ট হয় এবং ফলহীন সুখ লাভ করা যায়—সে-সব কাজই আমি এখন করতে চাই। আমার বিবেক নষ্ট হয়েছে ; আমি নিজেও নষ্ট হয়েছি। আমায় তুমি সংসার থেকে রক্ষা কর। তুমি ছাড়া আমাকে উদ্ধার করবার আর কেউ নেই।

রাজা শ্বেতের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে সেই বটগাছের কাছে এলেন। সেই সময়ে তাঁর আকৃতি ছিল নীল মেঘের মতো শ্যাম, চোখ পদ্মপাতার মতো আয়ত, হাতে সুদর্শন চক্র শোভা পাচ্ছিল ; অথচ তাঁকে দেখতে ক্ষীরোদ সমুদ্রের মতো সাদা, চাঁদের মতো নির্মল এবং তাঁর বাঁ-হাতে ছিল পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ। তিনি গরুড়বাহনে সমাগত, গদা ও অসিধারী। তিনি রাজা শ্বেতকে বললেন,—তোমার শুভ বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।

ভগবান বিষ্ণুর কথা শুনে তাঁকে প্রণাম করে রাজা শ্বেত বললেন—আমি যে আজ বিষ্ণুভক্তদের মধ্যে অন্যতম হতে পেরেছি, সেজন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি। যে বৈষ্ণব-পদ ব্রহ্মভবনেরও উপরে বিরাজ করে এবং যা অব্যয়, শুদ্ধ, নির্মল ও সংসার সঙ্গবর্জিত ; আপনার অনুগ্রহে আমি সেই পদ লাভ করতে ইচ্ছা করছি।

রাজা শ্বেতের প্রার্থনার উত্তরে ভগবান বিষ্ণু বললেন—দেবতারা, মুনি-ঋষিরা ও সিদ্ধ যোগীরা যে পদ লাভ করতে পারেন না, সেই অনাময়, ও পরম মনোরম পদ তুমি লাভ করবে। এখন তুমি রাজ্যসুখ ভোগ কর ; পরে সমস্ত লোক অতিক্রম করে বিষ্ণুলোকে যাবে। শোন শ্বেত, ত্রিভুবনে তোমার কীর্তি বিস্তৃত হবে এবং এখানে আমি সর্বদাই থাকব। দেবতা এবং দানবেরা শ্বেতগঙ্গার নাম গান করবেন। এই শ্বেতগঙ্গার জল এক ফোঁটাও যারা স্পর্শ করবে, তাদের স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত। যারা এই চাঁদের মতো সৌন্দর্য-বিশিষ্ট ও পাপনাশক 'মাধব' নামক বিষ্ণু মূর্তিকে একবারও ভক্তিভরে প্রণাম করবে, তারা সমস্ত লোক পরিত্যাগ করে বিষ্ণুলোকেই পূজিত হবে। সেখানে মন্বন্তর কাল পর্যন্ত বিপুল সুখ ভোগ করবে। তারপর পুণ্যক্ষয়ে সেখান থেকে মর্ত্যলোকে এসে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করবে। সে তো মৃত্যুর পরের কথা। এ জন্মে সে ধনধান্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। সে রূপবান, ভাগ্যবান ও পুত্র পৌত্রে পরিবেষ্টিত হয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। পরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এসে এই বিখ্যাত বটগাছের নীচে বা সাগরজলে হরির ধ্যান করে দেহ পরিত্যাগ করবে এবং শান্ত পদ লাভ করবে।

—'শ্বেতমাধবমাহাত্ম্য বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ ষাট

ব্রহ্মা মুনিদের পুরাকালের কথা বলে চললেন—পুরাকালে পৃথিবী যখন জলময় ছিল, তখন যিনি রুইমাছের রূপ ধারণ করেছিলেন, এবং বেদ উদ্ধারের জন্য যিনি রসাতলে বাস করেন, সেই প্রথম অবতার মাছরূপী মাধব ওই শ্বেতমাধবের কাছেই এক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। শ্বেতমাধবকে দর্শন করে, তাঁর প্রতিষ্ঠা স্থান সম্যকরূপে চিন্তা করে তাঁকে প্রণাম করলে মানুষ সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পায় এবং যেখানে স্বয়ং হরি বিরাজ করেন, শেষে সেখানেই উপনীত হয়ে থাকে। পরে পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে। অবশেষে বৈষ্ণবযোগ অবলম্বনে মোক্ষলাভ করে। এই মৎস্য-মাধবকে দর্শন করলেই মানুষ সমস্ত কামনা লাভ করে থাকে।

ব্রহ্মার কাছ থেকে মৎস্য-মাধবের কথা শোনার পর মুনিরা তাঁকে অনুরোধ করলেন—আমরা আপনার কাছ থেকে এখন মার্জনবিধি শুনতে চাই। সাগরজলে স্নান করে দান প্রভৃতি করলে যে অশেষ ফল লাভ করা যায়, তা দয়া করে আমাদের বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা মার্জনবিধি বলতে আরম্ভ করলেন। পুণ্যকামী মানুষ সবার আগে ভক্তিভরে মার্কণ্ডের হ্রদে স্নান করবে। বিশেষ করে, চতুর্দশী তিথিতে ঐ হ্রদে স্নান করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। সমুদ্রস্নান অবশ্য সব সময়েই করা উচিত। পূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্রে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। মার্কণ্ডের হ্রদ, অক্ষয়বট, কৃষ্ণবলরাম, মহাসমুদ্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—এই পাঁচটির নাম পঞ্চতীর্থ। জ্যেষ্ঠ মাসের জ্যেষ্ঠা নামক নক্ষত্রযোগে পূর্ণিমা তিথিতে তীর্থশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমে গমন করবে। এই সময় তীর্থযাত্রায় বাক্য, মন ও দেহ শুদ্ধ হয়, মনের একাগ্রতা জন্মায় এবং তীর্থসেবী মানুষ সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রোধ পরিত্যাগ করেন। সেই সুন্দর কল্পতরুর কাছে গিয়ে বটরূপী বিষ্ণুকে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে। সেই কল্প বটগাছ দর্শন করলে সাত জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং বিপুল পুণ্য ও ইষ্টগতি লাভ করা যায়। সেই কল্প বটের প্রত্যেক যুগে যে যে নাম, প্রমাণ ও সংখ্যা হয়, তা যথাক্রমে বলছি। চার যুগে ওই বটগাছের যে যে নাম হয়, তা হল—বট, বটেশ্বর, কৃষ্ণ ও পুরাণ পুরুষ। চার যুগে তার পরিমাণ হয় যথাক্রমে, এক যোজন, যোজনের এক পাদ কম, যোজনের অর্ধেক এবং ওই অর্ধেকেরও অর্ধেক বলে নির্দিষ্ট। যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই কল্প বটগাছকে নমস্কার করবে। তারপর দক্ষিণদিকে তিনশো ধনুক ব্যবধানে যেতে হয়। সেখানে ভগবান বিষ্ণু, মনোরম স্বর্গদ্বার ও সাগরজলসম্পৃক্ত সেই সমস্ত গুণযুক্ত কাঠ দেখা যায়। তারপর বিষ্ণুকে পুজো ও প্রদক্ষিণ করলে সমস্ত পাপ থেকে এবং সমস্ত অশুভ গ্রহের দৃষ্টি থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তারপর উগ্রসেনকে দর্শন করে স্বর্গদ্বার পথে সাগরে গিয়ে আচমন করে পবিত্রভাবে পরমপুরুষ নারায়ণকে ধ্যান করবে। তারপর নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্র হাতে ও সমস্ত শরীরে ন্যাস করবে। মনীষীদের মতে নারায়ণের ওই অষ্টাক্ষর মন্ত্র—'ওঁ নমো নারায়ণায়।' অন্যান্য অনেক মন্ত্র আছে ঠিকই, কিন্তু ওই মন্ত্রই সর্বার্থসাধক। জল নরের পুত্র বলে 'নারা' নামে বিখ্যাত। পূর্বে ভগবান বিষ্ণুর জলেই অয়ন বা গতি ছিল বলে তাঁর নাম হয় 'নারায়ণ'। সমস্ত বেদ, সমস্ত ব্রাহ্মণ, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত কর্ম, পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, বাতাস ও মন সমস্তই নারায়ণ পরায়ণ ; নারায়ণকে পরমগতি রূপে আশ্রয় করে।

অহঙ্কার ও বুদ্ধি—উভয়ই নারায়ণকে আশ্রয় করে রয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরম বস্তু—সমস্তই নারায়ণপরায়ণ। জলে, স্থলে, পাতালে, স্বর্গলোকে, আকাশে ও পর্বতে—সর্বত্রই নারায়ণ বিরাজ করেন। ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু ও প্রাণীতে নারায়ণ অনুস্যুত হয়ে রয়েছেন। জল এবং জলপতি—উভয়ই সেই নারায়ণের আয়তন, আশ্রয়। অতএব পাপহরণকারী নারায়ণকে জলের মধ্যে সর্বদাই স্মরণ করবে। বিশেষত শুদ্ধ হয়ে স্নান করার সময় নারায়ণকে পূজা করে তাঁকেই হাতে ও দেহে বিন্যস্ত করবে। যেমন—অঙ্গুষ্ঠে, দুই হাতে, ওঙ্কার ও ন কার এবং তর্জনী থেকে অন্যান্য আঙুলে অন্যান্য বর্ণ বিন্যস্ত করতে হবে। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মূলমন্ত্র যথাক্রমে বিন্যস্ত করতে হবে। যেমন—বাঁ পায়ে ওঙ্কার, ডান পায়ে 'ন' কার, বাঁ কোমরে 'মো' কার, ডান কোমরে 'না' কার, নাভিতে 'রা' কার, বাঁ হাতে 'য়' কার, ডান হাতে 'ণা' কার এবং মাথায় 'য়' কার বিন্যস্ত করবে। তারপর উপরে, নীচে, হৃদয়ে, পাশে, পিছনে ও সামনে নারায়ণকে ধ্যান করে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কবচ পাঠ করবেন। তিনি বলবেন—গোবিন্দ আমার পূর্ব দিকে, মধুসূদন দক্ষিণে, শ্রীধর পশ্চিমে, কেশব উত্তরে, বিষ্ণু অগ্নিকোণে, মাধব নৈর্ঋতে, হৃষীকেশ বায়ুকোণে, বামন ঈশানকোণে, বরাহ ভূতলে এবং ত্রিবিক্রম উপর দিকে রক্ষা করুন। এভাবে কবচ পাঠ করে 'আমিই শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণদেব' এভাবে নিজেকে চিন্তা করবে। এরপর এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে—তুমি দুপা বিশিষ্ট প্রাণীদের অগ্নি, উর্ধ্বরেতা, সমস্ত প্রাণীর প্রধান ও জীবদের অব্যয় প্রভু। তুমিই অমৃতের উপায় স্বরূপ, দেবযোনি ও জলপতি। তুমি আমার পাপ হরণ কর; আমি তোমায় নমস্কার করি। এই মন্ত্র উচ্চারণ করার পর স্নান ও আচমন করবে। সমুদ্রে এ ছাড়া অন্য রকম ভাবে স্নান করা প্রশস্ত নয়।

তারপর বৈদিক মন্ত্রে অভিষেক ও মার্জনা করে জলের মধ্যে থেকে তিনবার পাপনাশক অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করবে। অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন সমস্ত পাপ নাশ করে, অঘমর্ষণ সূক্তও তেমনি সমস্ত পাপনাশক। তারপর জল থেকে তীরে উঠে শুদ্ধ কাপড় পরে প্রাণায়াম, আচমন ও সন্ধ্যা-উপাসনা সমাপন করে সূর্যের আরাধনা করবে। সূর্যের আরাধনার জন্য একশো আট বার পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র ও অন্যান্য সূর্যবিষয়ক মন্ত্র জপ করবে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে নমস্কার করবে। তারপর পূর্ব দিকে মুখ করে বেদ পাঠ করবে এবং দেবতা, মানুষ, পিতা ও অন্যান্য প্রাণীদের নাম ও গোত্র উল্লেখ করে তিল মেশানো জল দিয়ে যথাবিধি তর্পণ করবে। প্রথমে দেবতার তর্পণ করলে পরে পিতৃ-তর্পণে অধিকার জন্মে। শ্রাদ্ধ ও হোম প্রভৃতি কাজ এক হাতেই করবে কিন্তু তর্পণ দুহাতে করবে। নাম ও গোত্র উল্লেখ করে বাম ও ডান হাত দিয়ে 'তৃপ্যতাম্' এই মন্ত্রে জল সেচন করবে। যে ব্যক্তি মোহবশে নিজের গায়ে তিল রেখে পিতৃতর্পণ করে, তার পিতৃগণ ত্বক, মাংস, রক্ত ও অস্থি দ্বারাই তর্পিত হয়ে থাকে। সুতরাং সে ভাবে কখনোই তর্পণ করা চলবে না। তাতে তিল মেশানো জল রক্তের মতো হয়ে যায় তর্পণকারীও পাপী হয়ে থাকে। তর্পণকারী যদি জলে থেকে মাটিতে জলদান করেন, তবে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাতে কারুরই তৃপ্তি হয় না। যে স্থলে থেকে জলে তর্পণ দান করে, সে দানও নিরর্থক হয়ে যায়। জলে থেকে পিতৃগণকে কখনো জল দান করবে না; পরন্তু পবিত্র তীরদেশে উঠে জল তর্পণ করবে। জলে, পাত্রে এবং মাটিতে তর্পণ করা নিষিদ্ধ। ক্রুদ্ধ হয়ে কিংবা এক হাত দিয়ে তর্পণ করা উচিত নয়। আপনারা জানবেন যে, পৃথিবীকেই আমি পিতৃগণের অক্ষয় স্থানরূপে

দান করেছি। তাই বলছি যে, পিতৃগণের প্রীতি কামনায় সেখানেই তর্পণ জল দান করবে। যেহেতু মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাজই মাটির উপর ঘটে থাকে, সেহেতু মাটিতেই জলদান করা উচিত। তর্পণের সময় আগাসমেত কুশের মুঠো বিছিয়ে দিয়ে নিজের নিজের মন্ত্রে দেবতা ও পিতাদের আহ্বান করবে। কুশের ডগা পূর্ব দিকে করে রেখে দেবতাদের এবং দক্ষিণ দিকে রেখে পিতাদের তর্পণ করবে।

—'সমুদ্রস্নানবিধি নিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একষট্টি

পূজাবিধি প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলে চললেন দেবতা, পিতা এবং অন্যান্য প্রাণীদের তর্পণ করে আচমন করবে ; তারপর বাক্য সংযত করে মহাসমুদ্রের তীরে একটি মণ্ডল আঁকবে। এই মণ্ডল এক হাত পরিমিত, চার কোণ বিশিষ্ট, চারটি দ্বারযুক্ত এবং সুশোভন হবে। ওই মণ্ডলের মধ্যে ফলত্বক বিশিষ্ট একটি অষ্টদল পদ্ম আঁকবে। এভাবে মণ্ডল এঁকে আট অক্ষরযুক্ত মন্ত্রে অজ ও বিভু সেই নারায়ণকে তাতে পূজা করবে। এর পর আপনাদের আমি দেহশুদ্ধির বিধি সম্পর্কে বলছি। হৃদয়ে চক্ররেখা যুক্ত ওংকার ধ্যান করে উজ্জ্বল ও তিনটি শিখাযুক্ত দাহকারী ও পাপনাশক চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে 'রা' কারকে মস্তকে চিন্তা করবে ; আরো ভাববে যে, ওই চন্দ্রমণ্ডল সাদা রঙের অমৃত পৃথিবীতে বর্ষণ করছে। এভাবে নিষ্পাপ হয়ে দিব্য দেহ ধারণ করবে। তারপর সাধক বাম পা থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ সারা গায়ে ওই আট অক্ষরযুক্ত মন্ত্র ন্যাস করবে। তারপর পঞ্চাঙ্গ বৈষ্ণব চতুর্ব্যূহ নির্মাণ করে মূলমন্ত্রে হাত শুদ্ধ করবে। প্রত্যেক আঙুলে ওংকারের এক একটি বর্ণ বিন্যাস করে সাদা রঙের পৃথ্বীবীজ বাম পায়ে বিন্যাস করতে হবে। শ্যামবর্ণ শিববীজ 'ন' কার ডান পায়ে, কালবীজ 'মো'-কার বাম কোমরে, সর্ববীজ 'না'-কার ডান দিকে, 'তৈজস' নামক 'রা'-কার নাভিতে, বায়ুবীজ 'য়'-কার বাম কাঁধে, সর্বত্রগামী 'ণা'-কার ডান কাঁধে এবং সমস্ত লোকে প্রতিষ্ঠিত 'য়'-কার মাথায় বিন্যাস করবে।

তারপর 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ শিরঃ' ইত্যাদি মন্ত্র যথাযোগ্য স্থানে বিন্যাস করে সাধক চিন্তা করবে আমার সামনে বিষ্ণু, পিছনে কেশব, ডান পাশে গোবিন্দ, বামে মধুসূদন, উপরে বৈকুণ্ঠ, পৃথিবীতে বারাহ এবং অন্যান্য সমস্ত দিকে মাধব অবস্থিত। সমস্ত অবস্থায় নৃসিংহ আমায় রক্ষা করুন। আমি বাসুদেবময়। এভাবে বিষ্ণুময় হয়ে সমস্ত কাজ শুরু করবে। যেমন নিজের শরীরে তেমনি দেবতার শরীরে সমস্ত তত্ত্ব যোজনা করা কর্তব্য। তারপর প্রণব মন্ত্রে প্রোক্ষণ করে সমস্ত বিঘ্ননাশক, শুভ ফটকারান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করবে। তারপর সূর্য, চন্দ্র ও ব্রহ্মমণ্ডল চিন্তা করবে। ওই অষ্টদল পদ্মের মধ্যে বিষ্ণুকে ন্যাস করে পরে হৃদয়ে জ্যোতীরূপ ওংকার চিন্তা করে ফলত্বকে সনাতন জ্যোতীরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথাক্রমে বিন্যাস করবে। পরে ওই মন্ত্রে বিশেষ পূজা করা কর্তব্য। হৃদয়ে সেই জ্যোতীরূপ সনাতন দেবকে ফলত্বকের বাইরের দিকে বিন্যাস করবে। এভাবে বিন্যাস করে কোটি সূর্যের দীপ্তির মতো উজ্জ্বল জ্যোতীরূপ সনাতন দেবকে আবাহন করবে এই মন্ত্র দিয়ে—তুমি নারায়ণ, মীনরূপ ধারী, বরাহরূপ-ধারী, নৃসিংহরূপ-ধারী ও বামনরূপ-ধারী ; তুমি আমার সামনে এসে আবির্ভূত হও। তোমাকে নমস্কার জানাই।

তারপর এই মন্ত্রে স্থাপন করবে—হে মধুসূদন, ফলত্বক বিশিষ্ট এই শ্রেষ্ঠ পদ্মাসনে

সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের জন্য তুমি এসে অধিষ্ঠান কর ; তোমাকে আমার নমস্কার।

স্থাপন করে এই মন্ত্রে তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করবে—তুমি বিষ্ণু, তুমি ত্রিভুবনের অধিপতিদের অধিপতি, তুমি শ্রেষ্ঠ দেব, তুমি জিতেন্দ্রিয় ; তোমায় আমার নমস্কার।

তারপর এই মন্ত্রে তাঁকে পাদ্যদান করবে—তুমি সনাতন পুরুষ, পদ্মপাতার মতো আয়ত তোমার চোখ, তোমার নাভিতেও পদ্ম থাকে। তুমি নারায়ণ ; তোমাকে আমার নমস্কার।

পাদ্যদানের পর মধুপর্ক সহ ভগবান বিষ্ণুর অর্চনা করবে। মধুপর্কদানের মন্ত্র—হে পুরুষোত্তম, তোমারই জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা নির্দিষ্ট করেছেন। আমি তোমায় ভক্তিভরে এই মধু ও দধিমিশ্রিত দ্রব্য দান করছি, তুমি দয়া করে গ্রহণ কর। তোমাকে আমার নমস্কার।

মধুপর্কদানের পর এই মন্ত্রে আচমনীয় দান করবে—মন্দাকিনীর পবিত্র ও পাপনাশক জল ভক্তিভরে তোমায় দান করছি ; কৃপা করে তা গ্রহণ কর। তোমায় আমার নমস্কার নিবেদন করি।

আচমনীয়ের পর এই মন্ত্রে দেববিগ্রহকে স্নান করাবে—হে লোকেশ, তুমিই জল, তুমিই পৃথিবী, জ্যোতি তুমি, তুমিই বায়ু ; নামমাত্র জলে তোমাকে আমি স্নান করাচ্ছি। তুমি আমার প্রণতি গ্রহণ কর।

তারপর বস্ত্র পরাবে এই মন্ত্রে—হে কেশব, তোমাকে এই সোনার রঙের কাপড় পরাচ্ছি। হে নারায়ণ, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

বস্ত্রদান করার পর এই মন্ত্রে দেবতার বিলেপন করবে—হে কেশব, তোমার শরীর এবং শারীরিক চেষ্টার কথা কিছুই বুঝি না আমি। এই গন্ধদ্রব্য তোমার সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিচ্ছি। তুমি সন্তুষ্ট হও এবং আমার নমস্কার গ্রহণ কর।

বিলেপনের পর উপবীত দানের মন্ত্র উচ্চারণ করবে—তিনটি তন্তুতে ঋক্, যজুঃ এবং সামমন্ত্রে পবিত্র করা এবং সাবিত্রী গ্রন্থি দেওয়া এই পৈতে তুমি গ্রহণ কর।

তারপর অলঙ্কার দান করবে। এর মন্ত্র—হে মাধব, দিব্যরত্ন সংযুক্ত এবং সূর্যের মতো প্রদীপ্ত অলঙ্কারে তোমার দেহ শোভামণ্ডিত হয়ে উঠুক।

তারপর এই মন্ত্রে ধূপ দান করবে—এই ধূপ বনস্পতির পবিত্র গন্ধে সুরভিত ; ভক্তিভরে তোমায় তা দান করছি। হে নারায়ণ, আমার নমস্কার তুমি গ্রহণ কর।

ধূপদান করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে এবং দীপ দান করবে—এই প্রদীপের জ্যোতি চন্দ্র এবং সূর্যের মতো, বিদ্যুতের মতো এই প্রদীপ প্রদীপ্ত। এই দীপ তুমি গ্রহণ কর। আমার প্রণাম নাও।

সবার শেষে এই মন্ত্রে নৈবেদ্য দান করবে—ছয় রসযুক্ত এই চার রকম অন্ন তোমায় ভক্তিভরে আমি দান করছি। তুমি তা গ্রহণ কর। হে নারায়ণ, তোমায় আমার নমস্কার।

তারপর ওই অষ্টদল পদ্মের পূর্বদলে বাসুদেব, দক্ষিণে সংকর্ষণ, পশ্চিমে প্রদ্যুম্ন, উত্তরে অনিরুদ্ধ, অগ্নিকোণে বরাহ, নৈর্ঋতে নরসিংহ, বায়ুকোণে মাধব এবং ঈশানকোণে বিষ্ণুকে বিন্যস্ত করবে। এভাবে বাসুদেবের সামনে গরুড়, বাম পাশে চক্র, ডান পাশে শংখ ও গদা, বাঁ দিকে শার্ঙ্গধনু, ডান দিকে দিব্য তূণীদ্বয়, বাঁয়ে খড়্গ, ডান দিকে সৌন্দর্য বা সৌভাগ্য এবং উত্তরে পুষ্টিকে বিন্যাস করবে। তারপর উপরে এবং নীচের দিকে তান্ত্রিক মন্ত্রে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান ও অনন্তদেবকে পুজা

করবে। এই ক্রমে মণ্ডলস্থ বিষ্ণুকে পূজা করলে অভিমত কাম্যবস্তু লাভ করা যায়। মণ্ডলস্থ ভগবান বিষ্ণুর এ রকম পূজা যিনি দেখেন তিনিও বিষ্ণুশরীরে লীন হয়ে থাকেন। যিনি একবার মাত্র এ রকম ভাবে কেশবের পূজা করেন তিনি জন্ম, বার্ধক্য এবং মৃত্যু জয় করে বিষ্ণুলোকে উপনীত হন। যে ভক্তিভরে প্রত্যেক দিন নারায়ণকে স্মরণ করে, শ্বেতদ্বীপে তার বসতি হয়ে থাকে। প্রথমে ওঙ্কার এবং শেষে 'নমঃ' কার যুক্ত সর্বতত্ত্বময় বাসুদেব নামই তাঁর মন্ত্র বলে নির্দিষ্ট। তারপর যথাবিহিত ক্রম অনুসারে নির্দিষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন করে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আটবার, আটাশবার, একশো আটবার বা যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করবে। পদ্ম, শঙ্খ, শ্রীবৎস, গদা, গরুড়, চক্র ও শার্ঙ্গ—এই আটটি মুদ্রার কথা বলা হয়েছে। এ সমস্ত মুদ্রাই প্রদর্শন করতে হয়। তারপর বিসর্জন। এই মন্ত্রে বিসর্জন করবে—'হে পুরাণপ্রসিদ্ধ পরমপুরুষ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা যেখানে রয়েছেন, সেখানে তুমি যাও।' যারা হরির পূজা ঠিক মতো জানে না, তাদের পক্ষে মূলমন্ত্র দ্বারা অর্চনা করাই সব সময় দরকার।

অধ্যায় ঃ বাষট্টি

এভাবে পুরুষোত্তম দেবকে ভক্তিভরে পূজা করবে, তারপর সমুদ্রকে প্রসন্ন করবে। বলবে- তুমি নদীসমূহের অধিপতি, সমস্ত প্রাণীর প্রাণ ও যোনি। তুমি তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি বিষ্ণুর প্রিয় ; তোমায় নমস্কার করি। আমায় তুমি রক্ষা কর। তারপর সমুদ্রে স্নান করবে। সমুদ্রে স্নান করার পর, তীরে বলরাম, সুভদ্রা ও নারায়ণকে পূজা করলে একশো অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। যে এ রকম করে সে দেবতার মতো সৌভাগ্যবান ও যৌবনগর্বিত হয়ে, নিজের একুশ কুলের উদ্ধার সাধন করে বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। সেখানে গিয়ে একশো মন্বন্তর কাল পর্যন্ত বার্ধক্য ও মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পায়। অনেক দিন পর্যন্ত সেখানে বিবিধ সুখ উপভোগ করে এবং পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে কোন উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে। সত্যশীল, বেদজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণরূপে অনেক কাল কাটিয়ে শেষে বৈষ্ণব যোগ অবলম্বন করে মোক্ষ লাভ করে। গ্রহণ, সংক্রান্তি, অয়ন, বিষুব, যুগাদ্যা, ষড়শীতি, ব্যতীপাত, এবং আষাঢ়, কার্তিক ও মাঘ মাসের শুভ দিন ও শুভ তিথিতে যে সব সুধী ব্যক্তি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ধন দান করেন, তাঁরা অন্য তীর্থ অপেক্ষা হাজার গুণ ফল লাভ করে থাকেন। যাঁরা বিধিমতো সেখানে পিতৃপিণ্ড দান করেন, তাঁদের পিতারা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকেন। এভাবে যথাবিধি সাগরস্নানে, ধনদানে এবং পিণ্ডদানে যে ফল পাওয়া যায়, তা আমি আপনাদের সম্যক বললাম। এই পুরাণ-কথা ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ ফল প্রদান করে, আয়ু, যশ ও কীর্তি দান করে। এই পবিত্র কথা নাস্তিককে কখনো বলবে না। পুষ্কর প্রভৃতি অন্যান্য যে সব তীর্থক্ষেত্র রয়েছে, সে সব শুধুমাত্র তীর্থ-দর্শনের জন্য ফলই দান করে, কিন্তু এই পুরুষোত্তম তীর্থক্ষেত্র সমস্ত তীর্থদর্শনের ফল দান করে। পৃথিবীতে যত নদী ও সরোবর প্রভৃতি আছে সবই সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তাই সমুদ্র সমস্ত তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। যেমন সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি এই তীর্থে সমুদ্রে স্নান করলে সমস্ত পাপ দূর হয়। এই তীর্থের মতো কোন তীর্থ কখনো ছিল না, কখনো হবেও না। যেখানে সর্বদা ভগবান বিষ্ণু অবস্থান করেন,

সেই তীর্থরাজের গুণ কে বর্ণনা করতে পারে? এখানে নিরানব্বুই কোটি তীর্থ রয়েছে। তাই এখানে স্নান, দান, হোম, জপ প্রভৃতি যা কিছু করা হয়, সবই অক্ষয় হয়।

—'সমুদ্রস্নানমাহাত্ম্যবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : তেষট্টি

এরপর যজ্ঞাঙ্গসম্ভব তীর্থে যাবে। ওই তীর্থে পরম পবিত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর রয়েছে। সেখানে গিয়ে পবিত্রভাবে আচমন করে মনে মনে হরিকে ধ্যান করবে এবং জলস্পর্শ করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে—এই সরোবর পাপনাশক। অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকে তোমার উৎপত্তি ঘটেছে। তোমার জলে আমি স্নান করছি; আমার সমস্ত পাপ তুমি দূর কর। স্নান করার পর জলের সঙ্গে তিল মিশিয়ে দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করবে। পিতাদের পিণ্ডদান করে ও পুরুষোত্তমকে পূজা করে মানুষ একশো অশ্বমেধ যজ্ঞ করার যা ফল, তা লাভ করে থাকে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাত পুরুষকে উদ্ধার করে দেবতার মতো যথেচ্ছগামী বিমানে করে বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। সেখানে গিয়ে অনেক কাল পর্যন্ত সুখভোগ করার পর পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে এসে সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভ করে। এভাবে একাদশীর দিন উপবাসী থেকে যে পঞ্চতীর্থ কৃত্য সম্পন্ন করে জ্যেষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুরুষোত্তম দর্শন করে, আগে যে যে ফলের কথা বলা হয়েছে, সে সব ফলই লাভ করে এবং অবশেষে বৈকুণ্ঠে কিছুকাল কাটিয়ে এমন এক জায়গায় যায়, যেখান থেকে আর তাকে পৃথিবীতে ফিরতে হয় না ; সে মোক্ষলাভ করে।

ব্রহ্মাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে মুনিরা জিগ্যেস করলেন—অন্যান্য সব মাসের কথা বাদ দিয়ে আপনি কেবল জ্যেষ্ঠ মাসের কথা বললেন কেন? এর কারণ কি আমরা জানতে চাই, দয়া করে বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা বলতে আরম্ভ করলেন—কেন আমি জ্যেষ্ঠ মাসের কথা বার বার বললাম ; তার কারণ বলছি, শুনুন। পৃথিবীতে যত নদী, সরোবর, পুকুর, হ্রদ, কুয়ো, সমুদ্র প্রভৃতি আছে, জ্যেষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দশমী থেকে আরম্ভ করে এক সপ্তাহ পর্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সর্বদাই তাদের দেখা যায়। সে জন্য স্নান, দান ও দেবতাদর্শন প্রভৃতি যে'সব পুণ্য কাজ সে-সময় করা হয়, সবই তখন অক্ষয় হয়ে থাকে। জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী দশ রকম পাপ নষ্ট করে ; এজন্যই তাকে 'দশহরা' নামে অভিহিত করা হয়। যে সুসংযত হয়ে সেই দশমী তিথিতে বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তার সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। সে বিষ্ণুলোকে গমন করে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করলে বিষ্ণুলোক লাভ করা যায়। যে ফাল্গুন মাসে প্রযত হয়ে পুরুষোত্তমকে দোলায় আরূঢ় অবস্থায় দর্শন করে, সে বিষ্ণুলোক লাভ করে। বিষুব দিনে যথাবিধি পঞ্চতীর্থকৃত্য অনুষ্ঠান করে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করলে সমস্ত যজ্ঞের দুর্লভ ফল লাভ করা যায় এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে ও শেষে বিষ্ণুলোকে তার গতি হয়। যে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে কৃষ্ণকে চন্দনচর্চিত অবস্থায় দেখে, সে বিষ্ণুলোকে যায়। জ্যেষ্ঠ মাসের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত দিনে যে ভগবান বিষ্ণুকে দর্শন করে, তার একুশ কুলের সদ্‌গতি হয়। সে বিষ্ণুলোকে যায়।

—'পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্যনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ চৌষট্টি

জ্যেষ্ঠ মাসের প্রশংসার কথা ব্রহ্মা বলে চললেন—যে সময়ে রাশি নক্ষত্রের যোগ অনুসারে মহাজ্যেষ্ঠী হবে, তখন সমস্ত পৃথিবীবাসীরই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত। মহাজ্যেষ্ঠীর দিন যে ব্যক্তি বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তার দ্বাদশ যাত্রার চেয়ে অধিক ফল লাভ ঘটে। প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, গয়া, গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, কোকামুখ, শূকর, মথুরা, মরুস্থান, শালগ্রাম, বায়ুতীর্থ, মন্দর, সিন্ধুসাগর, পিণ্ডারক, চিত্রকূট, প্রভাস, কনখল, শঙ্খোদ্ধার, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, লোহকুণ্ড, অশ্বতীর্থ, সর্বপাপপ্রমোচন, কমলালয়, কোটিতীর্থ, অমরকণ্টক, লোহার্গল, জম্বুমার্গ, সোমতীর্থ, পৃথূদক, উৎপলাবর্তক, পৃথুতুঙ্গ, কুব্জক, একাম্রক, কেদার, কাশী, বিরজ, কালঞ্জর, গোকর্ণ, শ্রীশৈল, গন্ধমাদন, মহেন্দ্র, মলয়, বিন্ধ্য পারিযাত্র, হিমালয়, সহ্য, শুক্তিমান, গোমান, অর্বুদ, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোমতী, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, নর্মদা, তাপী, পয়োষ্ণী, কাবেরী, শিপ্রা, চর্মণ্বতী বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বাহুকা, ঋষিকুল্যা, কুমারী, বিপাশা, দৃষদ্বতী, সরয়ূ, নাকগঙ্গা, গণ্ডকী, মহানদী, কৌশিকী, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মধুবাহিনী, মহানদী বৈতরণী প্রভৃতি যত তীর্থ পৃথিবীতে আছে, সব দর্শন করলে, কিংবা সূর্যগ্রহণে স্নান করলে, যে ফল পাওয়া যায়, মহাজ্যেষ্ঠীর দিন কৃষ্ণ দর্শন করলে, সেই ফল লাভ করা যায়। এজন্যই বলছিলাম যে মহাজ্যেষ্ঠীর দিন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত। ওই দিন কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করলে মানুষ বিষ্ণুলোকে যায়। সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত সুখে বাস করার পর পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে বেদবিদ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে সে ধর্মনিরত, শান্ত, কৃষ্ণভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হয়। শেষে বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনে তার মোক্ষলাভ হয়।

—'মহাজ্যেষ্ঠীপ্রশংসা বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ পঁয়ষট্টি

ব্রহ্মার কছে থেকে মহাজ্যেষ্ঠীর প্রশংসা শোনার পর মুনিরা তাঁকে বললেন—আমাদের মার্জনা করবেন। অনেক অনুরোধই রক্ষা করেছেন আপনি। দয়া করে বলুন কোন্ বিধি অনুসারে, কোন্ কালে কৃষ্ণের স্নান প্রশস্ত ?

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা বলতে আরম্ভ করলেন,-জ্যেষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় চন্দ্রদৈবত নক্ষত্রে হরির স্নান প্রশস্ত। সে-সময় সেখানকার কুয়ো নির্মল ও পবিত্র হয়। সেখানে তখন ভোগবতী প্রত্যক্ষগোচর হয়ে থাকেন। তাই বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার স্নানের জন্য সোনার কলসীতে করে সেই কুয়ো থেকে জল তুলে নিতে হবে ; পরে তাঁদের স্নানের জন্য একটি মঞ্চ প্রস্তুত করবে। ফুল, কাপড়, পতাকা, মুক্তাহার প্রভৃতি দিয়ে ওই মঞ্চ সাজাবে। তারপর সেই মঞ্চের উপর বলরাম, কৃষ্ণ ও এঁদের দুজনের মাঝখানে সুভদ্রাকে স্থাপন করে, বিভিন্ন জয়সূচক এবং মঙ্গলসূচক ধ্বনি ও নানা বাজনা বাজিয়ে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলিত হয়ে মঞ্চস্থ কৃষ্ণ ও বলরামকে স্নান করাবে। এ সময় সমস্ত তীর্থের জল দিয়েই তাঁদের স্নান করানো উচিত। তখন পটহ, শাঁখ, ভেরী, বাঁশী, বীণা,

করতাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মিলিত সুন্দর ধ্বনি, স্ত্রীকণ্ঠে উচ্চারিত মঙ্গল শব্দ, স্তুতিগান প্রভৃতি শব্দ গর্জনশীল সমুদ্রের গম্ভীর ধ্বনির মতো শোনা যায়। মুনিদের বেদপাঠে, স্তোত্র উচ্চারণে এবং সামগানে সেই স্থান মুখরিত হয়ে ওঠে। তখন স্ফীত স্তনের ভারে আনত যৌবনবতী গণিকারা সুন্দর কাপড় ও বিভিন্ন রত্নালংকারে সেজে রত্নদণ্ডযুক্ত চামর দিয়ে রাম ও কেশবকে বীজন করে। যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, কিন্নর, অপ্সরা, গন্ধর্ব, চারণ, বসু, আদিত্য, রুদ্র, মরুৎ, বিশ্বেদেবগণ এবং লোকপালসমূহ অন্তরীক্ষ থেকে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার স্তব করেন। তখন দেবতা ও গন্ধর্বেরা গান করতে থাকেন, অপ্সরাগণ নাচে এবং সুশীতল বাতাস বইতে থাকে। সে-সময় মেঘেরা আকাশ থেকে পুষ্পময় জল বর্ষণ করে এবং মুনি ও সিদ্ধচারণগণ 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা, সমস্ত ঋষিরা, পিতারা, প্রজাপতিরা এবং অন্যান্য সকলেই অভিষেচনের দ্রব্যসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হন। ইন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতারা, সপত্নীক, মিত্রাবরুণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষ, রাক্ষস, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ, বৈখানস বালখিল্যগণ, বায়ু আহারকারী এবং সূর্যকিরণ পানকারী তাপসগণ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ, পবিত্র বিদ্যাধরগণ, প্রচেতা, মনু দক্ষ, ঋতু, গ্রহ, জ্যোতিষ্কগণ, নদীসমূহ, সনাতন দেবতাগণ, সমুদ্র, হ্রদ, সমস্ত তীর্থ, পৃথিবী, দিক্‌সমূহ বৃক্ষগণ, অদিতি, লক্ষ্মী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, কুহু, রাকা, ধিষণা প্রভৃতি দেবপত্নীগণ, সমস্ত প্রধান প্রধান পাহাড়-পর্বত, ঐরাবত, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত, দিন, বছর, উচ্চৈঃশ্রবা, বামন, অরুণ, গরুড়, কাল, যম এবং অন্যান্যেরা সে-সময় পুরুষোত্তম দেবের অভিষেকের জন্য এসে থাকেন। এঁরা সবাই সোনার কলসীতে ফুল দিয়ে সরস্বতী নদীর পবিত্র জল ও আকাশগঙ্গার দিব্য জল নিয়ে বলরাম ও কৃষ্ণের অভিষেক করে থাকেন। সে-সময় দিব্য বিমানে অপ্সরাগণ আকাশপথে থেকে গান গেয়ে এবং বিভিন্ন বাজনা বাজিয়ে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানান। এভাবে কৃষ্ণ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে স্নান করানোর পর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা এবং সিদ্ধসম্প্রদায় আনন্দিত মনে পুরুষোত্তম দেবের স্তব করেন। স্তবের দ্বারা কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে সন্তুষ্ট করে তাঁরা নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যান।

এই স্নানের সময় যারা কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তারা অব্যয় পদ লাভ করে। রাম ও সুভদ্রার সঙ্গে মঞ্চে আসীন পুরুষোত্তমকে দর্শন করলে মানুষ নিরাময় স্থান লাভ করে। পুষ্কর ক্ষেত্রে অনেক ধূসর রঙের গোরু দান করলে যে ফল হয়, ওই তিনজনকে দর্শন করলে সেই ফলই পাওয়া যায়। একশো কন্যা সম্প্রদানে যে ফল পাওয়া যায় বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, মঞ্চে আসীন কৃষ্ণকে দর্শন করলে মানুষ সেই ফলই লাভ করে। একশো নিষ্ক পরিমাণ সোনা দান করলে, হাজারটা গোরু দান করলে, ভূমি দান করলে, অতিথিদের অর্ঘ্য ও অন্ন দান করলে, বৃষ উৎসর্গ করলে, গ্রীষ্মকালে জল দান করলে, হাতী, ঘোড়া, রথ প্রভৃতি দান করলে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠানে এবং বিধিমতো একমাস উপবাস করলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার মাত্র কৃষ্ণদর্শন করলেই সে ফল লাভ করা যায়। সেই মঞ্চস্থ কৃষ্ণ দর্শনে পাওয়া যায় না এমন কোন কিছুই নেই। কৃষ্ণের স্নান হয়ে যাওয়ার পর সেই জলে দেহ অভিষিক্ত করবে। বন্ধ্যা রমণী, গ্রহপীড়িত, রোগাক্রান্ত কিংবা যার ছেলে হয়ে মরে গিয়েছে, তারা যদি সেই স্নানের অবশিষ্ট জলে নিজেরা

অভিষেক করে, তবে তারা তাদের কাম্য ফল লাভ করে। যে নারীরা পুত্র কামনা করে তারা পুত্র লাভ করে, যারা সুখ চায় তারা সৌভাগ্য লাভ করে, যারা রোগমুক্তি কামনা করে, তারা রোগ থেকে মুক্ত হয়। পৃথিবীতে যত পবিত্র জল আছে, ওই স্নানের অবশিষ্ট জলের ষোলোভাগের এক ভাগও তারা নয়। স্নানের পর যারা কৃষ্ণকে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখে, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ থেকে তারা মুক্তিলাভ করে। পৃথিবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখলে ওই ফল লাভ করা যায়। সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণে, বদরিকাশ্রমে গিয়ে নারায়ণকে দর্শন করলে, কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গাদ্বারে স্নান ও দান করলে, কার্তিকমাসে পুষ্করক্ষেত্রে গেলে, গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে স্নান এবং দান করলে এবং অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে যথাবিধি স্নান ও দান করলে যে যে ফল পাওয়া যায় কৃষ্ণকে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করতে দেখলে মানুষ সে সব ফলই লাভ করে। মনীষির পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের যে যে ফলের কথা বলেছেন, বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখলে, সেই সব ফলই মানুষ পেয়ে থাকে।

—'কৃষ্ণস্নানমাহাত্ম্য' নামক অধ্যায়

অধ্যায় : ছেষট্টি

গুণ্ডিবা মণ্ডপে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে যারা রথে আরূঢ় অবস্থায় যেতে দেখে, তারা বিষ্ণুলোকে যায়। যারা সেই মণ্ডপে স্থিত কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে তখন এক সপ্তাহ ধরে দর্শন করে, তারা বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়।

ব্রহ্মার কথা শুনে মুনিরা তাঁকে জিগ্যেস করলেন—কে সেই দক্ষিণ দিকের যাত্রা নির্মাণ করেছেন ? সেখানে গিয়ে মানুষ কি রকম যাত্রাফলই বা পায় ? কিসের জন্য সেই রাজকীয় সরোবরের তীরে পবিত্র নির্জন দেশস্থ মণ্ডপে গিয়ে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা সাত রাত ধরে রথের উপর বাস করেন, তা দয়া করে আমাদের বলুন।

মুনিদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান বিষ্ণুর কাছে এ রকম প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের তীরে তিনি যেন এক সপ্তাহ ধরে বাস করেন, এবং সেখানে বাস করার জন্য তাঁর যে মন্দির থেকে যাত্রা তা 'গুণ্ডিবা' নামে যেন খ্যাত হয়। ভগবান বিষ্ণু তাঁর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নকে তিনি আরো বলেছিলেন—সেখানে সুভদ্রা, বলরাম এবং আমাকে যারা সুসমাহিত হয়ে গন্ধ, ধূপ, দীপ, নানা রকম উপহার, স্তোত্র এবং নানা রকম উপচার দিয়ে যথাবিধি পুজো করবে, তারা যে জাতের হোক, পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক না কেন, তারা সমস্ত ফলই লাভ করে থাকে।

তাই গুণ্ডিবায় গিয়ে পুরুষোত্তমকে দর্শন করবে। সেই সময় পুরুষোত্তমকে দর্শন করলে যার যা অভীষ্ট তাই সে লাভ করে থাকে। আয়ু, কীর্তি, যশ, বুদ্ধি, বল, বিদ্যা, রূপ, যৌবন প্রভৃতি সমস্তই পাওয়া যায়। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে যে গুণ্ডিবায় গিয়ে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, সে পনেরোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের চেয়েও বেশী ফল লাভ করে। এর ফলে সে নিজের সাত পুরুষের উদ্ধার সাধন করে পরিণামে বিষ্ণুলোকে গমন করে। সেখানে অনেক কাল ধরে সুখভোগ করার পর পৃথিবীতে বেদবিদ ও

আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে। তারপর কালক্রমে বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করে মুক্তিলাভ করে।

—'গুণ্ডিবাযাত্রা মাহাত্ম্যকথন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ সাতষট্টি

গুণ্ডিবা যাত্রার কথা ব্রহ্মার কাছ থেকে শোনার পর মুনিরা তাঁকে অনুরোধ জানালেন—মানুষ সুসংযত হয়ে গুণ্ডিবায় যাত্রা করলে যে ফল লাভ করে, আপনি সেই এক একটি যাত্রার পৃথক পৃথক ফলের কথা দয়া করে আমাদের বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা তাঁদের বলতে আরম্ভ করলেন—যারা উত্থান একাদশীতে—বা কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে হয়, ফাল্গুন মাসে ও বিষুবে গুণ্ডিবায় যাত্রা করে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন ও প্রণাম করে, তারা সমস্ত বাঞ্ছিত ফলই লাভ করে থাকে এবং অনেক দিন পর্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করে থাকে। যারা যত দিন পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ মাসে গুণ্ডিবায় যাত্রা করে, তত কল্পকাল পর্যন্ত তারা বিষ্ণুলোকে থেকে সুখভোগ করে। সেই পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যারা জ্যেষ্ঠ মাসে যায় এবং পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা করে, তারা বিবিধ ভোগ্য উপভোগের পর মোক্ষ লাভ করে।

মুনিরা তখন ব্রহ্মাকে তাঁর বক্তব্যের মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললেন—সেই পুরুষোত্তমদেবের প্রতিষ্ঠার কথা এই যে আপনি বললেন, এর কথা, পূজাবিধির কথা এবং তার ফল শোনবার জন্য আমরা অধীর হয়ে উঠেছি। আপনি দয়া করে সে কথা বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা তাঁদের বলতে আরম্ভ করলেন—যার অনুষ্ঠান করলে মানুষ বিশিষ্ট ফল লাভ করে, সেই প্রতিষ্ঠার কথা বলছি. শুনুন। যখন দ্বাদশযাত্রা শেষ হবে, তখন পুরুষোত্তমদেবের সেই পবিত্র মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন সুসমাহিত হয়ে পবিত্র জলাশয়ে আচমন করে সমস্ত তীর্থকে আবাহন করবে। তারপর নারায়ণের ধ্যান করে সেখানে স্নান করবে। ঋষিরা স্নান সম্বন্ধে যার যেমন বিধি নির্দেশ করেছেন, সেই বিধি অনুসারেই স্নান করা উচিত। নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে স্নান করে দেবতা, ঋষি ও পিতাদের এবং নাম গোত্র উল্লেখ করে অন্যান্য প্রাণীদের তর্পণ করবে। তারপর কাচা কাপড় পরে, সূর্যের দিকে মুখ করে বসে একশো আটবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে। গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে অন্যান্য সৌর মন্ত্র জপ করবে এবং সূর্যকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে নমস্কার করবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের জপ-ক্রম বেদে নির্দিষ্ট হয়েছে, স্ত্রী ও শূদ্র জাতের বেদে অধিকার নেই বলে তাদের স্নান ও জপ বিষয়ে বেদের কোন বিধি নেই। তারপর মৌনী হয়ে পুরুষোত্তমদেবের মন্দিরে যাবে। হাত-পা ধুয়ে আচমন করবে। আচমন করার পর ঘি, দুধ, মধু, সুগন্ধি জল ও চন্দনজল দিয়ে তাঁকে স্নান করাবে। স্নান করানোর পর ভালো এক জোড়া কাপড় পরিয়ে চন্দন, অগুরু, কর্পূর প্রভৃতি তাঁর গায়ে মাখিয়ে দেবে। এভাবে পদ্ম, মল্লিকা প্রভৃতি যে সব ফুল বিষ্ণুর প্রিয়, সে সব ফুল দিয়ে তাঁর সম্যক পূজা করবে। পূজার পর পুরুষোত্তমদেবকে অগুরুযুক্ত ধূপ ও গুগ্‌গুল এবং উজ্জ্বল ঘিয়ের প্রদীপ দেবে। ঘি ছাড়া অন্যান্য যে সব স্নেহ পদার্থ, যেমন তিলের তেল, সরষের তেল প্রভৃতি রয়েছে, সে সব দিয়েও বারোটি দীপ দান করতে হবে। তারপর নৈবেদ্য, পায়স, পিঠে, মিষ্টি এবং আখের

ঘন রস ও উৎকৃষ্ট ফল দিয়ে পুরুষোত্তমদেবকে পূজা করবে। এভাবে পাঁচ রকম উপচারে পুরুষোত্তমদেবকে পূজা করার পর 'আমি পুরুষোত্তমদেবকে নমস্কার জানাই' এই মন্ত্র একশো আটবার জপ করতে হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবে; বলবে—আমি সংসার সাগরে নিমগ্ন হয়ে রয়েছি, তুমি আমায় রক্ষা কর। আমি যে তোমার দ্বাদশ যাত্রার অনুষ্ঠান করেছি, তোমার দয়ায় তা সম্পূর্ণ হোক। এর পর ফুল, কাপড় ও অনুলেপন দিয়ে গুরুকে পূজা করবে; কারণ, গুরু ও পুরুষোত্তম—এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এর পর কৃষ্ণকথা গান করে, কৃষ্ণের স্তব পাঠ করে সারা রাত জেগে কাটাবে। দ্বাদশীর দিন সকালে বারোজন বেদজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে এনে আগের দিনের মতোই যথাযথ বিধানে পুরুষোত্তমদেবকে স্নান করাবে এবং পূজা করবে। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদেরও পূজা করবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে বারোটি গাই-গোরু, সোনা, ছাতা, চামড়ার জুতো প্রভৃতি এবং ধন-রত্ন ও কাপড়-চোপড় ব্রাহ্মণদের দান করবে। ব্রাহ্মণরা সন্তুষ্ট হলে পুরুষোত্তমও সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণদের যে সব জিনিস দান করবে, গুরুদেবকেও সে সব জিনিস শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। তারপর ভালো ভালো খাবার দিয়ে ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা জানাবে। খাওয়া শেষ হলে পর তাঁদের বারোটি জল ভরা কলসী ও সামর্থ্য মতো দক্ষিণা দান করবে। গুরুদেবকেও তাই দান করবে। গুরুকে পূজা করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে—সর্বব্যাপী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী অনাদি অনন্ত পুরুষোত্তম জগন্নাথ প্রীত হোন। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ব্রাহ্মণদের তিনবার প্রদক্ষিণ করবে এবং প্রণাম করবে। তাঁদের বিদায় দিয়ে তাঁদের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত যাবে। তারপর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দরিদ্র ভিখারী প্রভৃতিদের খাইয়ে নিজে খাবে। যারা এই উপায়ে জগন্নাথের, গুরু ও ব্রাহ্মণদের পূজা, দান প্রভৃতি করে, তারা হাজারটা অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একশো রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। কেবল তাই নয়, তাদের অতীত ও ভবিষ্যতের একশো পুরুষ উদ্ধার পেয়ে স্বর্গে যায়। যারা এভাবে পূজা করে তারা স্বয়ং দিব্য দেহ ধারণ করে উজ্জ্বল বিমানে বিষ্ণুলোকে যায় এবং সেখানে অনেক দিন ধরে বিবিধ ভোগ্য বস্তু পরম সুখে উপভোগ করে। তারপর আনন্দিত মনে ব্রহ্মলোকে যায়। সেখানে ওই ভাবে অনেক দিন সুখে কাটিয়ে রুদ্রলোকে যায়। সেখানেও অনেক দিন সুখে কাটানোর পর গোলোকধামে যায়। সেখান থেকে যায় প্রজাপতিলোকে, প্রজাপতিলোক থেকে ইন্দ্রলোকে, সেখানে সুখভোগের পর যায় সুরলোকে, সুরলোক থেকে নক্ষত্রলোকে, নক্ষত্রলোক থেকে যায় চন্দ্রলোকে।

এই যে চন্দ্রলোক, এখানে স্বয়ং সোমদেব বিরাজ করেন। এই চন্দ্রলোকে সুখ ভোগের পর জগন্নাথদেবের পূজাকারী ব্যক্তি আদিত্যলোকে যায়। আদিত্যলোক থেকে যায় গন্ধর্বপুরে, গন্ধর্বপুরে সুখে অনেক দিন কাটিয়ে পৃথিবীতে ধার্মিক, চক্রবর্তী ও বলশালী রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করে ওই রাজা বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। মৃত্যুর পর যোগীলোকে গিয়ে অনেক দিন সুখ ভোগ করার পর বৈষ্ণব যোগীদের বাড়িতে এসে জন্মগ্রহণ করে। এ জন্মেও বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে শেষে বৈষ্ণব যোগ অবলম্বন করে মোক্ষলাভ করে।

—'দ্বাদশযাত্রাফলমাহাত্ম্যকথন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ আটষট্টি

ব্রহ্মা মুনিদের দ্বাদশ যাত্রাফলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন তাঁরা আরো কী কথা শুনতে চান। মুনিরা তখন ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন—আমরা আপনার কাছ থেকে বিষ্ণুলোকের কথা জানতে চাই। ওই লোকের বিস্তার পরিমাণ কেমন ? কেমন কাজ করলে ধার্মিক মানুষ সেখানে যেতে পারে—এ সমস্ত কথা আপনি বিস্তৃত ভাবে আমাদের বলুন।

মুনিদের অনুরোধে ব্রহ্মা বলতে আরম্ভ করলেন—যা ভক্তদের ঈপ্সিত ও পবিত্র, সেই পরম পদ কি, তা আপনারা শুনুন। যে বিষ্ণুলোকের কথা আপনারা শুনতে চান, সেই বিষ্ণুলোক সমস্ত লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতীব পবিত্র সেই স্থান ; ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণী ওই স্থানের গুণগানে মুখর। সেখানে বিবিধ উৎকৃষ্ট ফল ও ফুলের গাছ রয়েছে। রয়েছে পদ্মফুলে শোভিত অসংখ্য দীঘি, সরোবর। আর রয়েছে বিভিন্ন পাখির কণ্ঠে মধুর ডাক। অসংখ্য সোনার বিমানও রয়েছে সেখানে। ওই সব বিমানে গন্ধর্বরা রয়েছে, অপ্সরারা আছে, আর রয়েছে বিচিত্র ভোগ্য সামগ্রী ; এমন কি, নাচের এবং গান-বাজনারও ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। ওই সব বিমানে চেপে দেবতা ও দেবসুন্দরীরা বিষ্ণুলোকে সর্বদাই পরিভ্রমণ করে থাকেন। গন্ধর্বগণ, সুন্দরী নারীগণ এবং অপ্সরাগণ রত্নময় চামর দিয়ে সেই পুরুষোত্তমকে সর্বদাই বীজন করেন। যক্ষ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব প্রভৃতি নাচ-গানে নিপুণ ব্যক্তিরা সেখানকার আকাশ বাতাসকে সর্বদাই মুখর করে রাখেন। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরদেশে সেই বিশাল বটগাছের কাছে যাঁরা কৃষ্ণকে দর্শন করেন, চন্দ্র সূর্যের অবস্থিতি কাল পর্যন্ত তাঁরা অপ্সরাদের সঙ্গে সুখে কাল যাপন করেন। মৃত্যু কিংবা বার্ধক্য তাঁদের আক্রমণ করতে পারে না। সমস্ত কামনা, সমস্ত দুঃখ থেকে তাঁরা মুক্তিলাভ করেন। সমস্ত দেবলোক তার যাবতীয় ঐশ্বর্য নিয়েও সেই বিষ্ণুলোকের সমকক্ষ হয় না। সেই বিষ্ণু-লোকে ভগবান হরির একটি মন্দির আছে। সেই মন্দির রত্নে মণ্ডিত ; তার চারপাশে রয়েছে সোনার প্রাকার। ওই মন্দির নানা পতাকা ও রত্নে মণ্ডিত হয়ে নক্ষত্র পরিবৃত শরৎকালীন চন্দ্রের মতো প্রতিভাত হয়। ওই মন্দিরের চারটি দ্বার আছে—প্রথমটি সোনার, দ্বিতীয়টি মরকতের, তৃতীয়টি ইন্দ্রনীলমণির এবং চতুর্থটি মহানীলময়। দ্বারের সংলগ্ন যে সাতটি পুর রয়েছে তার মধ্যে পঞ্চমটি উজ্জ্বল পদ্মরাগমণির তৈরি, ষষ্ঠটি সোনার এবং সপ্তমটি বৈদূর্যমণির। সোনার উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলো সেই বিষ্ণুলোকের সৌন্দর্যকে যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। পূর্ণিমার দিন চন্দ্র যেমন নক্ষত্রমণ্ডলীর সঙ্গে আকাশে শোভা পেয়ে থাকেন বিষ্ণুলোকের ওই মন্দিরের মধ্যে লক্ষ্মীর সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুও শোভা পেয়ে থাকেন। ভগবান বিষ্ণু পীত বসন পরিধান করে থাকেন, ভীষণ সুদর্শন চক্র তিনি ধারণ করেন। তাঁর ডান হাতে রয়েছে উজ্জ্বল অস্ত্র। যার শব্দে সমগ্র জগৎ সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সেই বিখ্যাত পাঞ্চজন্য শঙ্খ তাঁর বাম হাতে শোভা পায়। যা পাপ নাশ করে, যার প্রভাবে দৈত্যদানবেরা বিনষ্ট হয় সেই ভীষণ কৌমোদকী গদা এবং সূর্যের মতো উজ্জ্বল শার্ঙ্গধনু যথাক্রমে তাঁর ডান ও বাম হাতে শোভা পায়। সমস্ত দেবতার নমস্য এবং সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের গুরু জগন্নাথদেব সেখানে বিরাজ করেন। যক্ষ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব ও কিন্নর প্রভৃতি তাঁর স্তবগান করে। কীর্তি, প্রজ্ঞা, মেধা, সরস্বতী, মতি, বুদ্ধি, সিদ্ধি, ক্ষান্তি, মূর্তি, দ্যুতি, গায়ত্রী, সাবিত্রী, মঙ্গলা, প্রভা, কান্তি, নারায়ণী, শ্রদ্ধা, কৌশিকী, বিদ্যুৎ,

সৌদামিনী, নিদ্রা, রাত্রি, মায়া এবং অন্যান্য দেবসুন্দরীরা সেই বিষ্ণুলোকে বাস করেন। তাছাড়া, ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা সহজন্যা, তিলোত্তমা, নিম্লোচা, বাসনা, মন্দোদরী, সুভগা, বিশ্বাচী, বিপুলাননা, ভদ্রাঙ্গী, চিত্রসেনা, প্রম্লোচা, মনোহরা, রামা, চিত্রমধ্যা, শুভাননা, সুকেশী, নীলকেশা, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, মুঞ্জিকস্থলা, ক্রতুস্থলা, বরাঙ্গী, পূর্বচিত্তি, পরাবতী, মহারূপা ও শশিলেখা প্রভৃতি অপ্সরাগণ সমস্ত অলংকারে অলংকৃত হয়ে সেখানে নাচ-গান করে থাকেন। ওই বিষ্ণুলোকে রোগ, গ্লানি, মৃত্যু, হিম, আতপ, ক্ষুধা পিপাসা বা বার্ধক্য প্রভৃতি কোন কিছুই নেই। বিষ্ণুলোক থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন লোকের কথা আমার জানা নেই। স্বর্গলোকে পুণ্যকর্মা ব্যক্তিদের যে সব লোকের কথা শুনতে পাওয়া যায়, সে-সব বিষ্ণুলোকের ষোলভাগের এক ভাগও নয়। যারা নাস্তিক, অতি বৈষয়িক, কৃতঘ্ন, চোর বা অত্যধিক ইন্দ্রিয়াসক্ত, তারা বিষ্ণুলোকে কখনই যেতে পারে না। যারা ভক্তিভরে সেই জগন্নাথদেবের অর্চনা করে, তারাই একমাত্র বিষ্ণুলোকে যেতে পারে। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে পরম দুর্লভ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে ওই বটগাছের কাছে যারা দেহত্যাগ করে, তারা বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। বটগাছ ও সমুদ্রের মাঝখানে থেকে যে পুরুষোত্তমকে স্মরণ করে এবং যারা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে, তারা সবাই বিষ্ণুলোকে যায় এবং সেখানে তারা পরম পদ লাভ করে।

—'বিষ্ণুলোকানুকীর্তন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ উনসত্তর

ব্রহ্মার কাছ থেকে বিষ্ণুলোকের বর্ণনা শোনার পর মুনিরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে বললেন—আপনি আমাদের বিষ্ণুলোকের বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং যেখানে দেহত্যাগ করে মানুষ ভগবান বিষ্ণুর নৈকট্য লাভ করে, সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিষয়ও বলেছেন। পৃথিবীতে প্রয়াগ, পুষ্কর প্রভৃতি আরো কত তীর্থ রয়েছে, রয়েছে কত পবিত্র নদী, সরোবর। আপনি বারবার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের যে রকম প্রশংসা করলেন, অন্য কোন তীর্থ প্রভৃতি সম্পর্কে সে-রকম প্রশংসা কিন্তু করেন নি। কেন করেন নি সে কথাও আমরা জানি। বস্তুত পুরুষোত্তমের মতো ক্ষেত্র পৃথিবীতে আর নেই। সেজন্যই বারবার আপনি তার প্রশংসা করেছেন।

মুনিদের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন—আপনারা সত্য কথাই বলেছেন, পুরুষোত্তমের মতো ক্ষেত্র পৃথিবীতে আর নেই। বিষ্ণু যেমন সমস্ত লোকের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ, তেমনি এই পুরুষোত্তম সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আদিত্যদের মধ্যে বিষ্ণু, নক্ষত্রদের মধ্যে চাঁদ, জলরাশির মধ্যে সমুদ্র, বসুদের মধ্যে অগ্নি, রুদ্রদের মধ্যে শংকর, বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ, পাখিদের মধ্যে গরুড়, শৃঙ্গসমূহের মধ্যে সুমেরু, পর্বতসমূহের মধ্যে হিমালয়, নারীদের মধ্যে লক্ষ্মী, নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা, হাতীদের মধ্যে ঐরাবত, মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু, সৈনিকদের মধ্যে স্কন্দ, সিদ্ধসমূহের মধ্যে কপিল, অশ্বসমূহের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, কবিদের মধ্যে উশনা, মুনিদের মধ্যে ব্যাস, যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে কুবের, ইন্দ্রিয়দের মধ্যে মন, গাছেদের মধ্যে অশ্বত্থ, বহমানদের মধ্যে বাতাস, সমস্ত অলংকারের মধ্যে চূড়ামণি, গন্ধর্বদের মধ্যে চিত্ররথ, অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, সমস্ত বর্ণের মধ্যে অ-কার, ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রী, অঙ্গসমূহের মধ্যে উত্তমাঙ্গ, স্ত্রীদের মধ্যে সতী অরুন্ধতী,

সমস্ত বিদ্যার মধ্যে মোক্ষবিদ্যা, মানুষদের মধ্যে রাজা, গাভীসমূহের মধ্যে কামধেনু, রত্নসমূহের মধ্যে সোনা, সাপেদের মধ্যে বাসুকি, দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ, শস্ত্রধারীদের মধ্যে রাম, মাছসমূহের মধ্যে কুমীর, পশুদের মধ্যে সিংহ, সমুদ্রসমূহের মধ্যে ক্ষীরোদ সমুদ্র, যাদোদের মধ্যে বরুণ, সংযমীদের মধ্যে যম, দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, ধাতুসমূহের মধ্যে কাঞ্চন, পবিত্রসমূহের মধ্যে দক্ষিণা, প্রজাপতিদের মধ্যে দক্ষ, ঋষিদের মধ্যে কশ্যপ, গ্রহসমূহের মধ্যে সূর্য, মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব, যজ্ঞসমূহের মধ্যে অশ্বমেধ, এবং ওষধি-সমূহের মধ্যে ধান যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি তীর্থসমূহের মধ্যে পুরুষোত্তমই শ্রেষ্ঠ।

—'পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য কীর্তন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ সত্তর

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলে চললেন- সমস্ত তীর্থে ও সমস্ত পুণ্য-ক্ষেত্রে জপ, হোম, ব্রত ও দান করলে যে ফল লাভ হয়, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী ফল পাওয়া যায়। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যে মহৎ, এ কথা সর্বতোভাবে সত্য। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে একবার দর্শন করলে এবং একবার ব্রহ্মবিদ্যা জানলে, মানুষের আর গর্ভবাস হয় না। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে এক বছর বা কেবলমাত্র একমাস থেকে উপাসনা করে সে জপ, হোম ও তপস্যা না করলেও তার যা ফল, তা লাভ করে থাকে। দেহত্যাগ করার পর তার বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং সেখানে অনেক দিন সুখ ভোগের পর আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শেষে বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করে সে মোক্ষলাভ করে থাকে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র সম্পর্কে এত কথা বললাম, আর কি আপনারা শুনতে চান, বলুন।

ব্রহ্মার প্রশ্নে উৎসাহিত হয়ে মুনিরা বললেন- আপনার কাছ থেকে এই তীর্থের কথা শুনেও আমাদের পরিতৃপ্তি হয় নি। আপনি দয়া করে পরম গুহ্য তীর্থমাহাত্ম্য আমাদের বলুন।

মুনিদের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন-পূর্বে এই একই কথা নারদ আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন। তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলে যত তীর্থ আছে তাদের নাম এবং মাহাত্ম্য এবং কোনটিই বা সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তাঁকে আমি যে কথা বলেছিলাম, আপনাদেরও সেই একই কথা বলছি।

স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং রসাতলে চার রকম তীর্থ রয়েছে-দৈব, আসুর, আর্ষ এবং মানুষ। এই চার রকম তীর্থের মধ্যে মানুষ তীর্থ থেকে আর্ষ তীর্থ শ্রেষ্ঠ, আর্ষ থেকে আসুর এবং আসুর থেকে দৈব তীর্থ আরো পবিত্রতাদায়ক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দৈব তীর্থের নির্মাতা। এই তীর্থ থেকেও জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে যে ভারতবর্ষ, তা অন্যতম প্রধান তীর্থ বলে পরিচিত। ভারতবর্ষ কর্মভূমি বলে একে 'তীর্থ' এই নামে অভিহিত করা হয়। ভারতবর্ষের যে সব তীর্থের কথা আমি বলেছি, তাদের মধ্যে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যে প্রবাহিত ছ'টি দেবনদী এবং দক্ষিণ সমুদ্র ও বিন্ধ্যা-চলের মধ্যবর্তী ছ'টি দেবনদী—এই বারোটি নদীই প্রধান বলে পরিচিত। দেবতারা ভারত-বর্ষকে কর্মভূমি বলে সম্মানিত করেছেন, সেজন্য একে 'দেবতীর্থ' বলা হয়। কোথাও কোথাও আর্ষ ও দৈবতীর্থসমূহ আসুর তীর্থে আবৃত হয়েছিল; এজন্য এদের 'আসুর'

বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহর্ষিরা অনেকে দৈবপ্রদেশে তপস্যা করে দৈববলে ও তপস্যার সাহায্যে আর্যতীর্থসমূহ নির্মাণ করেন। আত্মার মঙ্গল, মুক্তি অথবা দেবপূজা ও নিজের যশ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যে সব তীর্থ নির্মাণ করেছে, ওই সব তীর্থই 'মানুষতীর্থ' নামে পরিচিত। এই যে তীর্থসমূহের চার রকম ভেদের কথা বললাম, এ কথা তোমরাই শোনার যোগ্য, পৃথিবীতে অনেক বিদ্বান লোকই আছেন যারা কথা শোনেন এবং বলেন কিন্তু শোনানোর মতো শোনাতে পারেন ক'জন। পূর্বে যে বারোটি দেবনদীর উল্লেখ আমি করেছি তাদের নাম বলছি। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিক দিয়ে যে ছ'টি নদী প্রবাহিত তাদের নাম—গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, বেণিকা, তাপী ও পয়োষ্ণী। আর ভাগীরথী, নর্মদা, যমুনা, সরস্বতী, বিশোকা ও বিতস্তা—এই নদীগুলো হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই পবিত্র নদীদের 'দেবতীর্থ' নামে অভিহিত করা হয়। গয়, কেল্লাসুর, বৃত্র, ত্রিপুর, অন্ধক, হয়গ্রীব, লবণ, নমুচি, শৃঙ্গক, যম, পাতালকেতু, ময় ও পুষ্কর প্রভৃতি অসুরেরা যে সব তীর্থকে অধিকার করেছিল, সে সব তীর্থস্থানসমূহ 'শুভ আসুর তীর্থ' নামে পরিচিত। প্রভাস, ভার্গব, অগস্তি, নর ও নারায়ণ, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, কশ্যপ ও মনু প্রভৃতি মুনিরা যে তীর্থস্থানে বাস করেন, সেই তীর্থসমূহ 'ঋষিতীর্থ' বা 'আর্ষতীর্থ' নামে পরিচিত। অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, মনু, কুরু, কনখল, ভদ্রাশ্ব, সগর, অশ্বযূপ, নাচিকেতা ও বৃষাকপি প্রভৃতি রাজারা যে সব তীর্থ নির্মাণ করেন, সে-সব তীর্থস্থান 'শুভমানুষ তীর্থ' নামে পরিচিত। মানুষ যশোলাভের জন্যই তীর্থ নির্মাণ করে কিন্তু দৈবতীর্থসমূহ আপনা থেকেই উদ্ভূত হয়। এই সমস্ত তীর্থই পবিত্রতার আধার।

—'তীর্থভেদবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একাত্তর

ব্রহ্মা বলে চললেন—এবার আপনাদের দৈবতীর্থের কথা বলছি। ত্রিদৈবত্য তীর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখা হয়, ততক্ষণ অন্যান্য তীর্থসমূহকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। ত্রিদৈবত্য তীর্থ দেখার পর আর কোন তীর্থই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় না। যে পবিত্র গঙ্গা নদী পৃথিবীতে প্রবাহিত এঁকেই 'ত্রিদৈবত্যা' নামে অভিহিত করা হয়। কি করে এঁর উৎপত্তি হল, সেই কথাই বলছি। অনেক দিন আগে তারক নামে এক বলবান অসুর আমার বরে গর্বিত হয়ে দেবতাদের সমস্ত ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে। তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা নিরুপায় হয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়নকারী বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর স্তব করেন—এই ত্রিভুবনে তুমি ছাড়া বিপন্ন জনগণের ত্রাণকর্তা আর কেউ নেই। ত্রিবিধ তাপকে তুমিই প্রশমিত কর। তুমি অখিল জগতের পিতা এবং মাতাও তুমিই। একমাত্র সেবার দ্বারাই তোমাকে পাওয়া যায়। বিভিন্ন মূর্তি ধরে বিভিন্ন সময়ে তুমি আমাদের রক্ষা করেছ। এখন আমরা সর্বস্ব খুইয়েছি; এমন কি আমাদের স্ত্রী-পুত্রেরাও সেই তারকাসুরের হাতে নির্যাতিত। আর সে এমনই দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে যে তাকে যুদ্ধের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা অথবা অভিশাপ প্রদান করেও আমরা হত্যা করতে পারি না। দশ দিনের চেয়েও বয়স যার কম এমন বালকের হাতেই এর মৃত্যু হবে। এবার আপনি যা করবার করুন। তার মৃত্যুর কারণ আপনাকে জানালাম। যা হোক একটা বিধি-ব্যবস্থা করুন।

দেবতাদের কথা শুনে নারায়ণ বললেন—দেখুন, আমি, আমার সন্তান বা অন্য কোন

দেবতা এই অসুরকে বধ করতে সমর্থ নয়। যদি ভগবান শংকরের কোন পুত্র জন্মায়, তবে সেই পুত্রই তারকাসুরকে নিধন করতে সক্ষম হবে। তাই আপনাদের বলছি, চলুন, ভগবান শংকরের বিবাহের ব্যবস্থা করি।

দেবতারা তখন সবাই মিলে হিমালয়ে গেলেন এবং হিমালয় ও মেনকাকে বললেন—পুরাকালে দক্ষকন্যা সতী ছিলেন ভগবান শংকরের পত্নী ; তিনিই দেবতাদের কার্য-সাধনের জন্য আপনাদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবেন। পরে তাঁরই সঙ্গে ভগবান শংকরের বিয়ে হবে।

তারপর যথাকালে হিমালয় ও মেনকার কন্যারূপে দক্ষকন্যা জন্মগ্রহণ করলেন। নাম হল গৌরী। দেবতাদের অনুরোধে গৌরী শিবের প্রসন্নতা অর্জনের জন্য তাঁর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এদিকে দেবতারা গৌরীর প্রতি শিবের অনুরাগ জন্মানোর জন্য বৃহস্পতির পরামর্শক্রমে কামদেব মদনকে নিযুক্ত করলেন। মদনকে সাহায্য করার জন্য আবার বসন্তকে অনুরোধ জানানো হল। তখন কামদেব মদন নিজের স্ত্রী রতি ও বন্ধু বসন্তকে নিয়ে শিবের কাছে পেঁছিলেন। শিব ছিলেন ধ্যানে নিমগ্ন। মদন পুষ্পশরে ভগবান শংকরকে যেই বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন, অমনি সহসা মহাদেবের ধ্যান গেল ভেঙে ; আর তাঁর কপালস্থিত তৃতীয় নেত্র থেকে অগ্নি বেরিয়ে গিয়ে মদনকে তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে ছাই করে দিল। দেবতারা কাছাকাছিই ছিলেন। এ রকম ভয়ানক ঘটনা দেখে ভীত হয়ে তাঁরা ভগবান শংকরের স্তব করতে লাগলেন—আপনি দেবাদিদেব, সবই আপনি জানেন। তবু আপনাকে বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে, তারকাসুরের হাতে আমরা নিগৃহীত হয়েছি। সে আমাদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের পরিত্রাণের জন্য আপনি হিমালয় কন্যা গৌরীকে বিয়ে করুন।

দেবতাদের কথা ভেবে এবং মদনবাণে বিদ্ধ হয়েছিলেন বলে শিব দেবতাদের প্রস্তাবে রাজী হলেন। দেবতাদের অনুরোধে তখন আমি, অরুন্ধতী, বসিষ্ঠ এবং বিষ্ণু শিবের বিয়ের জন্য হিমালয়ে গেলাম। অচিরেই হিমালয়ের সঙ্গে ভগবান শংকরের সম্বন্ধ স্থাপিত হল।

—'শম্ভুবিবাহসম্ভব' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ বাহাত্তর

হর-গৌরীর বিবাহ সম্পর্কে ব্রহ্মা বলে চললেন—হিমালয় পর্বতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বিশাল পর্বতের নানা জায়গায় কত নদ নদী, সরোবর ও কূপ প্রভৃতি রয়েছে। হর-গৌরীর বিবাহকে কেন্দ্র করে সেখানে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ প্রভৃতি এসে উপস্থিত হল। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, পৌলস্ত্য ও লোমশ প্রভৃতি ঋষিরা হিমালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের বিয়ের জন্য রত্নময় এক বেদী নির্মিত হল। জয়া, লক্ষ্মী, শুভা, ক্ষান্তি, কীর্তি ও তুষ্টি প্রভৃতি দেবীরা সেই বেদীতে বিরাজ করতে লাগলেন। অন্যান্য পর্বতসমূহের দ্বারা সম্মানিত হয়ে মৈনাক অতিশয় শোভা বিস্তার করে সেখানে বিরাজ করছিলেন। ঋষিরা, লোকপালেরা, আদিত্যেরা ও মরুৎগণ ভগবান শংকরের বিবাহবেদী নির্মাণ করলেন। স্বয়ম্ভু বিশ্বকর্মা এক তোরণময় বেদী নির্মাণ করেন। সমস্ত পর্বত, সমুদ্র, নদী, ওষধি সেই বিয়েতে যোগদান করে। ইলা ভূমিকর্ম, ওষধিগণ অন্নক্রিয়া, বরুণ পানকর্ম ও কুবের

দানকর্ম করবার ভার নিলেন। অগ্নি স্বয়ং অন্ন প্রস্তুত করতে লাগলেন, বিষ্ণু পৃথক পৃথক পূজার কাজে নিযুক্ত হলেন। বেদগান হতে লাগল, অপ্সরা, গন্ধর্ব ও কিন্নরেরা পর্যন্ত নাচ-গান করতে লাগল। মৈনাককে খই ছড়ানোর কাজে নিযুক্ত করা হল। এদিকে ঘরের ভেতর পুণ্যাহবচন হতে লাগল। হর-গৌরী বিয়ের বেদীতে বসলেন। অগ্নি ও প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করে খইয়ের হোম শেষ করলেন নবদম্পতি। তারপর যথাবিধি অগ্নি প্রদক্ষিণ করলেন। অগ্নি প্রদক্ষিণ কারর পর ভগবান শঙ্কর হাত দিয়ে গৌরীর অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করলেন। আমি তখন হোম করছিলাম। হোম করতে করতে ভগবান শংকরের পাশে উপবিষ্ট গৌরীকে দেখলাম। তাঁকে দেখে আমার কাম জাগ্রত হল এবং তার ফলে আমার বীর্য ক্ষরিত হল। আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে যেন মিশে গেলাম। কী আর করি, ওই বীর্যকে ছড়িয়ে দিলাম। ছড়ানো ওই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীর্য থেকে বালখিল্য মুনিদের উৎপত্তি হল। তখন দেবতাদের মধ্যে একটা আর্ত চিৎকার উঠল। আমি লজ্জায় আসন ছেড়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলাম। ভগবান মহাদেব নন্দীকে দিয়ে আমাকে কাছে ডাকলেন। তিনি বললেন, লোকে অপরাধ করলেও সাধুব্যক্তি তার প্রতি কৃপা করে থাকেন। বিষয়-সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিদেরও মোহ উৎপাদন করে থাকে। ভূমি ও জল আজ থেকে পাপীদের পাপমোচন করবে।

এই কথা বলে জল ও ভূমির পবিত্র সারাংশ নিয়ে তিনি ভূমিকে কমণ্ডলু করলেন। সেই কমণ্ডলুতে জল দিয়ে পাবমানী সূক্ত আবৃত্তি করে তাকে অভিমন্ত্রিত করলেন। তারপর সেই কমণ্ডলুতে ত্রিলোকের পবিত্রতা বিধায়ক শক্তিকে ধ্যান করলেন। সেই কমণ্ডলু আমাকে দিয়ে তিনি বললেন--ভূমি এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর। জল এবং ভূমি--এঁরা উভয়েই পৃথিবীর মা। এই জল ও ভূমিময় কমণ্ডলুর মধ্যে সনাতন ধর্ম, যজ্ঞ, মুক্তি, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত বস্তুই রয়েছে। এই কমণ্ডলুর জলের কথা স্মরণ করলে মানস পাপ নষ্ট হয়, এই জলের কথা বর্ণনা করলে বাচিক পাপ এবং স্নান, পান ও অভিষেক করলে কায়িক পাপ নষ্ট হয়। পৃথিবীতে এই জলই পরম পবিত্র অমৃতস্বরূপ। পঞ্চভূতের মধ্যে জলই শ্রেষ্ঠ, আবার জলরাশির মধ্যে এই কমণ্ডলুর জলই উৎকৃষ্ট। এই জল স্পর্শ করলে, এমন কি এই জলের কথা চিন্তা করলেও মানুষের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

আমি শংকরের হাত থেকে কমণ্ডলু গ্রহণ করলে পর দেবতারা আনন্দিত হয়ে 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করলেন এবং মহাদেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন-দেবাদিদেবের পবিত্র বিবাহ উৎসবে ব্রহ্মা গৌরীমায়ের পায়ের সামনের দিক দেখে কামবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাতে করে পাপ তাঁকে স্পর্শ করেছিল, মহাদেব কৃপা করে তাঁর পবিত্রতার জন্য পবিত্র গঙ্গাকে কমণ্ডলুর মধ্যে আনয়ন করলেন।

--'ব্রহ্মকমণ্ডলুদান' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ তিয়াত্তর

নারদ তারপর আমার কাছে গঙ্গা কিভাবে পৃথিবীতে এসেছিলেন-এ কথা জানতে চাইলে, তাঁকে যা বলেছিলাম, সে কথা আপনাদের বলছি, শুনুন।

বলি নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্য ছিল; কোথাও তার পরাজয় ঘটত না। ধর্মপালনে, যশ-খ্যাতিতে, প্রজাপালনে, গুরুভক্তিতে, সত্যপালনে, বীর্য প্রদর্শনে, বল-

প্রকাশে, ত্যাগ ও ক্ষমাগুণে পৃথিবীতে কেউই তার সমকক্ষ ছিল না। দেবতারা তার সমুন্নত সমৃদ্ধি দেখে চিন্তিত হলেন এবং পরস্পর সম্মিলিত হয়ে কিভাবে বলিকে জয় করবেন, সে সম্বন্ধে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। এদিকে বলির রাজাশাসন কালে ত্রিভুবন নিষ্কণ্টক হল ; রোগ, শত্রুভয়, অনাবৃষ্টি, অধর্ম, অভাবজনিত আর্তনাদ বা দুর্জনের উপদ্রব কোন কিছুই ছিল না সে সময়। বলির সমৃদ্ধিরূপ শরে দেবতাদের মন ভেঙে গেল, কীর্তিরূপ খড়্গে তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত হলেন। তাঁরা কোথাও শান্তিলাভ করতে না পেরে এর প্রতিকার খুঁজে বের করবার জন্য বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা বিষ্ণুর কাছে এই প্রার্থনা জানালেন—আমাদের রক্ষার জন্যই তুমি বারংবার অস্ত্রধারণ করে থাক। আমরা যজ্ঞ করে তোমাকেই অর্চনা করে থাকি এবং তোমারই স্তবগানে আমাদের জিহ্বা মুখর হয়ে ওঠে। এখন দৈত্যকে কি করে আমরা নমস্কার করি ? তুমি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করে থাক, বিষ্ণুরূপে সমগ্র বিশ্বচরাচরকে রক্ষা করে থাক আবার রুদ্ররূপে বিশ্ব সংহার করে থাক। আমরা ঐশ্বর্য হারাতে বসেছি। তুমি আমাদের রক্ষা কর। তুমি থাকতে এই দৈত্যের অধীন হয়ে কিভাবে থাকব ?

দেবতাদের আবেদন ধৈর্য ধরে শোনার পর বিষ্ণু তাঁদের বললেন—শোন দেবতারা, বলি আমার ভক্ত ; সুতরাং দেবতা ও অসুরদের সে অবধ্য। আমার কাছে বলিও যেমন তোমরাও তেমন। তাই আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, অন্য উপায়ে বলির রাজ্য কেড়ে নিয়ে তোমাদের হাতে অর্পণ করব।

বিষ্ণুর আশ্বাস বাক্য শুনে দেবতারা ফিরে গেলেন। এদিকে ভগবান বিষ্ণু অদিতির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর জন্মগ্রহণের পর দেবসমাজে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞপুরুষ বামনরূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

এদিকে বলি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সেই যজ্ঞে অনেক ঋষি এসে পৌঁছলেন। বেদবিদ শুক্রাচার্য হলেন সেই যজ্ঞের পুরোহিত। যজ্ঞ আরম্ভ হলে পর দেবতা, গন্ধর্ব ও সর্পসমূহ হবির্ভাগ গ্রহণ করার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। সেই যজ্ঞের সমৃদ্ধি এতই ছিল যে, চারদিকে শুধু 'দাও, খাও' এই ধ্বনি উঠছিল। এমন সময় বামনদেব বিচিত্র কুণ্ডলে মণ্ডিত হয়ে সামগান করতে করতে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। শুক্রাচার্য কিন্তু তাঁকে দেখেই চিনতে পারলেন যে ইনি যজ্ঞ ও তপস্যার ফলদাতা ও রাক্ষস কুলের হত্যাকারী ছাড়া আর কেউ নন। তিনি তখন বলিকে ডেকে বললেন—বলি, এই যে বামনাকৃতি ব্রাহ্মণ তোমার যজ্ঞে এসেছেন, ইনি কিন্তু ব্রাহ্মণ নন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইনি সমস্ত যজ্ঞের আরাধ্য পুরুষ ভগবান বিষ্ণু। দেবতাদের মঙ্গলের জন্য শিশুরূপে তোমার কাছে কিছু চাইতে এসেছেন। সুতরাং আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে এঁকে কোনো কিছু দেবে না।

শুক্রাচার্যের কাছ থেকে এ কথা শুনে বলি তাঁকে বললেন—কী সৌভাগ্য আমার ! স্বয়ং বিষ্ণু আমার ঘরে এসেছেন ! এঁর প্রার্থনা তো পূরণ করতেই হবে ; এতে আর পরামর্শের কি আছে ? এ কথা বলেই তিনি স্ত্রী ও পুরোহিতের সঙ্গে বামনের কাছে গিয়ে তাঁর প্রার্থনা কী তা জানতে চাইলেন। উত্তরে বামন বললেন—তিনটে পা রাখা যায় এত পরিমাণ ভূমি তুমি আমায় দান কর। এছাড়া আমার আর কোন প্রার্থনা নেই। বলি সেই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনি নানারত্নখচিত কলসী থেকে জল ছিটিয়ে বামনদেবকে তাঁর প্রার্থিত ভূমি দান করলেন। সমস্ত ঋষি ও প্রধান প্রধান দৈত্যদের সামনেই এই

দানক্রিয়া সম্পন্ন হল। বামন তখন কেউ শুনতে না পায় এমন ভাবে স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করলেন। বামনদেবের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য যেই বলি তাঁর দিকে তাকালেন, অমনি দেখলেন—সেই বামনদেব বিরাট মূর্তি ধারণ করেছেন, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর স্তনের আড়ালে রয়েছে এবং দেবতারা রয়েছেন তাঁর মাথায়। তাঁর আকৃতি এতই বিশাল যে মনে হচ্ছিল যেন তার কোন শেষ নেই।

বামনদেবের এই বিশাল মূর্তি দেখে বলি বিনীত ভাবে বললেন—আপনি শক্তি অনুসারে যন্দুর ইচ্ছে পা দিয়ে আক্রমণ করুন। বলি এ কথা বারবার বলতে লাগলে বামনরূপী বিষ্ণু কূর্মপৃষ্ঠে পদন্যাস করে বলির যজ্ঞে পা রাখলেন। তাঁর দ্বিতীয় পা ব্রহ্মলোকে স্থাপিত হল। তখন বিষ্ণু বলিকে বললেন—আমার তৃতীয় পা কোথায় রাখি ? আর তো স্থান নেই। তুমি এই পা রাখবার স্থান দাও।

বলি তখন মৃদু হেসে বিষ্ণুকে বললেন—দেখুন, আপনিই এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সবই আপনি জানেন। তবু যখন আপনি এ কথা বলছেন, তখন আমিও বলছি শুনুন—আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না। আমার প্রতিজ্ঞাই সত্যি হোক। আপনি আমার পিঠেই পা রাখুন।

বলির প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বিষ্ণু তাকে বললেন—শোন বলি, তোমার ভক্তি আমায় মুগ্ধ করেছে। আমার কাছে থেকে তুমি বর গ্রহণ কর।

বলি বললেন—স্বয়ং ভগবানের কাছে চাইবার আমার কিছুই নেই। বিষ্ণু কিন্তু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রসাতলের প্রভুত্ব, ভাবীকালে ইন্দ্রপদ, আত্মার উপর প্রভুত্ব এবং অবিনশ্বর যশ দান করলেন। এভাবে সস্ত্রীক বলিকে বর দিয়ে, তাকে রসাতলে স্থাপন করে ইন্দ্রকে দেবরাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় পা ব্রহ্মলোকে স্থাপিত হয় এ কথা আগেই বলেছি। বিষ্ণুর চরণকে তো যথোচিত ভাবে অভ্যর্থনা জানানো উচিত পূজা প্রভৃতি করে। কি দিয়ে তার সৎকার করি, এ কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়ে গেল কমণ্ডলুর কথা। এর জল পবিত্র ; স্বয়ং শংকর এতে জল দিয়ে একে পবিত্র করে তুলেছেন। আমি তখন সেই শান্তিকর, এবং রোগ ব্যাধির অব্যর্থ ওষুধ স্বরূপ কমণ্ডলুর জল দিয়ে নিজেকে পবিত্র করলাম। তারপর সেই জল দিয়ে অর্ঘ্য রচনা করে বিষ্ণুপদে ঢাললাম। বিষ্ণুর চরণ থেকে গড়িয়ে সেই জল পর্বতের উপর পড়ল এবং সেখানে চারভাগে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীতে এলো। দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম—চারদিকেই সে জল পড়ল। দক্ষিণ দিকে যে ধারা পড়ল, মহাদেব তাঁর জটায় তাকে ধারণ করলেন। পশ্চিম দিকের জল আবার সেই কমণ্ডলুতে ফিরে এল। উত্তরে যা পড়েছিল বিষ্ণু তা গ্রহণ করলেন এবং পূর্বদিকের জল দেবতা, ঋষি, পিতা এবং লোকপালেরা সুখপ্রদ বলে সাদরে গ্রহণ করলেন ; সুতরাং সেই জলই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর চরণ থেকে গড়িয়ে যে জল দক্ষিণ দিকে পড়েছিল, সে জলধারা পৃথিবীর মায়ের মতো এবং যে ধারা মহাদেবের জটায় রয়েছে, তাকে স্মরণ করলেই সমস্ত কামনার বস্তু লাভ করা যায়।

—'গঙ্গার মহেশ্বরজটায় গমন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ চুয়াত্তর

এই সমস্ত ঘটনা শোনার পর নারদ আমাকে বললেন—শুনেছি; আপনার কমণ্ডলু ও মহাদেবের জটার মধ্যে গঙ্গা রয়েছেন। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে কি ভাবে এলেন—দয়া করে

এ কথা আমাদের বলুন।

নারদের অনুরোধে সেই পুরোনো দিনের কথা তাঁকে বলতে শুরু করলাম—শোন, যে পূত গঙ্গাজল মহাদেবের জটার মধ্যে ছিল, দুজন আহরণকারীর জন্য সেই ধারাও দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এর একভাগ গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ব্রত, দান ও সমাধি অবলম্বনে শিবের আরাধনা করে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। অন্য ভাগ প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা ভগীরথ তপস্যা ও নিয়মের দ্বারা শিবের আরাধনা করে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। আমার কাছ থেকে গঙ্গার এই দ্বিবিধ ধারার কথা শুনে নারদ আমার কাছে গৌতম ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে প্রসঙ্গে নারদকে যা বলেছিলাম, সে কথাই শোনাচ্ছি।

যে সময় উমা মহাদেবের প্রণয়িনী হয়েছিলেন, গঙ্গাও সে-সময় তাঁর প্রণয় লাভ করেন। রসরূপিণী গঙ্গাদেবীকে তিনি তখন বেশী ভালোবাসতেন। তাঁর চিন্তাতেই মহাদেবের সময় কাটত। গঙ্গা তাঁর জটার ভেতর থেকে কোনো এক কারণে উৎপন্ন হন। শঙ্কর তাঁকে জটার মধ্যে আবার লুকিয়ে ফেলেন। উমা কিন্তু মহাদেবের জটায় স্থিত গঙ্গাকে আদৌ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি গঙ্গাকে পরিত্যাগ করার জন্য মহাদেবকে বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও মহাদেব কোন মতেই সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। গৌরী মহাদেবের জটার ভেতর গঙ্গাকে খুঁজে পেলেন। তারপর এক সময় নির্জনে তিনি গণেশ, কন্দ ও জয়াকে বললেন—দেখ, এই কামুক মহাদেব কিছুতেই গঙ্গাকে পরিত্যাগ করবেন না। শোন গণেশ, মহাদেব আমার অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই গঙ্গাকে পরিত্যাগ করলেন না। সুতরাং আমি আবার হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করব। অথবা এও হতে পারে যে, যদি কোন পুণ্যবান ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্যা করে শঙ্করের জটায় স্থিত গঙ্গাকে পৃথিবীতে নিয়ে যান, তাহলেই আমার শান্তি।

গণেশ কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর অভিমত হল, ভাই কার্তিক এবং জয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে পিতাকে বোঝাতে হবে যাতে তিনি গঙ্গাকে পরিত্যাগ করেন। এই সময় পৃথিবীতে ভীষণ অনাবৃষ্টি আরম্ভ হল। এই অনাবৃষ্টি চোদ্দ বছর ধরে চলে। পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই সেই অনাবৃষ্টির কবলে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু গৌতমের পুণ্যাশ্রম এবং গৌতমের নিজের কোন ক্ষতি হল না। অনাবৃষ্টির কবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীকে নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্য আমি দেবগিরিতে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলাম। সেজন্যই ওই পর্বত তারপর থেকে ব্রহ্মগিরি নামে বিখ্যাত হয়। গৌতম সেই পর্বতকে আশ্রয় করে বাস করতে লাগলেন। গৌতমের আশ্রমে রোগ-ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, ভয়, শোক বা দারিদ্র্য কোন কিছুই ছিল না। গৌতম যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড এত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতেন যে সে-রকমটি আর কেউই করতে পারতেন না। পৃথিবীতে তো বটেই, দেবলোকেও গৌতমের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত। ক্রমে গৌতমের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় নানা আশ্রমবাসী লোক গৌতমের আশ্রম দেখতে এবং গৌতমের সান্নিধ্য লাভ করতে এলেন। গৌতম কাউকে শিষ্যের মতো, কাউকে পুত্রের মতো, কাউকে বা পিতার মতো পরিপোষণ করতে লাগলেন। যাঁর যা প্রয়োজন গৌতম তাকে তাই দিয়ে সবাইকেই পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করলেন। গণেশের কাছে গৌতমের এই তপঃ-প্রভাব তথা লোকখ্যাতির কথা পৌঁছল। তিনি মাকে বললেন, গঙ্গাকে বিতাড়িত করবার একটা উপায় খুঁজে পাওয়া গেছে। দেবসমাজে মহর্ষি গৌতমের মাহাত্ম্যকথা আমি

শুনেছি ; এও শুনেছি যে, দেবতারাও যা করতে পারেন না, গৌতম তা অনায়াসেই করতে সক্ষম। তিনিই আরাধনায় পিতাকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে ভূতলে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি যাতে আমাদের ঈপ্সিত কাজ করেন সে চেষ্টাই এখন করা উচিত।

মাকে এ কথা বলেই গণেশ ব্রাহ্মণ রূপ ধরে গৌতমের আশ্রমে গেলেন এবং বেশ কিছু দিন সেখানে বাস করলেন। গৌতমের আশ্রমে অন্যান্য মুনিদের সঙ্গে বাস করার সময় গণেশ তাঁদের খুব প্রিয় এবং বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন। তিনি তখন সমবেত মুনিদের বললেন—শুনুন, অনেক দিন আমরা এখানে থাকলাম। আর থাকা চলে না ; এবার আমাদের যে যার জায়গায় যাওয়া উচিত। তবে, মহর্ষি গৌতমের অন্ন যখন আমরা গ্রহণ করেছি, তখন না জানিয়ে যাওয়াটা তো ঠিক হবে না।

গণেশের কথায় সম্মত হয়ে মুনিরা গৌতমকে চলে যাওয়ার কথা বললে তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁদের বললেন—আপনাদের যদি কোন অসুবিধা হয়ে থাকে বলুন, প্রাণপণে তার প্রতিকার করতে চেষ্টা করব। আপনারা যাবেন না। পুত্রের মতো আমি আপনাদের সেবা করব। আমার এই আশ্রম তো আপনাদেরই।

গৌতমের মনোভাব নিজ কার্যসাধনের পক্ষে অনুকূল নয় বুঝতে পেরে ব্রাহ্মণরূপী গণেশ মুনিদের বললেন—শুনুন, আমরা গৌতমের অন্নদাস হয়ে থাকব কেন? তিনি আমাদের উপকারই করেছেন। বিনিময়ে আমাদের তো তাঁর উপকারই করা উচিত। আপনারা যদি আমার উপর সব ভার ছেড়ে দেন তবে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে।

গণেশের কথায় মুনিরা রাজী হয়ে তাঁকে এমন কাজ করতে বললেন যাতে মহাত্মা গৌতম সহ জনসাধারণেরও মঙ্গল হয়। কৃতসংকল্প গণেশ কার্যসিদ্ধির উপায় ঠিক করে জয়াকে বললেন—শোন, তুমি একটি গাভীর মূর্তি ধারণ করে গৌতমের শালিধানের মাঠে গিয়ে শস্য নষ্ট করতে থাকবে। তোমাকে সেই অবস্থায় কেউ যদি দণ্ড দিয়ে প্রহার করে, তবে তুমি এমন ভাবে সেখানে পড়ে থাকবে যেন তুমি মরে গেছ। হ্যাঁ শোন, কেউ যেন এ কথা জানতে না পারে। জয়া গণেশের কথামতো গৌতমের ধানের ক্ষেতে গিয়ে শস্য নষ্ট করতে লাগল। গৌতম তখন সামান্য তৃণ দিয়ে সেই গাভীকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলে সেই গাভীটি প্রচণ্ড চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। গাভীটির চিৎকার শুনে মুনিরা ছুটে এলেন। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে মুনিরা তখনই সে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। গৌতম তখন বাজপড়া গাছের মতো তাঁদের সামনে মাটিতে শুয়ে পড়ে বিনীত ভাবে তাঁদের যেতে নিষেধ করলেন। মুনিরা কিন্তু তাঁর আবেদনে কর্ণপাত না করে চলে যেতে চাইলে গৌতম কাতরভাবে তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানালেন—আমাকে এভাবে বিপদে ফেলে চলে যাবেন না। দোহাই আপনাদের, আপনারা আমার সহায় হোন। আমাকে পাপস্খালনের ব্যবস্থা করে দিন।

মুনিদের প্রতিনিধি হিসাবে গণেশ বললেন—এই গাভী মৃত বা জীবিত, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আপনারা যদি আমার কথা অনুমোদন করেন এবং স্বয়ং গৌতম যদি রাজী থাকেন তবে একটা উপায়ের কথা আমি বলছি। আমরা সবাই এ কথা শুনেছি যে, ব্রহ্মার কমণ্ডলুর পবিত্র জল মহাদেবের জটায় রয়েছে। এই জলধারা পবিত্র গঙ্গাদেবীরই অংশ। মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম যদি সেই জলধারা এখানে নিয়ে আসতে পারেন এবং তার স্পর্শে এই গাভীকে অভিষিক্ত করতে পারেন তবে তাঁর পাপ স্খালনও হবে, আমরাও এখানে থাকব।

গণেশের প্রস্তাবে গৌতম রাজী হলেন। মুনিরাও একে অনুমোদন করলেন। মুনিরা চলে যাওয়ার পর গৌতম তাঁর কৃতকার্যের কথা ভাবতে লাগলেন। সমস্ত দিক বুদ্ধিবলে বিচার করে এবং ধ্যানযোগে তিনি তখন সমস্ত কথা জানতে পারলেন। এ কথা ভেবে তিনি সান্ত্বনা পেলেন যে, তিনি বস্তুত কোন পাপ করেন নি। তবু সমস্ত দিক চিন্তা করে মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করাকেই মঙ্গলজনক বলে মনে করলেন। এতে হরজায়া গৌরীকে সন্তুষ্ট করা যাবে ; কারণ, গঙ্গা তো তাঁর সতীনই বটে। এ সব কথা ভেবে ব্রহ্মগিরি থেকে গৌতম কৈলাস পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন।

—'বিনায়কগৌতমব্যাপারনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ পঁচাত্তর

তারপর ঋষি গৌতম কৈলাস পর্বতে গিয়ে, বাক্য সংযত করে ভক্তিবিনম্র চিত্তে মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন—তুমি দেবাদিদেব, ভোগার্থী মানুষকে অভীষ্ট ভোগ দান করার জন্য তুমি তোমার প্রসিদ্ধ অষ্টমূর্তি ধারণ কর। তোমার যে সোমমূর্তি, লোকে তাকে মহাদেব নামে স্তব করে থাকে। তোমার মহীময় রূপে তুমি সকল মানবের সুখবিধান কর, সমগ্র বিশ্বকে পালন করে থাক এবং সমগ্র বিশ্বচরাচরের সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে থাক। তোমার যে জলময় রূপ, সেই রূপে তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য এবং ভূমির আধানের জন্য প্রযত্ন করে থাক। তোমার যে চন্দ্রসূর্যময় রূপ, সেই রূপে তুমি কালব্যবস্থা, জীবসৃষ্টি, জীববিনাশ এবং প্রজাদের আনন্দ, সুখ ও উন্নতি বিধান করে থাক। বায়ুরূপে তুমি জীবগণের বৃদ্ধি, গতি, শক্তি ও প্রচুর প্রমোদ বিতরণের ব্যবস্থা করে থাক। তুমি নিজেই নিজেকে জানো, তোমার তত্ত্ব তুমি ছাড়া আর কেউই জানে না। ভেদ ব্যতীত কোন কৃতি, ধর্ম, দিক, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী, মুক্তি প্রভৃতি কোন কিছুই হয় না ; তাই তোমার এই ব্যোমময় দেহ রয়েছে। তুমিই ধর্মব্যবস্থার জন্য ঋক, সাম, যজুঃ ও অন্যান্য বেদের শাখা এবং স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র বিভাগ করে সেই সেই শব্দ-স্বরূপতা লাভ করেছ। এইটিই তোমার শব্দ-মূর্তি। যজ্ঞকারী তুমি, যজ্ঞও তুমি। যজ্ঞের বিবিধ সাধন, ঋত্বিক, যজ্ঞীয় দেশ, যজ্ঞের ফল, যজ্ঞীয় দেশকাল,—এ সবই তুমি। তোমারই যজ্ঞময় দেহ পরমার্থতত্ত্ব বলে পৃথিবীতে নির্দিষ্ট। তুমিই এ জগতের কর্তা, সর্বজ্ঞ, পরমপুরুষ এবং পরমাত্মা স্বরূপ। বেদজ্ঞানের দ্বারা, গুরুর উপদেশের দ্বারা কিংবা বুদ্ধি প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই তোমাকে জানা যায় না। তোমার জন্ম নেই, কোন পরিমাণ নেই তোমার ; তুমিই শিব, তুমিই সত্য। তোমাকে বারংবার নমস্কার জানাই। প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় সমস্ত কিছুতেই তুমি নিজের থেকে পৃথকভাবে দর্শন কর, আবার কখনো বা নিজের প্রকৃতিকে 'এ আমারই সম্পদ' এভাবে দর্শন কর। এ সময়ই তুমি পৃথকরূপে প্রতিভাত হও ; কেননা তুমি বহু, সারা বিশ্ব জুড়ে তোমার মূর্তি। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তিতে যিনি কারণস্বরূপ সেই নিত্যা, মঙ্গলময়ী গৌরীই মহাদেবের শক্তি। অনাদিকাল থেকে তোমাদেরই অভিন্ন মূর্তি পৃথিবীর উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ধ্বংস সম্পাদন করে। জীবগণ যাঁর প্রীতির জন্য অন্ন ও ধনরাশি দান করে, ধর্মাচরণ ও তপস্যার অনুষ্ঠান করে, সেই উমাই সোমপ্রিয়া অম্বা। স্বয়ং ইন্দ্রও যাঁর কৃপা ভিক্ষা করে থাকেন এবং যাঁর নাম উচ্চারণ করলে সকলেরই মঙ্গল

হয়, যিনি সমগ্র জগৎ ব্যেপে বিরাজ করেন, সেই উমাদেবী সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র করেন। বিশ্বের মানবসমূহ সমস্ত শ্রুতিবাক্য ও শিবের প্রভুত্ব পর্যালোচনা করে ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যে ভোগ্যবস্তুসমূহ উপভোগ করে থাকে, তা শিবের বিভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যা সারভূত এবং যে একমাত্র উপাসনার যোগ্য সেই পরম ব্রহ্মবস্তুকে ধ্যান করে যোগীরা মুক্তিলাভ করে থাকেন। ভগবান শংকরই সাক্ষাৎ মুক্তি। জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবান শংকর যে যে রূপ ধারণ করে থাকেন, তুমি তাঁর যোগ্য পত্নী হয়ে তাঁকে সাহচর্য দান করে থাক। তুমি মূর্তিমতী পাতিব্রত্য।

গৌতম যখন এভাবে স্তব করছিলেন তখন তাঁর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে, গণেশ প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে শিব এবং গৌরী সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান শংকর গৌতমকে বললেন--শোন গৌতম, তোমার ভক্তিতে এবং ব্রতচারণে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার যা চাইবার আছে বল।

গৌতম সপরিবারে শিবকে দেখে যারপরনাই আনন্দিত হলেন এবং তাঁদের প্রণাম করে বললেন—যদি আমার উপর তুমি তুষ্ট হয়ে থাক, তবে তোমার জটায় যে গঙ্গা আছেন, তাঁকে আমার হাতে সমর্পণ কর।

উত্তরে শংকর বললেন—পৃথিবীর উপকারের জন্য তুমি গঙ্গাকে প্রার্থনা করেছ; সুতরাং তাকে তুমি পৃথিবীতে নিয়ে যেতে পারবে।

গৌতম তখন মহাদেবের কথায় তাঁর কাছে দ্বিতীয়বারে এই প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি যে স্তবে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন, যে ভক্তেরা সেই স্তবে গৌরীর সঙ্গে হরের কাছে প্রার্থনা জানাবে তাদের সমস্ত প্রার্থনাই যেন পূর্ণ হয়। আর এ প্রার্থনাও তোমার কাছে রাখি যে তুমি এই গঙ্গাদেবীকে ব্রহ্মগিরিতে পরিত্যাগ কর। এই গঙ্গা সমস্ত নদীর মধ্যে তীর্থভূত হয়ে সাগরের অভিমুখে ধাবিত হবেন। এঁর জলে স্নান করলেই যেন মানসিক, বাচিক ও কায়িক সমস্ত পাপ, এমন কি ব্রহ্মহত্যার পাপও যেন নষ্ট হয়ে যায়। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের দিন, অয়ন, বিষুব প্রভৃতি যোগ উপলক্ষে অন্যান্য পবিত্র তীর্থে স্নান করলে যে ফল পাওয়া যায়, এঁকে স্মরণ করলেই যেন মানুষ সেই ফল পায়। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় যজ্ঞকর্ম, দ্বাপরে যজ্ঞ ও দান এবং কলিযুগে একমাত্র দানই শ্রেষ্ঠ। এই সব যুগধর্ম, সমস্ত দেশধর্ম এবং দেশকাল প্রভৃতির যোগে যে ধর্ম যেখানে প্রশস্ত বলে উল্লিখিত রয়েছে এবং অন্যান্য তীর্থে স্নান, দান ও সংযম প্রভৃতির দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এই গঙ্গানদীর স্মরণমাত্রেই সেই পুণ্য উৎপন্ন হোক। এই দেবনদী যেখান দিয়ে প্রবাহিত হবেন সেখানে তুমিও যেন বিরাজ কর। এই দেবনদীর তীরভূমি থেকে দশ হাজার যোজন পরিমিত স্থানে যারা বাস করে, তারা যদি মহাপাপও করে তবে তারা এবং তাদের পিতারা যেন মুক্তিলাভ করে। তাছাড়া এই নদীতে স্নান করতে এসে স্নান করার আগেই যদি কারো এই দশ হাজার যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানের মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে তারও যেন মুক্তিলাভ হয়। সমস্ত তীর্থে স্নান করলে যে ফল লাভ হয়, একমাত্র গঙ্গাস্নানেই যেন মানুষ সেই ফল লাভ করে।

গৌতমের বলা শেষ হলে শিব তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমি তোমাকে তিন সত্যি করে এ কথা বলছি যে, সমস্ত নদীর চেয়ে পবিত্র এই গঙ্গা। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর ছিলও না, হবেও না। এ কথা বলেই শংকর উমা ও গণেশকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

গৌতম তখন দেবতাদের সঙ্গে মহাদেবের জটায় স্থিত সেই গঙ্গাদেবীকে নিয়ে ব্রহ্মগিরিতে গেলেন। গৌতম যখন গঙ্গাকে ব্রহ্মগিরিতে নিয়ে আসছিলেন, তখন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল। তখন দেবতারা, ঋষিরা, ব্রাহ্মণেরা এবং ক্ষত্রিয়েরা গৌতমের প্রশংসায় মুখর হলেন।

—'গৌতম কর্তৃক গঙ্গানয়ন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ ছিয়াত্তর

গৌতম ব্রহ্মগিরির শিখরে গঙ্গাকে স্থাপন করে বললেন—তুমি সমস্ত কামনা পূরণ করে থাক। কৈলাস থেকে এত দূর পর্যন্ত তোমায় নিয়ে আসায় যে ক্লেশ তোমাকে ভোগ করতে হয়েছে, সেজন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি সুখে গমন কর এবং সকলের হিতসাধন কর। গৌতমের কথা শুনে গঙ্গা তাঁকে বললেন—গৌতম, তুমি সত্যবাক হলে ; আমি এখন কৈলাসে অথবা ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে কিংবা রসাতলে যাব। গঙ্গার কথা শুনে গৌতম বললেন—ত্রিভুবনের উপকারের জন্য আমি আপনাকে প্রার্থনা করেছিলাম। ভগবান শংকরও সেজন্যই আপনাকে দান করেছেন ; তাই বলি, আমার প্রার্থিত বিষয়ের যেন কোন অন্যথা না হয়। গৌতমের কথায় গঙ্গাকে খানিকক্ষণ চিন্তা করতে হল। তিনি সবদিক বিবেচনা করে নিজেকে তিনভাগে বিভক্ত করলেন—একভাগ স্বর্গে, একভাগ পৃথিবীতে এবং অপরভাগ রসাতলে প্রবাহিত হল। স্বর্গে চারটি ধারায়, পৃথিবীতে সাতটি ধারায় এবং রসাতলে চারটি ধারায়—এভাবে মোট পনেরোটি ধারায় তিনি প্রবাহিত হলেন। বেদে গঙ্গাকে পবিত্র এবং ফলদায়িনী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মর্ত্যবাসীরা তাঁর যে ধারা পাতালে প্রবাহিত তা দেখতে পায় না, আবার তাঁর যে ধারা স্বর্গে প্রবাহিত হয়, তাও তারা দেখতে পায় না। যা হোক, গৌতম সেই পবিত্র গঙ্গাদেবীকে প্রদক্ষিণ করে ভাবলেন যে তিনি গঙ্গায় স্নান করে মহাদেবের অর্চনা করবেন। স্মরণ করতেই ভগবান শংকর এসে গৌতমকে দেখা দিলেন। গৌতম তাঁর কাছে তীর্থস্নানবিধি জানতে চাইলে শংকর তাঁকে বললেন—গোদাবরী নদীর স্নান সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ শোন। প্রথমে নান্দীমুখ করে দেহশুদ্ধি করবে। তারপর ব্রাহ্মণদের খাইয়ে তাঁদের আদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে তীর্থস্নানে যাবে। কথা যতটা সম্ভব কম বলবে। যার চিত্ত সংযত এবং যার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্তি আছে, তিনিই তীর্থফল লাভ করেন। তীর্থে পুণ্যকামী মানুষ সাধু-সন্ন্যাসীদের কাপড়-চোপড় দান করবেন, এবং ভালো ভাবে খাওয়াবেন। গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কথা শুনবেন। এই নিয়ম পালন করে যে তীর্থে যায়, তার বিশিষ্ট তীর্থফল লাভ হয়।

—'তীর্থমাহাত্ম্য' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ সাতাত্তর

তীর্থস্নানবিধির বর্ণনা প্রসঙ্গে শংকর বলে চললেন—শোন গৌতম, এই স্বভাবপবিত্র গঙ্গা যেখান দিয়ে বয়ে যাবেন তার দু'হাত পরিমিত স্থানে সমস্ত তীর্থই বিরাজ করবে। আমিও সেখানে থাকব। গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ এবং সাগরসঙ্গম—এই তিন জায়গায় ভাগীরথী

দেবীকে দর্শন করলে মানুষ মুক্তিলাভ করে থাকে। অমরকন্টক পর্বতে নর্মদা নদী প্রবাহিত। যমুনা নদী তার সঙ্গে মিলেছে। প্রভাসতীর্থে সরস্বতী প্রবাহিত। কৃষ্ণা ভীমরথী ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থল তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। এই তীর্থদর্শনে মানুষের মুক্তিলাভ হয়। পয়োষ্ণী নদী যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে সে-স্থানও অতি পবিত্র কোন কোন তীর্থ কালবিশেষে এবং কোন কোন তীর্থ দেবসমাগমে পবিত্র হয়; কিন্তু এই গঙ্গা নদী, যা আজ থেকে গৌতমী নামেও পরিচিত হবে, সমস্ত কালেই সবার কাছে পবিত্র। এই গৌতমী নদীর দু'শো যোজনের মধ্যে সাড়ে তিনকোটি তীর্থ বিরাজ করবে এই গৌতমী গঙ্গা মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী গোদাবরী, নন্দা ও সুনন্দা নামে পরিচিত এই নদী সর্বদাই আমার প্রিয়। ক্ষিতি প্রভৃতি পাঁচটি ভূতের মধ্যে জলই শ্রেষ্ঠ; তার উপর তা আবার তীর্থভূত। সুতরাং জল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে বিখ্যাত। এই জলের মধ্যে ভাগীরথী শ্রেষ্ঠ এবং ভাগীরথী থেকেও গৌতমী শ্রেষ্ঠতর। মহাদেবের জটা থেকে একে নিয়ে আসা হয়েছে, তাই এর চেয়ে পবিত্র তীর্থ আর কিছুই নেই।

স্বয়ং মহাদেব গৌতমকে এ সব কথা বলেছিলেন; আমি তোমাকে এ কথা বললাম। তুমি আর কী শুনতে চাও, বল।

—'তীর্থমাহাত্ম্যবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ আটাত্তর

ব্রহ্মার প্রশ্নে উৎসাহিত হয়ে নারদ তাঁকে সবিনয়ে বললেন—ঋষি গৌতম গঙ্গাকে যেভাবে পৃথিবীতে এনেছিলেন, সে-কথা আপনার কাছ থেকে শুনেছি; ক্ষত্রিয় রাজা গঙ্গাকে যেভাবে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন, সে-কথা দয়া করে বলুন। সেই পবিত্র ও প্রাচীন কথা বিস্তৃতভাবে আমাকে বলুন।

নারদের অনুরোধে ব্রহ্মা সেই প্রাচীন কথা বলতে আরম্ভ করলেন। পুরাকালে বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে ইক্ষ্বাকু-বংশে সগর নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর দুজন স্ত্রী। অনেক দিন পর্যন্ত রাজার কোন সন্তানসন্ততি না হওয়ায় তিনি চিন্তান্বিত হয়ে মহামুনি বসিষ্ঠের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বসিষ্ঠ তাঁকে ভক্তিসহযোগে ঋষিদের সেবা করতে বললেন। একবার রাজপ্রাসাদে এক অজ্ঞাতপরিচয় মুনি এলে রাজা যথোচিতভাবে তাঁর সৎকার করলেন। ঋষি রাজার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরগ্রহণ করতে বললে রাজা পুত্র প্রার্থনা করেন। ঋষি তখন রাজাকে বললেন—শুনুন মহারাজ, আপনার এক স্ত্রীর গর্ভে একটি বংশধর পুত্র জন্মাবে এবং অন্য স্ত্রীর গর্ভে ষাটহাজার পুত্র জন্মাবে। কালক্রমে রাজার হাজার হাজার পুত্র জন্মায়। তারপর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁর আয়োজিত অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্যে একটিতে তিনি নির্বাচিত অশ্বটির রক্ষার ভার অর্পণ করেন তাঁর ষাট হাজার পুত্রের উপর। ইতিমধ্যে ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রত্ব পদ হারাবার ভয়ে কোন এক জায়গা থেকে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করে নিলেন। সগরসন্তানগণ সেই অশ্বকে কোথাও না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। এদিকে কয়েকজন রাক্ষস সেই অশ্বকে নিয়ে রসাতলে গেল। সগরসন্তানগণ দেবলোক থেকে আরম্ভ করে কোথাও খুঁজতে বাকি রাখল না। পৃথিবীর জলে, স্থলে কোথাও সেই অশ্বকে খুঁজে পেল না। সে সময় আকাশে একটি বাণী শোনা গেল—'সগরনন্দনগণ,

তোমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব পাতালে আবদ্ধ রয়েছে।' সেই দৈববাণী শুনে সগরসন্তানেরা পাতালে যাওয়ার জন্য মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করল। খাদ্যাভাবে তারা ওই শুকনো মাটি খেয়েই থাকত। এভাবে তারা একদিন পাতালে গিয়ে পৌঁছল। বলবান সগরপুত্রদের আসার কথা শুনে রাক্ষসেরা ভীত হয়ে পড়ল। পাতালে কপিল মুনি যেখানে শুয়ে ছিলেন, তারা সেখানে গিয়ে পৌঁছল। কপিল মুনিকে দেখে তারা সগরের পুত্রদের হত্যার উপায় ঠিক করে নিল।

পুরাকালে দেবতাদের বিশেষ কাজ সম্পাদন করার পর মহাজ্ঞানী কপিল খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি তখন দেবতাদের এই শর্তে তাঁর ঘুমোবার জন্য এক জায়গা ঠিক করে দিতে বলেন যে, তাঁর ঘুমোনোর সময় কেউ যেন তাঁকে না জাগায়। ঘুম ভাঙলে, তিনি যাকেই সামনে দেখতে পাবেন সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। দেবতারা রাজী হয়ে তাঁকে পাতালে পাঠিয়ে দেন। রাক্ষসেরা সেই চুরি করে আনা ঘোড়াটিকে এনে কপিলের মাথার কাছে রেখে দিয়ে নিজেরা একটু দূরে লুকিয়ে রইল কি ঘটে তা দেখবার জন্য। ক্রমে সগরের পুত্রেরা পাতালে গিয়ে পৌঁছল। তারা ঘোড়াটিকে এবং শায়িত অবস্থায় কপিল মুনিকে দেখে মনে করল ওই ব্যক্তিই ঘোড়াটিকে চুরি করে এনেছে। তারা ঘোড়াটিকে নিয়ে পা দিয়ে নিদ্রিত কপিলকে আঘাত করতে লাগল। কপিলের ঘুম ভাঙলে তিনি সগরপুত্রদের দিকে যেই তাকালেন, অমনি তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এদিকে সগর কিন্তু এ সব কিছুই জানতে পারলেন না। নারদ সগরের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বললেন। সগর তখন তাঁর ইতিকর্তব্য বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে সগরের আরেক পুত্র ছিল। তার নাম অসমঞ্জ। সে এতই নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল যে, নগরীর বেশির ভাগ শিশুদের সে মেরে ফেলেছিল। প্রজারা এতে অসমঞ্জের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। সগরের কানে এ কথা পৌঁছলে তিনি অসমঞ্জকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু সমস্যা হল উত্তরাধিকারী নিয়ে। সগর তখন অসমঞ্জের ছেলে অংশুমানকে সমস্ত কাজের ভার দিলেন। অংশুমান বয়সে বালক হলেও বিচারবুদ্ধিতে প্রবীণ। সে মহর্ষি কপিলকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে যজ্ঞীয় অশ্বকে নিয়ে এলে সগরের আরব্ধ যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হয়। অংশুমানের পুত্র দিলীপ ধার্মিক ও তেজস্বী, তাঁর পুত্র ভগীরথ। ভগীরথ বড় হয়ে পিতামহদের দুর্গতির কথা জানলেন। সগরকে তাঁদের উদ্ধারের কথা জিগ্যেস করায় তিনি কোনো উপায় বলতে পারলেন না। তিনি ভগীরথকে পাতালে মহর্ষি কপিলের কাছে যেতে বললেন। ভগীরথ পাতালে গিয়ে কপিলকে সব কথা খুলে বললেন। কপিল ধ্যানে বসলেন। তারপর ভগীরথকে বললেন—তুমি ভগবান শঙ্করকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করে তাঁর জটায় অবস্থিত গঙ্গাদেবীকে এখানে নিয়ে এসো। স্বভাবপবিত্র গঙ্গার পূতধারার স্পর্শে তোমার পিতামহেরা উদ্ধার পাবেন, তুমিও পৃথিবীতে কীর্তিমান হয়ে থাকবে।

কপিল মুনির কথা অনুসারে ভগীরথ কৈলাসে গিয়ে শিবের আরাধনায় মগ্ন হলেন। তিনি শিবের স্তবগান করতে লাগলেন—শঙ্কর, আমি বালক; বালকের মতোই আমার বুদ্ধি। তোমার গূঢ়তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। আমার পিতৃপুরুষেরা, যাঁরা আমার কল্যাণে কোন না কোন ভাবে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের উদ্ধারসাধনের জন্যই আমার এই তপস্যা। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমাকে দয়া কর। ভগীরথ যখন মহাদেবের স্তবে নিমগ্ন, তখন স্বয়ং শঙ্কর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি

ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বর প্রার্থনা করতে বললে ভগীরথ বললেন—যদি তুমি আমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে থাক, তবে তোমার জটায় অবস্থিত গঙ্গাদেবীকে আমায় দাও—এইই আমার একমাত্র প্রার্থনা। মহাদেব ভগীরথকে গঙ্গা-দান করলেন এবং তাঁকে গঙ্গার স্তুতি করতে বললেন। মহাদেবের কথামতো ভগীরথ কঠোর তপস্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন। অবশেষে গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে পাতালে গেলেন। ভগীরথ পাতালে গিয়ে কপিল মুনিকে সমস্ত কথা জানালেন এবং গঙ্গাকে যথাবিধি পাতালে স্থাপন করলেন। তাঁকে প্রদক্ষিণ করে ভগীরথ বললেন—আমার পিতৃপুরুষেরা মহামুনি কপিলের দৃষ্টিপাতে ভস্মীভূত হয়ে গেছেন। তুমি তাঁদের উদ্ধার কর। ভগীরথের কথায় গঙ্গা সম্মত হলেন। তিনি দেবলোক থেকে পাতালে এসে ভগীরথের পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করলেন। তারপর গঙ্গা সুমেরু পর্বতকে প্লাবিত করে ভগীরথের অনুরোধে হিমালয়ে গেলেন, পরে হিমালয় থেকে ভারতবর্ষে অবতরণ করলেন এবং ভারতবর্ষের মধ্য দিয়েই পূর্বসাগরের অভিমুখে ধাবিত হলেন। এই গঙ্গাই ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ভাগীরথী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গঙ্গার একভাগ বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত গৌতমী এবং অন্য ভাগ বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথী নামে অভিহিত হয়েছে।

'ভাগীরথীর অবতরণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ উনআশি

এর পর নারদ আমার কাছ থেকে সমস্ত তীর্থের মাহাত্ম্য এবং ফলের কথা শুনতে চাইলে, আমি তাঁকে বলেছিলাম যে সমস্ত তীর্থের মাহাত্ম্য ও ফল বলবার ক্ষমতা যেমন আমার নেই তেমনি তোমারও তা শোনার সামর্থ্য নেই। তবুও সংক্ষেপে তীর্থসমূহের বিবরণ যেভাবে নারদকে দিয়েছিলাম, সেভাবেই আপনাদের কাছে পরিবেশন করছি।

যেখানে ভগবান ত্র্যম্বক শিব প্রত্যক্ষগোচর হন, সেই তীর্থ ত্র্যম্বকতীর্থ নামে বিখ্যাত। আরেক প্রসিদ্ধ তীর্থ বরাহ। এই তীর্থের বিবরণ বলি। পুরাকালে সিন্ধুসেন নামক এক রাক্ষস দেবতাদের পরাজিত করে যজ্ঞকে পাতালে নিয়ে চলে যায়। ফলে পৃথিবী থেকে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। যজ্ঞ নষ্ট হয়ে গেলে ইহকাল পরকালও নষ্ট হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় দেবতারা সেই রাক্ষসকে বধ করবার জন্য পাতালে গেলেন। কিন্তু তাঁরা সেই সিন্ধুসেনকে পরাজিত করতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁরা তখন পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন। সমস্ত কথা শুনে বিষ্ণু দেবতাদের আশ্বাস দিলেন যে তিনি সিন্ধুসেনকে বধ করে যজ্ঞকে উদ্ধার করবেন।

তারপর বিষ্ণু গঙ্গা যে পথে পাতালে গিয়েছিলেন, সেই পথেই বরাহমূর্তি ধারণ করে, পাতালে গিয়ে, সেখানকার দানব ও রাক্ষসদের নিহত করলেন এবং মুখে করে যজ্ঞকে নিয়ে পাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন। এদিকে ব্রহ্মগিরিতে দেবতারা বিষ্ণুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বরাহরূপধারী বিষ্ণু ব্রহ্মগিরিতে এসে গঙ্গায় তাঁর রক্তাক্ত দেহ ধুয়ে ফেললেন। তখন থেকে সে স্থানের নাম বরাহকুণ্ড। তারপর মুখ থেকে তিনি যজ্ঞকে বের করে দেবতাদের সামনে রাখলেন। এ কথাও বলা যায় যে, তাঁর মুখ থেকেই যজ্ঞের উৎপত্তি হয়। তখন থেকেই স্রুব যজ্ঞের একটি প্রধান অঙ্গ বলে উল্লিখিত হয়েছে। ওই বরাহকুণ্ড 'বরাহ-

তীর্থ" নামে পরিচিত। বরাহতীর্থে স্নান করলে সমস্ত যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। সেখানে যে ব্যক্তি তার পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে, তার পিতৃগণ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গে যায়।

—'বরাহতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ আশি

এবার কুশাবর্ত তীর্থের কথা আপনাদের শোনাব। সেই তীর্থের কথা স্মরণ করলেই মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। মহাত্মা গৌতম গঙ্গাকে সেখানে কুশ দিয়ে আবর্তিত করেছিলেন। কুশ দিয়ে আবর্তন করেই তিনি গঙ্গাকে সেখানে এনেছিলেন বলে এর নাম হয় 'কুশাবর্ত"। নীলগঙ্গা নীলাচল থেকে নিঃসৃত হয়ে সেখানে প্রবাহিত। সেখানে স্নান ও দান প্রভৃতি করলে পিতৃগণের তৃপ্তি হয়।

কপোত-তীর্থের কথা ত্রিভুবনে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এখন সেই পবিত্র কপোত-তীর্থের কথা বলছি। পুরাকালে ব্রহ্মগিরিতে এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির ব্যাধ ছিল। তার আকৃতি যেমন বিকৃত, মনও তেমনি নিষ্ঠুর। তার স্ত্রী পুত্রেরাও তার চরিত্র ও আকৃতির সার্থক উত্তরাধিকারী ছিল। সে পশু-পাখি শিকার তো করতই, এমন কি ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসীদেরও তার হাত থেকে রেহাই ছিল না। একদিন সে শিকারে গিয়ে বহু পশু-পাখি হত্যা করল এবং কতকগুলোকে ধরে খাঁচার মধ্যে পুরে রাখল। শিকার করতে করতে সে বনের অনেক ভেতরে চলে গিয়েছিল ; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে সে তখন ঘরে ফেরবার জন্য তৈরি হল। এদিকে শিকার করতে করতে সময়ের দিকে তার কোন খেয়ালই ছিল না। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। বোশেখ মাসের বিকেল। দেখতে দেখতে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। শুরু হল বৃষ্টি, সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। মাঝে মাঝে ভারি ভারি শিলাও পড়তে লাগল বৃষ্টির সঙ্গে। অন্ধকারে এবং ঝড়বৃষ্টির দাপটে সে পথ হারিয়ে বারবার ওই বনের মধ্যেই ঘুরতে লাগল ; কোথাও কোন আশ্রয় তার জুটল না। তখন ব্যাধের সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। মনে মনে সে তার নিষ্ঠুর স্বভাবকেই দায়ী করল এর জন্য। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে তার সামনে একটি বড় প্রাচীন গাছ দেখতে পেল। নক্ষত্রদের মধ্যে চাঁদের মতো, পশুদের মধ্যে সিংহের মতো সেই বনস্পতি বনের বৃক্ষসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সে তখনই ওই গাছে উঠে বৃষ্টির হাত থেকে খানিকটা রক্ষা পেল। গাছে বসে সে তার স্ত্রী পুত্রদের কথা ভাবতে লাগল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।

ওই গাছে অনেক দিন ধরে একটি কপোত সপরিবারে সুখেই বসবাস করছিল। সেই দুর্যোগের দিনও কপোত ও কপোতী অন্যান্য দিনের মতোই খাদ্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়েছিল। কপোতটি যথাসময়ে তার বাসায় ফিরে এলো, কিন্তু ঘটনাচক্রে কপোতী ওই ব্যাধের হাতে ধরা পড়ে তারই খাঁচায় জীবিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু কপোত সে কথা জানত না। সেই দুর্যোগের সন্ধ্যায় স্ত্রীকে ফিরে আসতে না দেখে কপোতটি খুব দুঃখিত হয়ে বিলাপ করতে লাগল। লোকে যেমন প্রিয়জনের বিচ্ছেদে তার গুণকীর্তন করে কপোতটিও প্রিয়ার বিরহে তার নানা কথা জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—হায়, আমার সেই প্রিয়া এখনো ফিরে এলো না। সে আমার স্ত্রী, আবার ধর্মজননীও বটে। সে আমার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিত্য সহচরী। আমার সন্তুষ্টিতেই তার সন্তুষ্টি আবার আমার দুঃখেই তার

দুঃখ বোধ হত। বিপদে সে যেমন আমায় সুপরামর্শ দিত, তেমনি সর্বদাই আমার কথা মেনে চলত। সে নেই বলে আমার ঘর অরণ্য হয়ে গেছে। গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। তাকে ছাড়া আমি থাকব কি করে! হায়, এ আমার কী দুর্গতি হল! এই সব বলে কপোতটি যখন বিলাপ করছিল, তখন ব্যাধের খাঁচা থেকে কপোতী সবই শুনল। কপোত যাতে শুনতে পায় এমন ভাবে সে জানাল—শোন, আমি খাঁচায় বিবশ হয়ে পড়ে আছি। এক ব্যাধ আমাকে বেঁধে এনেছে। এই বন্ধন-অবস্থায়ও এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার কাজে আমার স্বামী সন্তুষ্ট। তিনি আমার গুণ বর্ণনা করেছেন; তা সে গুণ আমার থাক আর নাই থাক। স্ত্রী-জাতির সব কিছুই হল তার স্বামী। স্বামী সন্তুষ্ট হলে সমস্ত দেবতাই সন্তুষ্ট হন। তুমিই আমার দেবতা, আমার প্রভু, বন্ধু, পরম আশ্রয়, ব্রত, আমার স্বর্গ ও মোক্ষ তুমিই। চিন্তা করো না। আমার জন্য দুঃখ করবারও দরকার নেই। মনকে ন্যায়পথে রাখ।

কপোতীর কথা শুনে কপোতটি গাছ থেকে নেমে এসে খাঁচাটা খুঁজে বার করল এবং দেখল যে ব্যাধটি মড়ার মতো পড়ে আছে। সে তখন কপোতীকে বলল—শোন, এই হিংস্র ব্যাধ লুব্ধক এখন অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে; তাই বলছি, তোমায় আমি এখন মুক্ত করে দিই। সে কথা শুনে কপোতী বলল—আমাকে মুক্ত করার চেষ্টাও করো না। তুমি তো জানোই যে, প্রাণীদের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী নয়। জীবই জীবের খাদ্যরূপে নির্দিষ্ট। এতে তো ব্যাধের কোন দোষই আমি দেখছি না, সে তার খাদ্য সংগ্রহ করেছে মাত্র। দেখ, ব্রাহ্মণদের গুরু যেমন অগ্নি, বর্ণসমূহের যেমন ব্রাহ্মণ, স্ত্রীদের যেমন স্বামী, তেমনি সমস্ত ব্যক্তিরই গুরু অভ্যাগত, অতিথি। অতিথিকে মিষ্টি কথায় আপ্যায়িত করলে স্বয়ং সরস্বতী তুষ্ট হন। অতিথিকে অন্নদান করলে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। পা ধোয়ার জন্য অতিথিকে জল দান করলে পিতৃপুরুষেরা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা প্রীত হন। অতিথিকে দেবতা বলেই জানতে হবে। সুতরাং তাঁকে উপেক্ষা করলে দেবতারাও উপেক্ষিত হন। তাই বলছি তুমি শান্ত হও; দুঃখ করার তো কোন কারণ নেই এতে। কল্যাণকর্মে তোমার বুদ্ধি স্থির হোক। উপকারী এবং অপকারী উভয়কেই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। দেখ, উপকারী ব্যক্তির উপকার তো সবাই করে থাকে; কিন্তু যিনি অপকারীর প্রতি সাধু ব্যবহার করে থাকেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পুণ্যবান এবং বিবেচক বলে পরিগণিত হন।

কপোতীর কথা শুনে কপোত বলল—তুমি ঠিক কথাই বলেছ। দুঃখে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি। কিন্তু শোন, তুমি যে অতিথি সেবার কথা বলছ, কি দিয়ে সেবা করি বল তো? পৃথিবীতে দেখা যায় যে কেউ কেউ হাজার লোককে, কেউ কেউ একশো লোককে, কেউ বা দশজনকে ভরণপোষণ করে। আবার কেউ বা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আমরা কষ্টে-সৃষ্টে উদর পূরণ করি। কোন সঞ্চয়ই তো আমাদের থাকে না। কি আমাদের আছে, যে তা দিয়ে এই অতিথির সেবা করি?

কপোতের কথায় কপোতী বলল—এই ব্যাধ এখন শীতে কাতর হয়ে পড়েছে। তাই বলছি, তুমি আগুন নিয়ে এসো এবং কাঠ, খড়, কুটো, যে ইন্ধনই পাও তাতে দিয়ে সেই আগুনকে উদ্দীপিত কর। তাহলে এই অতিথির পরিচর্যা করা হবে। কপোতটি তখন গাছের ডালে উঠে দেখতে পেল যে, দূরে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। সে সেখান থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নিয়ে এলো এবং কাঠ, খড়, কুটো প্রভৃতি দিয়ে ব্যাধের

সামনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এদিকে ঝড়বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। ব্যাধ আগুনের তাপে উঠে বসল এবং পরিতৃপ্তি বোধ করল। অতিথিকে ক্ষুধার্ত দেখে কপোতী তখন তার স্বামীকে বলল—তুমি এবার আমায় মুক্ত করে দাও। আমি নিজের দেহ দিয়ে ক্ষুধার্ত এই ব্যাধের তৃপ্তি বিধান করি। তাহলে তুমি সেই লোকে যেতে পারবে, যেখানে অতিথির সেবাপরায়ণ লোকেরা যায়। কপোতীকে বাধা দিয়ে কপোত বলল—আমি যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ সমস্ত কর্তব্য আমাকেই পালন করতে দাও। এ কথা বলেই কপোতটি তিনবার সেই অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করল। তারপর বিষ্ণুর নাম স্মরণ করে আগুনে প্রবেশ করল।

এই দৃশ্য দেখে ব্যাধ লুব্ধক নিজের মানবজীবনকে ধিক্কার জানাল এবং মনে মনে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হল। কপোতী তখন ব্যাধকে অনুরোধ করল- মহাশয়, দয়া করে আমায় মুক্ত করে দিন। পতিবিহীন এই জীবনে আর কী প্রয়োজন? আমি এখনই এই অগ্নিতে দেহত্যাগ করব। কপোতীর কথা শুনে ব্যাধ যেন মোহাবিষ্টের মতো খাঁচা থেকে তাকে মুক্ত করে দিল। মুক্ত হয়ে কপোতীটি বলল—সমস্ত অবস্থায় স্বামীর অনুগমন করাই স্ত্রীজাতির ধর্ম। বেদে এবং লোকসমাজে এই পথই প্রশস্ত বলে অভিহিত। পতিব্রতা নারী স্বামীর সাহায্যেই স্বর্গে গমন করে থাকে। যে নারী স্বামীর অনুগমন করে, সে বহুকাল পর্যন্ত স্বর্গে বাস করে। এ কথা বলেই সে ভূমিকে, গঙ্গাকে এবং যে গাছে বাস করত, সেই বনস্পতিকে নমস্কার করে নিজের সন্তানদের আশ্বাস দিল এবং লুব্ধককে অনুরোধ করল যেন সে তার সন্তানদের ক্ষমা করে। তারপর সে যখন আগুনে প্রবেশ করল, তখন আকাশে জয়ধ্বনি শোনা গেল। সেই পক্ষি-দম্পতি সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে স্বর্গে যেতে যেতে ব্যাধকে বলল—মহাশয়, আমরা দেবলোকে যাচ্ছি। এখন তোমার অনুমতি নিচ্ছি; কারণ তুমি আমাদের অতিথি। তোমার জন্যই আমাদের স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হল। তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

সমস্ত ঘটনা নির্বাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছিল ব্যাধটি। সে তখন তার ধনুক ও খাঁচাটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং হাত জোড় করে সেই পক্ষি-দম্পতিকে বলল—তোমরা সত্যই মহান। আমাকে পরিত্যাগ করো না। অজ্ঞান ব্যক্তিকেও কিছু জ্ঞান দান করা উচিত। আমি তোমাদের অতিথি, কিন্তু আমার প্রকৃতি বড়ই নিষ্ঠুর। আমার কিসে মুক্তি হতে পারে, সে কথা বলে যাও।

ব্যাধের কথা শুনে পক্ষি-দম্পতি তাকে বলল—তুমি গৌতমী নদীতে যাও। সেখানে গিয়ে নদীকে তোমার সব কথা জানাও। সেই পবিত্র গৌতমী গঙ্গায় পনেরো দিন ধরে স্নান করবে; তাহলেই সমস্ত পাপ থেকে তুমি মুক্তিলাভ করতে পারবে। তাদের কথামতো কাজ করায় ব্যাধও পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে দিব্য বিমানে স্বর্গে গেল। তারপর থেকেই সেই স্থান 'কপোততীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেই তীর্থে স্নান, দান, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যা কিছু করা হয়, সবই অক্ষয় হয়ে থাকে।

—'কপোততীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একাশি

ব্রহ্মা বললেন—এবার কার্তিকেয় তীর্থের কথা বলব। এই তীর্থ কৌমার নামেও পরিচিত। এই তীর্থের নাম শুনলেও মানুষ রূপবান হতে পারে। পুরাকালে তারকাসুর নিহত হলে

দেবতারা স্বর্গে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন। শিবজায়া পার্বতী তখন কার্তিকেয়কে বলেন–ত্রিভুবনে তোমার যা প্রিয় বস্তু, তুমি তা যথাসুখে ভোগ কর। তুমি দেবসেনাপতি, তোমার জন্যেই তো তারকাসুর নিহত হল। সুতরাং তোমার ঈপ্সিত বস্তু তুমি ভোগ কর।

মায়ের কথায় উৎসাহিত হয়ে কার্তিকেয় মনের সুখে দেবপত্নীদের সঙ্গে কাল কাটাতে লাগলেন; দেবপত্নীরাও আনন্দে কার্তিকেয়ের সঙ্গে কাম-ক্রীড়ায় সমাসক্ত হলেন। দেবতারা কার্তিকেয়র এ রকম গর্হিত কাজ দেখে অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু কার্তিকেয়কে সে-কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তখন তারা নিরুপায় হয়ে স্বয়ং পার্বতীর কাছে গিয়ে তাঁর ছেলের অপকর্মের কথা বললেন। পার্বতীও তাঁর ছেলেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। অনেক চিন্তা করে তিনি শেষে একটি কৌশল আবিষ্কার করলেন। তিনি নিজেকে বহুরূপে বিভক্ত করে, সমস্ত দেবপত্নীতে নিজেকে দিলেন ব্যাপ্ত করে; ফলে কার্তিকেয় যে দেবপত্নীকেই কাম ক্রীড়ায় তাঁর সঙ্গিনী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান, তাঁকেই তাঁর মায়ের মূর্তিতে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যান। এভাবে সমগ্র স্ত্রীজাতিকেই তাঁর 'মা' বলে মনে হয়; তখন তাঁর বৈরাগ্য জন্মায়। তিনি একে তাঁর মায়েরই কাজ বলে মনে করলেন। শেষে লজ্জিত হয়ে তিনি গৌতমী নদীতে গেলেন এবং সেখানে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, এর পর থেকে সমগ্র স্ত্রীজাতিকেই তিনি মায়ের মতো দেখবেন। পিতা শঙ্কর গৌরীর সঙ্গে সেখানে এসে কার্তিকেয়কে নিবৃত্ত করলেন এবং তাঁকে মনোমত বর প্রার্থনা করতে বললেন। কার্তিকেয় তখন পিতাকে বিনীতভাবে জানালেন--আমি দেবতাদের সেনাপতি; তার চেয়েও বড় কথা আমি আপনার পুত্র। আমার আর অন্য কি প্রার্থনীয় থাকতে পারে? তবু যখন আপনি বর দিতে চাইছেন, তখন আমার এই প্রার্থনা আপনাকে জানাই যে, যারা গুরুপত্নীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং যারা মহাপাপ করে, তারা যেন এই গৌতমীর জলে স্নান করলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। এখানে স্নান করলে লোকে যেন রূপবান হয়।

শঙ্কর কার্তিকেয়র প্রার্থনা পূরণ করেন। তারপর থেকেই সেই স্থান 'কার্তিকেয় তীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়। সেখানে স্নান ও দান করলে সমস্ত যজ্ঞফল লাভ করা যায়।

—'কুমারতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ বিরাশি

ব্রহ্মা বললেন–এবার তোমায় কৃত্তিকাতীর্থের কথা শোনাব। ওই তীর্থে স্নান করলে সোমপানের যে ফল, সেই ফল লাভ করা যায়। পুরাকালে তারকবধের জন্য ভগবান অগ্নি শঙ্করের বীর্য পান করেন। অগ্নিকে ওই রকম অবস্থায় দেখে ঋষিপত্নীরা তাঁর প্রতি আসক্ত হন। একমাত্র অরুন্ধতীই এই ঋষিপত্নীদের দলে ছিলেন না। যা হোক, ছ'জন ঋষিপত্নী অগ্নির সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হওয়ার ফলে সবাই তাঁরা গর্ভবতী হলেন। তখন তাঁদের চিন্তা হল কি ভাবে এই গর্ভ নষ্ট করে দেবেন। তা না হলে ঋষিদের কাছে তাঁরা মুখ দেখাতে পারবেন না। অনেক চিন্তা করে তাঁরা গঙ্গায় গিয়ে তাঁদের গর্ভ পরিত্যাগ করলেন। সেই ছ'জনের পরিত্যক্ত গর্ভ থেকে একরূপধারী ষড়াননের জন্ম হল।

এদিকে গর্ভ পরিত্যাগ করে নিশ্চিন্ত ভাবে ঋষিপত্নীরা ঘরে গেলেন। ঋষিরা কিন্তু ধ্যানে সব কথা জানতে পেরেছিলেন। তাঁরা বললেন–তোমরা এখনই এখান থেকে চলে

যাও। স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিতাকে কখনোই সমর্থন করা যায় না। ঋষিপত্নীরা নিজেদের স্বামীদের কাছ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে দুঃখিত মনে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে নারদের দেখা হল। নারদ বললেন--আপনারা এক কাজ করুন। শিবের পুত্র কার্তিকেয় তারকহন্তা নামে পরিচিত। তিনি গাঙ্গেয় এবং আগ্নেয় বলেও পরিচিত। আপনারা গিয়ে তাঁরই শরণাপন্ন হন।

নারদের কথায় ঋষিপত্নীরা কার্তিকেয়কে সমস্ত কথা জানালেন। কার্তিকেয় কৃত্তিকাদের মুখে সমস্ত কথা শুনে তাঁদের গোতমীতে স্নান করে মহাদেবের পুজা করতে নির্দেশ দিলেন। কৃত্তিকাগণ কার্তিকেয়র কথামতো কাজ করলেন। তখন তাঁরা মহাদেবের অনুগ্রহে দেবলোকে গেলেন। তারপর থেকেই সেই তীর্থ 'কৃত্তিকাতীর্থ' নামে বিখ্যাত। কার্তিকমাসে কৃত্তিকানক্ষত্রযোগে যে সেখানে স্নান করে, তার সমস্ত যজ্ঞ ফল লাভ হয়। যে শুধু সেই তীর্থের নাম শোনে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকে।

—'কৃত্তিকাতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ তিরাশি

এবার দশাশ্বমেধিক তীর্থের কথা বলব, মন দিয়ে শোন। এই তীর্থের কথা শুনলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়।

বিশ্বকর্মার পুত্র বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র প্রথম এবং প্রথমের পুত্র ভৌবন। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ কশ্যপ ওই ভৌবনের পুরোহিত ছিলেন। ভৌবন একবার যজ্ঞ করতে চেয়ে কশ্যপকে জিজ্ঞেস করলেন—আমি একসঙ্গে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চাই ; কিন্তু কোথায় ওই যজ্ঞ করব, আপনি দয়া করে তার স্থান নির্দেশ করুন। ভৌবনের প্রশ্নের উত্তরে কশ্যপ বললেন—ব্রাহ্মণেরা পুরাকালে যে যে জায়গায় যজ্ঞ করে গিয়েছেন সেই সেই স্থানই যজ্ঞের পক্ষে প্রশস্ত।

তারপর কশ্যপের নির্দিষ্ট জায়গায় যজ্ঞ আরম্ভ হল। কিন্তু সেখানে অনেক বাধাবিঘ্ন দেখা গেল। রাজা তাঁর অনুষ্ঠিত যজ্ঞগুলিকে অপূর্ণ দেখে পুরোহিতকে বললেন--আমার এই দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ দেশ, কাল কিংবা আপনার বা আমার দোষে পূর্ণতা পাচ্ছে না। যাতে এই যজ্ঞসমূহ সম্পূর্ণ হতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। তখন দুজন মিলে পরামর্শ করে বৃহস্পতির দাদা সংবর্তের কাছে গেলেন। যজ্ঞ প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ। তাঁরা সংবর্তকে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি যজ্ঞের স্থান এবং যোগ্য গুরু নির্দেশ করে দেন। সংবর্ত সমস্ত কথা শুনলেন। তারপর ধ্যান করে ভৌবনকে বললেন—তোমরা ব্রহ্মার কাছে যাও, তিনিই তোমাদের যজ্ঞীয় দেশ নির্দেশ করে দেবেন। সংবর্তের কথামতো কশ্যপ ও ভৌবন আমার কাছে এসে পৌঁছল। আমি ভৌবনকে বললাম—তোমরা গোতমী নদীতে যাও। সেই স্থানই যজ্ঞের পুণ্যে পরিপূর্ণ। আর পৃথক গুরুর আবশ্যক নেই। এই বেদপারগ কশ্যপই তোমার শ্রেষ্ঠ গুরু। এই গুরুর অনুগ্রহে এবং গোতমী গঙ্গার প্রসাদে সেখানে তোমার একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলেই দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ পরিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। রাজা

ভৌবন সে কথা শুনে কশ্যপের সঙ্গে গৌতমী নদীর তীরে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে অশ্বমেধে দীক্ষিত হলেন। যজ্ঞ যথাসময়ে সমাপ্ত হল। রাজা ভৌবন তখন যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ গুরুকে পৃথিবী দান করতে উদ্যত হলেন। এই সময়ে আকাশে শ্রুত হল—রাজা ভৌবন, আপনি যে আপনার পুরোহিত কশ্যপকে এই পৃথিবী দান করতে ইচ্ছা করেছেন এতেই আপনার সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে। আপনি ভূমিদানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে বরং অন্ন দান করুন। পৃথিবীর মধ্যে, বিশেষত এই গঙ্গাতীরে অন্নদানের মতো পুণ্য আর নেই।

এ রকম আকাশবাণী শোনার পরও রাজা পৃথিবী দান করতে প্রবৃত্ত হলেন। তখন স্বয়ং পৃথিবী তাঁকে বললেন—রাজা ভৌবন, আমাকে আপনি দান করবেন না। আমি জলের মধ্যে ডুবে যাব। এই গৌতমী নদীর তীরে তিল, গোরু, ধন, ধান বা অন্য যা কিছু দান করা হয়, সমস্তই অক্ষয় হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাতীরে এসে একগ্রাস অন্নও দান করে, সে বস্তুত আমাকেই দান করে।

ভৌবন পৃথিবীর কথাকেই সঙ্গত বলে মনে করলেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রচুর অন্ন দান করলেন। তখন থেকেই সেই তীর্থ 'দশাশ্বমেধিক' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেই তীর্থে স্নান করলে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়।

—'দশাশ্বমেধতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ চুরাশি

এবার পৈশাচ তীর্থের কথা বলছি। গৌতমী নদীর দক্ষিণ তীরে ওই তীর্থ অবস্থিত। ব্রহ্মগিরির পাশে অঞ্জন নামে একটি পর্বত আছে। অঞ্জনা নামে এক প্রধান অপ্সরা শাপভ্রষ্ট হয়ে ওই অঞ্জন পর্বতে বাস করত। তার উত্তমাঙ্গ দেখলে তাকে বানরী বলে মনে হত। তার স্বামীর নাম কেশরী। ওই কেশরীর আরেকজন স্ত্রী ছিল, তার নাম অদ্রিকা। অদ্রিকাও শাপভ্রষ্ট অপ্সরা। সেও ওই অঞ্জন পর্বতে বাস করত। কেশরী একবার দক্ষিণ সমুদ্রে যায়। ওই সময় অগস্ত্য ঋষি অঞ্জন পর্বতে আসেন। অঞ্জনা ও অদ্রিকা অগস্ত্যকে যথাবিধি সেবা করে। তাদের পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হয়ে অগস্ত্য তাদের বর দিতে চাইলে, তারা এই প্রার্থনা জানায়—আমাদের গর্ভে যেন বলবান এবং সর্বলোকের হিতৈষী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অগস্ত্য বর অনুমোদন করে দক্ষিণ দিকে চলে যান।

কোন এক সময় অঞ্জনা ও অদ্রিকা পর্বতের উপর আনন্দে নাচ-গান করছিলেন। তখন বায়ু ও নিঋতি তাদের দেখে কামশরে বিদ্ধ হন। বায়ু অঞ্জনার কাছে এবং নিঋতি অদ্রিকার কাছে গিয়ে নিজেদের মনোভাব জানালে উভয়েই উভয়ের সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হন। তারপর অঞ্জনার গর্ভে বায়ুর ঔরসে হনুমান জন্মগ্রহণ করে এবং অদ্রিকার গর্ভে নিঋতি থেকে অদ্রি নামক এক পিশাচ জন্মায়। অঞ্জনার উত্তমাঙ্গ দেখলে তাকে যেমন বানরী বলে মনে হত, তেমনি অদ্রিকার উত্তমাঙ্গ দেখলে তাকে স্ত্রী বিড়াল বলে মনে হত। তাদের সন্তান হওয়ার পর তারা তাদের স্বামীদের বলল—মুনির বরে তো আমাদের দুজনের দুটি পুত্র হল। কিন্তু ইন্দ্রের অভিশাপে আমরা বিরূপা হয়েছি। কি ভাবে আমাদের শাপমুক্তি ঘটবে দয়া করে তা আমাদের বলে দিন।

তখন বায়ু ও নিঋতি বললেন—তোমরা গৌতমী তীরে যাও। সেখানে স্নান এবং

দান করলেই তোমরা শাপমুক্ত হবে। এ কথা বলেই তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন। তারপর পিশাচ অদ্রি ভাই হনুমানের প্রীতির জন্য বিমাতা অঞ্জনাকে গৌতমী নদীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনল। হনুমানও অনুরূপভাবে বিমাতা অদ্রিকাকে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনল। তখন থেকেই সেই তীর্থ 'পৈশাচ' এবং 'আঞ্জন'—এই উভয় নামেই পরিচিত। ব্রহ্মগিরি থেকে পূর্বদিকে তিপান্ন যোজন পরিমিত স্থান 'মার্জার' এবং তারপরের স্থান 'হনুমান' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এই স্থানের প্রকৃত রূপ ও বিবরণ তখন থেকেই শুভ নামে নিরূপিত হয়।

'পৈশাচতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ পঁচাশি

এবার ক্ষুধাতীর্থের কথা বলছি, শোন। এই তীর্থ পবিত্র এবং সমস্ত কামনা প্রদান করে। পুরাকালে কণ্ব নামে বেদজ্ঞ এক ঋষি ছিলেন। তিনি একবার ক্ষুধায় কাতর হয়ে বহু আশ্রমে ঘুরে বেড়ানোর পর গৌতম ঋষির সমৃদ্ধ আশ্রমে পৌঁছলেন। দেখলেন যে, গৌতমের আশ্রমে অন্নের কোন অভাব নেই। কণ্ব ক্ষুধায় কাতর হলেও গৌতমকে কিছুই জানালেন না। কারণ, তিনি তপোনিষ্ঠ আবার গৌতমও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; সুতরাং সমধর্মীর কাছে কোন কিছু চাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নয়—এইটেই কণ্বের অভিমত। তিনি ঠিক করলেন যে, তাঁর যদি ক্ষুধায় মৃত্যুও হয়, তবু তিনি গৌতমের কাছে কিছুতেই অন্ন ভিক্ষা করবেন না। তিনি তখন গৌতমী গঙ্গায় গিয়ে স্নান করলেন এবং পবিত্র হয়ে নিবিষ্ট চিত্তে গৌতমী গঙ্গাকে এবং ক্ষুধাদেবীকে স্তব করতে লাগলেন—গঙ্গা, তুমি নিখিলজনের ক্লেশ হরণ কর, তোমায় আমি নমস্কার করি। আর ক্ষুধা, তুমি সমস্ত প্রাণীকে কষ্ট দাও; তোমাকেও আমার নমস্কার। গঙ্গার উৎপত্তি মহাদেবের জটা থেকে, আর ক্ষুধার উৎপত্তি মহামৃত্যুর মুখবিবর থেকে; গঙ্গা পুণ্যবান ব্যক্তিকে শান্তি দান করে এবং নদীরূপে নিখিল প্রাণীকুলের পাপ, তাপ হরণ করে আর ক্ষুধা সবাইকেই পাপ-তাপ দেয়। তোমাদের দুজনকেই আমার নমস্কার। কণ্বের স্তব শেষ হলে পর গঙ্গা এবং ক্ষুধা দুজনেই সেখানে আবির্ভূত হলেন। কণ্ব উভয়কেই নমস্কার জানালেন। তিনি গঙ্গাকে উদ্দেশ করে বললেন—তুমি শিবের জটা থেকে উৎপন্ন হয়ে গৌতমের পাপ হরণ করেছ এবং সাতটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রের অভিমুখে বয়ে চলেছ। তুমি পবিত্র, তোমায় আমার নমস্কার। তারপর ক্ষুধাকে উদ্দেশ করে বললেন—তুমি ধর্ম, কাম ও অর্থ ধ্বংস কর; দুঃখ এবং লোভ দিয়ে মানুষকে তার প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দাও। তোমাকেও আমার নমস্কার জানাই। কণ্বের কথা শুনে দুজনেই প্রীত হলেন এবং তাঁকে তাঁর অভীষ্ট কি তা জানাতে বললেন। কণ্ব তখন গঙ্গাকে বললেন—তুমি আমাকে মনোজ্ঞ কাম্য বস্তু, প্রচুর সম্পদ এবং মুক্তি দান কর। তারপর ক্ষুধাকে বললেন—আমি এবং আমার বংশধরগণ যেন কখনো ক্ষুধায় কষ্ট না পায়। আমি যে স্তবে তোমাকে সন্তুষ্ট করলাম সেই স্তবে যে ক্ষুধাতুর ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করবে সে যেন কখনো দারিদ্র্য অনুভব না করে। আরো একটা কথা, যারা এই পবিত্র তীর্থে ভক্তিভরে স্নান, দান কিংবা জপ প্রভৃতি করবে তারা যেন বিত্তলাভ করে। যদি কোন ব্যক্তি কখনো কোন তীর্থে বা বাড়িতে বসে এই স্তোত্র পাঠ করে, যেন কখনোই তার দারিদ্র্য এবং দুঃখ লাভ

না হয়—এইই আমার প্রার্থনা।

গঙ্গা এবং ক্ষুধা কণ্বের প্রার্থনা পূরণের আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন। তখন থেকেই সেই তীর্থ 'কাণ্ব', 'গাঙ্গ' অথবা 'ক্ষুধা' নামে পরিচিত।

—'ক্ষুধাতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ ছিয়াশি

এবার তোমায় চক্রতীর্থের কথা শোনাব। সেই চক্রতীর্থে ভক্তিভরে স্নান করলে মানুষ বিষ্ণুলোকে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করে গণিকাসঙ্গমে স্নান করে, সে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করতে পারে।

পুরাকালে যে ঘটনা ঘটেছিল এই তীর্থকে কেন্দ্র করে, সে-কথা বলছি, শোন। অনেক দিন আগে বিশ্বধর নামে এক ধনবান বৈশ্য কোন এক দেশে বাস করত। সে যখন প্রায় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে তখন তার একটি পুত্র জন্মায়। বিশ্বধরের ওই পুত্র রূপবান, গুণবান এবং মিতভাষী ছিল। কিন্তু দুঃখের কথা, বিশ্বধরের ওই পুত্র কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তার মরণাপন্ন অবস্থা দেখে বিশ্বধর ও তার স্ত্রী ভীষণ কাঁদতে লাগল। তাদের দুঃখ দেখে যম তাদের ছেলেটিকে না নিয়েই ফিরে গেলেন। মানুষের এই দুঃখ তাঁকে খুব পীড়িত করল। তিনি গোদাবরীর তীরে বসে বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। যম তাঁর লোকক্ষয়রূপ কাজ না করে তপস্যা করতে থাকলে পৃথিবীতে দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল। তার ফলে, পৃথিবী ক্রমেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। পৃথিবীতে মৃত্যু বলে আর কিছুই রইল না। অত্যধিক ভারাক্রান্ত হয়ে পৃথিবী ইন্দ্রের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। ইন্দ্র পৃথিবীকে প্রণাম করে তার আসার কারণ জানতে চাইলে পৃথিবী বলল-দেখুন দেবরাজ, প্রাণীরা মৃত্যু বরণ করছে না, তাই আমি গুরুভারে পীড়িত। এর কারণ কি, তা জানবার জন্যই আপনার কাছে এসেছি। ইন্দ্র তখন পৃথিবীকে বললেন—শোন পৃথিবী, এর কারণ কি, তা আমি অনেক আগে থেকেই জানি। আমি দেবতাদের অধিপতি, আমার তো কোন কথা অজানা থাকবার কথা নয়। পৃথিবী তখন ইন্দ্রকে অনুরোধ করল যাতে তিনি এ রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যেন যম তাঁর লোকক্ষয়রূপ কাজ চালিয়ে যান। পৃথিবীর অনুরোধে ইন্দ্র তখন যমকে নিয়ে আসবার জন্য সিদ্ধ ও কিন্নরদের আদেশ করলেন। ইন্দ্রর আদেশমতো সিদ্ধ ও কিন্নরগণ যমালয়ে গেল, কিন্তু যমকে দেখতে না পেয়ে ইন্দ্রের কাছে ফিরে এলো। ইন্দ্র তখন যমের খোঁজ জানবার জন্য যমের পিতা সূর্যকে জিগ্যেস করলেন। সূর্য জানালেন—যম গোদাবরী নদীর তীরে কঠোর তপস্যায় রত ; তবে কিসের জন্য তার এই তপস্যা সে-কথা আমি জানি না। সূর্যের কথায় ইন্দ্রের আশংকা হল বুঝি বা তাঁর পদলাভের জন্যই যমের এই কঠোর তপস্যা। ইন্দ্র দেবতাদের যমের তপস্যা বিষয়ে অবহিত করে অপ্সরাদের ডেকে পাঠালেন। তাদের সব কথা বলে জিগ্যেস করলেন—তোমাদের মধ্যে কে এমন আছ যে যমকে তার তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করতে পারো ? কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই ইন্দ্রের কথায় কোন উত্তর করল না। ইন্দ্র তখন নিজেই দেবতাদের নিয়ে সেই গোদাবরী তীরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এদিকে ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের অভিপ্রায় জেনে যমকে রক্ষা করার জন্য তাঁর সুদর্শন

চক্রকে গোদাবরী তীরে পাঠালেন। সেই চক্র যেখানে গিয়ে পেঁছল সেই স্থান 'চক্রতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এদিকে ইন্দ্রের কার্যাবলী দেখে মেনকা ভীত হয়ে ইন্দ্রকে বলল—আমাকে মার্জনা করবেন দেবরাজ; স্বয়ং মহাকালের প্রতি কটাক্ষপাত করতে কোন নারীই সমর্থ নয়। তবু আপনার হাতে মৃত্যুও ভালো, যমের হাতে যেন মৃত্যু না হয়। দেখুন, আপনার অনুগত এক গণিকা আছে; সে রূপবতী, যৌবনবতীও বটে। যমের কাছে তার যাওয়ার ইচ্ছে আছে। আপনি তাকেই সেখানে পাঠান। মেনকার কথা মেনে নিয়ে ইন্দ্র ওই গণিকাকেই পাঠাতে ইচ্ছে করে বললেন—তুমি যদি গিয়ে কৃতকৃত্য হয়ে ফিরে আসতে পারো তবে শচীর মতোই তুমি আমার প্রণয়িনী হতে পারবে।

ইন্দ্রের আদেশে ওই গণিকা আকাশপথে শীগগিরই গোদাবরী তীরে গিয়ে যেখানে যম তপস্যা করছিলেন সেখানে পেঁছল। তার দেহের প্রভায় দশ দিক আলোকিত হয়ে উঠল। সেই চঞ্চল গণিকা হেলেদুলে ললিতলীলায় যখন যমের কাছে এলো, তাকে দেখে যমের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। যম কামনাপূর্ণ দৃষ্টিতে যখন ওই গণিকার দিকে তাকালেন তখনই সেই গণিকা বিলীন হয়ে গিয়ে সলিলের আকার পেল এবং গৌতমী গঙ্গার সঙ্গে মিশে গেল। সে তখনই স্বর্গে চলে গেল। বিমানে গণিকাকে স্বর্গে যেতে দেখে যম খুবই বিস্মিত হলেন। তারপর যমের পিতা সূর্য এসে তাঁকে বললেন—দেখ, লোকক্ষয় করাই তোমার কাজ; সে কাজেই তোমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তুমি তোমার নির্দিষ্ট কাজ কর। দেখ, বায়ু সর্বদাই বয়ে চলেছেন, বিধাতা প্রজা সৃষ্টি করে চলেছেন। আমি সর্বদাই ত্রিভুবন পর্যটন করছি এবং এই পৃথিবী প্রজা ধারণ করছেন। সুতরাং তোমাকেও তোমার নির্দিষ্ট কাজ করে যেতে হবে। উত্তরে যম বললেন—শুনুন, তপস্যা করা তো গর্হিত কাজ নয়। আমাকে তপস্যা করা থেকে বিরত হতে বলবেন না। আর আমাকে লোকক্ষয়ের মতো নিষ্ঠুর কাজে নিযুক্ত করবেন না। যমের কথা শুনে সূর্য বললেন—আমি তোমার কথা স্বীকার করছি যে, তপস্যা করা নিন্দনীয় কাজ নয়। কিন্তু যে নিজেই ইচ্ছে করলে সব কিছু পেতে পারে, সব কাজ করতে পারে, তার আর তপস্যা করার কি দরকার? তুমি কি দেখ নি যে কিছুক্ষণ আগে একটি গণিকা মৃত্যুবরণ করে গৌতমী নদীতে যাওয়ার পর বিমানে করে স্বর্গে চলে গেল? সুতরাং তোমার কাজকে তুমি নিষ্ঠুর বলছ কেন? শোন, তুমি এখানে যে কঠোর তপস্যা করেছ, স্থানমাহাত্ম্যে সে তপস্যা তোমার অক্ষয় হয়ে থাকবে। সুতরাং তুমি তোমার নিজের জায়গায় যাও।

সূর্যের কথা মতো যম তাঁর নিজের জায়গায় চলে গেলেন। যমকে যেতে দেখে বিষ্ণুচক্র বিষ্ণুর কাছেই ফিরে গেল। যে সমাহিত হয়ে এই বৃত্তান্ত শুনবে বা পাঠ করবে, তার সমস্ত বিপদ নষ্ট হয়ে যাবে। সে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে পারবে।

—'চক্রতীর্থগণিকাসঙ্গমবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ সাতাশি

ব্রহ্মা নারদকে বললেন—অহল্যাসঙ্গম নামে একটি পবিত্র তীর্থ আছে; সেই তীর্থের কথা তোমায় এবার শোনাচ্ছি। পুরাকালে আমি কৌতূহলের বশে রূপবতী এবং গুণবতী অনেক কন্যা সৃষ্টি করেছিলাম; তাদের মধ্যে একটি কন্যা সব থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মুশকিল হল তার ভরণ-পোষণ নিয়ে। আমার পক্ষে তো তাকে প্রতিপালন করা সম্ভব

নয়। অথচ তাকে প্রতিপালন করতে পারে এমন কাউকেই আমি খুঁজে পেলাম না। শেষে অনেক ভেবে মহামুনি গোতমের কাছে আমার সেই কন্যাটিকে নিয়ে গেলাম। তাঁকে বললাম—এইটি আমার কন্যা। একে প্রতিপালন করতে পারে এমন কাউকে আমি খুঁজে পেলাম না। যত দিন না এর যৌবনাগম হয়, তত দিন পর্যন্ত আপনি একে পালন করুন। কন্যাটি যৌবনবতী হয়ে উঠলে আমাকে জানাবেন।

তারপর অনেক দিন কেটে গেল। আমার ওই কন্যাটি যুবতী হয়ে উঠলে গোতম তাকে বিবিধ অলংকারে সাজিয়ে নির্বিকারচিত্তে আমার কাছে নিয়ে এলেন। তার নাম আমি রেখেছিলাম অহল্যা। এদিকে অহল্যার রূপের খ্যাতি পৃথিবীতে তো বটেই দেবসমাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ প্রমুখ দেবতারা সবাই আমার কাছে অহল্যাকে প্রার্থনা করলেন। তারপর একে একে মুনিগণ, সাধ্যগণ, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ অহল্যাকে আমার কাছে প্রার্থনা করলেন। আমি কিন্তু তার মধ্যেই আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছি। গোতমকেই আমার কন্যা অহল্যাকে সমর্পণ করব-এইটেই আমার সিদ্ধান্ত। তবু সকলেরই মন রাখবার জন্য আমি একটা শর্ত আরোপ করলাম ; বললাম—আপনাদের মধ্যে যিনি এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সবার আগে ফিরে আসতে পারবেন, আমার কন্যা অহল্যাকে তিনিই লাভ করতে পারবেন।

আমার কথা শোনার পর দেবতারা এবং অন্যান্যরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পর গোতমও অহল্যালাভের জন্য সচেষ্ট হলেন। সে সময় অর্ধপ্রসূতা সুরভি গাভী সেখানে এসে পৌঁছল। গোতম তাকেই পৃথিবী জ্ঞানে প্রদক্ষিণ করলেন এবং সেখানে মহাদেবের যে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাকেও প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর আমাকে প্রণাম করে বললেন—আমি এই সমগ্র পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করেছি। আমি ধ্যানযোগে সমস্ত ঘটনা জেনে তাঁকে বললাম—আপনি সত্যিই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। অহল্যাকে আপনার হাতেই সম্প্রদান করব। যে ধর্ম শাস্ত্রেরও দুর্জ্ঞেয় আপনি তাতে অভিজ্ঞ। অর্ধপ্রসূতা সুরভি প্রকৃতই পৃথিবী। তাকে প্রদক্ষিণ করলেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়। তাছাড়া আপনি মহাদেবের লিঙ্গমূর্তিকেও প্রদক্ষিণ করেছেন ; এতেও সেই একই ফল পাওয়া যায়। আপনার ধৈর্য, জ্ঞান এবং তপস্যার প্রভাবে আমি প্রীত হয়েছি। এই অহল্যাকে আপনার হাতেই আমি সম্প্রদান করলাম।

অহল্যা ও গোতমের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দেবতারা একে একে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে এলেন। তাঁরা এই বিয়ে দেখে বিস্মিত হলেন এবং কোন কথা না বলেই ফিরে গেলেন। ইন্দ্র কিন্তু অপ্রসন্ন মনে স্বর্গে ফিরে গেলেন। অহল্যার প্রতি বরাবরই তাঁর অত্যধিক অনুরাগ ছিল। যাই হোক, আমি আমার ব্রহ্মগিরি গোতমকে দিয়ে দিলাম। গোতম সেই ব্রহ্মগিরিতে অহল্যার সঙ্গে সুখে কাল কাটাতে লাগলেন। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। গোতমের কীর্তি-কথা শুনে ইন্দ্র তাঁর আশ্রম এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে দেখার জন্য এলেন। অহল্যাকে দেখামাত্রই ইন্দ্র কামার্ত হয়ে পড়লেন। তখন দেশ, কাল বা ঋষির অভিশাপ প্রভৃতি কিছুই তাঁর মনে রইল না। অহল্যাকে পাওয়ার আকাঙ্খায় তিনি সন্তপ্ত হতে লাগলেন। কি ভাবে তিনি অহল্যাকে লাভ করবেন এই চিন্তাই তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী হয়ে রইল। তিনি তখন ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে গোতমের শিষ্যদের মাঝখানে গিয়ে কিছু দিন কাটালেন। তাতেও তাঁর অভীষ্ট পূরণ হল না। একবার গোতম পূর্বাহ্ণের কর্তব্য শেষ করে শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে গোতমী গঙ্গা এবং আশ্রমের

ানখেত পরিদর্শন করতে বেরোলেন। ইন্দ্র দেখলেন যে, এইটেই কার্যসাধনের প্রকৃষ্ট অবসর। তিনি অবিকল গৌতমের মতো মূর্তি ধারণ করে আশ্রমে প্রবেশ করলেন এবং সুন্দরী অহল্যাকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে আহ্বান জানালেন। অহল্যা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি তাঁকেই গৌতম ভেবে তাঁর সঙ্গে রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন। অহল্যা এবং ইন্দ্র যখন সঙ্গমে রত ঠিক সে-সময়ই গৌতম শিষ্যদের নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। কিন্তু অন্যান্য দিন অহল্যা যেমন এসে প্রিয় সম্ভাষণ করেন, সেদিন কিন্তু তিনি এলেন না। গৌতম বিস্মিত হলেন। আশ্রমবাসীরা পর্যন্ত দেখল যে মহামুনি গৌতম আশ্রমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। তখন অগ্নিহোত্রশালার রক্ষিগণ ভীত অথচ বিস্মিত হয়ে গৌতমকে বলল—এ কী বিচিত্র ব্যাপার! আপনাকে যে আমরা আশ্রম কুটিরের বাইরে এবং ভেতরে এক সময়েই দেখতে পাচ্ছি! ভেতরে প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে রয়েছেন, আবার বাইরেও আছেন! তপস্যার কি বিচিত্র প্রভাব! একই সময়ে একই মূর্তিতে দু'জায়গায় অবস্থান করছেন আপনি।

গৌতম সে-কথা শুনে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে অহল্যাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আমি আশ্রম-কুটিরের দোরগোড়ায় অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু তুমি তো ই অন্যান্য দিনের মতো আমাকে সম্ভাষণ জানালে না? কি হয়েছে তোমার বল তো? অহল্যা মহামুনি গৌতমের স্বর চিনতে পারলেন। তিনি তখন বুঝতে পারলেন যে কেউ গৌতমের ছদ্মবেশে তাঁর চরম সর্বনাশ করেছে। তিনি তখুনি সেই পাপশয্যা থেকে উঠে পড়লেন। ইন্দ্রও গৌতমের ভয়ে বিড়ালের রূপ ধারণ করে পালিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। দিকে গৌতম অহল্যার বিস্রস্ত অবস্থা এবং ভয়ার্ত মুখের দৃষ্টি দেখে ক্রুদ্ধস্বরে অহল্যাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ঘটেছে। অহল্যা লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন, কোন উত্তরই দিতে পারলেন না। গৌতম বুঝতে পারলেন সব কিছু। তিনি অহল্যার অবৈধ প্রণয়ীকে তখন খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে সামনে একটি বিড়ালকে দেখতে পেলেন। গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে ওই বিড়ালটিকেই জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি করে বল, তুমি কে? মিথ্যে বললে আমার কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবে না। ইন্দ্র তখন গৌতমের তপস্যার প্রভাবের কথা চিন্তা করে সবিনয়ে বললেন—আমাকে মার্জনা করবেন। আমি ইন্দ্র, দেবতাদের অধিপতি। আমি স্বীকার করছি, এই পাপ কাজ আমিই করেছি। কামবাণে যাদের হৃদয় বিদ্ধ হয়, তারা পারে না এমন কোন কাজই নেই। আমি মহাপাপী, আমায় ক্ষমা করুন। দেখুন, সাধু ব্যক্তি অপরাধী লোকের প্রতি রূঢ় আচরণ করেন না। ইন্দ্রের কথা শুনে গৌতমের ক্রোধ প্রশমিত হল না। তিনি ইন্দ্রকে এই অভিশাপ দিলেন—তুমি স্ত্রী-যোনির প্রতি আকৃষ্ট হয়েই এ রকম কাজ করেছ; সুতরাং তোমার দেহে সহস্র যোনির উৎপত্তি হোক। গৌতম ইন্দ্রকে অভিশাপ দেওয়ার পর অহল্যাকেও এই অভিশাপ দিলেন—তুমি যে অন্যায় কাজ করেছ সেজন্য তুমি শুকনো নদী হয়ে পৃথিবীতে বিরাজ করবে।

অহল্যা তখন গৌতমের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য তাঁকে বললেন—শুনুন, যে নারীরা মনে মনেও অন্য পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, তারা মহাপাপী, নরকই তাদের একমাত্র স্থান। ই ব্যক্তি আপনারই রূপ ধরে আমার কাছে এসেছিল, আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ই অগ্নিশালার রক্ষকেরা সকলেই এর সাক্ষী। আপনি বিবেচক, এবার আমার দোষ টুকু বিচার করে দেখুন। গৌতম অহল্যার কথা শুনে ধ্যান করতে বসলেন। ধ্যানে তিনি বুঝতে পারলেন যে অহল্যা ঠিক কথাই বলেছে। তখন তিনি অহল্যাকে বললেন—

শোন, তোমাকে যে অভিশাপ দিয়েছি, তা ব্যর্থ হওয়ার নয়। তবে তুমি যখন নদী হয়ে গৌতমী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হবে তখন পুনরায় তুমি আগেকার অবস্থা ফিরে পাবে। কালক্রমে অহল্যা গৌতমীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর আবার স্ব-মূর্তিতে প্রতিভাত হলেন।

তারপর দেবরাজ সবিনয়ে গৌতমকে বললেন—আমি পাপিষ্ঠ, মহা অন্যায় করেছি; আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্রের আকুতি দেখে গৌতমের দয়া হল। তিনি ইন্দ্রকে বললেন—শোন দেবরাজ, তুমি গৌতমী গঙ্গায় গিয়ে স্নান কর; তাহলেই তোমার সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। তুমি পাপমুক্ত হয়ে সহস্র চক্ষু লাভ করবে। অহল্যার পুনরায় আবির্ভাব এবং ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু লাভ—এই উভয় ব্যাপারই আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি। সেদিন থেকেই 'অহল্যাসঙ্গম' অন্যতম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। একে 'ইন্দ্রতীর্থ'ও বলা হয়।

—'অহল্যাসঙ্গম ইন্দ্রতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ অষ্টআশী

এর পর তোমায় জনস্থান তীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থ চার যোজন পরিমিত স্থানে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। পুরাকালে বৈবস্বত বংশে জনক নামে এক রাজা ছিলেন। বরুণের মেয়ে গুণার্ণবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। গুণার্ণবার রূপ এবং গুণের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। জনকের পুরোহিত ছিলেন স্বনামধন্য যাজ্ঞবল্ক্য। রাজা জনক একবার যাজ্ঞবল্ক্যকে জিগেস করেন—ঋষিরা তো ভোগ এবং মুক্তি বা বৈরাগ্য উভয়কেই শ্রেষ্ঠ বলে স্থির করেছেন; তার মধ্যে পার্থিব ভোগ্যবস্তুসমূহের নিঃশেষে উপভোগই ভুক্তি বা ভোগ পদবাচ্য। কিন্তু এই ভোগ পরিণামে অসার। একমাত্র মুক্তিই শ্রেষ্ঠ। কারণ ভোগের শেষ পাওয়া যায় না; ভোগতৃষ্ণা নিয়তই তরুণ হতে থাকে। সুতরাং ভুক্তি থেকে মুক্তিই শ্রেষ্ঠ—এ কথা নির্বিবাদে বলা যায়। এখন আমার জিজ্ঞাস্য হল, ভোগের দ্বারা কি করে মুক্তি লাভ হয়? সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করলে এবং দুঃসহ দুঃখ ভোগ করলেই মুক্তি পাওয়া যায়। আপনি বেদজ্ঞ ঋষি, দয়া করে বলুন সুখ থেকে কি করে মুক্তি লাভ হয়। রাজা জনকের কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—শুনুন, এ বিষয়ে আপনাকে সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জলপতি বরুণ আপনার শ্বশুর; সুতরাং তিনি আপনার গুরুও বটে। চলুন, আমরা তাঁর কাছে যাই। তিনি প্রাজ্ঞ এবং বিবেচক। তিনিই আপনার জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন।

তারপর তাঁরা দুজনেই বরুণের কাছে গিয়ে তাঁকে মুক্তিপথের কথা জিগ্যেস করলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বরুণ বললেন—শুনুন, মুক্তি দ্বিবিধ, এক কর্মপথে অবস্থিত এবং অন্যটি অকর্মপথে অবস্থিত। অকর্ম থেকে যে কর্মই শ্রেষ্ঠ এ কথা সর্বজনবিদিত। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ যে পুরুষার্থ চতুষ্টয় রয়েছে তা কর্মের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ; সুতরাং অকর্মের দ্বারা যে মুক্তিপথ লাভ করা যায়, তা মিথ্যা বলেই নির্দিষ্ট। কর্মের দ্বারাই সমস্ত ধর্ম সিদ্ধ হয়। অতএব মানুষের বৈদিক কর্ম করাই উচিত। মানবগণ কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই ভুক্তি ও মুক্তি লাভ করে। কর্ম আশ্রমভেদে জাতিবিশেষে প্রতিষ্ঠিত। কর্মের দ্বারস্বরূপ যে চারটি আশ্রম আছে, তাদের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই পবিত্র। এই গার্হস্থ্য আশ্রম পালনের দ্বারাই মনুষ্যগণ ভুক্তি ও মুক্তি লাভ করে থাকে।

অন্তত আমার এটাই ধারণা। বরুণের বলা শেষ হলে পর জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য দুজনেই তাঁকে অনুরোধ করলেন—আপনি সব কিছুই জানেন ; দয়া করে বলুন কোন্ দেশ বা কোন্ তীর্থ ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করে। উত্তরে বরুণ বললেন—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ পবিত্র স্থান। ভারতবর্ষের মধ্যে দণ্ডকারণ্য আরও পবিত্র। সেই দণ্ডকারণ্যে মানুষ যে কাজই করে, তাই ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করে থাকে। তীর্থসমূহের মধ্যে গৌতমী গঙ্গা মানুষের মুক্তিদায়িনী। সেই গৌতমী গঙ্গায় স্নান করলে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ করা যায়।

তারপর জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন। জনক অশ্বমেধ প্রভৃতি নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সমস্ত যজ্ঞই গৌতমী গঙ্গার তীরে অনুষ্ঠিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেকটি যজ্ঞেই প্রধান ঋত্বিকরূপে কাজ করেন। এর ফলে রাজা জনকের মুক্তি হয়। রাজা জনকের সেই কর্মের প্রভাবে এবং গৌতমী গঙ্গার কৃপায় আরও অনেক ভাগ্যবান পুরুষ মুক্তি লাভ করেন। তারপর থেকেই এই স্থান 'জনস্থান' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেখানে স্নান ও দান করলে কিংবা পিতৃগণকে তর্পণ করলে মানুষ তার ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে।

—'জনস্থানতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ উননব্বই

পুরাকালে অরুণা ও বরুণা নামে দুটি পবিত্র নদী ছিল। ওই নদী দুটি গঙ্গার সঙ্গে যেখানে মিশেছে সে স্থান খুবই পবিত্র। কশ্যপের বড় ছেলে সূর্য। ইনি ত্রিভুবনের চক্ষুস্বরূপ, প্রখর তেজোযুক্ত এবং লোকপূজ্য। তাঁর স্ত্রী ঊষা সুন্দরী ; ইনি ত্বষ্টার কন্যা। ঊষা সূর্যের তেজের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁর দুটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্র দুটির নাম বৈবস্বত মনু ও যম এবং কন্যার নাম যমুনা—এই যমুনা নদীরূপা। ঊষা বিবস্বানের প্রখর তেজ সহ্য করতে না পেরে নিজেরই মতো এক ছায়া-মূর্তি সৃষ্টি করলেন। তিনি ওই ছায়াকে আদেশ করলেন সে যেন তাঁরই মতো হয়ে থাকে এবং সূর্যের সমস্ত কথা মেনে চলে। তাছাড়া তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্বও তিনি ছায়াকে দিয়ে গেলেন এবং এই সমস্ত ঘটনা গোপন রাখতে বললেন। ঊষা স্বামীর সৌম্যরূপ কামনা করে পিতা বিশ্বকর্মার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা ঊষার এই স্বেচ্ছাচারিতাকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি ঊষাকে তার পতিগৃহে ফিরে যেতে বললেন। ঊষা পিতার কথামতো পুনরায় পতিগৃহে ফিরে গেলেন না। তিনি উত্তর কুরুদেশে গেলেন। সেখানে গিয়ে ঘোটকীর রূপ ধারণ করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

এদিকে ঊষার কথামতো ছায়া পতি পরিচর্যায় নিরত থেকে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করতে লাগলেন। কালক্রমে তাঁর দুটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মাল। পুত্র দুটির নাম সাবর্ণি ও শনি ; কন্যাটির নাম বিষ্টি। ছায়া তাঁর নিজের সন্তানদের যেমন স্নেহ করতেন ঊষার সন্তানদের তেমনটি করতেন না। এই বৈষম্য দেখে যম ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন ; তিনি পা দিয়ে ছায়াকে আঘাত করলেন। ছায়া যমের এই দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তার পা খসে পড়বে। যম তখন পিতার কাছে গিয়ে

সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। যম বললেন—আমার মনে হচ্ছে, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের মা নন। কারণ সন্তান বিরুদ্ধ আচরণ করলেও মা কখনো তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দেন না। আমি তো ছেলেবেলায় মাকে কত কটু কথা বলেছি, মা তো আমাকে কিছুই বলেন নি, সন্তান ভালো বা মন্দ যা-ই করুক না কেন, মা সব কিছু সহ্য করেন বলেই তো তাঁকে 'মাতা' বলা হয়। এখন যিনি আমাদের মা তাঁর ব্যবহার মায়ের মতো নয়। তাই আমার দৃঢ় ধারণা, ইনি আমাদের মা নন। যমের কথা শুনে সূর্যেরও মনে হল এ নিশ্চয়ই ঊষা নয়। তখন তিনি ধ্যানে বসলেন। ধ্যানযোগে সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে তিনি নিজেই অশ্বরূপ ধারণ করে উত্তর কুরুদেশে গেলেন এবং সেই ঘোটকীরূপিণী ঊষার পিছনে ছুটতে লাগলেন। অশ্বকে কামাতুর দেখে পতিব্রতা ঊষা ভীত হয়ে দক্ষিণ দিকে পালাতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন এমন কি কেউ নেই, কোন দেবতা বা কোন ঋষি, যিনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তিনি যতই দৌড়ান, অশ্বরূপধারী সূর্যও তাঁর পিছনে ছোটেন। বস্তুত কামবশে বিবশ হলে কোন্ দুষ্কর্মই না প্রাণিরা করতে পারে? এভাবে ছুটতে ছুটতে তাঁরা কত নদী কত পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে গেলেন। শেষে ঘোটকীরূপধারিণী ঊষা গৌতমী গঙ্গার জলে পড়ে গেলেন। তিনি অত্যধিক শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শুনেছিলেন যে জনস্থানে ঋষিদের আশ্রম আছে এবং সেখানকার মুনিঋষিরা বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করে থাকেন। অশ্বরূপধারী সূর্যও সেখানে এসে পৌঁছলেন। জনস্থানের ঋষিবালকেরা অশ্বকে নিবৃত্ত করল। অশ্বরূপী সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে সেই ঋষিবালকদের অভিশাপ দিলেন—তোমরা যেহেতু আমাকে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করলে, সেজন্য তোমাদের বটগাছ হতে হবে। মুনিরা তখন ধ্যানযোগে সেই অশ্বের স্বরূপ জানতে পেরে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। সূর্য অশ্বরূপিণী ঊষার সঙ্গে মিলিত হলেন। ঊষা বুঝতে পারলেন সমস্ত ঘটনা। তাঁদের উভয়ের বীর্যে সেই গঙ্গার মধ্যেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হল। তখন দেবতাগণ, মুনিগণ, অন্যান্য দেবতারা, জ্যোতিষ্কগণ প্রভৃতি সবাই নিজের নিজের রূপ ধারণ করে বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁদের দেখতে লাগলেন। তখন বিশ্বকর্মাও সেখানে এসে পৌঁছলেন। সূর্য বিশ্বকর্মার অভিপ্রায় মনে মনে বুঝতে পেরে তাঁকে অনুরোধ করলেন—ঊষা এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রীতির জন্য আপনি দয়া করে আমার তেজ সহনীয় করে দিন। বিশ্বকর্মা সূর্যের অনুরোধমতো তাই করলেন। তাতেই প্রভাসতীর্থের উৎপত্তি। গৌতমী নদীর যে অংশে অশ্বিনীরূপিনী ঊষা সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, সেই স্থান 'অশ্বতীর্থ' নামে বিখ্যাত। সেখানে ভানুতীর্থ, পঞ্চবটাশ্রম, পিতৃদর্শনের জন্য নবাগত তাপী ও যমুনা তীর্থ এবং অরুণা ও বরুণা নদীর সঙ্গমতীর্থ ও সমাগত দেবতাগণে বিভিন্ন তীর্থ বিখ্যাত। এভাবে সেখানে সাতাশ হাজার বিশিষ্ট তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে স্নান, দান প্রভৃতি যে কাজই করা হয়, তা অক্ষয় হয়ে থাকে। এই তীর্থের কথা শুনলে, পাঠ করলে বা স্মরণ করলেও মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়

—'ভানুতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ নব্বই

এবার তোমায় গরুড় তীর্থের কথা শোনাব। অনন্তনাগের মণিনাগ নামে এক মহা বলশালী পুত্র ছিল। ওই নাগ গরুড়ের ভয়ে ভীত হয়ে ভক্তিভরে শঙ্করের আরাধনা

করে। তার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব মণিনাগকে বর প্রার্থনা করতে বললেন মণিনাগ শংকরের কাছে এই বরই চাইল যে, গরুড় যেন তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। শম্ভু তাকে সেই বরই দিলেন।

শিবের বরে বলীয়ান হয়ে মণিনাগ ক্ষীরসমুদ্রের কাছে যেখানে ভগবান বিষ্ণু বিরাজ করছিলেন সেখানে বিচরণ করতে লাগল। এমন কি, যেখানে স্বয়ং গরুড় বাস করত সেখানেও সে গেল। গরুড় মণিনাগকে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে বিস্মিত হল এবং তাকে ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল।

এদিকে নন্দী মণিনাগকে খুঁজে না পেয়ে শংকরকে বলল—প্রভু, মণিনাগ তো আর ফিরে এলো না। নিশ্চয়ই গরুড় তাকে খেয়ে ফেলেছে, অথবা বেঁধে রেখেছে। নন্দীর কথা শুনে শিব ধ্যানে বসলেন ; ধ্যানযোগে সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে নন্দীকে বললেন— মণিনাগ গরুড়ের বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তুমি ভগবানের স্তব কর এবং স্তবে তাঁকে সন্তুষ্ট করে গরুড়ের কাছ থেকে মণিনাগকে নিয়ে এসো। নন্দী বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁর স্তব করল এবং তাঁকে সব কথা জানাল। নারায়ণ তখন গরুড়কে বললেন—শোন গরুড়, আমার কথানুসারে নন্দীর কাছে মণিনাগকে সমর্পণ কর। গরুড় তাতে অসম্মত হয়ে নন্দীর সাক্ষাতেই বিষ্ণুকে বলল, দেখুন, অন্যান্য প্রভুগণ ভৃত্যদের যে সব প্রিয় বস্তু দান করে থাকেন, আপনি তার কিছুই দেন না। অধিকন্ত আমি যদি কিছু নিয়ে আসি, আপনি তা আমাকে ভোগ করতে দেন না। এই দেখুন না, ভগবান শংকর কেমন ভক্তবৎসল। তিনি সামান্য নাগের জন্য নন্দীকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি সর্বদাই আপনাকে বহন করে থাকি, আপনারই উচিত আমাকে কিছু দান করা। সে তো আপনি দিচ্ছেনই না, পরন্তু আমি এই নাগটিকে ধরে এনেছিলাম, আপনি তাকে ছেড়ে দিতে বলছেন। এই কি আপনার উচিত কাজ ? সচ্চরিত্র প্রভুদের এ রকম ব্যবহার সঙ্গত নয়। মনে রাখবেন, আমার শক্তিতেই সংগ্রামে আপনি দৈত্যদের জয় করে থাকেন। আমিই প্রকৃতপক্ষে মহাবলশালী ; আপনার আত্মশ্লাঘা বৃথা।

বিষ্ণু গরুড়ের এই কথা শুনে মৃদু হেসে তাকে বললেন—গরুড়, তোমার কথাই ঠিক। তুমি আমাকে বহন করে কৃশ বা ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছ, তোমার শক্তিতেই আমি অসুরদের জয় করে থাকি। আমি স্বীকার করছি, তুমি মহাবলবান। এক কাজ কর, তুমি আমার এই কনিষ্ঠ আঙুলটির ভার বহন কর তো দেখি। এ কথা বলেই বিষ্ণু গরুড়ের মাথায় তাঁর আঙুলটি রাখলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা গরুড় সেই আঙুলের ভারে চূর্ণ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। গরুড় তখন লজ্জিতভাবে বিষ্ণুকে জানাল—প্রভু, আমি অপরাধী ভৃত্য, আমায় পরিত্রাণ করুন। আপনিই সকলের প্রভু, আপনিই সকলকে ধারণ করে থাকেন। প্রভুগণ ভৃত্যদের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন। মুনি ঋষিরা আপনাকে করুণাকর বলে থাকেন। আমি কিছুই জানি না, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। বিষ্ণুর পাশেই ছিলেন লক্ষ্মী। গরুড় তাঁর কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করল। গরুড়ের কাতর আবেদনে লক্ষ্মীর দয়া হল। তিনি বিষ্ণুকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন গরুড়কে ক্ষমা করেন।

বিষ্ণু তখন নন্দীকে বললেন—তুমি গরুড়ের সঙ্গে এই মণিনাগকে শিবের কাছে নিয়ে যাও। মহাদেবের প্রসন্ন দৃষ্টিতে গরুড় পুনরায় আগের রূপ ফিরে পাবে। বিষ্ণুর কথামতো নন্দী মণিনাগের সঙ্গে গরুড়কে নিয়ে শিবের কাছে পেঁছল এবং সমস্ত কথা

জানাল। শিব তখন গরুড়কে বললেন—তুমি পবিত্র গৌতমী গঙ্গায় যাও। সেখানে স্নান করলে আবার তুমি তোমার নিজের দেহ ফিরে পাবে। যারা মহাপাপী তারাও এই গৌতমী গঙ্গায় স্নান করলে অভীষ্ট লাভ করে।

মহাদেবের কথামতো গরুড় গৌতমী গঙ্গায় গিয়ে স্নান করল এবং শিব ও বিষ্ণুকে প্রণাম করল। গরুড় সেখানে স্নান করে পুনরায় তার আগের দেহ ফিরে পেল। কেবল তাই নয় তার দেহের দ্যুতি বাড়ল এবং সে অধিক বেগবান হল। সে তখন বিষ্ণুর কাছে ফিরে এলো। তারপর থেকেই ওই তীর্থ 'গরুড়তীর্থ' নামে বিখ্যাত হল। যে ব্যক্তি সেখানে সংযত হয়ে স্নান করে এবং কোন কিছু দান করে, তার সে দান অক্ষয় হয়ে থাকে। শিব এবং বিষ্ণু তার উপর সন্তুষ্ট হন।

—'গরুড়তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একানব্বই

এবার তোমায় গোবর্ধন তীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থ অতি পবিত্র। জাবালি নামে কোন এক বিখ্যাত কৃষক ব্রাহ্মণ প্রখর দুপুরবেলাতেও ক্ষেত থেকে বলদদের কাজ থেকে অব্যাহতি দিত না। পরন্তু তাদের পিঠে এবং পাশে তাড়ন দণ্ড দিয়ে প্রহার করত। গো-মাতা সুরভি সেই বলদ দুটোর করুণ অবস্থা দেখে নন্দীকে সব কথা জানালেন। নন্দী ভগবান শংকরকে সব কথা খুলে বলল এবং তার পরিকল্পনার কথা জানাল। শিব নন্দীর পরিকল্পনাকে সমর্থন করলেন। নন্দী তখন ত্রিভুবনের সমস্ত গোরু এক জায়গায় রাখলেন। স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং পাতালে কোথাও আর কোন গোরু দেখা গেল না। তখন দেবতারা এসে আমাকে বললেন—দেখুন, ত্রিভুবনে কোথাও তো আর গাভী দেখা যাচ্ছে না। অথচ গাভী ছাড়া তো আর জীবন ধারণ করা যায় না। আপনি একটা উপায় করুন। আমি দেবতাদের বললাম—তোমরা শিবের কাছে যাও, তাঁকে সব কথা জানাও। তিনি এর একটা উপায় করতে পারবেন। দেবতারা তখন শিবের স্তব করে তাঁকে সব কথা জানালেন। শিব দেবতাদের সব কথা শুনে তাঁদের বললেন—দেখুন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমার বৃষভ সব কথা জানে। দেবতারা বৃষভকে বললেন—তুমি উপকারী গোরুদের প্রদান কর। বৃষ তখন দেবতাদের বলল—আপনারা গো-সব নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ; তাহলেই উপকারী গোরুদের পেতে পারবেন।

দেবতারা মহাদেবের বৃষের কথামতো গো-সব যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হলেন। তখন গৌতমী নদীর পবিত্র তীরে গোজাতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল। এজন্য সেখানে দেবতাদের প্রীতিজনক 'গোবর্ধন তীর্থে'র প্রতিষ্ঠা হল। এই তীর্থে স্নান করলে গো-সহস্র দানের ফল পাওয়া যায়। সেখানে দান করলে যে কি ফল পাওয়া যায়, তা আমাদের জানা নেই।

—'গোবর্ধন তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ বিরানব্বই

এবার তোমায় পাপপ্রশমন তীর্থের কথা শোনাব। কি করে এই তীর্থের এ রকম নাম হল সে কথা তোমায় বলছি শোন।

পুরাকালে ধৃতব্রত নামে একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম মহী। মহী খুবই সুন্দরী ছিলেন। সূর্যের মতো দীপ্তিমান তাঁর একটি পুত্র জন্মায়। পুত্র জন্মানোর পর ধৃতব্রত মারা গেলেন। মহীর বয়স ছিল কম। পুত্রকে নিয়ে মহী তখন কি করবেন ভেবে পেলেন না। অবশেষে অনেক চিন্তা করে ঠিক করলেন যে তিনি গালব মুনির আশ্রমে যাবেন। পরে গালব মুনির আশ্রমে গিয়ে শিশুপুত্রটিকে সেখানে রাখলেন। তারপর বহু দেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দেশ পরিভ্রমণ করার ফলে অনেক পুরুষের সংস্পর্শে এসে মহী স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। অনেক পুরুষের সঙ্গে তিনি শারীরিকভাবে মিলিত হলেন।

এদিকে মহীর পুত্র গালবের আশ্রমে থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠল। কিন্তু হলে কি হবে, মায়ের দোষ যাবে কোথায়? সে যখন বড় হয়ে উঠল তখন তারও বেশ্যা সম্ভোগের প্রবল ইচ্ছা হল। বিভিন্ন দেশ ঘুরে মহী অবশেষে জনস্থান নামক স্থানে এসে বাস করতে লাগল। ওই জনস্থানে নানা জাতের বাস। মহীর সেই পুত্রও নানা স্থান পরিভ্রমণ করতে করতে সেই জনস্থানে এসে পেঁছিল। সেখানে গিয়ে ধৃতব্রতের পুত্র বেশ্যাসঙ্গ আকাঙ্খা করছিল, আবার মহীও বেশ্যা হয়ে ধনবান পুরুষের সঙ্গে সহবাস করছিল। মহী তার পুত্রকে চিনতে পারল না, তার পুত্রও নিজের মা মহীকে চিনতে পারল না। ফলে মা ও ছেলের সঙ্গম ঘটল। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল, অথচ কেউই কাউকে চিনতে পারল না। এ রকম গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকলেও পিতার ধার্মিকতাগুণে তার পুত্রের ধর্মাচরণ করার প্রবৃত্তি তখনো জাগ্রত ছিল। সে প্রতি দিন সকালবেলায় গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে সন্ধ্যা, আহ্নিক প্রভৃতি সমস্ত কাজ করত। তারপর বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণদের নমস্কার করে ঘরে ফিরে আসত। সে যখন গৌতমী গঙ্গায় স্নান করতে যেত তখন তার গায়ের নানা স্থানে কুষ্ঠ দেখা যেত, এবং তা থেকে পুঁজ ও রক্তক্ষরণ হত। আর যখন সে গঙ্গাস্নান করে ফিরত তখন আর তার গায়ে কুষ্ঠ দেখা যেত না, তাকে সূর্যের মতো উজ্জ্বল মনে হত। মহামুনি গালব গৌতমী গঙ্গার তীরে শিষ্যদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতেন, আর ধৃতব্রতের পুত্র প্রতি দিন তাঁকে নমস্কার করতে আসত। গালব তার স্নান করতে যাওয়ার আগেকার রূপ এবং স্নান করে ফিরে আসার পরের রূপের মধ্যে এই বৈষম্য দেখে মনে করলেন যে নিশ্চয়ই এর কোন কারণ আছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ধৃতব্রতের পুত্র এ সব ব্যাপার কিছুই জানত না। এক দিন গালব তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন-কে তুমি কোথায় যাও, কি কর? তোমার বাসস্থান কোথায়? তোমার পত্নীই বা কে? সব কথা আমাকে খুলে বল। গালবের প্রশ্নে বিচলিত হয়ে ধৃতব্রতের পুত্র বলল—সব কথা আমার জানা নেই। আমি আগামীকাল সব কথা আপনাকে জানাব।

সেদিন রাত্রে শোয়ার সময় ধৃতব্রতের পুত্র তাঁর শয্যা-সহচরী বেশ্যাকে বলল—তুমি বেশ্যা বটে, তবু পতিব্রতা। তোমার গুণের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। আমি চাই যে, আমাদের মধ্যে এই প্রীতি আজীবন যেন থাকে। শোন, আমি তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করব—তোমার নাম কি? কোন্ বংশে তোমার জন্ম? এখানে আসার আগে তুমি কোথায় থাকতে? কে-ই বা তোমার বন্ধু? সব কথা আমাকে খুলে বল। বেশ্যা তার উত্তরে বলল—ধৃতব্রত নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন, আমি তাঁর স্ত্রী; আমার নাম মহী। আমার একটি পুত্র আছে, সে সনাক্ষাত

নামে বিখ্যাত। মহামুনি গালবের আশ্রমে সেই সনাঙ্জাতকে আমি রেখেছি। কর্মদোষে কুলধর্ম পরিত্যাগ করে আমি এখন বেশ্যা হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি।

ধৃতব্রতের পুত্র সেই বেশ্যার কথা শোনার পর দু'হাতে কান ঢেকে মাটিতে পড়ে গেল। বেশ্যা তা দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল—এ কি হল? আমি কি তোমাকে কোন কঠোর কথা বলে দুঃখ দিয়েছি? শীগগির বল। ব্রাহ্মণকুমার নিজেকে কোন রকমে সংযত করে বলল—ব্রাহ্মণ ধৃতব্রত আমার পিতা; এই তুমি আমারই মা মহী। ঘটনাচক্রে আমাদের এ রকম সংযোগ ঘটেছে। এ কথা শুনে মহী অত্যন্ত দুঃখিত হল। এবং তারা উভয়েই পরস্পর শোকপ্রকাশ করতে লাগল। এভাবে রাত শেষ হল। সকালে ধৃতব্রতের পুত্র গালবকে সমস্ত কথা জানালো। সে বলল,—আমি ধৃতব্রতের পুত্র; পূর্বে আপনিই আমাকে পালন করেছেন। কি করলে এই জঘন্য পাপ থেকে আমার মুক্তি ঘটবে দয়া করে তা বলুন। আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না।

ব্রাহ্মণকুমারের কথা শুনে গালব তাকে আশ্বস্ত করে বললেন—তুমি শোক কোরো না। আমি প্রতি দিন তোমার দু'রকম রূপ দেখে তোমাকে জিগ্যেস করেছিলাম। চিন্তার কোন কারণ নেই; গঙ্গাস্নানে তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে গেছে। তুমি পবিত্র, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তুমি যেহেতু পবিত্র, সুতরাং তোমার আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই। তোমার মাকে তুমি চিনতে পেরেছ; তিনিও তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেছেন এবং এখনো তিনি অনুতপ্ত। অনুশোচনার আগুনে পুড়ে তাঁর সব পাপ ছাই হয়ে গেছে। প্রাণীদের যে বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, সে প্রবৃত্তি তার স্বাভাবিক হয়। যদি কখনো বিশেষ পুণ্যবলে দৈবাৎ সৎসঙ্গ ঘটে, তাহলে তার সেই প্রবৃত্তি আর থাকে না। তোমার মা অনুতপ্ত; এখন তীর্থস্নান করলেই তিনি পবিত্র হবেন।

গালবের উপদেশে মহী ও তার ছেলে সেই গৌতমী গঙ্গায় স্নান করলেন। স্নান করার পর তাঁরা পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তারপর থেকেই এই তীর্থ 'ধৌতপাপ' নামে বিখ্যাত হয়। পাপ প্রশমন ও গালব তীর্থ নামেও একে অভিহিত করা হয়। এই তীর্থ অতি পবিত্র।

—'ধৌতপাপমাহাত্ম্য নিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ তিরানব্বই

এবার তোমায় পিতৃতীর্থের কথা বলি। দশরথের পুত্র রাম সীতার সঙ্গে যেখানে পিতৃ-তর্পণ করেছিলেন, সেই স্থান পিতৃতীর্থ নামে নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। সেখানে স্নান, দান এবং পিতৃতর্পণ করলে, তা অক্ষয় হয়ে থাকে। রাম যেখানে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে পূজা করেছিলেন, সেই মহাপুণ্যজনক তীর্থ বিশ্বামিত্র তীর্থ নামে পরিচিত। বেদবাদিগণ সেই তীর্থের স্বরূপ যেভাবে নিরূপণ করেছেন, আমি সেভাবেই তোমাকে তা বলছি।

অনেক দিন আগে একবার এক ভয়াবহ অনাবৃষ্টি হয়। সে সময় বিশ্বামিত্র শিষ্যদের সঙ্গে গৌতমী গঙ্গার তীরে যান। স্ত্রী, পুত্র ও শিষ্যদের ক্ষুধায় কাতর দেখে ব্যথিত চিত্তে বিশ্বামিত্র তখন শিষ্যদের বললেন—তোমরা শীগগির যেখান থেকে পারো যে কোন রকম খাদ্য নিয়ে এসো। ক্ষুধার্ত শিষ্যগণ বিশ্বামিত্রের কথায় তখুনি খাদ্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারা অনেক জায়গা ঘুরল, কিন্তু কোথাও খাবার পেল না। শেষে একটা

মরা কুকুরকে পথে পড়ে থাকতে দেখল। তারা নিরুপায় হয়ে সেই কুকুরটিকে এনেই বিশ্বামিত্রকে দিল। বিশ্বামিত্র সেই কুকুরটিকে গ্রহণ করে শিষ্যদের বললেন—তোমরা এর মাংস কেটে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেল। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করে অগ্নিতে একে আহুতি দিয়ে রান্না কর। আমরা দেবতা, ঋষি, অতিথি, গুরু ও পিতৃদের নিবেদন করে অবশিষ্ট মাংস সকলে মিলে খাব। বিশ্বামিত্রের কথা অনুসারে শিষ্যরা কাজ করতে আরম্ভ করল। যখন সেই মাংস রান্না করা হচ্ছিল, তখন অগ্নি দেবদূতরূপে দেবতাদের সে খবর জানালেন। অগ্নির কথা শুনে ইন্দ্র শ্যেনরূপে আকাশ-পথে গিয়ে সেই মাংসপূর্ণ পাত্র নিয়ে চলে এলেন। শিষ্যেরা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বামিত্রকে সে-কথা জানালেন। শিষ্যদের কাছ থেকে সব কথা শুনে বিশ্বামিত্র ধ্যানযোগে সেই শ্যেনের স্বরূপ জানতে পারলেন। তিনি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে সংকল্প করলেন। ইন্দ্র সে-কথা জানতে পেরে সেই মাংস পাত্রকে মধুময় করে দিলেন এবং নিজেই পাখিরূপে আবার সেই মধুপূর্ণ পাত্র আগুনের উপর রেখে দিয়ে গেলেন। বিশ্বামিত্র সেই মধুপূর্ণ পাত্র দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বললেন—ইন্দ্র, তুমি এই অমৃত নিয়ে যাও, আমাকে সেই কুকুর মাংসই দাও। তা না হলে তোমার মহা অনর্থ ঘটবে। বিশ্বামিত্রের কথায় ইন্দ্র ভীত হয়ে পড়লেন ; তিনি বললেন—আপনি মধু দিয়েই হোম করুন এবং পুত্র ও শিষ্যদের সঙ্গে তাই পান করুন। কুকুরের মাংস তো যজ্ঞে দেওয়া যায় না। বিশ্বামিত্র তখন ইন্দ্রকে বললেন—এই মধু পান করেই বা কি ফল হবে ? সমগ্র প্রজাকুল ক্ষুধার জ্বালায় অবসন্ন ; তারা এককণা খাবার পর্যন্ত পাচ্ছে না। আমি একলাই মধু পান করব, সেটা মোটেই সঙ্গত নয়। সবাই যদি অমৃত লাভ করে, তবেই আমি পবিত্র অমৃত গ্রহণ করতে পারি। তা যদি না হয়, তবে দেবতাগণ এবং পিতৃগণ এই কুকুর মাংসই গ্রহণ করবেন ; পরে আমি ওই মাংস ভোজন করব। এতে কোন পাপ তো আমি দেখছি না।

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে ইন্দ্র খুবই ভীত হয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মেঘবৃন্দকে ডেকে আদেশ দিলেন তারা যেন পৃথিবীতে প্রভূত বারি বর্ষণ করে। বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবী পরিতৃপ্ত হল, প্রজারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তখন বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের দেওয়া সেই অমৃত দেবতাদের, পিতৃগণকে এবং ত্রিভুবনকে তর্পণ করে স্ত্রী-পুত্র ও শিষ্যদের সঙ্গে তা খেলেন। তখন থেকে সেই স্থান 'বিশ্বামিত্র তীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। স্বয়ং ইন্দ্র সেখানে অমৃত বর্ষণ করেন। সেই তীর্থ অতি পবিত্র। সেখানে স্নান করলে কিংবা কোন কিছু দান করলে সমস্ত যজ্ঞের ফলই পাওয়া যায়। এই বিশ্বামিত্র তীর্থ, মধু তীর্থ, ঐন্দ্র তীর্থ ও শ্যেন তীর্থ নামেও পরিচিত।

—'বিশ্বামিত্রতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ চুরানব্বই

এরপর তোমায় পবিত্র শ্বেততীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থের নাম শুনলেই সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। পুরাকালে শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তিনি মহামুনি গৌতমের বন্ধু ছিলেন। গৌতমী গঙ্গার তীরে তাঁর পবিত্র আশ্রম ছিল। তিনি সর্বদাই অতিথি সৎকারে রত থাকতেন। শ্বেত ছিলেন শিবের পরম ভক্ত। কালক্রমে তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যমদূতেরা এলো। কিন্তু তারা শ্বেতের বাড়ির ভেতর

ঢুকতেই পারল না। যমের অনুচর চিত্রক তখন যমকে জিগ্যেস করল—আচ্ছা, এখনো তো সেই ব্রাহ্মণ শ্বেত এলো না! দূতেরাই বা কোথায় গেল? আমি এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার নিয়মের এই ব্যতিক্রম কেন? চিত্রকের কথা শুনে যম ক্রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে শ্বেতের বাড়িতে পাঠালেন। মৃত্যু গিয়ে দেখলেন যে শ্বেতের বাড়ির বাইরে দূতেরা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি দূতদের কাছে ঘটনাটা জানতে চাইলে দূতেরা বলল—সাক্ষাৎ শিব ব্রাহ্মণ শ্বেতকে রক্ষা করছেন; কাজেই আমরা তাঁর দিকে চাইতে পারছি না। মৃত্যু তখন নিজেই ব্রাহ্মণ শ্বেতের কাছে গেলেন। কিন্তু কে মৃত্যু, কারাই বা তার অনুচর, শ্বেত তা জানেন না। তাঁর ভ্রুক্ষেপই নেই এ সবের প্রতি। তিনি একমনে শিব পুজা করতে লাগলেন। মৃত্যুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিবের অনুচর জিগ্যেস করল—তুমি এখানে কেন? শিবভক্তের উপর তোমার তো কোন অধিকার নেই। মৃত্যু তখন দণ্ডধারী শিবানুচরকে বললেন—শ্বেতের কাল পূর্ণ হয়েছে, তাই তাকে নেওয়ার জন্যেই আমি এসেছি। এ কথা বলেই মৃত্যু শ্বেতের প্রতি পাশ নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। শিবানুচর মৃত্যুর এ রকম আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে শিবের দেওয়া দণ্ড দিয়ে মৃত্যুকে আঘাত করল। মৃত্যু সেই ভীষণ দণ্ডের আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল। দূতেরা মৃত্যুকে নিহত দেখে যমের কাছে গিয়ে সব কথা জানাল। সব শুনে যম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি চিত্রগুপ্ত, মহিষ, ভূত, বেতাল, আধি ব্যাধি, অক্ষিরোগ কুক্ষিরোগ, কর্ণমূল, তিন প্রকার জ্বর এবং সমস্ত নরককে তাঁর সঙ্গী হওয়ার আদেশ জানিয়ে নিজেই শ্বেতের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যমকে সদলবলে আসতে দেখে নন্দী, গণেশ, কার্তিক, শিব ও শিবানুচর ওই দণ্ডধারীকে সে কথা জানাল। তখন সেখানে এক ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। কার্তিকেয় নিজের শক্তিতে যমদূতদের ছিন্ন-ভিন্ন করতে লাগলেন এবং স্বয়ং যমরাজকেও তিনি আহত করলেন। তখন অসহায় হয়ে অবশিষ্ট যমদূতেরা সূর্যকে সমস্ত ঘটনা জানাল। সূর্য সমস্ত কথা শুনে লোকপাল ও অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে আমার কাছে এলেন। তখন আমি, ভগবান বিষ্ণু, ইন্দ্র, অগ্নি বরুণ, চন্দ্র, সূর্য, মরুদ্‌গণ ও অন্যান্য লোকপালগণ—আমরা সবাই মিলে যমের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম যে বলবান যম গঙ্গাতীরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তখন সেখানে সমুদ্র, নদ-নদী, পর্বত ও অন্যান্য প্রাণীরা বৈবস্বত যমকে দেখার জন্য এলো। দেবতারা যমকে এ রকম অবস্থায় দেখে ভীত হয়ে শিবকে বললেন—তুমি দেবাদিদেব, ভক্তজনে অনুরাগ ও দুষ্ট দমনের ক্ষমতা সবই তোমাতে রয়েছে। ব্রাহ্মণ শ্বেত তোমার পরম ভক্ত, তার আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে; তবু দেবতাদের মিলিত শক্তিরও কোন ক্ষমতা নেই শ্বেতকে নিয়ে যেতে পারে। যারা তোমাকে উপাস্যরূপে পূজা করে, স্বয়ং যমও তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। তুমি ছাড়া এই বিশ্বের ব্যবস্থা-বিধানে আর কে সমর্থ? তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

দেবতারা এ রকম স্তব করতে থাকলে শিব তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন—তোমাদের স্তবে আমি সন্তুষ্ট, তোমরা কি বর চাও, বল। দেবতারা তখন শিবকে বললেন—এই বৈবস্বত যম সমস্ত শরীরধারী প্রাণীর নিয়ামক। এই লোকপাল যমকে ন্যায়বিধানে নিযুক্ত করা হয়েছে। ইনি অপরাধীও নন, পাপকর্মকারীও নন। এঁকে মেরে ফেলার তো কোন কারণ নেই। ইনি না থাকলে বিশ্ববিধাতার নিয়ম রক্ষা হয় না। আমাদের প্রার্থনা আপনি যমকে বাঁচিয়ে দিন; তাঁর অনুচরেরাও যেন বেঁচে যায়। আমরা আশা করি আমাদের প্রার্থনা পূরণ হবে। কারণ, মহান লোকের কাছে যা প্রার্থনা

করা হয়, তা পূরণ হয়। দেবতাদের কথা শুনে শিব বললেন—আপনারা যদি আমার কথার অনুমোদন করেন তাহলে নিশ্চয়ই আমি যমকে বাঁচিয়ে দেব। শিবের কথায় দেবতারা সবাই তাঁদের সম্মতি জানালেন। তখন শিব সমবেত দেবতাদের বললেন—আমার প্রস্তাব এই যে, যারা আমার ভক্ত, তারা যেন কখনো মৃত্যু বরণ না করে। দেবতারা শিবের কথা শুনে বললেন—আপনি প্রাজ্ঞ হয়ে কি করে এ কথা বলছেন! এ হলে তো আর জগতের নিয়ম রক্ষা হবে না, সবাই অমর হয়ে যাবে। তখন স্বর্গে এবং পৃথিবীতে কোন পার্থক্য থাকবে না। শিব কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে অটল রইলেন, তিনি আবার বললেন—দেখ, আমার কথা না রাখলে তোমাদের কোন প্রার্থনাই আমি পূরণ করব না। যারা আমার ভক্ত এবং গৌতমী গঙ্গায় যারা স্নান করে, তাদের ওপর যমের কোন কর্তৃত্বই থাকবে না। কেবল তাই নয়, তারা যেন কোন রকম রোগ বা কোন রকম কষ্ট ভোগ না করে। যারা আমার শরণাপন্ন, তাদের যেন অবিলম্বে মুক্তি ঘটে। দেবতারা তখন শিবের কথায় বাধ্য হয়ে সম্মত হলেন।

দেবতাদের সম্মতি আছে জেনে শিব নন্দীকে আদেশ করলেন যম এবং তাঁর অনুচরদের গৌতমী গঙ্গার পবিত্র সলিল দিয়ে বাঁচিয়ে দিতে। নন্দী শিবের আদেশ পালন করলেন। যম এবং তাঁর অনুচরেরা তখন বেঁচে উঠলেন এবং দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন। গৌতমী নদীর উত্তর তীরে থেকে দেবতারা মহাদেবের পুজো করলেন। শ্বেততীর্থের এই পবিত্র কাহিনী তোমায় শোনালাম। একে মৃত্যুতীর্থও বলে। এই তীর্থের বিবরণ শুনলে সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ হয় এবং সেখানে স্নান করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

—'তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ পঁচানব্বই

এবার তোমায় শুক্রতীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থ অতি পবিত্র। পুরাকালে অঙ্গিরা ও ভৃগু নামে দুজন পরম ধার্মিক ঋষি ছিলেন। তাঁদের দুজনেরই দুটি পুত্র জন্মায়। অঙ্গিরার পুত্র জীব এবং ভৃগুর পুত্র কবি। কবি শুক্র নামেও পরিচিত। কালক্রমে জীব এবং কবির উপনয়ন হল ; উপনয়নের পর তাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। তখন অঙ্গিরা এবং ভৃগু পরস্পর মিলে ঠিক করলেন তাঁদের মধ্যে যে কোন একজন পুত্রদের শিক্ষাদান ব্যাপারে থাকবেন। সেই ব্যবস্থা অনুসারে অঙ্গিরা তাদের অধ্যাপনার ভার নিলেন। জীব এবং শুক্র দুজনেই গুরু অঙ্গিরার কাছে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু শুক্র দেখলেন যে, সমান যত্নের সঙ্গে অঙ্গিরা দুজনকে পড়াচ্ছেন না। তিনি জীবকে যে রকম যত্ন নিয়ে পড়ান শুক্রকে তেমন যত্নের সঙ্গে পড়ান না। শুক্র বড় হয়েছেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর ক্ষতি হচ্ছে। তাই একদিন তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সঙ্গে গুরু অঙ্গিরাকে বললেন—গুরুদেব, আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অধ্যাপনায় পক্ষপাতিত্ব দেখে আমি ব্যথিত হয়েছি। পুত্র এবং শিষ্যের প্রতি গুরুদের এ রকম পক্ষপাতিত্ব সমীচীন নয়। যাঁরা প্রকৃত পক্ষে খাঁটি উপদেষ্টা তাঁরা এ রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করেন না। আপনি তো সবই বোঝেন, কি আর নতুন করে জানাব আপনাকে। আমাকে অনুমতি দিন। পিতার কাছে বিদ্যাশিক্ষার

জন্য যাব, যদি তিনি রাজী না হন, তবে অন্য কারুর কাছে যাব।

তারপর গুরু অঙ্গিরার অনুমতি নিয়ে শুক্র সেখান থেকে চলে গেলেন। কিন্তু পিতার কাছে না গিয়ে মহামুনি গৌতমের আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি ঠিক করলেন যে, বিদ্যালাভ করেই তিনি পিতার কাছে যাবেন। তিনি গৌতমকে সব কথা বললেন এবং জিগ্যেস করলেন—মুনিশ্রেষ্ঠ, দয়া করে বলে দিন, কাকে আমরা গুরুরূপে পাব ? গৌতম জগদ্‌গুরু শংকরকে তাঁর গুরু বলে নির্দেশ করলেন। গৌতম শুক্রকে গৌতমী তীরে গিয়ে মহাদেবকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করতে নির্দেশও দিলেন। গৌতমের নির্দেশে শুক্র গৌতমী গঙ্গায় গিয়ে স্নান করলেন এবং শংকরের স্তব করতে লাগলেন—আমি নিতান্তই বালক। আমার বুদ্ধিও বালকজনের মতো। কি ভাবে আপনার স্তব করতে হয় তাও জানি না। গুরু আমায় পরিত্যাগ করেছেন; আমার বন্ধু বা উপদেষ্টা কেউই নেই। আপনি গুরুদেরও গুরু, মহৎদেরও মহীয়ান। আমি বিদ্যাপ্রার্থী। বিদ্যাশিক্ষার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করছি। দয়া করে এই অধীন জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; আমাকে বিদ্যা দান করুন। আপনাকে আমি বারংবার প্রণাম জানাই।

শুক্রের স্তবে মহাদেব প্রসন্ন হলেন। তিনি শুক্রকে বললেন—যা দেবতাদেরও দুর্লভ, সে-রকম বরও তুমি প্রার্থনা করতে পারো। তোমার স্তবে আমি প্রীত হয়েছি। শুক্র তখন বিনীত ভাবে মহাদেবকে বললেন—প্রভু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা এবং ঋষিরাও যে বিদ্যা জানেন না, আমি সেই বিদ্যা প্রার্থনা করি। আপনিই আমার পরম গুরু। শিব শুক্রের প্রার্থনা পূরণ করেন। যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার কথা দেবতারা পর্যন্ত জানতেন না, মহাদেব সেই বিদ্যাই শুক্রকে দান করলেন। অন্যান্য যে সব লৌকিক ও বৈদিক বিদ্যা সে তো শুক্রের আয়ত্তে। শুক্র শংকরের কাছ থেকে সেই মহাবিদ্যালাভ করে নিজের পিতা ভৃগুর কাছে গেলেন। শুক্র সেই বিদ্যার প্রভাবে দৈত্যদের পূজনীয় হয়ে উঠলেন; দৈত্যরা তাঁকে গুরু রূপে বরণ করল। এর পর বৃহস্পতির পুত্র কচ ঘটনাচক্রে শুক্রের কাছ থেকে সেই বিদ্যা লাভ করলেন। তারপর বৃহস্পতির কাছ থেকে একে একে সেই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দেবতারাও শিখে নিলেন। শুক্র যেখানে থেকে মহাদেবকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করে সেই বিদ্যা লাভ করেন, সে-স্থান গৌতম গঙ্গার উত্তর তীর। এই স্থান শুক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত। এর অন্য নাম 'মৃতসঞ্জীবনী তীর্থ'। এই তীর্থে স্নান, দান প্রভৃতি করলে মানুষের আয়ু বাড়ে, তারা দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়।

—'মৃতসঞ্জীবনীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ ছিয়ানব্বই

এবার তোমাকে বিখ্যাত ইন্দ্রতীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থের কথা শুনলে পাপ ক্ষয় হয়। পুরাকালে ইন্দ্র বৃত্র নামক অসুরকে হত্যা করেন। বৃত্রকে হত্যা করায় ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে স্পর্শ করে। ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে ভীত করে তোলে। সেই মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকে। তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ইন্দ্র অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মানসিক শান্তি লাভ হয় না। তিনি তখন একটা বড় সরোবরে গিয়ে পদ্মফুলের ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। ইন্দ্র সেখানে দিব্য সহস্র বৎসর ছিলেন, মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যাও ইন্দ্রের পিছু ছাড়ে নি।

এদিকে ইন্দ্রের দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতিতে দেবতাদের অসুবিধা হতে লাগল ; তাঁরা ইন্দ্রকে উদ্ধারের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। আমি তখন দেবতাদের নির্দেশ দিলাম যে তাঁরা যেন ইন্দ্রকে গৌতমী গঙ্গার জলে স্নান করিয়ে আনেন, তাহলেই তিনি পবিত্র হতে পারবেন ; ব্রহ্মহত্যার পাপ আর থাকবে না। আমার নির্দেশে ইন্দ্র গৌতমী গঙ্গার জলে স্নান করলেন। তারপর দেবতারা এবং ঋষিরা তাঁকে যখন অভিষিক্ত করতে উদ্যত, তখন মহামুনি গৌতম সেখানে এলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদের বললেন—তোমরা কি ভেবেছ ? এই ইন্দ্র গুরুপত্নীগামী ; মহাপাপ করেছে ; অভিষেক কিছুতেই হবে না। তোমরা একে নিয়ে শীগগির এখান থেকে চলে যাও ; নইলে তোমাদের সবাইকে আমি ভস্মীভূত করব।

দেবতারা তখন ইন্দ্রকে নিয়ে নর্মদা নদীতে গেলেন। নর্মদা নদীর উত্তর তীরে ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করতে উদ্যত হলেন। সেখানে মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রম ছিল। তিনিও ইন্দ্রের অভিষেকে বাধা দিলেন। তখন মাণ্ডব্য ঋষিকে দেবতারা স্তবযোগে পুজো করে বললেন—দেখুন, আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। এই সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট ইন্দ্র যেখানে অভিষিক্ত হবেন, সেখানেই দারুণ বিঘ্ন ঘটছে। অথচ এঁকে অভিষিক্ত না করে আমরা স্বর্গে নিয়ে যেতে পারি না। তাই আমরা ঠিক করেছি, যেখানে ইন্দ্রের পাপ প্রক্ষালন করা হবে, সেখানে যেমন বিঘ্ন ঘটবে, তেমনি আমরা সেই দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলব ; সেখানে দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি কোন দিনই হবে না। আপনি দয়া করে বলে দিন, কোথায় ইন্দ্রের অভিষেক হবে।

দেবতাদের কথা শুনে মাণ্ডব্য সেখানেই ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করতে বললেন। সেই নর্মদা নদীর উত্তর তীরে ইন্দ্রের অভিষেক এবং মল বা পাপ ক্ষালন হল। তখন থেকেই দেবতারা এবং মুনিরা সেই স্থানকে মালব নামে অভিহিত করেন। ইন্দ্র পবিত্র হলেন, তাঁকে আরও পবিত্র করে তোলার জন্য গৌতমী গঙ্গায় স্নান করানো হল। ইন্দ্রের সেই অভিষেক অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম : তাছাড়াও ঋষিগণ, দেবতাগণ, বিষ্ণু, বসিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, অত্রি, কশ্যপ এবং যক্ষ ও সর্পগণ উপস্থিত ছিলেন। আমি কমণ্ডলুর জল দিয়ে ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করলাম। কমণ্ডলু থেকে ছিটানো সেই জলে সিক্তা নামে একটি পবিত্র নদীর উৎপত্তি হল। সেই নদী গৌতমী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হল। গৌতমী গঙ্গার সঙ্গে সিক্তা নদীর সেই সঙ্গমস্থান তীর্থে পরিণত হয় : সেখানে সাত হাজার পবিত্র তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে যা কিছু দান করা হয়, তা চিরদিনই অক্ষয় হয়ে থাকে। এই পবিত্র কথা যে শোনে বা পাঠ করে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

—'ইন্দ্রতীর্থ প্রভৃতি সপ্তসহস্রতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ সাতানব্বই

এবার তোমাকে পৌলস্ত্য তীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে উত্তর দিকের অধিপতি ছিলেন কুবের ; তিনি সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্রবা নামক ঋষির জ্যেষ্ঠ পুত্র। লঙ্কায় তাঁর আধিপত্য ছিল প্রতিষ্ঠিত। বিশ্রবা ঋষির দুজন স্ত্রী। তার মধ্যে একজনের গর্ভে কুবেরের জন্ম হয় এবং অন্যজনের গর্ভে তিন পুত্রের জন্ম হয়—তাদের নাম—রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। এদের মা ছিল রাক্ষস জাতীয়া নারী। ভাইদের

সঙ্গে কুবেরের সম্পর্ক ছিল ভালো। তারা আমারই দেওয়া বিমানে আমার কাছে প্রায়ই আসত। রাবণদের মা কিন্তু ভাইদের মধ্যে এই সু-সম্পর্ককে ভালো চোখে দেখল না। সে ক্রুদ্ধ হয়ে তার পুত্রদের বলল—এই জীবনে আমার আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। দেবতা ও দানবেরা পরস্পর পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাই, তাই জয় ও ঐশ্বর্য কামনায় পরস্পরের নিধন কামনা করে। তোমরা পুরুষ নও ; তোমাদের না আছে জয়ের ইচ্ছা, না আছে বলবত্তা। যে ব্যক্তি শত্রুর আনুগত্য নেয়, তার জীবনের কোন দাম নেই।

মায়ের কথা শুনে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ তপস্যার জন্য বনে চলে গেল। তারা অনেক দিন ধরে কঠোর তপস্যা করার পর আমি তাদের বর দান করি। পরে মা এবং মামা কালনেমির পরামর্শ অনুসারে তারা লঙ্কার আধিপত্য প্রার্থনা করল। তাতে কুবেরের সঙ্গে তাদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই যুদ্ধে তারা কুবেরকে পরাজিত করে পুষ্পক বিমান এবং লঙ্কা নগরী নিয়ে নিল। তারপর রাবণ এ কথা ঘোষণা করে দিল যে, যে কুবেরকে আশ্রয় দেবে, তাকে আমার হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। রাবণ প্রচণ্ড বলবান ছিল ; তার উপর আমার বরে সে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। রাবণের ভয়ে কেউই কুবেরকে আশ্রয় দিতে সাহস করল না। তখন কুবের নিরুপায় হয়ে পিতামহ পুলস্ত্যের কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালেন এবং পরবর্তী কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কুবেরের কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে পুলস্ত্য তাঁকে বললেন—তুমি গৌতমী গঙ্গায় যাও ; সেখানে গিয়ে ভগবান মহাদেবের স্তব কর। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমার বিশ্বাস, ভগবান শঙ্কর তোমার একটা উপায় করবেন।

কুবের তখন বাবা, মা, স্ত্রী ও পিতামহ পুলস্ত্যের সঙ্গে গৌতমী গঙ্গায় গিয়ে স্নান করলেন। তারপর পবিত্র হয়ে শংকরের স্তব করতে লাগলেন—তুমিই এই সমগ্র বিশ্বের প্রভু ; তোমাকে অবজ্ঞা করে যদি কোন ব্যক্তি মোহবশে কোন বিষয়ে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করে, তাহলে তার অবস্থা প্রকৃতই শোচনীয় হয়ে থাকে। তুমি তোমার অষ্টমূর্তিতে পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তোমার এই তত্ত্ব জানেন ; অবিদ্বান ব্যক্তি কিন্তু তোমার মাহাত্ম্য কিছুই জানতে পারে না। জগন্মাতা গৌরী নিজের গায়ের ময়লা দিয়ে মূর্তি তৈরি করে পরিহাসচ্ছলে 'এটি পুত্র' এ রকম কথা বললে, সেই মূর্তিই তোমার দৃষ্টির ফলে গণেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কামদেব তোমার তৃতীয় নেত্রজাত বহ্নিতে ভস্মীভূত হওয়ার পর গৌরীদেবীর অনুরোধে তুমিই তোমার সৌম্য-মূর্তিতে কামদেবকে পুনর্জীবন দান করেছিলে।

কুবেরের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শংকর তাঁকে বরগ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু কুবের মহাদেবের দর্শনে এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি কোন বরই চাইতে পারলেন না। এ সময় আকাশবাণী শোনা গেল। সেই আকাশবাণীর বক্তব্য—কুবের ধনসমূহের অধিপতি হবেন। ভবিতব্য বস্তু ঘটে যাওয়ার মতো, দাতব্য বস্তু দিয়ে দেওয়ার মতো এবং প্রাপ্তব্য বস্তু পেয়ে যাওয়ার মতো সেই দৈবী বাক সেই মুহূর্তে কাজে পরিণত হল। কুবের সোমেশ্বর শিবের পুজো করে দিকপালদের এবং ধনসমূহের অধিপতি হলেন। সেই আকাশবাণীকেই মহাদেব অনুমোদন করলেন। এভাবে ভগবান শংকর পুলস্ত্য বিশ্রবা মুনি ও কুবেরকে অভিনন্দিত করে সেখান থেকে চলে গেলেন। তারপর থেকেই সেই তীর্থ পৌলস্ত্য, ধনদ বা বৈশ্রবসতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

—'পৌলস্ত্যতীর্থবর্ণন নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ আটানব্বই

এবারে তোমাকে বিখ্যাত 'অগ্নিতীর্থে'র কথা শোনাব। পুরাকালে জাতবেদা নামে অগ্নির এক স্বনামধন্য ভাই ছিলেন ; তিনি দেবতাদের জন্য যজ্ঞীয় হবি বহন করতেন। একবার গৌতমী তীরে ঋষিদের যজ্ঞাগারে জাতবেদা দেবতাদের জন্য হব্য বহন করছেন, এমন সময় মধু নামে এক বলবান দৈত্য, ঋষি ও দেবতাদের সামনেই তাঁকে মেরে ফেলল। জাতবেদার মৃত্যুতে দেবতাদের চরম ক্ষতি হল ; তাঁরা যজ্ঞীয় হবির অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে পড়লেন। এদিকে জাতবেদার মৃত্যুতে অগ্নি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাজলে প্রবেশ করলেন। অগ্নির অভাবে দেবতা, ঋষি, মানবকুল সকলেরই মৃতপ্রায় অবস্থা হয়ে পড়ল। অগত্যা দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষেরা যেখানে অগ্নি ছিলেন সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা অগ্নিকে প্রশমিত করার জন্য স্তব করতে লাগলেন—তুমি হব্য ও কব্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে, অন্নপাকে মানবকুলকে এবং তাপের দ্বারা বীজসমূহকে সঞ্জীবিত কর। দেবতাদের স্তুতির উত্তরে অগ্নি বললেন—আপনারা যা বলছেন, আমার যে যে কাজের কথা উল্লেখ করছেন, সে সব সম্পন্ন করতে সক্ষম ছিলেন আমার নিহত ভাই জাতবেদা, আমি নয়। আপনাদের কাজেই তিনি নিরত ছিলেন, তবুও তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হল। আমিও আপনাদের কাজে নিযুক্ত, আমারও একদিন সেই দশাই হবে। তাই আপনাদের কাজ করার ব্যাপারে আমার আর কোন উৎসাহ নেই। ঐহিক বা পারলৌকিক যে কাজই করি না কেন, আমারও জাতবেদার মতোই গতি হবে। অগ্নির কথা শুনে দেবতারা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—শোন, তোমাকে আমরা আয়ু, কর্মে প্রীতি এবং সমস্ত অধিকারে শক্তি প্রদান করব ; তাছাড়া প্রযাজ ও অনুযাজও তোমাকে সমর্পণ করব। তুমি দেবতাদের মুখস্বরূপ এবং তোমারই আহুতি প্রথম ; তোমাকে যজ্ঞে যে সামগ্রী মানবসমূহ প্রদান করবে, সে সামগ্রীই আমরা গ্রহণ করব।

দেবতাদের আশ্বাসে সন্তুষ্ট হয়ে অগ্নি ঐহিক ও পারলৌকিক হব্য বিষয়ে নিযুক্ত হলেন। তিনি জাতবেদা, বৃহদ্ভানু, সপ্তার্চি, নীললোহিত, জলগর্ভ, শমীগর্ভ ও যজ্ঞ-গর্ভ প্রভৃতি নামে অভিহিত হলেন। দেবতারা তাঁকে জল থেকে তুলে সিঞ্চন করেছিলেন। অগ্নি আগে কেবল স্থলভাগেই ছিলেন পরে জলে থাকার জন্য তাঁর সর্বত্র অবাধ গতি হল। তিনি প্রথম যেখানে জল থেকে উঠে এসেছিলেন, সেই স্থান 'অগ্নিতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেখানে সাতশো তীর্থ রয়েছে। যে ব্যক্তি সংযত হয়ে ওই সব তীর্থে স্নান ও দান প্রভৃতি করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। সেখানে দেবতীর্থ নামে আরেকটি তীর্থ আছে। আগ্নেয় ও জাতবেদসনামক অগ্নি অনেক বর্ণবিশিষ্ট এক লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। মহাদেবের সেই মূর্তি দর্শন করলে সমস্ত যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

—'অগ্নিতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ নিরানব্বই

ঋণমোচন নামে এক তীর্থ আছে, এবার তার কথাই তোমায় শোনাব। পুরাকালে কক্ষীবান নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর একটি পুত্র ছিল ; তার নাম পৃথুশ্রবা। তিনি বৈরাগ্যবশত

বিয়ে করেন নি এবং বিয়ে না করার জন্য অগ্নির উপাসনা করতেও পারেন নি। কক্ষীবানের আরেকটি পুত্র ছিল। সে যেহেতু ছোট, তাই তার ইচ্ছা থাকলেও সে বিয়ে করতে পারে নি, এবং বিয়ে না করায় অগ্নির উপাসনাও করতে পারে নি। কারণ, বড় ভাই অবিবাহিত থাকতে ছোট ভাইয়ের যদি বিয়ে হয় তবে পরিচিত্তি নামক দোষ হয়। এ রকম অবস্থায় পূর্বপিতৃগণ দুজনকেই আলাদা আলাদা ভাবে ডেকে বললেন– শোন, তোমরা বিয়ে কর, তা না হলে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ প্রভৃতি যে তিন রকম ঋণ রয়েছে, তা পরিশোধ হবে না। পিতৃপুরুষদের কথা শুনে পৃথুশ্রবা বললেন- আমি কোন ঋণের কথাই জানি না, কিভাবে তার মোচন হয় তাও জানি না ; তবে আমি ঠিক করেছি যে, বিয়ে আমি করব না। কক্ষীবানের ছোট ছেলেও বলল যে বড় ভাই অবিবাহিত থাকতে তার পক্ষে বিয়ে করা অসঙ্গত। তাদের কথা শুনে পূর্বপুরুষেরা তাদেরকে বললেন–শোন, তোমরা পবিত্র গৌতমী গঙ্গায় যাও, সেখানে গিয়ে স্নান কর এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তর্পণ কর। এতেই তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। গৌতমী গঙ্গায় যে কেউ স্নান করতে পারে ; এতে জাতের কোন বাছবিছার নেই।

তারপর পিতৃপুরুষদের কথা মেনে নিয়ে পৃথুশ্রবা গৌতমী গঙ্গায় স্নান ও তর্পণ করলেন, এতে তিনি ঋণমুক্ত হলেন ; ছোট ছেলেরও পরিচিত্তি দোষ রইল না। তারপর থেকেই ওই স্থান 'ঋণমোচন তীর্থ' নামে পরিচিত হয়ে রয়েছে। ঋণী ব্যক্তি গৌতমী গঙ্গায় স্নান করলে এবং দান করলে বৈদিক ও লৌকিক ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে সুখলাভ করে।

—'ঋণমোচনতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো

সুপর্ণাসঙ্গম ও কদ্রুসঙ্গম নামে দুটি বিখ্যাত তীর্থ রয়েছে। সেখানে অগ্নিকুণ্ড, রৌদ্র, বৈষ্ণব, সৌর, সৌম্য, ব্রাহ্ম, কৌমার ও বারুণ নামে আরও অনেক তীর্থ আছে। এইখানেই অপ্সরা নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এবার এই তীর্থস্থানে যে ঘটনা ঘটেছিল তার কথা তোমায় শোনাব।

পুরাকালে ইন্দ্রের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে বালখিল্য মহর্ষিগণ প্রজাপতি কশ্যপকে ডেকে বললেন- মহামান্য কশ্যপ, আমরা আপনাকে আমাদের তপস্যার অর্ধাংশ দান করছি ; আপনি এমন একটি পুত্র উৎপাদন করুন যে ইন্দ্রের অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে পারে। বালখিল্যদের প্রস্তাব কশ্যপ মেনে নিলেন। তারপর কশ্যপ তাঁর দুই পত্নী সুপর্ণা ও সর্পমাতা কদ্রুর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় কালক্রমে তারা গর্ভবতী হল। কশ্যপ তাদেরকে আশ্রম থেকে কোথাও যেতে নিষেধ করলেন এবং কোন রকম গর্হিত কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বললেন। তারপর তিনি কিছু দিনের জন্য বাইরে চলে গেলেন। কশ্যপ বাড়িতে না থাকায় সুপর্ণা এবং কদ্রুর কোন বাঁধন রইল না। সে সময় গঙ্গার তীরে সপ্তর্ষিরা এক মহাসত্রের আয়োজন করেছিলেন। কদ্রু ও সুপর্ণা সেখানে গিয়ে হাজির হল। তত্ত্বদর্শী মুনিরা বারংবার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তারা সেই সত্রে থেকে তাঁদের সামগানে এবং হবিদানে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগল। স্ত্রীলোকের দুর্বিনয় তো সহ্য করা যায় না। ব্রাহ্মণেরা প্রথমে তাদের নিষেধ করলেন কিন্তু তারা সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করল। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণগণ তদের এই অভিশাপ দিলেন যে, তারা নদীরূপ প্রাপ্ত হবে।

ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তারা সুপর্ণা ও কদ্রু নামে দুটি নদীতে পরিণত হল।

এদিকে কশ্যপ বাড়িতে ফিরে এসে ঋষিদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনলেন। তারপর সমস্ত ঘটনা বালখিল্যদের জানালেন। বালখিল্য মহর্ষিরা কশ্যপকে বললেন—তুমি গোতমী গঙ্গায় যাও। সেখানে স্নান করে মহাদেবের স্তব কর। তাহলেই তুমি তোমার পত্নীদের ফিরে পাবে।

বালখিল্যদের কথামতো কশ্যপ গোতমী গঙ্গায় গেলেন। মহাদেব ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত হয়ে গোতমী গঙ্গার মধ্যদেশে মধ্যমেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়ে বিরাজ করছিলেন। কশ্যপ সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন।—যিনি লোকত্রয়ের অধিপতি, কোন বস্তুতেই যার কোন আসক্তি নেই, সেই নিখিল বিশ্ববিধাতা প্রসন্ন হোন। এই চরাচর প্রাণীবর্গ, তাপত্রয়রূপে সূর্যতাপে তাপিত হয়ে কষ্ট ভোগ করে, তুমিই এদের দুঃখ দূর করতে পারো। যাঁর গুণাবলী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও বলতে অক্ষম. সেই সোমমূর্তি মহাদেবকে চিন্তা করেই লোকে সুখী. দানশীল ও বরেণ্য হতে পারে। মহাদেব কশ্যপের স্তবে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি কশ্যপের মনোভব বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন—শোন কশ্যপ, তোমার যে পত্নীদ্বয় নদীরূপে বিরাজ করছে, তারা যখনই গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হবে তখনই নিজ নিজ রূপ ফিরে পাবে এবং গঙ্গার অনুগ্রহে তারা গর্ভিণী অবস্থাই ফিরে পাবে।

তারপর কশ্যপ তাঁর দুই স্ত্রীকেই আগেকার রূপে ফিরে পেলেন। তিনি তখন গোতমী তীরস্থিত সেই ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে দুই পত্নীর সীমন্তোন্নয়ন করলেন এবং বিধিমতো ব্রাহ্মণদের সৎকার করলেন। তখন কদ্রু তাঁদের দিকে তাকিয়ে উপহাসের হাসি হাসলেন। ব্রাহ্মণগণ কদ্রুর সেই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তুই আমাদের যে উপহাসের চোখে দেখলি, সেই চোখে তুই কোন দিন দেখতে পাবি না। সর্পমাতা কদ্রু তখন কাণা হয়ে গেল। পত্নীর অসংযত আচরণের জন্য কশ্যপ তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হয়ে বললেন যে কদ্রু যদি গোতমী গঙ্গায় স্নান করে, তাহলে তার পাপ থাকবে না। ব্রাহ্মণদের কথামতো কশ্যপ পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে গোতমী গঙ্গায় স্নান করলেন। তারপর থেকেই ওই তীর্থ সঙ্গমতীর্থ নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এই তীর্থে স্নান করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

—'কদ্রুসুপর্ণাসঙ্গমতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো এক

এবার তোমাদের বিখ্যাত পুরুরবা তীর্থের কথা শোনাব। ওই তীর্থের কথা স্মরণ করলেও পাপক্ষয় হয়। পুরুরবা নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি একবার ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হলে দেবনদী সরস্বতী তাঁকে দেখে হাসতে লাগলেন। তাঁকে দেখে পুরুরবা স্বর্গীয় অপ্সরা উর্বশীর কাছে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। উর্বশী জানাল যে ওই হাস্যময়ী রমণী দেব নদী সরস্বতী। পুরুরবা তখন উর্বশীকে জানালেন যে, ওই সরস্বতীকে তাঁর চাই। রাজার কথামতো উর্বশী সরস্বতীকে সব কথা জানালে সরস্বতী পুরুরবার কাছে চলে এলেন। তারপর অনেক দিন ধরে পুরুরবা সরস্বতীর তীরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম সুখ অনুভব করতে লাগলেন। তার ফলে সরস্বান নামে তাঁদের একটি পুত্র

জন্মগ্রহণ করল। ওই সরস্বানের পুত্র বৃহদ্রথ।

আমি এ সবের কথা কিছুই জানতাম না। অন্যান্যদের কাছে সব কথা শুনে আমি সরস্বতীকে এই বলে অভিশাপ দিলাম—তুমি মহানদীর রূপ ধারণ কর। তখন আমার অভিশাপে ভীত হয়ে সরস্বতী গোতমী গঙ্গায় গেল। সেই পবিত্র গঙ্গার কাছে সরস্বতী সব কথা খুলে বলল। তখন গঙ্গা আমাকে বলল—আপনি সরস্বতীকে শাপমুক্ত করুন। তাকে অভিশাপ দেওয়া আপনার সঙ্গত কাজ নয়। স্ত্রীলোকেরা পুরুষকে কামনা করে, এটাই স্বাভাবিক; এটাই তাদের স্বভাব। রমণীগণ স্বভাবতই চঞ্চল। আপনি তো বিশ্বস্রষ্টা; আপনি সব কথাই জানেন। দেখুন, কাম স্বভাবতই কাকে না পীড়িত করে?

গোতমীর অনুরোধে আমি তখন সরস্বতীকে শাপমুক্ত করে বললাম—আচ্ছা, ঠিক আছে। সরস্বতীকে সকলেই দেখতে পাবে। তখন থেকেই সরস্বতী পৃথিবীতে দৃশ্য এবং অদৃশ্য উভয় রূপেই বিরাজিত। সরস্বতী শাপাকুল হয়ে যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, ধার্মিক পুরূরবা সেখানে গিয়ে মহাদেবের আরাধনা করেন। তার ফলে তাঁর সমস্ত কামনা পূরণ হয়। তারপর থেকেই ওই তীর্থ পুরূরবা নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সরস্বতীর সঙ্গম ব্রহ্মতীর্থ নামে পরিচিত।

—'সরস্বতীসঙ্গমতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো দুই

সাবিত্রী, গায়ত্রী, শ্রদ্ধা, মেধা ও সরস্বতী—এই পঞ্চতীর্থ মুনিদের মতে অতি পবিত্র স্থান। এই তীর্থসমূহে স্নান করে জলপান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এরা আমারই কন্যা; এদের মধ্যে বড় মেয়ে সাবিত্রী অপরূপ সুন্দরী ছিল। তাকে যুবতী অবস্থায় দেখে আমার বুদ্ধি বিকৃত হয়; আমি তাকে শারীরিক ভাবে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেই সে হরিণীর রূপ ধরে আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। আমিও হরিণরূপে তার পিছনে পিছনে দৌড়ই। এ সময় আমার বুদ্ধিবিকৃতি দেখে ধর্মরক্ষার জন্য ভগবান শঙ্কর ব্যাধের রূপ ধরে আমাকে বধ করতে উদ্যত হন। আমি তখন সেই দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হই এবং সাবিত্রীকে সূর্যের হাতে সম্প্রদান করি। আমার সেই পাঁচটি কন্যা নদী-রূপে গঙ্গায় মিলিত হলেও আমার কাছে তারা এসেছিল। যেখানে তারা গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়, সেই জায়গার নামই পঞ্চতীর্থ। সেই পবিত্র সঙ্গমস্থানে মানুষ স্নান বা দান প্রভৃতি যা কিছু করে, সে সবই ফলবান হয়। সেখানে থেকে যদি কোন কাজও কেউ না করে সে-ও মুক্তিলাভ করে। সেখানকার আরেকটি তীর্থের নাম ব্রহ্মতীর্থ; ওই ব্রহ্মতীর্থে স্নান করলে তা স্বর্গ ও মোক্ষ উৎপাদন করে।

—'পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্য নিরূপণ' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ একশো তিন

ব্রহ্মা বললেন—এবার তোমায় শমীতীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে প্রিয়ব্রত নামে এ বিজয়ী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি একবার গোতমী গঙ্গার দক্ষিণতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞে আয়োজন করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর পুরোহিত ছিলেন। যজ্ঞ যখন আরম্ভ হল,

হিরণ্যাক নামে জনৈক দানব তাঁর সেই যজ্ঞক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে ইন্দ্র প্রভৃতি কিছু কিছু দেবতা ভয়ে স্বর্গে পালিয়ে যান। অগ্নি শমীগাছ, বিষ্ণু অশ্বত্থ গাছ, সূর্য অর্কগাছ, শিব বটগাছ এবং চন্দ্র পলাশগাছকে আশ্রয় করেন। অগ্নি গঙ্গাজলে প্রবেশ করেন। অশ্বিনীকুমার যজ্ঞের ঘোড়া এবং যম কাকের রূপ ধারণ করেন। ওই সময় বশিষ্ঠ যষ্টি দিয়ে দৈত্যদের তাড়িয়ে দেন। তখন তাঁরই আদেশে পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ হয়। দৈত্যরা সসৈন্যে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সেই রাজকীয় যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং দেবতা ও ঋষিগণ সন্তুষ্ট হয়ে পুরোহিত বশিষ্ঠ ও রাজা প্রিয়ব্রতকে সেই সব গাছ এবং গঙ্গার কথা বলেন। দানবের ভয়ে ভীত হয়ে অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতিরা যে যে গাছকে আশ্রয় করেন, তাদের প্রত্যেকটির নামে এক একটি তীর্থ গড়ে ওঠে। এদের নাম শমীতীর্থ, বৈষ্ণবতীর্থ, অর্কতীর্থ, শৈবতীর্থ, সৌম্যতীর্থ ও বাসিষ্ঠ তীর্থ। এই তীর্থসমূহে স্নান, দান প্রভৃতি করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়।

—'শমী প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো চার

এবার তোমাকে বিশ্বামিত্র, হরিশ্চন্দ্র, শুনঃশেফ, রোহিত, বারুণ, ব্রাহ্ম, আগ্নেয় ঐন্দ্র, ঐন্দব, ঐশ্বর মৈত্র, বৈষ্ণব, যাম্য, আশ্বিন ও ঔশন প্রভৃতি পবিত্র তীর্থের কথা শোনাব।

ইক্ষ্বাকুবংশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। একবার পর্বত ও নারদমুনি তাঁর বাড়িতে এলেন। রাজা যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে জিগ্যেস করলেন—আপনারা প্রাজ্ঞ; দয়া করে আমার একটা কথার উত্তর দেবেন কি? লোকে তো শুনেছি পুত্রলাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করে, কিন্তু পুত্রলাভ করলে কি লোকে জ্ঞানী কিংবা অজ্ঞানী অথবা উত্তম বা মধ্যম হয়? আপনারা দয়া করে আমার এই সংশয় দূর করুন। নারদ ও পর্বত রাজার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—আপনি যা জিগ্যেস করলেন, তার উত্তর অনেক ভাবে দেওয়া যায়। দেখুন, অপুত্রক ব্যক্তির পারলৌকিক গতি হয় না। পুত্র জন্মগ্রহণ করলে যে পিতা স্নান করেন, তিনিই দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অভিষেক-ফল লাভ করেন। দেবতারা যেমন অমৃতের দ্বারা অমর হয়ে থাকেন, তেমনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের লোকেরা পুত্রের দ্বারাই অমর হয়ে থাকেন। পুত্র, পিতা ও পিতামহদের দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ নামক তিন প্রকার ঋণ থেকে মুক্ত করে। পুত্র স্বর্গ ও মুক্তিলাভের সহায়ক। পুত্রই মানুষের ধর্ম, কাম ও অর্থ। অপুত্রক ব্যক্তি যা দান করে, কিংবা যা হোম করে, তা ব্যর্থ। অপুত্রক ব্যক্তির জন্মই নিরর্থক। রাজা হরিশ্চন্দ্র মুনিদের কাছ থেকে এ কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি তখন তাঁদেরকে পুত্র লাভের উপায় জিগ্যেস করলেন। তাঁরা হরিশ্চন্দ্রকে বললেন—আপনি এক কাজ করুন, গৌতমী গঙ্গায় গিয়ে স্নান করুন। তারপর জলপতি বরুণের স্তব করবেন; তিনিই আপনার অভীষ্ট পূরণ করবেন।

হরিশ্চন্দ্র মুনিদের কথামতো গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে বরুণকে স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করলেন। বরুণ তুষ্ট হয়ে হরিশ্চন্দ্রকে বললেন—শুনুন, ত্রিলোকের অলঙ্কারস্বরূপ একটি পুত্র আপনাকে দান করব। তবে এই পুত্রকে দিয়েই যজ্ঞ করতে হবে, তাহলেই আপনার পুত্র হবে। হরিশ্চন্দ্র বরুণকে যজ্ঞ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর

তিনি বরুণের নামে যজ্ঞীয় অন্ন প্রস্তুত করে পত্নীকে খেতে দিলেন। যথা সময়ে তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তখন বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে ডেকে বললেন—রাজা, আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে তো? হরিশ্চন্দ্র উত্তরে বললেন—দশ দিন পর্যন্ত নবজাতক অপবিত্র থাকে. এ তো আপনি জানেন। দশ দিন পরেই আমি যজ্ঞের আয়োজন করব। সে-কথা শুনে বরুণ চলে গেলেন। দশ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর বরুণ আবার এসে রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন। হরিশ্চন্দ্র তখন বললেন—দাঁত না ওঠা পর্যন্ত কোন পশুরই পশুত্ব আসে না। এই শিশুর দাঁত ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তখন যজ্ঞ করব। তারপর ক্রমে সেই শিশুর দাঁত উঠে গেল। যখন তার বয়স সাত বছর হল, তখন বরুণ আবার এসে রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন। হরিশ্চন্দ্র পুত্র স্নেহে এমনই অন্ধ যে তিনি বরুণকে বললেন—শুনুন, এই বালকের দাঁতগুলো পড়ে গিয়ে আবার যখন দাঁত উঠবে, তখন আপনি আসবেন। কালক্রমে রাজপুত্রের আবার দাঁত উঠল। বরুণ তখন এসে একই কথা বললেন। হরিশ্চন্দ্র তখন বরুণকে বললেন—ক্ষত্রিয় সন্তান যখন ধনুর্বেদে অভিজ্ঞ হয়, তখনই তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। এর অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হোক, তখন যজ্ঞ করব। বরুণ আর কি করেন, ফিরে চললেন তিনি। তারপর সেই রাজপুত্র রোহিত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠল এবং তার ষোলো বছর বয়সের সময় যখন সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হল, তখন বরুণ সেই রোহিতের সামনেই রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো যজ্ঞ করার কথা বললেন। রাজা তখন বরুণ ও ঋত্বিকদের সামনেই রোহিতকে সমস্ত কথা বললেন। সব শুনে রোহিত পিতাকে বলল—দেখুন, পুরোহিত ও ঋত্বিকগণের সঙ্গে পবিত্র হয়ে বিষ্ণুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞ করব বলে অনেক আগেই ঠিক করেছি; আপনি আগে তার অনুমোদন করুন। বরুণ তখন রোহিতের সেই কথা শুনে খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে উদরী রোগ দান করলেন।

এদিকে রোহিত নিরুদ্বেগে দিব্য ধনু গ্রহণ করে বনে গিয়েছিলেন। তিনি ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি বেশ কিছু দিন কাটালেন। সেখানে থাকার সময়েই তিনি পিতার রোগবার্তা শুনলেন এবং সেই রোগ থেকে রাজাকে মুক্ত করার কথা ভাবতে লাগলেন। গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি অনেক ঋষির দেখা পেলেন। এর মধ্যে যাঁর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তাঁর নাম অজীগর্ত। ইনি খুবই দরিদ্র; তিনটি পুত্র এবং স্ত্রীসহ তিনি কষ্টে-সৃষ্টে দিন যাপন করতেন। রোহিত একদিন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সংসার-জীবনের কথা শুনলেন। তিনি অজীগর্তকে জিগ্যেস করলেন—আপনার ইচ্ছা কি বলুন? আপনি কি চান? উত্তরে অজীগর্ত বললেন—আমার কোন সম্পদই নেই, খাদ্য-বস্ত্রেরও অভাব। আমার জীবিকাও কিছুই নেই যাতে কিছু উপার্জন করতে পারি। এমন কোন ক্রেতাও নেই যিনি আমাদের এই পাঁচজনের একজনকেও অন্নের বিনিময়ে কিনে নেন। কি আর করি দুঃখই আমার বিধিলিপি। অজীগর্তের কথা শুনে রোহিত বললেন—আপনি বৃদ্ধ; আপনাকে দিয়ে অথবা আপনার স্ত্রীকে দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি বরং আপনার তিন পুত্রের মধ্যে একটিকে আমাকে দিন। অজীগর্ত তখন বললেন—আমার বড় ছেলে শুনঃপুচ্ছকে আমি বিক্রি করব না এবং ছোট ছেলেকে বিক্রি করতে তার মা রাজী হবে না। আপনি আমার মেজো ছেলে শুনঃশেফকে কিনে নিন, কি মূল্য দেবেন এর জন্য সে-কথা

বলুন। রোহিত বললেন—বরুণের জন্য যজ্ঞের পশু হিসাবে একে দরকার। আপনিই এর উচিত মূল্য বলুন। অজীগর্ত বললেন—যদি এক হাজার গোরু, প্রচুর ধান, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং এক হাজার খণ্ড কাপড় দিতে পারেন তবেই আমার পুত্রকে বিক্রি করব। রোহিত সেই মূল্যেই শুনঃশেফকে কিনে ফেললেন এবং তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। হরিশ্চন্দ্রকে সমস্ত কথা খুলে বলার পর এই পরামর্শ দিলেন যে, তিনি এই ঋষিপুত্রকে দিয়ে যেন যজ্ঞ করেন তাহলে তিনি নীরোগ হতে পারেন।

রোহিতের কথা শুনে রাজা বললেন—দেখ, বেদে বলা আছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন বর্ণের লোকদের রাজা প্রতিপালন করবেন। তার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণগণ সমস্ত বর্ণের গুরু। ভগবান বিষ্ণুও যাঁদের পূজা করে থাকেন, তাঁরা যে আমারও পূজনীয় সে কথা বলাই বাহুল্য। যাঁদের অবজ্ঞা করলে রাজাদের বংশ ধ্বংস হয়, সেই ব্রাহ্মণদের পশু করে কি করে আমি যজ্ঞে তাকে উৎসর্গ করব? আমার মৃত্যু যদি হয় সেও ভালো; তবু ব্রাহ্মণপুত্রকে যজ্ঞের পশু করতে পারব না। তুমি একে নিয়ে যাও। পিতা ও পুত্রের মধ্যে যখন এ রকম কথাবার্তা চলছে তখন এক আকাশবাণী শোনা গেল। ওই আকাশবাণী রাজাকে সম্বোধন করে বলল—আপনি ঋত্বিক, পুরোহিত, পুত্র রোহিত এবং এই ব্রাহ্মণ-রূপী যজ্ঞীয় পশুকে নিয়ে গোতমী গঙ্গার তীরে যান। সেখানে যজ্ঞ করুন; এই শুনঃশেফকে যজ্ঞে বধ না করলেও আপনার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সুসম্পূর্ণ হবে। সেই আকাশবাণী শুনে রাজা শীগগির বশিষ্ঠ, বামদেব ও অন্যান্য মুনি-ঋষিদের সঙ্গে গঙ্গা-তীরে এসে নরমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হল; শুনঃশেফকে মন্ত্র উচ্চারণ করে জল দিয়ে প্রোক্ষণ করা হল। বিশ্বামিত্র তখন দেবতা, ঋষি, হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর পুত্র রোহিতকে বিশেষ করে বললেন—আপনারা সবাই এই ঋষিপুত্র শুনঃশেফকে যজ্ঞে উৎসর্গ করার ব্যাপারে অনুমোদন করুন। এই যজ্ঞে যে সব দেবতাদের পৃথক পৃথক ভাবে হবি দান করা হবে, তাঁরাও অনুমোদন করুন। বসা, লোম, ত্বক ও মাংস দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করে এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ শুনঃশেফকে অগ্নিতে হোম করা হবে। ব্রাহ্মণগণ এই কাজে আমাকে অনুমোদন করে গোতমী গঙ্গায় স্নান করুন এবং আলাদা আলাদাভাবে মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করুন। হবির্ভোজী দেবতারা ও মুনিরা এই পশুকে রক্ষা করুন।

তারপর শুনঃশেফ গঙ্গায় স্নান করে সেই হবির্ভোজী দেবতাদের স্তব করলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা বিশ্বামিত্রের সামনেই শুনঃশেফকে বললেন—তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে বধ না করলেও হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে। তখন সকলেরই সম্মতি-ক্রমে সেই শুনঃশেফ মুক্তি পেল। যজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে পর বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে নিজের বড় ছেলে হিসেবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ শুনঃশেফকে মেনে নিতে পারল না; ঋষি তাদেরকে অভিশপ্ত করলেন। যারা শুনঃশেফকে তাদের মধ্যে বড় বলে মেনে নিল, তারা হল বিশ্বামিত্রের প্রিয়পাত্র। এই সমস্ত ঘটনাই গোতমী নদীর দক্ষিণ তীরে ঘটেছিল। সেখানে আরো অনেক তীর্থ আছে। হরিশ্চন্দ্র, বিশ্বামিত্র ও রোহিত প্রভৃতি নামে আট হাজার তীর্থ সেখানে রয়েছে। ওই সব তীর্থে স্নান করলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই তীর্থমাহাত্ম্য পড়ে, পড়ে শোনায় বা শোনে, সে অপুত্রক হলেও পুত্রলাভ করে।

—'সহস্রতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো পাঁচ

এবার তোমাকে বিখ্যাত সোমতীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থ পিতৃগণের প্রীতিবর্ধক পুরাকালে সোম গন্ধর্বদের রাজা হন ; তিনি দেবতাদের মধ্য থেকে পালিয়ে এসে গন্ধর্বদে অধিপতিরূপে সম্মানিত হতে থাকেন। দেবতারা সোমের অভাবে পীড়িত হয়ে আমাে বললেন—পিতামহ, গন্ধর্বেরা আমাদের প্রাণপ্রিয় সোমকে নিয়ে গেছে। তাঁকে না হে তো আমাদের চলবে না। আপনি এর একটা উপায় করে দিন। সোম যেন আমাদে কাছে আবার ফিরে আসতে পারেন সে রকম কোন উপায় আপনি চিন্তা করুন। সরস্বত আমার পাশেই ছিল, সে দেবতাদের বলল—শুনুন, গন্ধর্বগণ স্ত্রীজাতির একান্ অনুরাগী ; তাই বলি, আমাকে আপনারা গন্ধর্বদের কাছে সমর্পণ করুন। তাহলে সোমকে ফিরে পাওয়া যাবে। দেবতারা বাগ্‌দেবী সরস্বতীর কথা শুনে বললেন—তোমাে আমরা দান করতে পারি না ; বরং চন্দ্রকে ছাড়াই আমরা থাকতে পারি, তবু তোমাে ছেড়ে এক মুহূর্তও আমরা থাকতে পারব না। সরস্বতী সে কথা শুনে বললেন—শুনু কোন চিন্তা নেই। আমি আবার আপনাদের মাঝখানে ফিরে আসব। আপনারা বর এক কাজ করুন ; গোতমীর দক্ষিণ তীরে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করুন। সেই যে দেবতা এবং গন্ধর্ব প্রভৃতিরা সবাই আসবেন, তখন আপনারা আমাকে সোমের বিনিমে গন্ধর্বদের পণরূপে দিয়ে দেবেন।

তারপর সরস্বতীর কথা মতো যজ্ঞের আয়োজন করা হল। সেই যজ্ঞে দেবতা ঋষি গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সিদ্ধ ও সর্পগণ প্রভৃতি অনেকেই এসে হাজির হল। যজ্ঞ চলা কালীন ইন্দ্র দেবতাদের বললেন—তোমরা গন্ধর্বদের কাছে সরস্বতী ও সোমের পণপ্রস্তা উত্থাপন কর। ইন্দ্রের কথায় গন্ধর্বগণ সরস্বতীকে নিয়ে সোমকে দেবতাদের হাতে তুলে দিল। তখন থেকেই চন্দ্র দেবতাদের এবং সরস্বতী গন্ধর্বদের আপনার হয়ে রইলেন সরস্বতী গন্ধর্বদের কাছে ছিলেন বটে কিন্তু প্রায়ই দেবতাদের কাছে গোপনে চলে আসতেন। তারপর ক্রমে সরস্বতী দেবতাদের কাছেই ফিরে এলেন। দেবতাদের সোম সংগ্রহ ব্যাপারে সবাই গোতমী নদীর তীরে এসেছিলেন। তাছাড়া পঁচিশটি নদী সে সময় গঙ্গায় এসে মিলিত হয়। ওই যজ্ঞে যেখানে পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়, সে স্থান পুণ্যাখ্যান তীর্থ নামে অভিহিত। গোতমীর সঙ্গে যে যে নদী এসে মিলেছিল, তাদের নাম অনুসারে সেখানে এক এক তীর্থ বিখ্যাত হয় ; এদের নাম সংক্ষেপে বলছি—সোমতীর্থ, গান্ধর্বতীর্থ, দেবতীর্থ, পর্ণাতীর্থ, শালতীর্থ, শ্রীপর্ণাসঙ্গম, স্বাগতাসঙ্গম, কুসুমাসঙ্গম, পুষ্টিসঙ্গম, শুভকর্ণিকাসঙ্গম, বৈষ্ণবীসঙ্গম, কৃশরাসঙ্গম, বাসবীসঙ্গম, শিল্যা, আর্যা, শিখী, কুসুম্ভিকা, উপারথ্যা, শান্তিজা, দেবজা, অজ, বৃদ্ধসুর ও ভদ্র প্রভৃতি। এই নদীসমূহ গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে কেউ কেউ নদীরূপে, কেউ কেউ সরোবররূপে, কেউ কেউ বা প্রস্রবণরূপে পৃথক পৃথক ভাবে বিখ্যাত হয়। এই সব তীর্থে স্নান, দান, হোম, জপ প্রভৃতি করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুপুরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

—'নদীসঙ্গমবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো ছয়

শোন নারদ. প্রবরাসঙ্গম নামে একটি মহানদী আছে। সেখানে সিদ্ধেশ্বর মহাদেব রয়েছেন। পুরাকালে দেবতা ও দানবগণের মধ্যে একবার ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল। পরে তাদের মধ্যে আবার সু-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন তাঁরা পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্খায় মেরু-পর্বতে মিলিত হয়ে এ রকম চিন্তা করলেন যে, যেহেতু অমৃতের দ্বারাই অমরত্ব ঘটে থাকে তাই আমরা উত্তম অমৃত উৎপাদন করে সকলে মিলে পান করব এবং অমরত্ব অর্জন করব। তাতে আমরা সুখ শান্তি লাভ করতে পারব। যুদ্ধে আর আমরা লিপ্ত হব না ; যুদ্ধই তো সব দুঃখের মূল। হিংসাহীনতা কিংবা ঈর্ষাহীনতার দ্বারাই পৃথিবীতে সমস্ত সুখ লাভ করা যায়।

তারপর তাঁরা সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হলেন। এই মন্থনকার্যে তাঁরা মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড এবং বাসুকি নাগকে দড়িরূপে ঠিক করলেন। মন্থনের ফলে অমৃত উৎপন্ন হল। তখন দেবতা ও দানবেরা পরস্পর মিলে ঠিক করলেন যে, পরে যখন তাঁরা শুভ লগ্নে একসঙ্গে মিলিত হবেন, তখন সমান ভাগে ভাগ করে সেই অমৃত পান করবেন। দৈত্যরা এ কথা বলেই চলে গেল। দৈত্যদের চলে যাওয়ার পর দেবতারা ঠিক করলেন যে, কষ্টার্জিত সেই অমৃত কিছুতেই তাঁদের শত্রু দানবদের দেবেন না। দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাদের এ কথার অনুমোদন করে বললেন—তোমরাই এই অমৃত পান কর। নীতিবিদ্‌গণ বলে থাকেন যে, শত্রুকে বিশ্বাস করতে নেই, শত্রুকে কোন গোপন কথা বলবে না। দানবগণ যদি অমৃত পান করে, তবে তারা অমর হয়ে যাবে, তাদের পরাজিত করা যাবে না। আপনারা এক কাজ করুন। ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানিয়ে জিগ্যেস করুন কোন্ জায়গায় গিয়ে আপনারা সেই অমৃত পান করবেন। কারণ, দানবগণ খুবই হিংস্র এবং চতুর।

তারপর বৃহস্পতির পরামর্শমতো দেবতারা আমার কাছে এসে সমস্ত কথা জানালেন। আমি নিজে কিছু ঠিক করতে না পেরে তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলাম। বিষ্ণুকে এবং ভগবান শঙ্করকে সব কথা জানালাম। তারপর আমি বিষ্ণু, শিব, অন্যান্য দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্নরদের সঙ্গে মেরুকন্দরে গেলাম। তখন ভগবান বিষ্ণুকে রক্ষকরূপে নিযুক্ত করে দেবতারা সেখানেই অমৃত পান করতে উদ্যত হলেন। সূর্য জানতেন দেবতাদের মধ্যে কারা সোমভাগী এবং কারা সোমযোগ্য নন। চন্দ্রই দেবতাদের অমৃত পরিবেশনে নিযুক্ত হলেন। সিংহিকা নামক দৈত্যের পুত্র রাহু ছাড়া আর কোন দৈত্য, দানব বা রাক্ষস এই ঘটনা জানতে পারল না। রাহু ছদ্মবেশে দেবতাদের মধ্যে মিশে গিয়ে অমৃতের পানপাত্র ধারণ করে যেই পান করতে যাবে, অমনি সূর্য তাকে চিনতে পারলেন এবং চন্দ্রকে সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দিলেন। চন্দ্র বিষ্ণুকে সে-কথা জানালেন। বিষ্ণু এ কথা জানতে পেরেই রাহুর মাথা চক্র দিয়ে কেটে ফেললেন। কিন্তু মাথাটি নষ্ট হল না। রাহুর মাথাবিহীন দেহ গোতমী নদীর দক্ষিণতীরে পড়ল এবং সেই দেহ যেহেতু অমৃত স্পর্শ করেছিল, তাই তা অমর হয়ে গেল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। দেহ মাথার অপেক্ষা করে এবং মাথাও দেহের অপেক্ষা করে ; কিন্তু এক্ষেত্রে সেই দৈত্যের মাথা ও দেহ পরস্পরের সাহায্যের অপেক্ষা না করেও অমর হল। দেবতারা এতে ভীত হয়ে পড়লেন। দেবতারা তখন ভগবান শঙ্করের কাছে গিয়ে তাঁকে জানালেন—এই দৈত্যের

দেহ আপনিই সংহার করুন। যাতে করে এর দেহ এবং মাথা মিলিত হতে না পারে, তার একটা উপায় আপনি করে দিন।

দেবতাদের প্রার্থনায় শঙ্কর তখন মাতৃগণের সঙ্গে জগন্মাতা লোকপালিনী ঐশীশক্তিকে সেই দৈত্যের দেহকে বিনাশ করবার জন্য পাঠালেন। দেবতারা সেই দৈত্যের মাথাটাকেই শান্ত করতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এদিকে মহাদেব-প্রেরিত সেই ঐশী শক্তির সঙ্গে রাহুর দেহের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হল। রাহু তখন দেবতাদের বলল—আমার গায়ে যে উৎকৃষ্ট রস আছে, তা তোমরা টেনে বের করে নাও, তাহলেই আমার দেহ মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। দেবতারা রাহুর এই কথা শুনে তার উপর সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে গ্রহদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে অভিষিক্ত করলেন। রাহু গ্রহপদ লাভ করে আনন্দিত হল। তারপর রাহুর কথামতো সেই দেহের কিছু রস টেনে নিয়ে পান করলেন সেই ঐশী শক্তি। ওই দেবী অম্বিকাই কালরাত্রি ভদ্রকালী ও মহাবলা প্রভৃতি নামে পরিচিত। রাহুর দেহ থেকে নিঃসৃত সেই রস থেকে প্রবরা নামক একটি নদীর উৎপত্তি হল। সেই নদীর তীরে তীরে অসংখ্য তীর্থ গড়ে উঠল। তার তীরে স্বয়ং শিব বাস করতে লাগলেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে সেই নদীকে আলাদা আলাদা ভাবে বর দান করলেন। তাঁরা বললেন—তুমি পৃথিবীতে লোকের প্রদত্ত পুজো পাবে। জগতের মঙ্গলের জন্য তুমি এখানে বাস কর। যেহেতু এখানে শিব ও শক্তির বাসস্থান নির্দিষ্ট হল, সেজন্য মুনিরা এই স্থানকে নিবাসপুর নামে অভিহিত করবেন। গঙ্গার সঙ্গে তুমি যেখানে মিলিত হয়েছ, সেই স্থান অতি পবিত্র। সেখানে যারা স্নান, দান প্রভৃতি করবে, তাদের সব কামনাই পূরণ হবে।

তারপর থেকেই এই তীর্থ প্রবরাসঙ্গম নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। মহাদেব যে শক্তি প্রেরণ করেছিলেন, তা এভাবে প্রবরা নামক নদীরূপে বিখ্যাত হয়।

—'অমৃতাসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো সাত

এবার তোমায় বৃদ্ধাসঙ্গমতীর্থের কথা শোনাব। সেখানে বৃদ্ধেশ্বর শিব বিরাজ করেন। পুরাকালে বৃদ্ধগৌতম নামে এক মুনি ছিলেন ; ইনি মহর্ষি গৌতমের অন্যতম পুত্র। বৃদ্ধ গৌতমের ছোটবেলা থেকেই নাক ছিল না ; তিনি বিকৃত রূপ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম কোন রকমে তাঁর উপনয়ন কার্য সম্পন্ন করেন। বিকৃত রূপ নিয়ে জন্মেছিলেন বলে গুরুর কাছে গিয়ে শিষ্যদের সঙ্গে বেদ-অধ্যয়ন করতে তাঁর লজ্জা বোধ হল। তিনি তখন বিভিন্ন দেশ পর্যটন করতে বেরিয়ে পড়লেন। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। তিনি শাস্ত্রশিক্ষা করেন নি বটে, তবে তিনি প্রতিদিনই গায়ত্রী জপ এবং অগ্নি উপাসনা করতেন। তিনি বিভিন্ন দেশ পর্যটন করতে করতে অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি বিকৃত রূপ নিয়ে জন্মেছিলেন, তাই তাঁর স্ত্রীলাভ ঘটল না। দেশ ভ্রমণ করতে করতে তিনি শীতগিরিতে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি সেখানে একটি সুন্দর গুহা দেখতে পেলেন এবং তার মধ্যে বাস করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি সেই গুহার মধ্যে ঢুকেই একটি রমণীকে দেখতে পেলেন। দেখলেন যে, ওই নারী বৃদ্ধা, তাঁর স্বাস্থ্য ক্ষীণ অথচ তিনি তপস্যা করছিলেন। গৌতম ওই ব্রহ্মচারিণীকে দেখেই তাঁকে অভিবাদন করতে উদ্যত হলে ওই তপস্বিনী বৃদ্ধগৌতমকে বললেন—আপনি আমায়

নমস্কার করবেন না ; কারণ, আপনি আমার গুরু। গুরু যাকে নমস্কার করেন, তার আয়ু, বিদ্যা, সম্পদ, কীর্তি সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। বৃদ্ধগৌতম এ কথা শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে ওই বৃদ্ধাকে বললেন—দেখুন, আপনি তপস্বিনী, তার উপর আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। তাছাড়া আমার কোন বিদ্যাই নেই, কি করে আমি আপনার গুরু হলাম। আপনার কথা হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে।

বৃদ্ধগৌতমের কথা শুনে ওই তপস্বিনী বৃদ্ধা বললেন—শুনুন আপনাকে সব কথা খুলে না বললে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। রাজা আর্ষ্টিষেণের পুত্র ছিলেন ঋতধ্বজ। তিনি বলবান এবং গুণবানও ছিলেন। একবার তিনি মৃগয়ার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে এই গুহার মধ্যেই বিশ্রাম করেন। এই গুহার মধ্যে বিশ্রাম করার সময় তিনি গন্ধর্ব-রাজকন্যা সুশ্যামা নামক অপ্সরাকে দেখতে পান। সুশ্যামার রূপে আকৃষ্ট হয়ে রাজা ঋতধ্বজ তার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হন ; অবশ্য সুশ্যামাও রাজাকে আকাঙ্খা করেছিল। তারপর রাজা তাঁর রাজ্যে ফিরে যান। কালক্রমে সেই সুশ্যামার গর্ভে আমার জন্ম হয়। আমাকে এখানে রেখে যাওয়ার সময় মা বলে যান যে এই গুহার মধ্যে যে পুরুষ প্রবেশ করবে সেই আমার পতি হবে। তারপর থেকে একলাই আমি এখানে আছি। আপনিই প্রথম এই গুহায় এলেন, সুতরাং আপনাকেই আমি পতিরূপে বরণ করলাম। আমার বাবা আশী হাজার বছর রাজত্ব করার পর এখানেই তপস্যা করে মৃত্যু-বরণ করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর আমার এক ভাই দশহাজার বছর রাজত্ব করেন ; তারপর তাঁরও মৃত্যু হয়। পিতার রাজত্বকাল থেকেই আমি এখানে রয়েছি। আজও আমার বিয়ে হয় নি। আপনাকে পতিরূপে বরণ করছি, আপনি আমায় গ্রহণ করুন।

বৃদ্ধা তপস্বিনীর কথা শুনে বৃদ্ধগৌতম বললেন—দেখ, আমার বয়স মাত্র এক হাজার বছর। তুমি আমার চেয়ে অনেক বড় ; বলতে গেলে আমি বালক আর তুমি বৃদ্ধা। আমাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ কি ভাবে হওয়া সম্ভব ? এ অসঙ্গত প্রস্তাবে আমি সম্মত নই। বৃদ্ধা তপস্বিনী বললেন—আপনিই আমার ঈশ্বর-প্রেরিত পতি। আপনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন, তবে আপনার সামনে এক্ষুনি আমি জীবন বিসর্জন দেব। বস্তুত প্রত্যাশিত বস্তুর অপ্রাপ্তি থেকে মৃত্যুই মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক। আরো জানবেন যে অনুরক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা পাপ। তখন বৃদ্ধগৌতম বললেন—দেখ, আমার বিদ্যা নেই, তপস্যা নেই, আমি অতি অকিঞ্চন। তাছাড়া আমি কুরূপ ; আমি তোমার যোগ্য বর হতে পারি না। তবে এটুকু তোমায় বলতে পারি যে, যদি কখনো সুরূপ ও সুবিদ্যা লাভ করতে পারি, তবে তোমার কথা ভেবে দেখব। বৃদ্ধগৌতমের কথা শুনে বৃদ্ধা তপস্বিনী বললেন—দেখুন, আমি তপস্যার দ্বারা বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে সন্তুষ্ট করেছি ; অগ্নি এবং বরুণও আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট। সুতরাং বাগ্‌দেবী আপনাকে বিদ্যা দান করবেন এবং রূপবান অগ্নি দেবেন রূপ। তারপর অগ্নি ও সরস্বতীর কৃপায় বৃদ্ধগৌতম রূপবান এবং বিদ্বান হয়ে উঠলেন। তখন সেই বৃদ্ধার সঙ্গে গৌতমের বিয়ে হল। সেই বৃদ্ধ দম্পতি অনেক দিন ধরে সেই গুহায় সুখে কাল কাটালেন। একবার সেই বৃদ্ধ দম্পতি গিরিগুহায় বসে আছেন, এমন সময় বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিরা তীর্থ পরিভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে হাজির হলেন। তাঁরা সেই মহর্ষিদের যথাযোগ্য সমাদর জানালেন। মহর্ষিদের মধ্যে যাঁদের বয়স কম, তাঁরা কেউ কেউ সেই বৃদ্ধা এবং রূপবান বৃদ্ধগৌতমকে দেখে হাসতে লাগলেন। অন্যান্য

ঋষিরা তখন বৃদ্ধা তপস্বিনীকে জিগ্যেস করলেন—এই রূপবান যুবক তোমার কে হন, ইনি কি তোমার পুত্র অথবা পৌত্র ? এঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি, তা না জেনেই এই কমবয়সী ঋষিরা হেসেছেন। দেখ, বৃদ্ধজনের পক্ষে যুবতী বিষের মতো ; পরন্তু বৃদ্ধা স্ত্রীর পক্ষে যুবক পুরুষ অমৃতস্বরূপ। আজ বহু দিন পর আমরা ইষ্ট এবং অনিষ্টের সম্যক যোগ দেখলাম।

তারপর আতিথ্য লাভ করে মহর্ষিরা সেখান থেকে চলে গেলেন। ঋষিদের কথা শুনে সেই বৃদ্ধ দম্পতি দুঃখিত এবং লজ্জিত হলেন। তখন বৃদ্ধগৌতম মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে জিগ্যেস করলেন—দয়া করে আমাকে একটা কথার উত্তর দিন। এমন কোন দেশ বা তীর্থ আছে কি যেখানে গেলে শ্রেয় লাভ করা যায় এবং মুক্তি লাভ হয় ? বৃদ্ধগৌতমের প্রশ্নের উত্তরে অগস্ত্য বললেন—পূর্বে আমি মুনিদের মুখে এ কথা শুনেছি যে, গৌতমীতীরে গেলে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। তাই বলি, আপনি গৌতমী গঙ্গায় যান। অগস্ত্যের কথামতো বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধগৌতম গৌতমী গঙ্গার তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি পত্নীর সঙ্গে কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণু ও শিবের স্তব করলেন। প্রথমে শিবের স্তব করলেন—এই পৃথিবীতে যাদের আত্মা খিন্ন হয়েছে, মরুভূমির মধ্যে গমনকারী মানুষের পক্ষে গাছের মতো তুমিই তাদের একমাত্র আশ্রয়। তারপর বিষ্ণুর স্তব করলেন—বৃষ্টির জলধারা যেমন অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাওয়া শস্যের তাপ হরণ করে প্রাণ সঞ্চার করে, তুমিও তেমনি তাপিত জনগণের আর্তি দূর কর। তারপর গৌতমীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তুমি নিখিল বিশ্বের সন্তপ্ত মানুষকে আশ্রয় দান কর। আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও।

বৃদ্ধগৌতমের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে গৌতমী বৃদ্ধগৌতমকে বললেন—তুমি কলসীতে আমার মন্ত্রপূত জল নিয়ে নানা উপচার সহ তোমার স্ত্রীকে অভিষেক কর। তাতেই তোমার স্ত্রী সুরূপা হয়ে উঠবে। তোমার ওই রূপবতী স্ত্রী তোমাকে সেই জলে অভিষেক করলে তোমার রূপও কমনীয় হয়ে উঠবে। গৌতমীর কথামতো সেই দম্পতি নির্দিষ্ট কাজ করলে পর দুজনেই অভীষ্ট ফল লাভ করল। সেই অভিষেকের জল থেকে একটি নদীর সৃষ্টি হল এবং অন্যান্য ঋষিগণ মহর্ষি গৌতমের সেই পুত্রকে বৃদ্ধগৌতম নামে অভিহিত করলেন। তখন সেই বৃদ্ধা গৌতমীকে বললেন—আমার একটা প্রার্থনা আছে, অভিষেকের জল থেকে এই যে নদী উৎপন্ন হল, তা আমার নাম অনুসারে বৃদ্ধা নামে অভিহিত হোক এবং তোমার সঙ্গে যেখানে এর মিলন ঘটেছে, সেই স্থান শ্রেষ্ঠ তীর্থ রূপে পরিচিত হোক। এই সঙ্গমে স্নান, দান প্রভৃতি করলে মানুষ যেন সমস্ত কিছুই লাভ করে। গৌতমী বৃদ্ধার কথাকে অনুমোদন করলেন। বৃদ্ধগৌতম সেখানে মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করেন। তাঁরই নাম অনুসারে সেই শিব বৃদ্ধেশ্বর নামে পরিচিত হন। তখন থেকেই এই তীর্থ 'বৃদ্ধাসঙ্গম' নামে পরিচিত।

—'বৃদ্ধাসঙ্গমতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো আট

ব্রহ্মা বললেন এবার তোমাকে ইলাতীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থের মাহাত্ম্য-কথা শুনলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। পুরাকালে বৈবস্বত বংশে ইল নামে

এক রাজা ছিলেন। তিনি মৃগয়া করতে ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনি একবার সৈন্য নিয়ে মৃগয়া করার জন্য বনে গেলেন। মৃগয়া করতে করতে তিনি তার প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়লেন যে, সৈন্য-সামন্তদের রাজধানীতে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। তিনি কেবল গোটাকয়েক ঘোড়া, হাতী এবং একান্ত অনুচর কয়েকজনকে নিয়ে হিমালয়ে বাস করতে লাগলেন। একদিন তাঁর বাসস্থানের খুব কাছেই তিনি একটি সুন্দর গিরি-কন্দর আবিষ্কার করলেন। ওই গুহায় সমন্যু নামে এক যক্ষ বাস করত। তার স্ত্রীর নাম সমা। সমা খুবই পতিব্রতা। সমন্যু কখনো মৃগরূপে ধারণ করে স্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াত আবার কখনো নাচ-গানে মেতে থাকত। যক্ষ কিন্তু সমস্ত বিষয়ে ছিল অভিজ্ঞ। রাজা ইল সেই সুন্দর গুহায় তাঁর অনুচরগণ সহ বাস করতে লাগলেন ; সে সময় সমন্যু মৃগরূপ ধারণ করে পরিভ্রমণ করছিল। রাজা যখন সেই গুহায় বাস করতে এলেন তখন তিনি জানতেন না যে সেখানে যক্ষ বাস করে। সমন্যু এসে যখন এ সব দেখল, তখন রাজার এই অসঙ্গত ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে লাগল। অনেক চিন্তা করে সমন্যু তার আত্মীয় বীর যক্ষদের অনুরোধ জানাল যাতে তারা গৃহ ফিরে পেতে তাকে সাহায্য করে। যক্ষরা তখন রাজা ইলের কাছে গিয়ে তাঁকে সেই গুহাগৃহ ছেড়ে দিতে বলল ; রাজা রাজী না হওয়ায় যক্ষদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বেধে যায় এবং তাতে যক্ষেরা পরাজিত হয়। সমন্যুকে অগত্যা গৃহহীন হয়েই বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়। সে তখন চিন্তা করে একটা উপায় বের করল। তার স্ত্রী সমাকে সে বলল--দেখ, সমস্ত রাজার রাজ্যই পাপ ও ব্যসনের অতিরিক্ততায় নষ্ট হয়। তুমি এক কাজ কর। সুন্দর হরিণীর রূপ ধারণ করে তুমি এই রাজাকে উমাবনে নিয়ে যাও। রাজা সেখানে প্রবেশ করলেই স্ত্রীলোক হয়ে যাবেন। তারপর তুমি আবার তোমার আসল স্বরূপে প্রকাশিত হতে পারবে। তখন আর আমাদের কোন চিন্তা থাকবে না। এ কাজ একমাত্র তুমিই করতে পারো। সমা তখন যক্ষকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, আমি না হয় তোমার কথামতো কাজ করব। কিন্তু তুমি কেন সেখানে যাবে না শুনি ? তোমার বাধা কোথায় ?

যক্ষ তখন তার স্ত্রীকে বলল—কেন আমি উমাবনে যাব না, সে কথা শোন। একবার উমার সঙ্গে ভগবান শঙ্কর হিমালয়ে বিচরণ করছেন ; সঙ্গে রয়েছেন অন্যান্য দেবতারা। তখন উমা শঙ্করকে একান্তে বললেন--দেখ, রতি-ব্যাপার গোপনে করতে হয়, স্ত্রীজাতির স্বভাবই এই। তাই বলছিলাম, সুরক্ষিত একটি প্রদেশ তুমি আমায় দান কর। ওই স্থান 'উমাবন' নামে পরিচিত হবে। তুমি, গণেশ, কার্তিকেয় এবং নন্দী ছাড়া আর যে পুরুষ সেখানে প্রবেশ করবে, সে-ই স্ত্রীলোক হয়ে যাবে। শঙ্কর প্রিয়ার কথা অনুমোদন করেন। সুতরাং বুঝতেই পারছ কেন আমি উমাবনে যেতে চাইছি না।

সমা তখন হরিণীর রূপ ধারণ করে রাজা ইলের কাছাকাছি ঘুরতে লাগল ; যক্ষ ছিল অদূরেই। রাজা ছিলেন মৃগয়ায় অত্যন্ত আসক্ত। তিনি হরিণীটিকে দেখেই ঘোড়ায় চড়ে তার পিছু নিলেন। এদিকে হরিণী ছুটতে ছুটতে রাজাকে উমাবনের কাছে নিয়ে এলো। সে যখন বুঝল যে রাজা উমাবনে ঢুকে পড়েছেন ; তখন তার আসল রূপে সে প্রকাশিত হল। সে দিব্যরূপ ধারণ করে একটি অশোকগাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিশ্রান্ত রাজাকে দেখে হাসতে লাগল এবং রাজাকে বলল—তুমি অবলা হয়ে একাকী ঘোড়ায় চড়ে কোথায় চলেছ ? ইলা, তোমার গায়ে পুরুষের পোশাক কেন ? রাজা ওই অপরিচিতার মুখে 'ইলা' এ রকম সম্বোধন শুনে খুব রেগে এগোলেন বং তাকে হরিণীটির কথা জিগ্যেস

করলেন। সমা কোন কথা না বলে যখন হাসতে লাগল, তখন রাজা তাকে ধনুক দেখালেন। তখন সমা আবার বলল—তুমি নিজেকে আগে ভালো করে দেখ, পরে আমাকে যা শাস্তি দেবার দেবে। রাজা তখন আপন অঙ্গে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন যে, তাঁর বুকে দুটি স্তন উঠেছে। তিনি তখন বিস্মিত হয়ে সমাকে বললেন—আমি বুঝতে পারছি না আমার এ কি হল ! তুমি নিশ্চয়ই সব কথা জানো। আমাকে তোমার পরিচয় দাও এবং সমস্ত কথা খুলে বল। সমা তখন ইলকে বলল—হিমালয়ের রম্য গিরিকন্দরে আমার স্বামী যক্ষরাজ সমন্যু বাস করেন ; যেখানে আপনি অনেক দিন ধরে বাস করছিলেন এবং মোহবশে অনেক যক্ষকে হত্যা করেছিলেন। আপনাকে আমাদের ওই কন্দর থেকে তাড়াতে না পেরে আমি হরিণীরূপ ধারণ করে আপনাকে এখানে নিয়ে আসি। এই উমাবন সম্পর্কে মহাদেবের এ রকম নির্দেশ আছে যে, এখানে যে মন্দ পুরুষ প্রবেশ করবে, সে ই স্ত্রীলোক হয়ে যাবে। আপনি দুঃখ করবেন না, কারণ, বিচিত্র ভবিতব্যতার কথা কেউই জানে না। বরং আপনি এক কাজ করুন, আপনার পক্ষে আর পুরুষত্বলাভ যখন সম্ভব নয়, তখন স্ত্রীলোকের যে সব বিদ্যা করায়ত্ত করতে হয়, যেমন নাচ, গান এবং স্ত্রীসুলভ ছলাকলা প্রভৃতি—সে সব আয়ত্ত করুন। যক্ষপত্নীর কাছে সব কথা শুনে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি যক্ষপত্নীকে অনুরোধ করলেন তার পুরুষত্ব প্রাপ্তির উপায় কি তা জানাতে। সমা রাজাকে তখন বলল—শুনুন, এখান থেকে পূর্বদিকে এগুলে সোমের পুত্র বুধের আশ্রম দেখতে পাবেন। বুধ প্রতিদিনই তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এই পথেই যান। তিনি যখন এই পথ দিয়ে যাবেন তখন তাঁর মন-মেজাজ বুঝে তাঁকে আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাবেন, তাতেই আপনার অভীষ্ট পূরণ হবে।

তারপর যক্ষপত্নী তার স্বামীর কাছে চলে গেল। ইলাও নাচগান প্রভৃতি শিখে তার চর্চায় দিন কাটাতে লাগল। একদিন ইলা নাচগানে মত্ত হয়ে রয়েছে এমন সময় বুধ তাকে দূর থেকে দেখতে পেলেন। তিনি ইলার কাছে এসে সরাসরি তাকে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। ইলা বুধের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁর আশ্রমে চলে গেল। অনেক দিন ধরে বুধ ও ইলা সুখে বাস করলেন। একদিন বুধ ইলাকে জিগ্যেস করলেন—প্রিয়তমা, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট ; কি তোমার প্রার্থনা আমাকে জানাও, আমি তোমায় তা দেওয়ার চেষ্টা করব। সুযোগ পেয়ে ইলা বুধের কাছে একটি পুত্র সন্তান চাইলেন। বুধ প্রীত হয়ে বললেন—শোন ইলা, তোমার একটি সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মাবে। এই পুত্র সোমের বংশধর হবে—তেজে সে সূর্যের মতো, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির মতো, ক্ষমাগুণে পৃথিবীর মতো, বীর্যে বিষ্ণুর মতো এবং ক্রোধে অগ্নির মতো।

কালক্রমে ইলার একটি পুত্র জন্মাল। তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সুরসদনে জয়ধ্বনি উত্থিত হল। সমস্ত দেবতারা বুধের আশ্রমে এলেন। আমিও সেখানে এলাম। বুধের ওই পুত্র জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই জোরে শব্দ করতে লাগল। তখন সেখানে আগত দেবতা ও ঋষিরা বললেন—যেহেতু এই পুত্র পুরু অর্থাৎ বিপুল রব করছে, এজন্য একে আমরা পুরূরবা নামে অভিহিত করলাম। স্বয়ং বুধ তাকে ক্ষত্রিয় বিদ্যা পড়ালেন এবং সমস্ত শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে পুরূরবা সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে লাগলেন। এক সময় তিনি মাকে দুঃখিত দেখে তাঁর মনোকষ্টের কথা জানতে চাইলেন। সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি মায়ের দুঃখ দূর করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইলা প্রথমে ইতস্তত করলেও পুরূরবার কাছে সমস্ত ঘটনাই আগাগোড়া বললেন। সমস্ত কথা শুনে পুরূরবা

মাকে জিগ্যেস করলেন—আপনি কি এই বর্তমান অবস্থাতে সত্যিই সন্তুষ্ট নন? যদি না হয়ে থাকেন, তবে বলুন আপনি কি চান? আমি আপনাকে সন্তুষ্ট এবং সুখী করার জন্য সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। ইলা তখন পুরূরবাকে বললেন—আমি আবার আমার আগেকার অবস্থা, বিপুল রাজ্য এবং পূর্বপুত্রগণের বিশেষ করে তোমার রাজ্যাভিষেক কামনা করি। পুরূরবা তখন মাকে জিগ্যেস করলেন—আপনি কিভাবে আবার পুরুষ হয়ে উঠবেন, সে উপায়ের কথা বলুন। ইলা তখন পুরূরবাকে তার পিতা বুধের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে বললেন। পুরূরবা পিতাকে সব কথা জানালে তিনি বললেন দেখ, সব কথাই আমি জানি। একমাত্র হর-গৌরীকে আরাধনায় তুষ্ট করেই তোমার মায়ের শাপমুক্তি হতে পারে। তুমি গৌতমী গঙ্গার তীরে যাও, সেখানে গিয়ে হর-গৌরীর আরাধনা কর।

পুরূরবা তখন পিতার কথা মতো গৌতমী গঙ্গার তীরে গিয়ে তপস্যায় নিরত হলেন। তাঁর পিছন পিছন ইলা এবং বুধও সেখানে গেলেন। তাঁরা তিনজন মিলে শঙ্কর ও গৌরীর স্তব করলেন। স্বয়ং কার্তিকেয় ও গণেশ যাঁর স্তব করেন, সেই জগৎশরণ্য হর-গৌরী আমার শরণ হোন। ইলা বললেন—মানুষ সংসারে তাপে তাপিত হয়ে যাঁদের চিন্তা করে এবং তার ফলে পরম নিবৃতি লাভ করে, সেই হর-গৌরী আমাদের রক্ষা করুন। পুরূরবা বললেন যাঁদের প্রভাবে এই বিশ্ব-সংসার আবির্ভূত হয় এবং শেষে লয় পায় সেই শিব ও উমাকে আমি প্রণাম করি; তাঁরা আমায় রক্ষা করুন। তাঁদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে গৌরী পুরূরবাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তখন পুরূরবা গৌরীকে বললেন—দেখুন, না জেনে রাজা ইল আপনার নামিত বনে ঢুকে পড়েছিলেন, এঁকে আপনি পুনরায় পুরুষত্ব দান করুন। হর-গৌরী উভয়েই পুরূরবার প্রার্থনা পূরণ করলেন। গৌতমী গঙ্গায় স্নান করার পরই ইলার অঙ্গ থেকে জলের প্রবাহ বিনিঃসৃত হল। তিনি আগে নাচ-গান প্রভৃতি যা কিছু শিখেছিলেন সে সবই ওই নদীর জলে মিশে গেল। তখন ওই জল থেকে নৃত্যা, গীতা ও সৌভাগ্যা নামে তিনটি নদীর উৎপত্তি হল। সেই নদী তিনটি গৌতমী গঙ্গায় মিশে গেল। ওই তিনটি নদীর মিলন স্থানে তিনটি পবিত্র তীর্থ গড়ে উঠল। ইলা স্নান করার পরই পুনরায় পুরুষ ইলরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। তারপর তিনি একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। তিনি দণ্ডকারণ্যে চতুরঙ্গবলযুক্ত এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের রাজধানী ইল নামে বিখ্যাত হয়। সূর্যবংশের নিয়ম অনুযায়ী তিনি তাঁর পূর্বের পুত্রদের রাজ্যাভিষেক করে পরে পুরূরবাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই সব ব্যাপার যেখানে ঘটে সেই গৌতমী গঙ্গার উভয় তীরে অনেক তীর্থ রয়েছে। সেখানে ইলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ রয়েছে। ওই শিবকে পুজো করলে সমস্ত অভীষ্ট ফলই পাওয়া যায়।

—'পুরূরবা-সংবাদ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো নয়

এবার তোমাকে বিখ্যাত চক্রতীর্থের কথা শোনাব। এইখানেই ভগবান বিষ্ণু তাঁর চক্রলাভ করেছিলেন; সেজন্যই এই তীর্থের নাম চক্রতীর্থ।

পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। দেবতা, ঋষি, দৈত্য, যক্ষ

প্রভৃতি সবাই সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন এবং সেখানে হাজির হন। কিন্তু দক্ষ মহাদেবকে দোষী স্থির করে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ জানান নি। শিবজায়া সতী অহল্যার মুখে এ কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং পিতার এই অমার্জিত আচরণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রাণত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নেন। শিব সম্পর্কে দক্ষের নিন্দাবাক্য সতীকে আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে। সতী পিতার যজ্ঞস্থানে গিয়ে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। এদিকে নারদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে শিব জয়া ও বিজয়াকে সতীর মৃত্যু ব্যাপারে সঠিক সংবাদ এনে দিতে বলেন। তারা যখন শিবকে সতীর মৃত্যুসংবাদ জানাল, তখন শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। সেই যজ্ঞ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। স্বয়ং ইন্দ্র, পূষা এবং বিষ্ণু ওই যজ্ঞ রক্ষা করছিলেন। শিবের অনুচরদের মধ্যে ভদ্রকালী এবং বীরভদ্রই ছিল ভয়ংকর। শিবের আদেশে তারা যজ্ঞ ধ্বংস করতে আরম্ভ করল। যজ্ঞে সমবেত দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি সবাই পালাতে লাগল। যজ্ঞকে বিনষ্ট হতে দেখে পূষা ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। বীরভদ্র পূষার দাঁত উপড়ে নিল, সূর্যকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিরুপায় হয়ে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে মারবার জন্য নিজের চক্রটিকে পাঠালেন, কিন্তু শিব ওই চক্রকে গ্রাস করে ফেললেন। বিষ্ণুচক্রকে পরাস্ত দেখে লোকপালগণ ভয়ে সেখান থেকে পালাল। উপায়ান্তর না দেখে দক্ষ শংকরকে স্তুতি করতে প্রবৃত্ত হলেন। দক্ষের স্তবে শিব তুষ্ট হলেন; তিনি দক্ষকে বর গ্রহণ করতে বললেন। দক্ষ জানালেন যে তাঁর যজ্ঞ যেন অপূর্ণ না থাকে। শিবের বরে দক্ষের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হল।

একবার দেবতা ও দানবদের মধ্যে বড় রকমের একটি যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হন। অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা ভগবান বিষ্ণুর কাছে এসে তাঁকে স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। বিষ্ণু তাঁদের প্রতি তুষ্ট হয়ে জিগ্যেস করেন—তোমাদের কোন্ কাজ আমাকে করতে হবে বল। দেবতারা তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। বিষ্ণু তখন তাঁদের বললেন—দেখ, এমন সময়ে তোমরা দৈত্যদের কাছে পরাজিত হলে যখন আমার চক্র মহাদেব গ্রাস করে বসে আছেন। ঠিক আছে, তোমরা যাও। যেভাবেই হোক তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা আমি করব। দেবতাদের এ কথা বলার পর বিষ্ণু গোদাবরী তীরে গিয়ে শংকরের পূজা করতে লাগলেন। তিনি ভক্তিভরে এক হাজার সোনার পদ্ম দিয়ে শিবের পূজা করছিলেন। তার মধ্যে একটি পদ্ম পাওয়া গেল না। পূজার অঙ্গহানি হয় দেখে অনন্যোপায় হয়ে ভগবান কমললোচন নিজেরই একটি চোখ তুলে নিয়ে শিবের পূজা সমাপন করলেন। তিনি বললেন—তুমি মনুষ্যসমূহের হৃদগত ভাব জানো এবং তুমিই তাদের ত্রাণকর্তা। বিষ্ণু এভাবে শিবের পূজা করছেন এমন সময় ভগবান শংকর গৌরীকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি গাঢ় আলিঙ্গনে বিষ্ণুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—আগের মতোই তুমি তোমার চক্ষু লাভ কর; তোমার চক্রও তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। হরি ও হরের মিলন এভাবেই সংঘটিত হল।

তারপর থেকেই ওই তীর্থ 'চক্রতীর্থ' নামে পরিচিত হয়। যে ব্যক্তি ওই তীর্থে স্নান, দান ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গ লাভ করে।

—'চক্রতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো দশ

চক্রতীর্থের পর এবার তোমাকে পিপ্পল তীর্থের কথা শোনাব। চক্রেশ্বর হরি এই তীর্থে চক্র লাভ করেছিলেন। যেখানে স্বয়ং বিষ্ণু শিবের আরাধনা করেন, সেই স্থান পিপ্পল তীর্থ নামে অভিহিত।

পুরাকালে দধীচি নামে স্বনামধন্য এক ঋষি ছিলেন ; তাঁর স্ত্রীর নাম লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা ছিলেন বিদুষী ও পতিব্রতা। তাঁর একটি বোন ছিল, নাম গভস্তিনী ; বড়বা নামেও ইনি পরিচিত। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে দধীচির আশ্রম ছিল। অগ্নির পরিচর্যায়, দেবতা ও অতিথিদের সেবায় তিনি ছিলেন সদা তৎপর। তাঁর প্রভাবে দৈত্য, দানব প্রভৃতি সেখানে আসতেই পারত না। এছাড়া মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমের কাছেও তারা আসতে পারত না। একবার রুদ্র, সূর্য, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও অগ্নি প্রমুখ দেবতারা যুদ্ধে দৈত্যদের পরাজিত করে আনন্দিত মনে দধীচির আশ্রমে এসে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলেন। দধীচিও সাধ্যমতো দেবতাদের আপ্যায়িত করে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করায় দেবতারা বললেন—আপনার আশীর্বাদে আমরা ভালোই আছি। সংগ্রামে দৈত্যদের পরাজিত করেছি আমরা। কিন্তু আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি। যুদ্ধ যেহেতু শেষ হয়ে গেছে অস্ত্রের প্রয়োজন তাই আপাতত ফুরিয়েছে। অথচ এত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রাখার কোন উপযুক্ত জায়গা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই আমরা ঠিক করেছি আপনার এই পুণ্যাশ্রমে অস্ত্রশস্ত্র রেখে যাব। তাহলে কেউই এই অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতি করতে পারবে না বা এগুলোকে নিয়ে যেতেও পারবে না ; কারণ, আপনার প্রভাবে এই দেশ সুরক্ষিত। আপনিই এই অস্ত্রসমূহের রক্ষক হোন এবং আমাদের চিন্তামুক্ত করুন। দধীচি দেবতাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁরা আনন্দিত মনে স্বর্গে ফিরে গেলেন। দধীচি সম্মত হলেও লোপামুদ্রা তাঁকে নিষেধ করলেন। তিনি দধীচিকে বললেন—দেখুন, আপনি কিন্তু ধর্মবিরোধী কাজ করতে যাচ্ছেন। যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং সংসার-চেষ্টায় বীতস্পৃহ, তাঁদের পক্ষে পরকীয় দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ কোন কাজেই আসে না। শুনুন, দেবতাদের অস্ত্ররক্ষার ভার নিলে আপনার যে যে দোষ হবে, একে একে তা বলছি—প্রথমত দেবতাদের অস্ত্ররক্ষার ভার নিলে যারা দেবতাদের শত্রু তারা আপনার শত্রু হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত যদি দেবতাদের এই অস্ত্রসমূহের মধ্যে কিছু নষ্ট হয় বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে দেবতারা আপনার উপর ক্রুদ্ধ হবেন। আপনার যদি দ্রব্যদানে শক্তি থাকে, তাহলে আপনি তা দান করবেন ; কিন্তু যদি সে শক্তি না থাকে, তাহলে সাধু ব্যক্তিরা যেমন সর্বোপায়ে পরোপকার করে থাকেন, আপনিও তাই করবেন। দয়া করে পরধন রক্ষার ভার গ্রহণ করবেন না। লোপামুদ্রার কথা শুনে দধীচি বললেন—তুমি যা বলছ, তা ঠিক। আগে আমি সে-কথা ভেবে দেখি নি। কিন্তু একবার যখন তাদের কথা দিয়েছি, তখন তো আর না বলা যায় না।

তারপর দেবতাদের হিসেবে হাজার বছর কেটে গেল ; কিন্তু দেবতারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিতে এলেন না। দধীচি তখন চিন্তিত হয়ে গভস্তিনীকে কর্তব্য বিষয়ে জিগ্যেস করলেন, কিন্তু তিনি কোন উপায় ঠিক করতে পারলেন না। এদিকে অস্ত্রশস্ত্র-গুলো কালবশে ক্ষয় পেতে শুরু করেছে। শেষে অনেক চিন্তা করে দধীচি অস্ত্র রক্ষার এক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন। তিনি মন্ত্রপূত পবিত্র জল দিয়ে সেই অস্ত্রগুলো ধুয়ে

দিলেন ; সেই অস্ত্রসমূহ থেকে যে তেজ নির্গত হল, তা তিনি পান করলেন ; তখন অস্ত্রসমূহ বীর্যহীন হয়ে ক্রমশ নষ্ট হয়ে গেল। ঠিক এ রকম সময়ই দেবতারা এসে দধীচির কাছে অস্ত্র চাইলেন। দেবতাদের কথা শুনে দধীচি বললেন—আপনারা অনেক দিন হল আসেন নি বলে দৈত্যদের ভয়ে সে-সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আমি পান করে ফেলেছি। কি করি এখন বলুন তো ! দেবতারা সে কথা শুনে বিনীত ভাবে মুনিকে বললেন—দেখুন, আমাদের শত্রুরা আবার প্রবল হয়ে উঠেছে। তাদের পরাজিত করবার জন্য আমাদের অস্ত্রের দরকার। আপনি বিচক্ষণ লোক ; এর থেকে আপনাকে বেশী কি আর বলব ? দধীচি তখন খানিকক্ষণ ভেবে দেবতাদের বললেন—তাহলে এক কাজ করুন, আমি যোগবলে দেহত্যাগ করব। আপনারা আমার অস্থি দিয়ে উৎকৃষ্ট অস্ত্র তৈরি করুন। দধীচির এই প্রস্তাবে দেবতারা প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে রাজী হয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দধীচির স্ত্রী লোপামুদ্রা সেখানে ছিলেন না। দেবতারা তাঁকে ভয় করতেন। দেবতারা তাই শীগগির দধীচিকে কার্যসাধনে যত্নবান হতে অনুরোধ করলেন। দধীচি তখন সন্তুষ্ট মনে বদ্ধ পদ্মাসনে বসে, নাকের ডগায় দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়ে গেল। দেবতারা দধীচির প্রাণহীন দেহ দিয়ে বিশ্বকর্মাকে তখন অস্ত্র নির্মাণ করতে বললেন। বিশ্বকর্মা দেবতাদের জানালেন—ব্রাহ্মণের কলেবর বিদারিত করে অস্ত্র নির্মাণ করতে আমি পারব না। তবে তাঁর অস্থি সমূহ পেলে আমি অস্ত্র নির্মাণ করতে পারি। দেবতারা তখন গাভীদের বললেন—শোন, আমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বজ্র নির্মাণ করব ; অতএব তোমরা দধীচির দেহ বিদারিত করে বিশুদ্ধ অস্থিসমূহ এনে দাও। গাভীরা দেবতাদের কথা অনুসারে অস্থি-সমূহ তাদের এনে দিল। বিশ্বকর্মা সেই অস্থি দিয়ে উৎকৃষ্ট অস্ত্র তৈরি করলেন।

এদিকে লোপামুদ্রা উমার পুজো সম্পন্ন করে আশ্রমে এসে দেখেন দধীচি নেই। তিনি তখন অগ্নিকে স্বামীর কথা জিগ্যেস করায় অগ্নি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাই লোপামুদ্রাকে বললেন। সমস্ত কথা শুনে লোপামুদ্রা শোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তখন তিনি ঠিক করলেন যে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। কারণ, স্বামীবিহীন জীবনের কোন মূল্য নেই। তিনি স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—পৃথিবীতে উৎপন্ন বস্তুমাত্রই নশ্বর, সুতরাং শোকের কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই পরিবর্তনশীল বিশ্বসংসারে যাঁরা দেবতা ও ব্রাহ্মণদের মঙ্গলের জন্য দেহত্যাগ করেন, তাঁরাই ধন্য। আমার নিষেধ সত্ত্বেও যখন দেবতাদের অস্ত্ররক্ষার ভার নিয়ে স্বামীর মৃত্যু হল, তখন নিশ্চয়ই বিধাতার ইচ্ছা এ-রকমই। তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। অগ্নিপ্রবেশের পূর্বে তিনি তাঁর গর্ভস্থিত শিশুকে গর্ভাশয় থেকে বের করে গঙ্গা, পৃথিবী এবং আশ্রমের বনস্পতি ওষধিদের আহ্বান করে বললেন—এই পিতা, মাতা, জ্ঞাতি ও বন্ধুহীন বালককে ওষধি ও লোকপালগণ রক্ষা করুন। এ কথা বলেই পতিব্রতা লোপামুদ্রা সেই শিশুকে পিপ্পল বা অশ্বত্থ গাছের কাছে রেখে অগ্নিতে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করলেন। আশ্রমের গাছ এবং বন্য জন্তুরা পর্যন্ত দধীচি ও লোপামুদ্রার জন্য শোক করতে লাগল। তারা পিতামাতা জ্ঞানে দধীচি ও লোপামুদ্রাকে শ্রদ্ধা করত। তাই তাঁদের পুত্রসন্তানকে ভালো ভাবে প্রতিপালন করার ইচ্ছা নিয়ে সোমের কাছে গেল। সোম ওষধি এবং বনস্পতিসমূহের রাজা। সোমকে সমস্ত কথা বলে তারা ওই বালকের জন্য অমৃত চাইল। চন্দ্র তা দিয়েও দিলেন। অমৃত পান করে সেই বালক ধীরে ধীরে

বেড়ে উঠতে লাগল। পিপ্পল গাছেরা সেই বালককে রক্ষা করেছিল বলে তার নাম হল পিপ্পলাদ। পিপ্পলাদ বড় হয়ে একদিন সবিস্ময়ে পিপ্পলদের জিগ্যেস করলেন—মানুষ থেকে মানুষের জন্ম হয়, পাখি জন্ম দেয় পাখির আর বীজ থেকে বৃক্ষসমূহের উৎপত্তি হয়; পৃথিবীতে এর কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কিন্তু আমি মানুষ হয়ে কেমন করে জন্মালাম, তোমরা গাছেরা যদি আমার প্রতিপালক হও? পিপ্পল গাছেরা তখন পিপ্পলাদকে সমস্ত কথা বলল। সমস্ত কথা শুনে পিপ্পলাদ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই ওষধি ও বনস্পতিদের তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা জানালেন। তিনি বললেন—আমার পিতার যারা হত্যাকারী তাদের আমি হত্যা করব। নতুবা আমার এই জীবনে কোন প্রয়োজন নেই। যে পুত্র বন্ধুদের সঙ্গে থাকে এবং পিতার শত্রুদের বিরুদ্ধাচরণ করে, সেই পুত্রই পুত্র নামের যোগ্য।

গাছেরা পিপ্পলাদকে নিয়ে তখন সোমের কাছে এলো এবং তাঁকে পিপ্পলাদের প্রতিজ্ঞার কথা জানাল। সমস্ত কথা শুনে সোম বালক পিপ্পলাদকে বললেন—শোন পিপ্পলাদ, তুমি প্রথমে বিধিমতো বিদ্যা শিক্ষা কর এবং অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হও। পিপ্পলাদ তখন সোমকে বললেন—যত দিন আমি পিতৃহত্যার প্রতিবিধান না করতে পারি, তত দিন আমি এ সব কিছুকে বৃথা বলেই মনে করি। আপনি দয়া করে বলুন, কোন্ দেশে গিয়ে কোন্ যন্ত্রে কার আরাধনা করলে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে। সোম খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন—শোন, দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়ে গৌতমী গঙ্গা প্রবাহিত। তুমি তার তীরে গিয়ে চক্রেশ্বর শিবের আরাধনা কর; স্বয়ং বিষ্ণু সেই শিবকে পূজা করে তাঁর সুদর্শন চক্র ফিরে পেয়েছিলেন। তুমি সেই তীর্থে গিয়ে ভগবান শংকরের আরাধনা কর, তিনি তোমাকে সমস্ত অভীষ্ট দান করবেন। শংকরের কথামতো পিপ্পলাদ সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। গোদাবরীতে স্নান করে তিনি সংযতভাবে শংকরের স্তব করতে লাগলেন। তিনি বললেন—সংযতচিত্ত সাধুগণ প্রাণ-মন জয় করে এবং সমস্ত বাসনা পরিহার করে মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে যাঁর শরণাপন্ন হয়ে থাকেন, সেই আদিদেবতা শিবকে আমি প্রণাম জানাই। যিনি সমস্ত কিছুর সাক্ষী, সকলের অন্তরাত্মা, সকলের ঈশ্বর এবং সমস্ত বিদ্যার কারণস্বরূপ, সেই মহাদেব আমাকে করুণা করুন। রাবণ দিক্‌পালদের পরাজিত করে কৈলাসকে আন্দোলিত করলে যিনি তাকে শুধুমাত্র বুড়ো আঙুল দিয়ে রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তারপর রাবণের আর্তস্বরে যিনি তাকে উদ্ধার করেছিলেন সেই মহেশ্বরকে আমি প্রণাম জানাই। তোমারই পূজো করে বাণাসুর ইন্দ্রকে পর্যন্ত পরাজিত করেছিল। যিনি পুত্র কার্তিকেয়র জন্য অর্ধনারীশ্বর রূপ ধারণ করেন সেই মহাদেবকে আমি প্রণাম জানাই।

পিপ্পলাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। পিপ্পলাদ তখন সবিনয়ে মহাদেবকে বললেন—দেবতারা আমার যশস্বী এবং পরোপকারী পিতাকে নিহত করেছেন এবং আমার মা-ও সেই দুঃখে প্রাণত্যাগ করেছেন। আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন নেই। আপনি আমায় এমন সামর্থ্য দান করুন, যাতে আমি দেবতাদের নিধন করতে পারি। পিপ্পলাদের কথা শুনে শিব তাকে বললেন—যদি তুমি আমার তৃতীয় নয়ন দেখতে পারো, তাহলে তুমি দেবতাদের বিনাশ করতে সক্ষম হবে। পিপ্পলাদ অনেক চেষ্টা করেও মহাদেবের তৃতীয় নয়ন দেখতে পেলেন না। তিনি তখন কঠোর তপস্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি প্রত্যেক দিন সকালে স্নান ও গুরুজনদের প্রণাম করে আসনে বসতেন।

তারপর সুষুম্না নামক নাড়ীতে মনকে নিবিষ্ট করে সমস্ত বিশ্ব-সংসারকে ভুলে গিয়ে একমাত্র শিবকেই ধ্যান করতে লাগলেন। ক্রমে তপস্যায় সিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত হল। মহাদেবের তৃতীয় নেত্র তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি তখন শংকরের কাছে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত দেবতা বিনাশের সামর্থ্য প্রার্থনা করলেন। সে সময় পিপ্পলাদের মাসী গভস্তিনী তাকে বললেন—তোমার মায়ের এ রকম অভিপ্রায় ছিল যে যারা অপরের প্রতি ঈর্ষাচরণ করে, তাদের নরকেই গতি হয়। সুতরাং দেবতাদের বিনাশ প্রার্থনা করা তোমার পক্ষে অনুচিত। পিপ্পলাদ কিন্তু মায়ের অভিপ্রায় মতো কাজ করলেন না। তিনি মহাদেবের কাছে বারংবার সেই প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। তখন শংকরের তৃতীয় নেত্র থেকে বড়বা অর্থাৎ ঘোটকীর মতো ভীষণাকৃতি কৃত্যার জন্ম হল। সে জন্মেই পিপ্পলাদকে জিগ্যেস করল—বল, এখন আমি কি করব ? পিপ্পলাদ বললেন—তুমি আমার শত্রু দেবতাদের ধ্বংস কর। কৃত্যা পিপ্পলাদের কথায় সম্মত হয়ে প্রথমে তাকে ধরেই খেয়ে ফেলতে উদ্যত হল। পিপ্পলাদ বিস্মিত হয়ে তাকে জিগ্যেস করায় সে বলল—দেখ, তোমার কথায় দেবনির্মিত দেহও আমি ভক্ষণ করব। পিপ্পলাদ তখন ভীত হয়ে শিবের কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালেন। শিব তখন কৃত্যাকে এই নির্দেশ দিলেন যে,—তুমি আমার আদেশে এই স্থানের এক যোজন মধ্যবর্তী জীবদের ভক্ষণ করতে পারবে না। শিবের নির্দেশে সেই কৃত্যা পিপ্পলতীর্থের এক যোজন দূরবর্তী এক স্থানে গিয়ে বাস করল। সেখানে তখন এক ভীষণ অগ্নির প্রাদুর্ভাব হল। সেই অগ্নির প্রচণ্ডতায় দেবতারা ভীত হয়ে শিবের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন—আপনি এই কৃত্যার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। এই কৃত্যা আমাদের নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। ভগবান শংকর তখন দেবতাদের বললেন—এই পিপ্পলতীর্থের এক যোজনের মধ্যে যে প্রাণীসমূহ থাকবে, তাদের কোন ক্ষতিই এই কৃত্যা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা এখানে এসে থাকতে পারো। শংকরের কথা শুনে দেবতারা বললেন—দেখুন, আমাদের বাস করার জন্য আপনি স্বর্গভূমিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, স্বর্গ ত্যাগ করে কি করে এখানে এসে থাকব ? দেবতাদের কথা শুনে শিব বললেন-শোন, সূর্য বিশ্বের চক্ষু এবং মুখস্বরূপ। ইনি রশ্মিসমূহের দ্বারা সততই পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন। তিনি পৃথিবীর জনক রূপে অভিহিত হন। সুতরাং তিনিই এখানে থাকুন ; তিনি থাকলেই সমস্ত দেবতার থাকা হবে।

তারপর শিবের কথামতো সূর্য সেই পিপ্পলতীর্থে থাকলেন, দেবতারাও নিজেদের অংশে সেই পিপ্পলতীর্থের যোজনব্যাপী চারদিকে গঙ্গার উভয় তীরে বাস করতে লাগলেন। তারপর থেকে সেই স্থানে তিনকোটি পাঁচশো তীর্থ গড়ে উঠল। তারপর দেবতারা ভগবান শংকরকে বললেন—আপনি দয়া করে পিপ্পলাদকে দেবনিধন কার্য থেকে বিরত থাকতে বলুন। শংকর তখন পিপ্পলাদকে ডেকে বললেন- দেখ, দেবতাদের বিনাশ করলেও তোমার পিতাকে তো তুমি আর ফিরে পাবে না। তোমার পিতা মহান, তিনি দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যই প্রাণ ত্যাগ করেছেন। তোমার মা-ও ছিলেন পতিব্রতা। বলতে কি, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী এবং অগস্ত্য পত্নীও তোমার মায়ের মতো যশস্বিনী নন। তোমার প্রতাপ ভয়ে দেবতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তুমি এখন এদের পরিত্রাণ কর। আর্ত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করার মতো পুণ্য আর পৃথিবীতে নেই। এবং যাদের শাস্ত্রজ্ঞান নেই তারা বেঁচে থাকলেও মৃত এবং অন্ধ।

মহাদেবের কথায় পিপ্পলাদের দেবতাদের প্রতি ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি

মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন—যাঁরা আমাকে মা বাবার মতো প্রতিপালন করেছেন, তাঁদের নাম অনুসারে এই তীর্থ বিখ্যাত হোক। আমি মনে করি তাতে তাঁদের কাছে আমার ঋণ পরিশোধ হবে। পৃথিবীতে যে সব দেবক্ষেত্র তীর্থ আছে সবার থেকে এই তীর্থ মহিমান্বিত হোক। দেবতারা যদি আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তবেই তাদের অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারি। দেবতারা সানন্দে পিপ্পলাদের কথা অনুমোদন করলেন। শিব তখন পিপ্পলাদকে তাঁর প্রার্থনা কি তা জানাতে বললেন। পিপ্পলাদ তখন শঙ্করকে বললেন—আমার নিজের জন্য চাইবার কিছুই নেই। যে পুণ্যবান ব্যক্তিরা গঙ্গায় স্নান করে আপনাকে দর্শন করবে, তাদের সমস্ত কামনাই যেন পূর্ণ হয়। আমার স্বর্গগত পিতা মাতা আপনার চরণে চিরকাল যেন ঠাঁই পান। মহাদেব পিপ্পলাদের কথাকে অনুমোদন করলেন। দেবতারা পিপ্পলাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর চাইতে বললেন। পিপ্পলাদ কিন্তু মৌন অবলম্বন করলেন। দেবতারা তাঁকে বারংবার বর চাইতে প্ররোচিত করায় তিনি বললেন—আপনারা যদি একান্তই আমাকে বর দিতে চান, তবে আমার প্রার্থনা, আমার পিতা-মাতাকে আমি যেন দেখতে পাই—এই ব্যবস্থা করুন। পিতা-মাতাকে কোন দিনই আমি দেখতে পেলাম না। পশুরাও তাদের মায়ের স্নেহ পায়, আমি মানুষ হয়েও কেন পেলাম না। আমি তো কোন পাপ করি নি। তাঁদের দেখা যদি পাই তবেই আমার জীবন সার্থক হবে।

পিপ্পলাদের কথা শুনে দেবতারা বললেন—তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমার পিতা-মাতা স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করে তোমাকে দেখা দেওয়ার জন্যই এসেছেন। পিপ্পলাদ তখন তাঁর পিতা ও মাতাকে দেখে আনন্দিত হলেন। অন্তরের বেদনাকে কোন মতে চেপে রেখে তিনি বললেন—পুত্রগণ পিতামাতাকে উদ্ধার করে এটাই জগতের নিয়ম। আমি কিন্তু তাঁদের কেবলমাত্র দুঃখই দিয়েছি। তবু যে আপনাদের দেখতে পেয়েছি এতেই নিজেকে আমি ধন্য বলে মনে করছি।

দেবতারা পিপ্পলাদকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—দুঃখ করো না, এই পৃথিবীতে তুমিই ধন্য। তোমার কীর্তি স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দেবতারা যখন পিপ্পলাদকে এ কথা বলছেন, তখন স্বর্গ থেকে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। সস্ত্রীক দধীচি পিপ্পলাদকে আশীর্বাদ করে বললেন—তুমি বিয়ে করে যজ্ঞানুষ্ঠান কর ; শিব এবং গঙ্গাকে ভক্তিভরে সেবা কর। পিপ্পলাদ পিতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি যজ্ঞ করবেন। দধীচি তখন সস্ত্রীক স্বর্গে চলে গেলেন। দেবতারা তারপর পিপ্পলাদকে অনুরোধ করলেন তাঁর সৃষ্ট কৃত্যাকে প্রশমিত করতে। দেবতাদের কথা শুনে পিপ্পলাদ বললেন—আমাকে ক্ষমা করুন ; আমি ওই কৃত্যাকে নিবারণ করতে সক্ষম নই। আপনারাই তাকে নিবৃত্ত করুন।

পিপ্পলাদের কথামতো দেবতারা কৃত্যা এবং অগ্নিকে তাঁদের ক্রোধ প্রশমিত করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁরা রাজী হলেন না সে কথায়। তাঁরা বললেন—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত কিছুকেই ভক্ষণ করার জন্যই আমরা ঋষি কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছি। কিছুতেই এর অন্যথা হতে পারে না। দেবতারা তখন আমার কাছে এসে কর্তব্য বিষয়ে জিগ্যেস করলেন। আমার পরামর্শ মতো দেবতারা সেই কৃত্যা নামক বড়বা বা ঘোটকীকে গিয়ে বললেন—ঠিক আছে তোমরা উভয়ে ক্রমে ক্রমে সমস্তই ভক্ষণ করতে পারবে। অগ্নি এবং কৃত্যা সে-কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। সেই বড়বা তখন নদী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলে

গেল। তার স্রোত থেকে যে অগ্নি উৎপন্ন হল তা অতি ভীষণ হয়ে উঠল। তখন দেবতারা সেই অগ্নিকে বললেন—জল সবার চেয়ে বড় এবং আপনিও প্রথম সৃষ্টি বলে পরিচিত। জলের মধ্যে আবার সমুদ্রই শ্রেষ্ঠ; অতএব, আপনি তাকেই পান করুন। দেবতাদের কথা শুনে অগ্নি বললেন—যেখানে জল আছে সেখানে তো আমি যেতে পারব না। তবে একটা ব্যবস্থা যদি আপনারা করতে পারেন, তাহলে সব দিকই রক্ষা হয়। যদি কোন গুণবতী কন্যা সোনার কলসীতে করে আমাকে সেখানে নিয়ে যায়, তবেই আমি যেতে পারি। দেবতারা অগ্নির কথা শুনে সরস্বতীকে বললেন ওই কাজ করতে। সরস্বতী একা সেই অগ্নিকে বহন করে নিয়ে যেতে পারলেন না ; তিনি, গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা ও তপতী—এই পাঁচজন মিলে তাকে প্রভাস তীর্থে নিয়ে গেলেন। অগ্নি সেখানে থেকেই ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলপান করতে লাগলেন।

তারপর দেবতারা শিবকে জিগ্যেস করলেন—দধীচির অস্থিসমূহের, আমাদের এবং গাভীগণের পবিত্রতা কিভাবে নিষ্পন্ন হবে ? শিব দেবতাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—গঙ্গায় অবগাহন করলে সকলেরই পাপ থেকে মুক্তি ঘটবে। ঋষির অস্থিসমূহও গঙ্গায় ধুলেই পবিত্র হবে। দেবতারা গঙ্গার যে অংশে স্নান করে পাপমুক্ত হয়েছিলেন, তার নাম পাপনাশন তীর্থ। সেখানে স্নান ও দান প্রভৃতি করলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। গোরুরা যেখানে পবিত্র হয়েছিলেন তার নাম গোতীর্থ ; সেখানে স্নান করলে গোমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। যেখানে দধীচির অস্থিসমূহ পবিত্র হয়েছিল, তার নাম পিতৃতীর্থ। এই তীর্থে যদি কোন প্রাণীর ভস্ম, অস্থি, বা নখ বা রোম কোনক্রমে পড়ে তবে তার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

দেবতারা তখন শিবকে প্রণাম করে বললেন—এখানে সূর্য প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, তিনি থাকলেই সমস্ত দেবতা থাকবেন। আমরা এখন স্বর্গে ফিরে যাই। যেখানে গঙ্গা এবং স্বয়ং শঙ্কর থাকেন, প্রকৃতপক্ষে সেখানে সমস্ত দেবতাই অধিষ্ঠিত থাকেন। দেবতারা তারপর মহাদেবের অনুমতি নিয়ে এবং পিপ্পলাদকে বলে স্বর্গে ফিরে গেলেন। কালক্রমে সেখানকার অশ্বত্থ গাছগুলো পবিত্র হয়ে উঠল। পিপ্পলাদ তখন গৌতমের কন্যাকে বিয়ে করলেন এবং ক্রমে পুত্র, যশ ও সমৃদ্ধি লাভ করে স্বর্গে গেলেন। তারপর থেকেই সেই তীর্থ পিপ্পলেশ্বর নামে অভিহিত হল। সূর্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে এবং দেবতারা এখানে অধিষ্ঠান করেছিলেন বলে এই স্থান প্রতিষ্ঠান নামে পরিচিত হয়। যে বক্তি এই অতি পবিত্র আখ্যান পাঠ করে, শোনে বা স্মরণ করে, সে দীর্ঘজীবন লাভ করে ; ধনলাভ তার পক্ষে সুগম হয় এবং মুক্তি তার করায়ত্ব হয়।

—'চক্রেশ্বরপিপ্পল তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো এগারো

ব্রহ্মা নারদকে বললেন—এবার তোমাকে বিখ্যাত নাগতীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থে স্বয়ং নাগেশ্বর দেব বিরাজ করেন। পুরাকালে প্রতিষ্ঠানপুরে শূরসেন নামে সোমবংশের একজন রাজা ছিলেন। অনেক চেষ্টার পর একটি ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট সাপ তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। রাজা এবং রাণী উভয়েই এই ঘটনায় খুব দুঃখিত হলেন। তাঁরা গোপনে সেই সর্পরূপী পুত্রকে পালন করতে লাগলেন। মন্ত্রী, পুরোহিত, এমন কি

ধাত্রী পর্যন্ত সে কথা জানতে পারল না। একটু বড় হওয়ার পরই সেই সাপটি মানুষের মতো কথা বলতে লাগল। সে পিতা শূরসেনকে তার চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বেদাধ্যয়নের আয়োজন করতে বলল। রাজা তখন ব্রাহ্মণ এনে সেই সর্পরূপী পুত্রের সংস্কার প্রভৃতি করালেন। বেদাধ্যয়নের পর সেই সাপ রাজাকে বলল--আমার এবার বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। যে পিতা পুত্র উৎপাদন করে বেদবিধি অনুসারে তার সমস্ত সংস্কার সম্পাদন না করেন, নরক থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। শূরসেন বিস্মিত হয়ে সেই সর্পরূপী পুত্রকে বললেন—যার নাম শুনলে বীরপুরুষেরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে যান, কে তাকে কন্যাদান করবে? তুমিই বলে দাও কি আমার করণীয়। পিতার কথা শুনে সে বলল—রাজাদের বিয়ে তো অনেক ভাবে হয়; বলপূর্বক কন্যা হরণ করেও বিয়ে করা যায়। দেখুন, আমার যদি বিয়ে না দেওয়া হয় তবে আমি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেব। রাজা তখন মন্ত্রীদের ডেকে বললেন--আমার পুত্র নাগেশ্বর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছে। তার সমান বীর পৃথিবীতে তো বটেই স্বর্গে এবং পাতালেও দুর্লভ। আমারও বয়স হয়েছে। সুতরাং আপনারা তার বিয়ের ব্যবস্থা করুন। তার হাতে রাজ্যের ভার অর্পণ করে আমি তপস্যার জন্যে বনে চলে যাব।

রাজা কিন্তু এ কথা বললেন না যে তাঁর পুত্র একটি সাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজা যখন মন্ত্রীদের রাজপুত্রের বিয়ের জন্যে সুলক্ষণযুক্ত এবং সদ্বংশজাত পাত্রীর কথা বলছেন তখন একজন মন্ত্রী বললেন—পূর্বদেশে বিজয় নামে এক রাজা আছেন; তাঁর আটটি ছেলে ও একটিমাত্র মেয়ে, নাম ভোগবতী। মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমার মনে হয় সে-ই আপনার পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী। রাজা তখন সেই মন্ত্রীকে অলঙ্কার, পর্যাপ্ত উপকরণ এবং সৈন্যসামন্ত দিয়ে পূর্বদেশে পাঠিয়ে দিলেন। বিজয় রাজার রাজসভায় এসে সেই মন্ত্রী রাজার খুব প্রশংসা করলেন। বিজয় এই প্রশংসা-বাক্যে খুবই তুষ্ট হলেন। তারপর মন্ত্রী রাজার কাছে নাগেশ্বরের সঙ্গে ভোগবতীর বিয়ের কথা পাড়লেন। বিজয় তাতে সম্মত হলেন। তখন সেই মন্ত্রী শূরসেনকে এসে সব কথা জানাল এবং রাজা ও নাগেশ্বরের পরামর্শমতো আবার বিজয়ের রাজসভায় এসে বলল--মহারাজ, শূরসেনের পুত্র নাগেশ্বর বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান। তিনিও এ বিয়েতে সম্মত। ক্ষত্রিয়দের বিয়ে তো অনেক ভাবে হয়; শাস্ত্র ও অলঙ্কারের সঙ্গেও বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। নাগেশ্বর এখানে আসতে চান না; বিশেষ অসুবিধা আছে। সুতরাং আপনি অস্ত্র বা অলঙ্কারের সঙ্গেই আপনার কন্যার বিয়ে দিন। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা সাধারণত মিথ্যা বলেন না—এই বিশ্বাসটুকু আপনি রাখুন।

বৃদ্ধ মন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে রাজা বিজয় অস্ত্রের সঙ্গেই ভোগবতীর বিয়ে দিলেন এবং মন্ত্রীর সঙ্গেই তাকে তার স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। মেয়ের সঙ্গে রাজা বিজয় প্রভূত সোনা-দানা এবং অন্যান্য যৌতুক পাঠিয়ে দিলেন; সঙ্গে দিলেন তাঁর বিশ্বস্ত কয়েকজন মন্ত্রী। অমাত্যদের সঙ্গে বিবাহিতা বধূ ভোগবতী প্রতিষ্ঠানপুরে এসে পৌঁছলেন। যে সব মন্ত্রী এবং অনুচরেরা রাজা বিজয়ের কাছ থেকে এসেছিল, শূরসেন তাদের যথোচিত আপ্যায়ন জানালেন। ভোগবতী স্বামীর বাড়িতে থেকে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করতে লাগল। এদিকে সর্পরূপী সেই রাজপুত্র নাগেশ্বর রাজপ্রাসাদের এক নির্জন স্থানে বাস করছিল। সে তার মাকে জিগ্যেস করল—আমার স্ত্রী আমার কাছে আসে না কেন? ছেলের কথার কোন উত্তর না দিয়ে রাণী তাঁর এক পরিচারিকাকে

বললেন—তুই এক কাজ কর, ভোগবতীকে গিয়ে বল যে তার স্বামী মানুষ নয়, একটি সাপ। সে তখন কি বলে বা কি করে তা শুনে এসে আমাকে জানাবি। রাণীর কথামতো পরিচারিকাটি ভোগবতীকে বলল—তোমার যিনি স্বামী তিনি মানুষ নন, দেবতা; কিন্তু তাঁর আকার সাপের মতো। সে কথা শুনে ভোগবতী বলল—সাধারণত মানুষীদের পতি মানুষই হয়; পুণ্যবশতই দেবতারূপ স্বামী পাওয়া যায়। আমার ভাগ্যে যদি সে-রকম স্বামী হয়ে থাকে, তবে তা তো সুখের কথা। তুমি আমাকে পতি সন্দর্শনে নিয়ে চল। পরিচারিকাটি রাজা ও রাণীকে সব কথা জানিয়ে ভোগবতীকে নাগেশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কুসুমশয্যায় শায়িত সেই নাগেশ্বরকে দেখে ভোগবতী বলল—আমি আজ ধন্য এবং অনুগৃহীত হলাম। এই কথা বলে সে স্বামীর কাছে গিয়ে তাকে নানাভাবে আনন্দ দিতে সচেষ্ট হল। ভোগবতীর সঙ্গে মেলামেশার ফলে নাগেশ্বরের পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত হল। ক্রমে পূর্বজন্মের সমস্ত ঘটনাই তার মনে পড়ে গেল। সে তখন ভোগবতীকে বলল—শোন, তোমার সংস্পর্শে এসে আমার পূর্বজন্মের সব কথাই মনে পড়ে গেছে। আমি নাগের পুত্র মহাবলশালী নাগ; মহাদেবের হাতেই ছিলাম। তুমি পূর্ব জন্মেও আমার স্ত্রী ছিলে। একবার উমার কথা শুনে শিব খুব জোরে হেসে উঠেছিলেন। তাতে আমিও হেসে উঠেছিলাম। শিব আমার এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন যে—তুমি মনুষ্য-যোনিতে সাপ হয়ে জন্মাবে। তোমার পূর্বজন্মের স্মৃতি কিন্তু থাকবে। তারপর আমি অনেক চেষ্টায় তাঁকে প্রসন্ন করায় তিনি বলেছিলেন—যখন তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে গৌতমীতে গিয়ে আমার পুজো করবে, তখন তোমার পত্নী ভোগবতীর আনুকূল্যে শাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে। সেজন্যই আজ আমার এই অবস্থা। তুমি আমাকে গৌতমী তীরে নিয়ে চল। স্বামীর কথা শুনে ভোগবতীরও সব কথা মনে পড়ে গেল।

তারপর ভোগবতী নাগেশ্বরকে নিয়ে গৌতমী তীরে গেল। সেখানে গৌতমী নদীতে স্নান করে দুজনেই শিবের পুজো করল। তাদের পুজোয় প্রীত হয়ে ভগবান শঙ্কর নাগেশ্বরকে দিব্য রূপ দান করলেন। তারপর তারা রাজধানীতে ফিরে এসে যখন বাবা-মা'র কাছে শিবলোকে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইল, তখন শূরসেন নাগেশ্বরকে বললেন—দেখ, তুমিই আমার একমাত্র পুত্র এবং যুবরাজও বটে। এদিকে আমারও বয়স হয়েছে। তুমি রাজ্যপালন এবং সংসার ধর্ম পালন কর। তারপর যখন তোমার পরলোকে যাওয়ার সময় হবে, তখন শিবলোকে যেও।

পিতার কথামত সেই সুন্দর রূপবিশিষ্ট নাগরাজ অনেক দিন রাজ্যশাসন করলেন। তারপর নিজের পুত্রদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে স্ত্রী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে শিবলোকে চলে গেলেন। তারপর থেকেই এই তীর্থ 'নাগতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এখানেই ভোগবতী ও নাগেশ্বর মহাদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্নান, দান প্রভৃতি করলে সমস্ত যজ্ঞেরই ফল পাওয়া যায়।

—'নাগতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ একশো বারো

এবার বিখ্যাত মাতৃতীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে দেবতারা দানবদের কাছে পরাজিত হন। তখন তারা

আমার কাছে এসে সমস্ত কথা বলেন। আমি দেবতাদের নিয়ে ভগবান শংকরের কাছে যাই। ভগবান শংকরকে তুষ্ট করার একটাই উপায় জানতাম। তাই তাঁর স্তব করতে লাগলাম—দেবতাদের সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল তা দেবতারা পান করেন আর যে কালকূট নামক ভয়ংকর বিষ উঠেছিল, জগতের কল্যাণের জন্য তুমি তাই পান করেছিলে। তাই তো তুমি নীলকণ্ঠ। সমগ্র পৃথিবীকে ফুলশরে মদন বিদ্ধ করতে পারে, কিন্তু সে যখন তোমাকেই সেই শর দিয়ে বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তখন তার চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। জগতের কল্যাণে সততই তুমি সচেষ্ট আছ। মহাদেবকে এভাবে স্তব করায় তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং দেবতাদের বক্তব্য কি তা জিজ্ঞেস করলেন। দেবতারা তখন বললেন—দৈত্যরা আমাদের পরাজিত করেছে ; আমরা বড় কষ্টের মধ্যে রয়েছি। আপনি দানবদের সংহার করে আমাদের রক্ষা করুন।

দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে শংকর দেবতাদের সঙ্গে যেখানে দানবেরা বাস করছিল, সেখানে গিয়ে পেঁছিলেন। তখন দৈত্যদের সঙ্গে মহাদেবের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। তিনি তামসী মূর্তি ধারণ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। মহাদেবের সেই রুদ্র মূর্তি দেখে দৈত্যগণ মেরুপৃষ্ঠ থেকে সমতলে নেমে এলো ; মহাদেবও দৈত্যদের সংহার করতে করতে তাদের পিছনেই এলেন। দৈত্যরা ভীত হয়ে সমগ্র পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। মহাদেবও ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের পিছু নিলেন। যুদ্ধ করার সময় পরিশ্রমে তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল। পৃথিবীর যে যে জায়গায় সেই ঘাম পড়ল সেখানেই শিবের মতো ভয়ংকর আকৃতিবিশিষ্ট মাতৃগণ আবির্ভূত হলেন। জন্মানোর পরই সেই মাতৃগণ শংকরকে বললেন—আমরা অসুরদের বিনাশ করব। মহেশ্বর তখন তাদের বললেন—শোন, আমার ভয়ে ভীত হয়ে অসুরেরা পাতালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ; তোমরাও পাতালে গিয়ে তাদের সংহার সাধন কর। মহাদেবের কথায় মাতৃগণ পাতালে গেলেন এবং দৈত্যদের বিনাশ করে আবার দেবতাদের কাছে ফিরে এলেন। মাতৃগণ পাতালে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসার সময় পর্যন্ত দেবতারা গোতমী নদীর তীরেই বাস করছিলেন। সেজন্য সেই স্থান প্রতিষ্ঠান নামে বিখ্যাত হয়। মাতৃগণও সেই গোতমী নদীর তীরে বিভিন্ন স্থানে রয়ে গেলেন। তাঁরা যে যে জায়গায় অবস্থান করেছিলেন, সেই সেই স্থানই মাতৃতীর্থ নামে পরিচিত। এই সব স্থানে স্নান, দান কিংবা পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যা কিছু করা হয়, সে সবই সার্থক হয়ে থাকে। যে এই মাতৃতীর্থের কথা শোনে বা পাঠ করে সে দীর্ঘজীবী হয়।

—'দেবতীর্থ মাতৃতীর্থ প্রতিষ্ঠান বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো তেরো

এবার তোমাকে বিখ্যাত ব্রহ্মতীর্থের কথা শোনাব। দৈত্যরা শিবের ভয়ে যখন পাতালে প্রবেশ করল, তখন মাতৃগণ তাদের পিছন পিছন গেলেন ; আর দেবতাদের সঙ্গে আমি সেই গোতমী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তুমি জানো যে আগে আমার পাঁচটি মাথা ছিল এবং পঞ্চম মাথাটির আকার ছিল গর্দভের মুখের মতো। আমার সেই পঞ্চম মস্তক তখন দৈত্যদের উদ্দেশ্য করে বলল—তোমরা পালাচ্ছ কেন, ফিরে এসো ; আমিই দেবতাদের খেয়ে ফেলব। আমি দৈত্যদের বিনাশ সাধন করতে উৎসুক আর আমার অন্যতম মাথা

দেবতাদের বিনাশ করতে উদ্যত—এ রকম বিসদৃশ ঘটনা দেখে দেবতারা ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা তখন ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালেন। তাঁরা বললেন—আপনি ব্রহ্মার এই মাথা কেটে ফেলুন, নইলে আমরা বাঁচব না। দেবতাদের কথা শুনে বিষ্ণু বললেন—আমি একে এই মুহূর্তেই কেটে ফেলতে পারি, কিন্তু পৃথিবীতে যদি এই মাথা পড়ে, তবে তা সমগ্র পৃথিবীকেই ধ্বংস করে ফেলবে। তার চেয়ে এক কাজ কর, ভগবান শঙ্করকে তোমরা স্তবে তুষ্ট কর। তিনিই ব্রহ্মার কাটা মাথা ধারণ করতে পারেন। দেবতারা তখন শিবের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব তাদের কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনলেন। তিনি তখন দেবতাদের জিজ্ঞেস করলেন—ব্রহ্মার ওই মাথা কেটে কোথায় রাখব আমি? পৃথিবী তখন দেবতাদের বলল যে সে ওই মাথা বহন করতে পারবে না। তাহলে তাকে পাতালে প্রবেশ করতে হয়। সমুদ্র জানাল যে যদি ওই মাথা তার বুকে পড়ে তবে সে শুকিয়ে যাবে। দেবতারা তখন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর তাঁরা শঙ্করকেই অনুরোধ করলেন যাতে তিনি ওই মাথা নিজেই ধারণ করেন। শঙ্কর চিন্তা করে দেখলেন যে ঐ মাথা না কাটলেও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, কাটলেও ধ্বংস হয়ে যাবে—এ রকম ভেবে তিনি ব্রহ্মার সেই পঞ্চম মস্তক কেটে নিজেই তা ধারণ করলেন। ভগবান শঙ্করের এই দুষ্কর কার্যসাধনে দেবতারা নিঃশঙ্ক হলেন। তাঁরা মহাদেবের স্তবগাথা কীর্তন করলেন।

তারপর থেকেই ওই তীর্থ ব্রহ্মতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। আজও চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্তি এই তীর্থে প্রতিষ্ঠিত। ভগবান রুদ্র যেখানে আমার মাথা কেটে নেন সেই স্থান রুদ্রতীর্থ নামে পরিচিত। এখানেই সমস্ত দেবতারূপী সাক্ষাৎ সূর্য বিরাজ করেন; সুতরাং এই উভয় তীর্থ সৌর্য তীর্থ নামেও পরিচিত। এখানে এসে স্নান করার পর সূর্যকে দর্শন করলে পুনর্জন্ম ঘটে না। মহাদেব ব্রহ্মার যে মাথা কেটে ফেলেন, তা অবিমুক্ত ক্ষেত্রে স্থাপন করে দেবতাদের মঙ্গলসাধন করেছিলেন। গৌতমীতটে ব্রহ্মতীর্থে যে সেই ব্রহ্মকপাল দেখে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়।

—'শিবতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো চৌদ্দ

অবিঘ্ন নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। এই তীর্থের কথা তোমাকে এখন বলছি। একবার গৌতমীর উত্তর তীরে এক দেবযজ্ঞ আরম্ভ হয়; কিন্তু বিঘ্ন ঘটায় ঐ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নি। দেবতারা তখন আমাকে এবং ভগবান বিষ্ণুকে ঐ ঘটনা জানান। আমি ধ্যানস্থ হয়ে বিঘ্নের কারণ জানতে পারি। দেবতাদের ডেকে বলি—গণেশ এই যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, তাই তোমাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। তোমরা বিনায়কের স্তব কর। তিনি তুষ্ট হলে তোমাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে।

আমার কথা মতো দেবতারা তখন গণেশের স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা বললেন—যিনি সমস্ত কাজে শঙ্কর, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের সর্বদা নমস্য এবং পূজ্য, সেই বিঘ্ননাশক দেবতা বিনায়কের আমরা শরণ নিলাম। অন্য কোন দেবতাই গণেশের মতো অভীষ্টদায়ক নন! তিনি আমাদের এই যজ্ঞে যে বিঘ্ন ঘটেছে, তা দূর করুন। যাঁকে ধ্যান করলে সমস্ত প্রাণীই অভিলাষ পূর্ণ হয়, যিনি দেবীর চিন্তামাত্রেই জন্মেছিলেন,

দেবতারা যে সদ্যোজাত বালককে বিঘ্নরাজ নামে অভিহিত করেছিলেন, শিব যাকে লম্বোদর নাম দেন, যিনি পুজো না পেলে নিজের মাকে পর্যন্ত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে ফেলেন, তিনি আমাদের বিঘ্ন দূর করুন। সমস্ত মাঙ্গলিক কাজে যাঁকে স্মরণ করা হয়, সমস্ত দেবতার পুজোর আগে যাঁর পুজো হয়, যাঁর অর্চনা করলে প্রার্থনার অনুরূপ ফল পাওয়া যায়, সেই বিঘ্নরাজকে আমরা প্রণাম জানাই। যিনি সরস নাচ, গান এবং অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানের দ্বারা মাকে আনন্দ দান করেছিলেন, সেই গণেশের আমরা শরণ নিই।

দেবতাদের স্তবে বিঘ্নরাজ গণেশ তুষ্ট হলেন। তিনি দেবতাদের বললেন—তোমাদের স্তবে আমি প্রীত হয়েছি : এখন থেকেই তোমাদের যজ্ঞ নির্বিঘ্ন হবে। গণেশের অনুগ্রহে দেবতাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হল। গণেশ তখন দেবতাদের বললেন—আপনারা আমার যে স্তব করলেন, যে সব ব্যক্তি সেই স্তবের দ্বারা আমার পুজো করবে, তাদের দারিদ্র্য দুঃখ কখনোই থাকবে না। এখানে যারা ভক্তিভরে স্নান, দান প্রভৃতি করবে, তাদের সমস্ত কাজই সার্থক হবে।

তারপর থেকেই ওই তীর্থ 'অবিঘ্ন' নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

—'অবিঘ্নতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো পনেরো

এবার তোমাকে বিখ্যাত শেষতীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে শেষ নামক মহানাগ সমগ্র পাতালের অধিপতি বলে নির্দিষ্ট হন। তিনি পাতাল অধিকার করেন। কিন্তু রাক্ষস ও দৈত্য-দানবগণ পাতাল থেকে সেই শেষনাগকে বিতাড়িত করেন। পাতালের আধিপত্য হারিয়ে শেষনাগ দুঃখিত হল। সে আমাকে এসে বলল—আপনি আমাকে পাতাল দান করেছেন ; কিন্তু দৈত্য, দানব, রাক্ষসরা আমাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কি করলে আবার পাতাল ফিরে পাব তার উপায় আপনি বলে দিন।

শেষনাগের কথা শুনে আমি তাকে বললাম—শোন শেষ, তুমি গৌতমীর তীরে যাও, সেখানে গিয়ে মহেশ্বরের স্তব করলে তুমি তোমার অভীষ্ট বস্তু লাভ করতে পারবে। আমার কথামতো শেষনাগ গৌতমীতে স্নান করে ভগবান শংকরের স্তব করতে প্রবৃত্ত হল। শেষ বলল—তুমি আদি দেবতা, ত্রিভুবনের প্রভু, দক্ষযজ্ঞকে তুমিই ধ্বংস করেছ। ত্রিভুবনে তোমার মূর্তি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তুমি সোম, সূর্য, অগ্নি ও জলমূর্তিতে প্রকাশিত হও ; তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। আমি তাপিত, আমাকে তুমি রক্ষা কর ; আমার প্রার্থনা তুমি পূরণ কর।

তখন শেষনাগের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব দৈত্য, দানব ও রাক্ষসদের বিনাশের জন্য একটি ত্রিশূল দান করে বললেন—তুমি এই ত্রিশূল দিয়ে তোমার শত্রুদের বিনষ্ট কর। মহাদেবের পরামর্শ মতো শেষনাগ ওই ত্রিশূল নিয়ে পাতালে গেল এবং তার শত্রুদের সংহার করল। তারপর সে মহাদেবের কাছে ফিরে এলো। শেষনাগ যে পথে পাতাল থেকে মহাদেবের কাছে এসেছিল, সেখানে একটি বিরাট গর্ত দেখা দিল। সেই গর্তের জল অতি পবিত্র। সেই গর্তের জল গঙ্গার সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সঙ্গমতীর্থ সৃষ্টি করল। শেষনাগ সেখানে মহাদেবের একটি লিঙ্গ-মূর্তি স্থাপন করল। তারই নাম অনুসারে সেই প্রতিষ্ঠিত

মহাদেবের নাম হল শেষেশ্বর। ঐ শেষেশ্বরের মন্দিরের সামনে একটি কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডে অগ্নি সর্বদাই থাকেন, সেজন্য সেখানকার গঙ্গাসঙ্গমের জল সব সময় গরম হয়ে থাকে। শেষনাগ সেখানে হোম করেছিল। শেষনাগ মহাদেবের পূজো করে তাঁরই অনুগ্রহে আবার পাতালে ফিরে যায়। তারপর থেকেই ঐ তীর্থ নাগতীর্থ নামে অভিহিত হয়। ঐ তীর্থ অতি পবিত্র। এখানে স্নান বা দান করলে মানুষ দীর্ঘায়ু হয় এবং সম্পদ লাভ করে। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই কাহিনী শোনে বা পাঠ করে, পরিণামে তার মুক্তি ঘটে। সেখানে গোমতী নদীর উভয় তীরে শেষ প্রভৃতি অনেক তীর্থ রয়েছে।

—'শততীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো ষোল

এবার তোমাকে মহানল তীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থ বাড়বানল তীর্থ নামেও পরিচিত। এখানে মহানল নামে মহাদেবের মূর্তি রয়েছে আর রয়েছে বড়বা নামে নদী।

পুরাকালে নৈমিষারণ্যে ঋষিরা দীর্ঘদিনব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞে ঋষিরা মৃত্যুকে পশুবধকারীরূপে নিযুক্ত করেন। যজ্ঞ আরম্ভ হলে দেখা গেল যে, পশুরা ছাড়া আর কেউই মৃত্যুর কবলে পড়ছে না। পৃথিবীবাসীরা অমর হয়ে উঠল। মৃত্যুকে প্রাণীহত্যার প্রতি উদাসীন দেখে দেবতারা রাক্ষসদের বললেন—যাও, তোমরা গিয়ে ঋষিদের যজ্ঞ ধ্বংস কর। দেবতাদের কথা শুনে রাক্ষসেরা তাঁদের পাল্টা জিগ্যেস করল—আমরা যে যজ্ঞ ধ্বংস করব, তাতে আমাদের লাভ কি হবে ? বিনা কারণে কে কখন কোন্ কাজে প্রবৃত্ত হয় ? দেবতারা তখন তাদের আশ্বস্ত করে বললেন—এই যজ্ঞের অর্ধেক ভাগ তোমরাও পাবে। সুতরাং এই যজ্ঞ অবিলম্বে ধ্বংস কর। দেবতাদের কথামতো রাক্ষসেরা সেই যজ্ঞস্থলে গিয়ে পেঁছিল। ঋষিরা এ ব্যাপার জানতে পেরে মৃত্যুর সঙ্গে পরামর্শ করে কেবলমাত্র অগ্নিকে নিয়ে সেখান থেকে গোতমী নদীর তীরে চলে গেলেন। গোতমীতে স্নান করে যজ্ঞ রক্ষার জন্য মহাদেবের পূজো করলেন এবং তাঁর স্তব করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন—যিনি এই চরাচর বিশ্বের কর্তা, যিনি ত্রিভুবনেরই বিধাতা, বিশ্বরূপ, পরম পুরুষ, সৎ এবং অসৎ পুরুষ, সেই সোমেশ্বরের আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি। যিনি ইচ্ছামাত্রেই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় করে থাকেন, সেই শঙ্করের শরণ গ্রহণ করি আমরা। যিনি মহাকায়, মহানল ও মহামূর্তিধর, সেই শঙ্করের আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তিনি আমাদের রক্ষা করুন।

দেবতারা মৃত্যুকে প্রধান করে যেহেতু মহাদেবের পূজো করেছিলেন, সেজন্য শঙ্কর মৃত্যুকেই জিগ্যেস করলেন—বল, কি রকম বর চাও তুমি ? মৃত্যু তখন ভগবান শঙ্করকে বললেন—রাক্ষসেরা ঋষিদের যজ্ঞ ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। যত দিন না এই যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, তত দিন পর্যন্ত রাক্ষসরা যাতে কোন বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন। তখন মহাদেবের আশ্বাসক্রমে ঋষিদের যজ্ঞ আবার আরম্ভ হল এবং তা সম্পূর্ণ হল। দেবতারা সেই যজ্ঞে হবির্ভাগ গ্রহণ করতে এলে ঋষিরা এবং মৃত্যুও তাঁদের বললেন—আমাদের যজ্ঞ ধ্বংসের জন্য যেহেতু তোমরা রাক্ষসদের পাঠিয়েছিলে, সেজন্য রাক্ষসেরা তোমাদের শত্রু হোক। ঋষিদের কথায় তখন থেকেই রাক্ষসেরা দেবতাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। দেবতা ও ঋষিদের চেষ্টায় সেই কৃত্যা মৃত্যুর পত্নীরূপে পরিগণিত হল। সেই

বড়বা কৃত্যাকে যে জলে অভিষিক্ত করা হয়, সেই জল থেকে বড়বা নামক নদীর উৎপত্তি হল। সেখানে মৃত্যু যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তা মহানল নামে বিখ্যাত হয়। তারপর থেকেই সেই তীর্থ বড়বাসঙ্গম নামে পরিচিত হয়। এখানে গৌতমী নদীর উভয় তীরে অনেক তীর্থ আছে। এখানে স্নান ও দান প্রভৃতি পুণ্য উৎপাদন করে।

—'বড়বা প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো সতেরো

এবার তোমাকে বিখ্যাত আত্মতীর্থের কথা শোনাব। এখানে জ্ঞানেশ্বর শিব বিরাজ করেন। পুরাকালে মহামুনি অত্রির এক পুত্র হয়; তাঁর নাম দত্ত। তিনি দুর্বাসার ভাই এবং সমস্ত জ্ঞানে সুপণ্ডিত। তিনি একবার সবিনয়ে তাঁর পিতাকে জিগ্যেস করলেন— সমস্ত বিদ্যা আমি অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু কি ভাবে আমি ব্রহ্মজ্ঞান ল্যভ করব ? আপনি এ ব্যাপারে আমাকে পথনির্দেশ করুন। দত্তের কথা শুনে অত্রি চিন্তিত হলেন। তিনি ধ্যান করে খানিকক্ষণ পর তাঁকে বললেন—তুমি এক কাজ কর। গৌতমী গঙ্গার তীরে গিয়ে মহাদেবের স্তব কর। তিনি যদি প্রীত হন, তবেই তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ সুগম হবে।

দত্ত পিতার কথামতো গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে ভক্তিভরে শংকরের স্তব করতে লাগলেন। তিনি বললেন—আমি মোহপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর দুঃখপংকে এবং সংসাররূপ কূপে পতিত হয়েছি, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, তাই শ্রেয়লাভ করতে পারছি না। পাপরূপ ত্রিশূল এবং চিন্তারূপ ক্ষুর আমাকে সততই পীড়া দিচ্ছে : পঞ্চেন্দ্রিয়ের তীব্র তাপে এবং প্রবল প্রভাবে আমি দিশেহারা, আমাকে তুমি রক্ষা কর। আমি দারিদ্র্যরূপ ভীষণ বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছি। রোগরূপ আগুনের তীব্র তাপে পীড়িত হয়ে মৃত্যুরূপ সর্পের আক্রমণে আমি ভীত হয়ে পড়েছি। আমার ইতিকর্তব্য আমি ঠিক করতে পারছি না। আমাকে তুমি পথ দেখাও। আমি বারংবার জন্ম ও মৃত্যুতে নিতান্ত নিপীড়িত হয়ে পড়েছি। কাম, কোপ, মাৎসর্য ও দম্ভ আমাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তুমি আমার এই শত্রুদের সংহার কর। মানুষ দুঃখ-কষ্টে পড়লে মানুষই তার সেই দুঃখ-কষ্ট দূর করে। আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই আমার রক্ষাকর্তা বলে জানি না। শিবের আশ্রয় গ্রহণ করলে ক্রোধ, মোহ, দুঃখ, অজ্ঞান, দারিদ্র্য, ব্যাধি, কাম প্রভৃতি অন্তঃশত্রু এবং মৃত্যুর ভয় থাকে না। আমার ধর্ম নেই, ভক্তি নেই, বিবেক নেই, দয়া নেই ; আমি অতি দীন ব্যক্তি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি ঐশ্বর্য চাই না, তোমার পাদপদ্মেই আমার মনমধুকর স্থির থাকুক চিরদিন। আমি হয়তো অনেক অন্যায় কাজ করেছি, তবু দয়া করে আমার প্রার্থনা শোন। আমার প্রার্থনা এই যে, যেখানে শংকরের নাম শোনা যাবে, সেখানে যেন আমি থাকতে পারি।

ভগবান শংকর দত্তের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললেন—শোন দত্ত, তোমার স্তবে আমি প্রীত হয়েছি ; তুমি বর প্রার্থনা কর। দত্ত মহাদেবের কথা শুনে সবিনয়ে বললেন— আমার প্রার্থনা এই যে, আমাকে তুমি আত্মজ্ঞান এবং তীর্থমাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক ভাবে অবহিত কর। শিব দত্তের প্রার্থনা অনুমোদন করে চলে গেলেন। তারপর থেকেই

পণ্ডিতগণ ঐ তীর্থকে 'আত্মতীর্থ' বলে থাকেন। ঐ তীর্থে স্নান, দান প্রভৃতি করলে মুক্তি লাভ করা যায়।

—'আত্মতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো আঠারো

অশ্বত্থ ও পিপ্পল তীর্থের কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এর উত্তরে রয়েছে মন্দ নামক তীর্থ। এই তীর্থের কথা এবার তোমায় শোনাব। পুরাকালে দক্ষিণ দিকের অধিপতি মহামুনি অগস্ত্য অনেক শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে দেবতাদের নির্দেশে বিন্ধ্যপর্বতের কাছে এসে পৌঁছন। সেই বিন্ধ্যপর্বত শতশৃঙ্গ বিশিষ্ট; এতে প্রচুর গাছপালাও রয়েছে। মহামুনি অগস্ত্যের আগমনে খুশি হয়ে বিন্ধ্যগিরি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করল। অগস্ত্য বিন্ধ্যকে আশীর্বাদ করে বললেন—আমার সঙ্গে যে মুনিরা রয়েছেন এঁদের নিয়ে আমি তীর্থপর্যটনক্রমে দক্ষিণ দিকে যাব। তুমি উন্নত শৃঙ্গ নিয়ে পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ; তুমি মস্তক অবনত কর, আমাকে পথ করে দাও। এতেই তোমার আতিথেয়তা সম্পাদিত হবে। যদ্দিন পর্যন্ত না আমি ফিরে আসছি, তদ্দিন তুমি এভাবেই থাকবে। তোমার কাছে এটাই আমার অনুরোধ। বিন্ধ্যপর্বত অগস্ত্যের কথা মেনে নিল। অগস্ত্য মুনিও শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে গৌতমী গঙ্গার তীরে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানে একবছর ব্যাপী এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এমন সময়ে কৈটভ নামে এক রাক্ষসের অশ্বত্থ ও পিপ্পল নামে দুই পুত্র মুনিদের যজ্ঞ ধ্বংস করার জন্য তার ছিদ্র অন্বেষণ করতে লাগল। তারা যেহেতু রাক্ষস, তাই তারা ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারত। ওই দুই রাক্ষসের মধ্যে অশ্বত্থ নামক রাক্ষস অশ্বত্থগাছের রূপ ধারণ করল আর পিপ্পল ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যে ব্যক্তি সেই অশ্বত্থ গাছকে স্পর্শ করে অশ্বত্থ রাক্ষস তাকেই খেয়ে ফেলে। পিপ্পল রাক্ষস সামগায়ক ব্রাহ্মণ হয়ে মুনি ঋষিদের খেয়ে ফেলতে লাগল। সেজন্যই আজ পর্যন্ত সামগায়ী ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণদের মধ্যে অত্যন্ত নির্দয়রূপে পরিচিত। মুনিরা দেখলেন যে, ক্রমেই ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তাঁরা তখন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধ্যানযোগে সবকিছু জানতে পারলেন। সে সময় গৌতমীর দক্ষিণ তীরে সূর্যপুত্র শনি তপস্যা করছিলেন। মুনিরা তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। সব কথা শুনে শনি তাদের বললেন- দেখুন, আমার তপস্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারব না। তপস্যা শেষ হলে পর রাক্ষসদের আমি নিধন করব। শনির কথা শুনে মুনিরা বললেন—আপনাকে আমরা বিপুল তপস্যা দান করছি, আপনি আমাদের কাজ করে দিন। মুনিদের কথায় সম্মত হয়ে শনি তখন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করে প্রথমে অশ্বত্থরূপী রাক্ষসের কাছে গিয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করলেন। শনি যখন তাকে প্রদক্ষিণ করছেন, তখন অশ্বত্থ মনে করল যে, প্রতি দিন যেমন ব্রাহ্মণেরা তার কাছে এসে মৃত্যুবরণ করে এও তেমনই এক ব্রাহ্মণ। এ রকম মনে করে অশ্বত্থ শনিকে খেয়ে ফেলল। শনি তার উদরে গিয়ে যেই তার অন্ত্রসমূহের দিকে তাকালেন, অমনি সেই বিরাট অশ্বত্থগাছ পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

তারপর তিনি ব্রাহ্মণ রূপধারী পিপ্পল রাক্ষসের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিনীত, অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ শিষ্যের মতো আচরণ করতে লাগলেন। পিপ্পলও তাঁকে

খেয়ে ফেলল। তিনি তার উদরে গিয়ে অন্ত্রসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই সেও মৃত্যু-মুখে পতিত হল। ঋষিরা তখন শনির কাজে প্রীত হয়ে তাঁকে অভিমত বর প্রদান করলেন। শনি তাঁদেরকে বললেন-যে ব্যক্তি সংযত হয়ে শনিবারে অশ্বত্থতীর্থে স্নান করবে, তাদের সকল কার্যসিদ্ধি হবে এবং তারা কখনো আমার কোপদৃষ্টির আওতায় আসবে না। তারপর থেকেই সেই তীর্থ অশ্বত্থ ও পিপ্পল নামে বিখ্যাত হয়। সেখানে শনৈশ্চর, আগস্ত্য, সাত্রিক, যাজ্ঞিক ও সামগ প্রভৃতি আরো অনেক তীর্থ রয়েছে। ওই তীর্থসমূহে স্নান, দান প্রভৃতি করলে সত্রযাগের ফল পাওয়া যায়।

—'অশ্বত্থপ্রভৃতিতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো উনিশ

সোমতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। ওই তীর্থে স্নান, দান প্রভৃতি করলে সোমপানের ফল পাওয়া যায়। তুমি জানো যে, ওষধিসমূহ জগতের মাতা রূপে নির্দিষ্ট। সেই অতি প্রাচীন ওষধিসমূহ আমারও মা। এই ওষধিসমূহে ধর্ম, স্বাধ্যায় ও যজ্ঞধর্ম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই চরাচর বিশ্বকে এঁরাই ধারণ করে থাকেন, এঁরাই রোগ নিরাময়ের কারণ। ওষধিসমূহ আমাকে একদিন বললেন—তুমি আমাদের পতি এবং রাজা প্রদান কর এবং বলে দাও কোথায় গেলে বা কি করলে আমরা আমাদের রাজাকে পাব। আমি তাঁদের বললাম—আপনারা গৌতমী গঙ্গার তীরে গিয়ে গঙ্গার স্তব করুন, তিনি সন্তুষ্ট হলে আপনারা আপনাদের পতি লাভ করতে পারবেন। আমার কথামতো ওষধিসমূহ গঙ্গার স্তব করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন—আপনি যদি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ না হতেন, তা হলে সংসারের লোকেরা দুঃখে কাকে আশ্রয় করত? দেহীরা অতীব ভাগ্যবান, কারণ আপনি তাদের মহাপাপ বিদূরিত করেন। আপনার অত্যুত্তম গুণরাশির জন্যই আপনি শিবের মাথায় ঠাঁই পেয়েছেন। আপনাকে আমরা বারংবার নমস্কার জানাই।

ওষধিদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে গৌতমী তাঁদের অভিমত বর চাইতে বললে তারা বললেন—আপনি আমাদের অধিপতি এবং তেজস্বী রাজা দান করুন। গঙ্গা তখন ওষধিদের বললেন—আমি অমৃতরূপিণী, ওষধিসমূহও অমৃতময়ী, অতএব আমি তোমাদের অমৃতাত্মা সোমকেই পতিরূপে দান করছি। গঙ্গার এই প্রস্তাব ওষধিরা তো বটেই দেবতারা, ঋষিরা এবং সোমও অনুমোদন করলেন। গঙ্গার কথানুসারে তখন থেকেই ওষধিসমূহের অধিপতি হলেন সোম। সেজন্য ওই স্থান 'সোমতীর্থ' নামে বিখ্যাত। ওই তীর্থে স্নান, দান প্রভৃতি করলে অশেষ পুণ্য সাধিত হয়। যে ব্যক্তি এই তীর্থমাহাত্ম্য শোনে বা পাঠ করে সে আয়ুষ্মান, ধনবান ও পুত্রবান হয়।

—'সোমতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো কুড়ি

ধান্যতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। সোমকে অধিপতিরূপে লাভ করে ওষধিসমূহ প্রীত হয়ে লোকসাক্ষাতে অনেক কথা প্রকাশ করেছিল। তারা বলেছিল—বেদবিদগণ কীর্তিত এক বৈদিকী পুণ্য গাথা আছে যে, যে

ব্যক্তি গঙ্গাসমীপে শস্যশ্যামলা ভূমি প্রদান করে, সে সমস্ত অভীষ্ট বস্তুই লাভ করে। যে গোরু, ওষধি প্রভৃতি গঙ্গাসমীপে দান করে সেও সমস্ত অভীষ্ট বস্তু লাভ করে। সোম ওষধিদের রাজা ও অধিপতি এ কথা জেনে যে ব্যক্তি ওষধিদের প্রদান করে সে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। সেই ওষধিসমূহ সোমকে বারংবার বলতে লাগল—যে ব্যক্তি আমাদের গঙ্গায় প্রদান করে, তুমি তাদের উদ্ধার কর এ কথা আমরা জানি। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের হাতে আমাদের প্রদান করে, তুমি তাকে ভবসাগর পার হতে সাহায্য কর। আমাদের নিবেদন এই যে, যে ব্যক্তি এই পবিত্র কথাযুক্ত বৈদিকী গাথা শোনে বা পাঠ করে—তাকেও তুমি মুক্তি-পথে অগ্রসর হতে সাহায্য কোরো। সোম ওষধিদের এই প্রার্থনা অনুমোদন করেন। গঙ্গার তীরে যে জায়গায় ওষধিরা সোমের উদ্দেশে এই কথা বলেছিলেন সেই স্থানের নাম ধান্যতীর্থ। তারপর থেকেই সেখানে ওষধ্য, সোম, অমৃত প্রভৃতি বিভিন্ন তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম প্রভৃতি যা কিছু করা হয়, তা অক্ষয় হয়ে থাকে। এখানে গৌতমীর উভয় তীরে অসংখ্য তীর্থ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

—'ধান্যতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো একুশ

পুরাণজ্ঞগণ বিদর্ভাসঙ্গম এবং রেবতীসঙ্গম নামে দুটি তীর্থের কথা বলেছেন। পুরাকালে ভরদ্বাজ নামে একজন তপোনিষ্ঠ ঋষি ছিলেন। তাঁর একটি বোন জন্মায়, তার আকৃতি ছিল কুৎসিৎ এবং গলার স্বর ছিল বিকৃত। ভরদ্বাজ তার নাম দেন রেবতী। একবার ভরদ্বাজ তাঁর গঙ্গার দক্ষিণতীরস্থ আশ্রমে বসে রেবতীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন, এমন সময় মুনিশ্রেষ্ঠ কঠ যাঁর বয়স ছিল প্রায় একশো কুড়ি বছর তিনি ভরদ্বাজের আশ্রমে এলেন। ভরদ্বাজ তাঁকে বিধিমতো অভিবাদন জানিয়ে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কঠ বললেন আমি আপনার কাছে পুরাণ, স্মৃতি, বেদ এবং অন্যান্য যে সব ধর্মশাস্ত্র আছে, তা অধ্যয়ন করতে এসেছি। দয়া করে আমাকে আপনি ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করুন।

কঠের কথা শুনে ভরদ্বাজ বললেন—তোমাকে আমি সাদরে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করছি। বস্তুত কুলীন, ধার্মিক, গুরুশুশ্রুষারত, শ্রুতিধর শিষ্য অতি পুণ্যবলেই পাওয়া যায়। কালক্রমে কঠের বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হল। বিদ্যালাভের শেষে কঠ ভরদ্বাজকে দক্ষিণা দিতে চেয়ে বললেন—যারা গুরুর কাছে বিদ্যালাভ করে তাঁকে দক্ষিণা দেয় না, তারা অনন্তকাল নরকে বাস করে। ভরদ্বাজ তখন কঠকে বললেন—তুমি যদি গুরুদক্ষিণা দিতেই চাও তবে আমার বোনকে তুমি বিয়ে কর। এই-ই আমার দক্ষিণা প্রার্থনা। ভরদ্বাজের কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত হয়ে কঠ বললেন—শিষ্য সর্বদা গুরুর ভাই ও ছেলের মতো এবং গুরু শিষ্যের কাছে পিতার মতো। এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ কিভাবে স্থাপিত হবে আমি ভেবে পাচ্ছি না। ভরদ্বাজ কঠের কথা শুনে তাকে বললেন—দেখ, শিষ্যের কর্তব্য গুরুর আদেশ পালন করা। সুতরাং রেবতীকে তুমি গ্রহণ কর। ভরদ্বাজের কথামতো কঠ তখন সেই কুরূপা রেবতীকে বিয়ে করলেন। বিয়ে করার পর তিনি ভরদ্বাজের আশ্রমের কাছেই কোন একস্থানে শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর শিবারাধনার উদ্দেশ্য রেবতীর সুরূপ লাভ যদি সম্ভব হয়। কঠের কঠোর তপস্যায়

শিব সন্তুষ্ট হলেন ; তাঁর অনুকম্পায় রেবতী রূপবতী ও সৌন্দর্যশালিনী হয়ে উঠল। গঙ্গার জলে রেবতীকে অভিষিক্ত করা হল। সেই অভিষেকের জল পুনরায় গঙ্গায় মিলে রেবতী নামে এক নদীর সৃষ্টি হল। পবিত্রতা বিধানের জন্য রেবতীকে আবার কুশজল দিয়ে অভিষিক্ত করা হল, সেই জল থেকে যে নদীর উৎপত্তি হল, তার নাম বিদর্ভা। যে ব্যক্তি রেবতী ও গঙ্গানদীর সঙ্গমে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নান করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে এবং পরিণামে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। সেখানে সেই গৌতমী গঙ্গার উভয় তীরে অসংখ্য তীর্থ রয়েছে।

—'তীর্থবর্ণন নামক' অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো বাইশ

গঙ্গার উত্তর তীরে পূর্ণতীর্থ নামে একটি বিখ্যাত তীর্থ আছে। সেই তীর্থে চক্রপাণি বিষ্ণু এবং পিণাকপাণি মহাদেব সততই অবস্থান করেন। আদিকল্পের প্রাক্কালে আয়ুর পুত্র মহারাজ ধন্বন্তরি অশ্বমেধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং বিবিধ ধনরত্ন দান করেন। দীর্ঘ দিন রাজ্যভোগ করার পর সংসারের অসারতা উপলব্ধি করে তিনি সংসার ত্যাগ করলেন। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তিনি তপস্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন।

এদিকে পুরাকালে তম নামে এক অসুর ধন্বন্তরির ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে। সে হাজার বছর ধরে সমুদ্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকার পর ধন্বন্তরিকে তপস্যারত দেখে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এলো। সেই বলবান দৈত্য পূর্বের কথা স্মরণ করে ধন্বন্তরির প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। সে ধন্বন্তরিকে হত্যা করতে চেয়ে সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করল এবং গঙ্গাতীরস্থিত ধন্বন্তরির আশ্রমে গিয়ে পৌঁছল। তাকে দেখে রাজা জিজ্ঞেস করলেন—তোমার পরিচয় কি ? কি জন্যেই বা তুমি এই গভীর বনে এসেছ ? আর কাকে দেখেই বা তোমার এত আনন্দ ? রাজার কথা শুনে সেই রমণীরূপী তম বলল—আপনি যত দিন আছেন, তত দিন আপনাকে ছাড়া আর কাকে দেখে আনন্দ পাব ? ইন্দ্রের যে লক্ষ্মী, আমিই সেই। পুণ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত কেউই আমাকে লাভ করতে পারে না।

ধন্বন্তরি সেই চারুদর্শনা রমণীর কথা শুনে তপস্যা ছেড়ে তাকেই লাভ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তম দেখল যে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, সে তখন সেখান থেকে চলে গেল। এদিকে ধন্বন্তরিকে বরদানের জন্য আমি তার আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলাম। তাকে তপোভ্রষ্ট ও বিহ্বল দেখে আশ্বাস দিয়ে বললাম—তোমার শত্রু তম দৈত্য তোমার তপস্যা নাশ করতে এসেছিল, উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে সে চলে গিয়েছে। এখন শোক করে আর কি হবে ? নারীদের চরিত্রই এই যে তারা মানুষকে আনন্দও দেয় আবার দুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপও করে। ধন্বন্তরি তখন অসহায় হয়ে আমাকে ইতিকর্তব্য বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় আমি তাকে বললাম—তুমি এক কাজ কর ; ভগবান বিষ্ণুর স্তব কর। তিনিই নিখিল জগতের স্রষ্টা ও পরিপালক। তিনিই তোমার সব দুঃখ দূর করতে পারেন। আমার কথা মেনে নিয়ে ধন্বন্তরি হিমালয়ে গিয়ে বিষ্ণুর স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন। ধন্বন্তরি বললেন—তুমিই ধর্ম আবার সৎ এবং অসতের প্রতিমূর্তিও তুমিই। তুমিই কাম দান কর আবার স্বয়ং কামনাও তুমিই। নিখিল মানবের কল্যাণ কামনায় সততই রত ; ভবসমুদ্রের তীরে তাপিত-মানবকে তুমি নিয়ে যাও। তুমিই অন্ন দান কর আবার স্বয়ং অন্নও তুমি। তুমিই যজ্ঞদানকারী আবার

যজ্ঞও বটে। কীর্তি, সুখ, পবিত্রতা সমস্তই তুমি সংসারতাপে জর্জর মানবকুলকে দান করে থাক। জ্যোতির্ময় তুমি সমগ্র বিশ্বব্যেপে বিরাজ কর। ত্রিভুবনের অখিল প্রাণীর ক্লেশ তুমিই দূর করতে সক্ষম।

ধন্বন্তরির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাকে বর প্রদান করতে চাইলেন। ধন্বন্তরি তখন সবিনয়ে বিষ্ণুর কাছে সুররাজ্য প্রার্থনা করলে বিষ্ণু তাকে তাই প্রদান করলেন। বিষ্ণুর বরে ধন্বন্তরি ইন্দ্রত্ব লাভ করলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি অনেক মন্দ কাজ করেছিলেন তাই তাঁর সারা গায়ে সহস্র চক্ষু উৎপন্ন হল এবং তিন তিনবার তিনি ইন্দ্রত্ব থেকে বিচ্যুত হন। তিনি নহুষের কাছে অপমানিত হন, বৃত্রহত্যার পাপে তাঁকে পীড়িত হতে হয়। সিন্ধুসেনের বধ, অহল্যাসম্ভোগ প্রভৃতি বিভিন্ন পাপকর্মের কথা চিন্তা করে তিনি দুঃখিত হয়ে পড়লেন। পরে তিনি বৃহস্পতিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি দেবগুরু, মহাপ্রাজ্ঞ। দয়া করে বলুন, কেন আমি বারংবার রাজ্য থেকে চ্যুত হই? পদ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার চেয়ে মানুষের চিরদারিদ্র্যও ভালো।

বৃহস্পতি ইন্দ্রের কথা শুনে তাকে বললেন—তুমি ব্রহ্মার কাছে যাও, তাঁকে এ বিষয়ে জিগ্যেস কর। তিনিই এর কারণ বলতে পারেন। তারপর ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আমার কাছে এসে আমাকে জিগ্যেস করায় খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম—শোন, খণ্ডধর্ম দোষে এই রাজ্যচ্যুতি ঘটেছে। দেশকাল প্রভৃতির দোষে, যজ্ঞে মন্ত্রের অপ্রয়োগে, যথাযোগ্য দক্ষিণা না দেওয়ায় কিংবা অব্যবহারযোগ্য দ্রব্য দান করলে এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ পাপ কাজের জন্য মানবসমূহের বিহিত প্রারব্ধ কর্ম যে খণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়, সেজন্য সুদুঃসহ মনস্তাপ এবং অনিবার্য পদচ্যুতি ঘটে থাকে। ধর্মকাজ শান্ত এবং সংযতভাবেই করবে, তা না হলে তাতে ইষ্টের স্থলে অনিষ্টই হয়। তোমরা এক কাজ কর; গৌতমী নদীর তীরে গিয়ে ভগবান বিষ্ণু ও শঙ্করের আরাধনা কর। তাঁরা সন্তুষ্ট হলে সমস্ত পাপ দূর করতে পারেন।

আমার কথামতো তাঁরা দুজনেই তখন গৌতমী নদীর তীরে গেলেন। সংযত চিত্তে তাঁরা সেখানে হরি-হরের আরাধনায় রত হলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন—মৎস্যরূপী তোমাকে নমস্কার। নিখিল জগতের তাপ প্রশমনের জন্য তুমি কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন প্রভৃতি রূপে ধারণ করেছিলে। তুমিই বরুণ, ইন্দ্র এবং যমও তুমিই। তুমি সর্বজ্ঞ, তোমার মুখে সর্বদাই সরস্বতী বাস করেন। তোমার বুকে স্বয়ং লক্ষ্মী বাস করেন; সেজন্যই তুমি লক্ষ্মীবান। তোমার শরণ যারা নেয় তাদের কোনো চিন্তা বা দৈন্য থাকে না। বৃহস্পতি শিবকে উদ্দেশ করে বললেন—মুমুক্ষুরা তোমাকে সূক্ষ্ম, অনন্তরূপ, ওঙ্কারাত্মক, চিন্ময় এবং আনন্দময় রূপে উল্লেখ করেছেন। সেই মুক্তিকামীরা প্রাণীসমূহকে সমদৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অজ্ঞানজনিত চিত্তবিকারে অবিচলিত থেকে জ্ঞানপ্রভাবে কর্মফল পরিহার করে ধ্যানের সাহায্যে শেষে তোমাতেই লীন হয়ে থাকেন। বেদশাস্ত্রজ্ঞান, ধ্যানযোগ কিংবা সমাধিধর্ম কোনো কিছুর দ্বারাই তোমাকে পাওয়া যায় না বলেই আমি ভক্তিভরে জগতের মঙ্গলকারী সোমমূর্তি রুদ্রদেবকে নমস্কার করি। পৃথিবীতে যত জ্ঞান, যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি যা কিছু আছে শঙ্করের প্রতি ভক্তির সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা হয় না। পৃথিবীতে যত দৃষ্ট ও শ্রুত ফল আছে তা তোমার প্রতি অবিচল ভক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়। তোমারই মায়ায় মোহিত হয়ে মানুষ তোমায় চিনতে পারে না। তাই আমার প্রার্থনা, আমার ভক্তি থাক আর নাই থাক, তোমার সেবা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। আপন মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে

আমার মতো পাপীর প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমি স্থূল অথচ সূক্ষ্ম, অনাদি, নিত্য, জগতের পিতামাতা, যা সৎ ও যা অসৎ সে উভয়ই তুমি। আমি সোমেশ্বর তোমায় নমস্কার করি।

তাঁদের দুজনের স্তবে হরি ও হর উভয়ে প্রীত হলেন এবং তাদের বর প্রার্থনা করতে বললেন। তখন ইন্দ্র বললেন--আপনারা উভয়ে যদি প্রীত হয়ে থাকেন, তবে যে পাপের জন্য আমি বারংবার ইন্দ্রত্ব থেকে বিচ্যুত হচ্ছি, সেই পাপের ক্ষয় হোক। আমি যাতে রাজ্যে স্থির হতে পারি, সমস্ত ঐশ্বর্য যাতে নিশ্চল হয়, এমন বর প্রদান করুন। ইন্দ্রের কথার উত্তরে হরি ও হর সহাস্যে বললেন—গৌতমী নদীর তীর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রকৃষ্ট আবাসস্থল ; ঐ তীর্থ বাঞ্ছিত ফল দান করে। সেই নদীতে স্নান করুন। বৃহস্পতি ইন্দ্রের মঙ্গলের জন্য আমাদের স্মরণ করে অভিষেক সম্পাদন করুন। —'হে গোদাবরি! আমি এ জন্মে কি অন্য জন্মে যে সব পুণ্য কর্ম করেছি, সে সমস্তই পূর্ণতা লাভ করুক ; তোমাকে নমস্কার'—এই মন্ত্র পাঠ করে যে গৌতমী নদীতে স্নান করে, আমাদের অনুগ্রহে তার সমস্ত অসম্পূর্ণ ধর্মই সম্পূর্ণতা লাভ করে। সে পূর্বজন্মের খণ্ডধর্ম দোষ থেকে মুক্ত হয়।

তারপর ইন্দ্র ও বৃহস্পতি গৌতমী নদীর তীরে গেলেন। বৃহস্পতি যথাবিধি ইন্দ্রের অভিষেক সম্পন্ন করলেন। সেই অভিষেকের জলে 'মঙ্গলা' নামক একটি নদীর উৎপত্তি হল। গঙ্গার সঙ্গে মঙ্গলার সঙ্গমস্থান খুবই পবিত্র। ইন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু সেখানে আবির্ভূত হন। তাঁরই অনুগ্রহে ইন্দ্র ত্রিলোকসমন্বিত গো অর্থাৎ ভূমি লাভ করেন ; হরি তা দান করেন। সেজন্যই বিষ্ণুর নাম হয় গো-বিন্দ। মহেশ্বর বিষ্ণুর কাছ থেকে পাওয়া ইন্দ্রের রাজ্যকে স্থির নিশ্চল করে দেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রের রাজ্যের স্থিরতা সম্পাদনের জন্য যেখানে মহেশ্বরের স্তব করেছিলেন সেখানে 'সিদ্ধেশ্বর' নামে মহাদেব বিরাজ করেন। তারপর থেকেই সেই স্থান গোবিন্দ তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। মঙ্গলাসঙ্গম, পূর্ণতীর্থ, ইন্দ্রতীর্থ, বার্হস্পত্য তীর্থ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এর পরিচিতি রয়েছে। এখানে স্নান, দান প্রভৃতি যা কিছু করা হয় সবই অক্ষয় হয়ে থাকে। এই তীর্থের কথা যে ব্যক্তি পাঠ করে বা শোনে সে সমস্ত তীর্থের ফলই লাভ করে।

'পূর্ণতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো তেইশ

রামতীর্থ নামে এক তীর্থ রয়েছে। এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি স্বনামধন্য, বলবান এবং ইন্দ্রের মতো বীর। পাতালের অধিপতি বলির মতো সুবিচারে তিনি রাজ্য পালন করছিলেন। তাঁর অনেক স্ত্রীর মধ্যে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীই প্রধান। তাঁর পুরোহিত ছিলেন মহামুনি বশিষ্ঠ। রাজ্যে রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই ছিল না। প্রজারা পরম সুখে দিন যাপন করছিল। সে সময় দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে রাজ্যের অধিকার নিয়ে বিবাদ বাধে। কখনো বা দানবগণ কখনো বা দেবতাগণ যুদ্ধে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে লাগল। সেই ঘোরতর যুদ্ধের ফলে ত্রিভুবন পীড়িত হতে লাগল। আমি তখন উভয় পক্ষকেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পরামর্শ দিলাম। কিন্তু কেউই আমার কথায় কর্ণপাত

করল না। দেবতারা দৈত্যদের পরাজিত করতে না পেরে ভগবান বিষ্ণু ও শঙ্করের কাছে এসে সব কথা বলল। সব কথা শুনে তাঁরা দেবতাদের বললেন—শোন, তোমরা তপস্যা দ্বারা বলবান হয়ে পুনরায় যুদ্ধ করলে জয়লাভ করতে পারবে। দেবতারা তখন হরিহরের পরামর্শমতো তপস্যায় নিরত হন এবং তপস্যা শেষ হওয়ার পর আবার দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তা সত্ত্বেও যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণীত হল না। তখন এক আকাশবাণী শোনা গেল যে, রাজা দশরথ যাদের পক্ষে থাকবেন, তারাই যুদ্ধে জয়ী হবে। এই আকাশবাণী শুনে উভয় পক্ষই রাজা দশরথের কাছে ছুটলেন। দেবতাদের মধ্যে বায়ু ক্ষিপ্রগামী। তিনি সবার আগে দশরথের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন—এক আকাশবাণী শুনে আপনার কাছে এসেছি। আপনি দেবতা ও দানবদের মধ্যে যাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন, যুদ্ধে তারাই হবেন জয়ী। আমার অনুরোধ, আপনি দেবতাদের পক্ষে থাকুন, তাহলে দেবতারা জয়ী হতে পারবেন। দশরথ বায়ুর অনুরোধে দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করতে রাজী হলেন।

বায়ু চলে যাওয়ার পর দানবগণ এসে দশরথকে সেই একই কথা বললে তিনি তাদের বললেন—দেখুন, আপনাদের আগে আগে বায়ু এসে আমাকে ওই একই অনুরোধ করায় আমি দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করব বলে কথা দিয়েছি ; সুতরাং আপনারা আসুন। দশরথ প্রতিশ্রুতি মতোই দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। সেই যুদ্ধে দেবতাদের সমক্ষেই নমুচি দানবের ভাইরা তীরের আঘাতে দশরথের রথের অক্ষ অর্থাৎ চাকার মাঝখানের কাঠের ফলক বিদ্ধ করল। রাজা কিন্তু তা জানতে পারেন নি। তিনি দৈত্যসংহারেই রত ছিলেন। রাজার পাশেই রথে বসে ছিলেন কৈকেয়ী, তিনি জানতে পারলেন ব্যাপারটা এবং নিজের হাতটি বাড়িয়ে দিলেন চাকার মাঝখানে। সুতরাং রথের গতি রইল অব্যাহত। দশরথ সেই যুদ্ধে দৈত্যদের পরাজিত করে সসম্মানে ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে। ফেরার পথে কৈকেয়ীকে দেখে তাঁর সন্দেহ হল, জিগ্যেস করে পুরো ব্যাপারটিই জানতে পারলেন। কৈকেয়ীর এই সেবাপরায়ণতায় খুশি হয়ে দশরথ তাঁকে তিনটি বর দিতে চাইলেন। কৈকেয়ী দশরথকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন বরগুলো গচ্ছিতরূপে রাখেন ; ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে কৈকেয়ী তা নেবেন।

দশরথের ছিল মৃগয়ার শখ। সময় পেলেই তিনি মৃগয়া করতে বেরিয়ে পড়তেন। একবার মৃগয়া করতে গিয়ে অনুচরদের সঙ্গে বনে ঘুরতে ঘুরতে তিনি রাতের বেলা সেখানকার একটি জলাশয়কে অবরোধ করে ফেললেন। জলাশয়কে অবরোধ করা নীতি-বিগর্হিত কাজ—এ কথা জেনেও দশরথ জলপান করতে যে সব প্রাণী এলো তাদের সংহার করতে লাগলেন। সেই বনে শ্রবণ নামে এক বৃদ্ধ ঋষি বাস করতেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিল, কানেও শুনতে পেতেন না। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন অন্ধ এবং চলাফেরায় একান্তভাবে অসমর্থ। দশরথ যখন জলাশয় অবরোধ করে প্রাণী সংহারে ব্যস্ত, তখন সেই বৃদ্ধ ঋষি-দম্পতি তাঁদের একমাত্র পুত্রকে বলছিলেন—আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছি। রাত এখনো গভীর এবং অন্ধকারে ছেয়ে আছে চারদিক। আর তুমিও বালক ; তাই বলছিলাম যে সংসারে বৃদ্ধদের জীবন ধারণ কবা কঠিন। যত দিন পর্যন্ত দেহ সুশ্রী এবং দৃঢ় ও সবল থাকে তত দিনই মানুষের বেঁচে থাকা ভালো। তারপরেও যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে তীর্থে গিয়ে প্রাণত্যাগ করাই ভালো। পিতা-মাতার এই দুঃখপূর্ণ কথা শুনে ঋষি-বালক তাঁদের বলল—আমি যত দিন বেঁচে আছি, আপনাদের কোন দুঃখ নেই। পিতা-

মাতার দুঃখ যে দূর করতে পারে না, সে সন্তানের বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এ কথা বলেই সেই ঋষিবালক একটি কলসী হাতে নিয়ে একাকী ঘোর অন্ধকার রাতে জল আনতে চলল। ঋষিকুমার কলসী নিয়ে দশরথ কর্তৃক অবরুদ্ধ সেই জলাশয়ের কাছে এলো। সে যেই জলে কলসী ডুবিয়েছে, অমনি রাজা তাকে হাতী মনে করে তীক্ষ্ণ তীরের ঘায়ে বিদ্ধ করলেন। বুনো হাতী বধ করা ক্ষত্রিয়দের অনুচিত কাজ। দশরথ এ কথা জেনেও হাতী মনে করে সেই ঋষিবালককে তীর বিদ্ধ করলেন। ঋষিকুমার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলল—আমি সদ্‌ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণীরই বন্ধু বলে কথিত। আমি তো কোন অন্যায় কাজও করি নি। কে আমাকে এভাবে তীর বিদ্ধ করল! দশরথ সেই মুনিকুমারের কথা শুনে তার কাছে ছুটে গেলেন এবং তার পরিচয় জিগ্যেস করলেন। তিনি বললেন—কি জন্য আপনি এখানে এসেছিলেন, আমাকে বলুন। ব্রাহ্মণহত্যাকারীরা এতই পাপী যে চণ্ডালগণ পর্যন্ত তাদের স্পর্শ করে না। কি করলে এ থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি, সে কথা বলুন। দশরথের কথা শুনে ঋষিকুমার তাঁকে বলল—দেখুন, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার মৃত্যু হবে : তবু আপনাকে কিছু বলার আছে। স্বেচ্ছাচার, অজ্ঞতা এবং প্রারব্ধ কাজের পরিণাম ভীষণ দুঃখকর। আমি নিজের জন্য দুঃখ করি না, কিন্তু আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ এবং অন্ধ; অথচ আমি তাঁদের একমাত্র পুত্র। কে তাঁদের সেবা-সুশ্রূষা করবে, আমাকে ছাড়া কেমন করে তাঁরা এই অরণ্যে জীবন ধারণ করবেন, সেই চিন্তায় আমি ব্যাকুল। আমাকে তাঁরা জলের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। জলের অভাবে তাঁদের যাতে মৃত্যু না হয়, সেজন্যে আপনি এই কলসীটি নিয়ে শীগগির সেখানে যান। এ কথা বলার পরই সেই ঋষিকুমার প্রাণত্যাগ করল। রাজা তীর-ধনুক পরিত্যাগ করে জলের কলসীটি নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই বৃদ্ধ দম্পতির কাছে পেঁছিলেন। তাঁরা তাঁদের পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় অধীরভাবে প্রহর গুণছিলেন। নানা রকম অমঙ্গলের আশংকায় তাঁদের মন ক্রমশই চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছিল। দশরথের পায়ের শব্দ শুনে তাঁদের মনে হল যে নিশ্চয়ই তাঁদের নয়নের মণি আসছে। তাঁরা পদশব্দকে উদ্দেশ্য করেই বললেন—এত দেরী হল কেন ফিরে আসতে? বৎস, তুমিই আমাদের দৃষ্টিস্বরূপ, একমাত্র অবলম্বন; কেন কথা বলছ না? তুমি কি আমাদের উপর রেগে গিয়েছ? বৃদ্ধ-দম্পতির কথা শুনে দশরথ অনুশোচনা এবং শোকের আগুনে দগ্ধ হয়ে তাঁদের সব কথা জানালেন। রাজার কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে বৃদ্ধ-দম্পতি মূর্ছা গেলেন। রাজার চেষ্টায় তাঁদের চেতনা ফিরে আসার পর তাঁরা রাজাকে বললেন—যেখানে আমাদের সেই নয়নের মণি পড়ে রয়েছে সেখানে আমাদের নিয়ে চল, কিন্তু স্পর্শ করো না; ব্রহ্মহত্যাকারীকে স্পর্শ করলে যে পাপ হয়, সে পাপ কখনো বিনষ্ট হয় না। রাজা তাঁদেরকে সেখানে নিয়ে গেলেন। পুত্রকে মৃত অবস্থায় দেখে তাঁরা দারুণভাবে বিলাপ করতে লাগলেন এবং দশরথকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তোমার জন্যেই পুত্রকে আমরা হারিয়েছি এবং সেই দুঃখেই মৃত্যুকে আমরা বরণ করতে চলেছি। তোমারও পুত্রবিয়োগে মৃত্যু হবে—এ কথা ধ্রুব সত্য। এ কথা বলতে বলতেই তাঁদের মৃত্যু হল। রাজা তখন সেই বৃদ্ধ দম্পতিকে ঋষিকুমারের সঙ্গে অগ্নিসংস্কার করালেন।

রাজধানীতে দশরথ দুঃখিত মনে ফিরে এলেন এবং সমস্ত ঘটনা কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে জানালেন। বশিষ্ঠ অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে পরামর্শ করে দশরথকে বললেন—তোমার এই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এভাবে হতে পারে। তুমি এক অশ্বমেধ

যজ্ঞের আয়োজন কর এবং ঋত্বিকরূপে গালব, বামদেব, জাবালি ও কশ্যপ প্রভৃতি অন্যান্য ঋষিদের নিমন্ত্রণ জানাও। বশিষ্ঠের পরামর্শমতো রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সে সময় আকাশবাণী শোনা গেল যে, রাজা দশরথের শরীর পবিত্র হয়েছে, তিনি এখন সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত। তাঁর পুত্র জন্মাবে এবং তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের সুকর্মের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবেন।

তারপর কালক্রমে দশরথের তিন পত্নীর গর্ভে চারজন পুত্রের জন্ম হল। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হল। বিশ্বামিত্রমুনি একবার রাক্ষসদের উপদ্রব থেকে যজ্ঞ রক্ষা করার জন্যে দশরথের কাছে রাম ও লক্ষ্মণকে চাইতে এলেন। রাজা অত্যধিক স্নেহবশে তাঁদেরকে রাক্ষসদমনে পাঠাতে অস্বীকার করায় বশিষ্ঠ দশরথকে বললেন—মহারাজ, রঘুবংশীয়েরা কখনো প্রার্থীকে বিমুখ করেন না। সুতরাং কথাটা আরেকবার ভেবে দেখুন। দশরথ তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাম ও লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যজ্ঞ রক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। বিশ্বামিত্র খুশি হয়ে তাঁদেরকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন এবং মাহেশ্বরী মহাবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা, লৌকিকীবিদ্যা, রথবিদ্যা, গজবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, আকর্ষণীবিদ্যা এবং আরো অনেক বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন। সেই সব বিদ্যা লাভ করে রাম ও লক্ষ্মণ বনবাসীদের মঙ্গলের জন্যে তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করলেন। তারপর পথে যেতে যেতে পাষাণরূপী অহল্যাকে রাম তাঁর পায়ের স্পর্শে শাপমুক্ত করলেন এবং যজ্ঞস্থলে সমাগত বিঘ্নসৃষ্টিকারী রাক্ষসদের বধ করে যজ্ঞ রক্ষা করলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে পর বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে জনকরাজার রাজসভায় গেলেন। সেখানে সমবেত রাজমণ্ডল মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ বিচিত্র ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শন করলেন। রাজা জনক তাতে প্রীত হয়ে বসুন্ধরা-কন্যা সীতাকে রামের হাতে সম্প্রদান করলেন। রাজা দশরথ তারপর বশিষ্ঠের পরামর্শ নিয়ে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নেরও বিয়ে দিলেন। রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র ; সুতরাং দশরথ তাঁকেই যখন রাজ্য প্রদান করতে উদ্যত হলেন, তখন মন্থরা নামক দাসীর কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী তাতে বাধা ঘটালেন। তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো দশরথের কাছে রামের চোদ্দ বছর বনবাস এবং ভরতের রাজ্যলাভ—এ দুটি বর প্রার্থনা করলেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ভয়ে চরম অনিচ্ছাসত্ত্বেও দশরথ কৈকেয়ীর ইচ্ছাই পূরণ করলেন। ফলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলে গেলেন এবং দশরথ তখন নিদারুণ দুঃখে ব্রহ্মশাপের কথা চিন্তা করতে করতে পুত্র-বিরহে প্রাণত্যাগ করলেন। কৃতকর্মের জন্যে দশরথকে বিভিন্ন নরকে অনেক দিন ধরে কষ্ট ভোগ করতে হল। এদিকে বনবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে প্রথমেই রাম চিত্রকূট পর্বতে এসে পৌঁছলেন, সেখানে তিনি তিন বছর কাটালেন। পরে তিনি দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে দৈত্য ও রাক্ষসগণ ঋষিদের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। রাম ও লক্ষ্মণ তাদের হত্যা করলেন, যজ্ঞ নির্বিঘ্ন হল। রাম এভাবে চলতে চলতে ক্রমে পাঁচ যোজন পথ অতিক্রম করে গৌতমী নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন। এদিকে রাজা দশরথ তখনও নরকে রয়েছেন। যম তখন তাঁর দূতদের ডেকে বলেলন—দেখ, দশরথের পুত্র রাম গৌতমী নদীর দিকে যাচ্ছেন ; তিনি গৌতমীর তীরে পৌঁছনোর আগেই রাজাকে তোমরা নরক থেকে অন্যত্র সরিয়ে দাও। শিবস্বরূপ ঈশ্বরের যে এক নিত্য পরাশক্তি রয়েছে, পণ্ডিতগণ তাঁকেই জলাকারে পরিণত গৌতমীরূপী বলে উল্লেখ করে থাকেন। সেই গৌতমীকে বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা পর্যন্ত পূজা করে থাকেন। মানুষ যতই পাপী হোক না

কেন, সে যদি গঙ্গাকে স্মরণ করে তাহলে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। বিশেষত যার রামের মতো পুত্র গৌতমী নদীর কাছেই থাকে, তাকে নরকে নির্যাতিত করার শক্তি কারুরই নেই।

যমদূতেরা যমের আদেশ মেনে দশরথকে নরক থেকে অন্যত্র নিয়ে এলে তিনি তার কারণ জিগ্যেস করলেন। একজন দূত রাজাকে বলল—বেদ ও পুরাণ প্রভৃতিতে এই তত্ত্ব যদিও সযত্নে গুপ্ত রয়েছে, তবু আপনার পুত্র ও তীর্থের কথা বলছি, শুনুন। আপনার পুত্র শ্রীমান রাম গৌতমী নদীর তীরে এসেছেন, সেজন্যই আপনি ঘোর নরক থেকে পরিত্রাণ পেলেন। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যদি সেই গৌতমীতে স্নান করে আপনার উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন, তবেই আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন এবং স্বর্গে যেতে পারবেন। দূতের কথা শুনে দশরথ তাঁদের অনুমতি নিয়ে, রাম ও লক্ষ্মণকে পিণ্ডদান প্রভৃতির কথা বলার জন্য গৌতমীর দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে গৌতমী নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে স্নান করলেন। সেদিন গৌতমীতটে তটবাসী জনগণের খাওয়ার মতো কোনো কিছুই ছিল না। তাই দেখে লক্ষ্মণ রামকে বললেন—আমরা মহারাজ দশরথের পুত্র; তাহলেও আমাদের এখন এমন সামর্থ্য নেই যে নিজেদের এবং গঙ্গাতীরবাসী জনগণের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করি। লক্ষ্মণের কথা শুনে রাম বললেন—ভাই, বিধিবিহিত যে কর্ম, কোনমতেই তার অন্যথা হয় না। নতুবা পৃথিবী অন্নে পূর্ণ হলেও আমরা অন্নের কাঙাল কেন? নিশ্চয়ই আমরা ব্রাহ্মণমুখে হোম করি নি। যারা অবজ্ঞাবশে ব্রাহ্মণদের পূজা করে না, তারা সর্বদাই বুভুক্ষিত হয়ে থাকে। স্নান করে অগ্নিতে হোম করা কর্তব্য। তাহলে উপযুক্ত সময়ে পিতা আমাদের খাদ্যবিধান করবেন। রাম ও লক্ষ্মণ যখন এভাবে কথোপকথনে রত, তখন দশরথ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মৃত্যুর পর পূর্বের দুষ্কর্মের জন্য তাঁর আকৃতি হয়েছিল বিকট ও ভীষণ। লক্ষ্মণ বিকটাকার দশরথকে দেখামাত্রই ক্রোধে ধনুকে টান দিয়ে বলে উঠলেন—তুই রাক্ষস বা দানব বা যেই হোস না কেন, আর এগোবি না। এখানে দশরথ-তনয় পুণ্যাত্মা রামচন্দ্র রয়েছেন; এই সত্যসন্ধ ধার্মিক রাম যেখানে থাকেন, সেখানে তোদের মতো পাপীদের কোন প্রবেশাধিকার নেই। কাছে এলেই তোকে হত্যা করব। দশরথ পুত্রের মুখে এ রকম কথা শুনে খুবই দুঃখিত হয়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে বললেন—আমি রাজা দশরথ। আমার কথা শোন। তিন-তিনটি ব্রহ্মহত্যার জন্য আমিই দায়ী। সেজন্য নরকে আমাকে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে।

দশরথের কথা শুনে তিনজনই ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে ব্রহ্মহত্যার কথা জানতে চাইলেন। দশরথ তাঁদের কাছে সমস্ত ঘটনাই খুলে বললেন। সমস্ত কথা শুনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা খানিকক্ষণের জন্য মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সীতা তখন রামকে উদ্দেশ করে বললেন—আপনার মতো মহাত্মারা ব্যসনাগমে শোক করেন না। ব্যসন দৈবকৃত হোক বা মানবকৃতই হোক, তার প্রতিকারই চিন্তা করা উচিত। শোক করলে তো আর বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। আপনি বরং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ আমাদের সমর্পণ করুন। প্রথমত পিতৃভক্ত, পুণ্যশীল, বেদজ্ঞ যে ব্রাহ্মণ বিনাপরাধে নিহত হয়েছে, সেই পাপের ভার আমাকে ন্যস্ত করুন। দ্বিতীয় ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের ভার লক্ষ্মণ গ্রহণ করুন আর তৃতীয়টি আপনি গ্রহণ করুন। সীতার এ রকম যুক্তিযুক্ত কথা শুনে দশরথ তাঁর প্রশংসা করে বললেন—শোন, তোমরা যা করলে আমার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ

বিদূরিত হবে, সে-কথা বলছি। গৌতমীতে স্নান, দান ও পিন্ড প্রদান করলেই আমি ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গে যেতে পারব।

পিতার কথা শুনে রাম পিণ্ডদানের জন্য তৎপর হলেন। কিন্তু পিণ্ডদানের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন অথচ রাম চেষ্টা করেও তা সংগ্রহ করতে পারলেন না। তখন লক্ষ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। লক্ষ্মণ বললেন—উত্তম ভোজ্যদ্রব্য না পাওয়া গেলেও ইঙ্গুদীফলের টাটকা নির্যাস এনেছি, তাই দিয়ে পিণ্ডদানের কাজ সম্পন্ন করা যাক। রাম কিন্তু ইঙ্গুদী-ফলের নির্যাস দিয়ে পিতার পিণ্ডদান করতে হবে ভেবে দুঃখিত হলেন। তখন এক আকাশ-বাণী শোনা গেল—দুঃখ করবেন না। আপনি রাজপুত্র এবং ধর্মরত হলেও এখন রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী এবং অকিঞ্চন। সুতরাং এক্ষেত্রে শোক করা উচিত নয়। ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যে ব্যক্তি ধর্ম আচরণ করে, সে-ই পাপী হয়। সমস্ত শাস্ত্রে যে বিধান শুনতে পাওয়া যায়, তা শুনুন। মানুষেরা যখন যা খায়, তাদের দেবতারাও সেই অন্নেই তৃপ্ত হন।

দৈববাণী শুনে তাঁরা সেখানে পিতার শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান করলেন। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হলে পর দশরথকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তখন সেখানে নিজের নিজের বিমানে আরোহণ করে লোকপালগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এসে উপস্থিত হলেন। সেই দেবতাদের মধ্যে উজ্জ্বল আকৃতি নিয়ে দশরথ ছিলেন বটে, কিন্তু রাম তাঁকে চিনতে না পেরে তাঁদের জিগ্যেস করলেন—আপনাদের মধ্যে তো আমার পিতাকে দেখতে পাচ্ছি না, তিনি কোথায়? ঠিক সেই সময় সীতা ও রামকে সম্বোধন করে এক আকাশবাণী উচ্চারিত হল যে, রাজা দশরথ সমস্ত ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। এই দেখ, দেবতারা তাঁকে বরণ করে নিচ্ছেন। দেবতারা তখন রামকে বললেন-তুমিই পৃথিবীতে ধন্য, তুমি কৃতকৃতার্থ হলে। যে বংশধর পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করে, তারাই জগতে ধন্য। রাজা দশরথ রামকে আশীর্বাদ করে বললেন—তোমার জন্যই আমি নরক থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। সেই পুত্রই ধন্য, যে পিতামাতাকে ত্রাণ করে। রাম তখন দেবতাদের বললেন-আপনারা দয়া করে বলে দিন, পিতার ব্যাপারে আর কোন কর্তব্য আমাদের সম্পাদন করতে হবে কিনা। দেবতারা বললেন—তুমি পূর্বপুরুষদের পরিত্রাণ-ব্যাপারে যাবতীয় কর্তব্যই সম্পাদন করেছ। দেখ, গঙ্গার মতো নদী নেই, তোমার মতো পুত্র নেই, শিবের মতো দেবতা নেই, ওঁ-কারের মতো মন্ত্রও নেই। তোমার পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার লাভ করেছেন, তুমিও রাজ্যপালন কর।

রাম তারপর লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে সেই পতিতপাবন গৌতমীগঙ্গার তীরে শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন এবং ষোড়শোপচারে পূজা করলেন ভগবান উমাপতিকে। রাম ভক্তিগদগদ-চিত্তে শিবের উদ্দেশে এই স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করলেন—তুমি পুরাণপুরুষ, সর্বজ্ঞ, রোগের নিরাময়কারী, বিশ্ববৃক্ষের বীজস্বরূপ—তুমি যজ্ঞেশ্বর। সম্যকভাবে তোমার আরাধনা করলে তুমি বাঞ্ছিত ফল দান করে থাক। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা যাঁকে নমস্কার করেন শ্রদ্ধাসহকারে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বরগণ যাঁর কৃপালাভে সততই সচেষ্ট সেই স্বাধীন স্বয়ম্ভু শংকরকে প্রণাম নিবেদন করি। রামের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শিব সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং রামকে বর দিতে চাইলেন। রাম শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান শংকরকে বললেন-হে ভবেশ, আমার প্রার্থনা এই যে, এই স্তোত্র পাঠ করে যারা তোমার পূজা করবে, তাদের পিতৃপুরুষ যদি নরকেও পতিত হয়, তবু যেন তারা পবিত্র হয়ে স্বর্গে যেতে পারে।

এখানে যারা স্নান করবে, তাদের সমস্ত পাপ যেন বিনষ্ট হয়। ভগবান শংকর রামের প্রার্থনা অনুমোদন করে চলে গেলেন। রাম তাঁর অনুচরদের সঙ্গে গৌতমীগঙ্গার উৎসের দিকে চলতে লাগলেন। তারপর থেকেই ওই স্থান 'রামতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। পথে যেতে যেতে যেখানে লক্ষ্মণের হাত থেকে বাণ পড়ে গিয়েছিল, তা বাণতীর্থ নামে অভিহিত হল। লক্ষ্মণ যেখানে স্নান ও শংকরের অর্চনা করেছিলেন সেই স্থান লক্ষ্মণ-তীর্থ নামে পরিচিত এবং সীতা ও শংকরের পূজা যেখানে করেছিলেন, সে স্থান সীতা-তীর্থ নামে বিখ্যাত। এই তীর্থসমূহ পবিত্র এবং এখানে স্নান করলে মানুষ বাঞ্ছিত ফল লাভ করে।

—'রামতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ একশো চব্বিশ

তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—এবার তোমাকে পবিত্র পুত্রতীর্থের কথা শোনাব। এই পুত্রতীর্থ পুণ্যতীর্থ নামেও অভিহিত।

পুরাকালে দেবতা ও দৈত্য দানবদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবতারা দৈত্য এবং দানবদের পরাজিত করেন। দৈত্যদের মা দিতি পুত্রবিয়োগ দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। দেবতাদের মাতা অদিতি ছিলেন তাঁর সপত্নী দানবমাতা দনুও তাই। সেই যুদ্ধে দৈত্য এবং দানব উভয়েই পরাজিত হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই দেবতাদের হাতে নিহত হয়। দিতি দনুর কাছে এসে নিজের দুঃখের কথা বলেন—দেখ দনু, অদিতির পুত্রেরা কেমন দিন দিন সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে। আর তোমার এবং আমার পুত্রগণ দুঃখে ম্লান হয়ে পড়েছে। সপত্নীর সমৃদ্ধি স্বপ্নেও দেখতে কষ্ট হয়। দিতি এবং দনুর মধ্যে যখন এ রকম কথাবার্তা চলছে দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি দিতি ও দনুকে প্রণাম করে সবিনয়ে বললেন—দেখুন, আপনাদের দুঃখ করা সঙ্গত কর্ম নয়। প্রাণীদের যা ঈপ্সিত বস্তু, তা পুণ্যকর্মের দ্বারাই লাভ করা যায়। প্রজাপতি কশ্যপ সমস্ত কিছুই জানেন।

তখন দনুর পরামর্শে দিতি সমস্ত রকম সেবা শুশ্রূষার দ্বারা কশ্যপকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করলেন। কশ্যপ দিতির সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হয়ে দিতিকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। দিতি সবিনয়ে কশ্যপকে বললেন—আমাকে এমন একটি পুত্রসন্তান দাও যে সমস্ত লোককে জয় করতে পারবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে পরিগণিত হবে। কশ্যপ দিতির প্রার্থনা শুনে তাঁকে বললেন—শোন, পুত্রলাভ করতে হলে তোমাকে একটি ব্রত পালন করতে হবে। বারো বছর ধরে নিয়মপূর্বক এই ব্রত পালন করলে সম্যক ভাবে ফল প্রদান করে। ব্রত পালন শেষ হলে আমি এসে তোমার গর্ভাধান করব। সর্বপ্রকারে নিষ্পাপ থাকতে পারলে মনোরথ সিদ্ধ হয়। কশ্যপের কথামতো দিতি নিয়মমাফিক ব্রত পালন করতে লাগলেন। ব্রত পালন সমাপ্ত হলে পর কশ্যপ একদিন দিতিকে ডেকে বললেন—দেখ, তপস্যানিরত মুনিরাও অবহেলা বশত কর্মাঙ্গের বিকলতার জন্য বাঞ্ছিত কামনালাভে অসমর্থ হন ; অতএব নিন্দনীয় কার্য, সন্ধ্যার সময়ে শোওয়া বা কোথাও যাওয়া, হাই-তোলা এবং খোলা-চুলে কোথাও বসা—এ সব তুমি একেবারে পরিত্যাগ করবে। সন্ধ্যায় প্রাণীরা ইতস্তত বিচরণ করে থাকে ; সে সময় হাসলে মুখ ঢেকে হাসা উচিত।

উত্তর দিকে মাথা করে কখনোই শোবে না। সন্ধ্যাবেলা মিথ্যা কথা বলা বা অন্য কারোর বাড়ি যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে কখনোই সেভাবে দেখবে না, যা নিন্দনীয় বলে গণ্য হতে পারে। যদি তুমি এই নিয়মসমূহ পালন করে থাকতে পারো, তাহলে তুমি ঈপ্সিত পুত্র লাভ করতে পারবে। কশ্যপ দিতিকে এ সব উপদেশ দেওয়ার পরই বিশেষ কাজে দূরে কোথাও চলে গেলেন। দিতি নিয়ম পালন করে দিন যাপন করতে লাগলেন। দিতির গর্ভস্থ শিশুও ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল।

ময়-দানব মায়াপ্রভাবে এ সমস্ত ঘটনাই জানত। ময়ের সঙ্গে ইন্দ্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সে ইন্দ্রকে সমস্ত কথা জানাল। ব্রহ্মাকে থামিয়ে দিয়ে নারদ জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা, নমুচিদানবের ভাই তো ময়-দানব। সেই নমুচিকে ইন্দ্র নিহত করেন। তো ভ্রাতৃহন্তা ইন্দ্রের সঙ্গে ময়-দানবের বন্ধুত্ব কি ভাবে হল? নারদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—পুরাকালে বলবান নমুচি দৈত্যদের অধিপতি ছিল। ইন্দ্রের সঙ্গে নমুচির ভীষণ যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পালিয়ে যান; নমুচিও তাঁর অনুগমন করে। ইন্দ্র নমুচিকে পিছনে আসতে দেখে সমুদ্রফেনার মধ্যে ঢুকে যান। নমুচি ইন্দ্রকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে ইন্দ্র সেই ফেনা দিয়েই তাকে সবেগে আঘাত করলেন, সেই ফেনার আঘাতেই নমুচি নিহত হয়। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ময়-দানব তখন কঠোর তপস্যা আরম্ভ করে। নিরন্তর অগ্নি ও ব্রাহ্মণের পূজা করে তাঁদের অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয়। বিষ্ণুর অনুগ্রহে সে বিবিধ বর এবং দেবতাদেরও ভয়জনক বিবিধ মায়া লাভ করে। ইন্দ্রকে জয় করার অভিপ্রায়ে সে যুদ্ধসজ্জা করে অর্থীদের ধন বিতরণ করতে লাগল। এই কথা জানতে পেরে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে সেই ময়-দানবের কাছে এসে বারবার বলতে লাগলেন—আমি সদ্ ব্রাহ্মণ, আমাকে বাঞ্ছিত বর দান করুন। ময় সেই বর দান করার প্রতিশ্রুতি দিলে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র বললেন—আমি তোমার বন্ধুত্ব কামনা করি। ব্রাহ্মণের এই বিচিত্র প্রার্থনায় ময় বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিগ্যেস করল—সত্যি করে বলুন, আপনি কে? আর আপনার এই বিচিত্র প্রার্থনারই বা অর্থ কি? ইন্দ্র তখন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করলেন। ময় বিস্মিত হয়ে বলল—বন্ধু ইন্দ্র, এ কাজ তোমার অযোগ্য। তুমি আমাকে ছলনা করলে। ইন্দ্র তখন ময়কে আলিঙ্গন করে বললেন—দেখ, পণ্ডিত ব্যক্তিরাও যেন তেন প্রকারে কার্য সাধন করে থাকেন সুতরাং তুমি দুঃখ করো না; তোমার সঙ্গে আমার কোন দিনই বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হবে না। তারপর থেকেই পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। হ্যাঁ, তোমাকে যা বলছিলাম, ময় সমস্ত কথা ইন্দ্রকে জানাল। ইন্দ্র তখন ময়কে কর্তব্য বিষয়ে জিগ্যেস করলেন। ময় তাঁকে বলল—তুমি অগস্ত্যের আশ্রমে যাও। সেখানে গর্ভবতী দিতি রয়েছেন। তুমি সেখানে গিয়ে তাঁর সেবা শুশ্রূষা কর; তারপর সুযোগ বুঝে দিতির গর্ভে প্রবেশ করে সেই গর্ভকে বজ্র দিয়ে কেটে ফেলবে। তাহলে তোমার শত্রু আর জন্মলাভ করতেই পারবে না।

ময়ের পরামর্শমতো ইন্দ্র অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে দিতির সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন; কিন্তু গর্ভে প্রবেশ করার মতো সুযোগ আর ঘটল না। একদিন সন্ধ্যার সময় দিতি দেবী উত্তর দিকে মাথা করে শুয়ে ছিলেন, এমন সময় ইন্দ্র বজ্র হাতে নিয়ে দিতির গর্ভে প্রবেশ করলেন। কারণ, কশ্যপের নির্দেশ দিতি লঙ্ঘন করেছিলেন উত্তর দিকে মাথা করে শুয়ে। ইন্দ্র যখন তাঁর গর্ভে প্রবেশ করলেন তখন সেই গর্ভস্থ বালক তাঁকে বধোদ্যত দেখে বললেন—আমি তোমার ভাই। ভাইকে হত্যা করা কি তোমার মতো লোকের পক্ষে উচিত

কাজ? বিশেষ করে আমি অস্ত্রহীন আর এটা যুদ্ধক্ষেত্রও নয়। যদি সত্যিই তোমার যুদ্ধের সাধ হয়ে থাকে, তবে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য কর; তারপর অবশ্যই তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। যাঁরা মহান, তাঁরা বিপন্ন হলেও কখনো কুমার্গে প্রবৃত্ত হন না। এই নিরস্ত্র এবং অসহায় অবস্থায় একজন বালককে হত্যা করলে তোমার পৌরুষ কি ম্লান হয়ে যাবে না? ইন্দ্র কিন্তু সেই বালকের কোন কথায় কর্ণপাত না করে বজ্র দিয়ে তাকে সাত ভাগে কেটে ফেললেন। তবুও সেই খণ্ডগুলো বলতে লাগল—ইন্দ্র, এমন নিষ্ঠুর কাজ কোরো না; আমরা তোমার ভাই। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে সেই সাতটি খণ্ডের প্রত্যেকটিকে আবার সাত সাতটি খণ্ডে কেটে ফেললেন। সেই গর্ভ এভাবে ঊনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হয়েও মরল না বরং প্রত্যেক খণ্ডেই আলাদা আলাদা হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজিয়ে উঠল। তারা তখনো কেঁদে কেঁদে ইন্দ্রকে বারবার বলছিল- আমাদের মেরো না ইন্দ্র, আমরা তোমার ভাই। ইন্দ্র তখন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'মা রুত', কেঁদো না—এ থেকেই তারা মরুৎ নামে পরিচিত হয়। ঐ মরুৎগণ বলীয়ান এবং নির্ভীক। তারা তখন মহামুনি অগস্ত্যকে গিয়ে বলল—আমাদের পিতা আপনার ভাই, আপনার বন্ধুত্বকে তিনি সম্মানীয় বলে মনে করেন। আমাদের উপরেও আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে—এ কথা আমরা জানি। চণ্ডালও যে কাজ করে না, ইন্দ্র সে কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। সমস্ত কথা শুনে অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন—তুমি যে জঘন্য কাজ করেছ, সেজন্য চিরকালই শত্রুরা যুদ্ধে তোমার পৃষ্ঠ দর্শন করবে। যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নকালে শত্রুরা যে পৃষ্ঠ দর্শন করে, মানীদের পক্ষে এটাই মৃত্যুর মতো। দিতিও ইন্দ্রকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তুই পুরুষের মতো কাজ করিস নি; সেজন্যই বলছি, স্ত্রীলোক কর্তৃক অপমানিত হয়ে তুই রাজ্য হারাবি।

এদিকে প্রজাপতি কশ্যপের কানে সমস্ত কথাই উঠল। তিনি পুত্রের আচরণে ব্যথিত হলেন। কশ্যপ তখন অগস্ত্যের আশ্রমে যেখানে দিতি বাস করছিলেন, সেখানে এসে পৌঁছলেন। ইন্দ্র কিন্তু অগস্ত্য এবং দিতির ভয়ে গর্ভ থেকে বেরোতে পারছিলেন না। কশ্যপ তাঁকে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন এবং নিন্দিত কাজের জন্য তিরস্কৃত করলেন। ইন্দ্র পিতা কশ্যপ, মহামুনি অগস্ত্য এবং বিমাতা দিতির সামনে লজ্জায় নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকে সৎ বা অসৎ যে কাজই করুক না কেন, তার আকৃতি এবং মুখমণ্ডল তার সাক্ষ্য দেয়। ইন্দ্র নতমস্তকে পিতা কশ্যপকে বললেন—আমি মোহবশে দুষ্কর্ম করে ফেলেছি। এখন আপনি যা বলবেন, সেই অনুযায়ীই কাজ করব। প্রজাপতি কশ্যপ তখন লোকপালগণ এবং দেবতাদের সঙ্গে আমার কাছে এসে সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। তারপর দিতির গর্ভশান্তি, ইন্দ্রের শাপমোচন, গর্ভস্থ বালকদের সঙ্গে ইন্দ্রের বন্ধুত্ব, অগস্ত্যের শাপপরিহার—এ সব বিষয়েই কিভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব তা জিগ্যেস করলেন। আমি তখন প্রজাপতি কশ্যপকে বলেছিলাম—তুমি বসু ও লোকপালগণের সঙ্গে ইন্দ্রকে নিয়ে শীগগির গৌতমী গঙ্গার তীরে যাও। সেখানে সকলে মিলে স্নান করবে, তারপর দেবাদিদেব মহাদেবকে স্তব করবে; তাহলে শিবের প্রসাদে তোমাদের সমূহ কল্যাণ সাধিত হবে।

আমার কথামতো কশ্যপ এবং লোকপালগণ সেখানে গিয়ে মহাদেবের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। কশ্যপ বললেন—তুমিই আদি দেব, সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি স্থানও তুমিই। ঘোর সংসার কান্তারে বিচরণকারী শরীরিগণের তুমিই একমাত্র সহায়। তোমাকে আমরা

নমস্কার করি। কশ্যপের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব সেখানে আবির্ভূত হলেন। কশ্যপ ইন্দ্রের আচরণের কথা সবিস্তারে বলে সমস্ত বিষয়ের যাতে শুষ্ঠু সমাধান হয় তার উপায় করে দিতে মহাদেবকে অনুরোধ করলেন। দেবাদিদেব পরে দিতিকে বললেন—তোমার পুত্রগণ উনপঞ্চাশ সংখ্যক 'মরুৎ' নামে অভিহিত হবে ; তারা সবাই ঐশ্বর্যশালী এবং যজ্ঞভাগী হবে। ইন্দ্রের সঙ্গে সানন্দে তারা দিন কাটাবে। যেখানে যেখানে যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ থাকবে, সেখানে সেখানেই মরুদ্‌গণের ভাগ কল্পিত হবে। ইন্দ্র যখন মরুদ্‌গণের সঙ্গে বিরাজ করবে তখন শত্রুরা তাঁকে কখনোই পরাজিত করতে পারবে না। আজ থেকে যে কেউ অন্যায় রূপে ভ্রাতৃহত্যা করবে, তাদের সর্বদাই বংশহানি এবং পদে পদে বিপত্তি ঘটবে। শিব তারপর অগস্ত্যকে বললেন—ইন্দ্রের উপর তুমি ক্রুদ্ধ হোয়ো না, শান্ত হও মরুদ্‌গণ অমর হয়েছে ; সুতরাং তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। ভগবান শঙ্কর দিতিকে উদ্দেশ করে পুনরায় বললেন—তুমি তো ব্রত পালন করে পুত্র কামনা করেছিলে তোমার অনেক পুত্র জন্মেছে। তারা বলবান, ঐশ্বর্যশালী এবং গুণবান। অতএব তোমার দুঃখের কোন কারণ নেই। তুমি নিঃসংকোচে আমার কাছ থেকে আরও বর প্রার্থনা কর। দিতি তখন ভগবান শঙ্করকে প্রণাম করে বললেন—তোমার কৃপায় আমার গর্ভজাত পুত্রেরা অমর হয়েছে এ কথা সত্যি, তবে একটি গুণবান পুত্র হলে যে কী সুখ হত, তা কেমন করে বলি। যাক, যাতে জগতের মঙ্গল হয়, সে-রকম ব্যবস্থা তুমি হয়তো করেছ। তবে আমার প্রার্থনা এই যে, এখানে স্নান করলে মানুষ যেন গুণবান পুত্র লাভ করে। শিব তখন বললেন—অপুত্রক হওয়া মহাপাপেরই ফল। এখানে স্নান করলেই সে দোষ ঘুচে যাবে। এখানে স্নান করে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ পাত্রে ফল দান করে কশ্যপকৃত এই স্তোত্র পাঠ করবে, তিন মাসের মধ্যেই সে বাঞ্ছিত পুত্র লাভ করবে। পুত্রহীনা রমণীও এখানে স্নান করলে পুত্র লাভ করতে পারবে। ঋতুস্নানের পর এখানে যে নারী স্নান করবে, সে বহু পুত্রবতী হবে। গর্ভবতী রমণী যদি এখানে ভক্তিভরে বহু ফল অভাবে তিল দিয়েও স্নান করে আমাকে দর্শন করে এবং কশ্যপকৃত এই স্তোত্রে আমাকে স্তব করে, তবে তার ইন্দ্রের মতো পুত্র উৎপন্ন হবে। যারা কোন কারণে পুত্রলাভ করতে পারে না, তারা যদি বিধিমতো স্নান করে পিতৃগণের পিণ্ড দান করে এবং কিছু সোনা দান করে, তাহলে নিশ্চয়ই তার পুত্র হবে। যারা অপরের গচ্ছিত বস্তু কাছে রেখেও মিথ্যাচরণ করে, যারা রত্ন চুরি করে কিংবা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পিতৃকর্ম করে না, তাদের কখনই বংশবৃদ্ধি হয় না। আজ থেকে এই স্থানের নাম হল দিতি গঙ্গা। ব্রহ্মচারী হয়ে প্রতিদিন যারা এই দিতি গঙ্গার সঙ্গমে স্নান করে এই গৌতমী গঙ্গার তীরে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের যথোপচারে পুজো করবে এবং চতুর্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে সোনা দান করে ব্রাহ্মণদের খাওয়াবে, তারা শত পুত্র লাভ করতে পারবে এবং সমস্ত সুখ ভোগ করার পর শেষে শিবলোকে যেতে পারবে। যে কোনো ব্যক্তি যে কোন স্থানে এই স্তোত্র পাঠ করে আমার স্তব করবে, সে অবশ্যই পুত্র লাভ করতে পারবে।

তারপর থেকেই এই তীর্থ 'পুত্রতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এখানে মরুদ্‌গণের সঙ্গে ইন্দ্রের মিত্রতা ঘটেছিল বলে, এই স্থান মিত্রতীর্থ নামেও পরিচিত হয়। শত্রু এখানে নিষ্পাপ হয়েছিলেন বলে, একে শত্রুতীর্থও বলা হয়। গৌতমীতীরে এমনি অনেক পবিত্র তীর্থ আছে।

—'পুত্রতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো পঁচিশ

যমতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে, এবার সেই তীর্থের কথাই তোমাকে শোনাব। পুরাকালে অনুহ্রাদ নামে একটি কপোত তার স্ত্রী হেতির সঙ্গে গোতমী গঙ্গার উত্তরতীরে বাস করত। অনুহ্রাদ যমের পৌত্র আর হেতি যমের দৌহিত্র। কালক্রমে তাদের অনেক সন্তান-সন্ততি জন্মায়। গঙ্গার দক্ষিণতীরে উলূক নামে আরেকটি পাখি তার সন্তান-সন্ততি সহ বাস করত। উভয়ের মধ্যে প্রবল শত্রুতা ছিল। উলূকেরা ছিল অগ্নির বংশধর, তাই তারা আগ্নেয় নামে পরিচিত হয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘদিনব্যাপী এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু সেই যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণীত না হওয়ায় অনুহ্রাদ নামক কপোতটি যমের আরাধনা করে উত্তম অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে ; এদিকে উলূকও অগ্নির উপাসনা করে অত্যন্ত বলবান হয়ে ওঠে। যম ও অগ্নির বরে বলীয়ান হয়ে উভয়েই ঘোরতর যুদ্ধ করতে লাগল। একে অপরের প্রতি দেবদত্ত অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করল। কপোতপত্নী হেতি উলূক কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নিময় শরকে আসতে দেখে বিশেষত পুত্রদের সেই অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল এবং দুঃখিত হৃদয়ে অগ্নির স্তব করতে লাগল। হেতি বলল—যাঁর রূপ নেই, কোন পরোক্ষ বিষয় নেই, জগতের যাবতীয় পদার্থই যাঁর আত্মভূত এবং যিনি দেবতাদের মুখস্বরূপ, সেই যজ্ঞভুক স্বাহাপতিকে আমি নমস্কার করি। তিনি দেবতাদের হোতা, তিনি প্রাণীদের অন্তরে প্রাণরূপে এবং বহির্ভাগে অন্নদাতারূপে বিরাজ করেন, তাঁকে বারংবার নমস্কার জানাই। কপোতপত্নীর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে অগ্নি তাকে বললেন—দেখ, যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত আমার এই অস্ত্র অমোঘ ; সুতরাং এমন কোন স্থান নির্দেশ কর, যেখানে গিয়ে এই অস্ত্রসমূহ কাউকে আঘাত না করেই পতিত হয়। হেতি তখন বলল—দেখুন, আমার পতি বা পুত্রকে আপনার অস্ত্র যেন আঘাত না করে, আপনার অস্ত্র আমাকে বরং আঘাত করুক। হেতির কথায় সন্তুষ্ট হয়ে অগ্নি তাকে বললেন—তোমার কোন ভয় নেই, আমার এই আগ্নেয় অস্ত্র তোমার পতিকে কিংবা পুত্রদের কোন ক্ষতি করবে না।

এদিকে উলূকের পত্নী উলূকীও নিজের পতিকে যমের পাশঅস্ত্রে পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখে ভীত হল এবং যমের স্তব করতে লাগল। উলূকী বলল—প্রভু, জনগণ আপনারই ভয়ে কর্মমার্গে প্রবৃত্ত হয়, আপনার ভয়েই ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে। পণ্ডিতগণ আপনার ভয়েই সংকর্ম করেন এবং আপনার ভয়েই সোমপান এবং বেদ উচ্চারণ করে থাকেন। উলূকীর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে যম তাকেও অগ্নির মতোই সেই একই কথা বললেন। হেতির মতো উলূকীও সেই একই কথা বললে যম তার পতি ও পুত্রদের সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত করে দিলেন। পরে যম ও অগ্নি উভয়ে মিলে অনুহ্রাদ ও উলূককে বললেন—তোমরা পরস্পর মিত্রভাবে বসবাস কর। তোমাদের আনুগত্য আমাদের মুগ্ধ করেছে, তোমরা আমাদের কাছ থেকে বর গ্রহণ কর। অনুহ্রাদ ও উলূক তখন বিনীত ভাবে বলল—আমরা পাপ কাজ করেছি ; তবু আমাদের ভাগ্য ভালো যে, আপনাদের দেখা আমরা পেয়েছি। আমাদের আর অন্য বরে কি প্রয়োজন ? তবুও যদি আপনারা বর দিতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে আমরা এমন বর আপনাদের কাছে চাই যা জনগণের কল্যাণ করবে। যে ব্যক্তি নিজের জন্য কিছু চায়, সে কৃপার যোগ্য। যে সতত পরের কল্যাণ করতে চায়, তার জীবনই সার্থক। এ পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই মরণশীল ; সুতরাং স্বার্থে পরিশ্রম

করা একান্তই বৃথা। প্রাণীরা বৃথা পুরুষকারের বড়াই করে ক্লেশ ভোগ করে। আমাদের প্রার্থনা এই যে, গঙ্গাতীর্থের উভয় তীরে আমাদের দুজনের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হোক। যে ব্যক্তি এখানে স্নান, দান, জপ, হোম প্রভৃতি করবে, তারা যেন ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারে। দেবতাদ্বয় প্রীত হয়ে তাদের প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। যম আরও বললেন-- গৌতমীর উত্তরতীরে যারা এই যমস্তোত্র সংযতচিত্তে পাঠ করবে, তাদের সাত পুরুষের মধ্যে কেউই অকালে মরবে না। এই তীর্থে এক সপ্তাহ স্নান করলেই সতী রমণী তিন মাসের মধ্যে এবং বন্ধ্যা রমণী ছ'মাসের মধ্যে গর্ভবতী হবে। এখানে পিণ্ড দান করলে পিতৃগণ মুক্তিলাভ করবেন।

যমের কথা শেষ হলে পর অগ্নি বললেন—যারা সংযত হয়ে গৌতমীর দক্ষিণতীরে এই অগ্নিস্তোত্র পাঠ করবে, তাদের অগ্নিভয় থাকবে না। এই অগ্নিতীর্থে যে ব্যক্তি পবিত্র-ভাবে স্নান, দান প্রভৃতি করবে, তারা নিঃসংশয়ে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করবে।

তারপর থেকেই সেই দুই স্থান যাম্যতীর্থ ও অগ্নিতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। কপোত, উলূক প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও এই তীর্থদ্বয় পরিচিত। সেখানে গঙ্গার উভয় তীরে আরো অনেক তীর্থ আছে। এই তীর্থসমূহে স্নান, দান প্রভৃতি করলে যে সব মানুষ মৃত্যুর পর প্রেত হয়, তারাও পবিত্র হয়ে স্বর্গে যেতে পারে।

—'যাম্য অগ্নি প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো ছাব্বিশ

তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—তপস্তীর্থ নামে একটি বিখ্যাত তীর্থ আছে। এখন সেই তীর্থের কথা তোমাকে শোনাব। পুরাকালে একবার মুনিদের মধ্যে জল এবং অগ্নির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বিবাদ বাদে। কেউ কেউ অগ্নিকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নেন, কেউ কেউ আবার জলই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেন, তাঁদের যুক্তি এ রকম—অগ্নি ছাড়া জীবনই থাকতে পারে না, অগ্নির দ্বারাই অখিল জগৎ উৎপাদিত হয়। অগ্নিই জ্যোতির্ময় তৈজস জগদাকারে পরিণত হয়েছেন। অতএব অগ্নি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। অগ্নি ব্যতীত কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে না। পুরুষের বীর্য নারীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে যে শারীরিক জন্ম হয় সেও অগ্নির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং অগ্নির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকতে পারে না।

যাঁরা জলকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন, তাঁদের অভিমত হল—জলের সাহায্যেই অন্ন তথা শস্যসমূহ উৎপন্ন হয়, মানুষকে পবিত্রও করে এই জলই। জলই জগতের মাতা, জগতের জীবন। জল থেকেই অমৃত উৎপন্ন হয়েছে, ওষধিসমূহও সেই জল থেকেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পঞ্চভূতের মধ্যে জলই শ্রেষ্ঠ।

এভাবে মুনিরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারলেন না। তাঁরা তখন আমার কাছে তাঁদের বিবাদের বিষয় বললেন। আমি বললাম—জল ও অগ্নি উভয়ই লোকে পূজ্য। উভয়েই জগতের উৎপাদক। উভয়ের দ্বারাই লোকসমূহ জীবন ধারণ করে থাকে ; এঁদের মধ্যে ইতরবিশেষ নেই। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের গুরুত্বই সমান। ঋষিরা তখন আমার কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে বায়ুর কাছে গেলেন এবং তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। সমস্ত কথা শুনে বায়ু বললেন—অগ্নিতেই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, অতএব অগ্নিই

শ্রেষ্ঠ। ঋষিরা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পৃথিবীর কাছে গেলেন মীমাংসার জন্য। পৃথিবী জলকেই শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করলেন। ঋষিরা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে প্রথমে তাঁর স্তব করলেন। তাঁরা বললেন—যিনি জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্তই জানেন, বুদ্ধিরূপে গুহাতে যাঁর অবস্থান, ঋষিরা যাঁকে শাশ্বত ও অক্ষয় বলে নির্দেশ করেন, পরিণামে যাঁর মধ্যে সমস্ত প্রাণীরই লয় হয়, সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করি। আপনি বিশ্বাত্মা, জগতের অন্তরে, বাইরে সর্বত্রই আপনি বিরাজ করেন। অগ্নি ও জলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে—এ বিষয়ের মীমাংসা আপনি করে দিন। সে সময় এক দৈববাণী হল—তপস্যা, নিয়ম ও ভক্তিভরে জল ও অগ্নির আরাধনা করলে, যাঁর উপাসনা প্রথম সিদ্ধ হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন।

দৈববাণী শুনে ঋষিরা গৌতমীগঙ্গার তীরে গিয়ে সংযতচিত্তে জল ও অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হলেন। সেখানে তখন বেদমাতা সরস্বতী ঋষিদের বললেন- জলই অগ্নির যোনিস্বরূপ, জলের দ্বারাই পবিত্রতা লাভ হয়। যাঁরা অগ্নির পূজক, তাঁরাও জল ছাড়া অগ্নির পূজা করতে পারেন না। জলে স্নান না করলে পবিত্র হওয়া যায় না ; আর পবিত্র না হলে বেদোক্ত কর্মে অধিকার জন্মায় না। সুতরাং জলই শ্রেষ্ঠ ; কারণ, জল অগ্নিরও মাতৃস্বরূপ।

সরস্বতীর কথায় ঋষিদের আর কোন সংশয় রইল না। তাঁরা জলকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিলেন। তারপর থেকেই সেই তীর্থ 'তপস্তীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এই তীর্থ শত্রুতীর্থ, অগ্নিতীর্থ ও সারস্বততীর্থ নামেও অভিহিত হয়। এই তীর্থসমূহে স্নান, দান প্রভৃতি করলে সমস্ত বাঞ্ছিত ফলই পাওয়া যায়। যেখানে দৈববাণী শোনা গিয়েছিল, সেখানে সরস্বতী নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, এই সরস্বতী-গঙ্গাসঙ্গম তীর্থ অতি পবিত্র।

—'তপস্তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ একশো সাতাশ

গঙ্গার উত্তর তীরে দেবতীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে আর্ষ্টিষেণ নামে এক স্বনামধন্য রাজা ছিলেন ; তাঁর স্ত্রীর নাম জয়া। তাঁদের পুত্রের নাম ভর। সমস্ত বিদ্যায়, সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহারে সে ক্রমেই নিপুণ হয়ে ওঠে। কালক্রমে তার বিয়ে হয় সুপ্রভা নামে এক রূপবতী রাজকন্যার সঙ্গে। রাজা আর্ষ্টিষেণ ভরের হাতে রাজ্যের ভার অর্পণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য সরস্বতী নদীর তীরে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। রাজা পুরোহিতদের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে বসে আছেন, এমন সময় মিথু নামে বলশালী এক দানব যজ্ঞ ধ্বংস করার মানসে পুরোহিত, রাণী ও রাজাকে নিয়ে পাতালে চলে গেল। যজ্ঞ বিনষ্ট এবং রাজা ও পুরোহিত অপহৃত দেখে সবাই সেখান থেকে চলে গেল। রাজপুরোহিতের দেবাপি নামে এক পুত্র ছিল। সে জন্মাবধি তার পিতাকে দেখে নি। বড় হয়ে ওঠার পর সে মাকে তার বাবার কথা জিগ্যেস করল। তিনি পুত্র দেবাপিকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। দেবাপি সমস্ত কথা শোনার পর ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। তারপর রাজপুত্র ভরের কাছে গিয়ে তাকে বললেন—শুনুন যুবরাজ, দানবপতি মিথু পাতালে যাঁদের নিয়ে গেছে, আমি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ব্রত

ও নিয়মের প্রভাবে তাঁদের সকলকেই নিয়ে আসব। নিদারুণ ভাবে অপমানিত হয়েও যে তার প্রতিক্রিয়া করে না, তার বাঁচা বা মরা দুই-ই সমান। আমি এই কাজে কৃতকার্য হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি আমার মায়ের দেখাশোনা করবেন। দেবাপির সংকল্পের কথা শুনে ভর তাকে আশ্বস্ত করে বললেন—তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমি কর্তব্য সম্পাদন করে কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসো। আমার শুভেচ্ছা রইল তোমার পথের পাথেয় হয়ে।

তারপর দেবাপি ঋত্বিকদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। যাঁরা সেই যজ্ঞে ঋত্বিক রূপে কার্য সম্পাদন করেছিলেন দেবাপি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সবিনয়ে নিজের পরিচয় প্রদান করে বললেন—দেখুন, যজ্ঞে দীক্ষিত যজমান, পুরোহিত এবং দীক্ষিত যজমান পত্নী—এদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের। অথচ আপনাদের সামনেই যজ্ঞ বিনষ্ট হল, এঁরাও অপহৃত হলেন। যাই হোক, যাঁরা অপহৃত হয়েছেন, তাঁদের সুস্থ দেহে এখানে এনে দিন। যদি তা না করেন, তবে আপনাদের আমি অভিশাপ দেব। ঋত্বিকরা দেবাপির কথা শুনে বললেন—যজ্ঞে অগ্নিই প্রথম পূজিত হন, তিনিই বস্তুত যজ্ঞের রক্ষক। তুমি বরং অগ্নির কাছে যাও। আমাদের এ বিষয়ে করণীয় কিছুই নেই। দেবাপি তখন অগ্নির যথাবিহিত অর্চনা করে তাঁকে সব কথা জানালেন। অগ্নি তখন দেবাপিকে বললেন—ঋত্বিকরা যেমন আমিও তেমনই দেবতাদের পরিচারক মাত্র। আমি দেবতাদের হব্য বহন করি। আমি দেবতাদের পৃথক পৃথক ভাবে আহ্বান করে হবির্ভাগ প্রদান করে থাকি। সুতরাং তুমি দেবতাদের কাছে যাও।

অগ্নির কথা শুনে দেবাপি দেবতাদের কাছে চললেন। দেবতারা সমস্ত কথা শুনে তাঁকে বললেন—দেখ, আমরা বৈদিক মন্ত্রে এবং ঋত্বিকগণ কর্তৃক আহূত হয়ে হবির্ভাগ গ্রহণ করি ; আমরা স্বাধীন নই। আমরা বেদানুগ ; সেজন্য বেদানুগ হয়েই আমাদের এ কাজ করতে হয়। সুতরাং তুমি বেদ আহ্বান করে তাদের জিগেস কর ; আমাদের এ বিষয়ে করার কিছুই নেই। দেবতাদের পরামর্শ মতো দেবাপি বেদসমূহকে আহ্বান করে সমস্ত কথা তাদের জানালেন। বেদগণ বলল—আমরা পরাধীন, স্বাধীনতা আমাদেরও নেই। আমরা ঈশ্বরের বশানুগ। আমরা যেহেতু শব্দময় ; তাই সমস্ত ঘটনাই জানি এবং তা বলতেও পারি। তোমার পিতার অপহরণ এবং রাজা আর্ষ্টিসেনের যজ্ঞের বিষয়ে সমস্ত কথাই আমরা জানি। কি ভাবে কি করলে তাঁদের তুমি পাতাল থেকে উদ্ধার করতে পারো—সে কথাই এখন বলছি। তুমি গৌতমী নদীর তীরে যাও এবং মহেশ্বরের স্তব কর। তিনি প্রীত হলে তোমাকে সমস্ত বরই দান করবেন। এটুকু বলতে পারি যে, তোমার পিতা, রাজা এবং রাণী সবাই অক্ষত দেহে পাতালে রয়েছেন।

বেদগণের পরামর্শ মতো দেবাপি গৌতমীর তীরে গিয়ে সেখানে স্নান করলেন। তারপর সংযতচিত্তে মহেশ্বরকে স্তব করতে লাগলেন। তিনি বললেন—যারা অনাথ, যারা কৃপণ, যারা দরিদ্র, যারা রোগী, যারা পাপাত্মা—তুমি তাদের সবাইকেই পরিত্রাণ করে থাক। তোমার নাম মাত্রই সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। আমি বিপন্ন, আমাকে তুমি রক্ষা কর। দেবাপির স্তবে দেবাদিদেব মহেশ্বর সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাকে বর দিতে উদ্যত হলেন। দেবাপি বলল—আমার প্রার্থনা এই যে, রাজা আর্ষ্টিষেণ আর রাজপত্নী জয়াকে ফিরে পেতে চাই এবং আমার শত্রু সেই মিথু নামক অসুরকে নিহত অবস্থায় দেখতে চাই। দেবাদিদেব তাঁর প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। তিনি নন্দীকে পাঠালেন পাতালে মিথু নামক দানবকে

হত্যা করে রাজা ও রাজপত্নীকে ফিরিয়ে আনতে। নন্দী প্রভুর আদেশ মতো পাতালে গিয়ে সমস্ত কাজই করল। সবাই সেখানে সমবেত হয়ে স্থির করলেন যে, গোতমীর তীরেই অপূর্ণ সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে। অগ্নি, ঋত্বিক, দেবতা, বেদ ও ঋষিগণের সহায়তায় সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হল। তারপর থেকেই সেই তীর্থের নাম হল দেবতীর্থ। এই তীর্থ অতি পবিত্র। সেখানে গোতমীর উভয় তীরে আরো অনেক তীর্থ আছে।

—'আর্ষ্টিষেণ তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো আটাশ

তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—সেই গোতমীর দক্ষিণ তীরে তপোবন, নন্দিনীসঙ্গম, সিদ্ধেশ্বর এবং শার্দূল নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে। সেই তীর্থের কথা তোমাকে এবার বলছি, শোন।

পুরাকালে অগ্নির পত্নী স্বাহার কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁর তপস্যার প্রখরতায় শঙ্কিত হয়ে অগ্নি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—স্বাহা, তুমি তপস্যা করো না, তুমি অবশ্যই সন্তান লাভ করবে। অগ্নির কথায় স্বাহা তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে বিপন্ন দেবতাকুল মহেশ্বরের শরণাপন্ন হলেন। তাঁদের চেষ্টায় যদিও বা মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়কন্যা উমার পরিণয় হল, সন্তান কিন্তু আকাঙ্খিত সময়ের মধ্যে হল না। দেবতারা তখন নিরুপায় হয়ে অগ্নির শরণাপন্ন হলেন। অগ্নি দেবতাদের কথায় রাজী না হয়ে তাঁদের বললেন—দম্পতি যদি সঙ্গমরত অবস্থায় থাকে, তবে সেখানে অন্য কারুর যাওয়া সম্পূর্ণ ভাবে অনুচিত। দেবতারা অগ্নিকে বুঝিয়ে বললেন—বিপদের সময় ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন অবান্তর। আমাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত; তুমি সত্বর গিয়ে মহাদেবকে সব কথা বল এবং যা হোক একটা উপায় ঠিক কর। অগত্যা অগ্নি শুকপাখির রূপ ধরে যেখানে সঙ্গমরত অবস্থায় হরগৌরী ছিলেন সেখানে গিয়ে পেঁছিলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকতে না পেরে জানলার কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শিব কিন্তু শুকবেশী অগ্নিকে চিনতে পেরে উমাকেও তা দেখিয়ে দিলেন। উমা তাতে লজ্জিত হয়ে পড়লেন। যাই হোক, শিব তখন অগ্নিকে ডেকে বললেন—'অগ্নি, আমি সব কথাই জানি; কিছুই তোমাকে বলতে হবে না। তুমি মুখ বিস্তার কর এবং আমি যা দিচ্ছি তা গ্রহণ কর।' এ কথা বলেই মহাদেব অগ্নির মুখে প্রচুর পরিমাণে বীর্য নিক্ষেপ করলেন। মহাদেবের বীর্যের ভারে অগ্নি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। অতি কষ্টে যেতে যেতে তিনি সুরনদীর তীরে এসে পেঁছিলেন। সেখানে ছিলেন কৃত্তিকাগণ। সেই কৃত্তিকাতে তিনি শিবের বীর্য নিক্ষেপ করলেন, তখন কার্তিকেয়র জন্ম হল। তবুও কিছু বীর্য অগ্নির দেহে অবশিষ্ট রয়ে গেল। তিনি সেই বীর্য দু'ভাগে ভাগ করে নিজপত্নী স্বাহাকে প্রদান করলেন। অগ্নিনিহিত সেই তেজ থেকে স্বাহার গর্ভে যমজ পুত্রকন্যার জন্ম হল। ওই যমজ অপত্যের মধ্যে পুত্রটির নাম সুবর্ণ এবং কন্যাটির নাম সুবর্ণা। অগ্নি সেই সুবর্ণাকে ধর্মের হাতে সম্প্রদান করেন এবং সুবর্ণেরও বিয়ে দিলেন। তাঁর পত্নীর নাম সংকল্পা। যেহেতু অপরের বীর্যে সেই পুত্র কন্যার জন্ম হয়, সেজন্য তারা ব্যভিচারী হয়ে উঠল। সুবর্ণ ইচ্ছামতো রূপ ধারণ

করে ইন্দ্র, বায়ু, কুবের, বরুণ এবং অন্যান্য মুনিদের পত্নীর সঙ্গে সঙ্গম করতে লাগল। সুবর্ণাও যাকে পছন্দ তারই সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। এদের এ রকম ব্যভিচার দেখে দেবতারা এই অভিশাপ দিলেন যে. সুবর্ণ যেহেতু ব্যভিচার করেছে সেজন্য সে সর্বত্রগামী ও পাপাচারী হবে। আর সুবর্ণাও পতিব্রতা নয় বলে নানা জাতের নিন্দিত বহু শরীরীকে তাকে বাধ্য হয়ে বরণ করতে হবে। অগ্নি পুত্র-কন্যাকে অভিশপ্ত দেখে আমার কাছে এসে তাদের শাপনিষ্কৃতির উপায় জিগ্যেস করলেন। আমি তখন অগ্নিকে বললাম—তুমি গৌতমী নদীর তীরে যাও এবং ভগবান শংকরকে স্তবে সন্তুষ্ট কর। তাঁরই বীর্যে তো তোমার সন্তানের উৎপত্তি হয়েছে ; সুতরাং তিনিই এর প্রতিবিধান করবেন।

আমার পরামর্শ মতো অগ্নি সেই গৌতমী নদীর তীরে গিয়ে মহাদেবের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। অগ্নি বললেন—যিনি সমগ্র জগতের পালক, স্বয়ম্ভু, যিনি অগ্নি হয়ে সংহার করেন, জল হয়ে সৃষ্টি করেন, সূর্যরূপে যিনি পালন করেন, সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে আমি নমস্কার করি। অগ্নির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বর দিতে উদ্যত হলেন। অগ্নি তখন মহাদেবকে সমস্ত কথা জানালেন এবং দেবতাদের অভিশাপের কথাও বললেন। অগ্নির কথা শুনে মহাদেব তাঁকে বললেন—আমার বীর্য থেকেই এদের জন্ম; সুতরাং দেবতাদের অভিশাপে এদের কোন ক্ষতি হবে না। সুবর্ণ ঋদ্ধির আধার-স্বরূপ হবে। লোকে ঐ সুবর্ণই অমৃতস্বরূপ। সুবর্ণ ছাড়া সকলেই হীন, আর সুবর্ণ থাকলে সকল সম্পদই পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। নির্গুণ ব্যক্তিও ধনী হলে মান্য হয়, কিন্তু সগুণজনও নির্ধন হলে মান্য বলে বিবেচিত হয় না। আর এই সুবর্ণা চঞ্চল হলেও উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হবে। এর সদয় দৃষ্টিতে যা চিররিক্ত তাও চিরসম্পদবান হয়ে উঠবে। এই সুবর্ণাই সাক্ষাৎ কমলা। যদিও তোমার সন্তানদের ব্যভিচার দোষ রয়েছে, তাহলেও আমার বরে আজ থেকে তারা পবিত্র বলে পরিগণিত হবে।

শিবের বরে তখন তারা নিঃশঙ্ক চিত্তে কালযাপন করতে লাগল। ইতিমধ্যে শার্দূল নামে এক দানব ধর্মকে পরাজিত করে সুবর্ণাকে অপহরণ করে পাতালে নিয়ে গেল। তখন জামাতা ধর্মের সঙ্গে হব্যবাহ অগ্নি ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা জানালেন। হরি সমস্ত কথা শুনে সুদর্শনচক্র পাঠিয়ে শার্দূলকে নিহত করলেন এবং সুবর্ণাকে মহেশ্বরের কাছে নিয়ে এলেন। শার্দূলকে বধ করার পর বিষ্ণুর রুধিরলিপ্ত চক্রকে যেখানে ধোয়া হয়েছিল, সেই স্থান চক্রতীর্থ ও শার্দূলতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। শংকরের সঙ্গে সুবর্ণার যেখানে দেখা হয়, সেই স্থান শংকরতীর্থ এবং বৈষ্ণবতীর্থ নামে পরিচিত। সুবর্ণাকে ফিরে পেয়ে অগ্নি ও ধর্ম যেখানে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলেন, সেখানে আনন্দা নামে একটি নদী উৎপন্ন হয়, এর অপর নাম নন্দিনী। গঙ্গার সঙ্গে ঐ নদী যেখানে মিলিত হয়, সেই স্থান অতি পবিত্র। সেখানে আজো সুবর্ণা বিরাজ করেন; তিনি দাক্ষায়ণী, শিবা, আগ্নেয়ী, অম্বিকা, জগদাধারা, কাত্যায়নী, ঈশ্বরী ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। অগ্নি যেখানে তপস্যা করেছিলেন, সেই স্থান তপোবন নামে বিখ্যাত। সেখানে গঙ্গার উভয় তীরে অনেক তীর্থ আছে। সেখানে যে কোন রকম ধর্মানুষ্ঠান করলেই, তা পরলোকের পাথেয় হয়ে থাকে। অবুক তীর্থের পশ্চিমদিকে যে তীর্থ, তা শার্দূল তীর্থ নামে অভিহিত। এই তীর্থে স্নান করলে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে যেতে পারে।

—'তপোবনতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো উনত্রিশ

পূর্বে যে তপোবনতীর্থের কথা তোমাকে বললাম, তার কাছাকাছি ইন্দ্রতীর্থ, বৃষাকপি-তীর্থ, ফেনাসঙ্গম তীর্থ ও হনুমন্ত তীর্থ আছে। আগে যে অবুক তীর্থের কথা তোমাকে বলেছি, সেখানে দেবত্রিবিক্রম তীর্থ আছে। এই অবুক তীর্থ গঙ্গার দক্ষিণতীরে এবং ইন্দ্রেশ্বর রয়েছেন গঙ্গার উত্তরতীরে। ইন্দ্রের শত্রু নমুচি নামে এক বলবান দৈত্য ছিল। ইন্দ্রের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয় ; সেই যুদ্ধে ইন্দ্র ফেনা দিয়ে তার মাথা কেটে নেন। ইন্দ্র যে জল-ফেনা দিয়ে নামুচিকে আঘাত করেন, সেই ফেনা বজ্ররূপ ধারণ করে নামুচির শিরশ্ছেদ করে ; তারপর মাটি ফুঁড়ে পাতালে চলে যায়। পাতালে যে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, সেই ছিদ্রপথে তা পৃথিবীতে এসে পেঁছিয়। সেই গঙ্গাজল ফেনের নাম অনুযায়ী ফেনা নামক নদী বলে কথিত হয়। গঙ্গার সঙ্গে এই নদী যেখানে মিলিত হয়েছে, সেই সঙ্গমস্থান অতি পবিত্র। সেখানে স্নান করেই বিষ্ণু গঙ্গার অনুগ্রহে হনুমানের বিমাতা বিড়ালত্ব থেকে মুক্ত হন।—এই স্থান মার্জার তীর্থ নামে পরিচিত। এ কথা আগেই বলেছি তোমাকে। একে হনুমন্ত তীর্থও বলে। এবার তোমাকে বৃষাকপ এবং অবুক তীর্থের কথা শোনাব।

হিরণ্য নামে পুরাকালে এক বলবান দৈত্য ছিল। সে তপস্যা করে দেবতাদেরও অজেয় হয়ে ওঠে। তার পুত্র মহাশনিও অত্যন্ত বলবান ছিল। মহাশনির স্ত্রীর নাম অপরাজিতা। মহাশনির সঙ্গে ইন্দ্রের দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চলে। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হন। মহাশনি তাঁকে ঐরাবত হাতীর সঙ্গে বেঁধে এনে পিতার হাতে অর্পণ করেন। হিরণ্য ইন্দ্রকে পাতালে এক সুরক্ষিত স্থানে রাখেন। ইন্দ্রকে পরাজিত করে মহাশনি বরুণকে জয় করার জন্য গমন করে। বুদ্ধিমান বরুণ নিজ কন্যা বারুণীসহ নিজের বাসভবন সমুদ্রকেও তার হাতে সমর্পণ করেন।

এদিকে দেবতারা ইন্দ্রহীন হয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা পরামর্শ করে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। দেবতাদের কথা শুনে বিষ্ণু বললেন—দেখ, তোমাদের সমস্যা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু মহাশনি আমার বধ্য নয় ; তবু দেখছি কি করা যায়। দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বরুণের কাছে গিয়ে বললেন—আপনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, যাতে ইন্দ্রকে ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়। বিষ্ণুর কথামতো বরুণ তার জামাই মহাশনির কাছে গিয়ে বললেন—তুমি যে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে পাতালে রেখেছ, তাতে লোকসমূহের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। তুমি তাঁকে ছেড়ে দাও। শত্রুকে বেঁধে রেখে পরে যে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাতে বিজেতা ব্যক্তির মহত্ত্বই সূচিত হয়। বরুণের অনুরোধে মহাশনি ইন্দ্রকে তাঁরই হাতে অর্পণ করলেন ; তারপর ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন—তোমাকে কে ইন্দ্রত্বে অধিষ্ঠিত করেছে, আর কেনই বা করেছে ? যুদ্ধে এরা তোমাকে পরাজিত করে, অথচ তুমি কিনা দেবতাদের রাজা ! তুমি যে পুরুষ হয়েও বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইছ, এতে তোমার ইন্দ্রত্ব কি লজ্জায় সংকুচিত হচ্ছে না ? তোমার সেই ভীষণ বজ্র কোথায় ? সেই চিন্তামণি রত্ন, নন্দনবন, অপরূপ সুন্দরী দেবরমণীগণ ? যশ ও কীর্তিকে যা প্রসারিত করে সেই জীবনই জীবন ; যা যশের বিরোধী তাই-ই মরণ। তবু তুমি মুক্তি লাভ করতে চাইছ অন্যের মারফৎ। তোমার কি লজ্জা নেই ? আমার মনে হয় নিরন্তর সুখভোগে থেকে থেকে লজ্জা কাকে বলে তা তুমি

ভুলেই গিয়েছ। তুমি নাকি বৃত্রকে হত্যা করেছ, নমুচির প্রাণ সংহার করেছ; আরও তোমার কত বিশেষণ! এ সব তুমি পরিত্যাগ কর। অপমানিত ও পরাজিত হয়েও যারা নিজের পদকে আঁকড়ে ধরতে চায়, সে-রকম লোকের জন্ম দেওয়ার সময় বিধাতা কেন চিন্তা করেন না? মহাশনি ইন্দ্রকে বরুণের হাতে তুলে দিয়ে আবার বলল—তুমি আজ যার জন্য মুক্তি পেলে সেই বরুণদেব আজ থেকে তোমার গুরু, তুমি তাঁর শিষ্য। এঁর প্রতি তোমার আচরণে যদি কোন রকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় তবে আবার তোমাকে বেঁধে এই পাতালেই নিয়ে আসব। এভাবে মহাশনির ভর্ৎসনাবাক্য শুনে ইন্দ্র ভীষণ লজ্জিত হলেন এবং স্বর্গে ফিরে এসে শচীকে সমস্ত কথা বললেন। সমস্ত কথা শুনে শচী ইন্দ্রকে বললেন—দেখ, আমি দানবদের উন্নতির হেতু, মায়া, তাদেরকে পরাজিত করার উপায়—এ সমস্তই জানি। কি করলে মহাশনির পরাজয় ঘটবে তা তোমায় বলছি, শোন। হিরণ্যদানবের পুত্র সেই মহাশনি আমার কাকার ছেলে, সুতরাং সে আমার ভাই। যদিও সে বলবান এবং তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান, তবুও সে অমর নয়। তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের অসাধ্য কোন কিছুই নেই, আর বিষ্ণু ও শিবের প্রতি যে ভক্তি, তার অসাধ্যও কোন কিছুই নেই। আমি শুনেছি যে, ভূমি এবং জলের অসাধ্যও কিছুই নেই, কারণ, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে তীর্থভূত যে ভূমি, সেখানেই তুমি যাও। পৃথিবীর মধ্যে দণ্ডকারণ্যই সারভূত স্থান; সেখানে যে মহানদী প্রবাহিত, সেখানে গিয়ে তুমি মহাদেবের পূজা কর কিংবা ভগবান বিষ্ণুর পূজা কর। তাহলেই তাঁদের অনুগ্রহে তুমি ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারবে। ফল না জেনে কাজ করলে সে কাজ কর্মীকে একগুণ ফল দান করে; ফল জেনে করলে তা শতগুণ ফল দান করে। আর পত্নীর সঙ্গে কর্মানুষ্ঠান করলে, সেই কর্ম অক্ষয় ফল উৎপাদন করে থাকে। পুরুষ একাকী কর্ম করলে অর্ধেক ফল লাভ করে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে করলে পূর্ণ ফল লাভ করে। সেজন্য 'পত্নীই পুরুষের অর্ধেক অঙ্গ' এরূপ বেদবাক্য শোনা যায়। চল, সেখানে যাই। গৌতমী-নদীতে স্নান করে তপস্যা করি। তাহলে ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারব।

স্ত্রীর পরামর্শ মতো ইন্দ্র তখন সেই দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে গৌতমী নদীতে স্নান করে সংযত চিত্তে মহাদেবের উদ্দেশে এই স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন। ইন্দ্র বললেন—যিনি নিজের মায়ার দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করেন, অথচ তাতে আসক্ত হন না, সেই এক, স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয়, চিৎস্বরূপ পিণাকপাণি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সনক প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণও যাঁর তত্ত্ব অবগত নন, সেই পার্বতীপতি আমার প্রতি দয়ালু হোন। তিনিই বিরিঞ্চিকে সৃষ্টি করে পরে তার ভয়ংকর মাথা দেখে তাকে নখ দিয়ে কেটে দিয়েছিলেন এবং মুণ্ডটি পুনরায় নিক্ষিপ্ত করেন। তা থেকেই ত্রিবর্গের অর্থাৎ পাপ, দারিদ্র্য, লোভ, মোহ, বিপদ প্রভৃতি দুঃখজনক বস্তুসমূহের উৎপত্তি হয় এবং এরা সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে। এ সমস্ত দেখে শিব পার্বতীকে বলেন—তুমি এই বিনাশোন্মুখ জগৎকে রক্ষা কর। তুমিই বাক এবং বুদ্ধিরূপিণী। শিবের কথামতো গৌরী নিজেই হরদেহে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে নখ দিয়ে ঘাম মুছে নিক্ষেপ করলেন। সেই ঘাম থেকেই প্রথমে ধর্ম, পরে লক্ষ্মী, তারপর দান, সুবৃষ্টি তারপর বিভিন্ন জন্তু, শেষে নানা সরোবর, ধান, ফুল-ফল, সৌভাগ্যবস্তু, সুন্দর দেহ, নৃত্য, গীত, অমৃত, প্রসাধন দ্রব্য, পুরাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, নীতি শাস্ত্র, অন্ন, পানীয়, শাস্ত্র, অস্ত্র, গৃহোপকরণ, তীর্থ, কানন, যানবাহন এবং আসন প্রভৃতি

উৎপন্ন হল। আপনি আমাকে ভয় থেকে রক্ষা করুন। আমি শিবশক্তির সেই অদ্বৈত সুন্দর বিগ্রহকেই নমস্কার করি।

ইন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শিব সেখানে আবির্ভূত হন এবং তাঁকে বর চাইতে বলেন। ইন্দ্র তখন সবিনয়ে বলেন—মহাশনি নামক দানব আমাকে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করেছে। তার বধের জন্যই আমার এই তপস্যা। আপনি আমাকে সে-রকম বীরত্ব দান করুন, যাতে সেই মহাশনি নামক দানবকে আমি বধ করতে পারি। শিব তখন ইন্দ্রকে বললেন—দেখ, তুমি শচীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা কর। তাঁর এবং আমার মিলিত বর প্রভাবেই তুমি মহাশনিকে বধ করতে পারবে। গঙ্গার দক্ষিণতীরে আপস্তম্ব নামে এক মুনি আছেন; তুমি সেখানে গিয়ে গৌতমী ও সিন্ধুফেন-সঙ্গমে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা কর। শিবের পরামর্শমতো ইন্দ্র নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বিবিধ বৈদিক মন্ত্র, তপস্যা ও স্তব দ্বারা বিষ্ণুকে তুষ্ট করলেন। ভগবান বিষ্ণু সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের প্রার্থনীয় কি তা জানতে চাইলে ইন্দ্র বললেন—আমাকে শত্রুনাশের ক্ষমতা দিন। বিষ্ণু ইন্দ্রের প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। পরে সেখানেই শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার অনুগ্রহে সেই জলে শিব-বিষ্ণুস্বরূপ এক পুরুষ উৎপন্ন হল; তার এক হাতে চক্র, অন্য হাতে শূল। সেই পুরুষ তখনই পাতালে গিয়ে মহাশনিকে নিহত করল। তখন তার নাম হল বৃষাকপি; জল থেকে উৎপন্ন বলে নাম হল অব্জক। সেই অব্জক বৃষাকপি ইন্দ্রের পরম বন্ধু হল। তিনি সব সময়ই সেই বৃষাকপিকে অনুগমন করতে লাগলেন। এতে শচী ভাবলেন যে ইন্দ্র বোধ হয় অন্য কোন রমণীতে আসক্ত হল, তাই তিনি ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন। ইন্দ্র সমস্ত কথা বুঝতে পেরে শচীকে বললেন—দেখ, তোমাকে স্পর্শ করে বলছি আমি অন্য কোন রমণীতে আসক্ত নই। তোমার মতো পতিব্রতা এবং বিবেচনাজ্ঞানযুক্তা স্ত্রী যার আছে তার আবার অভাব কিসের? বৃষাকপি আমার বন্ধু ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার পাতিব্রত্যের জন্যই আমি ইন্দ্রত্ব ফিরে পেয়েছি এবং তা নিষ্কণ্টক হয়েছে। পরলোকে এবং ধর্মসাধন বিষয়ে সৎ পুত্রের মতো অন্য কেউই নেই আর ইহলোকে আর্ত পুরুষের পত্নীর মতো অন্য কোন ওষুধ নেই। আমার প্রিয় সখা বৃষাকপি এবং প্রিয় সখী তুমি—এ ছাড়া আর কেউই বা কিছুই আমার প্রিয় নয়। তীর্থসমূহের মধ্যে গৌতমী গঙ্গা এবং দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু ও শিব আমাদের প্রীতিকর। তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা ইন্দ্রেশ্বরে এবং অবুকতীর্থে দেবতারা বাস করুন; আর কেবলমাত্র ইন্দ্রেশ্বরে শংকর এবং অব্জকে বিষ্ণু বাস করুন। এই তীর্থসমূহে স্নান করলে পাপীও যেন পাপ থেকে মুক্ত হয়। যারা এই তীর্থের মাহাত্ম্য শোনে বা পাঠ করে, তারা পুণ্য লাভ করে। ইন্দ্রের প্রার্থনা দেবতা ও মুনিরা অনুমোদন করলেন। ওই স্থানে গৌতমীর উত্তরতীরে সাত হাজার তীর্থ এবং দক্ষিণতীরে এগারোটি তীর্থ আছে। এই তীর্থসমূহের মধ্যে অব্জক তীর্থই শ্রেষ্ঠ। উহা বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার বাসস্থান।

—'ইন্দ্রেশ্বর প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো ত্রিশ

তীর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—আপস্তম্ব নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে; এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে আপস্তম্ব নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মুনি

ছিলেন. তাঁর স্ত্রীর নাম অক্ষসূত্রা। এ'দের পুত্রের নাম কর্কি ; এ'র বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল দূরবিস্তৃত। একবার সেই আপস্তম্বের আশ্রমে মুনিপ্রবর অগস্ত্য এলে আপস্তম্ব তাঁর যথোচিত সংকার করে জিজ্ঞেস করলেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতার মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ? কে আদি, অনন্তই বা কে ? যজ্ঞের দ্বারা মানুষ কার আরাধনা করে ? বেদেই বা কার মহিমা পরিগীত হয়ে থাকে ? দয়া করে আমার এই সংশয় দূর করুন। অগস্ত্য তখন আপস্তম্বের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সম্বন্ধে শব্দকেই পরম প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়। তার মধ্যে আবার বৈদিক শব্দই পরম প্রমাণ বলে কথিত হয়। সেই শব্দাত্মক বেদে যে পুরুষ গীত হন, তিনি পরাৎপর, তিনি মরণশীল তিনি অপর এবং যিনি মরণশীল নন তিনি পর বলে কথিত হন। যিনি অমূর্ত তিনি পর এবং যিনি মূর্ত তিনি অপর। গুণত্রয়ের অভিব্যক্তি ভেদে সেই মূর্ত পুরুষ ত্রিবিধ হয়ে থাকেন। একই পুরুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে অভিহিত হন। গুণ ও কর্মের ভেদবশে সেই এক পুরুষের বহুমূর্তি পরিলক্ষিত হয়। যিনি এই পরম তত্ত্ব জানেন, তিনিই বিদ্বান। যিনি এ'দের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করেন, তাঁর কোন প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই দেবত্রয়ের মূলতঃ একত্ব হলেও পৃথক পৃথক মূর্তিভেদ মাত্র আছে। এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ। আর যা এক, নিরাকার তা সমস্ত তত্ত্বের অতীত বলে নিরূপিত।

অগস্ত্যের কথা শোনার পর আপস্তম্ব তাঁকে বললেন—আপনার এই উপদেশ সত্ত্বে বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে পারছি না। সংশয় এখনো আমার মনে রয়ে গেছে ওই বিষয়ে যা নিঃসংশয়, নির্বিকল্প তার কথা দয়া করে বলুন। অগস্ত্য তখন বললেন যদিও এই দেবত্রয়ের পারস্পরিক ভেদ নেই, তবুও সুখাত্মা শিবই সমস্ত সিদ্ধি প্রদান করে থাকেন। যা এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের নিমিত্ত কারণ, তিনিই শিব ; তিনিই পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ। তুমি ভক্তিভরে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা কর। তিনি দণ্ডকারণ্যে প্রবাহিত গৌতমীগঙ্গার তীরে বিশেষভাবে বিরাজ করেন। তিনিই ভুক্তি এবং মুক্তিপ্রদ, সাকার অথচ নিরাকার। তিনি কর্তারূপে ব্রহ্মা, পালকরূপে বিষ্ণু এবং রুদ্ররূপে সংহারক।

অগস্ত্যের কথামতো আপস্তম্ব সেই গৌতমীগঙ্গার তীরে গিয়ে সেখানে স্নান করলেন এবং সংযতচিত্তে শিবের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন—যিনি কাষ্ঠে বহ্নি, কুসুমে গন্ধ, বীজে বৃক্ষ, পর্বতসমূহের মধ্যে হেম ইত্যাদি নানাভাবে সমস্ত প্রাণীতে বিরাজ করেন, সেই সোমনাথের শরণ নিলাম। যিনি লীলাবশে এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, যিনি বিশ্বরূপ, যিনি সৎ এবং অসতের পরবর্তী, সেই পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করছি। শরীরধারী ব্যক্তিরা যাঁকে স্মরণ করলে দারিদ্র্য, অভিশাপ ও রোগে কষ্ট ভোগ করে না এবং যাঁকে আশ্রয় করলে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়, সেই সোমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করি। যাঁর উদ্দেশে মন্ত্রপূত হবি যজ্ঞে প্রদত্ত হয়, সেই সোমেশ্বরকে সর্বতোভাবে ভজনা করি। যাঁর থেকে প্রশস্ত কোন কিছুই নেই, যাঁর থেকে সূক্ষ্ম কোন কিছুই নেই, যিনি স্থূল বস্তু সমূহের মধ্যেও স্থূলরূপ, যাঁর আজ্ঞানুসারে এই বিচিত্র বিশ্ব অচিন্ত্যরূপ, বিবিধ হলেও এক ক্রিয়ার মতো পরিচালিত হয়, সেই সোমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করি। বিভূতি, আধিপত্য, কর্তৃত্ব, দাতৃত্ব, মহত্ত্ব, প্রীতি, যশ, সৌখ্য, অনাদি ধর্ম—এ সমস্তই যাঁর মা রয়েছে, তাঁকেই আমি আরাধনা করি। যিনি চরাচর বিশ্বের মঙ্গল সাধন করেন, সে সোমশ্বরকে সর্বদা এবং সর্বথা আরাধনা করি।

আপস্তম্বের স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বর দিতে চাইলেন। আপস্তম্ব ভক্তিভ

মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন—আমার নিজের জন্য কোন প্রার্থনা নেই। যারা এখানে এই গৌতমীর তীরে স্নান করে আপনাকে দর্শন করবে, তারা যেন সমস্ত বাঞ্ছিত ফলই লাভ করে। শিব আপস্তম্বের প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। তারপর থেকেই সেই তীর্থ 'আপস্তম্ব' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

—'আপস্তম্ব তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো একত্রিশ

যমতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে, এবার তোমায় সেই তীর্থের কথা শোনাব।

দেবতাদের একটি কুক্কুরী আছে, তার নাম—সরমা, তার যমপ্রিয় এবং চতুরক্ষ নামে দুটি পুত্র আছে। সেই সরমার কাজ ছিল দেবতাদের যজ্ঞের প্রয়োজনে ব্যবহৃত গোরুদের রক্ষা করা। একবার কয়েকজন দৈত্য, দানব ও রাক্ষস মিলে সেই সরমাকে মিষ্টি কথায় এবং উত্তম খাদ্যদ্রব্যে প্রলোভিত করে যজ্ঞীয় পশুর জন্য কল্পিত সেই গোরুদের অপহরণ করল। সরমা তখন দেবতাদের কাছে এসে বলল—রাক্ষসেরা আমাকে মেরে এবং বেঁধে ফেলে যজ্ঞের প্রয়োজনে ব্যবহৃত গোরুদের অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। আমার কোন দোষ নেই। সরমার কথা শুনে দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাদের বললেন—দেখ দেবতারা, এর কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এই কুক্কুরী বিকৃতরূপ হয়ে রয়েছে। আমার মনে হয় এর সম্মতি অনুসারেই রাক্ষসেরা তোমাদের গোরুগুলিকে নিয়ে গেছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির কথাকেই সমর্থন করলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সেই সরমাকে পদাঘাত করলেন। তার ফলে সেই সরমার মুখ থেকে দুধ বেরোতে লাগল। তা দেখে ইন্দ্র বললেন—তোকে দুধ খেতে দিয়ে রাক্ষসেরা আমাদের গোরুগুলো নিয়ে চলে গেছে। সত্যিই তুই আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিস। সরমা তখন দুঃখ করতে করতে বারংবার বলতে লাগল যে সে দোষী নয়। দেবগুরু বৃহস্পতি তখন ধ্যানযোগে সমস্ত কথাই জানতে পারলেন। তিনি ইন্দ্রকে বললেন—আমি ধ্যানযোগে জানতে পারলাম যে সরমা সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে। ইন্দ্র সে কথা শুনে সরমাকে এই অভিশাপ দিলেন, তুই পৃথিবীতে পাপকারিণী কুক্কুরী হয়ে জন্মাবি। ইন্দ্রের অভিশাপে সরমা মনুষ্যলোকে বিকট দর্শন এবং হিংস্র প্রবৃত্তির কুক্কুরী হয়ে জন্মাল।

এদিকে রাক্ষসদের কাছ থেকে গোরুগুলোকে উদ্ধার করবার জন্য ইন্দ্র বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। বিষ্ণু সেই রাক্ষসদের বধ করার জন্য শার্ঙ্গ নামে এক ভীষণ ধনু নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যেখানে রাক্ষসেরা ছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি রাক্ষস ও দৈত্য-দানবদের নিহত করলেন ; কিছু সংখ্যক রাক্ষস ভয়ে পলায়ন করতে লাগলে বিষ্ণু বেগে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং ক্রমে সমস্ত শত্রুদের নিহত করলেন। অপহৃত গোরুগুলোও ফিরে এলো। দেবতারা যেখানে তাঁদের গোরুদের ফিরে পান, সেই স্থান 'বাণতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। যজ্ঞীয় পশুরূপে কল্পিত গোরুরা গঙ্গার দক্ষিণ তীরেই ছিল। দেবতারা গঙ্গার মধ্যে একটি দ্বীপের মতো ভূখণ্ড তৈরি করে তাতেই গোরুদের রাখেন। সেই গঙ্গাতেই দেবতারা তাঁদের যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। সেই যজ্ঞস্থলের নাম হয় যজ্ঞতীর্থ এবং ঐ দ্বীপের মতো ভূখণ্ডের নাম হয় গোদ্বীপ।

এদিকে সরমার পুত্রদ্বয় যমপ্রিয় ও চতুরক্ষ সমস্ত কথা যমের কাছে গিয়ে জানাল

এবং কি ভাবে তাদের মায়ের শাপমুক্তি ঘটবে, সে-কথাও তারা জিগেস করল। যম সূর্যকে সব কথা জানালেন। সূর্য তখন যমকে বললেন—তুমি দণ্ডকারণ্যে যাও ; সেখানে গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও আমাকে স্তুতি করবে, তাহলেই—যমপ্রিয় ও চতুরক্ষের মা সরমার শাপমুক্তি ঘটবে। পিতার কথামতো সূর্য সেই যমপ্রিয় ও চতুরক্ষকে নিয়ে গৌতমী নদীর দক্ষিণ তীরে আমাকে ও সূর্যকে এবং উত্তর তীরে শিব ও বিষ্ণুকে স্তুতি করল। তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে শাপমুক্তির উপায় বলে দিলেন। যম তাঁদের কাছে এই প্রার্থনা রাখলেন—এই স্থানে যারা স্নান করবে, তারা যেন বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি বাণতীর্থে স্নান করার পর শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণুকে স্মরণ করবে, তারা যেন কখনো দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ না করে। গোতীর্থে এবং ব্রহ্মতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে ব্রহ্মাকে নমস্কার করবে এবং তারপর গোদ্বীপকে প্রদক্ষিণ করবে, সে যেন পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ করে। আর সেখানে যারা দেবযজন স্থানে গিয়ে অগ্নিতে হোম করবে, তারা যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। সেই স্থানে যে নিষ্কাম ভাবে বেদমাতা গায়ত্রী একবারও পাঠ করবে, সে যেন সমগ্র বেদ অধ্যয়নের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি এখানে স্নান করে শক্তির আরাধনা করবে, সে যেন পুত্রবান ও ধনবান হয়। যারা সেখানে সূর্যকে ও বিষ্ণুকে দর্শন করবে এবং তাঁদের পূজা করবে, তারা যেন মোক্ষলাভ করতে পারে। দেবতারা যমের এই প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। সেখানে গঙ্গার উভয় তীরে আরো অনেক তীর্থ রয়েছে। সেই তীর্থসমূহে স্নান, দান, জপ, হোম প্রভৃতি যা কিছু করা হয় সবই ঐশ্বর্যলাভের জন্য হয়ে থাকে। যারা এখানে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তারা পিতৃ-পুরুষদের উদ্ধার করে শেষে মুক্তি লাভ করে।

—'বাণতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো বত্রিশ

যক্ষিণীসঙ্গম নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। পুরাকালে বিশ্বাবসু নামে এক গন্ধর্বের বোন পিপ্পলার স্বভাবই ছিল কারণে অকারণে হাসা। গৌতমীর তীরে ঋষিরা এক সময় এক সত্রের আয়োজন করেছিলেন। পিপ্পলা সেখানে গিয়ে মুনিদের ক্ষীণকায় দেখে হাসতে লাগল। ঋষিরা তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দেন—তুমি স্রোতস্বতী হও। ঋষিদের অভিশাপে পিপ্পলা যক্ষিণী নামক নদীতে পরিণত হল। বিশ্বাবসু তারপর সমস্ত কথা শুনে গৌতমীর তীরে গেলেন এবং ঋষিদের ও শঙ্করকে তুষ্ট করে তার শাপমোচন করলেন। তারপর থেকেই ঐ তীর্থ 'যক্ষিণীসঙ্গম' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। শম্ভু যেখানে বিশ্বাবসুকে শাপমোচনের বর দান করেন সেই স্থানের নাম শৈবতীর্থ। দুর্গাতীর্থ নামেও এর পরিচিতি রয়েছে। এই তীর্থ অতি পবিত্র ; এখানে স্নান করলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়।

—'যক্ষিণীসঙ্গম তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো তেত্রিশ

এবার তোমাকে বিখ্যাত শুক্রতীর্থের কথা শোনাব। ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত পরম ধার্মিক

ক মুনি ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম পৈঠীনসী। ভরদ্বাজ সেই পতিব্রতা স্ত্রীর সঙ্গে
মী নদীর তীরে বাস করতেন। একবার যজ্ঞীয় পিঠে পাক করার সময় ধোঁয়া থেকে
ক রাক্ষস বেরিয়ে সেই যজ্ঞীয় পিঠে পুরোটাই খেয়ে ফেলল। ভরদ্বাজ তাকে দেখতে
তার পরিচয় জিগ্যেস করলেন। তখন সেই রাক্ষস ভরদ্বাজকে বলল–আমার নাম
ব্যঘ্ন; আমি প্রাচীনবর্হির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মার বরে আমি যজ্ঞসমূহ নষ্ট করে
াকি হবি ভক্ষণ করে। বলবান কলি আমার ভাই। আমার মা, বাবা, ভাই- সবাই
ামরা কালো। আমি যজ্ঞ, যজ্ঞীয় যূপ সমস্তই নষ্ট করে ফেলব। ভরদ্বাজ তখন
লেন–তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু হলে। আমার এই যজ্ঞ তুমি নষ্ট করো না।
রদ্বাজের কথা শুনে হব্যঘ্ন বলল–পুরাকালে ব্রহ্মা আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন
ামার দুর্ব্যবহারের জন্য। আমি তারপর তাঁকে তুষ্ট করায় তিনি শাপমুক্তির যে উপায়
লে দেন, তা শোন। তিনি বলেন–মুনিরা যখন অমৃত দিয়ে তোমার দেহ অভিষিক্ত
বেন, তখন তুমি শাপমুক্ত হবে। হব্যঘ্নের কথা শুনে ভরদ্বাজ তাকে বললেন–দেখ,
মি যে অমৃতের কথা বলছ, তা তো আমাদের পক্ষে দুর্লভ। দেবতা এবং দানবেরা
ীরসাগর মন্থন করায় অমৃত ওঠে। সে অমৃত আমরা কোথায় পাব? তার চেয়ে যা
লভ, সহজে যা পাওয়া যায়, সে রকম কোন উপায়ের কথা বল। হব্যঘ্ন তখন বলল–
াতমীর জল, সোনা, আজ্য আর যজ্ঞীয় সোম–সবই অমৃত বলে কথিত। তুমি এর সব
টি দিয়ে যদি আমায় অভিষিক্ত করতে না-ও পারো, তবে গঙ্গাজল, সোনা ও ঘি–এ তিনটি
য়েই আমাকে অভিষিক্ত কর। অবশ্য এদের মধ্যে গৌতমীর জলই দিব্য অমৃত।

হব্যঘ্নের কথা শুনে ভরদ্বাজ তখনই গৌতমীর জল এনে সেই রাক্ষসকে অভিষিক্ত
রলেন। তারপর যজ্ঞীয় যূপে, পশুতে, ঋত্বিকদের মধ্যে ও সেই যজ্ঞীয় ভূমিতেও সেই
৷ ছিটিয়ে দিলেন। সেই হব্যঘ্ন আগে ছিল কৃষ্ণবর্ণের, কিন্তু জল ছিটোনোর পরই
শুক্লবর্ণ ধারণ করল। তারপর ভরদ্বাজ সেখানেই নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন এবং
ত্বিকদের বিদায় দিয়ে যূপটি গঙ্গাজলে ফেলে দিলেন।

তারপর থেকেই সেই তীর্থ 'শুক্লতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে গঙ্গার
ন তীরে আরো তীর্থ আছে। এই তীর্থসমূহ পবিত্র।

–'শুক্লতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ একশো চৌত্রিশ

বার তোমাকে চক্রতীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্তর্ষিরা গৌতমীর
ীরে সত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। রাক্ষসেরা সেই যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকায় ঋষিরা
ামাকে সে কথা জানালেন। আমি মায়ার প্রভাবে একটি নারী সৃষ্টি করে ঋষিদের
বললাম -এই অজৈকা নামক নারীকে তোমরা নিয়ে যাও; একে দেখলেই রাক্ষসেরা বিনষ্ট
ঋষিরা তাকে নিয়ে গিয়ে আবার যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন। রাক্ষসেরাও আবার
ই যজ্ঞ ধ্বংস করতে এলো। রাক্ষসদের মধ্যে শম্বর ছিল প্রধান। সে সেই অজৈকাকে
য়ে ফেলল। তারা তখন আবার যজ্ঞ ধ্বংস করতে লাগল। ঋষিরা তখন বিষ্ণুর কাছে
য়ে তাঁকে সব কথা জানালেন। বিষ্ণু রাক্ষসদের বিনষ্ট করার জন্যে তাঁর প্রসিদ্ধ
দর্শন চক্রকে সেখানে পাঠালেন। সেই বিষ্ণুচক্র রাক্ষসদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করল।

ঋষিরা তখন নির্বিঘ্নে সত্র সম্পাদন করলেন। পরে যেখানে বিষ্ণুর সেই সুদর্শনচ
গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত হয়, সেই স্থান 'চক্রতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়। সেখানে স্নান, দান প্রভৃ
করলে সত্রযাগের ফল লাভ হয়।

—'চক্রতীর্থপ্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ একশো পঁয়ত্রিশ

বাক্‌সঙ্গম নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে. সেখানে বাগীশ্বর মহাদেব বিরাজ করেন
একবার আমার ও বিষ্ণুর মধ্যে মহত্ব নিয়ে এক বিবাদ ঘটে ; তখন আমাদের মধ্যে মহাদে
জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। বিবাদ-মীমাংসার জন্যে তখন আকাশে এক দৈ
বাণী হল—যে এই জ্যোতির্ময় শিবের অন্ত দর্শন করবে, সে-ই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবে
সেই দৈববাণী শুনে বিষ্ণু নীচের দিকে এবং আমি উপরের দিকে চলে গেলাম। প
বিষ্ণু ফিরে এসে সেই জ্যোতির্ময় শিবের পাশে বসলেন। আমি কিন্তু তাঁর অন্ত
পেয়ে দূরদূরান্তরে চলে গেলাম। তবু তাঁর শেষ দেখতে না পেয়ে ফিরে এলাম
আমার তখন মনে হল যে, আমি তো বিষ্ণুর পরে ফিরে এসেছি, সুতরাং আমিই যে তাঁ
শেষ দেখেছি তা-ই প্রমাণিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমার মনে হল যে, আমার মু
তো সত্য ছাড়া কখনোই মিথ্যা উচ্চারণ করে না ; সুতরাং কি ভাবে মিথ্যা কথা বলব
এ রকম চিন্তা করে আমি ঠিক করলাম যে, গর্দভের মতো আকৃতি বিশিষ্ট একটি
অতিরিক্ত মুখ, যার সংখ্যা হবে পঞ্চম, সৃষ্টি করে তা দিয়েই মিথ্যা কথা বলব। এ রক
স্থির করে সেখানে সমাসীন ভগবান বিষ্ণুকে বললাম—আমি মহাদেবের অন্ত দর্শ
করেছি ; অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ। আমি যখন এ কথা বলছি, তখন দেখলাম যে, অমাবস্যা
চন্দ্র-সূর্যের মতো হরি ও হর একরূপে হয়ে গেছেন। আমি তখন তাঁদের মিলিত দে
দেখে বিস্মিত ও ভীত হয়ে স্তব করলাম। পরে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই মিথ্যা উচ্চারণ
কারিণী আমার কথাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—মিথ্যা কথা বলার মতো এত বড় পাপ আ
কিছুই নেই। এর জন্যে তুই নিম্নগামিনী হবি। তাঁদের অভিশাপে সেই বাণী নদীরূ
লাভ করল। আমি তা দেখে সেই নদীকে বললাম—যেহেতু তুমি ব্রহ্মার বাক্যে
অবস্থান করেও মিথ্যা উচ্চারণ করেছ. সেজন্যে তুমি অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেই বাক্ তখন
ভীত হয়ে হরিও হরকে স্তুতি করে শাপমোচন প্রার্থনা করল। তাব স্তবে সন্তুষ্ট
তাঁরা সেই বাণীকে বললেন—তুমি যখন গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হবে, তখন তুমি শরীর ধারণ
করে পবিত্র হয়ে উঠবে। পরে সেই বাক্ ভাগীরথী গৌতমীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার
পবিত্র দেহ ফিরে পেলেন। গৌতমীতে মিলিত হয়ে তিনিই বাণী নামে বিখ্যাত নদী
হলেন। ভাগীরথীতে তাঁর যে ধারা মিলিত হয়, তা সরস্বতী নামে অভিহিত হয়। এই
সরস্বতীসঙ্গম ও বাণীসঙ্গম পবিত্র স্থান। আমিও সেই পবিত্র স্থানে বাক্‌দোষ পরিহার
করে ব্রহ্মলোকে ফিরে যাই। সেখানে স্নান করে বাগীশ্বর শিবকে দর্শন করলে মুক্তি লা
করা যায়। সেখানে যে ব্যক্তি দান, হোম ও উপবাস প্রভৃতি করে, তার আর এ সংসারে
জন্ম হয় না। সেখানে গৌতমীর উভয় তীরে আরো অনেক অনেক তীর্থ আছে।

—'বাক্‌সঙ্গম প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ একশো ছত্রিশ

তীর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন-বিষ্ণুতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে, এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব।

পুরাকালে মুদ্গল নামে এক বিখ্যাত ঋষি ছিলেন; তাঁর পুত্রের নাম মৌদ্গল্য। মৌদ্গল্যের স্ত্রীর নাম জাবালা। সেই মৌদ্গল্য সংযত হয়ে প্রতি দিনই গঙ্গাস্নান করতেন এবং গঙ্গাস্নানের পর ভক্তিভরে বিষ্ণুর পুজো করতেন। মৌদ্গল্যের ভক্তি ও নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয়ে বিষ্ণু গরুড়বাহনে প্রতি দিনই সেই গঙ্গাতীরে মৌদ্গল্যের পুজো নিতে আসতেন। পুজো গ্রহণ করার পর মৌদ্গল্যের সঙ্গে তাঁর অনেকক্ষণ ধরে কথোপকথন হত। প্রতি দিন সন্ধ্যার দিকে মৌদ্গল্য বিষ্ণু পুজো করে ফেরবার পথে যা সংগ্রহ করে আনতেন তাতেই কোনমতে তাঁদের দিন কেটে যেত। সবাইকে খাইয়ে শেষে যা অবশিষ্ট থাকত, তাই খেতেন জাবালা। খাদ্য-দ্রব্য পর্যাপ্ত ছিল না বলে অর্ধেক দিনই জাবালার পুরো খাওয়া হয়ে উঠত না। তবু তাঁর কোন দুঃখ ছিল না মনে। রাত্রে বিষ্ণুর কাছ থেকে শোনা বিচিত্র কথা মৌদ্গল্য স্ত্রীকে শোনাতেন। একদিন মৌদ্গল্যের স্ত্রী তাঁকে বললেন—দেখ, ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে এতই যখন তোমার ঘনিষ্ঠতা, তাহলে আমাদের এত কষ্ট কেন? তুমি তাঁকে এ কথা জিগ্যেস করো।

একদিন বিষ্ণুকে পুজো করবার পর মৌদ্গল্য বিনীতভাবে তাঁকে জিগ্যেস করলেন - হে জগন্নাথ, তোমাকে দেখলেই মানুষের শোক, দারিদ্র্য ও পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। আমি তো তোমায় নিত্যই ভক্তিভরে পুজো করি; তবু আমার এত দুঃখ কেন? সাংসারিক স্বচ্ছলতাটুকুও আমার নেই কেন? আমার পুজোয় কি তবে কোন ত্রুটি হচ্ছে? মৌদ্গল্যের প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণু বললেন—প্রাণীরা নিজেদের কাজ অনুসারেই সুখ-দুঃখ ভোগ করে। এই সংসারে কেউই কারুর মঙ্গল বা অমঙ্গল করতে পারে না। বীজ যে রকম রোপণ করা হয়, ফলও সে-রকমই হয়ে থাকে। দেখ, নিমের বীজ থেকে কখনো আম বা সুস্বাদু কোন ফল জন্মায় না। যারা গৌতমীকে যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নি, হরি ও হরের অর্চনা করে নি, আর যারা ব্রাহ্মণদের দান করে নি, তারা কখনোই সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। তুমি ব্রাহ্মণদেরও কিছু দান কর নি, আমাকেও কর নি। পূর্বে যা দান করা হয়, পরবর্তী কালে তা-ই উপস্থিত হয়ে থাকে ভোগ্যদ্রব্য হিসেবে। দান ব্যতীত মানুষের কখনোই ভোগ ঘটে না। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ পবিত্র হয় এবং পরে বৈরাগ্য লাভ করে। আমার প্রতি যার অবিচল ভক্তি রয়েছে সে মুক্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু দান ও অন্যান্য সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা উপভোগের বস্তু সুলভ হয়।

বিষ্ণুর কথার উত্তরে মৌদ্গল্য বললেন—মুক্তি তো দ্রব্যভোগের থেকেও শ্রেষ্ঠ। বিশেষত দেহীদের যদি মুক্তিই লাভ হয়, তবে অন্য বিষয়ে আর কি প্রয়োজন? আমি মুক্তিরই প্রত্যাশী, ভুক্তি বা দ্রব্যভোগ আমি চাই না। বিষ্ণু তখন মৌদ্গল্যকে বললেন—ভোগ ও মুক্তির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা বলছি শোন। আমাকে স্মরণ করে ব্রাহ্মণদের অথবা অন্য প্রার্থীদের যা দান করা হয়, তা অক্ষয় হয়ে থাকে। আর আমাকে ধ্যান না করে যা দান করা হয়, তা খুব কম ফলজনক হয়ে থাকে। তাই বলি, তুমি আমাকে কিছু ভোজ্য দান কর, যা ভবিষ্যতে স্থায়ী ফল উৎপাদন করবে। তাও যদি না পারো, তবে

গোতমীর তীরে গিয়ে কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর। মৌদ্‌গল্য তখন বিষ্ণুকে বললেন—তুমি তো সবই জানো। আমার যে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। থাকবার মধ্যে আমিই আছি ; তা আমার সবকিছুই তো তোমাতেই সমর্পিত। সুতরাং কি করে আমি তোমায় দান করব ? বিষ্ণু মৌদ্‌গল্যকে কিছু না বলে গরুড়কে আদেশ দিলেন—তুমি শীগগির এখানে কিছু খুদ নিয়ে এসো ; মৌদ্‌গল্য তা-ই আমাকে দান করবে। তাতেই এর ভোগ্য লাভ হবে। বিষ্ণুর আদেশ মতো গরুড় খাদ্য-কণা নিয়ে এলো। বিষ্ণুর নির্দেশে মৌদ্‌গল্য সেই খাদ্য-কণা তাঁকেই দান করলেন।

এদিকে বিশ্বকর্মাকে ডেকে বিষ্ণু আদেশ দিলেন—আমার পরমপ্রিয় ভক্ত এই মৌদ্‌গল্য। সাত পুরুষ পর্যন্ত এদের ঘরে সোনা-দানা, ধান এবং অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যের যেন কোন অভাব না থাকে, সে ব্যবস্থা তুমি করবে। বিষ্ণুর নির্দেশ মতো মৌদ্‌গল্যের সাংসারিক সমৃদ্ধি সাধিত হল। তারপর থেকে মৌদ্‌গল্য স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সহ সেই ভোগ্যবস্তুসমূহ ভোগ করতে লাগলেন। মৌদ্‌গল্য যেখানে বিষ্ণুর পূজা করতেন, সেই গোতমীর তীর তারপর থেকে মৌদ্‌গল্য ও বিষ্ণুতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেই তীর্থে স্নান করলে ভোগ, মুক্তি সব কিছুই পাওয়া যায়। সেখানে গঙ্গার উভয় তীরে আরো অনেক তীর্থ আছে ; সেই সব তীর্থে স্নান, দান প্রভৃতি করলে মানুষ সমস্ত সিদ্ধিলাভ করে।

—'মৌদ্‌গল্যতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো সাঁইত্রিশ

তীর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—লক্ষ্মীতীর্থ নামে একটি বিখ্যাত তীর্থ আছে, এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে লক্ষ্মী ও দরিদ্রার মধ্যে পারস্পরিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে বিবাদ বাধে। অলক্ষ্মী দরিদ্রা লক্ষ্মীকে সম্বোধন করে বললেন—দেখ, তোমার থেকেও আগে আমার উৎপত্তি হয়েছে ; সুতরাং আমি শ্রেষ্ঠ। তার উত্তরে লক্ষ্মী বললেন—প্রাণীদের কুল, চরিত্র ও জীবন এ সমস্তই আমার অধীন। আমি না থাকলে প্রাণীরা বেঁচে থেকেও মরার মতো হয়ে পড়ে। সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠ। অলক্ষ্মী তখন লক্ষ্মীকে উদ্দেশ করে বললেন—আমিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মুক্তি আমাকেই আশ্রয় করে থাকে। আরও দেখ, আমি যেখানে থাকি সেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য কখনো থাকতে পারে না। আমি যেখানে থাকি সেখানে ভয় থাকে না, উন্মত্ততা, ঈর্ষা প্রভৃতিও থাকে না। দরিদ্রার মুখে এ কথা শুনে লক্ষ্মী তাকে বললেন—আমি যাকে আশ্রয় করি সে সর্বত্রই পূজিত হয়ে থাকে ; নির্ধন ব্যক্তি শিবের মতো সম্মানীয় হলেও কেউ তাকে কুশল প্রশ্নও জিগ্যেস করে না। মানুষের শরীরে ধী, শ্রী, হ্রী, শান্তি ও কীর্তি প্রভৃতি যে পঞ্চদেবতা থাকে, তা অচিরেই লোপ পায় যখন মানুষ কারুর কাছে কোন কিছু যাচঞা করে। অপরের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলেই জনগণের গুণ ও গুরুত্ব হ্রাস পায়। নির্ধনতার মতো কষ্টদায়ক মহাপাপ প্রাণীদের আর নেই ; কারণ নির্ধন ব্যক্তিকে জনগণ মান্য করে না, কথা বলে না, এমন কি স্পর্শও করে না। দরিদ্রা লক্ষ্মীর কথা শুনে বললেন—বারবার তোমার জ্যেষ্ঠতা প্রতিপাদন করতে লজ্জা হচ্ছে না ? তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষকে পরিহার করে পাপ ব্যক্তিকেই

আশ্রয় করে থাক। যে তোমাকে বিশ্বাস করে, তোমাতে আস্থা স্থাপন করে, তাকে তুমি বঞ্চিত করে থাক। তোমার সংস্পর্শে এসে বিদ্বান ব্যক্তির যেমন মত্ততা হয়, মদ্যপান করলেও মানুষের তেমন মত্ততা জন্মে না। শিব ও বিষ্ণুতে অনুরক্ত, কৃতজ্ঞ, মহৎ, সদাচারী, শান্ত ও গুরুসেবাপরায়ণ, সাধু, বিদ্বান, বীর ও সজ্জন ব্যক্তিকেই আমি সর্বদা আশ্রয় করে থাকি। আর তোমার আশ্রয়ের কথা কি বলব! রাজকর্মচারী, পাপী, নিষ্ঠুর, খল, অসাক্ষাতে পরের নিন্দাকারী, লোভী, অযোগ্য কর্মচারী, শঠ, অনার্য, কৃতঘ্ন, মিত্রদ্রোহী ও হীনচেতা ব্যক্তিকে তুমি আশ্রয় করে থাক।

তারা এ রকম বিবাদ করতে করতে কোন রকম মীমাংসায় না পেঁছিতে পেরে আমার কাছে এলো। আমাকে মীমাংসা করতে অনুরোধ করলে আমি তাদের বললাম—দেখ, আমার আগে জন্মেছে পৃথিবী, তারও আগে জলের উৎপত্তি। তারা উভয়েই স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকই স্ত্রীলোকের বিবাদ মেটাতে সক্ষম। এদের মধ্যে আবার জলই শ্রেষ্ঠ, জলের মধ্যে আবার গোতমী শ্রেষ্ঠতর। তোমরা গোতমী নদীর তীরে যাও; তিনিই তোমাদের দ্বন্দ্ব মেটাতে সমর্থ। তারপর আমার কথামতো তারা গোতমীর তীরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে সমস্ত কথাই জানাল। সমস্ত কথা শুনে গোতমী বললেন—ব্রহ্মশ্রী, তপঃশ্রী, যজ্ঞশ্রী, কীর্তি, ধনশ্রী, যশঃশ্রী, বিদ্যাশ্রী, প্রজ্ঞাশ্রী, সরস্বতী, মুক্তি, স্মৃতি, লজ্জা, ধৃতি, ক্ষমা, সিদ্ধি, তুষ্টি পুষ্টি, শান্তি, আপ্, পৃথিবী, আমি, শক্তি ওষধি, শ্রুতি, শুদ্ধি, স্বর্গ, আশীর্বাদ, স্বস্তি, ব্যাপ্তি, মায়া, ঊষা ও শিবা প্রভৃতি সংসারে যত ভালো জিনিস আছে সে সমস্তকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করে থাকেন। ব্রাহ্মণ, ধীর, ক্ষমাবান, সাধু, বিদ্বান ও অন্যান্য সচ্চরিত্র ব্যক্তিদের লক্ষ্মীই আশ্রয় করে থাকেন। যা কিছু সুন্দর, তা-ই লক্ষ্মীযুক্ত। যে কোন জায়গায় যা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু দেখা যায় সে সবই লক্ষ্মীময়। সুতরাং দরিদ্রা বা অলক্ষ্মী কোন মতেই লক্ষ্মীর চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়।

গোতমীর কথা শুনে অলক্ষ্মী ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেল। তার পর থেকেই সেই তীর্থ অলক্ষ্মীনাশক ও শুভসম্পাদক হয়ে আছে। সেখানে স্নান করলে লক্ষ্মীবান ও পুণ্যবান হওয়া যায়। সেই পুণ্যতীর্থের কাছাকাছি আরো অনেক তীর্থ আছে।

—'লক্ষ্মীতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশ আটত্রিশ

এবার তোমাকে ভানুতীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে শর্যাতি নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল স্থবিষ্ঠা, তিনি রূপে অতুলনীয়া ছিলেন। সেই রাজার পুরোহিত ছিলেন বিশ্বামিত্রের পুত্র ব্রহ্মর্ষি মধুচ্ছন্দা। একবার পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে রাজা শর্যাতি দিগ্বিজয়ে বের হলেন। নানা দিগ-দেশস্থ রাজাদের পরাজিত করে বিশ্রামের জন্য পথের মধ্যে এক সময় তাঁরা বসলেন। মধুচ্ছন্দাকে দুঃখিত এবং চিন্তান্বিত দেখে রাজা তাঁকে জিগ্যেস করলেন—আমি দিগ্বিজয় করলাম; সুতরাং এ তো আনন্দের সময়। তাছাড়া আমার রাজ্যে আপনি সকলেরই নমস্য; তথাপি আপনাকে উদ্বিগ্ন এবং দুঃখিত দেখছি কেন? এর কারণ কি বলুন। রাজার কথা শুনে মধুচ্ছন্দা একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেই দ্বিধার ভাব কাটিয়ে তিনি রাজাকে বললেন—দেখুন, অনেক দিন আমি রাজ্যছাড়া। আমার স্ত্রী অত্যন্ত পতিব্রতা এবং আমাকে দেখতে না

পেলে সে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। এত দিন তার কাছ থেকে দূরে রয়েছি বলে, তার জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে। আর বুঝতেই তো পারছেন, আমাদের এই তরুণ বয়সে কামের প্রভাব কি প্রচন্ড। তাই দুঃখে এবং উদ্বেগে আমি প্রায় ভেঙে পড়েছি। মধুচ্ছন্দার এ কথা শুনে রাজা হেসে বললেন—আপনি আমার গুরু এবং বন্ধু দুই-ই। কেন আমাকে বিড়ম্বনা দিচ্ছেন? মহান ব্যক্তিদের তো ক্ষণস্থায়ী সুখে আস্থা থাকে না। তবে কেন আপনি এই সামান্য কারণে অধীর এবং উদ্বেল হয়ে পড়ছেন? এ আপনার পক্ষে শোভা পায় না। রাজার কথা শুনে মধুচ্ছন্দা বললেন-দেখুন, দম্পতির যেখানে পরস্পর আনুকূল্য থাকে, সেখানে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ বর্ধিত হয়; এ তো দোষের নয় ববং মঙ্গলের জন্যই এর প্রতিষ্ঠা।

রাজা এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মধুচ্ছন্দাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং পুরোহিতের অজ্ঞাতসারেই রাজধানীর মধ্যে এ কথা ঘোষণা করে দিলেন যে, রাজা শর্যাতি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করার পর একটা বলবান রাক্ষস পুরোহিতের সঙ্গে তাঁকে হত্যা করে পাতালে পালিয়ে গেছে। এ কথা শুনে রাজপত্নী এর সত্যাসত্য নিরূপণে সচেষ্ট হলেন আর পুরোহিত পত্নী তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। দূতেরা রাজাকে সব কথা জানাল। রাজা মধুচ্ছন্দার প্রেম এবং তাঁর স্ত্রীর পাতিব্রত্য পরীক্ষার জন্যই এ রকম ঘোষণা করেছিলেন; তিনি ভাবতে পারেন নি যে, এ রকম দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে। তিনি খানিকক্ষণ চিন্তা করে দূতদের বললেন-তোমরা সেই পুরোহিত-পত্নীর দেহ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা কর। রাজা দূতদের এ রকম আদেশ দেওয়ার পর ইতিকর্তব্য বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন এক আকাশবাণী শোনা গেল। সেই আকাশবাণীর বক্তব্য ছিল এ রকম-শর্যাতি, তুমি গোতমীর তীরে যাও এবং সেখানে স্নান, দান প্রভৃতি কর। সেই গোতমী সমস্ত দুঃখ কষ্টের নিবারণ করেন।

সেই আকাশবাণী শুনে রাজা গোতমীর তীরে গিয়ে সেখানে স্নান করে ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত ধন দান করলেন এবং অন্যান্য তীর্থে গিয়ে দরিদ্রদের ধন দান ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করলেন। তারপর গঙ্গাতীরে গিয়ে অগ্নিপ্রবেশ করতে ইচ্ছুক হয়ে তার উদ্যোগ করতে লাগলেন। মধুচ্ছন্দা এর বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। যাই হোক, রাজা অগ্নি প্রবেশের পূর্বে গঙ্গা, সূর্য ও দেবতাদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বললেন যে, আমি যদি দান, হোম ও প্রজাপালন করে থাকি, তবে সেই কাজের জন্য আমার আয়ু নিয়ে সাধ্বী পুরোহিত পত্নী বেঁচে উঠুন। রাজা এ কথা বলেই আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এদিকে পুরোহিত পত্নীও বেঁচে উঠলেন। মধুচ্ছন্দা এ সব কথা জানতে পেরে খুব বিস্মিত হলেন। বিশেষত তাঁর স্ত্রীর জন্য রাজার এ রকম আত্মত্যাগ দেখে তিনি ইতিকর্তব্য বিষয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তিনি অনেক চিন্তা করে ঠিক করলেন যে, আগে রাজার প্রাণ ফিরিয়ে আনা দরকার। সেজন্য তিনি গোতমীর তীরে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন। মধুচ্ছন্দা বললেন-আমি মুক্তির কারণ স্বরূপ সেই অমিততেজা সূর্যকে নমস্কার করি। আপনি ছন্দোময়, ওংকারস্বরূপ, বিরূপ, সুরূপ, ত্রিগুণাত্মক এবং ত্রিমূর্তিধর; আপনাকে আমার নমস্কার জানাই। মধুচ্ছন্দার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে সূর্য তাঁকে বর গ্রহণ করতে বললেন। তিনি তখন বললেন—আপনি রাজাকে জীবন দান করুন; তারপর আমার যাতে সুপুত্র হয় এবং রাজার যাতে কল্যাণ হয়, সে রকম ব্যবস্থা করুন—এইই আমার প্রার্থনা। সূর্য মধুচ্ছন্দার সমস্ত প্রার্থিত বস্তুই প্রদান করলেন। রাজা তখন

প্রিয়জনে মিলিত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। তার পর থেকেই সেই স্থান 'ভানুতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে ; মৃতসঞ্জীবন এবং শার্যাতি নামেও এর পরিচিতি আছে। মাধুচ্ছন্দস নামেও একে অভিহিত করা হয়। এই মৃতসঞ্জীবন তীর্থে স্নান করলে আয়ু ও আরোগ্য লাভ করা যায়।

—'ভানুতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো উনচল্লিশ

গোতমীর উত্তর তীরে খড়্গতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। তপস্বী ব্রাহ্মণ কবষের পৈলুষ নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি সংসার প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জন করার চেষ্টায় ক্রমাগত এক বৃত্তি ছেড়ে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন বৃত্তিতেই আশানুরূপ অর্থ উপার্জিত হল না। তিনি তখন বিষয়তৃষ্ণার কথা ভাবতে লাগলেন। সেই প্রবল বিষয়-তৃষ্ণা যেন দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁকে কুপথে আকর্ষণ করছিল। তিনি তখন বিমূঢ় হয়ে সেই প্রবল বিষয়তৃষ্ণা দূরীকরণের উপায় জানতে পিতা কবষের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন—জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ক্রোধ, লোভ, এমন কি অন্যান্য প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রামকেও বিনষ্ট করা যায়, কিন্তু বিষয়তৃষ্ণাকে কিসের দ্বারা বিনষ্ট করা যায় ? দয়া করে এর উপায় বলুন। বিষয়তৃষ্ণায় নিতান্তই পীড়িত হয়ে পড়েছি আমি। পুত্রের কথা শুনে কবষ বললেন—তৃষ্ণা দূরীকরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান ভিক্ষা করবে—এ রকম শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়। তুমি ভগবান শঙ্করের আরাধনা কর, তাহলে তুমি জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

তারপর পিতার পরামর্শ মতো পৈলুষ শঙ্করকে আরাধনায় তুষ্ট করলেন। শঙ্করের প্রসাদে পৈলুষ জ্ঞান লাভ করলেন। জ্ঞানলাভ করার পর তিনি এই গাথা-উচ্চারণ করেন য, ক্রোধই পরম শত্রু, তাকে জ্ঞান খড়্গ দিয়ে কেটে ফেলবে। মায়াময়ী তৃষ্ণা অনেক রকমের য়ে থাকে ; এই তৃষ্ণা পাপের জন্ম দেয় এবং সংসার বন্ধনকে দৃঢ় করে। দেবতাদের মধ্যে এ রকম কথা শোনা যায় যে, সঙ্গ অধর্ম। অসঙ্গ আত্মার পক্ষে এই সঙ্গই পরম শত্রু সংশয় বনাশের উপায়স্বরূপ ; ধর্ম এবং অর্থকে এই সংশয় বিনষ্ট করে। আশা পিশাচীর মতো নগণের হৃদয়ে প্রবেশ করে সমস্ত সুখের অপমৃত্যু ঘটায় ; জ্ঞানরূপ খড়্গ দিয়েই এ মস্তকে বিনষ্ট করবে।

পৈলুষ এভাবে জ্ঞান খড়্গের দ্বারা তৃষ্ণা ও সংশয় ছেদন করে মুক্তি লাভ করেছিলেন। রপর থেকেই সেই তীর্থ 'খড়্গতীর্থ' নামে পরিচিত হয়ে আসছে ; একে জ্ঞানতীর্থ, বষতীর্থ ও পৈলুষতীর্থ নামেও অভিহিত করা হয়। সেখানে আরো অনেক তীর্থ াছে। ওই তীর্থসমূহ পাপরাশি নষ্ট করে বলে মহর্ষিরা বলে থাকেন।

—'খড়্গতীর্থ বর্ণন নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো চল্লিশ

বার তোমাকে আত্রেয়তীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থ অশ্বিন্দ্র নামেও অভিহিত হয়। ূরাকালে আত্রেয় ঋষি গোতমীর উত্তর তীরে মুনি-ঋষিগণে পরিবৃত হয়ে বিবিধ সত্র

আরম্ভ করেন। সেই সত্রে স্বয়ং অগ্নি হোতা হয়েছিলেন। সেই সত্র শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি আবার মাহেশ্বরী ইষ্টি আরম্ভ করেন। সেই ইষ্টি সম্পাদন করার ফলে আত্রেয় ঐশ্বর্য লাভ করেন এবং সর্বত্র যাওয়ার মতো অবাধ গতি তাঁর লাভ হয়। তপঃপ্রভাবে তিনি কি স্বর্গ, কি পাতাল সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি একবার ইন্দ্রলোকে যান। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, ইন্দ্র দেববৃন্দে পরিবৃত হয়ে রয়েছেন, সিদ্ধ এবং সাধ্যেরা তাঁর স্তব করছে। তিনি মধুর সঙ্গীত শুনছেন এবং অপ্সরাদের নাচ দেখছেন। তাঁর কোলে রয়েছে তাঁরই পুত্র জয়ন্ত এবং পাশে একই আসনে বসে রয়েছেন শচী। এ রকম দৃশ্য দেখে আত্রেয় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। দেবতারা আত্রেয়কে যথোচিত সৎকার করলেন। আত্রেয় সেখান থেকে নিজের আশ্রমে ফিরে এসে ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য এবং ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে নিজের আশ্রমের মালিন্য এবং বিত্তহীনতা দেখে ব্যথিত হয়ে পড়লেন। আশ্রমে বাস এবং আশ্রমের খাদ্যে তাঁর রুচি হল না। তিনি তখন তপস্যা প্রভাবে বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করে বললেন—দেখ, আমি ইন্দ্রত্ব আকাঙ্খা করি; অতএব এখানেই তুমি ইন্দ্রলোক তৈরি কর যদি আমার কথা তুমি অগ্রাহ্য কর, তবে তোমায় ভস্মীভূত করব। আত্রেয়র কথা অনুসারে বিশ্বকর্মা সেখানে মেরুপর্বত, দেবতাদের পুরী, কল্পবৃক্ষ, দিব্যগৃহসমূহ, মনোরম বিহারশালা, সুধর্মা নামক সভা, মনোজ্ঞ অপ্সরাসমূহ এবং দ্বিতীয় শচীও সৃষ্টি করলেন। নিজের স্ত্রী আত্রেয়কে এ সব করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও আত্রেয় সেই দ্বিতীয় শচীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলেন। বস্তুত আপাতরম্য বস্তুসমূহ যদি নয়নগোচর হয়, তবে কার না তাতে আসক্তি জন্মায়?

এদিকে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা মনে করল যে, ইন্দ্র যখন মর্ত্যে এসেছে, তখন তার সঙ্গে যুদ্ধ করার এইই উপযুক্ত সময়। তারা তখন সেই দ্বিতীয় ইন্দ্রপুরীকে বেষ্টন করে শরবর্ষণ করতে লাগল। আত্রেয় এ সব দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি দৈত্য ও দানবদের উদ্দেশ্য করে বললেন—তোমরা ভুল করছ। যিনি নিয়ত আনন্দময়, মনস্বী ও সবার আগে যিনি উৎপন্ন হয়েছেন, তিনিই ইন্দ্র। যাঁর প্রভাবে স্বর্গলোক এবং মর্ত্য সম্যক ব্যাপ্ত রয়েছে, যিনি সংসার সুখ প্রদান করেন, তিনিই ইন্দ্র, আমি নই। আত্রেয় তখন ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করলেন—আমি ইন্দ্র নই, আর এই যে শচীরূপী আমার স্ত্রী, ইনিও প্রকৃত শচী নন। আমি গৌতমীতীরবাসী বেদবিদ ব্রাহ্মণ। যা প্রকৃতপক্ষে আমার পক্ষে সুখদায়ক নয়, সেই কুকর্মই আমি করে ফেলেছি। দৈত্যরা সে কথা শুনে আত্রেয়কে বলল—তুমি এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি ত্যাগ কর। তাহলেই তোমার সমূহ মঙ্গল হবে। আত্রেয় তখন বললেন—আপনারা আমাকে যেমন বলছেন, সেই রকমই আমি করব। আমি এই অগ্নিস্পর্শ করে বলছি, এখনই আমি সব ধ্বংস করে ফেলব। তিনি তখন বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন—দেখ, তুমি এই কৃত্রিম ইন্দ্রলোক ধ্বংস কর। আমাকে আবার সেই আশ্রম, সেই বৃক্ষসমূহ, জলাশয়সমূহ—যা যেমন ছিল, সব ফিরিয়ে দাও। আমার এ দিব্য ঐশ্বর্যে প্রয়োজন নেই। বস্তুত বিশ্ববিধানকে লঙ্ঘন করে যা পাওয়া যায়, মনীষীদের পক্ষে তা সুখদায়ক হয় না।

যাহোক, আত্রেয়ের নির্দেশে সেই কৃত্রিম ইহলোক ধ্বংস করে বিশ্বকর্মা চলে গেলেন। দৈত্যরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে চলে গেল আর আত্রেয় গৌতমীতীরে মুনিগণ পরিবৃত হয়ে বললেন—হায়, মোহের কী মহিমা! তার প্রভাবে পড়ে আমিও বিপথে চালিত হয়েছিলাম। সে সময় দেবতারা সেখানে এসে আত্রেয়কে বললেন—তোমার লজ্জিত হওয়ার

কোন কারণ নেই। তোমার নামেই আজ থেকে এই তীর্থ বিখ্যাত হবে। এই আত্রেয়তীর্থে যারা স্নান করবে, তারা ইন্দ্রত্ব লাভ করতে পারবে। এই তীর্থ অন্বিন্দ্র, আত্রেয়, দৈত্যেয় প্রভৃতি নামে কীর্তিত হবে। এখানে আরো যে সব তীর্থ রয়েছে, সেখানে স্নান করলে পুণ্যলাভ হবে। দেবতারা এ কথা বলেই আত্রেয়কে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

—'অন্বিন্দ্র আত্রেয় প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো একচল্লিশ

তীর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—এবার তোমাকে কপিলসঙ্গম নামক তীর্থের কথা শোনাব। কপিল নামে এক তত্ত্বজ্ঞ, মহাযশা ও তপঃপরায়ণ মুনি ছিলেন। বামদেব প্রভৃতি মুনিরা ব্রহ্মশাপের দ্বারা বেণ রাজাকে নিহত করলে, রাজ্য অরাজক হয়ে পড়ল। ধর্ম প্রায় লোপ পেতে বসল, বেদ-বাণী ব্যর্থ হয়ে পড়ল। মুনিরা তখন গোতমী-তীরস্থিত তপস্যাপরায়ণ সেই মুনিশ্রেষ্ঠ কপিলের কাছে এসে তাঁকে বললেন—বেদ বিলুপ্ত হয়েছে, ধর্ম গতপ্রায়, রাজ্যও শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়েছে। আপনি মহাজ্ঞানী, দয়া করে এর একটা বিহিত করে দিন। কপিল সেই মুনিদের কথা শুনে ধ্যানে বসলেন। তারপর বললেন—দেখ, তোমরা সেই বেণ রাজার উরু মন্থন কর। সেই মথিত উরু থেকে এক পুরুষের উৎপত্তি হবে। কপিলের কথামতো মুনিরা তাই করলেন। তখন বেণের সেই উরু থেকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষের উৎপত্তি হল। মুনিরা সেই পুরুষকে দেখে ভীত হয়ে বললেন—নিষীদ, উপবেশন কর। সেই থেকেই সেই পুরুষের নাম হল নিষাদ। সেই নিষাদ থেকেই নিষাদদের উৎপত্তি হয়। পরে মুনিরা সেই বেণরাজের ধর্মসমন্বিত ডান হাত মন্থন করলেন, তা থেকেও এক পুরুষের উৎপত্তি হল, সেই পুরুষকে মুনিরা 'পৃথু' নামে অভিহিত করলেন। মুনিরা তাঁকে রাজা করেন। পৃথু রাজা হলে পর দেবতারা তাঁকে আশীর্বাদ করেন। তারপর মুনিরা কপিলকে সঙ্গে নিয়ে পৃথুকে বললেন—রাজা, প্রজারা অনেক দিন থেকে ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছে, আপনি তাদের আহারের ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া পৃথিবী যে সব মহৌষধি গ্রাস করেছেন, সে সবও আপনি ফিরিয়ে দিন। ঋষিদের কথা শুনে পৃথু ধনুক নিয়ে পৃথিবীকে বললেন—শোন পৃথিবী, তুমি যে সব ওষধি গ্রাস করেছ, প্রজাদের হিতকামনায় তা ফিরিয়ে দাও। পৃথিবী তাঁকে বললেন—মহৌষধিসমূহ আমি জীর্ণ করে ফেলেছি। কি ভাবে তা ফিরিয়ে দেব? পৃথিবীর কথা শুনে পৃথু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তুমি যদি মহৌষধিসমূহ ফিরিয়ে না দাও, তবে তোমাকে আমি হত্যা করব। তার উত্তরে পৃথিবী বললেন—আপনি মহাজ্ঞানী রাজা হয়ে কি করে স্ত্রীলোককে হত্যা করবেন? আর আমাকে যদি আপনি মেরেই ফেলেন, তবে এই প্রজাদের ধারণ করবে কে? পৃথু সে কথার উত্তরে বললেন—যেখানে একের বিনাশে অনেকের উপকার হয়, তার বধে কোন দোষ নেই। আমি তপস্যার প্রভাবে প্রজাদের ধারণ করব। সুতরাং তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই।

পৃথু এবং পৃথিবীর মধ্যে এ রকম বাদানুবাদ চলতে থাকলে দেবতারা সেখানে এসে পৃথুকে শান্ত হতে উপদেশ দিলেন এবং পৃথিবীকে বললেন—তুমি গো-রূপ ধারণ করে পৃথুকে দুগ্ধরূপ মহৌষধি দান কর। তাহলে রাজা খুশি হবেন এবং প্রজাসংরক্ষণও হবে। দেবতাদের পরামর্শমতো পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করে কপিলের সামনে এসে

বসলেন, আর রাজা পৃথু তখন মহৌষধিসমূহ দোহন করতে লাগলেন। পরে পৃথিবী নদীরূপে পরিণত হয়ে গৌতমীর সঙ্গে মিলিত হন। তারপর থেকেই সেই তীর্থ 'কপিল-সঙ্গম' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেখানে আরও অনেক তীর্থ আছে ; তাদের নাম স্মরণ করলেও পুণ্য লাভ হয়।

—'কপিলসঙ্গমতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো বিয়াল্লিশ

দেবস্থান নামে বিখ্যাত একটি তীর্থ আছে। এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে সত্যযুগের প্রথম ভাগে অমৃত মন্থনের পর দেবতা ও দানবদের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। সিংহিকা নামক দৈত্যসুন্দরীর পুত্র রাহু সেই যুদ্ধে বিষ্ণু কর্তৃক আহত হয়, কিন্তু সে অমৃত পান করেছিল বলে, তার মৃত্যু হয় নি। রাহুর পুত্র মেঘহাস তার পিতার মৃত্যুর কথা শুনে অতি দুঃখিত হয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিশোধ নেবার মানসে সে গৌতমীর তীরে তপস্যায় রত হল। তাকে কঠোর তপস্যায় রত দেখে দেবতা ও ঋষিরা বললেন—তুমি তপস্যা পরিত্যাগ কর। তোমার মনে যা আছে, শিব-গঙ্গার প্রসাদে সে সবই তুমি লাভ করতে পারবে। মেঘহাস তাঁদের বলল—আমার পূজনীয় পিতাকে আপনারা মেরে ফেলেছেন ; সেজন্যই আমাকে এই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। আপনারা যদি এমন কিছু করেন যা আমার এবং আমার পিতার পক্ষে মঙ্গলজনক, তবে আমি তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হব।

দেবতারা তখন রাহুকে গ্রহত্বে অভিষিক্ত করলেন এবং সেই মেঘহাসকে নৈঋর্তদিকের অধিপতি করে দিলেন। মেঘহাস তারপর দেবতাদের কাছে এই আবেদন রাখল যাতে আমার খ্যাতি হয় সেজন্য এই তীর্থের মাহাত্ম্যবিষয়ক আদেশও দান করুন। দেবতারা তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। মেঘহাসের নামেই সেই তীর্থ অভিহিত হল। দেবতারা সেখানে এসেছিলেন বলে, ঐ তীর্থ 'দেবস্থান' নামেও পরিচিত। এই তীর্থে স্নান করলে মহাপাপও বিনষ্ট হয়ে যায়।

—'দেবস্থান প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো তেতাল্লিশ

সিদ্ধেশ্বর শিব যেখানে বিরাজ করেন সেই স্থান সিদ্ধতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। পুরাকালে পুলস্ত্যবংশোদ্ভূত রাবণ সমস্ত দিক জয় করে সোমলোকে গেল। সোমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলে রাবণকে আমি বললাম—রাবণ, তুমি যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ কর ; আমি তোমাকে একটি মন্ত্র দান করছি। সেই মন্ত্রের সাধন করলে তোমার অভীষ্ট বস্তু লাভ সহজ হবে। এ কথা বলেই তাকে আমি শিবের অষ্টোত্তর শতনামের সঙ্গে সেই মন্ত্র দান করলাম। রাবণ কিন্তু আমার কাছ থেকে মন্ত্র নিলেও সোমলোকে গেল এবং সেখান থেকে জয়গর্বে গর্বিত হয়ে শুক ও সারণ নামে তার বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে ফিরে এলো। পুষ্পক-বিমানে পথে যেতে যেতে সে কৈলাস পর্বতকে দেখতে পেল। সে তখন তার মন্ত্রীদের জিগ্যেস করল—তোমরা কি জানো, এই পর্বতে কোন্ মহাত্মা বাস করেন ? যারই হোক,

আমি ঠিক করেছি যে একে লংকায় নিয়ে যাব। এই মনোরম পর্বত লংকায় থাকলে এর শোভা যেমন স্ফুরিত হবে তেমনই লংকারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। মন্ত্রীরা রাবণকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে তাদের কথা অগ্রাহ্য করে সেই পর্বতের সানুদেশে গিয়ে তাকে উৎপাটিত করতে চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে রাবণের কাজ দেখে শিব তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সামান্য একটু চাপ দিলেন. তাতেই সেই দিগ্বিজয়ী রাবণ ক্রমেই পাতালে চলে যেতে লাগল। তার চিৎকার শুনে ভগবান শংকর তাকে অভীষ্ট বর প্রদান করলেন ; যদিও তিনি তার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। শিবচরিত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য যে তিনি অযোগ্য লোককেও বরদান করেন। শিবের বর লাভ করে রাবণ পুষ্পকরথে চড়ে লংকায় ফিরে গেল। পথে যেতে যেতে সে গঙ্গায় স্নান করে শিবের পুজো করল। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সমস্ত সিদ্ধি তো দান করলেনই পরন্তু একটি তরবারিও তাকে দান করলেন। রাবণ যেখানে শিবের পুজো করে সিদ্ধিলাভ করে সেই স্থান অতি পবিত্র। ঐ স্থান 'সিদ্ধ তীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

—'সিদ্ধতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো চুয়াল্লিশ

পরুষ্ণীসঙ্গম নামে একটি বিখ্যাত তীর্থ আছে, এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে অত্রি ঋষি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আরাধনা করলে তাঁরা বরদান করতে উদ্যত হন। অত্রি তাঁদের বলেন--আপনারা যদি আমার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করুন। আর আমার যাতে একটি রূপবতী কন্যা জন্মায় সে বরও আপনারা আমাকে দান করুন। পরে আমি, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলাম ; আমাদের নাম হল যথাক্রমে--দত্ত, সোম ও দুর্বাসা। আমাদের বরে অত্রির যে রূপবতী কন্যাটির জন্ম হল. তার নাম আত্রেয়ী। অগ্নি থেকে অঙ্গিরা ঋষির জন্ম হয় ; অঙ্গার থেকে জন্ম হয় বলেই তাঁর নাম হয় অঙ্গিরা। সেই আত্রেয়ীকে তিনি অঙ্গিরার হাতে সম্প্রদান করেন।

অঙ্গিরার অনেক গুণের মধ্যে একটি দোষ ছিল এই যে, তিনি সর্বদাই আত্রেয়ীকে কর্কশ বা পরুষ বাক্য বলতেন। অথচ আত্রেয়ী সর্বদাই তাঁর সেবা করতেন। আত্রেয়ীর গর্ভে আঙ্গিরসদের উৎপত্তি হয়। একবার অঙ্গিরার পরুষ উক্তিতে দুঃখিত হয়ে আত্রেয়ী তাঁর শ্বশুর অগ্নিকে বিনীতভাবে বললেন-দেখুন, আমি সর্বদাই পতিপুত্রদের সেবা-শুশ্রূষায় নিরত থাকি ; তথাপি পতি আমাকে ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখেন এবং পরুষ উক্তি করেন। কি করলে তিনি শান্ত হয়ে আর কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করবেন না, সে-কথা আপনি বলে দিন। আত্রেয়ীর কথা শুনে অগ্নি বললেন--শোন. তোমার স্বামীর জন্ম অঙ্গার থেকে ; সুতরাং সে যখন অগ্নির দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে. তখন তুমি তাঁকে জল দিয়ে প্লাবিত করবে। তাহলে সে আর তোমার উদ্দেশে কর্কশ ভাষা ব্যবহার করবে না। অগ্নির কথায় শংকিত হয়ে আত্রেয়ী বললেন--না না, আমি না হয় কর্কশ বাক্য সহ্যই করব, কিন্তু আমার স্বামী যেন অগ্নিতে প্রবেশ না করেন। অগ্নি তাকে আশ্বস্ত করে বললেন--তোমার শংকার কোন কারণ নেই। 'যে আমি সেও সেই'--এ রকম চিন্তা করো। তুমি

জানবে যে, অগ্নিই তোমার শ্বশুর এবং জল অঙ্গিরার মাতা। আত্রেয়ী তখন বিস্মিত হয়ে অগ্নিকে বললেন—আপনি অগ্নি, আপনার পুত্রের আমি পত্নী, এবং জল তাঁর জননী—আপনি এ কথাই তো বললেন। তাহলে আমি পত্নী হয়ে জলাকারে কি করে জননীরূপ ধারণ করব? এ তো অতি বিরুদ্ধ কথা। আত্রেয়ীর কথার উত্তরে অগ্নি বললেন—বিবাহিতা রমণী প্রথমে পত্নীই থাকেন, তারপর ভরণ করেন বলে তিনি ভার্যা, পরে তাতে পুত্ররূপে জন্ম হয় বলে তাঁকে জায়া বলা হয়, নিজগুণে ফল অর্থাৎ মধুর কথায় শোক-দুঃখ প্রভৃতি থেকে ত্রাণ করেন বলে তাঁকে কলত্র বলা হয়। তুমিও এ রকম রূপই ধারণ করছ। এজন্যই বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, পুত্র জন্মগ্রহণ করলে পত্নী আর পত্নী থাকে না। অগ্নির পরামর্শমতো আত্রেয়ী তখন জলরূপে স্বামীকে প্লাবিত করলেন। গঙ্গার জলে অভিষিক্ত হয়ে অঙ্গিরা শান্ত রূপ ধারণ করলেন। তাঁদেরকে দেখে লক্ষ্মীযুক্ত বিষ্ণু, উমাসহ শংকর এবং রোহিণীসমন্বিত চন্দ্র বলে মনে হচ্ছিল। স্বামীকে অভিষিক্ত করার জন্য আত্রেয়ী যে জলময় দেহ ধারণ করেন, তা থেকে এক নদীর উৎপত্তি হয়, তার নাম হয় পরুষ্ণী। সেই পরুষ্ণী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। ওই পরুষ্ণীতে স্নান করলে শত গোদানের ফল পাওয়া যায়। আঙ্গিরস যেখানে অনেক যজ্ঞ করেছিলেন, সেখানে গঙ্গার উভয় তীরে অনেক তীর্থ আছে। গঙ্গার সঙ্গে পরুষ্ণী যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে স্নান করলে কত যে পুণ্য লাভ হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

—'পরুষ্ণীসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো পঁয়তাল্লিশ

তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন-মার্কণ্ডেয় তীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে, এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, অত্রি, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, জাবালি প্রভৃতি অন্যান্য মুনিরা পরস্পর মিলিত হয়ে কিসে মুক্তি হয় সে আলোচনায় একবার প্রবৃত্ত হন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মুক্তির উপায় হিসেবে জ্ঞানের, কেউ কেউ কর্মের, কেউ কেউ আবার জ্ঞান ও কর্মের প্রশংসা করেন। কোন সর্বজন-স্বীকৃত সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে তাঁরা আমার কাছে আমার মত কি জিগ্যেস করলেন। আমার কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁরা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁকে জিগ্যেস করেন; কিন্তু তাতেও তাঁদের পরিতৃপ্তি না হওয়ায় তাঁরা গৌতমীতীরে গিয়ে ভগবান শংকরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁকে মুনিরা বিতর্কিত বিষয়ে জিগ্যেস করায় তিনি কর্মেরই প্রশংসা করেন। জ্ঞান প্রধান হলেও সেই জ্ঞান যখন ক্রিয়ারই রূপান্তর এবং সেই ক্রিয়াকে যখন কর্ম বলা হয়, তখন এ কথা স্পষ্ট হয় যে, কর্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করা যায়। বিদ্যাভ্যাস, যজ্ঞানুষ্ঠান, যোগাচরণ, শিবপুজো—সবই তো কর্ম; অকর্মী প্রাণী কোথাও দেখা যায় না। অতএব কর্মই প্রকৃতপক্ষে মুক্তির কারণ। কর্ম ছাড়া জ্ঞানের প্রাধান্য বলা আর প্রলাপ বকা একই কথা। এই-ই ছিল শংকরের অভিমত। মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিরা যেখানে এই তত্ত্ব কথা জানতে পারেন, সেই স্থান 'মার্কণ্ডেয় তীর্থ' নামে পরিচিত। গঙ্গার উত্তর তীরে এই তীর্থ অবস্থিত। সেখানে আরো অনেক পবিত্র তীর্থ আছে।

—'মার্কণ্ডেয় তীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো ছেচল্লিশ

তোমাকে এবার যাযাত তীর্থের কথা শোনাব ; সেখানে কালঞ্জর শিব বিরাজ করেন। পুরাকালে নহুষের পুত্র ছিলেন যযাতি ; ইন্দ্রের মতো তাঁর বীরত্বের খ্যাতি ছিল দিগবিদিগে বিস্তৃত। উত্তমলক্ষণসম্পন্ন তাঁর দুজন স্ত্রী ছিলেন—একজন শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী, তিনিই বড় ; আরেকজন রাজা বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্বসু নামে দুজন পুত্র জন্মায় ; আর শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। দেবযানীর পুত্রেরা শুক্রের মতো দেখতে এবং শর্মিষ্ঠার পুত্রেরা ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণের মতো তেজস্বী। একবার দেবযানী দুঃখিত চিত্তে পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন—দেখুন, আমার দুটি পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার পুত্র তিনটি এবং তারা ইন্দ্র, বরুণের মতো তেজস্বী। যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রতি বেশী অনুরক্ত। এ সবের জন্য আমার মনে সুখ নেই। মানভঙ্গ অপেক্ষা মনীষীদের মরণও ভালো। কন্যার কথা শুনে শুক্রাচার্য কোন রকম বিবেচনা না করেই যযাতির উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন। তিনি যযাতির কাছে গিয়ে তাকে বললেন—তুমি রূপোন্মত্ত হয়ে যে কাজ করেছ, তাতে তোমাকে অকালেই বার্ধক্য ভোগ করতে হবে। বার্ধক্যের ফলে মানুষ যেমন ভোগ করতে পারে না আবার বিষয়ের প্রতি অত্যধিক আসক্তির জন্য যেমন তা ত্যাগ করতেও পারে না, কেবলমাত্র মনে মনে স্পৃহা করেই দিন যাপন করে, তোমারও সেই দশাই হবে। শরীরিদের পক্ষে বৃদ্ধত্ব এক রকম জীবন্মৃত্যু। যযাতি শুক্রাচার্যের কথা শুনে বললেন—মহামান্য, আপনি কোন কিছু বিবেচনা না করেই আমাকে অভিশাপ দিলেন। আমি তো ধর্মাচরণই করি, কোন অপরাধ তো আমি করি নি! দেবযানী নিশ্চয়ই আমার নামে আপনার কাছে কিছু বলেছে। বিদ্বান ব্যক্তিরাও যদি নির্দোষ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হন, মূর্খেরা যে ক্রুদ্ধ হয়, তাতে আর দোষ কি?

যযাতির কথা শুনে শুক্রাচার্যও মনে মনে সমস্ত কথা বিবেচনা করলেন। তাতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, দেবযানীই অপ্রিয় আচরণ করেছে। তিনি তখন যযাতির কাছে এসে তাকে বললেন—আমি বুঝতে পারছি দেবযানীরই এক্ষেত্রে দোষ। তবে আমার কথা ব্যর্থ হওয়ার নয়। তোমার কোন পুত্র যদি তোমার জরার ভার গ্রহণ করে, তবেই তোমার শাপমুক্তি ঘটবে। যযাতির প্রার্থনায় শুক্রাচার্য এও বললেন যে, যে যযাতির জরাভার গ্রহণ করবে সে-ই রাজপদে অধিষ্ঠিত হবে। তারপর অভিশাপের ফলে যযাতি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। তিনি একে একে তাঁর সমস্ত পুত্রদের ডেকে তাঁর জরাভার গ্রহণ করতে বললেন ; কিন্তু কেউই সেই বার্ধক্যভার গ্রহণ করতে রাজী হল না। যারা যারা রাজী হল না, যযাতি তাদের অভিশাপ দিলেন। শেষে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পিতার সেই জরাভার সানন্দে গ্রহণ করলেন। এক হাজার বছর ধরে সেই পিতৃপ্রদত্ত জরাভার তিনি বহন করলেন। এদিকে যযাতি যাবতীয় ভোগ্যবস্তুসমূহ নিঃশেষে ভোগ করলেন। ভোগতৃষ্ণা যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়ল তখন পুরুর কাছ থেকে যযাতি সেই ন্যস্ত জরাভার গ্রহণ করতে চাইলে, পুরু তা পিতাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন—সমস্ত প্রাণীই যখন বলপূর্বক জরার দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তা সহ্য করতেও বাধ্য হয়, তবে তা পরিহার করব কেন? বরং তা গ্রহণ করে যদি গুরুজনের উপকার

করা যায় তবে তাই করব। অথবা আরও এক কাজ করা যায়, তপস্যার প্রভাবে এই জরাকে আমি বিনষ্ট করব।

পুরু তারপর গোতমীর তীরে গিয়ে ভগবান শংকরের আরাধনায় রত হলেন। দীর্ঘ তপস্যার পর মহাদেব তাঁকে দেখা দিয়ে বর গ্রহণ করতে বললেন। পুরু মহাদেবকে বললেন- অভিশাপ-দত্ত এই জরাভার আপনি দয়া করে বিনষ্ট করুন। পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে আমার ভাইদের যে অভিশাপ দিয়েছেন. তাদেরও যেন শাপমুক্তি হয়। ভগবান শংকর পুরুর প্রার্থনা পূরণ করে চলে গেলেন। তারপর থেকেই সেই স্থান জরার নামানুসারে 'কালঞ্জর' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেখানে যযাত, নাহুষ, পৌর, শৌক্র, শর্মিষ্ঠ প্রভৃতি আরো অনেক পবিত্র তীর্থ আছে।

—'কালঞ্জর প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো সাতচল্লিশ

এরপর অপ্সরাসঙ্গম নামে যে তীর্থ আছে. সেই তীর্থের কথা তোমাকে শোনাব। এর অপর নাম অপ্সরোযুগ। গোতমী নদীর দক্ষিণ তীরে এই তীর্থ অবস্থিত। এর সম্বন্ধে যে উপাখ্যান শোনা যায়, তা বলছি শোন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে পুরাকালে পারস্পরিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে অত্যন্ত বিবাদ ছিল। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্য গঙ্গাদ্বারে থেকে তপস্যাপরায়ণ হলে ইন্দ্র তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য মেনকা নামক অপ্সরাকে পাঠালেন। মেনকা বিশ্বামিত্রকে প্রলোভিত করে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সংসর্গে মিলিত হলেন। তার ফলে তাঁদের একটি কন্যা জন্মায়। সেই কন্যা জন্মাবার পর মেনকা স্বর্গে ফিরে যান। বিশ্বামিত্রের তখন মোহভঙ্গ ঘটে। পূর্বের সমস্ত কথা চিন্তা করে তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করে যেখানে কালঞ্জর শিব বিদ্যমান, সেখানে গিয়ে পুনরায় তপস্যা শুরু করেন। ইন্দ্র আবার তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য একে একে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা ও তিলোত্তমাকে সেখানে যেতে বললেন। কিন্তু তারা কেউই রাজী হল না। ইন্দ্র তখন গম্ভীরা ও অতিগম্ভীরা নামক দুজন অপ্সরাকে পাঠালেন। তারা সেখানে গিয়ে শিবের মতো তেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্রকে দেখতে পেল। এতই তাঁর তেজের প্রভাব যে, তারা এক হাজার বছর পর্যন্ত চোখ মেলে তাঁকে দেখতে পেল না। সুতরাং দূরে থেকেই নাচ-গান প্রভৃতি করতে লাগল। তিনি সেই অপ্সরাদ্বয়কে দেখে ইন্দ্রের অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। তিনি তখন তাদের এই অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু তোমরা আমার তপস্যার কঠোরতাকে দ্রবীভূত করতে এসেছ. তাই আমার অভিশাপে তোমরাও দ্রবরূপা অর্থাৎ জলরূপিণী হবে। তারা বিশ্বামিত্র কর্তৃক এভাবে অভিশপ্ত হয়ে ভীত হয়ে পড়ল। অনেক কাকুতি মিনতি করার পরে বিশ্বামিত্র তাদের বললেন—তোমরা যখন গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হবে তখন দিব্যরূপ লাভ করতে পারবে। বিশ্বামিত্রের অভিশাপে তারা তৎক্ষণাৎ নদীরূপে পরিণত হল। এই দুটি নদী এই কারণেই অপ্সরোযুগ নামে বিখ্যাত হয়। গঙ্গার সঙ্গে এরা যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে ভগবান শংকর বিরাজ করেন। এখানে স্নান করে সেই শিবকে দর্শন করলে মানুষ সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

—'অপ্সরোযুগসঙ্গমতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো আটচল্লিশ

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কোটিতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। এখানে কোটীশ্বর মহাদেব বিরাজ করেন। কণ্বমুনির পুত্রের নাম বাহ্লীক; কাণ্ব নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। সেই বেদজ্ঞ ঋষি গোতমী নদীর দক্ষিণ তীরে দশপূর্ণমাস প্রভৃতি ইষ্টিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন নিয়মিতভাবে। তিনি প্রতি দিনই প্রাতঃকালে স্ত্রীর সঙ্গে অগ্নিতে সমাহিতভাবে হোম করতেন। একবার তিনি হোম করতে বসে সমিদ্ধ অগ্নিতে একটি মাত্র আহুতি দিয়ে যেই আরেকটি আহুতি দিতে উদ্যত হয়েছেন, তখনই সেই অগ্নি নির্বাপিত হল। কাণ্ব তখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে উপায়ের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। যদি অন্য অগ্নি আধান করে তাতে আহুতি দেওয়া হয়, তাহলে দুই অগ্নিতে দুটি হোম করার জন্য দোষ ঘটবে। তিনি যখন এ রকম চিন্তা করছেন, ঠিক সেই সময় এক দৈববাণী হল—অন্য অগ্নি আধান করা তোমার পক্ষে ঠিক হবে না। নির্বাপিত আগুনের যে সব খণ্ড পড়ে আছে, তাতেই তুমি হোম কর। কাণ্ব কিন্তু তাতে সম্মত হলেন না। তখন সেই দৈববাণী আবার বলল—দেখ, হিরণ্য অগ্নির পুত্র। যিনি পিতা, তিনিই পুত্র। পুত্রকে কোন জিনিস দেওয়া হলে, তা পিতার প্রীতিকরই হয়ে থাকে। আবার পিতাকে দেয় কোন জিনিস পুত্রে অর্পণ করলে তাও পিতার প্রীতি সম্পাদন করে। পিতা অপেক্ষা পুত্রে দান করলে সমস্ত দানেরই ফল কোটিগুণ অধিক হয়। সেই দৈববাণী আরও বলল—কাণ্ব, তোমার পুণ্য প্রভাবে এখানে এক মহাতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হল। মানুষ এখানে স্নান, দান প্রভৃতি যা কিছু করে, সে সবই কোটিগুণ ফলজনক হয় বলে একে কোটি-তীর্থও বলা হয়ে থাকে। এই তীর্থের মাহাত্ম্য স্বয়ং বৃহস্পতিও বলতে পারেন না। যে ব্যক্তি এই কোটিতীর্থে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে একটি গাভী প্রদান করে, সে ওই তীর্থের মহিমায় কোটি গোদান করলে যে ফল হয়, তা-ই লাভ করে। কাণ্ব দৈববাণীর আদেশে সেই নির্বাপিত অগ্নিতে হোম করলেন।

—'কাণ্ব প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো উনপঞ্চাশ

গঙ্গার উত্তর তীরে নারসিংহ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে এক প্রবল বলবান দৈত্য ছিল। সে তপস্যা ও বিক্রমে অতুলনীয় এবং দেবতাদের অপরাজেয় ছিল। তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ ছিল হরির পরম ভক্ত। পিতা হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের হরিভক্তির জন্য তার উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে তাঁর দুরাচারের জন্য বধ করেন এবং পরে তার সৈন্যদের পরাজিত করেন। পাতালের শত্রুদের তথা অন্যান্য দুরাচারী দৈত্যদের নিহত করে তিনি স্বর্গে যান। সেখানে সমাগত অন্যান্য রাক্ষসদের পরাজিত করে তিনি গোতমী নদীতে যান। সেখানে অম্বর্য নামে এক বলশালী দৈত্য ছিল; তার সঙ্গে হরির ভীষণ যুদ্ধ হয়। শ্রীমান হরি গোতমীর উত্তর তীরে তাকে বিনাশ করেন; সেখানে ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত নারসিংহ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই তীর্থ অতি পবিত্র। দেবতাদের মধ্যে যেমন হরির মতো শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, সেই রকম তীর্থসমূহের মধ্যেও নারসিংহের মতো শ্রেষ্ঠ

কেউ নেই। ওই তীর্থের কাছাকাছি আরো অনেক তীর্থ আছে। মানুষ অশ্রদ্ধা সহকারেও যাঁর নাম স্মরণ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়, সেই নৃসিংহদেব যেখানে সর্বদা সাক্ষাৎ বিরাজমান, তাঁর গুণ কে বর্ণনা করতে পারে ?

—'নারসিংহতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ একশো পঞ্চাশ

গঙ্গার উত্তর তীরে পৈশাচিক নামে এক তীর্থ আছে। সেখানে পুরাকালে এক ব্রাহ্মণ পিশাচত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। সুযজ্ঞ নামক এক ব্রাহ্মণের জীগর্তি নামে এক পুত্র ছিল। সে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হয়ে পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হয়ে পড়ে। অভাবের তাড়নায় সে শুনঃশেফ নামে নিজের মধ্যম পুত্রকে নরমেধ যজ্ঞ সাধনের জন্য কোন এক ক্ষত্রিয়ের কাছে প্রচুর ধনরত্নের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। বিপদে পড়লে পণ্ডিত ব্যক্তিও পাপকর্মে রত হন। সেই পুত্রবিক্রয়ী জীগর্তি কালক্রমে মারা গেল এবং ঘোর নরকে তার ঠাঁই হল। পূর্বের কর্মসমূহের ইহলোকে ভোগ ছাড়া ক্ষয় হয় না। সে যমের নির্দেশমতো পিশাচরূপে পরিণত হল। যমদূতেরা তাকে যন্ত্রণাময় বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গিয়ে কিছু দিন বন্দী করে রাখল। তারা একবার গ্রীষ্মকালে তাকে জলশূন্য এক নির্জন বনের মধ্যে রেখে এলো। ভীষণ কষ্টে জীগর্তি সেখানে নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে জোরে কাঁদতে লাগল। সেই শুনঃশেফ ঘটনাক্রমে সে পথ দিয়ে যেতে যেতে তার পিতার বিলাপবাণী শুনে তাকে পরিচয় জিগ্যেস করলেন। জীগর্তি নিজের পরিচয় দিয়ে তার কৃতকর্মের কথা শুনঃশেফকে বলল। শুনঃশেফ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে পিতাকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি বললেন—যেহেতু আমাকে বিক্রি করার জন্যই তোমার এই নরকভোগ, আমি সেজন্য আমার চেষ্টায় তোমাকে স্বর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

কালক্রমে সেই শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে পরিগণিত হয় এবং পিতার মুক্তির জন্য গৌতমী গঙ্গার তীরে গিয়ে স্নান করলেন। তারপর শিব ও বিষ্ণুর পুজো করে সেই পিশাচরূপী প্রেত-পিতাকে জলদান করলেন। সেই তর্পণের ফলে জীগর্তি পবিত্র হয়ে, বিমানে আরোহণ করে বিষ্ণুলোকে চলে গেল। তারপর থেকেই সেই স্থান পৈশাচ ও মহাগদ নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে গঙ্গার উভয় তীরে আরো অনেক তীর্থ আছে। তীর্থসমূহ পবিত্র ও ফলদায়ক।

—'পৈশাচ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো একান্ন

গৌতমী গঙ্গার উত্তর তীরে নিম্নভেদ নামে অনেক তীর্থ আছে। সেখানে বেদদ্বীপ নামে আর একটি তীর্থ আছে। পুরাকালে পরম ধার্মিক ঐলরাজা উর্বশীকে শয্যা-সঙ্গিনীরূপে পাওয়ার ইচ্ছা করেন। উর্বশী এ রকম শর্তে ঐলের শয্যাসঙ্গিনী হতে সম্মত হন যে, যেদিন তিনি রাজাকে নগ্ন অবস্থায় দেখবেন, সেদিনই তিনি চলে যাবেন। রাজা সেই শর্তে সম্মত হয়ে উর্বশীকে গ্রহণ করলেন। অনেক দিন এভাবে সুখে কাটল। একদিন বিছানায় শুয়ে আছেন উর্বশী এমন সময়ে ঐল নগ্ন অবস্থাতেই বিছানা ছেড়ে

উঠে পড়লেন। উর্বশী রাজাকে এ রকম অবস্থায় দেখে সেই রাত্রেই চলে গেলেন। রাজা কিন্তু এ কথা জানতে পারলেন না। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরে এসে সেই ঐল পুরুরবা কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের কাছে শুনলেন যে উর্বশী চলে গেছে। তিনি তখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়লেন। আহার, নিদ্রা, রাজকার্য সব কিছুই তিনি পরিত্যাগ করলেন। রাজাকে এ রকম হতোদ্যম দেখে বশিষ্ঠ বললেন—আপনি স্ত্রীলোকের হৃদয়ের কথা জানেন না ; তাদের চিত্ত শৃগালীর মতো। বঞ্চনা করা, হিংস্র আচরণ করা যাদের স্বভাবজ ধর্ম, তারা কি কখনো কাউকে সুখী করতে পেরেছে ? কালের দ্বারা কে না নিহত হয় ? কোন্ অর্থী গৌরব লাভ করে ? স্ত্রীর দ্বারা কে না ভ্রান্ত হয়, আর স্ত্রীলোকের দ্বারা কে না বঞ্চিত হয় ? এই সংসারে শঙ্কর, বিষ্ণু বা গৌতমী ছাড়া দুঃখার্ত ব্যক্তিদের আর কোন আশ্রয়স্থল নেই।

বশিষ্ঠের এই কথা শুনে রাজা পুরুরবা উর্বশী বিরহজনিত বেদনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে, গৌতমীর তীরে গিয়ে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সূর্য, গঙ্গা এবং আরো অনেক দেবতাকে যত্নের সঙ্গে আরাধনা করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, পুরুরবা সেখানে প্রচুর দক্ষিণা দান করে যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। সেজন্য ঐ স্থানের নাম হয় বেদদ্বীপ, একে যজ্ঞদ্বীপও বলা হয়ে থাকে। উর্বশী প্রত্যেক পূর্ণিমায় সেখানে আসেন। যে ব্যক্তি সেই দ্বীপ প্রদক্ষিণ করে, সে সমগ্র ধরণীই পরিক্রমা করে। ঐ স্থানই পুরুরবা, বশিষ্ঠ এবং নিম্নভেদ প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। রাজা পুরুরবা কখনো কোন কর্মে নিম্ন বা নীচ হতেন না, কেবলমাত্র উর্বশীর সঙ্গেই নিম্নভাবে ব্যবহার করতেন। তাঁর এই নিম্নভাব অর্থাৎ উর্বশীর প্রতি দুর্বলতার অবসান বশিষ্ঠ ও গঙ্গার প্রসাদে এখানেই সম্পন্ন হয়, সেজন্যই এর নাম হয়েছে 'নিম্নভেদ'। সেখানে গঙ্গার উভয় তীরে আরো অনেক তীর্থ আছে ; ঐ পবিত্র তীর্থসমূহে স্নান, দান প্রভৃতি করলে স্বর্গলোক লাভ করা যায়।

—'নিম্নভেদ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো বাহান্ন

নন্দীতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থস্থান রয়েছে। এবার তোমাকে সেই তীর্থ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান শোনা যায়, সে কথা শোনাব। অত্রির পুত্র ছিলেন চন্দ্রমা। তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে সমস্ত বেদ, ধনুর্বেদ ও অন্যান্য বিদ্যা যথাবিধি শিক্ষা করেন। বিদ্যা শিক্ষার পর চন্দ্রমা বৃহস্পতিকে বললেন—আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আমি এবার গুরুপূজা করব। বৃহস্পতি চন্দ্রের কথা শুনে আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন—দেখ চন্দ্র, এ বিষয়ে আমার স্ত্রী তারা সব কিছু জানেন, তুমি তাকেই জিগ্যেস কর। চন্দ্র তখন তারাকে জিগ্যেস করার জন্য অন্তঃপুরে গেলেন। সেখানে গিয়ে তারার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কামবশে তিনি তাঁর হাত ধরে বলপূর্বক তাঁকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। কামিনী-কটাক্ষে মোহিত হয়ে পড়লে পণ্ডিত ব্যক্তিরও বুদ্ধিনাশ হয়। বৃহস্পতি পরিজনদের মুখে এ সব কথা শুনে ক্রোধবশে চন্দ্রকে তিরস্কার করলেন অভিশাপও দিলেন। বস্তুত পত্নীকে পরপুরুষ কর্তৃক পীড়িত হতে দেখলে কোন্ ব্যক্তিই বা স্থির থাকতে পারে ? বৃহস্পতি তখন চন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন ; কিন্তু কোন কিছুতেই চন্দ্রের কিছু হল না। চন্দ্র তখন তারাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন এবং অনেক দিন ধরে রোহিণী

ও তারা উভয়কেই নির্ভয়ে ভোগ করতে লাগলেন।

এদিকে বৃহস্পতি দেখলেন যে, তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। তিনি তখন এ রকম মনে করলেন যে, অপমানকে সামনে রেখে এবং সম্মানকে পিছনে নিয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উচিত স্বার্থ সাধন করা। সুতরাং প্রয়োজন হলে সম্মানের দিকটা বড় করে না দেখে যে কোন উপায়ে স্বার্থ সাধন করতে চেষ্টা করা উচিত। এ রকম চিন্তা করে তিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালেন এবং তাঁর পরামর্শ চাইলেন। বৃহস্পতির কথা শুনে শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হলেন এবং এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তারাকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তিনি জলস্পর্শও করবেন না। তারপর তিনি শিবপুজো করে শিবের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। বৃহস্পতির সঙ্গে তারা যেখানে চন্দ্রের সঙ্গে বাস করছিলেন সেখানে গিয়ে পেঁছিলেন। তিনি চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে অভিশাপ দিলেন। তিনি বললেন—যেহেতু তুই মদগর্বে গর্বিত হয়ে এই হীন কাজ করেছিস, সেজন্য আমার অভিশাপে তোর সারা গায়ে কুষ্ঠ হবে। শুক্রাচার্যের অভিশাপে সেই চন্দ্র তৎক্ষণাৎ প্রায় পুড়ে যাওয়ার মতো বিবর্ণ হয়ে গেলেন। যারা গুরু, স্বামী ও বন্ধুর প্রতি অন্যায় আচরণ করে, কঠিন ফলভোগ তাদের করতেই হয়। চন্দ্র তারাকে তখন ত্যাগ করার শুক্র, ঋষি, পিতৃগণকে এবং বিভিন্ন নদ-নদী ও ওষধিসমূহকে তারা কিভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে, তার উপায় জিগ্যেস করলেন। পরে শ্রুতির নির্দেশমতো বৃহস্পতির সঙ্গে তারা গৌতমী-গঙ্গায় স্নান করলেন, তখনই তিনি পবিত্র হয়ে উঠলেন। তিনি যথাবিধি স্নান করলে পর সেখানে পুষ্পবৃষ্টি হল। তারপর দেবতারা তারাকে অনেক বর প্রদান করলেন। বৃহস্পতিও তারাকে গ্রহণ করে আনন্দিত হলেন। বৃহস্পতি তখন গঙ্গাকে উদ্দেশ করে বললেন—তুমি মুক্তি প্রদান কর বলে সকলেরই তুমি পুজ্য, বিশেষত আমি যখন সিংহরাশিতে থাকব, তখন স্বর্গে, মর্তে এবং পাতালে যত পুণ্যকামী মানুষ আছে, সবাই তোমার জলে স্নান করতে আসবে। ওই আনন্দ নামক তীর্থ ধনদায়ক, আয়ু প্রদানকারী, আরোগ্যদায়ক এবং সৌভাগ্যবর্ধনকারী। এখানে গঙ্গার তীরে শিবের কাছে নন্দী সাক্ষাৎ বিচরণ করেন, এজন্য এই স্থানের নাম নন্দীতটও বটে। সমস্ত আনন্দ-বর্ধনকারী বলে এই স্থান 'আনন্দতীর্থ' নামেও বিখ্যাত।

—'আনন্দতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো তিপ্পান্ন

তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—এর পর তোমাকে ভাবতীর্থের কথা শোনাব। অশেষ জগৎ যাঁর অভ্যন্তরে বিদ্যমান, যিনি এই চরাচর বিশ্বের আত্মস্বরূপ, যিনি সচ্চিদানন্দময় সেই ভব যেখানে স্বয়ং অবস্থান করেন, সেই স্থান ভাবতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। এই তীর্থ সম্বন্ধে যে কথা প্রচলিত আছে, তাই তোমায় শোনাচ্ছি।

পুরাকালে প্রাচীনবর্হি নামে এক স্বনামধন্য রাজা ছিলেন। তিনি প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর ধরে রাজ্য পালন করেন। তিনি এ রকম ব্রত অবলম্বন করেন যে, তিনি যখন যৌবন হারাবেন কিংবা প্রিয়া, পুত্র বা অন্য কোন প্রিয় বস্তুর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটবে, তখনই তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করবেন। বস্তুত বিবেকী ব্যক্তির উচিত বিভব ক্ষয় হলে কোন বিজন স্থানে গিয়ে বাস করা। পরে সেই মহামতি রাজা পুত্রকামনায় এক

যজ্ঞ করেন ; যজ্ঞ সমাপ্ত হলে পর শিব তাঁকে বর দান করতে উদ্যত হলেন। রাজা তখন তাঁর পুত্রকামনা ব্যক্ত করলে পর মহাদেব তাঁকে বললেন—তুমি আমার তৃতীয় নেত্রটি দর্শন কর। ভগবান শংকরের কথায় রাজা যখন তাঁর তৃতীয় নেত্রটি দেখতে লাগলেন, তখন সেই চক্ষুর দীপ্তি থেকে এক পুত্রের জন্ম হল ; মহিমা নামে সে বিখ্যাত হয়। ইনিই 'শিব-মহিম্নস্তোত্র' নামক বিখ্যাত স্তোত্রের রচয়িতা। রাজা প্রাচীনবর্হি পুত্র লাভ করার পর মহাদেবের কাছে এই প্রার্থনা জানালেন যে, এই স্থান যেন শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে ভবিষ্যতে পরিগণিত হয়। প্রাচীনবর্হির প্রার্থনা অচিরেই পূরণ করলেন মহাদেব। তারপর থেকেই সেই তীর্থ 'ভাবতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেখানে স্নান, দান প্রভৃতি করলে সমস্ত বাঞ্ছিত ফলই লাভ করা যায়।

—'ভাবতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো চুয়ান্ন

এবার তোমাকে সুবিখ্যাত সহস্রকুণ্ডের কথা শোনাব। পুরাকালে দশরথনন্দন রাম মহাসমুদ্রকে সেতুবন্ধন করে লংকায় যান এবং রাবণ প্রভৃতি অসুরদের হত্যা করে অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করেন। সীতাকে উদ্ধার করার পর তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা পরীক্ষা করার জন্য কুলগুরু, লোকপালগণ এবং লক্ষ্মণের সামনে অগ্নি প্রস্তুত হয় ; এবং সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে সীতাকে তাঁর পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিতে হয়। রাম তখন সীতাকে তাঁর পাশে বসতে আহ্বান করায় হনুমান এবং অঙ্গদ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ রামানুচরগণ সীতাকে নিষেধ করেন। কারণ, সীতা আপাপবিদ্ধা হলেও স্বজনসমক্ষে লোকাপবাদ নিরসন করা কর্তব্য। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং জাম্ববান প্রভৃতিরা তাদের কথা অগ্রাহ্য করেই সীতাকে আবার আহ্বান জানালেন। তখন দেবতাগণ আকাশমার্গে থেকে 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ করলে পর তিনি রাজা রামচন্দ্রের পাশে এসে বসলেন। সকলে তখন পুষ্পকরথে আরোহণ করে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। অযোধ্যার জনগণ তাদের রাজাকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত হল।

তারপর কিছু দিন কেটে গেল। অনার্যদের কুৎসাপূর্ণ কথা শুনে রাম দুঃখিত চিত্তে জন্মশুদ্ধা সীতাকে ত্যাগ করলেন। কুলোন্নত ব্যক্তিরা লোকাপবাদ সহ্য করতে পারেন না। রামের আদেশমতো লক্ষ্মণ ক্রন্দনরতা সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমের কাছে ছেড়ে দিয়ে এলেন। তারপর অনেক দিন অতীত হল। এবার রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য দীক্ষিত হলেন। তাঁর সেই যজ্ঞস্থলে লব ও কুশ নামে রামেরই পুত্রদ্বয় এলো। তারা নারদের মতো বিখ্যাত গায়ক ছিল। সেই যজ্ঞস্থলে তারা সমগ্র রামচরিতকথা গান করল। রাম তাদের সীতার গর্ভজাত সন্তান বলে চিনতে পারলেন। তখন তাদের সমাদর করে নিয়ে এসে অভিষিক্ত করা হল। রাম তাদের বারংবার আদর করতে লাগলেন। সেই সময় বিভীষণের সঙ্গে লংকার রাক্ষসগণ, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ ও জাম্ববান সেই যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে অঙ্গদ এবং হনুমান রামকে সীতার কথা জিগ্যেস করায় রাম নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। দ্বারপালেরা তাঁদের সমস্ত কথা জানাল। সীতা অন্তঃপুরে নেই—এ কথা শুনে তারা দুঃখিত চিত্তে গৌতমী নদীর তীরে চলে গেল। তাদের পিছন পিছন অযোধ্যার জনগণও সেখানে গেল। স্বয়ং রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও

পরিজনদের সঙ্গে সেই গোতমীতে স্নান করে শিবের আরাধনা করলেন। শিবের অনুগ্রহে তাঁদের সব পরিতাপ অপসৃত হল। গোতমীর তীরে যেখানে এ সব ব্যাপার ঘটেছিল, সেই স্থান সহস্রকুণ্ড নামে পরিচিত। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা সেখানে রামকে দিয়ে সর্বাপত্তারক নামক হোম করিয়েছিলেন। সেই হোম করলে সমস্ত বিপদ, সব রকম পাপ নষ্ট হয়। রাম সেই গোতমীর তীরে সহস্রটি কুণ্ডে সেই হোম-বারি অর্পণ করেন; তাই ঐ তীর্থ 'সহস্রকুণ্ড' নামে পরিচিত।

—'সহস্রকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো পঞ্চান্ন

কপিলাতীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। ওই তীর্থই আঙ্গিরস, আদিত্য এবং সৈংহিকেয় নামে পরিচিত। গোতমীর দক্ষিণ তীরে অঙ্গিরাগণ আদিত্যদের পূজা করেন; আদিত্যগণ দক্ষিণারূপে তাঁদের ভূমি দান করেন। তারপর অঙ্গিরাগণ তপস্যার জন্য অন্যত্র চলে গেলেন; তখন সেই ভূমি সিংহীরূপ ধারণ করে সেখানকার জনগণকে খেতে লাগল। জনগণ ভীত হয়ে অঙ্গিরাদের সে-কথা জানালে তাঁরা অনুসন্ধান করে জানলেন যে ঘটনাটি সত্যি। তখন তাঁরা আদিত্যদেব কাছে গিয়ে সব কথা জানিয়ে তাঁদের প্রদত্ত ভূমি ফিরিয়ে নিতে বলায় আদিত্যগণ কিছুতেই তা ফিরিয়ে নিতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন—ভূমিহরণের চেয়ে অধিকতর কোন পাপ নেই; সুতরাং তা ফিরিয়ে নিতে পারব না। বরং তা কিনে নিতে পারি যে কোন মূল্যে। অঙ্গিরাগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হলে পর আদিত্যগণ সেই ভূমির বিনিময়ে তাঁদের একটি শুভলক্ষণা কপিলা গাভী দিলেন। ওই দানক্রিয়া গোতমীগঙ্গার দক্ষিণ তীরে সম্পন্ন হয়; সেখানে স্বয়ং বিষ্ণু বিরাজ করেন। ওই স্থান কপিলাসঙ্গম নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। আদিত্যগণ গাভী প্রদানের সময় যে জল দিয়ে তাকে অভিষিক্ত করেন, তা থেকে একটি নদীর উৎপত্তি হয়; সেই নদী কপিলা নামে বিখ্যাত। শস্যবতী ভূমির চেয়ে গো-দান আরও পবিত্র। এভাবে বিনিময়-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় লোকরক্ষা হয়। যেখানে ওই সব ব্যাপার ঘটে সেই স্থান গোতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। কপিলা নদী গঙ্গার সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়েছে সেই স্থান 'কপিলাসঙ্গম' নামে বিখ্যাত। সেখানে আরও অনেক পবিত্র তীর্থ আছে।

—'কপিলাসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থবর্ণন'' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো ছাপ্পান্ন

শঙ্খগদাধর বিষ্ণু যেখানে বিদ্যমান, সেই তীর্থ শঙ্খতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেখানে গোতমীতে স্নান করে তাঁকে দর্শন করলে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এর সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত, তা বলছি শোন। পুরাকালে সত্যযুগের প্রথম দিকে সামগানপরায়ণ ব্রহ্মাণ্ডাগার থেকে অনেক ভীষণদর্শন রাক্ষসের উৎপত্তি হয়; তারা আমাকে ভক্ষণ করার জন্য আমাব দিকে ধাবিত হওয়ায় আমি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করি এবং তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য অনুরোধ জানাই। বিষ্ণু তাদের হনন করার

জন্য তাঁর সুদর্শন চক্রের সাহায্য নেন। চক্রের আঘাতে রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায় বিষ্ণু তাঁর শঙ্খে ফুৎকার দেন। সেই শঙ্খধ্বনিতে অন্যান্য রাক্ষসেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শঙ্খের প্রভাবে যেখানে এই সমস্ত ব্যাপার ঘটে, তা শঙ্খতীর্থ নামে বিখ্যাত। এই তীর্থস্থান অতীব পবিত্র এবং বাঞ্ছিতফলদায়ক। সেখানে আরও অনেক পবিত্র তীর্থ আছে, যেখানে স্নান করলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

—'তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো সাতান্ন

তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—এর পর তোমাকে কিষ্কিন্ধ্য নামক বিখ্যাত তীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে দশরথনন্দন রাম লঙ্কাধিপতি রাবণকে নিহত করে অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করেন। তারপর লক্ষ্মণ, বানর সৈন্য এবং বিভীষণ প্রভৃতির সঙ্গে পুষ্পকরথে আরোহণ করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। পথে গৌতমী গঙ্গার তীরে শ্রীরামচন্দ্র বিমান থেকে অবতরণ করেন। বানরদের সামনেই শ্রীরামচন্দ্র গৌতমী গঙ্গাকে উদ্দেশ করে আনন্দাপ্লুত চিত্তে বলতে লাগলেন—এই গৌতমীর প্রভাবেই আমার পিতা মুক্তিলাভ করে স্বর্গে গিয়েছেন, ইনি নিদারুণ পাপসমূহও বিনাশ করেন। এঁরই প্রভাবে আমার শত্রু নিহত হয়েছে, তোমরা আমার বন্ধু হয়েছ, বিভীষণ আমার পরম মিত্ররূপে সর্বদা আমার কল্যাণসাধনে তৎপর রয়েছেন, সীতাকে লাভ করেছি এবং হনুমানও আমার বন্ধু হয়েছেন। মহর্ষি গৌতম শিবের পুজো করে এঁকে লাভ করেন। ইনি সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু দান করেন, সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট করেন এবং নদীসমূহকে সৃষ্টি করেন ; এঁর দর্শনে আজ আমি ধন্য হলাম। রামচন্দ্রের কথা শুনে বানরগণ সেই গৌতমী নদীতে স্নান করে মহাদেবের পুজো করলেন ; স্বয়ং রামচন্দ্রও ভক্তিভরে মহাদেবের পুজো করলেন। বানরগণ আনন্দে নাচগান করতে লাগল। রামচন্দ্রের প্রস্তাব মতো সবাই সেই গোদাবরীর (গৌতমী গঙ্গা) তীরে আরও কয়েকদিন থেকে গেলেন। তারপর তাঁরা সিদ্ধেশ্বর তীর্থে গেলেন, যেখানে সিদ্ধেশ্বর মহাদেব সর্বদাই বিরাজ করেন। সেখানে রামচন্দ্র মহাদেবের লিঙ্গ স্থাপন করে পুজো করলেন। পুজো শেষ হওয়ার পর হনুমানকে তিনি এই বলে নির্দেশ দিলেন—আমার স্থাপিত এই সমস্ত লিঙ্গগুলি তুমি বিসর্জন কর। শিবপুজো করে যে শিবলিঙ্গ বিসর্জন না দেয় সে ভগবান শঙ্করের বাহন বৃষরূপে জন্মলাভ করে ; আর যারা জেনেও অবহেলাভরে শিবলিঙ্গ বিসর্জন না দেয়, তারা অসিপত্রবন নামক ঘোর নরকে বাস করে। রামের আদেশমতো হনুমান সেই শিবলিঙ্গকে দু'হাত দিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তারপর লেজ দিয়ে জড়িয়ে টেনে তুলতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। হনুমানকে পরিশ্রান্ত এবং ব্যর্থ হতে দেখে সুগ্রীব এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন কিন্তু তিনিও সফল হতে পারলেন না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে শ্রীরামচন্দ্র লিঙ্গের পুজো করলেন ; তারপর তাকে প্রদক্ষিণ করলেন। তখন সহজেই বানরেরা সেই লিঙ্গকে তুলে বিসর্জন দিল। রামচন্দ্র গৌতমীকে বারংবার প্রণাম জানিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। তারপর থেকেই ঐ স্থান 'কিষ্কিন্ধ্য তীর্থ' নামে পরিচিত হয়। ভক্তিভরে ঐ তীর্থের কথা শুনলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

—'কিষ্কিন্ধ্যতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো আটান্ন

এরপর তোমাকে ব্যাসতীর্থের কথা শোনাব ; প্রাচেতস তীর্থ নামেও এই তীর্থ পরিচিত। সৃষ্টির পূর্ব লগ্নে আমার দশটি মানসপুত্র জন্মায় ; তারা পৃথিবীর শেষ জানার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তারপর তাদের ফিরে আসতে না দেখে আবার আমি দশটি পুত্রের জন্ম দিই। আগে যে ভাইয়েরা পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে ফেরে নি তাদের খোঁজে এরা বেরিয়ে পড়ে। তারপর এরাও আর ফিরে আসে নি। তখন আঙ্গিরস নামক পুত্রগণের জন্ম হয়। তারা দিব্য আকারসম্পন্ন, মহাজ্ঞানী এবং সমস্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তারা পিতার অনুমতি গ্রহণ করে তপস্যার জন্য বেরিয়ে পড়ে। মাতার অনুমতি গ্রহণ করাকে প্রয়োজনীয় বলে তারা মনে করে নি, এতে তাদের মাতা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এই অভিশাপ দেন যে, তপস্যায় তাদের সিদ্ধি হবে না। সেই আঙ্গিরসগণ নানান্ দেশ পর্যটন করল বটে, কিন্তু কোথাও তাদের তপস্যার সিদ্ধি মিলল না : বিভিন্ন বিঘ্নের উপস্থিতি তাদের সিদ্ধিকে কণ্টকিত করে রাখল। তারা তখন মহামুনি অগস্ত্যের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা জানাল। তারা জিগ্যেস করল—জ্ঞানত আমরা কোন দোষ না করলেও কেন আমরা তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করতে পারছি না ? দয়া করে আপনি এর কারণ বলে দিন এবং কি করলে সিদ্ধি আমাদের করায়ত্ত হবে সে উপায় নির্দেশ করুন।

আঙ্গিরসদের কথা শুনে অগস্ত্য বললেন—দেখ, তোমাদের সমস্ত কথাই আমি জানি। শোন, তোমরা গৌতমী গঙ্গার তীরে যাও। সেখানে আশ্রম স্থাপন করে তোমরা জ্ঞানপ্রদ দেবতার পূজা কর, তিনিই তোমাদের সংশয় ছেদন করবেন। জগতে সদ্‌গুরু ব্যতীত কারুরই কোন সিদ্ধিলাভ হয় না। আঙ্গিরসগণ তখন অগস্ত্যকে জিগ্যেস করলেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আদিত্য, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ—এঁদের মধ্যে জ্ঞানদ কাকে বলা হয় ? আঙ্গিরসদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অগস্ত্য বললেন—দেখ, যিনি বরুণ, তাঁকেই অগ্নি বলা হয় ; যিনি অগ্নি, তিনিই সূর্য ; যিনি সূর্য তিনিই বিষ্ণু, যিনি বিষ্ণু তিনিই ভাস্কর, যিনি ব্রহ্মা তিনিই রুদ্র ; যিনি রুদ্র তিনিই সমস্ত দেবতাময়। সমস্ত জগৎ যাঁর রূপে, জ্ঞানও তাঁতেই অধিষ্ঠিত। সুতরাং সেই মহাদেবই জ্ঞানদ। দেশিক, প্রেরক, ব্যাখ্যাকৃৎ, উপাধ্যায়, দেহদ প্রভৃতি অনেক গুরু আছেন, তার মধ্যে যিনি জ্ঞানদ তিনিই মহান। যাঁর দ্বারা ভেদবুদ্ধির বিনাশ ঘটে, তাকেই এখানে জ্ঞান বলা হয়। সেই দেবাদিদেব মহাদেব এক এবং অদ্বিতীয় ; কিন্তু বিচারমূঢ় জনগণ তাঁকে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এবং রূপে আরাধনা করে।

আঙ্গিরসগণ তখন অগস্ত্য মুনির কথা শুনে সেই কথাই গাথারূপে গান করতে করতে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পাঁচজন করে যথাক্রমে দক্ষিণ গঙ্গায় এবং উত্তর গঙ্গায় গেলেন। তাঁরা গৌতমীর তীরে ভক্তিভরে মহাদেবের পূজা করলেন। মহাদেব তাঁদের পূজায় প্রীত হয়ে এই বর দিলেন, অধর্মের নিবৃত্তি, বেদের স্থাপন, লোকের উপকার, ধর্ম, কাম ও অর্থের সিদ্ধি, পুরাণ, স্মৃতি, বেদান্ত, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র—জগতের হিতকর এ সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত বিষয়ে তোমরাই আজ থেকে কর্তারূপে পরিগণিত হবে। যখন অধর্মের প্রভাব ও বেদসমূহের পরাভব ঘটবে, তখন তোমরাই বেদসমূহের বিভাগ করবে ; এজন্য তোমরা ভাবিকালে ব্যাস রূপে পরিচিত হবে।

গঙ্গাতীরে তারা যেখানে তপস্যা করেছিল সেখানে শিব, বিষ্ণু, আমি, আদিত্য, অগ্নি,

বরুণ—আমরা সবাই বিরাজ করি। এর মতো পবিত্র স্থান আর কোথাও নেই। এই আঙ্গিরসগণই ব্যাস এবং বেদব্যাস বলে খ্যাত। তাঁদের নাম অনুসারেই এই স্থানের নাম হয়েছে 'ব্যাসতীর্থ'। এই তীর্থ পুরুষদের পাপপঙ্ক ক্ষালন বিষয়ে জলস্বরূপ, মোহান্ধকাররূপ মদের নাশক।

—'ব্যাসতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো উনষাট

বঞ্জরাসঙ্গম নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে ; এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। পুরাকালে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়কে ঘটনাচক্রে নাগদের দাসত্ব করতে হয়। সেজন্য তিনি ভীষণ দুঃখিত ছিলেন। অন্যের দাসত্ব করার মতো দুঃখ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। গরুড় মাতা বিনতাকে এর কারণ জিগ্যেস করায় তিনি বলেন—আমার নিজের অপরাধেই তোমাকে আজ দাসত্ব শৃঙ্খল পরতে হয়েছে। নাগমাতা কদ্রুর সঙ্গে আমার একবার এক বিষয়ে তর্ক হয়। তাতে এই শর্ত ছিল যে, যে হেরে যাবে, তাকে দাসত্ব বরণ করতে হবে। কদ্রু ছলনা করে সেই তর্ক জিতে যায় ; ফলে আমাকে তার দাসী হতে হয়েছে, তোমাকেও সেজন্যই তাদের দাসত্ব করতে হচ্ছে।

তারপর একদিন কদ্রু বিনতার কাছে এসে তাকে বলে—দেখ, তোমার পুত্র গরুড় প্রত্যেক দিনই সূর্যকে নমস্কার করতে যায়, কিন্তু আমার পুত্রেরা সূর্যকে নমস্কার করতে পারে না। বিনতা কদ্রুকে তার কারণ জিগ্যেস করায় সে বলে—আমার পুত্রদের তুমি নাগালয়ে নিয়ে চল ; সেই নাগালয় সমুদ্রসমীপে অবস্থিত একটি শীতল সরোবর। বিনতা তখন কদ্রুকে এবং গরুড় নাগদের সেখানে নিয়ে চলল। সেখানে পৌঁছনোর পর কদ্রু এই ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, বিনতা যেন তার পুত্র নাগেদের প্রতি দিন সূর্যদর্শনে নিয়ে যায়। বিনতা কদ্রুর এই ইচ্ছার উত্তরে জানায় যে, গরুড়ই তাদের সূর্যদর্শনে নিয়ে যাবে। প্রস্তাবমতো নাগগণ গরুড়ের পিঠে চড়ে সূর্যকে নমস্কার করতে চলল। সূর্যের তাপে ক্রমশ তারা কষ্ট পেতে শুরু করল। তারা গরুড়কে অনুরোধ করল তাদের নাগালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। গরুড় কিন্তু ক্রমেই সূর্যের কাছাকাছি যেতে লাগল। তখন সূর্যের প্রখর তাপে অনেক নাগ পুড়ে গেল। পুত্রদের দগ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়তে দেখে কদ্রু ক্রুদ্ধ হয়ে বিনতাকে বলল—তোমার পুত্রের দুষ্কর্মের জন্যই আমার পুত্রদের এ রকম দশা। কি ভাবে এদের শান্তি হবে, সে-কথাই ভাবছি। সমস্ত কথা শুনে বিনতা গরুড়কে বললেন—তুমি ঠিক কাজ কর নি। যাঁরা সজ্জন তাঁরা শত্রুদের প্রতিও রূঢ় আচরণ করেন না। চন্দ্রকে দেখ, তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও যেমন কিরণ দান করেন, তেমনই চণ্ডালকেও দেন। যারা বলপূর্বক অপকার করতে পারে না, তারাই কপটতার সঙ্গে আচরণ করে। বিনতা তখন কদ্রুকে জিগ্যেস করলেন—কি করলে তোমার পুত্রদের শান্তি হবে, সে-কথা বল, তা-ই করতে চেষ্টা করব। কদ্রু বলল—রসাতলে যে জল আছে, তা দিয়ে অভিষেক করলে এদের শান্তি হবে। বিনতার আদেশে গরুড় তৎক্ষণাৎ রসাতলে গিয়ে সেই জল এনে নাগদের অভিষিক্ত করল। তারপর গরুড়ের অনুরোধে ইন্দ্র সেখানে বর্ষণ করলেন পর্যাপ্ত বারি। নাগদের সঞ্জীবিত করার জন্য গরুড় যে গঙ্গাজল পাতাল থেকে নিয়ে আসেন, সেই গঙ্গাজল পবিত্র। সেই অভিষেকের জল থেকে একটি নদীর উৎপত্তি হয়

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ; তার নাম বঙ্গরা। ঐ নদীর জল জরা, দারিদ্র্য এবং ক্লেশ বিনাশ করে। ঐ রসাতলের গঙ্গা অর্থাৎ বঞ্জরা নদী যেখানে পৃথিবীর গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে সেই স্থানের মহিমা বর্ণনা করা যায় না। সেখানে আরো অনেক তীর্থ আছে ; সেই তীর্থ সমূহে স্নান করলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

—'বঞ্জরাসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ একশো ষাট

দেবাগম নামক এক তীর্থ রয়েছে : সেই তীর্থ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান শোনা যায়, তা তোমায় বলছি। পুরাকালে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ধনের জন্য বিবাদ বাধে ; তাতে দেবতারা স্বর্গ অধিকার করে নেন এবং অসুরেরা অধিকার করে পৃথিবী। পৃথিবী অধিকার করার পর অসুরেরা দেবতাদের যজ্ঞভাগদাতা জনগণকে হত্যা করতে লাগল দেবতারা যজ্ঞের ভাগ না পেয়ে ব্যথিত হয়ে পড়লেন এবং আমার কাছে এসে তার প্রতিকার কি ভাবে করা যায়, সে কথা জিগ্যেস করলেন। আমি তাঁদের বললাম—তোমরা যুদ্ধে অসুরদের বলপূর্বক জয় করে ভূমি লাভ কর ; তাহলেই কর্ম, হবিঃ ও যশ লাভ করতে পারবে।

দেবতারা তখন পৃথিবীতে এলেন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। এদিকে অসুরেরাও সে-সংবাদ পেয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। দেবতাদের পক্ষে যেমন অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, ত্বষ্টা পূষা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসমূহ এবং অন্যান্য লোকপালগণ ছিলেন, তেমনি অসুরদের পক্ষে ছিলেন অহি, বৃত্র, বলি, ত্বাষ্ট্রি, নমুচি, শম্বর ও ময় প্রভৃতি রণকুশলী যোদ্ধারা অসুরেরা দক্ষিণ দিকে গিয়ে যুদ্ধ করতে মনস্থ করল। ত্রিকূট পর্বত আগে থেকেই রাক্ষসদের অধিকারে ছিল ; তারা ক্রমে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে মলয় পর্বতকেও অধিকার করল। এদিকে গোতমী তীরে যেখানে ভগবান শংকর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে এসে দেবতারা মিলিত হলেন। দেবতারা পরস্পর সম্মিলিত হয়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্তব করে অভয় কামনা করতে লাগল। দেবতারা দুঃখ করে বললেন—আমরা শত্রুদের নিহত করতে পারছি না ; বরং তারা আমাদের দাবিয়ে রেখেছে। এই অবস্থায় হয় বিজয় অথবা মরণ—যে কোনো একটিই আমাদের কাম্য। দেবতারা এভাবে দুঃখ করছেন এমন সময় দৈববাণী হল—দেবতাগণ, তোমরা দুঃখ করো না ; শীগগির তোমরা গোতমী তীরে যাও, সেখানে ভক্তিভরে হরি-হরের আরাধনা কর।

দৈববাণীর নির্দেশমতো দেবতারা হরি ও হরের আরাধনা করলেন। দেবতারা সেই যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করে পৃথিবীকে পুনরায় অধিকার করলেন। যেখানে দেবতাদের সমাগম ঘটেছিল, সেই স্থান 'দেবাগম' তীর্থ নামে পরিচিত। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এর প্রশংসা করে থাকেন। সেখানে যে পর্বতটি রয়েছে তার নাম দেবাগম ; 'প্রিয়' নামেও একে অভিহিত করা হয়। তখন থেকেই ওই তীর্থ দেবপ্রিয় হয়েছে।

—'দেবাগমতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ একশো একষট্টি

কুশতর্পণ ও প্রণীতাসঙ্গম নামে যে দুটি বিখ্যাত তীর্থ রয়েছে, তাদের কথা এবার তোমাকে শোনাব। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকে সহ্য নামে এক পর্বত আছে, এরই পাদদেশ থেকে গোদাবরী, ভীমরথী প্রভৃতি নদী উদ্ভূত হয়েছে। সেখানেই বিজয় তীর্থ এবং একবীরা নামক নদী আছে। সেই সহ্য পর্বতের কোন এক পুণ্য স্থানে কুশতর্পণ ও প্রণীতাসঙ্গম নামে দুটি তীর্থের উৎপত্তি হয়। আমি তোমাকে অতি গহন যে কথা শোনাতে চলেছি তা মুনিগণ, দেবতাগণ, পিতৃগণ ও অসুরগণ—কেউই জানেন না।

সেই অব্যক্ত পুরুষকে পর ও অক্ষয় বলে জানবে। তাঁর থেকেই প্রকৃতিযুক্ত অপর ক্ষর পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। নিরাকার অব্যক্ত পুরুষ থেকে সাকার পুরুষের জন্ম হয়। সেই সাকার পুরুষ থেকে সলিলের সৃষ্টি হয় এবং সলিল থেকে সৃষ্টি হয় নারায়ণের। সেই সলিল ও নারায়ণ থেকে একটি পদ্ম জন্মায়, আমি সেই পদ্মে জন্মেছি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আপ্ এবং জ্যোতি—এরা আমার থেকেও আগে জন্মেছে। আমি জন্মগ্রহণ করার পর এদেরই দেখতে পাই, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি তখন কিছুই ছিল না। তখন বেদ ছিল না; এবং আমিও অন্য কিছুই দেখি নি। পরে যাঁর থেকে আমি উৎপন্ন হয়েছিলাম, তাঁকেও দেখতে পাই নি। যা হোক, তখন এক আকাশবাণী হয়। ওই আকাশবাণীর বক্তব্য—ব্রহ্মা, তুমি স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয় প্রকার জগতের সৃষ্টি কর। আমি আকাশবাণীকে জিগ্যেস করলাম—কেমন করে সৃষ্টি করব? কোথায় সৃষ্টি করব? কি দিয়েই বা সৃষ্টি করব?

আকাশবাণী ঃ যজ্ঞ কর; তাহলেই তোমার শক্তিলাভ হবে। 'যজ্ঞই বিষ্ণু' এ রকমই শোনা যায়।

আমি ঃ তুমি দয়া করে বলে দাও কোথায়, কি দিয়েই বা যজ্ঞ করব?

আকাশবাণী ঃ এই কর্মভূমিতে যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষকে যজন কর; তিনিই তোমার যজ্ঞীয় সাধন হবেন। তাঁকে দিয়েই তাঁর যজ্ঞ কর। যজ্ঞ, স্বাহা, স্বধা, মন্ত্রসমূহ, ব্রাহ্মণ, হবিঃ প্রভৃতি সমস্তই হরির, সেজন্যই যজ্ঞপুরুষ হরির কাছ থেকে সব কিছুই পাওয়া যায়।

আমি ঃ সেই কর্মভূমি কোথায়?

আকাশবাণী ঃ সুমেরু পর্বত, হিমালয় এবং সহ্য পর্বতেরও দক্ষিণে শুভ কর্মভূমি বিদ্যমান।

সেই আকাশবাণীর নির্দেশমতো আমি সেই জায়গায় গিয়ে কোথায় থাকব এ রকম ভাবছি, এমন সময়ে সেই বৈষ্ণবী আকাশবাণী বলল—যজ্ঞের সংকল্প কর; সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে। সংকল্প করার পর যজ্ঞার্থবিদ্‌গণ যা যা বলবেন, সে-রকম কাজ করো। তখন ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শব্দগোচর যা কিছু সবই স্বতস্ফূর্তভাবে আমার স্মৃতিগোচর হল এবং মুখে স্ফুরিত হতে লাগল। সমগ্র বেদার্থ আমার জ্ঞানগোচর হল; সেই বিখ্যাত পুরুষসূক্তও আমার স্মৃতিপথে জাগরিত হল। সেখানে শুচি ও সংযতভাবে আমি যজ্ঞের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। ব্রাহ্মণবহুল সেই স্থান আমারই নামে পরিচিত হয়। সেই পবিত্র দেবযজন স্থান ব্রহ্মগিরি নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মগিরির পূর্বদিকে চব্বিশ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানকেই দেবযজন প্রদেশ

বলা হয়। এরই মাঝখানে বেদী ; তার দক্ষিণে গার্হপত্য অগ্নির ও আহরণীয় অগ্নির স্থান—এভাবে আমি সেখানে অগ্নির কল্পনা করেছিলাম। বৈদিক বিধান এই যে, পত্নী ছাড়া যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না। সেজন্য আমি নিজেকে দু-ভাগে ভাগ করলাম ; এক ভাগকে মনে করলাম পত্নী আর বাকী অন্য ভাগ আমি। বসন্তকালকে আজ্যরূপে, গ্রীষ্মকে যজ্ঞীয় সমিধরূপে, শরৎকালকে হবিরূপে এবং বর্ষাকালকে কুশরূপে কল্পনা করলাম। সাতটি ছন্দঃ আমার যজ্ঞের বেদীর সীমানা রচনা করল। যিনি অনাদি ও অনন্ত, সেই কালই তখন যূপরূপে কল্পিত হন। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনটি গুণ কল্পিত হয়েছিল পশুবন্ধন-রজ্জুরূপে। কিন্তু যজ্ঞীয় পশু না থাকায় আমি তখন সেই আকাশ-বাণীকে উদ্দেশ করে বললাম—পশু ব্যতীত এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। তখন সেই অশরীরী বাণী বলল—পুরুষ সূক্ত দ্বারা সেই পরম পুরুষের স্তব কর। আমি তার কথামতো ভক্তিভরে সেই পুরুষ সূক্তের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুকে স্তুতি করতে থাকলে সেই অশরীরী বাণী বললেন—তুমি আমাকেই যজ্ঞীয় পশু কর। তখন আমার জনক সেই অব্যয় পুরুষকে পুরুষ পশুরূপে কালরূপ যূপের পাশে কুশের উপর সত্ত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের দ্বারা বদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেলাম।

এদিকে সেই পুরুষ থেকেই সমগ্র বিশ্ব চরাচর উৎপন্ন হল। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণ এবং বাহু থেকে ক্ষত্রিয়গণ জন্মাল। মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ থেকে বায়ু, কান থেকে দিকসমূহ, মাথা থেকে স্বর্গ, মন থেকে চন্দ্র, চক্ষুদ্বয় থেকে সূর্য, নাভি থেকে অন্তরীক্ষ, উরুদ্বয় থেকে বৈশ্যগণ, পদযুগল থেকে শূদ্রজাত ও ভূমি, রোমকূপ থেকে ঋষিগণ, কেশ থেকে ওষধিসমূহ, নখসমূহ থেকে গ্রাম্য ও অরণ্য পশুসকল এবং পায়ু ও উপাস্থ থেকে কৃমি, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি উদ্ভূত হয়। তারপর আমার কাছ থেকে দেবতারা উৎপন্ন হন। তখন সেই অশরীরী বাণী বললেন—সমস্ত কাজই সুসম্পন্ন হয়েছে, অতএব হে ব্রহ্মা, তুমি যজ্ঞীয় পাত্রসমূহ ও অন্যান্য উপকরণসমূহ অগ্নিতে আহুতি দাও। যূপ, পুরুষ পশু, পাশসমূহ, ঋত্বিক, যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জন দাও।

সেই অশরীরী বাণীর কথা শুনে তখন সেই পরমপুরুষকে ধ্যান করে যজ্ঞীয় উপকরণ সকল অগ্নিতে আহুতি দিলাম। যজ্ঞদেবতা বিষ্ণু তখন সেই কুণ্ডের কাছে আবির্ভূত হলেন, তাঁকে আহরণীয় অগ্নিতে শ্বেতরূপধারী, দক্ষিণ অগ্নিতে শ্যাম ও গার্হপত্য নামক অগ্নিতে পীতমূর্তিধারী রূপে দেখলাম। তারপর আমি মন্ত্র দ্বারা প্রণীতা-পাত্র স্থাপন করলাম। সেই প্রণীতা-জলই প্রণীতা নামে পবিত্র নদীতে পরিণত হয়েছে। তারপর আমি সেই প্রণীতাকে কুশ দিয়ে মার্জন করে বিসর্জন দিই। মার্জন করার সময় সেই প্রণীতা-পাত্র থেকে যেখানে যে জলের বিন্দু পড়েছিল, সেখানে অনেক তীর্থ উৎপন্ন হয়। যেখানে সেই মার্জন কুশসমূহ পড়েছিল, সেই স্থানটি কুশতর্পণ নামে অভিহিত হয়। সেখানেই প্রণীতা নামক নদী পরবর্তী কালে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হওয়ায়, সেই স্থানকে প্রণীতাসঙ্গম বলা হয়। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর দিকে সেই যজ্ঞীয় যূপকে আমি বিসর্জন দিই, সেই যূপ অক্ষয় ; তাই অক্ষয় বটরূপে তা পরিণত হয়েছে। সেই দেবযজন স্থানই এখন দণ্ডকারণ্য বলে পরিচিত। সবার শেষে যজ্ঞপুরুষ সেই বিষ্ণুকে আমি বিসর্জন দিই ; বেদে বিরাট নামে তিনি পরিচিত, তিনিই পদার্থসমূহের স্রষ্টা ; এই জগৎ তাঁরই বিকার মাত্র।

সেই দণ্ডকারণ্য অতি পবিত্র স্থান ; বিশেষত তার যে অংশে গৌতমী প্রবাহিত, সেই

প্রদেশ পবিত্রতম হয়েছে। যে ব্যক্তি প্রণীতাসঙ্গমে কিংবা কুশতর্পণে স্নান, দান প্রভৃতি করে, সে পরম পদ লাভ করে। অনেকে বলেন যে, বারাণসী থেকেও কুশতর্পণ তীর্থ শ্রেষ্ঠ। একে স্বর্গদ্বার বলা হয়ে থাকে।

—'প্রণীতাসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো বাষট্টি

মন্যুতীর্থ নামে বিখ্যাত একটি তীর্থ আছে। এর সম্বন্ধে যে উপাখ্যান শোনা যায়, তা বলছি, শোন। পুরাকালে দেবতা ও দানবদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে। দেবতারা সেই যুদ্ধে পরাজিত হন এবং দানবগণ বিজয়ী হয়। তখন দেবতারা আমাকে এসে তার প্রতিকারের উপায় জিগ্যেস করেন। আমি তাঁদের এই পরামর্শ দিই যে, তাঁরা যদি গৌতমী গঙ্গার তীরে গিয়ে মহেশ্বরের আরাধনা করেন, তাহলে তিনিই তাঁদের প্রতিকারের উপায় করে দেবেন। আমার পরামর্শমতো তাঁরা গৌতমীর তীরে গিয়ে তপস্যা, নাচ-গান প্রভৃতির দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁদের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে দেবতারা বলেন—আপনি এমন একজন রণকুশলী পুরুষকে দিন, যিনি আমাদের সেনানায়ক হয়ে দানবদেব পরাজিত করতে পারবেন। মহেশ্বর তাঁদের প্রার্থনামতো নিজের তেজকে সংহত করে মন্যু নামক এক পুরুষ সৃষ্টি করলেন। দেবতারা মহাদেবকে নমস্কার করে মন্যুকে নিয়ে চলে গেলেন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাঁরা মন্যুর ক্ষমতার পরিচয় নিতে চাইলে তিনি দেবতাদের বললেন—সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শিব আমার জন্ম দিয়েছেন ; সুতরাং আমার ক্ষমতার কি পরিচয় আপনাদের দেব ? তবু আপনারা যখন পরীক্ষা করতে চেয়েছেন আমার সামর্থ্য, তখন দেখুন। এই কথা বলেই মন্যু সেই রূপ দেখালেন, যে রূপে পুরুষে পৌরুষ রূপে, জন্তুতে অহঙ্কাররূপে, সমস্ত জীবে ক্রোধরূপে বিরাজিত। যে রূপ থেকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে, যা জগতের সংহারকারী সেই রূপই মন্যু দেবতাদের দেখালেন। দেবতারা সেই রূপ দেখে তাঁর সামর্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। দেবতারা তখন তাঁকে বললেন—তুমি আমাদের সেনানী হও। তোমার দেওয়া এই রাজ্য আমরা ভোগ করব। আমরা যাতে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি, সেজন্য সমস্ত দেবতার শরীরে প্রবেশ কর। তুমি ইন্দ্র, তুমিই বরুণ, তুমিই লোকপালসমূহ হও। দেবতাদের কথা শুনে মন্যু বললেন—দেখুন, আমি সবার অন্তরেই রয়েছি। কিন্তু আমাকে কেউ জানে না। এ কথা বলেই তিনি পৃথক পৃথক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। সেই মন্যুই রুদ্র, তিনিই শিব। স্থাবর, জঙ্গম সমস্তই সেই মন্যু কর্তৃক ব্যাপ্ত।

তারপর সেই মন্যুকে সেনানায়ক করে দেবতারা দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। দেবতারা গৌতমী তীরে যেখানে শিবের আরাধনা করে মন্যুকে লাভ করেন, সেই স্থান মন্যুতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। যে এই বৃত্তান্ত মন দিয়ে শোনে, কারুর কাছ থেকেই সে কখনো পরাজিত হয় না। সেই মন্যুতীর্থে মন্যুরূপী শঙ্কর সর্বদাই বিরাজ করেন। সেখানে স্নান বা দান করলে সমস্ত বাঞ্ছিত ফলই লাভ করা যায়।

—'মন্যুতীর্থ বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো তেষট্টি

তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—সারস্বত নামক এক পবিত্র তীর্থ রয়েছে ; এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। এই তীর্থ বিষয়ে যে উপাখ্যান শোনা যায় তারই কথা বলছি।

পুষ্পোৎকটার পূর্বদিকে শুভ্র নামে একটি বিখ্যাত পর্বত আছে। গৌতমীর দক্ষিণ তীরে ওই পর্বত অবস্থিত। শাকল্য নামে বিখ্যাত, পরম নিষ্ঠাবান এক ব্রাহ্মণ সেই পর্বতে তপশ্চারণ করতেন। সেই পবিত্র পর্বতে যে ঘোর অরণ্য ছিল সেখানে পরশু নামে যজ্ঞদ্বেষী এক রাক্ষস বাস করত ; সে ইচ্ছানুযায়ী রূপে ধারণ করতে পারত। সে কখনো ব্রাহ্মণরূপে, কখনো বাঘরূপে, কখনো দেবতারূপে, কখনো পশুরূপে, কখনো সুন্দরী নারীরূপে, কখনো হরিণরূপে সেই পর্বতের বনে বনে বিচরণ করত। শাকল্য যেখানে বাস করতেন সেখানেও সে আসত। সে অনেক ভাবে শাকল্যকে হত্যা করতে চেষ্টা করে কিন্তু কোনোবারই সফল হতে পারে নি। একবার সেই নিষ্ঠাবান শাকল্য মুনি দেবপূজা করার পর খেতে বসেছেন, এমন সময় সেই দুরাত্মা পরশু একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার সঙ্গে ছিল একটি সুন্দরী কন্যা। সে শাকল্যকে বলল—আমরা দুজন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি ; এই বিজন বনে কোথাও খাদ্য না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি। দেখ, ইহলোকে তারাই ধন্য, যাদের ঘর থেকে অতিথিরা তাদের অভিলাষ পূর্ণ করে যেতে পারেন। ভোজন করতে বসে নিজের খাদ্য যে অতিথিকে দান করে, বলতে গেলে সে সমগ্র বসুন্ধরাই দান করে ফেলে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনে শাকল্য তাদের যথাবিধি সৎকার করে খেতে দিলেন। পরশু এক গণ্ডূষ জল হাতে নিয়ে বলল—দেবতারা দূরে থেকে অভ্যাগত এবং শ্রান্ত ব্যক্তির অনুগমন করেন ; সুতরাং সেই অতিথি তৃপ্ত হলে পর তাঁরাও তৃপ্ত হয়ে থাকেন। দেখ, অতিথি এবং অপবাদী এরা উভয়ে বিশ্ববান্ধব ; কারণ, অপবাদী পাপসমূহ হরণ করে ; আর অতিথি স্বর্গলাভের কারণ হয়। এজন্য অতিথি হয়ে তোমার কাছে এই প্রার্থনা রাখছি যদি তুমি আমার প্রার্থিত বস্তু দান কর, তবেই আমি খাদ্য গ্রহণ করব। শাকল্য তার প্রার্থনা পূরণ করতে প্রতিশ্রুত হলে পরশু বলল- দেখ, আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি রাক্ষস ; তোমার শত্রু। তোমাকে আমি নিয়ে গিয়ে ভক্ষণ করব—এইই আমার ইচ্ছা।

পরশুর কথা শুনে শাকল্য বললেন—মহাকুলে জন্ম যাঁদের, তাঁরা যে প্রতিশ্রুতি দেন, তা-ই পালন করে থাকেন। কখনোই এর কোন অন্যথা ঘটে না। তাহলেও তোমাকে আমার কিছু বলার রয়েছে। আমি ব্রাহ্মণ, হরি আমাকে রক্ষা করুন। বিষ্ণু আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন, দেব জনার্দন আমার মস্তক রক্ষা করুন, বরাহ আমার বাহুযুগল রক্ষা করুন, কূর্মরাজ আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন ; কৃষ্ণ আমার হৃদয় রক্ষা করুন। নৃসিংহ আমার অঙ্গুলিসকল রক্ষা করুন। বাগীশ আমার মুখ রক্ষা করুন, পক্ষিরাজ আমার নেত্রদ্বয় রক্ষা করুন, চিত্তেশ আমার কর্ণযুগল রক্ষা করুন ; ভব রক্ষা করুন আমার সর্বাঙ্গ, দেব নারায়ণ আমার নানা আপদে একমাত্র শরণ হোন। নারায়ণের কাছে এ রকম প্রার্থনা জানানোর পর শাকল্য পরশুকে বললেন—এবার তুমি আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে চল। সেই পরশু তখন শাকল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে বেশ করে দেখে বলল—আমি তোমাকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপে দেখছি। এখন তোমাকে সহস্রপাদ, সহস্রশিরা, সহস্রনেত্র, সহস্র-

কর, ছন্দোরূপ, জগন্ময়, বিভু আকারে দেখতে পাচ্ছি। তোমার সে আগেকার শরীর এখন আর নেই। এখন আমিই তোমার শরণ নিচ্ছি। কি করলে আমার পাপের নিষ্কৃতি ঘটবে, এমন উপায় বলে দাও। মহান ব্যক্তির দর্শন কখনই নিষ্ফল হয় না ; স্পর্শমণির সংযোগে লোহা সোনারূপে পরিণত হয়।

শাকল্য তখন পরশুর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে তাকে বললেন—সরস্বতীই তোমাকে বর দান করবেন। সেই পবিত্র নদীতে স্নান করে পরে দেব জনার্দনের স্তব কর। আমি বলছি, দেবী সরস্বতী তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন। শাকল্যের কথামতো পরশু গৌতমী গঙ্গায় স্নান করার পর শুক্লবর্ণা সরস্বতীদেবীকে দেখতে পেল। সে বিনীতভাবে সরস্বতীকে বলল—গুরু শাকল্য আমাকে বিষ্ণুর স্তব করতে বলেছেন ; তোমার অনুগ্রহে যাতে আমার সেই শক্তি জন্মে, দয়া করে সেই ব্যবস্থাই কর। সরস্বতী পরশুকে বর প্রদান করলেন ; সেই বরে দেব জনার্দনকে পরশু স্তব করল। বিষ্ণু তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এই কথাই বললেন—তোমার যা ঈপ্সিত, তা-ই তুমি আমার অনুগ্রহে লাভ করবে। তখন থেকেই ওই তীর্থ সারস্বত নামে পরিচিত হয়। সেই শ্বেত পর্বতে সারস্বত, বৈষ্ণব, শাকল্য, পরশু প্রভৃতি আরো অনেক তীর্থ আছে।

—'শাকল্যপ্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো চৌষট্টি

এবার তোমাকে চিচ্চিক বা চর্চিকতীর্থের কথা শোনাব। আগে তোমাকে শ্বেত পর্বতের কথা বলেছি। গঙ্গার উত্তর তীরে সেই শ্বেত পর্বতে চিচ্চিক বাস করত ; সে ভেরুণ্ড নামেও পরিচিত ছিল। সেখানে নানান্ গাছপালা, নানান্ জাতির লোক বাস করত। এমন একটি গাছ সেখানে ছিল, যার কাছে এলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চিন্তা বা মৃত্যুর ভয় থাকত না। একবার পবমান নামে এক ধার্মিক রাজা সৈন্য-সামন্ত এবং পুরোহিতদের সঙ্গে সেই পর্বতে মৃগয়া করতে এলেন। সেই পর্বতে বিচরণ করতে করতে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে সেই গাছের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সেই গাছে একটি স্থূলকায় পাখিকে দেখলেন ; তার দুটি মুখ রয়েছে। রাজা তাকে চিন্তান্বিত দেখে জিগ্যেস করলেন—তুমি কে ? এই গাছের কাছে এলে কারুরই তো কোন চিন্তা থাকে না বলে শুনেছি। তবে তোমাকে দুঃখিত এবং চিন্তান্বিত দেখছি কেন ? রাজার কথা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিচ্চিক বলল—আগে এই পর্বতে নানান্ লোক বাস করত, অথচ এখন এখানে লোক নেই বললেও চলে। এজন্যই আমার দুঃখ। কোথাও আমি শান্তি পাচ্ছি না। রাজা সেই পাখির কথা শুনে বিস্মিত হয়ে তাকে জিগ্যেস করলেন—তুমি কে ? কি পাপই বা তুমি করেছ ? পর্বতই বা জনশূন্য কেন ? প্রাণীরা তো একটি মুখেই তৃপ্ত হয়, তবে তোমার দুটো মুখ কেন ? তুমি কি পাপ করেছ, যে জন্য তোমার এই দশা ? সমস্ত কথা আমাকে খুলে বল, আমি তোমাকে ভয়মুক্ত তথা চিন্তামুক্ত করতে চেষ্টা করব।

রাজার কথায় আশ্বস্ত হয়ে চিচ্চিক বলল—পূর্বে আমি ব্রাহ্মণ এবং বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলাম। আমার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল সুবিদিত। কিন্তু আমার দোষের মধ্যে ছিল—

বিবাদপ্রিয়তা এবং পরশ্রীকাতরতা। লোকের সাক্ষাতে এক রকম, অসাক্ষাতে অন্য এক রকম বলতাম। কোন কাজে বাগড়া দেওয়া ছিল আমার স্বভাব। বিদ্বানদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে আমি অসৎ সঙ্গে সর্বদা কাল কাটাতাম। আমার ব্যবহারে লোকে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই আমার দুটি মুখ হয়েছে। আমারই কুকর্মের ফলে আমার বাসস্থান এই পর্বতটি জনশূন্য হয়েছে। ব্রহ্মহত্যা ছাড়াও এমন কতকগুলি পাপ আছে, যার দ্বারা ব্রহ্মহত্যার মতোই পাপ হয়। ক্ষত্রিয় ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়মান, অস্ত্রপরিত্যাগকারী, বিশ্বস্ত, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, উপবিষ্ট কিংবা আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তিকে যদি কেউ হত্যা করে, তবে ব্রহ্মহত্যার সমানই তার পাপ হয়। যে অধীত বিষয় ভুলে যায়, তাকে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মতো আদর করে এবং মাননীয় গুরুজনদের অনাদর করে, পণ্ডিতরা তাকেও ব্রহ্মহত্যাকারী বলে থাকেন। যে কথায় এক রকম ; কাজে অন্য রকম, প্রত্যক্ষে যে প্রিয় কথা বলে এবং অসাক্ষাতে অপ্রিয় কথা বলে, যে গুরুজনের নামে শপথ করে, ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, সেও ব্রহ্মহত্যাকারী। যে ব্যক্তি দেবতা, বেদসমূহ, ধর্মশাস্ত্র, ধর্ম এবং সাধুব্যক্তির নিন্দা করে, সে-ও ব্রহ্মহত্যাকারী রূপে পরিগণিত হয়। আমিও এ রকম পাপ করেছি। সেজন্যই আমাকে পাখি হতে হয়েছে। পাপী হলেও কিছু ভালো কাজ করেছি ; সেজন্যই পূর্বজন্মকৃত সেই কথা আমি স্মরণ করতে পারছি। রাজা তখন চিচ্চিককে জিগ্যেস করলেন—কোন্ কর্মে তোমার মুক্তি হবে, সে-কথা আমায় বল। চিচ্চিক পবমানের কথা শুনে বলল—গৌতমীর উত্তর তীরে এই পর্বতেই গদাধর নামে এক তীর্থ আছে, সেই পবিত্র তীর্থে আমাকে নিয়ে চলুন। আমার চেষ্টায় সেখানে আমি যেতে পারছি না, আপনি আমাকে দয়া করে সেখানে নিয়ে চলুন। রাজা তখন চিচ্চিককে নিয়ে সেই গদাধরদেব এবং গঙ্গাকে দেখালেন। গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে চিচ্চিক গঙ্গাকে উদ্দেশ করে বলল,—তোমাকে কেউ যতক্ষণ না দর্শন করে, ততক্ষণ জীব মুক্ত হতে পারে না। আমি অনেক দুষ্কর্ম করেছি, অনেক পাপ করেছি ; আমাকে তুমি উদ্ধার কর। তুমি ছাড়া সংসারে দেহীদের আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর গদাধরকে দর্শন করে সেই পাখি সকলের সামনে স্বর্গে চলে গেল। রাজাও তাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন। তারপর থেকেই ওই স্থান পবমান, চিচ্চিক বা চর্চিক, গদাধর, কোটিতীর্থ প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

—'পারমানাদি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো পঁয়ষট্টি

এবার তোমাকে বিখ্যাত ভদ্রতীর্থের কথা শোনাব। আগেই তোমাকে বলেছি যে সূর্যের দুজন স্ত্রী—বিশ্বকর্মার মেয়ে ঊষা, অন্য জন ছায়া। ছায়ার পুত্র শনি ; শনির বোন বিষ্টি। বিষ্টির আকৃতি ছিল ভীষণ। বিষ্টিকে কার হাতে সম্প্রদান করবেন সেই চিন্তা সূর্যকে আচ্ছন্ন করে ছিল। যাকেই তিনি বিষ্টির জন্য পাত্ররূপে মনোনীত করেন, সে-ই বিষ্টির ভীষণাকৃতির কথা শুনে পিছিয়ে পড়ে। এ রকম অবস্থায় বিষ্টি একদিন পিতা সূর্যকে বললেন—চার বছরের পর এবং দশ বছরের মধ্যে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করা উচিত। শ্রীমান, বিদ্বান, যুবক, কুলীন, যশস্বী, উদার, অভিভাবকবান পাত্রেই কন্যা দান করা উচিত। পর্বত এবং বনসমন্বিত সমগ্র পৃথিবী একদিকে আর অলঙ্কারভূষিতা ব্যাধিহীন সুকন্যা একদিকে—দুই-ই সমান। যে ব্যক্তি কন্যা, অশ্ব, গো, তিল—এ সমস্ত বিক্রি

করে, রৌরব প্রভৃতি ভীষণ নরক থেকে সে কোন দিনই নিষ্কৃতি পায় না। কন্যার যত দিন লজ্জাবোধ না হয়, সেই সময়ের মধ্যেই কন্যাকে সম্প্রদান করা উচিত, তা না হলে পিতামাতার অধোগতি হয়। সন্তান পিতার স্বরূপই হয়। পিতা কন্যার জন্য যা কিছু করেন সে সবই সৎ কর্ম বলে পরিগণিত হয়। সূর্য কন্যার এ রকম কথা শুনে তাকে বললেন—সমস্যা কি জানো, তোমার আকৃতির কথা শুনে কেউই তোমাকে গ্রহণ করতে সম্মত নয়। বিবাহ ব্যাপারে সবাই পরস্পর উভয়েরই বংশ, চরিত্র, বয়স, রূপ, বিত্ত, বিদ্যা, বৃত্ত এবং ব্যবহার প্রভৃতি বিশেষ করে দেখে। এক্ষেত্রে সবই তো আমাদের আছে, শুধু তোমার রূপেরই অভাব। এ অবস্থায় আমার কি করণীয় আছে? বৃথা আমাকে ধিক্কার দিচ্ছ কেন? তবে এক কাজ করা যেতে পারে। আমি যাকেই দিই না কেন, তাকে গ্রহণ করতে যদি তুমি রাজী থাক, তবে তোমাকে পাত্রস্থ করতে পারি। সূর্যের কথা শুনে বিষ্টি তাঁকে বললেন—পতি, পুত্র, ধন, সুখ, আয়ু, রূপ, সম্প্রীতি—এ সমস্তই পূর্বের কর্মানুসারে হয়ে থাকে। পূর্বজন্মে যে রকম কাজ করে পরজন্মে মানুষ সে রকম ফলই লাভ করে। পিতার পক্ষে উচিত নিজ বংশের অনুরূপ বংশে কন্যাদান করা; তাতে তাঁর দিক থেকে কর্তব্যের ত্রুটি থাকবে না।

সূর্য তখন ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের হাতে বিষ্টিকে সম্প্রদান করলেন; সেই বিশ্বরূপও তার মতোই ভীষণাকৃতিবিশিষ্ট ছিল। গণ্ড, অতিগণ্ড, রক্তাক্ষ, ক্রোধন, ব্যয়, দুর্মুখ ও হর্ষণ নামে তাদের কয়েকজন পুত্র জন্মায়। তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষণ পবিত্র, চরিত্রবান, শান্ত ও শুদ্ধমতি। সে একবার মাতুলকে দেখার জন্য যম-ভবনে যায়। যম বিষ্টির বৈমাত্রেয় ভাই। সেখানে স্বর্গস্থ ও নরকস্থ অনেক প্রাণী দেখে সে যমকে জিগ্যেস করল—এই সুখী প্রাণীরা কারা, আর এই যারা যন্ত্রণা ভোগ করছে, এরাই বা কারা? হর্ষণের কথা শুনে যম তাদের কর্মগতির কথা যথাযথভাবে বললেন। তিনি আরো বললেন—যাঁরা কখনো বিহিত কর্মের অন্যথা করেন না অর্থাৎ যা করা উচিত, তাই-ই করেন, তাঁরা স্বর্গে যান; আর যারা শাস্ত্র মানে না, আচার পালন করে না, কর্তব্য করে না, তারা নরকগামী হয়। যমের কাছ থেকে এ রকম কথা শুনে হর্ষণ বলল- আমার পিতা এবং মাতা দুজনেরই আকৃতি ও প্রকৃতি ভীষণ। আপনি এমন কোন উপায়ের কথা বলুন যাতে আমার ভাইরা সুরূপ, শান্ত ও চরিত্রবান হতে পারে। আমি সর্বোপায়ে সেই চেষ্টা করব। তা যদি না হয়, তবে আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না। যম তখন হর্ষণকে বললেন—তোমার জন্ম সার্থক। বংশে অনেক পুত্র জন্মালেও কুলের সম্মানবর্ধনকারী পুত্র যদি না জন্মায়, তাহলে সে বংশের কোন দাম থাকে না। পক্ষান্তরে যার দ্বারা কুলের উৎকর্ষ ঘটে এ রকম একটি পুত্রই প্রকৃত পুত্র। যে পুত্র কুলের আধার-ভূত, যে পিতামাতার প্রিয়কারী, যে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করে সে-ই প্রকৃত পুত্র। তুমি এক কাজ কর; গোতমী গঙ্গার তীরে যাও। সেখানে স্নান করে সংযতচিত্তে ভগবান বিষ্ণুর স্তব কর। তিনি যদি প্রীত হন, তবে তোমাকে সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান করবেন।

যমের কথামতো হর্ষণ সেখানে গিয়ে বিষ্ণুর স্তব করলেন। বিষ্ণু তার স্তবে তুষ্ট হয়ে বললেন—তোমার ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল হোক। তারপর থেকেই বিষ্টি ভদ্রা নামে এবং তার পুত্রগণ ও বিশ্বরূপ ভদ্র নামে পরিচিত হয়। তখন থেকেই ওই স্থান 'ভদ্রতীর্থ' নামে অভিহিত হয়। সেই তীর্থে স্বয়ং ভদ্রপতি হরি বিরাজ করেন।

—'ভদ্রতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো ছেষট্টি

পবিত্র তীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব। তার্ক্ষ্য প্রজাপতি কশ্যপের অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র জন্মায়। সম্পাতি ও জটায়ু গরুড়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন ওই বংশে। তারা একবার নিজেদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা করতে করতে সূর্যকে নমস্কার করতে যায়। তারা যেই সূর্যের কাছাকাছি এসে পেঁছিয়, অমনি তাদের ডানা পুড়ে যায়। তারা তখন একটা পর্বতের ওপরে পড়ে যায়। তারা যেখানে ডানা-পোড়া অবস্থায় পড়ে যায়, তার কাছাকাছিই অরুণ ছিলেন। তিনি তাদের এ রকম অবস্থায় দেখে সূর্যকে উদ্দেশ করে বললেন--তুমি নিখিল জগতের প্রভু ; তোমারই প্রখর তাপে এদের ডানা পুড়ে গেছে. এদের তুমি সুস্থ করে দাও এবং আগেকার অবস্থা যাতে এরা ফিরে পায়, সে ব্যবস্থা কর। অরুণের প্রার্থনায় সূর্য তাদের সুস্থ করে তুললেন। গরুড়ও তাদের এ রকম অবস্থার কথা শুনে বিষ্ণুর সঙ্গে সেখানে এলেন এবং তাদের খোঁজ খবর নিলেন। তারপর জটায়ু, সম্পাতি, গরুড়, অরুণ, সূর্য এবং বিষ্ণু সবাই গৌতমী গঙ্গায় গিয়ে স্নান করলেন। তাঁরা যেখানে স্নান করেন, সেই স্থান তীর্থরূপে পরিণত হয়। ওই স্থান পবিত্রতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। সেই গৌতমীর তীরে সূর্য ও বিষ্ণু অরুণ ও গরুড়ের সঙ্গে স্বয়ং বিদ্যমান। তাই ওই স্থান উত্তম তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি সেখানে স্নান করে ওই দেবতাদের প্রণাম করবে, সে সমস্ত ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

—'পবিত্রতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো সাতষট্টি

বিপ্রতীর্থ ও নারায়ণতীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, তার কথা এবার তোমায় শোনাব। অন্তর্বেদী নামক স্থানে কোন এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন ; রূপে ও গুণসম্পন্ন তাঁর অনেকগুলি পুত্র জন্মায়। তাদের মধ্যে যে সবার চেয়ে ছোট, তার নাম আসন্দিব ;— সে শান্ত, জ্ঞানবান এবং মহামতি। পিতা যে সময় তার বিয়ের ব্যবস্থা করছিলেন, সে-সময় এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। একদিন আসন্দিব বিষ্ণু স্মরণ না করেই উত্তর দিকে মাথা করে শুয়েছিলেন। এমন সময় এক রাক্ষসী এসে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে তুলে নিয়ে চলে যায়। গৌতমীর দক্ষিণ তীরে শ্রীপর্বতের উত্তরদিগ্‌বর্তী প্রত্যন্ত পর্বতে সুসমৃদ্ধ একটি নগর ছিল। সেই নগরের রাজা ছিলেন বৃহৎকীর্তি। সেই রাক্ষসী আসন্দিবকে নিয়ে ভোরবেলায় বৃহৎকীর্তির নগরে এসে উপস্থিত হয়। সুন্দরী রমণীর বেশে সেই রাক্ষসী আসন্দিবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সে একদিন বৃদ্ধার বেশে আসন্দিবকে বলল —সামনে এই গৌতমী গঙ্গা প্রবাহিত। তুমি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে সন্ধ্যা উপাসনা কর। যথাসময়ে সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি করা ব্রাহ্মণদের একান্ত কর্তব্য। যারা তা না করে, তারা অধম। আমাকে তোমার জননী বলে জানবে এবং সকলের কাছে এই পরিচয়ই দেবে। যদি তুমি আমার কথা মেনে চল, তবে তুমি সুখ লাভ করতে পারবে, তা না হলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। আমার কথা শুনে চললে আবার যাতে তুমি নিজের দেশে, নিজের বাড়িতে ফিরতে পারো সে ব্যবস্থা করব। আসন্দিব তখন

তাকে জিগ্যেস করলেন—তুমি কে ? সত্যি করে বল। আসন্দিবের প্রশ্নের উত্তরে সেই রাক্ষসী বলল—জগতে আমি কঙ্কালিনী নামে প্রসিদ্ধ ; কিন্তু তুমি শপথ কর যে এ কথা কাউকে বলবে না। যদি তুমি শপথ রক্ষা কর তবে তোমার প্রিয় কর্মই করব, অন্যথায় তোমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। আসন্দিব তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি তার কথা মেনে চলবেন।

সেই বৃদ্ধারূপী রাক্ষসী যেখানে যেত সেখানেই আসন্দিবকে নিজের পুত্র বলে পরিচিত করত। আসন্দিব সৌভাগ্য, বয়স ও বিদ্যা দ্বারা ভূষিত ছিল। এক ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যাকে অলংকারে ভূষিত করে আসন্দিবকে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্মণকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করে আসন্দিব চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। সেই রাক্ষসীর নজর এড়িয়ে ব্রাহ্মণকন্যাকে রাখা তো মুশকিল। সে সময় সেই বৃদ্ধারূপী রাক্ষসী অন্যত্র গিয়েছিল। পতিকে দুঃখিত এবং চিন্তান্বিত দেখে সেই ব্রাহ্মণকন্যা তাঁকে জিগ্যেস করল—তোমাকে চিন্তান্বিত এবং দুঃখিত দেখছি। তুমি কিসের জন্য চিন্তান্বিত আমাকে বল। পত্নীর কাছে কোন জিনিস গোপন করতে নেই। আসন্দিব তখন সমস্ত কথা পত্নীকে বললেন। সমস্ত ঘটনা শুনে সেই ব্রাহ্মণকন্যা বলল—এতে এত ধৈর্য হারাবার কি আছে? বিপদের সময় ধৈর্য হারালে তো চলে না। আমার কথা শোন, এই পুণ্যতোয়া গোতমী গঙ্গার জলে স্নান করে ভগবান বিষ্ণুর স্তব কর। পত্নীর কথামতো আসন্দিব নারায়ণের স্তব করলেন। তিনি বললেন—তুমিই এ জগতের অন্তরাত্মা ; তুমিই এর কর্তা। এই পৃথিবীকে তুমিই পালন করে থাক। আমি দীন, অধম ; কিন্তু তোমার শরণাগত। আমাকে তুমি পালন করছ না কেন? আমাকে তুমি দয়া কর ; ভয় থেকে আমাকে মুক্ত কর।

আসন্দিবের কাতর প্রার্থনায় ভগবান নারায়ণ তুষ্ট হলেন এবং সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই রাক্ষসীকে নিহত করলেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহে আসন্দিব ভীতিমুক্ত হয়ে পত্নীর সঙ্গে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। তারপর থেকেই ওই স্থান বিপ্রতীর্থ ও নারায়ণতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেখানে স্নান, দান প্রভৃতি করলে মানুষ বাঞ্ছিত ফল লাভ করে।

—'বিপ্রনারায়ণতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো আটষট্টি

ভানুতীর্থ, ত্বাষ্ট্র তীর্থ, মাহেশ্বর তীর্থ, ঐন্দ্র, যাম্য ও আগ্নেয়তীর্থ প্রভৃতি আরো কয়েকটি তীর্থ আছে। পুরাকালে অভিষ্টুত নামে এক প্রিয়দর্শন রাজা ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হন। সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও অত্রিপ্রমুখ ষোলজন ঋত্বিক ছিলেন। ক্ষত্রিয় যদি যজমান হন তবে যজ্ঞ-ভূমি কি করে হবে, সে সমস্যা দেখা দিল। ব্রাহ্মণ দীক্ষিত হলে রাজা যজ্ঞভূমি দান করে থাকেন ; কিন্তু রাজা যজ্ঞে দীক্ষিত হলে তাঁকে কে ভূমি দান করবে ? আর ক্ষত্রিয় রাজা চাইবেনই বা কার কাছে ? যাচঞা করা ক্ষত্রিয়দের স্বভাব-বিরুদ্ধ। তখন ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন। বশিষ্ঠ বললেন—রাজা যদি দীক্ষিত হন, তাহলে যজ্ঞভূমির জন্য সূর্যকে বলবেন—'হে দেব সবিত ! আমাকে দেবযজনোচিত ভূমি দান করুন, আপনাকে নমস্কার করি।' সুতরাং আপনি এ রকমই প্রার্থনা করুন। বশিষ্ঠের নির্দেশমতো রাজা অভিষ্টুত সূর্যের কাছে

সে-রকম প্রার্থনাই জানালেন। রাজার প্রার্থনায় সূর্য দেবযজনের জন্য ভূমি দান করলেন ; কারণ, সূর্য দেবতা এবং ক্ষত্রিয়ও বটে। সূর্য যেখানে রাজা অভিষ্টুতকে ভূমি দান করেন, সেই স্থান ভানুতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। যজ্ঞ আরম্ভ হলে পর দৈত্য, দানব ও অন্যান্য অনেক যজ্ঞবিঘ্নকারী ব্রাহ্মণবেশে সামগান করতে করতে সেই যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হল। তারা যজ্ঞীয় উপকরণ, ঋত্বিকগণ এবং রাজার নিন্দা করতে লাগল। কেউ কেউ আবার যজ্ঞীয় পাত্রগুলি ফেলে দিল। ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ছাড়া আর কেউই তাদের চিনতে পারল না। বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে সে কথা বলায় ত্বষ্টা দেবতাদের বললেন—তোমরা কুশ জলে ভিজিয়ে চারদিকে ছিটিয়ে দাও। যারা এই পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য এবং উপকরণসমূহের নিন্দা করছে, তারা ধ্বংস হোক। ত্বষ্টার নির্দেশমতো দেবতারা কুশ দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন—যজ্ঞের নিন্দাকারীরা ধ্বংস হোক। ত্বষ্টা নিজেও সে-কথা বলে চারদিকে জল ছিটিয়ে দিলেন। তখন হল কি না, সেই যজ্ঞবিঘ্নকারীরা কে কোথায় পালাবে ঠিক করতে না পেরে কয়েকজন পুড়ে মরল এবং বাকীরা আহত অবস্থায় সেখান থেকে পালিয়ে গেল। ত্বষ্টা যেখানে এই জল ছিটিয়ে দিয়েছিলেন সেই স্থান ত্বাষ্ট্রতীর্থ নামে অভিহিত হয়। যে সব যজ্ঞবিঘ্নকারি ত্বষ্টার ভয়ে যজ্ঞস্থল থেকে পালাচ্ছিল যম তাদের কালদণ্ড চক্র, কালপাশ প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে নিহত করলেন। যম যেখানে তাদের নিহত করেছিলেন, সেই স্থান যাম্য তীর্থ নামে অভিহিত হয়। সেই মহাযজ্ঞে রাজা অভিষ্টুত প্রচুর ঘি দিয়ে অগ্নির হোম করেন। সেই প্রচুর ঘৃত-হোমে অগ্নি তৃপ্তিলাভ করেন। যেখানে এই হোম প্রদত্ত হয়, সেই স্থান অগ্নিতীর্থ নামে পরিচিত হয়। রাজার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—আপনি উভয়লোকে সম্রাট হবেন এবং আজ থেকে আমার বন্ধুও হলেন।

সেই তীর্থের নাম মাহেশ্বর তীর্থও বটে ; কারণ, রাজা অভিষ্টুত বিবিধ দ্রব্য এবং উপচারে বিশিষ্ট ঋত্বিকদের দিয়ে শিব ও বিষ্ণুর পূজা করিয়েছিলেন। সেজন্য শৈব ও বৈষ্ণব তীর্থ নামেও এর পরিচিতি। এই তীর্থসমূহে স্নান, দান প্রভৃতি করলে বিষ্ণুর সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

—'ভানুপ্রভৃতিতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় : একশো উনসত্তর

তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—এবার তোমাকে বিখ্যাত ভিল্লতীর্থের কথা শোনাব। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে, শ্রীপর্বতের উত্তর ধারে আদিকেশ নামে মহাদেবের একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। পরম ধার্মিক সিন্ধুদ্বীপ মুনির ভাই বেদ প্রতি দিনই যথাবিধি সেই মহাদেবের পূজা করতেন। পূজা শেষ করতে করতে দুপুর হয়ে যেত। তখন ভিক্ষার জন্য তিনি নিকটস্থ গ্রামে যেতেন। ভিল্ল নামে এক ব্যাধও সেই পর্বতে প্রতি দিন শিকার করতে আসত। শিকারে সে যে পশুকে বধ করত, তাই ধনুকে ঝুলিয়ে নিয়ে সেই মহাদেবের লিঙ্গের কাছে আসত। গঙ্গায় গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে মুখে করে জল আনত এবং যে কোনো গাছের কয়েকটি পাতা এক হাতে নিত, তার আরেক হাতে থাকত নৈবেদ্যের জন্য মাংস। বেদ যে সব বস্তু দিয়ে পূজা করতেন, পা দিয়ে তা সরিয়ে দিয়ে ভিল্ল তার মুখে-করে-আনা জল দিয়ে মহাদেবের লিঙ্গমূর্তিকে স্নান করাত এবং ঐ

পাতা দিয়ে তাঁর পূজা করত। সে এ রকম প্রার্থনা জানাত যে, শিব আমার প্রতি প্রীত হোন। শুধুমাত্র ভক্তি ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। তারপর বাকী মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরে যেত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আদিকেশ মহাদেব তার পূজায় তুষ্ট হয়েছিলেন এবং সে পূজা না করা পর্যন্ত অধীরভাবে তার জন্য অপেক্ষা করতেন।

এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। বেদ প্রতি দিনই দেখতেন তাঁর পূজোপচার বিশৃংখলভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে এবং খানিকটা মাংস পড়ে আছে সেই জায়গায়। এ সব দেখে বেদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতেন, কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তেও কোন উপায় ঠিক করতে পারেন নি। যে ব্যক্তি গুরু, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং প্রভুকে পর্যন্ত অমান্য করে, তাকে মুনিরাও বধ করতে পারেন। সুতরাং বেদজ্ঞ বেদ মুনি ঠিক করলেন যে, আগে সেই ব্যক্তির পরিচয় জানবেন তারপর যা করার হয় করবেন। এ রকম স্থির করে তিনি আড়ালে লুকিয়ে থাকলেন। যথাসময়ে ভিল্ল এলো এবং প্রতি দিন যা করে, সেই সব নিত্যকর্ম করার পর আদিকেশের পূজা করতে লাগল। তখন দেবাদিদেব সেখানে আবির্ভূত হয়ে সেই ব্যাধকে বললেন—তুমি কি পরিশ্রান্ত হয়েছ, তাই আসতে এত দেরী হল? আমি যে তোমার পূজা নেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ভিল্ল মহাদেবকে সামনে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করল এবং বাড়ি চলে গেল। বেদ আড়াল থেকে সবকিছুই দেখলেন। তিনি শিবের এ রকম আচরণে যুগপৎ বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি মহাদেবকে বললেন—তোমার আচরণে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই ব্যাধ পাপকর্মে রত, পূজার কোন কিছুই সে জানে না, হিংসাই এর বৃত্তি, হীন কুলে এর জন্ম, সামান্য শাস্ত্রজ্ঞানও এর নেই, তবু তুমি তাকে নিজের মূর্তি দেখালে। আর আমি যে সংসার পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রিয় সংযম করে একাগ্রতা সহকারে তোমার পূজা করি এবং শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে তোমার স্তব করি, তুমি তো আমার সঙ্গে কোন দিন একটা কথাও বল না। সেই ব্যাধ মাংস দিয়ে তোমার পূজা করে, তুমি তার উপর তুষ্ট অথচ উত্তম দ্রব্য দিয়ে আমি তোমার পূজা করি, কিন্তু তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন নও। তোমার এই পক্ষপাতমূলক এবং অন্যায় আচরণের জন্য তোমায় আমি উপযুক্ত ভাবে শাস্তি দেব। সংসার বড়ই বিচিত্র; কেউ বা অনুরক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রীত হয়, আবার কেউ বা দুরাত্মার প্রতি প্রীত হয়। যা হোক, এই শিলাখণ্ড দিয়ে তোমার মাথায় আঘাত করব। বেদের কথা শুনে মহাদেব মৃদু হেসে তাঁকে বললেন—আমার মাথায় শিলা দিয়ে বা যা কিছু দিয়েই আঘাত কর না কেন, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। কাল তুমি যা খুশি, তাই করো।

পরদিন সকালবেলা বেদ যথাবিধি স্নান করে শিবপূজায় প্রবৃত্ত হলেন। পূজা করার সময় শিবলিঙ্গের মাথায় ফুল দিতে গিয়ে দেখেন লিঙ্গের মাথায় রক্তের দাগ রয়েছে। তিনি সেই রক্তের দাগ দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। পরে মাটি, গোবর, কুশ ও গঙ্গাজল দিয়ে সেই রক্তের ধারা ধুয়ে সাফ করে দিলেন এবং প্রতি দিনের মতো নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়ে পূজা শেষ করলেন। এদিকে সেই ব্যাধও প্রতি দিনের মতো পূজা করতে এসে দেখল যে শিবলিঙ্গের মাথায় রক্তের দাগ রয়েছে। সে তখন তীক্ষ্ন শর দিয়ে নিজেকে বারংবার বিদ্ধ করতে লাগল এবং এই কথা বলে দুঃখ করতে লাগল যে, আমি জীবিত থাকতে এ কি হল! বিধাতার এ কী নৃশংসতা! সে বারংবার নিজেকেই নিন্দা করতে লাগল; নিশ্চয়ই তারই দোষে এ রকম ঘটেছে। আদিকেশ মহাদেব তখন সেখানে আবির্ভূত

হয়ে বেদকে বললেন—দেখ, তোমাদের দুজনের মধ্যে কত তফাৎ। তুমি মাটি, জল প্রভৃতি দিয়ে আমার মাথা ধুয়ে দিয়েছ, আর এই ভিল্ল আত্মাকেও নিবেদন করেছে এক্ষেত্রে ভক্তি, প্রেম অথবা শক্তিরই তারতম্য বিচার হয়ে থাকে। তাই আগে এই ভিল্লবে বর প্রদান করব; তারপর তোমায় বরদান করব। আদিকেশ ভিল্লকে বর প্রার্থনা করতে বললে সে প্রার্থনা করল—প্রভু, আপনার যা নির্মাল্য হবে, আমিও যেন তা পাই। আর এই স্থানটি আজ থেকে তীর্থরূপে পরিগণিত হোক; আমার নামেই যেন এই তীর্থ পরিচিত হয়। আদিকেশ ভিল্লের প্রার্থনা পূরণ করলেন। তার পর থেকেই ওই স্থান 'ভিল্লতীর্থ' নামে অভিহিত হয়। আদিকেশ মহাদেব তারপর বেদকেও বর দান করেন।

—'ভিল্লতীর্থমহিমবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় : একশো সত্তর

চক্ষুতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে, এবার তোমাকে সেই তীর্থের কথা শোনাব গৌতমীর দক্ষিণ তীরে যেখানে যোগেশ্বর দেব বিরাজ করেন, সেখানে একটি পর্বত আছে। সেই পর্বতে ভৌবন নামে একটি নগর আছে; সেই নগরের রাজা ভৌবন সেখানে বৃদ্ধকৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর পুত্রের নাম গৌতম, তিনি বেদবিদ। গৌতমের সঙ্গে সেই নগরের এক বণিক পুত্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল; সেই বণিকপুত্রের নাম ছিল মণিকুণ্ডল। ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈশ্যের সচরাচর বন্ধুত্ব না হলেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু গড়ে উঠেছিল। গৌতম তার মায়ের কু-পরামর্শে পড়ে মণিকুণ্ডলকে একবার বলল—চল, আমরা ধন উপার্জনের জন্য পর্বত ও সমুদ্রে যাই; বাণিজ্য করি, রত্নের অন্বেষণ করি। যৌবনে যদি সুখভোগ না করা হয়, তবে সে যৌবনই বৃথা। গৌতমের কথা শুনে মণিকুণ্ডল তাকে বলল—আমার তো আপাতত ধনসম্পদের প্রয়োজন নেই, পিতার উপার্জিত প্রচুর ধনরত্ন রয়েছে আমার। গৌতম সে-কথা শুনে মণিকুণ্ডলকে মৃদু তিরস্কার করে বলল—ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান, কাম-এ সবের উৎকর্ষ সাধন করাই দেহীদের পক্ষে সম্মানজনক। যারা অপরের কাছ থেকে পাওয়া অর্থে সন্তুষ্ট থাকে, তাদের বেঁচে থাকাটাই অসম্মানকর। যে পুত্র পৈত্রিক ধনে পরিতৃপ্ত না হয়ে নিজের চেষ্টায় অর্থ উপার্জন করে তা ভোগ করে, তারাই জগতে কৃতার্থ। যে পুত্র নিজে বিত্ত অর্জন করে পিতা ও বন্ধুদের তা দান করে, তাকেই যথার্থ পুত্র বলে জানবে। গৌতমের কথাকেই সত্য মনে করে মণিকুণ্ডল তার নিজের ধনসম্পত্তি বন্ধুকে দিয়ে দিল। সে আরো বলল—চল, এই ধন সম্পদের সাহায্যে নানা দেশ পরিভ্রমণ করে ধনরত্ন উপার্জন করে এবং ধনাঢ্য হয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসব মণিকুণ্ডল আসলে সৎ এবং বন্ধুবৎসল ছিল। গৌতমের প্রতারণা এবং কৌশল সে বুঝতে পারে নি।

তারপর তারা মা, বাবাকে না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল এদিকে গৌতমের কিন্তু লক্ষ্য ছিল একটাই—যে কোন উপায়ে মণিকুণ্ডলের সম্পদ আহরণ করা এবং পৃথিবীর যেখানে যে সব ভোগ্য বস্তু আছে সব উপভোগ করা। সে একদিন হেসে মণিকুণ্ডলকে বলল—লোকে দেখা যায়, জীবগণ অধর্ম থেকেই বৃদ্ধি, সুখ এবং সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে; যারা ধার্মিক তারা বরাবরই দুঃখভাগী হয়ে

থাকে। সুতরাং যে দুঃখের কারণস্বরূপ সেই ধর্মাচরণে কিসের প্রয়োজন ! মণিকুণ্ডল গৌতমের সে-কথা শুনে বলল—না, না, ও কথা বলো না। ধর্মেই সুখ প্রতিষ্ঠিত। পাপাচরণে দুঃখ, ভয়, শোক, দারিদ্র্য এবং কষ্টভোগ অনিবার্য। যেখানে ধর্ম, সেখানেই মুক্তি। সুতরাং তোমার কথা আমি মেনে নিতে পারছি না। তারা উভয়ে তখন এ বিষয়ে তর্ক করতে লাগল, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল না। তখন তাদের মধ্যে এই পণ হল যে, যার অভিমত বিজ্ঞজনেরা সঠিক বলে রায় দেবেন, সে অন্যের সমস্ত ধন লাভ করবে। তারা তখন নানা লোকের কাছে এই কথাই জিগ্যেস করল যে, অধর্ম এবং ধর্মের মধ্যে প্রাধান্য কার বেশি ? তাতে অনেকেই বলল যে, যারা ধার্মিক, পৃথিবীতে তারাই দুঃখ ভোগ করে, অপর পক্ষে পাপিষ্ঠরাই সুখী হয়ে থাকে। সুতরাং মণিকুণ্ডল সেই পণ হেরে গিয়ে তার সমস্ত ধনসম্পদ গৌতমকে দিয়ে দিল। পণে মণিকুণ্ডল হেরে গেল বটে, তবুও সে ধর্মেরই গুণগান করতে লাগল। মণিকুণ্ডলকে তখনও ধর্মের প্রশংসা করতে দেখে গৌতম বলল—তুমি তো আমার কাছে পরাজিত হয়েছ ; তাও ধর্মেরই প্রশংসা করছ ! তুমি মূর্খ। সে কথার উত্তরে মণিকুণ্ডল হেসে তাকে বলল—ধানের মধ্যে যেমন তুষ এবং পাখির মধ্যে যেমন পুত্তিকা, যারা ধর্মকে অবজ্ঞা করে, তাদেরকে আমি সেই রকম অসার বলেই মনে করি। দেখ, চারটি পুরুষার্থের মধ্যে ধর্মেরই স্থান প্রথমে, সেই ধর্মই আমাতে রয়েছে ; সুতরাং তোমার এই আপাত-বিজয় পরিণামে বিফল বলে পরিগণিত হবে। এ তুমি দেখে নিয়ো। মণিকুণ্ডলের কথা শুনে গৌতম তাকে বলল—ঠিক আছে, আমাদের এই হাত দুটো দিয়ে পণ করা হোক—কে বড়, ধর্ম না অধর্ম। যে এতে পরাজিত হবে, সে তার হাত দুটো কেটে দেবে। মণিকুণ্ডল গৌতমের কথায় রাজী হয়ে গেল। তারা আবার লোকদের জিগ্যেস করায় তারা গৌতমের কথাকেই অনুমোদন করল। সুতরাং পণে হেরে গিয়ে মণিকুণ্ডলকে তার হাত দুটো কেটে দিতে হল। গৌতমও এমন নিষ্ঠুর যে, বন্ধুর হাত কেটে নিয়ে তাকে বিদ্রূপের স্বরে জিগ্যেস করল—কি বন্ধু, ধর্মকে এখন কেমন বোধ হয় ? মণিকুণ্ডল তখনও গৌতমকে বলল—প্রাণ যদি আমার কণ্ঠাগতও হয়, তবু আমি ধর্মকেই প্রবল বলে মনে করি। ধর্মই প্রাণীদের মাতা, পিতা, বন্ধু ও সখা। ধর্মের জয় আমি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করব। গৌতমের এ রকম নিষ্ঠুর আচরণেও মণিকুণ্ডল তার সঙ্গ পরিত্যাগ করল না।

তারপর তারা পরিভ্রমণ করতে করতে গঙ্গাতীরে যোগেশ্বর হরির কাছে এসে উপস্থিত হল। মণিকুণ্ডল তখনও ধর্ম, যোগেশ্বর বিষ্ণু এবং গৌতমী গঙ্গার জয় ঘোষণা করতে লাগল। সে-কথা শুনে গৌতম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—তোমার ধন-সম্পদ গেছে, হাত পড়েছে কাটা, কেবলমাত্র প্রাণটুকুই তোমার অবশিষ্ট আছে ; এখনো যদি তুমি ঐ কথা বল তবে তরবারি দিয়ে তোমার মাথা কাটব। গৌতমের কথা শুনে মণিকুণ্ডল হেসে বলল—প্রাণ যত দিন আছে, তত দিনই আমি উচ্চকণ্ঠে ধর্মের জয় ঘোষণা করে যাব। তোমার যা ইচ্ছে, তা-ই তুমি করতে পারো। যে পাপী ব্রাহ্মণ, গুরু, দেবতা, বেদ, ধর্ম, জনার্দন—এ সবের নিন্দা করে, তাকে স্পর্শ করাই উচিত নয়। এ কথা শুনে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলল—এখনও যদি তুমি ধর্মেরই প্রশংসা কর, তবে এসো, এবার আমাদের মধ্যে প্রাণ নিয়েই পণ হোক। মণিকুণ্ডল সেই প্রস্তাবেও রাজী হয়ে গেল। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এবারও গৌতমই জয়ী হল। তখন সে বিজয়গর্বে মত্ত হয়ে গৌতমীর তীরে সেই যোগেশ্বর বিষ্ণুর সামনেই মণিকুণ্ডলের দুটো চোখই উপড়ে নিল

এবং তাকে সেখানে ফেলে রেখেই চলে গেল। এদিকে মণিকুণ্ডল সেখানে শুয়ে শুয়েই তার ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগল। ধীরে ধীরে দিন শেষ হয়ে রাত এলো। সেদিন শুক্লপক্ষের একাদশী। প্রত্যেক শুক্লপক্ষের একাদশীতে বিভীষণ যোগেশ্বর বিষ্ণুর পুজো করতে সেখানে আসতেন। সেদিনও তিনি পুত্র ও অন্যান্য রাক্ষসদের সঙ্গে সেখানে এসে গৌতমীতে স্নান করলেন এবং যোগেশ্বর বিষ্ণুর পুজো করলেন। বিভীষণের পুত্র বৈভীষণি মণিকুণ্ডলকে ঐ রকম অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাকে সমস্ত কথা জিগ্যেস করল। মণিকুণ্ডলের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে সে পিতাকে সে কথা জানাল। তিনি সমস্ত কথা শুনে বললেন-দেখ, শ্রীরামচন্দ্র আমার গুরু, হনুমান আমার সখা। পুরাকালে মেঘনাদের নাগপাশে লক্ষ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি হনুমানকে একটি ওষধি নিয়ে আসতে বলেন। হনুমান সেই নির্দিষ্ট ওষধিটি চিনতে না পেরে পুরো পর্বতটিই নিয়ে আসেন। সেই পর্বতে বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী নামে দুটি মহৌষধি ছিল। কাজ শেষ হওয়ার পর হনুমান সেই পর্বতটিকে হিমালয়ে রেখে আসেন। যাওয়ার সময় বিশল্যকরণীর একটি লতা গৌতমীর তীরে এই যোগেশ্বর বিষ্ণুর কাছেই পড়ে গিয়েছিল। সেটিকে নিয়ে এসে হরিনাম স্মরণ করে এর বুকের উপর রেখে দাও, তাতেই ইনি পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবেন।

সেই পর্বতের যে স্থানে ঐ বিশল্যকরণী পড়েছিল, সেখানে কালক্রমে একটি বড় গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। বিভীষণ পুত্রকে বিশল্যকরণী চিনিয়ে দিলেন। বৈভীষণি সেখানে গিয়ে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে তার একটি শাখা কেটে নিয়ে এলো। সেই বড় গাছটিই আগেকার সেই বিশল্যকরণী। তার ডাল এনে মণিকুণ্ডলের বুকের উপর রাখা হল। মণি, মন্ত্র ও ওষধির কী শক্তি, মণিকুণ্ডল তার দুই হাত এবং দুই চোখ আবার ফিরে পেল। তারপর গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে যোগেশ্বর বিষ্ণুকে পুজো করল। মণিকুণ্ডলকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে বিভীষণ এবং তাঁর অনুচরগণ লঙ্কায় ফিরে গেলেন।

এদিকে বন্ধুহীন অবস্থায় পরিভ্রমণ করতে করতে মহাপুর নামে এক নগরীতে এসে উপস্থিত হল মণিকুণ্ডল। সেই নগরীতে মহারাজ নামে বলবান এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার কোন পুত্রসন্তান ছিল না, ছিল একটি মেয়ে ; সে আবার কানা। রাজা এ রকম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যে তার মেয়েকে দৃষ্টিদান করতে পারবে, তার সঙ্গেই তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন, সেইসঙ্গে দেবেন রাজ্যটাও। মণিকুণ্ডল সে কথা শুনে রাজার প্রাসাদে গেল এবং রাজকন্যাকে স্বাভাবিক ও সুস্থ করে তুলল। রাজা বিস্মিত হয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলে মণিকুণ্ডল তাকে সব কথা খুলে বলল। সে আরও বলল যে, ব্রাহ্মণদের কৃপায়, ধর্ম, তপস্যা ও দানের প্রভাবে এবং দিব্য ওষধির মহিমায় তার এমন সামর্থ্য জন্মেছে। রাজা মণিকুণ্ডলের কথা শুনে মনে মনে ঠিক করলেন যে, এর হাতেই কন্যাসহ রাজ্য প্রদান করবেন। তারপর একদিন ঘটা করে মণিকুণ্ডলের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

অনেক দিন কেটে গেছে। বন্ধুহীন অবস্থায় মণিকুণ্ডলের আর দিন যেন কাটতে চাইছিল না। রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য সবই তার কাছে বিস্বাদ ঠেকল। গৌতমের জন্য আসলে তাঁর মন কেমন করছিল। সদ্বংশে জাত ব্যক্তিদের বিশিষ্ট ধর্ম এই যে, তাঁরা অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও কৃপাপরায়ণ হয়ে থাকেন। কিছু দিন পর রাজা বনে চলে গেলেন। তখন

মণিকুণ্ডলই সেই রাজ্যের রাজা হল। একদিন রাজদূতেরা গৌতমকে বেঁধে রাজসভায় নিয়ে এলো কি এক দুষ্কর্ম করার জন্য। মণিকুণ্ডল তার বাঁধন খুলে দিয়ে তার কাছে সমস্ত কথা খুলে বলল; বিশেষ করে ধর্মের প্রভাবেই যে এ সব হয়েছে, সে-কথা জোর দিয়ে বলল। গৌতমের তখন বিষয়-সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না; সব কিছু হারিয়ে সে পথের ভিখিরি হয়ে বসেছিল। মণিকুণ্ডল গৌতমকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে স্নান করাল। তারপর গৌতমের বৃদ্ধ পিতা কৌশিক এবং অন্যান্য পরিজনদের নিয়ে গৌতমীর তীরে যোগেশ্বর হরির কাছে নানা যজ্ঞ করল। ফলে দেহত্যাগের পর সে স্বর্গলোকে চলে গেল। তারপর থেকেই সেই স্থান মৃতসঞ্জীবন, চক্ষুতীর্থ, যোগেশ তীর্থ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। ঐ তীর্থের নাম নিলেও মানুষ পবিত্র হয়ে থাকে।

—'চক্ষুতীর্থ প্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : একশো একাত্তর

উর্বশীতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, তার কথা বলব তোমায়। সেই পবিত্র তীর্থে দেবাদিদেব মহাদেব এবং বিষ্ণু বিরাজ করেন। পুরাকালে প্রমতি নামে এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি কোন এক যুদ্ধে শত্রুসৈন্যদের নিঃশেষে পরাজিত করে ইন্দ্রলোকে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, দেবরাজকে ঘিরে রয়েছেন অন্যান্য দেবতারা। প্রমতি দেবরাজকে সে-রকম অবস্থায় দেখে হেসে ফেললেন। প্রমতিকে হাসতে দেখে ইন্দ্র বললেন, রাজা, দেবালয়ে দেবতাদের সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন আর নেই; তুমি দিগ্বিজয় করে এসেছ, সুতরাং আমার সঙ্গেই তোমাকে খেলতে হবে। প্রমতি ইন্দ্রের সেই বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে খেলা করব। কিন্তু আপনি কি পণ রাখবেন তাতে? প্রমতির কথা শুনে ইন্দ্র বললেন-যাকে অনেক যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারাও লাভ করা যায় না, সেই উর্বশীই আমাদের পণ হোক। তুমি কি পণ রাখতে চাও রাজা? প্রমতি বললেন—তুমি যা বলবে, সেই পণই আমি রাখব। আমি আমার এই সমর্থ ডান হাতটিই পণরূপে রাখলাম। পাশা নিয়ে আসুন, খেলা যাক। দেখা যাক, মর্ত্যের নৃপতির ভাগ্যে উর্বশী জোটে কি না। খেলা আরম্ভ হল এবং প্রমতিই সেই খেলা জিতলেন। সুতরাং উর্বশী তার ভাগ্যে জুটল। প্রমতি তখন পরাজিত ইন্দ্রকে বললেন—এবার আপনি অন্য পণ করুন। ইন্দ্র বললেন,—এবার তোমার হাতের বিরুদ্ধে আমার সুবিখ্যাত জৈত্র রথ ও বজ্রকেই আমি পণরূপে রাখছি। এবারও ইন্দ্র হারলেন। এভাবে আরও কয়েকদান খেলে প্রমতি ইন্দ্রের কাছ থেকে আরও অনেক জিনিস জয় করে নিলেন।

এদিকে বিশ্বাবসু নামে এক গন্ধর্ব, যিনি পাশাখেলায় অত্যন্ত দক্ষ, সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রমতির সঙ্গে পাশা খেলতে চাইলেন। তিনি বললেন—আমি গন্ধর্ববিদ্যা অর্থাৎ নৃত্য, গীত ইত্যাদি পণ রেখেই তোমার সঙ্গে খেলতে চাই। ইন্দ্র ও বিশ্বাবসু একদিকে, আরেকদিকে প্রমতি একা। খেলা আরম্ভ হল। ভাগ্যের কি বিচিত্র লীলা! এবারও প্রমতিই জয়ী হলেন। প্রমতি তখন ইন্দ্রকে বিদ্রূপাত্মক বাক্যে এ কথা বললেন—কি যুদ্ধে, কি পাশাখেলায়, কোন ক্ষেত্রেই তুমি জয়ী হতে পারো না; সুতরাং তুমি আমার সেবক হও। গর্বভরে সেই প্রমতি তারপর উর্বশীকেও বললেন—যাও উর্বশী,

তুমি আমার দাসী হও। তার উত্তরে উর্বশী বলল—দেখুন, দেবতাদের সঙ্গে আমার যেমন ব্যবহার, আপনার সঙ্গে সেভাবেই আচরণ করব। আমাকে নিন্দিত, নীচ কর্মে নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত তো নয়ই, অশোভনও বটে। প্রমতি উর্বশীকে তাচ্ছিল্যবশে সেই একই কথা বললেন। প্রমতির এই গর্বোদ্ধত আচরণে চিত্রসেন নামে আরেকজন গন্ধর্ব তার সঙ্গে পাশা খেলতে চাইল। সেই চিত্রসেন বিশ্বাবসুর ভাই। তাতে চিত্রসেন পণ রাখল তার জীবন, প্রমতি রাখলেন তার রাজ্য। খেলা আরম্ভ হল; সেই খেলায় চিত্রসেন পণ জিতলেন। সেই পণে চিত্রসেন রাজ্য, ধনরত্ন সহ উর্বশী এবং প্রমতিকেও জয় করে নিল সে প্রমতিকে গান্ধর্ব মহাপাশের দ্বারা বেঁধে সেই দেবলোকেই রাখল।

রাজা প্রমতির সুমতি নামে একটি বালক পুত্র ছিল। সে বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দাকে জিগ্যেস করল—আমার পিতা কি পাপ করেছেন? কোথায় বা তিনি বন্ধ অবস্থায় আছেন? সেই বন্ধন থেকে কি ভাবেই বা তিনি মুক্ত হবেন? সুমতির কথা শুনে মধুচ্ছন্দা ধ্যানে বসলেন। ধ্যানযোগে তিনি সমস্ত কিছুই জানতে পারলেন। তিনি সুমতিকে বললেন—দেখ, তোমার পিতা পাশাখেলার প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশে এবং অন্যান্য অনেক দোষে রাজ্য হারিয়ে দেবলোকে বন্ধ অবস্থায় আছেন। যে পাশা না খেলেও, যেখানে পাশা খেলা হয়, সেখানে যে যায় সেও ক্লেশ ভোগ করে। পাশাখেলা, মদ ও মাংসভক্ষণ ব্যসন বলে গণ্য। যারা পাশাখেলার প্রতি অত্যধিক আসক্ত, তাদের সঙ্গে এক আসনে বসলে কিংবা আলাপ করলে কুলীন ব্যক্তিরাও পাপগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পাশাখেলায় আসক্ত ব্যক্তির স্ত্রী সর্বদাই পরিতাপ করে; সেই ব্যক্তিও তার আচরণের কথা চিন্তা করে দুঃখিত হয়, শোক করে। ব্রাহ্মণদের কখনোই পাশাখেলায় আসক্ত হয়ে পড়া উচিত নয়। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য-এ সব বরং করা উচিত, কিন্তু পাশাখেলায় কখনো আসক্ত হয়ে পড়বে না। যে পাশাখেলার মাধ্যমে ধনার্জন করতে ইচ্ছা করে, সে ধর্ম, অর্থ কাম, আভিজাত্য এবং পৌরুষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। বেদেও এই ব্যসনকে নিন্দা করা হয়েছে। তোমার পিতা সেই পাশাখেলায় আসক্ত হয়ে সব খুইয়েছেন। বস্তুত বিবিধ বিধানকে কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই অতিক্রম করতে পারেন না। তুমি এক কাজ কর, গৌতমী গঙ্গার তীরে যাও; সেখানে শংকর, বিষ্ণু, আদিত্য এবং বরুণকে পুজো কর। তাঁদের প্রসাদে তোমার পিতার কল্যাণ সাধিত হবে।

মধুচ্ছন্দার কথামতো সুমতি দেবপুজোয় প্রবৃত্ত হল। এক হাজার বছর ধরে তপস্যা করার পর সে দেবতাদের বর লাভ করতে সমর্থ হল। দেবতাদের বরে সে পিতাকে বন্ধনমুক্ত করতে সমর্থ হল। প্রমতি পুনরায় রাজ্য ফিরে পেলেন। তিনি পরে ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। তারপর থেকেই ওই তীর্থ শাম্ভব, বৈষ্ণব, উর্বশী ও কৈতবতীর্থ নামে পরিচিত হয়।

—'উর্বশীপ্রভৃতি তীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো বাহাত্তর

তীর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—সামুদ্র নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। সেই তীর্থের কথা এবার তোমায় শোনাব। গৌতম মুনি গঙ্গাকে পরিত্যাগ করলে পর, লোককল্যাণে সেই গঙ্গা পূর্বসমুদ্রের দিকে ধাবিত হন। সেই গঙ্গাকে আমি কমণ্ডলুতে

ধারণ করি এবং ভগবান শঙ্কর তাকে মাথায় ধারণ করেন। পবিত্র সেই দেবনদীকে তাঁর দিকে আসতে দেখে সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গাকে বললেন-যে পবিত্র জলপ্রবাহ পাতালে, পৃথিবীতে এবং স্বর্গে প্রবাহিত, আমার সঙ্গে তা মিলে যায়। রত্নসমূহ, অমৃত, পর্বত—এ সবই আমি ধারণ করে থাকি। আমার অন্তরে লক্ষ্মী বিরাজ করেন, বিষ্ণু প্রতিনিয়ত আমাতেই শয়ন করেন। যে ব্যক্তি মহাজনকে অভ্যাগত দেখে গর্বভরে তাঁকে যথোচিতভাবে সম্মান প্রদান করে না, সে অবশ্যই নরকে পতিত হয়। আমার দুঃখ একটাই যে, মহামুনি অগস্ত্যের কাছে আমি পরাজিত। কিন্তু সব কিছুর থেকে তোমার গৌরব বেশী। তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হও—এই-ই আমার প্রার্থনা। বহুরূপা তুমি যদি আমাকে একরূপ দেখে আমার সঙ্গে মিলিত হতে না চাও, তবে আমি বহুধা হয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। সমুদ্রের কথা শুনে গঙ্গা তাকে বললেন-তুমি এক কাজ কর। অরুন্ধতী প্রমুখ সপ্তর্ষিদের যে সাতজন পত্নী রয়েছেন তাঁদেরকে তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে এখানে নিয়ে এসো। আমি আগে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারপর তোমার সঙ্গে মিলিত হব। সমুদ্র গঙ্গার কথামতো কাজ করল। গঙ্গা তখন সাতভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। সেই সপ্তর্ষিদের নাম অনুসারেই 'সপ্ত গঙ্গা' এ রকম নাম হয়েছে। এই সমুদ্রতীর্থ অতি পবিত্র।

—'সপ্তধাগোদাবরীসমুদ্রগমনবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো তিয়াত্তর

পুরাকালে সপ্তর্ষিরা যেখানে তপস্যা করেছিলেন, যেখানে ভীমেশ্বর দেব বিরাজমান, সেই তীর্থ ঋষিসত্র নামে বিখ্যাত। সেই তীর্থ সম্বন্ধে এ রকম কথা শোনা যায়। সপ্ত ঋষির নাম অনুসারে গঙ্গার সপ্তধারার এ রকম নাম হয়—বাশিষ্ঠী, দাক্ষিণেয়ী, বৈশ্বামিত্রী, তার উত্তরদিকে বামদেবী, তারপর ভরদ্বাজী, আত্রেয়ী ও জামদগ্নী। এ সবের মধ্যভাগে গৌতমী গঙ্গা, ওই মহাত্মা ঋষিরা সবাই সেখানে সত্রযজ্ঞ নিষ্পাদন করেন। এদিকে বিশ্বরূপ নামে দেবতাদের এক প্রবল শত্রু মুনিদের আয়োজিত সেই সত্রস্থানে এসে উপস্থিত হয়। ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা দ্বারা সে দীর্ঘ দিন আরাধ্য দেবতার পূজা করে। কিন্তু তার কোন পুত্রসন্তান হয় নি। সে মুনিদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—আপনারা দয়া করে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন। যাতে আমার একটি বলবান, দেবদুর্জয় পুত্র হয়, সে উপায় বলে দিন। মুনিদের মধ্যে একমাত্র বিশ্বামিত্র বললেন—দেখ, এ সংসারে কর্ম দ্বারাই বিবিধ ফল লাভ হয়। তিনটি কারণের মধ্যে কর্মই প্রধান। দ্বিতীয় কারণ কর্তা। উপাদান ও বীজ থাকলেই যে কর্ম সম্পন্ন হবে, এমন কথা কিন্তু ঠিক নয়। আর একটি কারণও চাই. কারণত্বের প্রবলতা প্রয়োজন। কারণ যদি প্রচুর হয় তবে এ রকম ক্ষেত্রে ভাবাভাবাত্মক ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং ফল কর্মেরই আশ্রিত। কর্মও ত্রিবিধ—ক্রিয়মাণ, কৃত ও কর্তব্য। ক্রিয়মাণ কর্মের সাধন যাকে বলা হয়, তা-ই কর্মসিদ্ধি হলে সেই কৃতকর্মের ও কর্তব্য কর্মের কারণ। বিচক্ষণ জীব কর্ম করতে করতে যা কিছু ভাবনা করে, সেই ভাবনার অনুরূপই ফল নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। বিনা ভাবনায়ও যদি শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুযায়ী কর্ম করে, তাহলেও তার সমস্ত ফলই ভাবানুরূপ হয়ে থাকে। এজন্যই তপঃ, দান, ব্রত, জপ ও যজন প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই কর্মের অনুষ্ঠানের সময় ভাবের অনুরূপই ফল দিয়ে থাকে। ভাব ত্রিবিধ বলে জানবে—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। এদেরও কর্ম অনুসারেই

ফল হয়ে থাকে। ভাবনার অনুগত হওয়ায় কর্মের স্থিতিও তিন প্রকার। এজন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি আগে ইচ্ছানুসারেই ভাব করবেন ; তারপর কর্মের অনুষ্ঠান করবেন। সেখানেও ফল এক রকমই হবে। ফলবান জনগণকে ফলের ইচ্ছাই ফল দান করে। সে ক্ষেত্রে অন্য কেউই কর্মকার নেই। কর্ম স্বভাবতই কৃত হয়ে থাকে। সেই সত্ত্ব প্রভৃতি ত্রিবিধ গুণ-ভেদে স্বভাবই এর উপাদান। ভাব থেকে কর্মের আরম্ভ এবং ভাব থেকেই ফল লাভ হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের একমাত্র কর্মই কারণ। ভাবস্থিত কর্মই মুক্তিপ্রদ বা বন্ধহেতু হয়ে থাকে। ওই কর্ম মূলত এক হলেও বিভিন্ন ভাবের ভেদে বিভিন্ন আকারে তাকে দেখা যায়। অতএব ভাবকেই বিশিষ্ট বলে বোঝা যায়।

বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে এই জ্ঞানগর্ভ এবং সারবান কথা শুনে বিশ্বরূপ তামস ভাব আশ্রয় করে দীর্ঘ দিন তপস্যা করল। সে ভীষণ কর্মসমূহ করে। ভীষণ কুণ্ড খনন করে ভীষণ অগ্নিতে গুহাশায়ী আত্মাকে ভীষণ পুরুষের আকারে ধ্যান করতে প্রবৃত্ত হয়। তখন এক অশরীরী বাণী বিশ্বরূপকে উদ্দেশ্য করে বলল—বৃথাই তুমি আত্মাকে হোম করছ। সেই আত্মাই ইন্দ্র, তিনিই বরুণ, তিনি সর্বদেবময়। তাঁকে জটামাত্র অবশিষ্ট রেখে হোম করেছ—সুতরাং তাতে বৃজিন অর্থাৎ অখণ্ড আত্মাতে খণ্ডবোধ এবং মস্তক ব্যতীত হোম করায় নিকৃষ্ট অঙ্গ হোম এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের অভাবরূপ পাপ জন্মেছে। বিশ্বরূপ জটাজুট ছাড়া হোম করায় বৃত্রের জন্ম হল। বেদে সেই বৃজিনকেই বৃত্র বলা হয়েছে। আকাশবাণী এ কথা বলেই অন্তর্হিত হল ; মুনিরাও সেখান থেকে চলে গেলেন। ভীমকর্মা, ভীমাকৃতি, মহাভীম বিশ্বরূপ ভীমভাবে ভীমতনুকে ধ্যান করে আত্মাকে হোম করেছিল ; তাই বরদাতা শিব ভীমেশ্বর নামে অভিহিত হন। সেই ভীমেশ্বর শিবের নাম স্মরণ করলেও মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। সেখানে গোদাবরীর জলে যে স্নান করে, সে পূর্বপুরুষদের তীব্র নরক থেকে উদ্ধার করে স্বর্গলোকে যায়।

—'ঋষিসত্রভীমেশ্বরতীর্থবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো চুয়াত্তর

তীর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—গোতমী গঙ্গা পূর্বসমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হন। বশিষ্ঠ, জাবালি, যাজ্ঞবল্ক্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, দক্ষ, মরীচি, বিষ্ণুঋষি, শাতাতপ, শৌনক, দেবরাত এবং আরো অনেক মুনি ঋষি সেই দেবনদী গোতমীর তীরে গিয়ে গঙ্গার স্তব করেছিলেন। সেখানে হরি ও হর মুনিদের নিজ নিজ রূপ দেখান। দেবতারাও সেই মহান হরি ও হরকে স্তব করেন। সমুদ্র ও গঙ্গার সেই প্রসিদ্ধ সপ্তসঙ্গমে সেই দেবতাদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন। যেখানে দেব মহেশ্বর 'গৌতমেশ্বর' নামে পরিচিত হন, সেখানে বিষ্ণুও লক্ষ্মীর সঙ্গে সর্বদাই বিরাজ করেন। আমি লোক কল্যাণের জন্য সেখানে মহাদেবের যে লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করি, তা ব্রহ্মেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। সেখানে ঐন্দ্র তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ এক তীর্থ আছে। সে তীর্থ 'হয়মূর্ধক' নামেও প্রসিদ্ধ। সেখানে হয়গ্রীব বিষ্ণু বিরাজ করেন। তাছাড়া তার একটু দূরেই সোমেশ্বর শিব রয়েছেন প্রতিষ্ঠিত। সেই স্থান সোমতীর্থ নামে পরিচিত। সোমশ্রবা মুনি ইন্দ্রের কল্যাণের জন্য সেই লিঙ্গ স্থাপন করেন। সোমশ্রবা মুনি সোমের উদ্দেশে এ রকম প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন যে,—হে সোম, তুমি ইন্দ্রের জন্য পরিস্রুত হও। সপ্ত দিক, দ্বাদশ সূর্য, সপ্ত হোতা,

অদিতিতনয় সপ্ত দেবগণ-এঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি আমাদের রক্ষা কর। তোমার জন্য যে হবি পক্ক হয়েছে, তার দ্বারা তুমি আমাদের রক্ষা কর। শত্রুরা যেন আমাদের কাছে পরাজিত হয়, আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্যই যেন অপরিমিত হয়। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ওষধিসমূহের অধিপতিরূপে তোমাকে নমস্কার জানাই। শিল্পী, চিকিৎসক প্রভৃতি সকলেই আমরা তোমাকে আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকি। উত্তম তৃণ দেখে গাভীগণ যেমন স্থিরভাবে অবস্থান করে, তেমনি তোমার জন্য আমরাও অপেক্ষা করি। ইন্দ্রের যজ্ঞকালে সোমস্রবা ঋষি সোমের স্তুতি করে সোম লাভ করেন এবং তা ঋষিদের এবং ইন্দ্রকে পানের জন্য প্রদান করেন। তাতে ইন্দ্রের সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। যেখানে সোম সোমস্রবা লাভ করেন, সেই স্থান সোমতীর্থ নামে বিখ্যাত।

ঐ সোমতীর্থের কাছেই রয়েছে আগ্নেয় তীর্থ। সেখানে অগ্নি আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন। এরপর আদিত্যতীর্থ। সেখানে আদিত্য আমাকে, শঙ্করকে এবং বিষ্ণুকে উপাসনা করার জন্য প্রতি দিন দুপুরবেলা রূপান্তর গ্রহণ করে আসেন। এরপর বার্হস্পত্য তীর্থ। ঐ তীর্থে দেবতাদের সঙ্গে বৃহস্পতিকেও পূজা করা হয়। ইন্দ্রগোপ পর্বতে আরেকটি তীর্থ আছে। হিমালয় এখানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থান ইন্দ্রতীর্থ নামে পরিচিত হয়। সেই গোতমী গঙ্গা ব্রহ্মগিরি থেকে বিঃনিসৃত হয়ে সাগর পর্যন্ত গিয়েছেন; তার মধ্যে সেই দেবনদীব উভয় তীরে যত তীর্থ আছে, সংক্ষেপে সেই তীর্থসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি তীর্থের কথা তোমাকে বললাম। গোতমী গঙ্গার মহিমা কে বর্ণনা করতে পারে? কোনো স্থান বিশেষ কাল এবং বিশেষ ঘটনার যোগে প্রভাববান হয়ে থাকে, গোতমী কিন্তু দেবতা, মানব, ঋষি তথা সমস্ত প্রাণীর পক্ষে সর্বদাই পবিত্র। সুতরাং বারংবার তাঁকে শুধু নমস্কারই জানাতে হয়।

--'গঙ্গাসাগরসঙ্গমবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো পঁচাত্তর

এতক্ষণ ধরে বিভিন্ন তীর্থের কথা শোনার পর নারদ ব্রহ্মাকে বললেন--আপনি ব্রাহ্মণ কর্তৃক আনীত সেই পবিত্র গঙ্গার কথা বলেছেন; কিন্তু আদি, মধ্য ও অবসানে--বিষ্ণু, আপনি ও মহাদেব গঙ্গার উভয়তীরেই যে সব স্থান ব্যেপে রয়েছেন, তার কথা সংক্ষেপে বলুন। নারদের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন--তোমাকে তো আগেই বলেছি যে, গঙ্গা প্রথমে আমার কমণ্ডলুতে ছিলেন, পরে ভগবান বিষ্ণুর চরণকমলবাসিনী হন; তারপর মহাদেবের জটায় বাস করেন। পরে শিবের আরাধনা করে ব্রহ্মতেজের প্রভাবে তিনি ব্রহ্মগিরিকে লাভ করেন। পরে পূর্বসমুদ্রের সঙ্গে তিনি মিলিত হন। তিনি সর্বতীর্থময়ী। তাঁর থেকে অধিক ফলপ্রদ তীর্থ পৃথিবীতে আর আছে বলে মনে হয় না। এঁর প্রভাব কেউই বর্ণনা করতে পারেন না। নারদ ব্রহ্মার কথা শুনে বিনীতভাবে বললেন--আপনি চতুর্বর্গের উপদেষ্টা। উপনিষৎ, ছন্দঃশাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি আপনার বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত। দয়া করে আমাকে বলুন, তীর্থ, দান, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দেবতা মন্ত্রের সাধন--এ সব কর্মের মধ্যে কোন্ কর্মটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কার প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। এ বিষয়ে আমার সংশয় ছিন্ন করুন। নারদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন--শোন, তীর্থ চার প্রকার এবং যুগও চারটি। গুণ তিনটি, পুরুষ তিনজন, এবং সনাতন

দেবতাও তিনজন। বেদ চার প্রকার, পুরুষার্থও চারটি ; বাণী চার প্রকার, সমস্তের সঙ্গে গুণও চার রকম। ধর্ম সর্বত্রই সামান্যভাবে বর্তমান, যেহেতু ধর্ম সনাতন। এই ধর্মের আশ্রয় দ্বিবিধ–দেশ ও কাল। যে ধর্ম কালকে আশ্রয় করে থাকে, তা কমে এবং বাড়েও বটে। ধর্ম যুগ অনুসারে পাদপ্রমাণে হীন হয়ে থাকে। ধর্ম কালের আশ্রয়ে থেকে সর্বদাই দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যুগ ক্ষীয়মাণ হলেও দেশে সেই ধর্ম ক্ষীণ হয় না। কাল ও দেশ উভয়ই ক্ষীয়মান হলে ধর্মের অভাব দেখা যায়। সুতরাং যে ধর্ম দেশকে আশ্রয় করে থাকে তা চতুষ্পাদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। দেশে সেই ধর্ম তীর্থরূপে অবস্থিত। সত্যযুগে ধর্ম, দেশ ও কাল উভয়কে আশ্রয় করে থাকে। ত্রেতাযুগে দেশবিশেষে ধর্ম এক পাদ হীন হয়ে পড়ে। দ্বাপরযুগে অর্ধদেশে দুই পাদহীন হয়ে থাকে, আর কলিতে এক পদে থেকে অতি কষ্টে ধর্ম বিচরণ করে। যিনি ধর্মের এই তত্ত্ব জানেন, তাঁর ধর্ম কখনোই হীন হয় না। চার যুগের প্রভাবে গুণ ও গুণের তারতম্য হেতু জীবদের মধ্যে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মের স্থিতি অতি বিচিত্র ভাবে হয়ে থাকে। কালই গুণের প্রকাশক। কাল যখন অভিব্যক্তিকে ধারণ করে, তখনই সেই কাল থেকে দেশ বিশেষে পদার্থের প্রকাশ হয়ে থাকে। কর্ম, তীর্থ, জাতি ও আশ্রম–এদের এবং দেবতাদেরও যুগ অনুসারেই বিভিন্ন মূর্তি হয়। সত্যযুগে তীর্থসমূহে তিন প্রসিদ্ধ দেবতা–ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর বিরাজ করেন, ত্রেতাযুগে তীর্থসমূহে তিনজনের পরিবর্তে দুজন থাকেন, দ্বাপরে থাকেন একজন এবং কলিযুগে কোনো তীর্থেই কোনো দেবতার অনুভব হয় না। আরও শোন, সত্যযুগে দেবতাই তীর্থ বলে পরিগণিত, ত্রেতায় অসুরেরা, দ্বাপরে ঋষিরা এবং কলিতে মানুষই তীর্থ।

গোতমী গঙ্গার বিষয়ে যে কথা তুমি জিগ্যেস করছিলে, সে সম্পর্কে বলছি শোন। গঙ্গা তো মহাদেবের জটা আশ্রয় করে থাকলেন। এদিকে হরপ্রিয়া উমা গঙ্গার প্রতি শিবের এই আসক্তির কথা গণেশকে বললেন–দেখ, মহাদেব সেই গঙ্গাতেই চিত্ত সমর্পণ করেছেন ; যেখানে শিব, সেখানে দেবতারা, বেদসমূহ, সমস্ত ঋষি, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ অবস্থান করেন। তাই বলছি, গঙ্গাকে তুমি মহাদেবের জটা থেকে নামাও। মায়ের কথা শুনে গণেশ তাঁকে বললেন--আমায় মার্জনা করবেন, দেবাদিদেবকে গঙ্গাপ্রসঙ্গ থেকে নিবৃত্ত করা আমার সাধ্যের বাইরে। আর স্বয়ং মহেশ্বরকে যদি নিবৃত্ত করতে না পারি, তবে অন্যান্য দেবতাদের নিবৃত্ত করার শক্তি আমার নেই। এর পিছনে আরও কারণ রয়েছে, পুরাকালে গৌতম সর্বপ্রকারে মহাদেবকে তুষ্ট করেন। গৌতমের আরাধনায় প্রীত হয়ে মহাদেব তাঁকে বর গ্রহণ করতে বললে গৌতম বলেন–আমি আপনার জটাতে স্থিত পবিত্র গঙ্গাকে প্রার্থনা করি। আমার অন্য বরে আর কি প্রয়োজন ? তা সত্ত্বেও মহাদেব তাঁকে নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করতে বলেন। গৌতম তখন মহাদেবের কাছে এই প্রার্থনা রাখেন– ব্রহ্মগিরি থেকে নিঃসৃত হয়ে গঙ্গাদেবী যে পথে সাগরে গিয়ে পৌঁছেছেন, সেই পথের সর্বত্র আপনার অবস্থান যেন সুদৃঢ় হয়। যেখানে আপনি থাকবেন, সেই তীর্থই যেন পবিত্র হয়। আপনি যেখানে আমাকে আপনার জটায় স্থিত গঙ্গাকে দান করেছেন, সেখানে যেন সর্বকালেই সর্বতীর্থ বিদ্যমান থাকে। গৌতমের কথা শুনে মহাদেব আনন্দিত হয়ে তাঁকে বললেন–পুণ্য গোদাবরীর যে কোনো স্থানে মানুষ স্নান, দান, তর্পণ প্রভৃতি করলে সমগ্র পৃথিবী দানে যে ধর্ম হয়, সেই ধর্মই লাভ হয়। লোকবিশ্রুত সঙ্গমতীর্থে সুন্দর সবৎসা গাভী দান করলে যে পুণ্য লাভ হয়, পবিত্র গৌতমী নদীতে

ভক্তিভরে স্নান, দান প্রভৃতি করলে মানুষ তার চেয়েও অধিক পুণ্য লাভ করে। পিতা গৌতমকে যখন এ সব কথা বলেন, তখন আমি কাছাকাছিই ছিলাম, তাই সব শুনেছি। এজন্যই মহাদেব গঙ্গাতে নিয়ত অবস্থান করেন। সুতরাং কে তাঁকে গঙ্গা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে? তাহলেও তোমার প্রীতির জন্য আমি এক কাজ করতে পারি যে, মানুষ বিঘ্নপাশে বদ্ধ থেকে, কাছে থাকলেও গোদাবরীতে যাবে না। মহাদেবকে নমস্কার করবে না, স্মরণও করবে না, তাঁর স্তবও করবে না। এতে যদিও প্রজাদের ক্লেশ হবে, তবু তোমার প্রীতিসাধনের জন্যই আমি এ রকম কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

তারপর থেকেই গণেশ মানুষের কাজে কোন না কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকেন। যিনি তাঁর উপাসনা করে কাজে প্রবৃত্ত হন, কিংবা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে গৌতমীতে যান, তিনিই লোকসমাজে কৃতার্থ হন। বিঘ্ন সর্বদাই ঘটে; কিন্তু বিঘ্নের মাথায় পা দিয়ে যিনি গৌতমীতে যান, তিনি সমস্ত ফলই লাভ করেন। চরাচরে ধর্মার্থকামমোক্ষের যা কিছু সাধন আছে, এতক্ষণ ধরে বিবিধ তীর্থবর্ণনার মধ্য দিয়ে তাই তোমাকে বললাম। বহু ধর্মযুক্ত এই পুরাণ কথা জগতের হিতবিধানের জন্য পরীক্ষিতও হয়েছে। এই পুরাণ উপাখ্যানের একটি শ্লোক, বা একটি পদও যদি ভক্তি ভরে কেউ শোনে বা পাঠ করে, অথবা যে ব্যক্তি কেবলমাত্র 'গঙ্গা, গঙ্গা' এই বাক্য উচ্চারণ করে, তারা উভয়েই পুণ্য লাভ করে। ধন্য গৌতম, পৃথিবীতে তুমি উত্তম কীর্তি স্থাপন করেছ। তোমার আনীত গঙ্গাই কোটি কোটি জনগণকে পবিত্র করেছে। ত্রিভুবনে তিন কোটি তীর্থ আছে; গুরু সিংহ-রাশিতে অবস্থিত হলে, সমস্ত তীর্থস্থ দেবতাই গঙ্গায় স্নান করতে আসে। সহস্র অশ্ব-মেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে যে ফল পাওয় যায়, একবার মাত্র গঙ্গা স্মরণেও সেই ফল পাওয়া যায়। এই পুরাণ যার বাড়িতে থাকে, তার কলিকালজনিত ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি এই পুরাণ লিখে পুস্তকটি ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে চিরতরে মুক্তি লাভ করে।

—'গঙ্গামাহাত্ম্যশ্রবণ ফলবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : একশো ছিয়াত্তর

মুনিরা ব্রহ্মাকে বললেন—আপনার মুখে সেই প্রাক্তন, পবিত্র কথা শোনার স্বাদই আলাদা। যত শুনছি, তবু আমাদের তৃপ্তির শেষ নেই। আপনি অনন্ত বাসুদেবের মহিমা সম্যক বর্ণনা করেন নি; দয়া করে সেই কৃষ্ণকথা আমাদের বিস্তৃতভাবে বলুন। তাঁদের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন—আদিকল্পে আমি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে ডেকে এমন আদেশ দিই যে, তিনি যেন অনন্যসাধারণ এক বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণ করেন। আমি তাঁকে বলি—যা দেখে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেই মোহিত হয়, পৃথিবীতে বাসুদেবের এমন এক প্রস্তরময় মূর্তি তৈরি করুন। আমার কথামতো বিশ্বকর্মা সেই প্রতিমা নির্মাণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। সেই বিষ্ণু প্রতিমার চার হাতে রয়েছে শংখ-চক্র-গদা ও পদ্ম; তাঁর চোখ পদ্মের মতো টানা, গলায় রয়েছে বনমালা, মাথায় রয়েছে মুকুট, পরনে পীত বস্ত্র, দুই কানে কুণ্ডল। প্রতিষ্ঠাযোগ্য কাল দেখে সেই নয়নাভিরাম প্রতিমা আমি প্রতিষ্ঠিত করি সুমেরু শিখরে। একবার দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য খেচরদের সঙ্গে আমার লোকে আসেন। তিনি সেখানে সেই অপূর্ব বিষ্ণুপ্রতিমা দেখে তাঁকে পূজা করলেন;

তারপর প্রতিমাটিকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘ দিন সেই বিষ্ণুর পূজা করার ফলে তাঁরই বরে তিনি বৃত্র, নমুচি প্রভৃতি দুর্ধর্ষ দানবদের পরাজিত করতে সমর্থ হন।

ত্রেতা যুগে রাক্ষসরাজ রাবণ দশ হাজার বছর অনাহারে থেকে জিতেন্দ্রিয় হয়ে দুশ্চর তপস্যা করতে আরম্ভ করে। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হলে তাকে আমি বর দিই। সেই বরে সে দেবতা, দৈত্য, সর্প, রাক্ষস এবং যমদূতের দ্বারা অবধ্য হয়ে উঠল। সে ধনপতি কুবেরকে পরাজিত করে। তারপর ইন্দ্রকে পরাজিত করতে উদ্যত হয়। তার পুত্র মেঘনাদ দেবতাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করে ইন্দ্রকে পরাজিত করে; তাই তার নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। রাবণ তখন অমরাবতী লাভ করে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাসাদে এসে সেই নয়নাভিরাম বিষ্ণু মূর্তি দেখতে পায়। সমস্ত ধনরত্ন পরিত্যাগ করে সেই বিষ্ণু মূর্তিকে সে পুষ্পকবিমানে করে লঙ্কায় পাঠিয়ে দেয়। লঙ্কায় রাজপুরীর অধ্যক্ষ ছিলেন রাবণের ভাই বিভীষণ; তিনি নারায়ণের পরম ভক্ত। সেই মূর্তি দেখে বিভীষণ যেন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। বারংবার তিনি সেই বিষ্ণু প্রতিমাকে প্রণাম করতে লাগলেন। রাবণ লঙ্কায় ফিরে এলে বিভীষণ তাঁকে গিয়ে বললেন—আপনি দয়া করে ওই বিষ্ণু প্রতিমাটি আমাকে দান করুন; আমি নিত্য এঁর আরাধনা করব। বিভীষণের কথা শুনে রাবণ সস্নেহে তাঁকে বলেন—আমি তো মহাদেবের আরাধনা করে ত্রিলোকবিজয়ী হয়েছি। সুতরাং বিষ্ণু মূর্তিতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমিই একে গ্রহণ কর। বিভীষণ সেই প্রতিমা নিয়ে একশো আট বছর ধরে বিষ্ণুর আরাধনা করেন; তারই ফলে তিনি অমর হয়ে ঈপ্সিত ভোগ্যবস্তুসমূহ আজও ভোগ করেন।

মুনিরা সেই বিষ্ণুকথা বিস্তৃতরূপে শুনতে চাইলে ব্রহ্মা বলে চললেন—সেই দুরাচারী এবং বলবান রাক্ষসরাজ রাবণ দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, লোকপাল প্রভৃতি সবাইকে যুদ্ধে জয় করে তাদের স্ত্রীলোকদের হরণ করল। শেষে রামপত্নী সীতাকে সে মৃগরূপে ছলনা করে হরণ করে আনে। রাম তার এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে বানর সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হন এবং হনুমান, নল, নীল, জাম্ববান, পনস, গবয়, গবাক্ষ প্রভৃতি বানরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে নিয়ে মহাসমুদ্রে সেতু তৈরি করেন। সেই সেতু দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় পৌঁছান এবং রাবণকে সবংশে নিধন করে সীতাকে উদ্ধার করেন। ভক্ত বিভীষণকে তিনি লঙ্কার অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেন। লঙ্কা থেকে ফেরার সময় পুষ্পকবিমানে করে সেই বিষ্ণু মূর্তি তিনি অযোধ্যায় নিয়ে আসেন। রাম দীর্ঘ দিন রাজ্যশাসন করেন এবং তাঁর দেহ-ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেই বাসুদেব মূর্তি তথা নিজমূর্তির পূজা করেন। নিজ মূর্তি বলছি এ কারণে যে, রাম বিষ্ণুরই অবতার। শেষে তিনি সেই বাসুদেব মূর্তি সমুদ্রকে দান করে যান।

দ্বাপরযুগে ধর্মের শৈথিল্য ঘটলে পৃথিবীর অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু কংস প্রভৃতি দুষ্ট রাজাদের তথা অধার্মিকদের বধের জন্য বসুদেবের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তখন সমুদ্র সেই বিষ্ণু মূর্তিকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমুদ্রসলিল থেকে স্বয়ং উদ্ধার করেন। তখন থেকেই ভগবান বিষ্ণু সেই পবিত্র ও মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রে বিরাজ করেন। ভক্তিভরে সেই অনন্তদেবের পূজা করলে মানুষ রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের দশ গুণ বেশি ফল পায়। সমস্ত ভোগ্যবস্তু সুখে উপভোগ করে দেহত্যাগের পর বিষ্ণুলোকে যায়। শেষে বৈষ্ণবযোগ অবলম্বনে মুক্তিলাভ করে।

—'অনন্তমাহাত্ম্যবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় : একশো সাতাত্তর

তীর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদকে বলে চললেন—যেখানে পুণ্ডরীকাক্ষ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিরাজমান, সেই পবিত্রক্ষেত্রে যারা কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রাকে দর্শন করে তারাই পৃথিবীতে ধন্য। যারা কৃষ্ণে রত, কৃষ্ণকেই অনুসরণ করে, অহোরাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, তারা দেহত্যাগ করার পর অগ্নিতে মন্ত্রপূত হবির মতো কৃষ্ণতেই প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। যারা পর্বকালে ভক্তিভরে সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, হলায়ুধ ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তারা বিষ্ণুলোকে যায়। যে ব্যক্তি বর্ষাকালের চার মাস সেই পুরুষোত্তমে বাস করে, সে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থযাত্রা অপেক্ষাও বেশি ফল লাভ করে। তপস্যা, সঙ্গত্যাগ ও ব্রহ্মচর্যের যে ফল মনীষীরা সর্বদাই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সেই ফল লাভ করে থাকেন। নানান্ যজ্ঞ করে মানুষ যে ফল লাভ করে, সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে থাকলে, তার থেকেও বেশি ফল লাভ করা যায়। যে সব জীব কৃমি-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে জন্মেছে, তারাও সেখানে দেহ বিসর্জন করে পরম গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে একবারও পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সহস্র পুরুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম পুরুষ বলে পরিগণিত হয়। যেহেতু তিনি প্রকৃতির পরবর্তী অথচ পুরুষ অপেক্ষাও উত্তম, সেজন্য বেদে, পুরাণে ও লোকে 'পুরুষোত্তম' নামে খ্যাত হয়েছেন। বেদান্তে ও পুরাণে যিনি পরমাত্মা বলে উদাহৃত হন, তিনিই বিশ্বের উপকার সাধনের জন্য পুরুষোত্তম নামে পরিচিত হন। সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পথে, শ্মশানে, গৃহমণ্ডপে কিংবা অন্য যে কোন স্থানে দেহত্যাগ করে মানুষ মোক্ষলাভ করতে পারে। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সম্যকরূপে কেউই বর্ণনা করতে পারে না। শোন, তোমরা যদি শাশ্বত মোক্ষলাভ করতে চাও, তবে সেই পুণ্যক্ষেত্রে গিয়ে বাস কর। ব্রহ্মার কথথানুসারে সেখানে গিয়ে মুনিরা বাস করলেন এবং পরম পদ লাভ করলেন।

—'ক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : একশো আটাত্তর

ব্যাস সমবেত মুনিদের বললেন—বিশ্বের অমরাবতীস্বরূপ সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কণ্ডু নামে এক ঋষি ছিলেন। পরম ধার্মিক এবং বেদজ্ঞ সেই ঋষি পুরুষোত্তমের আরাধনা করে পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। শুধু কণ্ডু নন, সেই পবিত্র তীর্থে ধর্মাচরণ করে কত মুনি ঋষি যে মোক্ষলাভ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। মুনিরা ব্যাসদেবের কথা শুনে বিনীতভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সেই কণ্ডু মুনি কে? কিভাবেই বা তিনি সেখানে গিয়ে সিদ্ধি লাভ করেন, সেই বিবরণ আমরা বিস্তৃত রূপে শুনতে ইচ্ছা করি। দয়া করে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস কণ্ডু মুনির সেই পবিত্র কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন—শুনুন, কণ্ডু মুনির কাহিনী বিস্তৃত রূপে বলা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই সংক্ষেপে সেই মহাত্মার পুণ্য চরিত-কথা শোনাচ্ছি। পুণ্যতোয়া গৌতমী নদীর তীরে এক মনোরম স্থানে কণ্ডু মুনির পবিত্র আশ্রম ছিল; নানা রকম ফল ও ফুলের গাছে, বিহঙ্গের কলগীতিতে সেই স্থান সর্বদাই মুখরিত হয়ে থাকত। সেই আশ্রমে ব্রত, উপবাস, নিয়ম, মৌন এবং সংযম অবলম্বন করে কণ্ডু কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ

করলেন। গ্রীষ্মে প্রখর রোদে বসে, বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শুয়ে, হেমন্তে ভিজে কাপড় পরে দুশ্চর তপস্যায় তিনি প্রবৃত্ত হলেন। দেবতারা কণ্ডু মুনির তপস্যায় শঙ্কিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। তাঁকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত না করতে পারলে দেবতাদের নিজের নিজের পদ ও মর্যাদা হারানোর ভয় ছিল। ইন্দ্র তখন প্রম্লোচা নামে এক অপরূপ সুন্দরী অপ্সরাকে ডেকে বললেন—গোতমী নদীর তীরে কণ্ডু মুনি তপস্যায় রত আছেন; তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে হবে। তোমার উদগ্র যৌবন এবং ভুবনমোহিনী রূপে তুমি মুনির অন্তরে কামনার আগুন জেলে দাও। প্রম্লোচা বিনীতভাবে ইন্দ্রকে বলল—আমাকে মার্জনা করবেন; আপনার কথামতো কাজ আমি সব সময়ই করে থাকি। কিন্তু এ কাজ করতে আমি অক্ষম; এতে আমার জীবনের সংশয় আছে। আমি ছাড়া উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, পুঞ্জিকস্থলা, বিশ্বাচী, সহজন্যা, পূর্বচিত্তি, তিলোত্তমা, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, শশিলেখা এবং বাসনা প্রভৃতি আরও তো অনেক অপ্সরা আছে। আপনি আর কাউকে বলুন। প্রম্লোচার কথা শুনে ইন্দ্র বললেন—অন্য যারা আছে, তাদের কথা থাক। তোমাকেই আমি এ কাজে উপযুক্ত বলে মনে করছি। তোমাকে সহায়তা করার জন্য কামদেব, বসন্ত ও বায়ুকে দেব।

অগত্যা ইন্দ্রের কথায় রাজী হয়ে প্রম্লোচা কাম, বসন্ত ও বায়ুকে নিয়ে আকাশমার্গে কণ্ডু মুনির আশ্রমের কাছে এসে পৌঁছল। আশ্রমের পরিবেশ তাকে মুগ্ধ করল। শান্তির নিকেতন যেন কণ্ডুর সেই আশ্রমটি; বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ, বিহঙ্গের কলগীতিতে মুখরিত। বায়ু, কাম ও বসন্তকে পৃথক পৃথক ভাবে তাকে সাহায্য করতে বলে প্রম্লোচা কর্তব্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নদীতীরে গিয়ে গান করতে আরম্ভ করল। বসন্তও তার কাজ শুরু করে দিল। অকালমনোহর কোকিলরবে আশ্রম মুখরিত হয়ে উঠল। পুষ্পবাণ-ধারী কামদেবও সেই মুনির কাছে গিয়ে তাঁর মনকে অনুরাগজর্জর করে তুলতে চেষ্টা করলেন। সেই মনোরম গীতধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে কণ্ডু প্রম্লোচার কাছে এসে পৌঁছলেন। প্রম্লোচার সেই ভুবনভোলানো রূপ দেখে কণ্ডু কামাতুর হয়ে পড়লেন। তিনি প্রম্লোচাকে তার পরিচয় জিগ্যেস করলেন। প্রম্লোচা সলজ্জভাবে বলল—ফুল তুলতে এসেছিলাম এখানে। আমি আপনার এক গুণমুগ্ধ দাসী। আপনি আদেশ করলে যে কোন কাজই আমি করতে পারি। প্রম্লোচার কথা শুনে কণ্ডু তার হাত ধরে তাকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। কোন কিছুর প্রতিই তখন তাঁর কোন দৃষ্টি ছিল না। কামদেব, বসন্ত এবং বায়ু স্বর্গে ফিরে গেল, এবং ইন্দ্রকে সব কথা জানাল। ইন্দ্র ও দেবতারা সে-কথা শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। এদিকে কণ্ডু মুনি আশ্রমের অভ্যন্তরে গিয়ে দিব্যকান্তি ধারণ করলেন। তপঃপ্রভাবে এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন প্রম্লোচার কাছে। প্রম্লোচাও তাঁকে দেখে বিস্মিত হল। তারপর কণ্ডু সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত আচার পরিত্যাগ করে প্রম্লোচার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হলেন। দিনরাত ধরে তিনি প্রম্লোচার সঙ্গে সুরতক্রিয়ায় নিমগ্ন হয়ে থাকলেন। সময়ের কোন জ্ঞান তাঁর ছিল না; একে একে দিন, পক্ষ, মাস, বছর কেটে গেল। প্রম্লোচার সঙ্গে কামক্রীড়ায় মত্ত থেকে শত শত শত বছর তাঁর কেটে গেল। তারপর প্রম্লোচা যতবারই স্বর্গে যেতে চাইল, ততবারই কণ্ডু তাকে অনুরোধ করলেন আরও কয়েকদিন থেকে যেতে। এভাবেও অনেক দিন কেটে গেল। মুনির শাপ-ভয়ে ভীতা হয়ে প্রম্লোচাও জোর করে চলে যেতে পারল না। তারপর একদিন কুটির থেকে কণ্ডুকে চিন্তিত এবং ব্যস্তভাবে বেরোতে দেখে প্রম্লোচা জিগ্যেস

করল—এই সন্ধ্যার সময় কোথায় যাচ্ছেন আপনি ? কণ্ডু তার উত্তরে প্রম্লোচাকে বললেন—দেখ, দিন শেষ হয়েছে ; এখন সন্ধ্যাকালীন উপাসনা করার সময়। যে সময়ের যা কর্তব্য, তা সম্পাদন না করলে ক্রিয়ালোপ হয়। প্রম্লোচা মৃদু হেসে কণ্ডুকে বলল—আজই কি আমার দিবাবসান হল ? অনেক সন্ধ্যা চলে গেছে ; কত কাল যে কেটে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

কণ্ডু ঃ তুমি তো আজ সকালেই এই পবিত্র নদীতীরে এসেছিলে ; তারপর তোমাকে আমি আমার আশ্রমে নিয়ে এসেছিলাম। এখন সন্ধ্যা হয়েছে ; তাই তো উপাসনার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছি। তুমি কি বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কথা খুলে বল।

প্রম্লোচা ঃ আমি সকালবেলায় এসেছি, এ কথা সত্য। কিন্তু সে তো অনেক দিন আগের কোন এক সকালে। তারপর কয়েকশো বছর কেটে গেছে।

কণ্ডু ঃ ঠিক করে বল, তোমার সঙ্গে কত দিন আমি এভাবে কাটিয়েছি।

প্রম্লোচা ঃ প্রথমে নশো বছর, পরে সাতশো বছর ছ'মাস ও তিন দিন-সর্বসাকুল্যে ষোলো বছর ছ'মাস তিন দিন আমার সঙ্গে কাটিয়েছেন।

কণ্ডু ঃ আমার মনে হয় তোমার হিসেবে ভুল হচ্ছে। আমার স্থির বিশ্বাস আমি তোমার সঙ্গে মাত্র একটা দিন কাটিয়েছি।

প্রম্লোচা ঃ আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলার মতো স্পর্ধা বা দুঃসাহস আমার নেই। আমি ঠিকই বলছি।

প্রম্লোচার কথা শুনে কণ্ডু নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন—আমার তপস্যা নষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই কেউ আমাকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এই অপ্সরাকে কাজে লাগিয়েছে। নিজেকে সংযত করে ঊর্মিষট্‌কের অতীত ব্রহ্মকে জানার জন্য যত্ন করছিলাম। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে সেই ধর্মজ্ঞ মুনি প্রম্লোচাকে বললেন—দেখ, সাধু ব্যক্তিদের কথোপকথনে সাতটি পদ উচ্চারিত হলেই বন্ধুত্ব হয়। আর তোমার সঙ্গে আমি অনেক দিন কাটিয়েছি, সেজন্য কোন সুতীব্র অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করতে পারছি না। তোমায় বলছি ; এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও। অযথা আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি কেন ? আমারই তো দোষ ; ইন্দ্রিয়কে আমি জয় করতে পারি নি। কণ্ডু প্রম্লোচাকে উদ্দেশ করে যখন এ কথা বলছিলেন, তখন সে ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং তার শরীর থেকে প্রচুর ঘাম ঝরতে লাগল। প্রম্লোচা কণ্ডুর কথা শুনে সেই আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেল এবং আকাশপথে যেতে যেতে গাছের পাতা দিয়ে তার গায়ের সেই ঘাম মুছে ফেলতে লাগল ; কণ্ডু ঋষির সঙ্গে দীর্ঘ দিন শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত থাকায় মুনির যে বীর্য তার শরীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাও ঐ ঘামের সঙ্গে তরল হয়ে জল রূপে ঝরতে লাগল। তরুকুল ঋষি-নিহিত সেই বীর্য গ্রহণ করল, বায়ু তাকে একত্রিত করল আর সোম তাঁর কিরণ দিয়ে তাকে অপ্যায়িত করলেন। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে তা বৃক্ষকন্যা 'মারিষা' রূপে জন্মগ্রহণ করল। তিনি প্রাচেতসদের স্ত্রী এবং দক্ষ-প্রজাপতির মা রূপে পরবর্তীকালে পরিচিত হন।

এদিকে তপস্যা ক্ষীণ হওয়ায় কণ্ডু প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গেলেন। দক্ষিণ সাগরের তীরদেশে সেই পরম মঙ্গলময় ক্ষেত্র বিরাজিত। পৃথিবীতে স্বর্গস্বরূপ সেই তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে কণ্ডু ভগবান পুরুষোত্তমকে দর্শন করলেন। তিনি সেখানে দাঁড়ানো অবস্থাতেই

উপরের দিকে হাত তুলে এক মনে 'ব্রহ্মপারময়' স্তোত্র জপ করতে লাগলেন। মুনিরা তখন সেই 'ব্রহ্মপারময়' স্তোত্র কি তা জানতে চাইলে ব্যাস বললেন—সেই বিষ্ণু পরপার, অপার-পার, পর সকলের পরবর্তী, পরমাত্মরূপ, পর-পারভূত, পরসমূহেরও পর, পারেরও পার, ব্রহ্মপার। তিনি কারণকে আশ্রয় করে থাকলেও স্বয়ং কারণ, সেই কারণেরও কারণ, পরকারণেরও কারণ, আবার তিনিই কর্ম, কর্মকর্তা ইত্যাদি বিবিধরূপে এই বিশ্ব পালন করছেন। তিনি ব্রহ্মারও প্রভু, সেই ব্রহ্ম সর্বভূতরূপী, তিনি বৃহদাকার, প্রজাসমূহের পতি ও অপরিবর্তনশীল। সেই পুরুষোত্তম ব্রহ্মা যেমন নিয়তই ওংকারাত্মক, অজ, অব্যয়, নিত্য, ব্যাপক এবং অবিনাশী তেমনি আমারও সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর হয়ে যাক ; ব্রহ্মকে আমি যেন লাভ করতে পারি। কণ্ডুকৃত ব্রহ্মপারস্তোত্রের পাঠে প্রীত হয়ে ভগবান বিষ্ণু সত্বর সেখানে এসে তাকে বর দিতে চাইলেন। সুন্দরের প্রতিমূর্তিস্বরূপ সেই পীতবসন-পরিহিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুকে দেখে কণ্ডু ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর সেই নয়ন-মনোহর রূপে আবির্ভূত বিষ্ণুর সামনেই তাঁর স্তব করলেন।—তিনি বললেন—আপনি নারায়ণ, হরি, জগৎপতি, জগতের বীজস্বরূপ, অব্যক্ত, হিরণ্যগর্ভ, অনাদি, অনন্ত, অমৃত, অজেয়, আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি ভূতপালক, ভূতেশ, ভূতাধিবাস, ভূতাত্মা এবং ভূতগর্ভ ; আপনাকে নমস্কার জানাই। আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রপালক, ক্ষেত্রবান, ক্ষেত্রপরিত্যাগকারী, ক্ষেত্রাত্মা, ক্ষেত্রস্রষ্টা এবং ক্ষেত্রবহিত ; গুণের আলয়, গুণের আশ্রয়, গুণের বহনকারী, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ত্যাগী ; আপনাকে আমার নমস্কার। আপনি সহস্রশীর্ষসম্পন্ন, সহস্রদৃষ্টিসম্পন্ন, সহস্রচরণবিশিষ্ট জগতের বৃষ্টিকারণ যজ্ঞসমূহ আপনার কাছ থেকেই উৎপন্ন হয়। এই চরাচর সমগ্র জগৎকে আপনি উৎপন্ন করেছেন আবার আপনিই একে প্রতিপালন করেন। দশাবতার মূর্তিকে আমি প্রণাম জানাই ; যে বিভিন্ন মূর্তিসমূহ জগতের প্রয়োজনে আপনি বারংবার ধারণ করেছেন।

কণ্ডুর স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাকে বর দিতে চাইলেন। কণ্ডু তাঁকে বললেন—দেখুন আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে দীর্ঘ দিন সংসারে থাকলাম ; বিষয়সুখও উপভোগ করলাম ; তবু এর শেষ কোথায় তা জানতে পারলাম না। আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, আমাকে আপনি ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করুন ; এই পৃথিবীতে যেন আর কোন দিনই জন্মগ্রহণ করতে না হয় আমাকে। সনাতন পরম পদ যেন আমি লাভ করতে পারি। বিষ্ণু তখন বললেন—আমার যারা ভক্ত তারা সকলেই মোক্ষ লাভ করে। তোমার কথা তো তাদের থেকে আলাদা। তুমি অবশ্যই সেই পরম পদ লাভ করতে পারবে। এ কথা বলেই ভগবান বিষ্ণু সেখান থেকে চলে গেলেন। কালক্রমে কণ্ডু মুনিও তপস্যায় নিরত থেকে মোক্ষ লাভ করলেন। এই পবিত্র বৃত্তান্ত যে শোনে বা পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গলোক লাভ করে। উত্তম কর্মভূমি, পরম মোক্ষক্ষেত্র সেই পুরুষোত্তম তীর্থে গিয়ে যারা পুরুষোত্তম দেবকে দর্শন করে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং শেষে বিষ্ণুলোকে তাদের গতি হয়।

—'কণ্ডুমুনির উপাখ্যানবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো উনআশি

লোমহর্ষণ বললেন—ব্যাসের এ রকম কথা শুনে সেই সংযতেন্দ্রিয় মুনিরা তাঁকে বিনীত-ভাবে বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার কথা শোনানোর অনুরোধ

জানালেন। তাঁরা বললেন—আপনি দয়া করে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা শোনান। এই অসার, দুঃখপূর্ণ, জলবুদ্বুদের মতো চঞ্চল সংসারে গর্ভবাসে কেন তাঁদের রুচি হল? পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা যে সব কাজ করেছিলেন, সে সব কথাই আপনি দয়া করে আমাদের শোনান। কিছুতেই আমাদের সংশয়ের অবসান হচ্ছে না এ কথা ভেবে যে, যিনি মানুষদের মধ্যে নিজের অনাময় চক্র প্রবর্তিত করেন, তিনি কি করে মানুষ হয়ে জন্মালেন? যিনি জগতের সমস্ত প্রাণীরই গোপায়ন বা রক্ষক, সেই বিষ্ণু কিসের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে গোপত্ব গ্রহণ করলেন অর্থাৎ গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করলেন? যে ভূতাত্মা প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করে পুনরায় তাদের ধারণ করেন, তিনি কি করে পৃথিবীতলনিবাসী রমণীর গর্ভে বাস করলেন? যিনি ত্রিদশ অর্থাৎ দেবতাদের প্রার্থনানুসারে ত্রিপদ বিন্যাস করে ত্রিলোক আক্রমণ করেন এবং জগতের ধর্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গমার্গ স্থাপন করেন; যিনি দৃশ্য এবং অদৃশ্য আত্মা দ্বারা জলময় দেহ ধারণ করে সমগ্র জগৎ পান করেন এবং লোকসমূহ একার্ণবে পরিণত করেন; যে পুরাণাত্মা পুরাণ পুরুষ, বরাহরূপ ধারণ করে দাঁতে করে সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেন, যিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করে মহাবীর্যশালী হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন; পুরাকালে যে সর্বব্যাপী হরি সংবর্তক নামক অগ্নিময় রূপ ধারণ করে পাতালতলে সমুদ্রসলিল পান করেছিলেন; যে দেব যুগে যুগে সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্রমস্তক সম্পন্ন ব্রহ্ম বলে অভিহিত হন; একার্ণবে পাতালতলে যাঁর নাভি থেকে পিতামহ ব্রহ্মার বাসস্থান হিরন্ময় পদ্মের জন্ম হয়েছিল; যিনি স্বয়ং বাক্যরহিত এবং চরণহীন হয়েও গার্হপত্য, আহবনীয় এবং অন্যান্য বৈদিক কর্ম, বেদ, দীক্ষা, সমিধ এবং অন্যান্য যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করে দেবতাদের হব্যভোজী এবং পিতৃগণকে কব্যভোজী করেছেন; যজ্ঞসমূহের স্রষ্টা এবং ব্যবস্থাপকও যিনি, পুরাকালে যে অনন্ত স্রষ্টা কর্মানুসারে ক্ষণ, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালসমূহ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই ত্রিবিধ দেবতা, লোকত্রয়, বিদ্যাত্রয়, কর্মত্রয়, বর্ণত্রয়, গুণত্রয় প্রভৃতি সমস্তই সৃষ্টি করেছেন; যিনি ধার্মিকগণের সুগতি, অধার্মিকদের অগতি, বর্ণচতুষ্টয়ের স্রষ্টা, চতুর্বিধ বিদ্যার বেত্তা, আশ্রম চতুষ্টয়ের অবলম্বন; যিনি পরমজ্যোতি ও পরমতপস্যা রূপে কথিত হন; যাঁকে পর ও অপর বলা হয়; যিনি দেবতাদেরও দেবতা, দৈত্যসংহারক, যুগান্তকালে সকলেরই অন্তক অর্থাৎ বিনাশকারী, লোকসেতুসমূহের যিনি সেতু; যিনি বেদ-বিদ্বানদের বেদ্য; প্রভাববান ব্যক্তিদেরও প্রভু; যিনি সৌম্যকান্তি ব্যক্তিদের মধ্যে সোমস্বরূপ; অগ্নির মতো তেজশালী ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি অগ্নিস্বরূপ; ইন্দ্রদেরও যিনি অধিপতিস্বরূপ; তপস্বীদের তপঃস্বরূপ, নীতিমান ব্যক্তিদের বিনয়স্বরূপ এবং গতিমান ব্যক্তিদের মধ্যে গতিস্বরূপ, সেই পরমাত্মা বিষ্ণু কি ভাবে মানুষ রূপে পৃথিবীতে জন্মালেন, কেনই বা জন্মালেন, সে বৃত্তান্ত দয়া করে আপনি বলুন।

আকাশ থেকে বায়ুর জন্ম হয়, বায়ুর প্রাণ থেকে উৎপন্ন অগ্নিই আকাশের প্রাণস্বরূপ, সেই মুখ্য প্রাণাত্মক অগ্নিই মধুসূদন। রস থেকে রক্ত হয়, রক্ত থেকে মাংস, মাংস থেকে মেদ, মেদ থেকে অস্থি, অস্থি থেকে মজ্জা, মজ্জা থেকে শুক্র, শুক্র থেকেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গর্ভ উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে রসের প্রথম ভাগ থেকে সৌম্যরাশি এবং গর্ভোষ্ম থেকে দ্বিতীয় রাশি উৎপন্ন হয়। শুক্র সোমাত্মক এবং ঋতু পাবকাত্মক। এ সমস্ত কিছুরই ভাব রসানুসারে হয়। চন্দ্র ও অগ্নিই এর মূল কারণ। শুক্র কফবর্গে

এবং পিত্ত রক্তবর্গে অবস্থিত। কফের স্থান হৃদয়; পিত্তের স্থান নাভিতে। নাক ও দুই ঠোঁটের মাঝখানে অগ্নি অবস্থান করেন। মনকে প্রজাপতি বলা হয়, কফকে বলা হয় সোম এবং পিত্তকে বলা হয় অগ্নি; —এভাবে এই জগৎ অগ্নি ও সোমাত্মক। এভাবে অর্বুদ অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের মতো গর্ভ বাঁধত হতে থাকলে তার মধ্যে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েই বায়ু প্রবেশ করে। সেই বায়ু শরীরের ভেতরে থেকে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচভাগে বিভক্ত হয়। এই প্রাণবায়ু পরমাত্মাকে বর্ধিত করার জন্য শরীরের অভ্যন্তরেই সঞ্চরণ করতে থাকে। অপান সেই শরীরের নিম্ন অংশে এবং উদান মধ্যভাগে অবস্থান করে। ব্যান সমস্ত শরীর জুড়ে থাকে এবং যে বায়ুর দ্বারা সমতা বিধান হয়, তাকে সমান বায়ু বলে। পরে সেই শরীরে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পঞ্চভূতের আবির্ভাব হয়ে থাকে। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি—এই পঞ্চভূত ইন্দ্রিয়ে নিবিষ্ট হয়ে নিজের নিজের কাজ করতে থাকে। পৃথিবীর অংশে দেহ, বায়ুর অংশে প্রাণ, আকাশের অংশে ছিদ্রসমূহ, জলের অংশে স্রাব এবং তেজের অংশে চক্ষু ও কান্তি জন্মে। মন এই পঞ্চভূতের পরিচালক। মনের প্রভাবেই বিবিধ বিষয়ে প্রবৃত্তি ঘটে থাকে। সনাতন বিষ্ণু এই সমস্ত সৃষ্টি করে থাকেন; তিনিই আবার এই মর্ত্যলোকে কিসের জন্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করলেন? এই ঘটনা আমাদের বিস্মিত করে তুলছে। যিনি দেবতাদের আর্তি হরণ করেন, যিনি পুরুষোত্তম, সর্বব্যাপী, সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহারের সর্বময় কর্তা, অক্ষয়, শাশ্বত, অনন্ত, নিগুর্ণ নির্বিকার, সূক্ষ্ম, নিরঞ্জন, অবিকারী, নিত্য পরমাত্মা, নিত্যতৃপ্ত, নিরাধার এবং যাঁর সত্যযুগে বিশুদ্ধ হরিত্ব দেবতাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠত্ব, মনুষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণত্ব শোনা যায়, সেই পরমপুরুষ ঈশ্বরের সমস্ত বিস্ময়জনক কার্যকলাপ শুনতে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে। আপনি দয়া করে আমাদের তৃষ্ণা দূর করুন; সেই পবিত্র কথা বিস্তৃতভাবে বলুন। মুনিরা থামলে পর ব্যাসদেব কৃষ্ণকথা বলতে সচেষ্ট হলেন।

—'ঋষিপ্রশ্ননিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়: একশো আশী

মুনিদের অনুরোধে ব্যাসদেব কৃষ্ণ-কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমেই ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন। বললেন—সেই পুরাণ পুরুষ, সনাতন, নিগুর্ণ, বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বরেণ্য, দেবতাদের প্রার্থনীয়, প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি; যাঁর থেকে অণুতর আর কিছুই নেই, যাঁর থেকে বৃহত্তরও আর কিছুই নেই, যিনি এই সচরাচর বিশ্ব ব্যেপে রয়েছেন, সেই ব্রহ্মরূপী আদিদেবকে আমি নমস্কার করি। তিনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম আত্মা, অব্যক্ত ও ব্যক্তরূপী, পরমার্থদৃষ্টিতে তিনি অতীব নির্মল জ্ঞানস্বরূপ হলেও ভ্রান্তদৃষ্টিতে অর্থরূপে প্রতীয়মান হন। তিনি মুখ দিয়ে ঋক্ সাম প্রভৃতি বেদ উদ্গিরণ করে ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, তাঁর যজন না করলে যজ্ঞকালে অসুরেরা যজ্ঞ ধ্বংস করে। তত্ত্বদর্শী মুনিরা জলকে 'নারা' বলে থাকেন; সেই জলই পূর্বে তাঁর অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান ছিল বলে তাঁর নাম 'নারায়ণ' হয়। সেই অব্যক্তকারণ ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুর্ণ ভেদে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে সমস্ত বিশ্ব চরাচর জুড়ে রয়েছেন। তাঁর একটি মূর্তি জ্বালামালা বিশিষ্ট; জ্ঞানীরা তা দর্শন করেন। সেই পরামূর্তিই

যোগীগণের চরম লক্ষ্য। সেই গুণাতীত মূর্তির নাম বাসুদেব। দ্বিতীয় মূর্তির নাম শেষ ; এই মূর্তি অধোভাগে থেকে মস্তক দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করছে। একে তামসী মূর্তিও বলা হয়। তৃতীয় মূর্তি সত্ত্বগুণবহুল ; প্রজাপালন কর্মে সেই মূর্তি সদাই তৎপর। জলের মধ্যে সর্পশয্যায় শায়িত যে মূর্তি, তাকে রজঃমূর্তি বলা হয় ; সেই মূর্তিই নারায়ণের চতুর্থ মূর্তি। সৃষ্টিকর্মে সদাই তৎপর এই মূর্তি। হরির প্রজাপালন-তৎপর যে তৃতীয় মূর্তি, তা পৃথিবীতে ধর্মব্যবস্থা করে থাকে, ধর্মদ্বেষী অসুরদের হত্যা করে এবং দেবতাদের পালন করে থাকে। পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি উৎপন্ন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই ঐ মূর্তি আপনাকে রূপান্তরে সৃজন করে। ওই মূর্তি পুরাকালে বরাহরূপ ধারণ করে বিপন্ন বসুন্ধরাকে নিজের দাঁতে করে রক্ষা করেন, নৃসিংহরূপে অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন, বামনরূপ ধারণ করে মায়াবশে বলিকে পাতালে পাঠিয়েছিলেন, পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয়দের নিহত করেন, দত্তাত্রেয়রূপে মহাত্মা অলর্ককে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ দেন এবং রামরূপে বিশ্ববিধানের মর্যাদা লঙ্ঘনকারী রাবণকে বধ করেন। সহস্র যুগ পর্যন্ত তিনি অনন্তশয্যায় শয়ন করেছিলেন ; তখন তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম উদ্ভূত হয়। এই পদ্ম থেকেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে মধু ও কৈটভ নামে মহাবলশালী দুই অসুরের জন্ম হয় ; তারা ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। নারায়ণ তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় তাদের নিহত করেন। আপনারা তাঁর যে অবতারের কথা জিগ্যেস করেন তা মাথুর নামে পরিচিত। সেই সাত্ত্বিক মূর্তি প্রদ্যুম্ন নামেও বিখ্যাত। সেই পরম দেবের মাহাত্ম্যর কিছু কথা আপনাদের শোনালাম।

—'চতুর্ব্যূহ (দেহ) বর্ণন নামক' অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো একাশি

মুনিদের উদ্দেশ করে ব্যাস বললেন—এবার আপনাদের শ্রীভগবানের মাথুর অবতারের কথা শোনাচ্ছি। পুরাকালে পৃথিবী দৈত্যদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়ে মেরুপর্বতে বসবাস-কারী দেবতাদের কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণাম জানিয়ে বললেন—অগ্নি সুবর্ণের গুরু, আর সূর্য গোসমূহের গুরু, এঁরা এবং ত্রিলোকবন্দ্য নারায়ণও আমার গুরু। আপনাদের কাছে আমার এই নিবেদন, সম্প্রতি কালনেমিপ্রমুখ দৈত্যরা মর্ত্যলোকে এসে সর্বদাই প্রজা-পীড়নে নিরত রয়েছে। পুরাকালে যে কালনেমিকে বিষ্ণু নিহত করেন, এখন সে-ই উগ্রসেনের পুত্র কংস রূপে অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ এবং বাণ প্রভৃতি অসুরদের সঙ্গে প্রজাপীড়নে মেতে উঠেছে। তাদের অত্যাচারে আমি যাতে অবনতা হয়ে রসাতলে না যাই, সেজন্যই আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা নিয়ে এসেছি যে, আপনারা আমাকে রক্ষা করুন।

পৃথিবীর কথা শুনে ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর তীরে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মা বললেন—তুমি সহস্রমূর্তি-সম্পন্ন, তোমার সহস্র বাহু এবং অসংখ্য মুখ রয়েছে। জগতের বিনাশ ও স্থিতি বিষয়ে তুমি তৎপর ; তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। তুমি বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বাক্য এবং প্রকৃতির অতীত ; তুমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ সবচেয়ে বড়। পৃথিবী অসুরের অত্যাচারে পীড়িত

হয়ে তোমার করুণা যাচঞ্ঞা করছে। সমস্ত দেবতারা এখানে উপস্থিত। এ বিষয়ে আমাদের কী করণীয় আছে বলে দাও।

ব্রহ্মার কথা শুনে এবং সামনে সমস্ত দেবতাদের দেখে ভগবান বিষ্ণু তাঁর মাথা থেকে একটি সাদা আরেকটি কালো–দুটি চুল ছিঁড়ে নিয়ে বললেন–আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভার লাঘব করবে। দেবতারাও নিজের নিজের অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। তাহলেই দৈত্যরা বিনষ্ট হবে। বসুদেবের ধর্মপ্রাণা পত্নী দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান হিসেবে আমি জন্মগ্রহণ করব এবং কালনেমির বংশোদ্ভূত কংসকে হত্যা করব। এ কথা বলেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। দেবতারা বিষ্ণুর কথামতো নিজ নিজ অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেন। এদিকে বিষ্ণু যে দেবকীর অষ্টম গর্ভরূপে জন্মগ্রহণ করবেন নারদ এ কথা কংসকে জানিয়ে দিলেন। কংস নারদের কাছ থেকে সে কথা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন এবং দেবকী ও বসুদেবকে নিজের প্রাসাদে বন্দী করে রাখলেন। বসুদেবের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী যেমন যেমন পুত্র জন্মগ্রহণ করল; বসুদেব তাদের কংসের হাতে সমর্পণ করলেন। হিরণ্যকশিপুর ষড়গর্ভ নামে ছ'টি পুত্র ছিল; বিষ্ণুর আদেশে যোগনিদ্রা তাদেরই দেবকীর গর্ভে নিয়োগ করেন। অবিদ্যারূপী যে বৈষ্ণবী শক্তি দ্বারা এই সমগ্র জগৎ মোহিত হয়েছে, তিনিই মহামায়া যোগনিদ্রা। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বললেন–হিরণ্যকশিপুর ছয়টি পুত্রকে দেবকীর গর্ভে নিয়োগ কর। তারা একে একে কংস কর্তৃক হত হলে পর, আমার যে 'শেষ' নামক অংশ, তারই এক অংশ দেবকীর সপ্তম গর্ভরূপে জন্মগ্রহণ করবে। বসুদেবের রোহিণী নামে আরেক স্ত্রী আছে গোকুলে; তার প্রসব সময়ে ওই সপ্তম অংশকে তারই উদরে নিয়ে যেও। লোকে এ কথা জানবে না। গর্ভ সংকর্ষণ অর্থাৎ পরিবর্তনের জন্য ওই গর্ভজাত সন্তান সংকর্ষণ নামে অভিহিত হবে। তারপর আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভে প্রবেশ করব। তুমিও যশোদার গর্ভে প্রবেশ করবে। বর্ষাকালে শ্রাবণমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন গভীর রাত্রে আমি জন্মগ্রহণ করব; তুমি নবমীতে জন্মগ্রহণ করো। আমারই প্রেরণায় বসুদেব আমাকে যশোদার বিছানায় এবং তোমাকে দেবকীর বিছানায় নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। কংস তোমাকে পাথরে আছড়ে মেরে ফেলতে চাইবে; তখন তুমি অন্তরীক্ষে অবস্থান করো। পরে দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করবেন। তুমি শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি আরো অনেক দৈত্য-দানবদের নিহত করে পৃথিবীকে স্বস্তি দান করবে। যারা তোমাকে আর্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা, ক্ষেমংকরী প্রভৃতি নামে স্তুতি করবে, তারা সমস্ত বাঞ্ছিত ফলই লাভ করবে। যারা তোমাকে সুরা, মাংস প্রভৃতি উত্তম ভোজ্যদ্রব্য সহকারে পূজা করবে, তাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে। যা হোক, যে রকম বললাম, সে-রকমই কাজ করো।

–'হরির বংশাবতারনিরূপণ নামক' অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ একশো বিরাশি

ব্যাস মুনিদের বললেন–পূর্বের কথামতো যোগনিদ্রা সমস্ত কাজই সম্পাদন করলেন। সপ্তম গর্ভকে তিনি বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন; সেই থেকে বলরামের জন্ম। আর দেবকী যখন অষ্টমগর্ভে স্বয়ং জগৎপতি বিষ্ণুকে ধারণ করলেন,

তখন তিনি এতই তেজস্বিনী হয়ে উঠলেন যে, তাঁর দিকে তাকানোই যায় না। দেবতারা পর্যন্ত দেবকীকে স্তুতি করতে লাগলেন। তারপর একদিন গভীর রাতে জগৎপতি বিষ্ণু দেবকীর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর জন্মের সময় দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষণ করলেন। বসুদেব দেখলেন যে, সেই নবজাতকের গায়ের রঙ প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মতো, তাঁর চারটি হাত রয়েছে এবং তার বুকে রয়েছে শ্রীবৎসের চিহ্ন। বসুদেব বিষ্ণুজ্ঞানে সেই নবজাতকের স্তব করলেন। শ্রীভগবানকে স্তব করার পর কংসের ভয়ে বসুদেব তাঁকে বললেন—আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। এখন তুমি তোমার এই দিব্যরূপ পরিহার কর। তুমি আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ, এ কথা জানতে পারলে কংস আমাকে উৎপীড়ন করবে। দেবকীও সেই একই কথা বললেন। তাঁদের দুজনেরই কথা শুনে বিষ্ণু দেবকীর উদ্দেশে বললেন—তুমি পুত্র কামনা করে আমাকে যে স্তব করেছিলে, তা আজ তোমার সফল হল ; কারণ, আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মেছি। এ কথা বলেই তিনি বালকরূপ ধারণ করলেন।

বিষ্ণুর প্রেরণায় সেই রাত্রেই বসুদেব বালকরূপী তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। যোগনিদ্রার প্রভাবে রক্ষিগণ, দ্বারপালগণ, অন্তঃপুরবাসিগণ সবাই মোহিত হয়ে পড়ল। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। শেষনাগ তার বিরাট ফণা বিস্তার করে বসুদেবকে আচ্ছাদিত করে নিয়ে চলল। বর্ষার যমুনা উত্তাল এবং তরঙ্গসংকুল থাকা সত্ত্বেও বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার সময় সে নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ল এবং তার জল হাঁটু-প্রমাণ ছিল। যশোদাও সে সময় যোগনিদ্রার প্রভাবে মোহিত ছিলেন। অন্যান্য সবাই মোহিত হয়ে পড়ার পর তিনি কন্যা প্রসব করেন। বসুদেব যশোদার শয্যায় বালকরূপী কৃষ্ণকে রেখে যশোদার কন্যাটিকে নিয়ে শীগগির কংসের প্রাসাদে ফিরে এলেন। জেগে ওঠার পর যশোদা দেখলেন সেই নয়নাভিরাম শিশুকে।

এদিকে বসুদেব দেবকীর শয্যায় সেই বালিকাকে রেখে দেওয়ার পর সে কেঁদে উঠল। তার কান্নার শব্দে রক্ষীরা মোহদশা থেকে জেগে উঠল এবং কংসকে দেবকীর সন্তান প্রসবের কথা জানাল। সঙ্গে সঙ্গে কংস এসে শিশু কন্যাটিকে দেবকীর সকরুণ মিনতি-সত্ত্বেও পাথরে আছড়ে ফেলল। কিন্তু পাথরে পিষ্ট না হয়ে সেই বালিকা অষ্টভুজা মূর্তিতে অন্তরীক্ষে থেকে ক্রুদ্ধস্বরে কংসকে বলল—আমাকে পাথরে নিক্ষেপ করে কোন ফল হবে না। তোমার হত্যাকারী জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যথাসময়ে তিনি তোমাকে বধ করবেন। এ কথা বলেই সেই অষ্টভুজা যোগনিদ্রা দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

—'শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তিবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো তিরাশি

কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—যোগনিদ্রার কথা শুনে কংস ক্রুদ্ধ হয়ে প্রলম্ব, কেশি প্রভৃতি অসুরদের ডাকল। যোগনিদ্রা যা যা বলেছে, সব কথাই তাদের জানিয়ে কংস আদেশ দিল যে, পৃথিবীতে তারা যেখানে যে বালককে অধিক বলশালী দেখবে তাকেই যেন সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে। অসুরদের এ রকম আদেশ দিয়ে সেই বিষ্ণুদ্বেষী অন্তঃপুরে এসে দেবকীকে উদ্দেশ্য করে বলল—তোমার পূর্বের সন্তানদের আমি বৃথাই নষ্ট করেছি। আমার হন্তা নাকি অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছে। মৃত সন্তানদের জন্য তুমি দুঃখ করো না ;

আয়ু শেষ হলে কে-ই বা না মরে ? তোমরা মুক্ত। যেখানে খুশি তোমরা যেতে পারো। কংস তাদের মুক্তি দিয়ে চিন্তান্বিত ভাবে নিজের কক্ষে চলে গেলেন।

—'শ্রীকৃষ্ণবালচরিতে কংসবিচার কথন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো চুরাশি

কংস বসুদেবকে মুক্ত করে দেওয়ার পর তিনি নন্দগোয়ালার বাসস্থানে গিয়ে পেঁছিলেন। নন্দ এবং অন্যান্য গোয়ালারা নিজেদের বাসস্থান গোকুল থেকে তখন কংসকে প্রদেয় বার্ষিক কর দিতে মথুরায় এসেছিলেন। বসুদেব নন্দকে বললেন—বৃদ্ধ বয়সেও যে তোমার পুত্র হয়েছে, এ অতি আনন্দের কথা। তোমরা তো রাজার বার্ষিক কর মিটিয়ে দিয়েছ, তবে এখানে আর থেকো না ; তোমরা গোকুলে ফিরে যাও। রোহিণীর গর্ভে আমার যে পুত্র জন্মেছে তাকেও তুমি তোমার পুত্রের সঙ্গে পালন করো ; এই অনুরোধ তোমার কাছে। বসুদেবের কথা শুনে নন্দ প্রভৃতি অন্যান্য গোয়ালারা গোকুলে ফিরে গেল।

একবার রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন তখন পুতনা রাক্ষসী কৃষ্ণকে স্তন দান করতে এলো। পুতনা শিশু হত্যাকারিণী বলে পরিচিত ছিল ; কংসই তাকে এই নিষ্ঠুর কাজে নিযুক্ত করে। পুতনা যাকে যাকে তার স্তন্য পান করাত, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হত। পুতনা যেই কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাতে উদ্যত হয়েছে, অমনি কৃষ্ণ দুহাতে তার স্তন দুটিকে জোরে চেপে ধরেন। তার ফলে সে অল্পক্ষণের মধ্যেই চিৎকার করতে করতে মারা যায়। ব্রজবাসীরা সেই চিৎকার শুনে জেগে ওঠে এবং সেই ঘটনা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। যশোদা সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন লৌকিক উপায়ে বালকের রাক্ষসীনিধনজনিত দোষ নিরসন করার চেষ্টা করেন। নন্দ গোয়ালাও গোবর কৃষ্ণের মাথা দিয়ে মন্ত্র পাঠ করে তার রক্ষাবিধান করেন। তিনি বলেন—যাঁর নাভিসমুদ্ভূত পংকজ থেকে এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, ভূতপতি সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন, বরাহরূপধারী দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার উদর এবং গুহ্যদেশ বিষ্ণু এবং জানু ও চরণদ্বয় জনার্দন রক্ষা করুন। বামন তোমাকে রক্ষা করুন। যিনি ত্রিপাদবিক্ষেপে ত্রিভুবন অধিকার করেন, সেই গোবিন্দ তোমার মাথা রক্ষা করুন। কেশব কণ্ঠ রক্ষা করুন। তোমার মুখ, দুই বাহু, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন নারায়ণ। দিকসমূহে বৈকুণ্ঠ এবং বিদিকসমূহে মধুসূদন তোমাকে রক্ষা করুন। হৃষীকেশ আকাশে এবং মহীধর তোমাকে ভূমিতলে রক্ষা করুন।

তারপর যশোদা কৃষ্ণকে একটি গাড়ির নীচে শুইয়ে দিয়ে অন্য কাজে চলে গেলেন। বালক কৃষ্ণ স্তন্য পান করতে চেয়ে মাকে খুঁজে পেলেন না। তিনি তখন কাঁদতে লাগলেন। কান্না ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে হাত-পা ছোঁড়ায় পর্যবসিত হল। তাঁর পা লেগে সেই ভারী গাড়ি উল্টে গেল। গাড়ির উপর কয়েকটা কলসী ও অন্যান্য মাটির পাত্র ছিল, সেগুলো ভেঙে গেল। গোয়ালারা এসে সমস্ত ঘটনা দেখল এবং কাছাকাছি যে সব ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল তাদের জিগ্যেস করে জানল যে, শিশু কৃষ্ণের পায়ের চাপেই এ সব ব্যাপার ঘটেছে। তাঁরা সেই শিশুটির শক্তি দেখে বিস্মিত হল। নন্দগোয়ালা, যশোদাও সেই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন। এদিকে বসুদেব গর্গমুনিকে গোকুলে

পাঠালেন। তাদের অজ্ঞাতসারেই গর্গ সেই শিশু দুটির সংস্কার সাধন করলেন। তিনি বড়টির নাম 'রাম' এবং ছোটটির নাম 'কৃষ্ণ' রাখেন। তারা দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগলেন। বিভিন্ন রকম দুঃসাহসী খেলায় তারা মেতে উঠতেন। কেউই তাদের নিবৃত্ত করতে পারত না। তাদের দৌরাত্ম্যে অসহিষ্ণু হয়ে মা যশোদা একবার কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন এবং সেই দড়ির প্রান্তভাগকে বাঁধলেন উদূখল পাত্রের সঙ্গে। তারপর তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন। কৃষ্ণ তখন সেই উদূখলকে টানতে টানতে কাছাকাছি এক অর্জুন গাছের গায়ে গিয়ে ঠেকিয়ে দিলেন; তারপর দুবার জোরে টানতেই সেই বিরাট গাছ ভেঙে পড়ে গেল। গাছ ভেঙে পড়ার শব্দে ব্রজবাসী জনগণ ছুটে এসে সমস্ত ব্যাপারটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। যশোদা তাকে দাম বা রজ্জু দিয়ে উদরে বেঁধেছিলেন বলে তার নাম হয় 'দামোদর'।

এদিকে নন্দ প্রভৃতি প্রবীণ গোয়ালারা অনেক ভেবেচিন্তে এ সব বিপদ এড়ানোর জন্যই বৃন্দাবনে চলে গেল। তারা গোকুল ছেড়ে যাওয়ায় ব্রজভূমি শূন্য এবং অসহনীয় হয়ে উঠল। ভগবান কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনকে গোগণের উপযুক্ত বৃদ্ধিস্থান হিসেবে ঠিক করেছিলেন। সেজন্যই গ্রীষ্মকালেও বৃন্দাবনে বর্ষাকালের মতোই প্রচুর সবুজ তৃণ জন্মাত। নন্দ প্রভৃতি গোয়ালারা সেখানে অর্ধচন্দ্রের আকারে বাস করলেন। গোসমূহের পালক হলেন রাম ও দামোদর। তারা ময়ূরপুচ্ছ মাথায় পরতেন বুনো ফুল দিয়ে কানের অলংকার তৈরি করতেন। গোয়ালাদের মতোই বাঁশী বাজাতেন। এভাবে বৃন্দাবনে তাদের সাত সাতটা বছর কেটে গেল। পরে বর্ষাকাল এলো। মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ, প্রবল বারিবর্ষণ হতে লাগল; শ্যামল তৃণরাজিতে শোভিত হতে লাগল চারিদিক। নদীর জলরাশি নবসম্পদলাভে দুর্বিনীতদের মনের মতো উন্মার্গগামী হয়ে বইতে লাগল। রাম ও কৃষ্ণ সমবয়স্ক গোপবালকদের সঙ্গে বৃন্দাবনে কাল কাটাতে লাগলেন।

—বালচরিতে 'বৃন্দাবন প্রবেশবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো পঁচাশি

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—একবার কৃষ্ণ একাই বৃন্দাবন প্রান্তস্থিত কালিন্দী নদীর তীরে যান। তরঙ্গসমাকুল সেই কালিন্দী নদীর পাশে তিনি একটি বিরাট হ্রদ দেখতে পেলেন। ওই হ্রদে কালিয়নাগ তার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে বাস করত। কৃষ্ণ দেখলেন সেই কালিয়নাগের তীব্র বিষে দূষিত হয়েছে কালিন্দী তথা যমুনার জল। তাই মানুষের ও গবাদি পশুসমূহের কোন কাজেই তা আসে না। তিনি তখন ঠিক করলেন যে জনগণের অপকারী সেই নাগকে তিনি বধ করবেন। এ রকম চিন্তা করে ওই হ্রদের তীরস্থ কদম গাছে উঠে তিনি হ্রদের জলে লাফ দিলেন। কালিয়-নাগের বিষে বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল ওই হ্রদের জল। কৃষ্ণ সেই জলে লাফ দিয়ে পড়ায় তার জল এমনই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যে তীরস্থ গাছেও সেই জল ছিটকে পড়ল। বিষাক্ত জলের স্পর্শে গাছের সবুজ পাতাগুলো পর্যন্ত কুঁকড়ে গেল। তিনি জলে পড়েই হাত দিয়ে সেই হ্রদের জলকে আলোড়িত করতে লাগলেন। স্বয়ং কালিয়নাগ এবং অন্যান্য তীব্র বিষধর নাগরা সেই শব্দ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সেখানে এসে পেঁছিল এবং কৃষ্ণকে চার-দিক থেকে ঘিরে ধরে ছোবল মারতে লাগল। হ্রদের কাছাকাছি যে গোয়ালারা ছিল তারা

কৃষ্ণকে ওই অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে ব্রজের সবাইকে সে-কথা জানাল। নন্দ, যশোদা এবং অন্যান্য গোয়ালা এবং গয়লানীরা সে-কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে ওই হ্রদের কাছে এসে কৃষ্ণকে ওই বিপন্ন অবস্থায় দেখল। গোপনারীরা ভীত এবং বিহ্বল হয়ে কৃষ্ণকে বলল —যশোদার সঙ্গে আমরা সবাই এই হ্রদে প্রবেশ করব। ব্রজে ফিরে গিয়ে আর কি হবে? সূর্য বিনা দিবসের কি মূল্য? চন্দ্র ছাড়া রাত্রিরই বা মূল্য কি? দুগ্ধ বিনা গাভীরই কি প্রয়োজনীয়তা? আর কৃষ্ণ ভিন্ন ব্রজেরই শোভা কি? বলরাম শোককাতর গোপ এবং গোপরমণীদের সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—হে জগতের নাথ, তুমি এ কি মানুষ-ভাব ব্যক্ত করছ? নিজেকে কি তুমি চিনতে পারছ না? তুমিই যে মানুষের আশ্রয়-স্থল, ত্রিভুবনের কর্তা। এই গোপ এবং গোপীরাই এই অবতারে আমাদের বন্ধু এবং আত্মীয়। এদের তুমি দুঃখ দিচ্ছ কেন? তুমি ওই কালিয়নাগকে নিহত করে এদের আশ্বস্ত কর।

বলরামের উৎসাহব্যঞ্জক বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের যেন মোহভঙ্গ হল। তিনি তৎক্ষণাৎ কালিয়ের ভীষণ ফণাকে দু'হাতে নামিয়ে এনে তার মাথায় চেপে বসলেন। তারপর সেই ভীষণ বিষধর নাগের ফণার উপর দাঁড়িয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। কৃষ্ণের পায়ের চাপে কালিয়নাগের ফণা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল এবং সে হ্রদের জলে পড়ে গিয়ে রক্তবমি করতে লাগল। কালিয়নাগকে ওই অবস্থায় দেখে নাগপত্নীরা ভীত হয়ে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—অচিন্ত্য যে পরম জ্যোতি, তুমি তারই অংশ। তুমিই পরমেশ্বর; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমাত্মক এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড, যাঁর অতি অল্প অংশ মাত্র সেই বিরাট পুরুষকে আমরা কি করে স্তব করব? আমরা অসহায়, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমাদের স্বামী এই কালিয়নাগের প্রাণ তুমি ভিক্ষা দাও। সেই কালিয়নাগও তখন অবসন্ন দেহে কৃষ্ণকে বলল—তুমি জগতের প্রভু, পর, পরেরও আদি, পরমপুরুষ এবং পরমপুরুষ থেকেও পরম। তোমাকে আমি কি ভাবে স্তব করব? আমার এই আচরণ আমার জাতিরই অনুরূপ। তুমি আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করেছ, তাই আমি পালন করেছি মাত্র। আমি যদি অন্য রকম আচরণ করতাম, তবে আমাকে শাস্তি দেওয়া তোমার পক্ষে অন্যায় কাজ হত না। তবু তুমি যখন এই দণ্ডই আমাকে দিয়েছ, তখন মাথা পেতে আমি তা গ্রহণ করছি। আমি হতবীর্য হয়ে পড়েছি, তুমি আমাকে প্রাণে মেরো না, দয়া কর আমায়।

নাগপত্নীদের এবং কালিয়নাগের কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণের হৃদয় দ্রবীভূত হল। তিনি কালিয়কে বললেন—তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের নিয়ে সমুদ্রসলিলে যাও। এই নদীতে থেকো না। সমুদ্রে থাকলেও গরুড় বা অন্য কেউই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না; কারণ, তোমার মাথায় রয়েছে আমার পদচিহ্ন। কৃষ্ণের কথা মেনে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন সহ সেই কালিয়নাগ সমুদ্রে চলে গেল। গোপগণ কৃষ্ণকে তখন অভিষিক্ত করল; কেউ কেউ আবার আনন্দবিহ্বল হয়ে কৃষ্ণকে স্তব করতে লাগল।

—বালচরিতে 'কালিয়দমন নিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : একশো ছিয়াশি

কৃষ্ণকথা বর্ণনা করতে করতে ব্যাস বললেন—একবার গোচারণ করতে করতে রাম ও কৃষ্ণ রমণীয় এক তালবনে গিয়ে পৌঁছলেন; সেখানে মানুষ এবং গোমাংস আহারকারী

একটি অসুর বাস করত। তার নাম ধেনুক। ফল-সম্পদে সমৃদ্ধ সেই তালবন দেখে গোপবালকগণ বলরাম ও কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলল—এই স্থান ধেনুক সর্বদাই রক্ষা করে বলে সাধারণ মানুষ ভয়ে এখানে আসে না। কিন্তু পাকা তালফলের সুগন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে রয়েছে। আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে তালগুলো গাছ থেকে পেড়ে ফেলি। কিন্তু ধেনুকের ভয়ে ইচ্ছে থাকলেও তা করতে পারছি না। তোমরা যদি আমাদের জন্য সেই ফল এনে দিতে পারো, তো খুব ভালো হয়। গোপবালকদের কথা শুনে বলরাম ও কৃষ্ণ সেই পাকা তাল গাছ থেকে পাড়তে লাগলেন। তাল পড়ার শব্দ শুনে ধেনুক তার অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে এলো। এসেই সে বলরাম ও কৃষ্ণকে আঘাত করল; তাঁরা দুজনও সঙ্গে সঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর অসুরকে প্রত্যাঘাত করলেন। কৃষ্ণ তাকে ধরে আকাশে ঘোরাতে ঘোরাতে একটা তালগাছের উপরে ছুড়ে দিলেন। ধেনুক সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। গাছ থেকে সে যখন মাটিতে পড়ল, তখন গাছ থেকে অনেক তাল মাটিতে পড়ে গেল। ধেনুকের অনুচরদেরও তাঁরা মেরে ফেললেন। সেই অসুর নিহত হওয়ায় গো-গণ নিঃশঙ্ক চিত্তে সেখানে বিচরণ করতে লাগল।

—বালচরিতে 'ধেনুকবধবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো সাতাশি

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বললেন—ধেনুকাসুরকে মেরে ফেলার পর সেই তালবন গোপগোপীদের রমণীয় বিচরণস্থান হয়ে উঠল। বলরাম এবং কৃষ্ণ নানা রকম বাল-সুলভ খেলায় মেতে উঠলেন। প্রলম্ব নামে এক দানব তাঁদেরকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে মানুষের মূর্তি ধারণ করে গোপবেশে গোপবালকদের সঙ্গে খেলতে লাগল। হরিণাক্রীড়নক নামে একটি খেলায় সমস্ত গোপবালকগণ একবার মেতে উঠল। খেলার নিয়ম অনুযায়ী দুজন দুজন করে দৌড়তে লাগল; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের সঙ্গে, বলরাম প্রলম্বের সঙ্গে এবং অন্য গোপবালকেরাও পরস্পরের সঙ্গে এভাবে দৌড়তে লাগলেন। তাতে কৃষ্ণ শ্রীদামকে এবং বলরাম প্রলম্বকে পরাজিত করলেন। চুক্তিমতো পরাজিত পক্ষ বিজয়ীদের ভাণ্ডীর বন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল। প্রলম্ব বলরামকে পিঠে নিয়ে সেই ভাণ্ডীর বন অতিক্রম করে অনেকটা পথ অতিক্রম করল। তারপর ক্রমেই সে নিজেকে বড় করতে লাগল। বলরাম দেখলেন যে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠছে সেই প্রলম্ব, তার পায়ের চাপে মাটি কাঁপছে। তিনি তখন কৃষ্ণকে তাঁর করণীয় বিষয়ে জিগ্যেস করলেন। কৃষ্ণ বলরামকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—পুরাকালে একার্ণবে তুমি এবং আমি এক এবং কারণমাত্রই ছিলাম; পৃথিবীর প্রার্থনায় জগতের মঙ্গলের জন্য ভিন্নরূপে আমরা রয়েছি। মনুষ্যরূপে থেকেই তুমি দানবকে নিহত কর। কৃষ্ণের কথা শুনে বলরামের যেন মোহভঙ্গ হল। তিনি সেই প্রলম্বাসুরের মাথায় সজোরে এক আঘাত করলেন। তাতে সেই বলবান অসুরের মাথা ভেঙে গেল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো এবং রক্তবমি করতে করতে সে মারা গেল। প্রলম্বাসুরের মৃত্যুতে ব্রজবাসীরা খুবই সন্তুষ্ট হল।

এদিকে বর্ষাকাল অতীত হল। শরৎকালের আবির্ভাবে সরোবরে ফুটে উঠল অজস্র পদ্মফুল। রাতের আকাশ জোৎস্নালোকে হয়ে উঠল রমণীয়। ব্রজবাসীরা ইন্দ্রোৎসবের আয়োজনে মেতে উঠল। কৃষ্ণ গোপবৃদ্ধদের জিগ্যেস করলেন—তোমাদের এই ইন্দ্রোৎসবের

তাৎপর্য কি ? এর জন্য তোমাদের এত আনন্দই বা কেন ? পিতা নন্দ প্রীতিস্নিগ্ধ বাক্যে কৃষ্ণকে বললেন- দেবরাজ ইন্দ্র মেঘ ও বৃষ্টির অধিপতি। তাঁরই আদেশ অনুসারে মেঘগণ বারিবর্ষণ করে। সেই বৃষ্টির ফলে শস্য জন্মায়, তাতে আমরা আমাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকি ; দেবতাদেরও তৃপ্তিসাধন করি। সেই শস্য ভক্ষণ করে গাভী হয় দুগ্ধবতী। বৃষ্টি হলেই দেশে অভাব-অনটন থাকে না। এ জন্যই পৃথিবীবাসী জনগণ বর্ষাকালে দেবরাজ ইন্দ্রের অর্চনা করেন। নন্দের কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন–দেখুন, আমরা কৃষিকর্মী নই, বাণিজ্যও আমাদের জীবিকা নয়। গোগণই আমাদের দেবতা ; কারণ, আমরা বনচর। আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি–বিদ্যা এই চার প্রকার। তার মধ্যে বার্তার কথা বলছি। কৃষি, বাণিজ্য এবং পশুপালন–এই তিনটি বৃত্তি বার্তাকে আশ্রয় করে থাকে। কৃষকদের বৃত্তি কৃষি, পণ্যজীবীদের পণ্যই বৃত্তি এবং গোসমূহই আমাদের বৃত্তি। যে যে বিদ্যায় যুক্ত, তাই তার কাছে মহান দেবতাস্বরূপ। সুতরাং তাঁকেই তার পুজো করা উচিত। যে ব্যক্তি একের ফল ভোগ করে অপরের পুজো করে, কখনোই তার মঙ্গল হয় না। অতএব এই বিস্তৃত সীমা, সীমান্ত বন ও বনান্ত পর্বতসমূহের পুজো করুন। এ জন্য গিরিযজ্ঞ এবং গোযজ্ঞ প্রবর্তিত হোক। গোরু এবং পর্বতই আমাদের দেবতা, ইন্দ্রের পুজোয় আমাদের কাজ কি ? তাই বলি, সমস্ত গোপদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে গোবর্ধন পর্বতের পুজো করুন। ব্রাহ্মণ এবং প্রার্থীদের উত্তমরূপে ভোজন করানো হোক। যজ্ঞ শেষ হলে পর গোসমূহ সেই অর্চিত পর্বতে যাক–এই আমার অভিমত। যদি আপনাদের এতে সম্মতি থাকে তবে তাই করুন।

কৃষ্ণের প্রস্তাবকে সমস্ত ব্রজবাসী একবাক্যে সাধুবাদ জানাল। তারপর ব্রজবাসীরা দই, পায়স, মাংস প্রভৃতি দিয়ে শৈলবলি প্রদান করল, অনেক ব্রাহ্মণকে খাওয়াল। সবশেষে গোসমূহ সেই পর্বতকে প্রদক্ষিণ করল। কৃষ্ণ গোবর্ধনরূপে নিজেই সেই পুজো গ্রহণ করলেন এবং একই সময়ে গোপদের সঙ্গে গোবর্ধনের পুজোও করলেন। শ্রীভগবানের লীলাই বিচিত্র। পরে গোবর্ধন-উৎসব শেষ করে ব্রজবাসীরা গোষ্ঠেই ফিরে এলো।

–'গোবর্ধনগিরিযজ্ঞপ্রবর্তন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ একশো অষ্টআশি

এদিকে ইন্দ্রোৎসবের অনুষ্ঠান না হওয়ায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে সংবর্তক নামক মেঘদের আদেশ দিলেন যে, তারা যেন গোপদের গোসমূহকে বর্ষার দ্বারা পীড়িত করে। তিনি তাদের এ আশ্বাসও দিলেন যে, তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করবেন। ইন্দ্রের আদেশে মেঘেরা তখন প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ করল। সেই বেগবান বর্ষাপাতে পীড়িত গোগণ কাঁপতে কাঁপতে অনেকেই প্রাণত্যাগ করল। গোসমূহের এই দুর্দশা দেখে কৃষ্ণ তাদের রক্ষার জন্য গোবর্ধন পর্বতকে উৎপাটিত করে এক হাতে ধরে থাকলেন। তাতে গোষ্ঠের উপর ছায়া রচিত হল। কৃষ্ণের আহ্বানে গোপবাসীগণ গোসমূহকে সঙ্গে নিয়ে সেই গোবর্ধন পর্বতের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করল। সুতরাং বৃষ্টি তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারল না। সংবর্তক মেঘসমূহ গোষ্ঠে সাতদিন ধরে মুষলধারে বারিবর্ষণ করেছিল। কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ধরে থাকায় ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। বৃষ্টি থেমে গেল, ব্রজবাসীরাও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে আশ্বস্ত হল।

এদিকে কৃষ্ণের এই বিস্ময়জনক কর্মে আনন্দিত হয়ে ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে কৃষ্ণের দর্শনকামনায় গোবর্ধন পর্বতে এলেন। তিনি কৃষ্ণকে গোপকুমারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখলেন ; দেখলেন যে গরুড় তার পাখা মেলে ছায়া দান করছে কৃষ্ণকে। ইন্দ্র কৃষ্ণর কাছে গিয়ে তাঁকে একান্তে ডেকে বললেন—আমি যে কাজের জন্য তোমার কাছে এসেছি, তা শোন। আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। পৃথিবীর ভার অবতরণের জন্য তুমি গোপবেশে কাল অতিবাহিত করছ। আমার উৎসব অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে আমি গোকুল বিনাশের জন্য মেঘদের পাঠিয়েছিলাম। তারা অত্যাচার করেছে ; তুমি আবার তাদের অত্যাচার থেকে গোসমূহকে রক্ষা করেছ। গোগণ তোমার এই কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছে। তারাই আমাকে তোমার কাছে পাঠাল। তাদেরই কথানুসারে আমি তোমাকে উপেন্দ্রত্বে এবং গোগণের ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করব। তুমি 'গোবিন্দ' নামে পরিচিত হবে। এ কথা বলেই ইন্দ্র ঐরাবত থেকে ঘণ্টা ও জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করে তা দিয়ে কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করলেন। কৃষ্ণ অভিষিক্ত হবার পর গাভীরা দুগ্ধক্ষরণ করে তখনই পৃথিবীকে সিক্ত করল। কৃষ্ণকে এভাবে অভিষিক্ত করে ইন্দ্র বললেন—এ তো আমি গোগণের অনুরোধে করলাম। আরেকটা কথা তোমায় বলছি, শোন। পৃথিবীতে আমার অংশ অর্জুনরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। তুমি তাকে তোমার আত্মার মতোই রক্ষা করো। ইন্দ্রের কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—ভারতবংশে তোমার অংশে উৎপন্ন পার্থকে আমি জানি। সে যত দিন পৃথিবীতে থাকবে, তত দিন তাকে আমি রক্ষা করব। আমি যত দিন বেঁচে থাকব, কোন শক্তিই তাকে পরাজিত করতে পারবে না। কংস, অরিষ্ট, কেশী, কুবলয়াপীড় ও নরকাসুর প্রভৃতি দৈত্যেরা নিহত হলে একটি মহাযুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধেই পৃথিবীর ভার অবতরণ করা হবে। সুতরাং অর্জুনের জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি সেই ভারতযুদ্ধ শেষ হলে পর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবকে অক্ষতদেহে কুন্তীর হাতে সমর্পণ করব। কৃষ্ণের কথা শুনে ইন্দ্র তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। তারপর ঐরাবতে চড়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণও গোবর্ধন পর্বত থেকে ব্রজধামে ফিরে এলেন।

—বালচরিতে 'গোবিন্দের অভিষেকবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : একশো উননব্বই

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—কৃষ্ণের গোবর্ধন গিরি ধারণ, কালিয়দমন প্রভৃতি বিস্ময়জনক কর্ম দেখে গোপগণ কৃষ্ণকে বলল—দেখ কৃষ্ণ, তোমার এ সব বিস্ময়কর কর্ম দেখে তোমাকে আমরা সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে পারছি না। তুমি মনে হয় সাধারণ মানুষ নও। তুমি দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব যেই হও না কেন, সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নেই। তুমি আমাদের বন্ধু, তোমাকে আমাদের নমস্কার। আসলে আমাদের অযোগ্য কুলে তোমার জন্মটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। গোপগণের কথা শুনে কৃষ্ণ খানিক-ক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার জন্য যদি তোমাদের লজ্জা না হয়, কিংবা আমি যদি সম্মানীয় হই তোমাদের কাছে, তবে আমি কে সে বিষয়ে তোমাদের কি প্রয়োজন? আমি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ কিংবা দানব কিছুই নই। আমি তোমাদের বন্ধু, তোমাদেরই আত্মীয়। গোপেরা সে কথা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর তারা বলরামের কাছে ওই একই জিজ্ঞাসা নিয়ে গেল।

এদিকে শরৎকালের প্রকৃতির মনবিমোহন রূপ দেখে কৃষ্ণ গোপরমণীদের সঙ্গে রতি ক্রীড়ায় মত্ত হতে চাইলেন। কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে রমণীদের প্রিয় গান করতে লাগলেন। সেই সঙ্গীতের মধুর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে গোপরমণীগণ নিজের নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করে যেখানে বসে কৃষ্ণ গান করছিলেন, সেখানে এসে উপস্থিত হল। কেউ কেউ সেই গানের সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল ; কেউ কেউ আবার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কৃষ্ণের পাশে গিয়ে বসল। সমাগত গোপরমণীদের সঙ্গে কৃষ্ণ সেই রাত্রি ভালো ভাবেই কাটালেন। একবার কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে গোপরমণীরা বৃন্দাবনের সর্বত্র তাঁকে খুঁজল। তাঁকে না পেয়ে তারা ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কোথাও তাঁকে না পেয়ে তারা যমুনার তীরে গিয়ে তাঁরই চরিতকথা গান করতে লাগল। তারপর দেখল যে কৃষ্ণ আসছেন। তখন তারা আনন্দিত হয়ে তাঁকে চারদিকে ঘিরে ফেলল। কেউ কেউ তাঁকে দেখে চোখ বুজে তাঁর রূপ ধ্যান করতে লাগল ; কেউ বা তাঁর পাশে গিয়ে তাঁর হাতে হাত রাখল। গোপীরা রাসমণ্ডলে মিলিত হয়েও এক জায়গায় স্থির থাকতে পারল না ; এভাবে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনেক দিন সুখে অতিবাহিত করলেন। তাঁর অদর্শনে গোপীদের এক মুহূর্তও কাটতে চাইত না। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা গোপীরা কারুর কোন নিষেধই শুনত না। তারা প্রত্যেক রাত্রেই কৃষ্ণের সঙ্গে সহবাস করত। কৃষ্ণ আত্মস্বরূপে গোপীগণে অবস্থান করে নিজেরই সঙ্গে নিজে রতিক্রিয়ায় মগ্ন ছিলেন। আকাশ, অগ্নি জল, পৃথিবী ও বায়ু—এরা যেমন সমস্ত প্রাণীতেই বিরাজ করে, সেই আত্মা কৃষ্ণও সেই ভাবেই সমস্ত প্রাণীতে অবস্থান করতেন। কৃষ্ণ যখন গোপীদের সঙ্গে রাসে আসক্ত ছিলেন তখন একদিন গভীর রাত্রে অরিষ্টাসুর বৃষবেশে বৃন্দাবনে এসে জনসাধারণের ভয় উৎপাদন করল। বৃষভরূপধারী সেই ভীষণাকার অসুর গাভীদের গর্ভ পাতন এবং সমস্ত প্রাণীর বিনাশ সাধন করত। তাকে দেখে গোপরমণীরা ভীত হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করল। কৃষ্ণ তখন এমন এক শব্দ করলেন যে সেই শব্দ শুনে অরিষ্টাসুর কৃষ্ণের কাছাকাছি গিয়ে তার শিঙ দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। যখনই সে কৃষ্ণের নাগালের মধ্যে এলো তখনই তিনি সেই অরিষ্টাসুরকে কুক্ষিদেশে জানু দিয়ে আঘাত করলেন। তারপর তারই একটি শিঙ ভেঙে নিয়ে তা দিয়েই তাকে আঘাত করলেন। তাতে মুখ দিয়ে রক্তবমি করতে করতে সেই বৃষরূপী অসুর মারা গেল। গোপেরা তখন অরিষ্টাসুরকে নিহত দেখে কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল।

—'অরিষ্টবধবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো নব্বই

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাসদেব বলে চললেন—কৃষ্ণ জন্মাবার পর পুতনা থেকে আরম্ভ করে অরিষ্টাসুরের নিধন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা এবং দেবকীর গর্ভ পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনাও নারদ কংসকে জানালেন। কংস সে-কথা শুনে প্রকাশ্য রাজসভাতেই বসুদেবকে এবং সমগ্র যদুকুলকে ধিক্কার দিল। তারপর ঠিক করল যে, যে কোন কৌশলে সেই কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করতেই হবে। মনে মনে তাঁদের হত্যার পরিকল্পনা করে সে অক্রূরকে বলল—তুমি এক কাজ কর। রথে চড়ে গোকুলে যাও। আমার বিনাশের জন্য বিষ্ণুর

অংশে উৎপন্ন বসুদেবের রাম ও কৃষ্ণ নামে দুই পুত্র সেখানে আছে। আগামী চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্মহ মহাযাগের আয়োজন করেছি আমি। তুমি সেদিন তাদের এখানে নিয়ে এসো। চাণূর এবং মুষ্টিক নামে আমার যে দুজন মল্লযোদ্ধা আছে, তারা বাহুযুদ্ধে অত্যন্ত পটু। কৃষ্ণ এবং বলরামকে চাণূর এবং মুষ্টিকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে তারা অবশ্যই পরাজিত হবে। তখন কুবলয়াপীড় নামে আমার যে হাতী আছে, তাকে দিয়েই কৃষ্ণ ও বলরামকে নিধন করব। তারপর বসুদেব, নন্দগোপ, পিতা উগ্রসেন এবং দুষ্ট গোপদের একে একে হত্যা করে আমার রাজ্যকে শত্রুমুক্ত এবং নিষ্কণ্টক করব। সুতরাং আমার হয়ে তুমি এই কাজটা করে দাও। আর গোপদের বলবে তারা যেন উপঢৌকন রূপে মহিষ দুধের তৈরি ঘি এবং দই নিয়ে আসে। কংসের কথামতো অক্রূর তখনই রথ নিয়ে মথুরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে কংসের প্রেরণায় বলবান কেশী দৈত্য কৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য বৃন্দাবনে অশ্বরূপে এসে হাজির হল। তার হ্রেষাশব্দে গোপাল এবং গোপীরা ভীত হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করল। কৃষ্ণ তাদের আশ্বস্ত করে সেই অশ্বরূপী দৈত্যকে বললেন—পুরাকালে পিণাকপাণি মহাদেব যেমন করে পূষার দাঁত উপড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি তোমার সব দাঁতই আমি ভেঙে ফেলব। তোমাকে সমুচিত শাস্তি দেব। এ কথা বলেই কৃষ্ণ তার দিকে এগিয়ে গেলেন। মদোদ্ধত কেশী দৈত্যও মুখ হাঁ করে কৃষ্ণকে গিলে ফেলবার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। কৃষ্ণ তার মুখে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁতগুলো ভেঙে ফেললেন। ফলে রক্তবমি করে হতবীর্য হয়ে সেই বলবান অসুর মাটিতে পড়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল। কেশী দৈত্যকে নিহত হতে দেখে গোপগোপীরা আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। নারদ আকাশমার্গে থেকে সমস্ত ঘটনা দেখলেন এবং কৃষ্ণের কাছে এসে তাঁকে বললেন—স্বর্গবাসীদেরও ক্লেশ উৎপাদনকারী এই কেশি দৈত্যকে তুমি হত্যা করেছ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। এই অবতারে তুমি যে সব উত্তম কর্ম করলে, তাতে তোমার কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই কেশী দৈত্যকে হত্যা করার জন্য তুমি জগতে 'কেশব' নামে পরিচিত হবে। তোমার মঙ্গল হোক। এখন আমি যাই। তোমার আরো যে সব কাজ বাকি আছে, সে-সব দেখতে আবার আসব। নারদ চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণ গোপগোপীদের সঙ্গে আবার গোকুলে ফিরে গেলেন।

—কৃষ্ণবালচরিতে 'কেশিবধনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : একশো একানব্বই

কংসের আদেশমতো অক্রূর নন্দ গোকুলে গিয়ে পেঁছিলেন। পথে যেতে যেতে তিনি এ রকম চিন্তা করতে লাগলেন, পৃথিবীতে আমার চেয়ে ধন্য ব্যক্তি আর কে আছে? বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ সেই কৃষ্ণ ও বলরামকে আমি দেখব। তাঁর নাম স্মরণ করলেই মানুষের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়, তিনিই অখিল বেদবেদাঙ্গের স্রষ্টা, তিনিই মহাপুরুষরূপে পূজিত হন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র অশ্বিনীকুমার, বসু, আদিত্য ও মরুৎগণ পর্যন্ত তাঁর স্বরূপ জানেন না, তিনি সর্বত্রগামী, সর্বাত্মা, সর্বরূপী, সমস্ত প্রাণীতে সংস্থিত এবং অব্যয়; তিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতাররূপে বিরাজ করেন, সম্প্রতি তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করে ব্রজে অবস্থান করছেন। পিতা, বন্ধু, সুহৃদ, মাতা অন্যান্য

পরিজনসহ এই চরাচর বিশ্ব যাঁর মায়াকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয় না, তাঁকে আমার নমস্কার জানাই। মানুষ যাঁকে হৃদয়ে ধারণ করে অবিদ্যা থেকে পরিত্রাণ পায়, সেই বিদ্যাত্মাকে আমি নমস্কার করি। যাজ্ঞিকগণ যাঁকে যজ্ঞপুরুষ নামে অভিহিত করেন, সাত্ত্বতগণ যাঁকে বাসুদেব নামে ডাকেন এবং বেদান্তবিদ জনগণ যাঁকে বিষ্ণু নামে অভিহিত করেন, তাঁকে আমি নমস্কার করি। যাঁকে স্মরণ করলেই মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ হরিকে আমি নমস্কার করি। বিষ্ণুর চিন্তায় তদ্‌গতচিত্ত অক্রুর সূর্যাস্তের খানিকক্ষণ আগে গোকুলে এসে পেঁছিলেন। গোপবালকদের মধ্যে থেকে স্বতন্ত্ররূপে সেই শ্রীকৃষ্ণকে সহজেই অক্রুর চিনতে পারলেন। প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মতো তাঁর গায়ের রঙ, শ্বেতপদ্মের মতো তাঁর চোখ, বুকে আঁকা রয়েছে শ্রীবৎসের পদচিহ্ন এবং পরনে রয়েছে পীতবস্ত্র। তাঁর পাশে শুভ্রকান্তি এবং নীলবসন পরিহিত বলরামকেও তিনি দেখতে পেলেন। তাঁদের দুজনকে দেখে অক্রুরের মনে এ রকম চিন্তার উদয় হল যে, তিনি কি তাঁদের স্পর্শসুখলাভ থেকে বঞ্চিত হবেন? তিনি ভাবলেন, যাঁর আঙুলের স্পর্শমাত্রেই মানুষের জন্ম জন্ম সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয় তিনি কি আমাকে স্পর্শ করবেন না? তিনি তো অনেককেই স্পর্শ দান করে ধন্য করেছেন, তবে আমার কি অপরাধ? অথবা এ রকম চিন্তা করাই ঠিক নয়। যিনি জ্ঞানাত্মক, সতত অব্যক্ত এবং সমস্ত সত্ত্বগুণের আধার, জগতের সকল প্রাণীর হৃদগত ভাব তাঁর কাছে কি অজ্ঞাত থাকে। সুতরাং সমস্ত চিন্তা বাদ দিয়ে সেই বিশ্বেশ্বরের শরণ নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তিনি কৃষ্ণকে তখন সমস্ত কথা খুলে বলার জন্য তাঁর কাছে গেলেন।

—কৃষ্ণক্রীড়ায় 'অক্রুরের আগমনবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : একশো বিরানব্বই

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—কৃষ্ণের কাছে গিয়ে অক্রুর তাঁর পরিচয় দিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ দুজনেই তখন অক্রুরকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। অক্রুর তাঁদের কাছ থেকে যথোচিত আতিথ্য লাভ করার পর সমস্ত কথা কৃষ্ণকে খুলে বললেন। অক্রুরের কাছ থেকে সমস্ত শোনার পর কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—দানপতি অক্রুর, সমস্ত কথাই আমি জানি। আগামী কাল আমি ও দাদা বলরাম তোমার সঙ্গে মথুরা যাব এবং তিন রাত্রির মধ্যেই আমি কংসকে হত্যা করব—এ কথা তোমায় আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি। গোপবৃদ্ধেরা কংসের আদেশমতো নানাবিধ উপঢৌকন নিয়ে যাবে। কৃষ্ণের কথা শুনে ধর্মপ্রাণ অক্রুর আশ্বস্ত হলেন। তিনি তারপর গোপবাসীদের রাজাদেশ জানিয়ে দিয়ে নন্দগোপের বাড়িতেই কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে রাত কাটালেন। পরের দিন ভোরবেলা কৃষ্ণ, বলরাম ও অক্রুর মথুরায় যাওয়ার আয়োজন করতে লাগলেন। কৃষ্ণকে গমনোদ্যত দেখে গোপীরা লজ্জা, সম্ভ্রম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে গুরুজনদের সামনেই করুণভাবে বিলাপ করতে লাগল। কৃষ্ণবিরহে তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তাদের আশংকার কারণ একটাই যে, কৃষ্ণ মথুরায় গেলে সুশিক্ষিত এবং সুবেশা নাগরিকাদের সঙ্গ লাভ করতে পারবেন, তারপর আবার কি তিনি ব্রজধামে ফিরে আসবেন? মথুরার নাগরিকাদের তুলনায় ব্রজগোপীরা তো কামকলায় কম পটু। তারা অক্রুরকে, নন্দগোপ প্রমুখদেরও নিন্দা করতে লাগল; কারণ, কেউই কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় যেতে নিষেধ করছে না। তারা

মথুরাবাসিনী রমণীদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করতে লাগল ; কারণ কৃষ্ণের মুখপদ্মমধু চুম্বন করার সৌভাগ্য তারা অর্জন করতে পারবে। গোপরমণীদের চোখের জলের পথ বেয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজভূভাগ পরিত্যাগ করে মথুরায় যাত্রা করলেন।

মধ্যাহ্নের সময় তাঁরা যমুনা নদীর তীরে এক স্থানে এসে পেঁছিলেন। অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে নদীর জলে আহ্নিক এবং পূজা করতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি যমুনাজলে স্নান এবং আচমন করে পরব্রহ্মের ধ্যান করতে লাগলেন। তিনি জলের মধ্যে বলরামকে দেখতে পেলেন ; তাঁর পরনে রয়েছে নীলবসন, তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে বাসুকি, রম্ভা প্রভৃতি বিখ্যাত নাগগণ। তাঁরই কোলে বসে রয়েছেন কৃষ্ণ ; নীল মেঘের মতো তাঁর গায়ের রঙ, পদ্মের মতো আয়ত তাঁর চোখ, পরিধানে পীতবসন। সেই কৃষ্ণ ও বলরামকে হৃদয়ে ধ্যান করছেন সনন্দন মুনিগণ। এই দৃশ্য দেখে অক্রূর যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হলেন। জল থেকে উঠে এসেও অক্রূর দেখলেন যে রথের উপর মানুষরূপে বলরাম ও কৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন। জগৎপতি কৃষ্ণের মহিমায় রুদ্ধবাক অক্রূর সেই পরমেশ্বর অচ্যুতকে স্তব করতে লাগলেন। তিনি বললেন—তন্মাত্ররূপী, সর্বব্যাপী অনেকস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি। তিনিই শব্দস্বরূপ, প্রকৃতির পরবর্তী বিজ্ঞানরূপী ঈশ্বর। তুমি এক হয়েও সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান কর ; তুমি ইন্দ্রিয়রূপেও রয়েছ। ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা, প্রধানাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে তুমি অবস্থান কর। তোমার স্বরূপ, প্রয়োজন এবং অভিধান—কোন কিছুই বর্ণনীয় নয়। যাতে নাম, রূপ প্রভৃতি কল্পনাও করা যায় না, তুমি সেই নিত্য, অবিকারী, অজ, পরম ব্রহ্ম, যেহেতু সমস্ত পদার্থেরই কল্পনা ছাড়া জ্ঞান হতে পারে না। সেজন্যই লোকে তোমাকে কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকে। সমস্ত বিশ্ব-চরাচর ব্যেপে তুমি বিরাজ কর। এক তুমি বিভিন্ন রূপে এবং নামে বিভিন্ন দেবতারূপে চিহ্নিত হয়ে থাক। কিরণরূপী তুমি বিশ্বের সৃজন ও পালন করে থাক। এই গুণময় বিশ্বও তোমারই মায়ামাত্র। 'সৎ' এই যে বাচক অক্ষর, এইটাই তোমার পরম রূপ, সদসৎ জ্ঞানাত্মা সেই তোমাকে আমি প্রণাম করি। 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্রে তোমাকে আমি প্রণাম জানাই। বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকেও নমস্কার জানাই।

এভাবে কৃষ্ণকে স্তব করে অনেকক্ষণ ধ্যানে মনোনিবেশ করলেন অক্রূর। তারপর তীরে উঠে এসে দেখলেন যে কৃষ্ণ ও বলরাম আগের মতোই রথের উপর বসে রয়েছেন। অক্রূরকে বিস্মিত দেখে কৃষ্ণ তাঁকে জিগ্যেস করলেন—তোমাকে বিস্মিত দেখছি, যমুনার জলে তুমি কি এমন আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে এলে ? অক্রূর তার উত্তরে কৃষ্ণকে বললেন—জলের ভেতর যা দেখেছি, এখানেও তাই দেখছি। যাকগে, সে-সব কথা পরে হবে। চলুন, মথুরায় যাই। প্রভুর আদিষ্ট কাজ করি। যারা পরের অন্নের উপর বেঁচে থাকে তাদের জীবনে ধিক। তারপর দ্রুতবেগে রথচালনা করে সন্ধ্যার সময় তাঁরা মথুরায় এসে পেঁছিলেন। অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে বসুদেবের বাড়িতে যেতে বারণ করলেন ; কারণ, তাঁদের জন্যই বসুদেবকে কংসের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হচ্ছে। অক্রূর তারপর মথুরাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

এদিকে বলরাম ও কৃষ্ণ মথুরার রাজপথে বেড়াতে লাগলেন। মথুরার জনগণ তাঁদের বিস্মিতভাবে দেখতে লাগল। পথের দুধারে যত প্রাসাদ ও অট্টালিকা ছিল, সেগুলোর

বাতায়নে নরনারীরা কৃষ্ণ ও বলরামের অনিন্দ্যকান্তি আনন্দের সঙ্গে দেখতে লাগল। তাঁরা এভাবে ভ্রমণ করতে করতে এক ধোপাকে পথে দেখতে পেলেন। তার বিপণিও কাছেই ছিল। তাঁরা তার কাছে তাঁদের যোগ্য বস্ত্র চাইলেন; কারণ তাঁরা সাধারণ গোপগণের যোগ্য বসন পরিধান করে এসেছিলেন। ধোপা তো তাঁদের কাপড় দিলই না, পরন্তু তাদেরকে কংসের শত্রু ভেবে গালাগাল করতে লাগল। তাতে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মেরে ফেললেন। তারপর কৃষ্ণ পীতবসন এবং বলরাম নীলবসন পরিধান করে মালাকারের বাড়ি গেলেন। মালাকার তাঁদের দেখে ভাবল যে এঁরা নিশ্চয়ই দেবতা, তা না হলে এমন দিব্যকান্তিবিশিষ্ট পুরুষ আর কে? তাঁরা মালাকারের কাছে ফুল চাইলেন। মালাকার তাঁদের প্রণাম করে তার কাছে যত উৎকৃষ্ট ফুল ছিল, সবই তাঁদের দিয়ে দিল। শুধু তাই নয় তারই প্রস্তুত করা উত্তম মালাও তাঁদের গলায় পরিয়ে দিল। কৃষ্ণ মালাকারের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এই বর প্রদান করলেন যে, সে কখনো দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করবে না। তার বংশও অক্ষয় হয়ে থাকবে। এবং দেহত্যাগ করার পর সে বিষ্ণুলোক লাভ করতে পারবে। মালাকারকে বর প্রদান করে কৃষ্ণ ও বলরাম তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার রাজপথে এলেন।

—'অক্রূরপ্রত্যাগমন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো তিরানব্বই

তারপর কৃষ্ণ দেখলেন যে অনুলেপন পাত্র হাতে করে নবযৌবনগর্বিতা এক কুব্জা রমণী আসছে। কাছাকাছি আসতেই কৃষ্ণ তাকে মধুর বচনে জিগ্যেস করলেন—হে সুন্দরী, তুমি কার জন্য এই অনুলেপন নিয়ে যাচ্ছ? কুব্জা কৃষ্ণের সুন্দরী সম্বোধনে বিগলিত হয়ে বলল—আমি কংসের অনুলেপন করে থাকি; আমার নাম নৈকবক্রা আমার অনুলেপন ছাড়া মহারাজ কংস আর কারুরই অনুলেপন গায়ে দেন না। কৃষ্ণ সে-কথা শুনে বললেন—এই সুগন্ধ অতি মনোরম এবং রাজযোগ্যও বটে। অতএব এগুলো আমাদের দাও, আমরা এই অনুলেপন মাখি। কুব্জা প্রীত হয়ে কৃষ্ণকে সেই অনুলেপন পাত্র দিয়ে দিল। কৃষ্ণ এবং বলরাম যথাযোগ্য ভাবে নিজেদের অনুলিপ্ত করলেন। তারপর কৃষ্ণ সেই কুব্জা রমণীকে শারীরিক চেষ্টায় স্বাভাবিক করে তুললেন। সে তখন কৃষ্ণকে তার বাড়ি যেতে অমন্ত্রণ জানাল।

তারপর রাজপথে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা কংসের ধনুঃশালায় গিয়ে হাজির হলেন। সেই যজ্ঞীয় শ্রেষ্ঠ ধনু কোথায় আছে জিগ্যেস করায় রক্ষীরা তা দেখিয়ে দিল। কৃষ্ণ সেই ধনু-কটিকে আকর্ষণ করে তাতে গুণসংযোগ করা মাত্রই প্রচণ্ড শব্দ করে তা ভেঙে গেল। সেই বিকট শব্দে সমগ্র মথুরাপুরী যেন কেঁপে উঠল। রাক্ষীরা তখন কৃষ্ণের কাজে বিরক্ত হয়ে তাঁদের আক্রমণ করলে, কৃষ্ণ তাদের নিহত করে সেখান থেকে চলে গেলেন। এদিকে কংস খবর পেল যে বলরাম ও কৃষ্ণ মথুরায় এসেছে। সে তখন তার মল্লযোদ্ধা চাণুর এবং মুষ্টিককে ডেকে বলল— দেখ, সেই গোপবালকদ্বয় এখানে এসেছে। তোমরা আমার সামনেই তাদের বাহুযুদ্ধে পরাজিত করে হত্যা কর—এটাই আমার কাম্য। তোমরা যদি তাদের মেরে ফেলতে পারো তবে তোমাদের ঈপ্সিত সমস্ত বস্তুই আমি দেব। কংস তারপর হস্তিপালককে ডেকে বলল—শোন, তুমি আমার সেই বিখ্যাত হাতি কুবলয়াপীড়কে

প্রাসাদের দ্বারদেশে রাখবে। যখন সেই গোপবালকদ্বয় মল্লযুদ্ধের জন্য রঙ্গদ্বারে আসবে, তখন কুবলয়াপীড় তাদের যেন আক্রমণে পর্যুদস্ত করে এ রকম ব্যবস্থা করবে। তারপর মল্লযুদ্ধের জন্য যে মঞ্চ তৈরি হচ্ছিল তা সমাপ্ত হয়েছে দেখে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কংস সকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

পরদিন সকালে কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে দুর্ধর্ষ অসুরদ্বয় চাণূর ও মুষ্টিকের মল্লযুদ্ধ দেখতে নগরবাসীরা দলে দলে সেখানে এসে উপস্থিত হল। বসুদেব, দেবকীও শেষবারের মতো পুত্রকে দেখবার জন্য জনগণের মাঝখানে এসে বসলেন। মল্লযুদ্ধের দোষ গুণ বিচারকগণ একপাশে বসলেন। নন্দ প্রমুখ গোপগণও সেই অসম মল্লযুদ্ধ দেখবার জন্য সমবেত হল। রঙ্গস্থলে চাণূর এবং মুষ্টিক এসে আস্ফালন করতে লাগল। এদিকে কৃষ্ণ এবং বলরাম দ্বারদেশে স্থিত ভয়ানক হস্তী কুবলয়াপীড়কে বধ করে তার দাঁত দুটো ভেঙে অস্ত্ররূপে পরিণত করলেন। তাই নিয়ে তাঁরা সমবেত জনগণকে দেখতে দেখতে সেই রঙ্গস্থলে এসে হাজির হলেন। সমবেত জনগণ কৃষ্ণ এবং বলরামকে দেখে যুগপৎ আনন্দিত এবং ভীত হয়ে পড়ল। চাণূর এবং মুষ্টিকের মতো প্রবল মল্লযোদ্ধাদের সঙ্গে এদের যুদ্ধ করতে হবে ভেবেই পুরবাসী জনগণ এবং নন্দগোপ প্রভৃতি ব্যক্তিগণও শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। অন্তঃপুরিকারা পরস্পর বলতে লাগল—যোগ্য বিচারক বৃদ্ধগণ কি এখানে নেই? যৌবনোন্মুখ সুকুমারতনু এই কৃষ্ণ কোথায় আর বজ্রের মতো কঠিন দেহবিশিষ্ট এই মহাসুরেরাই বা কোথায়? আমাদের ভাগ্যেও এই নিদারুণ অসম যুদ্ধ দেখার যোগ ছিল! পুরস্ত্রীগণ যখন এ রকম ভাবে দুঃখপ্রকাশ করছেন তখন কৃষ্ণ চাণূরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন; বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। মল্লযুদ্ধের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে কৃষ্ণ সেই চাণূরকে সম্মুখে আকর্ষণ করলেন, কখনো বা দূরে নিক্ষেপ করলেন, কখনো মাটিতে ফেলে দিলেন, কখনো মুষ্টি প্রহার করলেন, কখনো বজ্রের মতো কঠোর কীলের আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করলেন, ধীরে ধীরে চাণূর দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। কৃষ্ণ কিন্তু তাঁর সঙ্গে এমন ভাবে যুদ্ধ করছিলেন যে দেখে মনে হয় তিনি খেলা করছেন। কংস দেখল যে চাণূর ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে; তখন সে সমস্ত বাজনা থামিয়ে দিতে বলল এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। কৃষ্ণ এদিকে চাণূরের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। তাতে চাণূর প্রাণত্যাগ করল। তার রক্তে সেখানকার মাটি লাল হয়ে গেল। এদিকে বলরামও মুষ্টিকের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর তাকে মাটিতে ফেলে এমন চাপ দিলেন যে, তাতেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। পরে কৃষ্ণ মহাবলশালী মল্লরাজ তোষলককে বধ করলেন। তখন অন্যান্য মল্লযোদ্ধাগণ সেখান থেকে প্রাণটি হাতে করে নিয়ে পালিয়ে গেল।

চাণূর এবং মুষ্টিককে নিহত দেখে কংস ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠে সৈন্যসামন্তদের নির্দেশ দিলেন—তোমরা বলপূর্বক ওই দুটি গোপবালককে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। নন্দ এবং বসুদেবকে শেকল দিয়ে বাঁধো, আর যে গোপগণ কৃষ্ণ এবং বলরামকে উৎসাহিত করছে এদের যা কিছু আছে সব কেড়ে নাও। কংস যখন সৈন্যদের নির্দেশ দিচ্ছিল, তখন কৃষ্ণ লাফ দিয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। কংসের চুল ধরে টেনে তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনলেন। তারপর তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজে তার উপর চেপে বসলেন। কৃষ্ণের শরীরের চাপে কংস তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করল। কংসকে নিহত

দেখে 'সুনামা' নামে তার এক ভাই কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো। বলরাম তাকে অনায়াসেই নিহত করলেন। বলরাম এবং কৃষ্ণ তখন বসুদেব ও দেবকীর কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করলেন। তাঁরাও কীর্তিমান দুই পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। বসুদেব কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে বললেন--তুমি জগতের নাথ ; প্রসন্ন হও। তুমি যে আমার ঘরে এসে জন্মেছ, তাতেই আমার বংশ ধন্য হয়েছে। তুমি অখিল জগতের আধার। তুমিই যজ্ঞ, তুমিই যজমান ; আবার তোমাকেই যজ্ঞপুরুষ জ্ঞানে লোকে অর্চনা করে। তুমি সর্বভূতের কর্তা, তুমি অনাদিনিধন, আমার এই মনুষ্য জিহ্বা তোমাকে পুত্র রূপে সম্বোধন করবে কি ভাবে ? এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ যাঁতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে তিনি মনুষ্যের কাছ থেকে কি করে জন্মগ্রহণ করবেন ? এ সবই সম্ভব তোমার ঐশীশক্তির বলে। বিষ্ণুর অংশে অবতারপুরুষ রূপে তোমার জন্ম ; তুমি আমার পুত্র নও। কংসের কাছ থেকে ভীত হয়ে তোমাকে আমি গোকুলে রেখে এসেছিলাম। কিন্তু সেই অত্যাচারী কংসকে হত্যা করে তুমি জগতের কল্যাণ সাধন করলে। তোমার আশ্চর্যজনক কর্মসমূহ দেখে বুঝলাম যে তুমিই বিষ্ণু। পৃথিবীর উপকার সাধন করার জন্যই তোমার জন্ম ; আমার মোহভঙ্গ হয়েছে ; প্রকৃত তত্ত্ব আমি বুঝতে পেরেছি।

—বালচরিতে 'কংসবধকথন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো চুরানব্বই

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—দেবকী ও বসুদেব ভগবৎকর্ম দর্শনে জ্ঞান লাভ করেছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁদের এবং যাদবদের মোহসাধনের জন্য আবার তাঁর বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করলেন। তিনি বসুদেবকে বললেন--আপনাদের অনেক দিন পর দেখলাম। পিতা মাতার পূজা ছাড়া যে কাল অতিবাহিত হয়, সাধু ব্যক্তিদের পক্ষে তা ক্লেশকরই হয়ে থাকে। আমাদের মার্জনা করবেন। তারপর কৃষ্ণ এবং বলরাম দুজনেই গোপবৃদ্ধদের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। এদিকে কংস নিহত হওয়ায় তার পত্নীরা এবং মাতৃগণ দুঃখে বিলাপ করতে লাগল। কৃষ্ণ নিজে তাদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন। তারপর কংসের পিতা উগ্রসেনকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে কৃষ্ণ তাঁকেই মথুরার রাজা রূপে অভিষিক্ত করলেন। উগ্রসেন তখন কংস এবং অন্যান্য যারা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য করলেন। কৃষ্ণ উগ্রসেনকে বললেন–যদিও যযাতির অভিশাপে যদুবংশ রাজ্যার্হ নয়, তবু বায়ুর মাধ্যমে আমি ইন্দ্রের কাছে খবর পাঠাচ্ছি যাতে সে তার সুধর্মা নামক সিংহাসনটি দেয়। বায়ু কৃষ্ণের আদেশমতো ইন্দ্রকে সমস্ত কথা জানাল। ইন্দ্র সে-কথা শুনে তৎক্ষণাৎ সেই সুধর্মা নামক সিংহাসনটি বায়ুকে দিয়ে দিলেন। যদুবংশীয়গণ সেই সিংহাসন সুখে উপভোগ করতে লাগলেন।

তারপর কৃষ্ণ ও বলরাম অস্ত্রশিক্ষার জন্য অবন্তিপুরবাসী সান্দীপনি মুনির কাছে গেলেন। যদিও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে তাঁরা দক্ষ ছিলেন, তবু পৃথিবীকে তাঁদের মনুষ্যত্ব বিষয়ে অবহিত করার জন্যই এই সব কর্ম করতে লাগলেন। অতি অল্প দিনেই তাঁদের শস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হল। সান্দীপনি এতে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। যাই হোক, বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হলে পর তাঁরা গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। সান্দীপনি মুনির পুত্র লবণ সমুদ্রের তীরে প্রভাস তীর্থে মারা গিয়েছিল। মুনি তাকেই জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে

আনতে বললেন কৃষ্ণ ও বলরামকে। সেইটেই তাঁর গুরুদক্ষিণা। কৃষ্ণ ও বলরাম তখন লবণ সমুদ্রের তীরে এসে সমুদ্রকে বললেন–সান্দীপনি মুনির পুত্রকে ফিরিয়ে দাও। লবণ সমুদ্র তখন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁদের বললেন–দেখুন, আমাকে মার্জনা করবেন। আমি সান্দীপনি মুনির পুত্রকে হরণ করি নি। পঞ্চজন নামক শঙ্খরূপী দৈত্য সেই বালককে হরণ করেছে। তবে সে এই জলের অভ্যন্তরেই আছে। সমুদ্রের কথা শুনে কৃষ্ণ জলের মধ্যে প্রবেশ করে পঞ্চজনকে হত্যা করলেন এবং তার দেহের অস্থি থেকে জাত উৎকৃষ্ট শঙ্খ নিয়ে এলেন। সেই শঙ্খ পাঞ্চজন্য নামে বিখ্যাত। সেই শঙ্খের শব্দ শুনলে দৈত্যদের বলহানি হয়, দেবতাদের তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অধর্ম বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণ সেই শঙ্খ বাজিয়ে যমপুরীতে গেলেন এবং বৈবস্বত যমকে জয় করলেন। নরকে স্থিত সেই মুনিপুত্রকে অক্ষত শরীরে তার পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। তারপর তাঁরা মথুরাপুরীতে ফিরে এলেন।

—'কৃষ্ণচরিতবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো পঁচানব্বই

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন–কংস জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন; তাদের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। জরাসন্ধ ছিলেন মগধের বলশালী রাজা। কংসকে কৃষ্ণের হাতে নিহত দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচুর সৈন্য সহ মথুরা আক্রমণ করলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁর বিখ্যাত সুদর্শন চক্র, শার্ঙ্গ ধনু, অক্ষয় তূণীর এবং কৌমোদকী গদা-সহ এবং বলরাম সুনন্দ নামক মুষল নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। জরাসন্ধকে তাঁরা সহজেই পরাজিত করলেন। জরাসন্ধ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। কিছু দিন পর সৈন্য সংগ্রহ করে আবার তিনি মথুরা আক্রমণ করলেন। এবারও তিনি পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। এভাবে আঠারোবার তিনি কৃষ্ণ এবং বলরামের কাছে পরাজিত হলেন। কৃষ্ণ যে শত্রুদের প্রতি অস্ত্র ব্যবহার করতেন সে কেবল তাঁর লীলা মাত্র। যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি সংহার করেন, শত্রুজয়ে তাঁর আর নতুন করে উদ্যম গ্রহণের কি প্রয়োজন? তাহলেও তিনি লোকশিক্ষার জন্য মানুষের মতোই বলবানদের সঙ্গে সন্ধি এবং দুর্বলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি যেখানে যা প্রয়োজন, তিনি তাই ব্যবহার করতেন- এ সবই তাঁর মানুষী লীলা মাত্র।

—'কৃষ্ণচরিতবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো ছিয়ানব্বই

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন–একবার সভামধ্যে যাদবদের সমক্ষেই গার্গ্য মুনিকে তাঁর শ্যালক ক্লীব বলে সম্বোধন করেছিল। এতে সমস্ত যাদবই হেসে ওঠে। গার্গ্য যাদবদের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি তখন দক্ষিণাপথে গিয়ে পুত্রকামনায় মহাদেবের তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। লৌহচূর্ণমাত্র ভক্ষণ করে বারো বছর ধরে কঠোর সাধনা করার পর মহাদেব তাঁর আরাধনায় পরিতুষ্ট হন। যবনরাজ ছিলেন

অপুত্রক। গার্গ্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক ভাবে মিলিত হওয়ায় মহাদেবের বরে গার্গ্যের ঔরসেই যবনরাজের এক পুত্র হয়। তার গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ; যবনরাজ তার নাম রাখেন কালযবন। কালযবন যখন যুবক হয়ে উঠল, তখন যবনরাজ তাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে চলে যান। কালক্রমে কালযবন নারদের কাছ থেকে পৃথিবীর রাজাদের বিবরণ শোনার সময় যাদবদের কথা শুনলেন। তিনি তখন সৈন্য-সামন্তদের নিয়ে যাদবদের পরাজিত করার উদ্দেশ্য মথুরার দিকে রওনা হলেন। কালযবনের আগমনবার্তা কৃষ্ণের কানে এসে পৌঁছল। এদিকে মগধরাজ জরাসন্ধও পুনরায় মথুরা আক্রমণ করতে পারেন, এ রকম সম্ভাবনাও ছিল। কৃষ্ণ তাই ঠিক করলেন যে, তিনি এ রকম এক দুর্গ নির্মাণ করবেন যেখানে যাদবরা সুরক্ষিত থাকবে। তিনি যখন থাকবেন না তখনও যাদবরা যাতে বিপদাপন্ন না হয়, সেজন্য মহাসমুদ্রের কাছে বারো যোজন পরিমিত স্থান নিয়ে সুরক্ষিত দ্বারকাপুরী নির্মাণ করলেন। কালযবন যখন মথুরার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলেন, তখন কৃষ্ণ মথুরাবাসীদের সেই দ্বারকাপুরীতে এনে রাখলেন। মথুরা বাসীদের দ্বারকায় সুরক্ষিত স্থানে রেখে কৃষ্ণ অস্ত্রহীন অবস্থায় একা যখন দ্বারকা-পুরী থেকে বেরিয়ে এলেন, কালযবন তখন তাঁকে ধরে ফেলবার জন্য তাঁর পিছন পিছন ছুটতে লাগল। কৃষ্ণ তাকে পিছন পিছন আসতে দেখে মহাবলশালী মুচুকুন্দ যেখানে গুহার মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, সেই গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কালযবনও সেই গুহার মধ্যে ঢুকে মুচুকুন্দকেই কৃষ্ণ ভেবে পা দিয়ে সজোরে তাঁকে আঘাত করল। মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে যেই তার দিকে তাকালেন, অমনি কালযবন তাঁর অগ্নিদৃষ্টিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন।

পুরাকালে মুচুকুন্দ দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অনেক অসুরকে তিনি নিহত করেন সেই যুদ্ধে। সেই যুদ্ধে দেবতারা জয়ী হন। দেবতাদের কাছে মুচুকুন্দ দীর্ঘকাল পর্যন্ত যাতে ঘুমোতে পারেন সে-রকম প্রার্থনা জানান। দেবতারা খুশি হয়ে মুচুকুন্দের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তাঁরা সেই সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, তোমাকে যে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে, সে তোমার তেজে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কালযবন ভস্মীভূত হওয়ার পর মুচুকুন্দ কৃষ্ণকে তাঁর পরিচয় জিগ্যেস করলেন। কৃষ্ণ তাঁর পরিচয় দিলে পর মুচুকুন্দ বৃদ্ধ গার্গ্যের বাক্য স্মরণ করে ভক্তিভরে কৃষ্ণকে প্রণাম করে বললেন—আমি জানতে পেরেছি যে তুমি বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করেছ। পুরাকালে গার্গ্য বলেছিলেন যে আটাশতম দ্বাপরযুগের অন্তর্ভাগে যদুবংশে বিষ্ণুর জন্ম হবে। পৃথিবীবাসীগণের কল্যাণকারী সেই তুমিই এখন এসেছ। তাই তোমার তেজ আমি সহ্য করতে পারছি না। প্রাণীসমূহের তুমিই একমাত্র শরণ্য এবং আর্তিহর ; তুমি আমাকে উদ্ধার কর। সমগ্র বিশ্ব চরাচর জুড়ে তুমি রয়েছ ; তুমিই অগ্নি, তুমিই পুরুষ এবং পুরুষেরও পরতর। শব্দ প্রভৃতি কোন প্রমাণের দ্বারাই তোমাকে প্রমাণিত করা যায় না ; তোমার জন্মও নেই ক্ষয়ও নেই। এই সমগ্র বিশ্ব চরাচরে যা কিছু ভূত, যা ভবিষ্যৎ এবং অমূর্ত, মূর্ত, স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্তই তুমি। এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে করতে কোথাও আমি সুখশান্তি পাই নি, তাপে দগ্ধ হয়ে গেছে আমার অন্তর। দুঃখরাশিকেই মৃগতৃষ্ণা ভ্রমে সুখরূপে গ্রহণ করেছি, কিন্তু তা আমাকে সতত দুঃখই দিয়েছে। রাজ্য, বল, কোষ, পুত্র, ভৃত্য, স্ত্রী, শব্দাদি অন্যান্য বিষয়- সবই আমি সুখহেতু মনে করে গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু পরিণামে এ সবই আমাকে পীড়িত করেছে। দেবতারা আমার সাহায্য

চেয়েছিলেন. সাহায্য করেছি। পুরুষের, বিশেষ করে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম অনেক করেছি, কিন্তু সনাতন শান্তির আস্বাদ কোথাও পাই নি। মানুষ তোমারই মায়ায় মোহিত হয়ে অশেষ দুখ কষ্ট ভোগ করে। সংসারে অসংখ্য দুঃখ কষ্ট ভোগ করে আমি শান্তির আশায় কত কী যে করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। এখন শাশ্বত শান্তির আশায় একমাত্র শান্তিদাতা হিসেবে তোমারই শরণ নিলাম।

—কালযবনবধে 'মুচুকুন্দস্তুতিবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো সাতানব্বই

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—মুচুকুন্দের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ তাকে বললেন—তুমি এখন দিব্যলোকে যাও, সেখানে যথোপযুক্ত ভোগ্যদ্রব্যসমূহ উপভোগ কর। তারপর জাতিস্মর হয়ে মহান বংশে জন্মগ্রহণ করবে। শেষে তুমি আমার অনুগ্রহে মোক্ষলাভ করবে। কৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য সেই মুচুকুন্দ গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে কলিযুগ সমাসন্ন। তখন তিনি তপস্যার জন্য গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন। কৃষ্ণও শত্রুদের নিহত করে তাদের ধন, রত্ন প্রভৃতি এনে দ্বারকাপুরীকে সমৃদ্ধতর করলেন। যদুকুল সম্পূর্ণরূপে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ায় বলরাম, নন্দগোপ এবং অন্যান্য প্রবীণদের দেখবার জন্য গোকুলে গেলেন। গোপগোপীরা বলরামের আগমনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল। গোপগোপীরা তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের মতোই ব্যবহার করল। তারা বলরামকে কৃষ্ণের কথা জিগ্যেস করল এবং এই বলে আক্ষেপ করল যে. পুরবাসী নাগরিকাদের পেয়ে কৃষ্ণ তাঁদের ভুলে গেছেন। হরিপ্রেমে গদগদ সেই গোপীরা এ রকম নানা কথা বলতে বলতে বলরামকেই কখনো 'কৃষ্ণ' কখনো 'দামোদর' বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। বলরামও যথাসম্ভব তাদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। এভাবে বলরাম গোকুলে গোপীদের সঙ্গে আনন্দে কিছু কাল কাটালেন।

—'বলপ্রত্যাগমনবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো আটানব্বই

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—বলরাম যখন লোকশিক্ষার জন্য মানুষরূপে বৃন্দাবনে বিচরণ করছেন তখন বরুণ বারুণীকে বললেন—তুমি তো বলরামের প্রিয়; সুতরাং তিনি যাতে তোমাকে উপভোগ করতে পারেন, সেজন্য তুমি বৃন্দাবনে যাও। বারুণী অর্থাৎ মদের প্রতি বলরামের অত্যধিক আসক্তি ছিল। বরুণের আদেশে সেই বারুণী বৃন্দাবনের প্রান্তদেশে এক কদমগাছে এসে থাকলেন। বলরাম একদিন গোপগোপীদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সেই কদমগাছের কাছাকাছি এসে মদের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অন্বেষণ করতে করতে সেই গাছটিকে খুঁজে পেলেন এবং গোপগোপীদের সঙ্গে আনন্দে সেই মদ পান করলেন। মদ পান করে তিনি তৃপ্ত হলেন এবং গান করতে লাগলেন। তখন শ্রমবশে তাঁর শরীর অতিশয় জলকণায় মুক্তোর মতো শোভা পেতে লাগল। তিনি বিহ্বলচিত্তে যমুনাকে উদ্দেশ করে বললেন—তুমি এখানে এসো, আমি তোমার জলে স্নান করব। বলরাম মদমত্ত বলে যমুনা তাঁর কথা শুনল না। বলরাম তখন

ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর লাঙ্গল নিয়ে তটপ্রান্তে যমুনাকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। বলরামের আকর্ষণের ফলে যমুনা গতিপথ পরিবর্তন করে বলরাম যেখানে ছিলেন সহসা সেই স্থানে এসে তাঁকে প্লাবিত করল। সে শরীর ধারণ করে বলরামের কাছে এসে তাঁর প্রসন্নতা ভিক্ষা করল। বলরাম যমুনার প্রার্থনায় তার প্রতি প্রসন্ন হলেন। তিনি তার জলে স্নান করায় তাঁর উত্তম দিব্যকান্তি প্রকাশ পেল। লক্ষ্মী তাঁকে তখন একটি সুন্দর পদ্ম, একটি কুণ্ডল, বরুণের পাঠানো অম্লান পঙ্কজের মালা এবং সমুদ্রের জলের মতো নীলবর্ণ একটি বস্ত্রখণ্ড দিলেন। সেই কুণ্ডল এবং নীলবসন পরিধান করে বলরাম ব্রজভূমিতে মাস দুয়েক কাটালেন। তারপর মথুরায় ফিরে এলেন। মথুরায় ফেরবার পর রাজা রৈবতের কন্যা রেবতীকে বিয়ে করলেন। কালক্রমে নিশঠ এবং উল্মুক নামে তাঁর দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল।

—'হলক্রীড়াবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ একশো নিরানব্বই

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—বিদর্ভ দেশে কুণ্ডিন নগরে ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল; তার নাম রুক্মিণী। ভীষ্মকের একটি পুত্রও ছিল, তার নাম ছিল রুক্মী। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পত্নীরূপে কামনা করেন। রুক্মিণী মনে মনে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে কামনা করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মীর ছিল চরম শত্রুতা। ভীষ্মক জরাসন্ধের সঙ্গে পরামর্শ করে রুক্মীর সঙ্গেও এ বিষয়ে একমত হন যে, কৃষ্ণকে কন্যাদান করা সঙ্গত নয়। জরাসন্ধের পরামর্শ অনুসারে তিনি চেদিরাজ শিশুপালের হাতেই রুক্মিণীকে সম্প্রদান করতে মনস্থ করেন। বিবাহের আয়োজন করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য শিশুপালের সঙ্গে জরাসন্ধ এবং অন্যান্য রাজন্য বর্গ কুণ্ডিন নগরে আসেন। এদিকে বিয়ের আগের দিনই বলরাম এবং অন্যান্য যদুবীরদের সহায়তায় কৃষ্ণ রুক্মিণীকে অপহরণ করেন। কৃষ্ণের এই কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব, বিদূরথ প্রভৃতি রাজারা কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য সসৈন্যে কৃষ্ণ এবং অন্যান্য যাদবদের আক্রমণ করেন। কিন্তু তারা সবাই কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হন। রুক্মী তখন এই প্রতিজ্ঞা করে যে কৃষ্ণকে হত্যা না করে সে কুণ্ডিন নগরে আর ফিরে আসবে না। কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে রুক্মী সহজেই পরাজিত হয়। কৃষ্ণ তখন রাক্ষসবিধানে রুক্মিণীকে বিয়ে করেন। কালক্রমে সেই রুক্মিণীর গর্ভে মদনের অংশে প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়। প্রদ্যুম্নকে শম্বর নামক দৈত্য অপহরণ করে এবং পরে প্রদ্যুম্নই তাকে নিহত করেন।

—শ্রীকৃষ্ণচরিতে 'রুক্মিণীপরিণয়' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দু'শো

মুনিরা ব্যাসদেবকে জিগ্যেস করলেন—কৃষ্ণতনয় বীর প্রদ্যুম্নকে শম্বর কি করে অপহরণ করল? আর তিনিই বা কীভাবে শম্বরকে বধ করলেন? আমরা আপনার কাছ থেকে সমস্ত কথাই শুনতে চাই। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস তাঁদের বললেন—প্রদ্যুম্ন জন্মানোর

পর যখন ছ'দিন পার হয়ে গেল, তখন শম্বর সকলের অজ্ঞাতসারে আতুড়ঘর থেকেই প্রদ্যুম্নকে নিয়ে চলে গেল। সে জেনেছিল যে এই প্রদ্যুম্নই তাকে হত্যা করবে। শম্বর সেই শিশু প্রদ্যুম্নকে নিয়ে গিয়ে লবণ সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। একটি বড় মাছ প্রদ্যুম্নকে তখন খেয়ে ফেলে। মাছের পেটে গিয়েও কিন্তু প্রদ্যুম্ন বেঁচে থাকেন। পরে জেলেরা অন্যান্য মাছের সঙ্গে সেই মাছটিকেও ধরে এবং শম্বরকে বিক্রি করে দেয়। শম্বর সেই মাছটিকে তার রান্নাঘরে পাঠিয়ে দেয়। মাছটিকে যখন কাটা হয় তখন তার পেট থেকে প্রদ্যুম্ন জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন। সেই বালকের অনিন্দ্যসুন্দর দৈহিক কান্তি দেখে শম্বরের স্ত্রী মায়াবতী মুগ্ধ হয়ে যায়। ছেলেটিকে নিয়ে সে যখন কি করবে ভাবছে এমন সময় নারদ সেখানে আসেন। তাঁর কাছ থেকে মায়াবতী তার আসল পরিচয় জানতে পারে। সে তখন পরম যত্নে প্রদ্যুম্নকে পালন করতে থাকে। প্রদ্যুম্ন যখন যুবক হয়ে ওঠেন তখন মায়াবতী তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। প্রদ্যুম্ন মায়াবতীর এ রকম বিপরীত আচরণে বিস্মিত হয়ে তাকে জিগ্যেস করেন—তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করে অন্য ভাব অবলম্বন করছ কেন? এ যে নিতান্তই অসঙ্গত ব্যাপার। মায়াবতী তখন প্রদ্যুম্নকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলেন। প্রদ্যুম্ন তখন শম্বরকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং সেই যুদ্ধে শম্বরকে তার অনুচরদের সঙ্গে পরাজিত করেন। শম্বর তখন বিভিন্ন মায়া অবলম্বন করে প্রদ্যুম্নকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু মায়াবতীর কাছ থেকে পাওয়া মায়ার প্রভাবে প্রদ্যুম্ন শেষ পর্যন্ত শম্বরের সমস্ত মায়িক কৌশলকে নষ্ট করে তাকে নিহত করেন। তারপর মায়াবতীকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে আসেন। সেই অতুলনীয় রূপবান এবং নবযৌবনসম্পন্ন প্রদ্যুম্নকে দেখে রুক্মিণী আনন্দিত হন কিন্তু তাকে ঠিক ঠিক চিনতে পারেন নি। তখন কৃষ্ণ এবং নারদ সেখানে আসেন। তাঁরা রুক্মিণীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে এই-ই তাঁর আঁতুড়ঘর থেকে হারিয়ে যাওয়া ছেলে প্রদ্যুম্ন আর সঙ্গে ওই রমণী তার পত্নী মায়াবতী। তাঁরা আরো বলেন যে, ঐ মায়াবতী আসলে মদনের পত্নী রতি। কামদেব মদন শিবের নেত্রজাত বহ্নিতে ভস্ম হওয়ার পর রতি মায়ারূপে শম্বরকে মোহিত করেছিলেন। ইনি শম্বরের সঙ্গে পত্নীরূপে যা যা করেছেন সবই ঐ মায়ারূপে। এই প্রদ্যুম্ন স্বয়ং কামদেব মদন। নারদের কথা শুনে রুক্মিণী আনন্দিত হলেন এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে সাদরে বরণ করে নিলেন।

—'শম্বরহৃত প্রদ্যুম্নাগমনবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো এক

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—রুক্মিণী চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, বিচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, সচারু ও বলিপ্রধান চারু—এই কয়টি পুত্রের জন্ম দেন। চারুমতী নামে তাঁর একটি কন্যাও জন্মায়। কৃষ্ণের রুক্মিণী ছাড়া আরো সাতজন স্ত্রী ছিল—তাঁদের নাম—কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, নাগ্নজিতী, জাম্ববতী, রোহিণী ও সত্যভামা। লক্ষণা এবং সুশীলা নামে তাঁর আরো দুজন স্ত্রী ছিলেন বলে শোনা যায়। তাছাড়াও ষোল হাজার গোপিণী তাঁকে পতিত্বে বরণ করে নেয় বলে শোনা যায়। যাই হোক, প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যাকে স্বয়ম্বর সভায় লাভ করেন; রুক্মী-কন্যাও প্রদ্যুম্নকেই মনে মনে কামনা করেছিলেন। তাঁরই গর্ভে প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে মহাবলশালী এক পুত্র জন্মায়। কৃষ্ণ

সেই অনিরুদ্ধের বিয়ের জন্য পরে রুক্মীর পৌত্রী অর্থাৎ ছেলের মেয়েকে পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করেন। কৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধ থাকলেও রুক্মী অনিরুদ্ধকেই নাতজামাই করেন। সেই অনিরুদ্ধের বিয়ে হয় বিদর্ভ রাজ্যের ভোজকট নামক নগরে। সেই বিয়েতে কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি সবাই উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর কলিঙ্গ প্রভৃতি আরো অনেক রাজারা, যাঁরা সেই বিয়েতে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এসেছিলেন, তারা রুক্মীকে বললেন যে, বলরাম পাশাখেলায় একদমই পটু নন, তবু তিনি পাশা খেলতে নাকি দারুণ ভালোবাসেন। সুতরাং বলরামকে পরাজিত করার এই এক সুযোগ। তাঁরা সবাই পরামর্শ করে বলরামকে পাশা-খেলার জন্য অনুরোধ জানালেন; বলরামও তাতে রাজী হলেন। প্রথম দিন বলরাম রুক্মীর কাছে এক হাজার নিষ্ক পণ রেখে হারলেন; দ্বিতীয় দিন আরও এক হাজার নিষ্ক পণ রেখে হারলেন, এভাবে রুক্মীর কাছে দশ হাজার নিষ্ক পণ রেখেও তিনি হেরে গেলেন। বলরামকে হারতে দেখে কলিঙ্গরাজ বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসলেন। মদোদ্ধত রুক্মীও বলরামকে উদ্দেশ করে বলল—বলরাম বৃথাই নিজেকে পাশাখেলায় পটু বলে গর্ববোধ করেন; আসলে ইনি পাশাখেলার কিছুই জানেন না। এতে বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে কোটি নিষ্ক পণ রাখলেন রুক্মীর কাছে এবং শেষে তিনি তা জিতে নিলেন। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট রুক্মী মিথ্যা বাক্যে বললেন যে তিনিই জিতেছেন। তখন এক আকাশ-বাণী হল। সেই আকাশবাণী বলল—বলরামই বিজয়ী; রুক্মী মিথ্যা কথা বলছে। কোন কথা না বলে কর্মের অনুষ্ঠান করলে, তা অনুমোদিতই হয়ে থাকে। ক্রুদ্ধ বলরাম তখন পাশা দিয়েই রুক্মীকে আঘাত করলেন। তারপর কলিঙ্গরাজকে আক্রমণ করে যে দাঁত দেখিয়ে সে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল, তা ভেঙে দিলেন। অন্য যে সব রুক্মীপক্ষীয় রাজারা সেখানে ছিলেন, বলরাম তাদেরকে প্রহার করতে বাদ রাখলেন না। বলরাম যে রুক্মীকে মেরে ফেলেছেন এ কথা কৃষ্ণ রুক্মিণীকে জানালেন না। তারপর যদুগণ বর-বধূকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এলো।

—অনিরুদ্ধবিবাহে 'রুক্মীবধনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো দুই

একবার ঐরাবতে আরোহণ করে ইন্দ্র কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে দ্বারকাতে এলেন। তিনি প্রথমেই হরির স্তুতি এবং বিস্ময়জনক কার্যসমূহের প্রশংসা করে তাঁর আসার প্রয়োজন ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন—পৃথবীর পুত্র নরক নামক অসুর প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা। সে প্রচণ্ড অত্যাচার এবং নীতিবিগর্হিত কর্মসমূহ আরম্ভ করেছে। সিদ্ধ, যক্ষ, দেবতা প্রভৃতি অসংখ্য প্রাণীবর্গকে হত্যা করে তাদের স্ত্রীলোকদের নিজের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। প্রচেতার যে জলদানকারী ছাতা ছিল, আমার মা অদিতির যে অমৃত-ক্ষরণকারী দুটি দিব্য কুণ্ডল ছিল, সেই অসুর তা নিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া মন্দর পর্বতের শৃঙ্গ মণিপর্বতকেও তার রাজ্যে নিয়ে রেখেছে। এখন আবার আমার ঐরাবতের দিকে নজর পড়েছে। আপনিই পারেন তাকে নিহত করে অত্যাচারিত প্রাণীদের বাঁচাতে। ইন্দ্রের কাছ থেকে সব কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁকে এই আশ্বাস দিলেন যে, নরকাসুরকে তিনি অবিলম্বেই হত্যা করবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে প্রাগজ্যোতিষ-

পুরের দিকে রওনা দিলেন, সঙ্গে নিলেন স্ত্রী সত্যভামাকে। প্রাগজ্যোতিষপুরের চারদিকে শত যোজন পরিমিত স্থানে সৈন্য মোতায়েন করা ছিল যাতে হঠাৎ করে শত্রুসৈন্য সেই রাজ্যকে আক্রমণ না করতে পারে। সেই সৈন্যদলের চারপাশ পাশ দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। কৃষ্ণ সুদর্শনচক্রে সেই পাশ ছিন্ন করলেন। তখন মুর নামক এক দৈত্য কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলো ; কৃষ্ণ অনায়াসেই তাকে নিহত করলেন। তারপর মুরের সাতটি ছেলে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে প্রাণ হারাল। কৃষ্ণ হয়গ্রীব, মুর, পঞ্চজন প্রভৃতি অসুরকে নিহত করে প্রাগজ্যোতিষপুরের দিকে এগুতে লাগলেন, কৃষ্ণর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে অসংখ্য অসুর তাঁর হাতে প্রাণ দিল। তখন নরকাসুর এলো কৃষ্ণর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কৃষ্ণ অনায়াসেই তাকে সুদর্শনচক্রে ছিন্ন করে ফেললেন। তখন পৃথিবী অদিতির সেই কুণ্ডল দুটো নিয়ে কৃষ্ণর কাছে এসে তাঁকে বলল—পুরাকালে বরাহমূর্তি ধারণ করে আপনি যে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, তাতে আপনার সঙ্গবশত আমার এই পুত্র নরকাসুর জন্মায়। আপনার কাছ থেকেই এর জন্ম এবং আপনিই আবার তাকে বধ করলেন। যাই হোক, এই সেই অদিতির কুণ্ডলদ্বয় ; আপনি গ্রহণ করুন। আর একটি প্রার্থনা এর সন্তান-সন্ততিদের ভার আপনার উপরেই রইল। আমারই ভার অবতারণের জন্যই বিষ্ণুর অংশে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন—সে আমি জানি। আপনি সর্বব্যাপী, ক্রিয়া, কর্তা, কার্য এবং সমস্ত প্রাণীর অন্তরে আত্মারূপে আপনি বিরাজ করেন, আপনাকে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কি ভাবে স্তব করব ? নরকের দোষ আপনি ক্ষমা করুন ; আমি তার মা, সন্তানের জন্য আপনার কাছে এই আমার প্রার্থনা।

পৃথিবীকে আশ্বস্ত করে কৃষ্ণ নরকাসুরের প্রাসাদ থেকে রত্নসমূহ নিলেন। তিনি সেই প্রাসাদে ষোল হাজার কন্যা এবং অনেক দন্তযুক্ত হস্তী ও একুশ নিযুত উৎকৃষ্ট কাম্বোজ দেশীয় ঘোড়া দেখতে পেলেন ; সে সবই তিনি দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন। নরকাসুরের প্রাসাদে বরুণের ছাতা এবং মণিপর্বতও দেখতে পেলেন। সে সবই তিনি দ্বারকায় নিয়ে এলেন। আর সেই কুণ্ডল দুটো অদিতিকে দেওয়ার জন্য গরুড়ের পিঠে চড়ে সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গেলেন।

—কৃষ্ণচরিতে 'নরকবধ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো তিন

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—পক্ষিরাজ গরুড় বরুণের ছত্র, মণিপর্বত এবং সপত্নীক কৃষ্ণকে অবলীলাক্রমে বহন করে নিয়ে স্বর্গদ্বারে গিয়ে পৌঁছল। স্বর্গদ্বারে গিয়ে কৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করলেন, তখন দেবতারা পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি নিয়ে কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানালেন। কৃষ্ণ অদিতির বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। অদিতিকে প্রণাম করে সেই কুণ্ডলদ্বয় তাঁর হাতে অর্পণ করলেন এবং নরকাসুরের নিধনবার্তাও তাঁকে জানালেন। অদিতি প্রীত হয়ে কৃষ্ণকে স্তব করতে লাগলেন। তিনি বললেন—সমস্ত প্রাণীতে আত্মা রূপে তুমি অবস্থান করছ ; তুমি বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রণেতা। তুমিই সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন, ভূমি, আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, মন ও বুদ্ধি। তুমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামক আত্মমূর্তি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্তা। তোমার মায়ারাশি দ্বারা এই স্থাবর, জঙ্গম জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। স্বধর্মপরায়ণ জনগণ নিজেদের মুক্তির জন্য

তোমারই আরাধনা করে, একমাত্র তারাই তোমার এই অনন্ত মায়াকে অতিক্রম করতে পারে সমস্ত প্রাণী এই বিষ্ণুমায়ারূপ আবর্ত মধ্যে মোহান্ধকারে আবৃত হয়ে রয়েছে। তোমাকে যে আমি পুত্রলাভের কামনায় আরাধনা করেছি, সেও তোমারই মায়ার প্রভাবে। তুমি প্রসন্ন হও, আমার অজ্ঞাননাশ কর। তোমার স্থূল রূপেই আমাদের নয়নগোচর হয়, সেই রূপকেই প্রণাম জানাই।

বিষ্ণু তখন অদিতিকে হেসে বললেন—তুমি আমাদের মা, তুমি আমাকে এ কী লজ্জায় ফেলছ আমাকে স্তুতি করে! তুমি আমাকে বর দান কর। অদিতি বিষ্ণুর এই বিনয় এবং শ্রদ্ধা দেখে প্রীত হয়ে বললেন—আমার বরে তুমি পৃথিবীতে অজেয় হয়ে উঠবে। এর পর ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সত্যভামাও অদিতিকে প্রণাম করতে এলেন। অদিতি সত্যভামাকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন—আমার বরে কখনই জরা বা বিরূপতা তোমাকে আক্রমণ করবে না। তারপর অদিতির আদেশে ইন্দ্র কৃষ্ণের যথোচিত পূজা করলেন। দেবতাদের কাছ থেকে যথাযোগ্য সম্মান লাভ করে সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণ নন্দনকানন প্রভৃতি স্বর্গের রমণীয় স্থান সমূহ দেখতে লাগলেন। ক্রমে তাঁরা স্বর্গের অন্যতম রমণীয় বস্তু পারিজাত তরু দেখতে পেলেন; পারিজাতের সুগন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে রয়েছে। সেই গাছের পাতার রং তামার মতো এবং সমুদ্র মন্থনের সময় এই গাছ সমুদ্র থেকে উঠেছিল। সেই পারিজাত গাছটি দেখে সত্যভামার খুব ভালো লেগে গেল। তিনি কৃষ্ণকে বললেন—দেখ, তুমি বলে থাক যে আমিই নাকি তোমার সবচেয়ে প্রিয়। তোমার ওই কথা যদি সত্য হয়, তবে এই পারিজাত তুমি দ্বারকায় নিয়ে চল। এই পারিজাতের মঞ্জরী কেশপাশে ধারণ করে সপত্নীদের মধ্যে সর্বাধিক শোভা ধারণ করতে পারব। তুমি একে দ্বারকায় নিয়ে চল। সত্যভামার কথায় কৃষ্ণ হেসে উঠলেন। তিনি তখন সেই পারিজাতকে দ্বারকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য গরুড়ের উপর চাপিয়ে দিলেন। রক্ষীরা কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলল যে, এতে ইন্দ্র খুবই অসন্তুষ্ট হবেন, কারণ এই পারিজাত ইন্দ্রাণীর খুবই প্রিয়। সুতরাং দেবতাদের সঙ্গে এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ করে কোন লাভ নেই। যে কাজ পরিণামে দুঃখজনক পণ্ডিতরা সে কাজের প্রশংসা করেন না। রক্ষীদের কথায় সত্যভামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের বললেন—কে ইন্দ্র, কে-ই বা শচী? অমৃতমন্থনে যদি এর উৎপত্তি হয়ে থাকে তো এতে সকলের অধিকার রয়েছে। ইন্দ্রই বা একা একে ভোগ করবেন কেন? সুরা, চন্দ্র ও লক্ষ্মী যেমন সকলেরই, এই পারিজাত তরুও তাই। ইন্দ্রের বাহুবলে শচী যদি একে আগলে রাখতে চান তো তোমরা গিয়ে আমার নাম করে তাকে বল যে, কৃষ্ণপত্নী সত্যভামা এই পারিজাত তরু হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, শক্তি থাকে তো রক্ষা করুন। রক্ষীরা ইন্দ্রাণীকে এবং ইন্দ্রকেও সমস্ত কথা জানাল। ইন্দ্রাণীর প্রেরণায় ইন্দ্র তখন সেই পারিজাত তরু রক্ষার জন্য দেবসৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য হাজির হলেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে উপস্থিত হতে দেখে শঙ্খনাদ করলেন; তারপর শরবর্ষণে দেবসৈন্যদের বিব্রত করতে লাগলেন। এদিকে গরুড়ও যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ হয়ে উঠল। সে বরুণের পাশ কেড়ে নিয়ে তা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। যম তার দণ্ড নিক্ষেপ করলে কৃষ্ণ তা সহজেই ভূপাতিত করলেন। কেবলমাত্র দৃষ্টিপাতেই তিনি চন্দ্র সূর্যকে তেজোহীন করে ফেললেন। অগ্নি, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুৎগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্বগণ সকলকেই কৃষ্ণ পরাজিত করলেন। শেষে ইন্দ্র তাঁর বজ্র নিয়ে এবং কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র নিয়ে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্র কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বজ্র নিক্ষেপ করলেন;

কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র প্রেরণ করলেন না। এদিকে গরুড় ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল। বাহন আহত এবং অস্ত্র বিনষ্ট হওয়ায় ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে উদ্যত হলে সত্যভামা বিদ্রুপাত্মক বাক্যে ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তুমি দেবরাজ, ত্রিভুবনের অধিপতি যে! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো তো তোমার সাজে না। শচীকে পারিজাতের মঞ্জরীতে সজ্জিত না দেখলে তো তোমার ভালো লাগবে না। পারিজাত তোমারই জিনিস, তুমি একে নিয়ে যাও। শচী আমাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নি, তাই স্ত্রীসুলভ হিংসা এবং ঈর্ষার বশে এই যুদ্ধ আমি ইচ্ছে করেই ঘটালাম। দেখ, রূপ এবং যশ নিয়ে গর্ব কোন স্ত্রীলোকই যেন না করে। সত্যভামার কথা শুনে ইন্দ্র তাকে 'সখি' বলে সম্বোধিত করে বললেন—দেখ, অখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী হরির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় আমার বিন্দুমাত্র লজ্জাও হচ্ছে না। সমস্ত পৃথিবী যাঁর মূর্তিস্বরূপ, যাঁর অতি সূক্ষ্ম রূপ বেদবিদ ছাড়া আর কেউই জানতে পারেন না, স্বেচ্ছায় পৃথিবীর কল্যাণকারী সেই অজ, নিষ্ক্রিয়, সনাতন ঈশ্বরকে কে জয় করতে পারে? সুতরাং তাঁর কাছে পরাজয়ও আমার পক্ষে গৌরবের।

—'পারিজাতহরণে শক্রস্তবনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ দুশো চার

ব্যাস বলে চললেন—ইন্দ্রের স্তুতিবাক্য শোনার পর কৃষ্ণ তাঁকে ভাবগম্ভীর বাক্যে বললেন—আপনি দেবরাজ, এ পারিজাত তরু এখানেই শোভা পায়। আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করবেন। সত্যভামার অনুরোধেই এই পারিজাত আমি নিয়েছিলাম। আর আপনি যে বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন, তাও অক্ষত অবস্থাতেই আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। কৃষ্ণের কথা শুনে ইন্দ্র বিনীত ভাবে তাঁকে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি ওই পারিজাত তরু দ্বারকায় নিয়ে যান। তিনি আরো বললেন যে কৃষ্ণ যত দিন পৃথিবীতে থাকবেন, তত দিনই তা পৃথিবীতে থাকবে। তারপর আর তা পৃথিবীতে থাকবে না। কৃষ্ণ তাতেই সম্মত হয়ে সেই পারিজাত তরু নিয়ে দ্বারকায় এলেন। তাঁকে দেখে দ্বারকার জনগণ আনন্দিত হল। সেই পারিজাত বৃক্ষটিকে সত্যভামা গৃহসংলগ্ন উদ্যানে রোপণ করলেন। সেই গাছের এমনই মাহাত্ম্য যে, তার কাছে এলেই সকলেই পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারে। তিন যোজন স্থান পর্যন্ত এর গন্ধ ছড়িয়ে যেত। এর পর নরকাসুর যে সব রমণীদের অপহরণ করে এনেছিল কৃষ্ণ তাদের বিয়ে করলেন। তারা সংখ্যায় ষোলো হাজার। কৃষ্ণ প্রত্যেক রমণীর সঙ্গে পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করে মিলিত হতেন। ভগবানের বিচিত্র লীলা কে বর্ণনা করতে পারে?

—কৃষ্ণচরিতে 'শতাধিকষোড়শসহস্রকন্যা পরিণয়' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ দুশো পাঁচ

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—রুক্মিণীর গর্ভে কৃষ্ণের যে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কয়েকজন পুত্র জন্মেছিল, সে কথা আপনাদের আগেই বলেছি। সত্যভামার গর্ভে ভানু প্রভৃতি কয়েকজন পুত্র জন্মায়, রোহিণীর গর্ভে জন্মায় প্রপক্ষ প্রভৃতি দীপ্তিমান পুত্রেরা,

জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব প্রভৃতি পুত্রদের জন্ম হয়, নাগ্নজিতীর গর্ভে ভদ্রবিন্দ প্রভৃতি পুত্রগণ, সব্যা নামক পত্নীর গর্ভে সংগ্রামজিৎ প্রভৃতি পুত্রেরা, বৃক প্রভৃতি পুত্রেরা মাদ্রীর গর্ভে এবং গাত্রবান প্রভৃতি পুত্রগণ লক্ষণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণও অসংখ্য পুত্রের জন্ম দেয়। এদের মধ্যে রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নই প্রধান। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র। অনিরুদ্ধ বাণাসুরের কন্যা ঊষাকে বিয়ে করেন। বাণাসুর বলির পুত্র। এই বিবাহে হরি এবং হরের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল এবং হরি বাণের সহস্র বাহু সুদর্শন চক্রে কেটে ফেলেছিলেন।

মুনিরা ব্যাসকে তাঁর বক্তব্যের মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলেন—কিসের জন্য ঊষার বিবাহে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল ? কৃষ্ণ কি ভাবেই বা বাণের সহস্র বাহু ছেদন করেন ? আমরা এই বৃত্তান্ত আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বললেন—একবার ঊষা দেখতে পায় যে, মহাদেব উমার সঙ্গে কামক্রীড়ায় রত ; তাঁরও তখন কামক্রীড়ার জন্য ইচ্ছে হয়। উমা ঊষার মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তাকে বলেন, তোমার কোন চিন্তা নেই ; এখনই তুমি অধীর হয়ে উঠো না। তুমিও অচিরেই তোমার পতির সঙ্গে কামক্রীড়ায় মিলিত হতে পারবে। বৈশাখ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে স্বপ্নে তুমি যাকে দেখবে, সে-ই তোমার পতি হবে। পার্বতীর কথামতো ঊষা স্বপ্নে এক অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষকে দেখতে পেল এবং ঘুমের ঘোরেই তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ঊষার সখী ছিল চিত্রলেখা, সে বাণের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা। ঊষা চিত্রলেখার কাছে ধরা পড়ে গেল। চিত্রলেখা ছবি আঁকায় খুবই পারদর্শী। সে তখন ঊষার কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব এবং মানুষদের মধ্যে যারা প্রধান এবং কীর্তিমান পুরুষ তাদের ছবি পটে এঁকে দেখাল। ঊষার দৃষ্টি একমাত্র মানুষদের ছবির প্রতিই আকৃষ্ট হল। অন্ধক এবং বৃষ্ণিদের মধ্যে রাম ও কৃষ্ণকে দেখে সে লজ্জা পেল, প্রদ্যুম্নকে দেখেও সে লজ্জায় মুখ নীচু করল ; আর যেই মাত্র সে অনিরুদ্ধের ছবি দেখল সেই মুহূর্তেই লজ্জা পরিহার করে 'এই-ই আমার সেই স্বপ্নে দেখা পুরুষ' বলে বারবার সেই ছবি দেখতে লাগল। চিত্রলেখা তখন বিরহকাতরা সখীকে আশ্বাস দিয়ে দ্বারকাপুরীর উদ্দেশ্যে রওনা হল।

—বাণযুদ্ধে 'চিত্রদর্শন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো ছয়

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—বলির পুত্র মহাসুর বাণ একবার মহাদেবকে জানায় যে তার যে সহস্র বাহু রয়েছে যুদ্ধ ছাড়া তার সার্থকতাই বা কি। অথচ যুদ্ধের আপাতত কোন সম্ভাবনাই সে দেখতে পাচ্ছে না। শঙ্কর তখন তাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে অতি শীগ্গিরই সে এক যুদ্ধে যোগ দিতে পারবে। শঙ্করের কথায় যুদ্ধপ্রিয় বাণাসুর নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এদিকে ঊষার সখী চিত্রলেখা দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধকে ধরে নিয়ে আসে এবং যোগবিদ্যাবলে অন্তঃপুরে ঊষার সঙ্গে তার মিলন সংঘটিত হল। বাণ এ কথা জানতে পেরে অনিরুদ্ধকে বন্দী করার জন্য তার সৈন্যদের আদেশ দিল। সৈন্যগণ অনিরুদ্ধকে বন্দী করতে গিয়ে তাঁরই হাতে মারা পড়ল। তখন বাণ নিজেই অনিরুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলো। সেও অনিরুদ্ধের হাতে পরাজিত হল।

তখন সে মায়া অবলম্বনে অনিরুদ্ধকে নাগ-পাশে বেঁধে ফেলল। এদিকে দ্বারকার জনগণ অনিরুদ্ধের খোঁজ করতে লাগল, কিন্তু তাঁর কোন সন্ধানই পেল না। তখন নারদ এসে যদুপুরে বাণ কর্তৃক অনিরুদ্ধের বন্দী হওয়ার ঘটনা জানালেন। কৃষ্ণ সে কথা শুনে বলরাম ও প্রদ্যুম্নকে সঙ্গে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করলেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাণের প্রাসাদের কাছে এসে পেঁছিলেন। তার আগে বাণের রাজধানীতে প্রবেশ করার সময় প্রমথগণের কাছে তাঁরা বাধা পান ; তবে অচিরেই কৃষ্ণ তাদের পরাজিত ও নিহত করে প্রাসাদের কাছে পেঁছিলে ত্রিপাদ এবং ত্রিশিরাবিশিষ্ট শৈব জ্বর তাঁদের বাধা দেয়। বাণাসুর ছিল শিবের বরে বলীয়ান, তাকে রক্ষা করার জন্যই শিব সেই জ্বরকে পাঠিয়েছিলেন। সেই শৈব জ্বরের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হল। জ্বরের নিক্ষিপ্ত ভস্মরাশিতে বলরাম পীড়িত হলেন বটে, তবে কৃষ্ণের দেহ স্পর্শ করা মাত্রই তিনি পুনরায় তাঁর স্বাভাবিকত্ব ফিরে পেলেন। সেই শৈব জ্বরকে বিনষ্ট করার জন্য এক বৈষ্ণব জ্বরও সৃষ্ট হল। শৈব জ্বর সেই বৈষ্ণব জ্বরের কাছে অনায়াসেই পরাজিত হল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন শৈব জ্বরকে ক্ষমা করেন। ব্রহ্মার অনুরোধে কৃষ্ণ সেই বৈষ্ণব জ্বরকে নিজ দেহে বিলীন করে ফেললেন। বাণ তখন দৈত্য সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। বাণের সহায়ক হিসেবে তখন ভগবান শংকর এবং কার্তিকেয় হরির সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। হরি ও হরের সেই যুদ্ধে প্রাণীকুল ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। দেবতারা তখন মনে করলেন যে ত্রিভুবনের নিশ্চয়ই প্রলয় আসন্ন। বিষ্ণু জৃম্ভণ অস্ত্র প্রয়োগ করে শংকরকে বিহ্বল করে তুললেন। তখন প্রমথ ও দৈত্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। শংকর বিহ্বল এবং মোহিত হয়ে রথের উপরই বসে রইলেন, যুদ্ধ করতে পারলেন না। কার্তিকেয়কেও গরুড় এবং প্রদ্যুম্ন আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে তুললেন। তিনিও তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। তখন স্বয়ং বাণ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলো। বাণাসুরের সঙ্গে বিষ্ণুর তখন ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হল। বাণ যতই শর নিক্ষেপ করল, বিষ্ণু সে সবই সুদর্শন চক্রে কেটে ফেললেন। বিষ্ণু তখন বাণকে নিহত করার জন্য তাঁর সুদর্শন চক্র পাঠাবেন বলে ঠিক করলেন। ঠিক সেই সময় কোটরী নামক দৈত্যে বিদ্যা উলঙ্গ হয়ে বিষ্ণুর সামনে এসে দাঁড়াল। বিষ্ণু তাকে সামনে নগ্ন অবস্থায় দেখে চোখ বন্ধ করেই বাণের সহস্র বাহু ছেদন করে তাকে নিহত করার জন্য তাঁর সুদর্শন চক্র পাঠালেন। সেই চক্র বাণের সমস্ত বাহু ছেদন করে পুনরায় বিষ্ণুর হাতে এসে পেঁছিল। শিব এ কথা জানতে পেরে বিষ্ণুর কাছে এসে তাঁকে বললেন—তোমাকে পরেশ, পরমাত্মা, অনাদিনিধন, পর ও পুরুষোত্তম বলে জানি। এ সবই যে তোমার মানুষী লীলা সেও আমার অবিদিত নয়। এই বাণকে আমি অভয়দান করেছি, সুতরাং আমার বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্যই তুমি একে ক্ষমা কর।

শিবের কথা শুনে বিষ্ণু তাঁকে বললেন—তুমি যখন তাকে অভয়দান করেছ, তখন তাকে আমি ক্ষমা করলাম। সে জীবিতই থাকবে। যে তুমি, আমিও সেই। অবিদ্যার দ্বারা মোহিত ব্যক্তিই তোমাকে এবং আমাকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখে। বিষ্ণুর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শঙ্কর চলে গেলেন। এদিকে অনিরুদ্ধ যেখানে নাগ-পাশে বন্ধ হয়ে পড়ে ছিলেন, সেখানে কৃষ্ণ, বলরাম এসে পেঁছিলেন। গরুড়ের নিশ্বাসে নাগ-পাশ থেকে মুক্তি পেলেন অনিরুদ্ধ। পরে ঊষাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সবাই দ্বারকায় ফিরে এলেন।

—বাণযুদ্ধে 'বাণপরাজয়' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো সাত

মুনিরা ব্যাসদেবকে বললেন—আপনার কাছ থেকে আমরা ভগবান কৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক এবং বিস্ময়জনক কার্যাবলী শ্রবণ করেছি। তবুও আমাদের পরিতৃপ্তি হয় নি। আপনি তাঁর কীর্তিকথা আরো কিছু বলুন। ব্যাসদেব মুনিদের অনুরোধে বিষ্ণু কর্তৃক বারাণসী নগরীর দাহবিষয়ক ঘটনা বলতে আরম্ভ করলেন। ব্যাস বললেন—পৌণ্ড্রক বাসুদেব পুণ্ড্র দেশের রাজা ছিল। সেই বাসুদেবের অজ্ঞান স্তাবকগণ তাকেই বাসুদেবের অবতার বলত। এতে গর্বিত হয়ে সেও বিষ্ণুর মতোই তাঁর চিহ্ন এবং অস্ত্রসমূহ ধারণ করত। মোহবশে মদগর্বে গর্বিত হয়ে সে বিষ্ণুর কাছে এক দূত পাঠাল। দূতমুখে বিষ্ণুকে সে জানাল যে তিনি যেন পৌণ্ড্রক বাসুদেবের চক্র প্রভৃতি চিহ্ন এবং বাসুদেব এই নাম পরিত্যাগ করেন এবং যদি বাঁচতে চান তো তাকে যেন প্রণাম জানান। দূতের মুখে সে কথা শুনে বিষ্ণু হেসে সেই দূতকে বললেন—তুমি আমার নাম করে তোমার প্রভুকে গিয়ে এ কথা জানাও যে, আমি তার সঙ্গে দেখা করে চক্র চিহ্ন প্রভৃতি সবই অচিরে পরিত্যাগ করব। দূত ফিরে গিয়ে পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে সব কথা জানাল।

এদিকে বিষ্ণুও গরুড়ের পিঠে অরোহণ করে বারাণসীতে গেলেন। কাশীরাজ বিষ্ণুর আসার কথা শুনে পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে সাহায্য করার জন্য তার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলো। বিষ্ণু দূর থেকে দেখলেন যে পৌণ্ড্রক বাসুদেব উঁচু রথে বসে আছে। তাঁর মতোই সে সেজেছে। হাতে রয়েছে শংখ, চক্র, গদা এবং পদ্ম, বুকে আঁকা রয়েছে শ্রীবৎসের পদাচিহ্ন, রথে রয়েছে শার্ঙ্গধনুর মতোই এক ধনুক; সেই রথের আকৃতি গরুড়ের মতো। তাকে দেখে বিষ্ণু মনে মনে হাসলেন। বিষ্ণুর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হল। বিষ্ণু কাশিরাজের সমস্ত সৈন্য সামন্তদের হত্যা করলেন। তারপর পৌণ্ড্রককে বললেন—তুমি যে দূতমুখে আমার কাছে খবর পাঠিয়েছিলে, তা আমি পেয়েছি। তোমার কথা মতোই আমি আমার এই চক্র, গদাও পরিত্যাগ করলাম, এই বাহন গরুড়ও তোমার রথে গিয়ে আরোহণ করুক। এ কথা বলেই বিষ্ণু চক্র ও গদা পরিত্যাগ করলেন। চক্র ও গদা পৌণ্ড্রককে সঙ্গে সঙ্গেই নিহত করল; গরুড়ও পৌণ্ড্রকের সেই রথ ভেঙে দিল। কাশিরাজ তখন বন্ধুর শত্রুকে হত্যা করবার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল। কৃষ্ণ শার্ঙ্গধনুতে তার মাথা কেটে ফেলে কাশীপুরীতে তা পাঠিয়ে দিলেন। কাশিরাজের ছিন্ন মস্তক কাশী নগরীতে গিয়ে পড়ায় জনগণ ভীত হয়ে পড়ল। কাশিরাজের পুত্র সমস্ত কথা জানতে পেরে অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে গিয়ে শংকরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে শংকর তাঁকে বর দিতে চাইলে সেই কাশিরাজ-তনয় বলল—আমার পিতা কৃষ্ণের হাতে শোচনীয় ভাবে নিহত হয়েছেন। আপনি এমন বর দিন যেন সেই কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কৃত্যার আবির্ভাব ঘটে। মহাদেব তাই অনুমোদন করলেন।

মহাদেবের বরে উৎপন্ন সেই ভীষণাকৃতি কৃত্যা কৃষ্ণকে বধ করার জন্য দ্বারকায় গেল। সেই কৃত্যার ভয়ে দ্বারকার জনগণ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণ সে সময় পাশাখেলায় মত্ত ছিলেন। কৃত্যার আসার কথা তিনি শুনতে পেলেন এবং ধ্যানযোগে সমস্ত কথাই জানতে পারলেন। তিনি তখন সেই কৃত্যাকে বিনষ্ট করার জন্য তাঁর সুদর্শন চক্রকে পাঠালেন। সেই সুদর্শন চক্র ভীষণ অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে কৃত্যাকে অনুসরণ করল। কৃত্যা ভীত হয়ে শেষে বারাণসীতেই প্রবেশ করল। তখন কাশিরাজের প্রচুর সৈন্য সেই বিষ্ণু-

চক্রের অভিমুখে অগ্রসর হল। কিন্তু চক্র নিজের তেজে সবাইকে দগ্ধ করে বারাণসীতে প্রবেশ করল এবং সমগ্র নগরীকেই পুড়িয়ে ফেলল। সেই বিষ্ণুচক্র দীপ্তিমান অবস্থাতেই সমস্ত বিঘ্ন দূর করে পুনরায় ভগবান কৃষ্ণের হাতে ফিরে এলো।

—'পৌণ্ড্রকবাসুদেববধে কাশীদাহবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো আট

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস মুনিদের অনুরোধে বলরামের কীর্তি কথা বলে চললেন—একবার দুর্যোধনের কন্যা লক্ষণার স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণপুত্র শাম্ব উপস্থিত ছিলেন। তিনি লক্ষণাকে দেখে এতই মুগ্ধ হন যে তাকে হরণ করে দ্বারকায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। তাতে দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ক্রুদ্ধ হয়ে শাম্বকে একযোগে আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে শাম্ব পরাজিত হন এবং তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। যাদবদের কানে সে-কথা পেঁছিলে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে কৌরব-প্রধানদের হত্যা করতে উদ্যত হয়। বলরাম তাদের আশ্বাস দিয়ে একাই হস্তিনাপুরে যান। তিনি হস্তিনাপুরের উপকণ্ঠে এক উপবনে বাস করেন, রাজধানীতে প্রবেশ করেন নি। দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবমুখ্যগণ বলরামের আগমন বার্তা পেয়ে তাঁকে যথোচিতভাবে পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। তিনি কৌরবপ্রধানদের জানান যে, উগ্রসেন আদেশ করেছেন যেন শাম্বকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। বলরামের কথায় কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরেরা অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা বলরামকে বলেন—আমরা উগ্রসেনের অধীন নই, সুতরাং তাঁর আদেশও আমরা মানতে বাধ্য নই। আর তোমার কথাতেও আমরা শাম্বকে ছেড়ে দেব না। বলরামকে পরিষ্কারভাবে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে দিয়ে তাঁরা হস্তিনাপুরে যে যাঁর কাজে চলে গেলেন। বলরাম কৌরবদের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইতস্তত পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর ক্রোধে তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে গেল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—এই কৌরবেরা বলগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে পড়েছে। যার আদেশ ইন্দ্রও মানেন, এরা সেই উগ্রসেনের আদেশকে অবহেলা করে। এদের আমি ক্ষমা করব না। আজই পৃথিবীকে আমি কৌরবহীন করব, এবং যারা এদের সাহায্য করতে আসবে, তাদেরও আমি ছাড়ব না। অথবা সমগ্র হস্তিনাপুরকে ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করব। বলরাম তখন তাঁর হল দিয়ে হস্তিনাপুরকে আঘাত করলেন, তাতে সেই নগরী টলে উঠল। তখন সমস্ত কৌরবগণ ভীত হয়ে বলরামের কাছে এসে তাঁকে প্রসন্ন করতে লাগল। তারা অঙ্গীকার করল যে, তারা লক্ষণা-সহ শাম্বকে ফিরিয়ে দেবে। তাদের অঙ্গীকারে বলরাম ক্রোধ সম্বরণ করলেন। তারপর কথামতো কৌরবগণ বিবাহযৌতুক ও লক্ষণা-সহ শাম্বকে তাঁর হাতে সমর্পণ করল। বলরামও তাদের নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন।

—'বলদেবমাহাত্ম্যনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো নয়

ব্যাস বললেন—বলরামের যে আরো কত বিস্ময়জনক কার্য আছে, কে তা বর্ণনা করতে পারে। নরকাসুরের এক বানর বন্ধু ছিল, তার নাম দ্বিবিদ। নরকাসুর কৃষ্ণের হাতে নিহত হলে পর, সে ঠিক করল যে দেবতাদের উপর দিয়ে সে তার বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ

নেবে। সে যজ্ঞ ধ্বংস করতে লাগল এবং নানা ভাবে জনগণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল দেশ, নগর, গ্রাম অযথা পুড়িয়ে দিল। কোথাও বা পর্বত নিক্ষেপ করল জলাশয় এব নদী ও সমুদ্রে। তাতে বন্যা হয়ে জনগণের ক্ষতি হল। তাছাড়া ইচ্ছামতো সে শস্যসমূ নষ্ট করতে লাগল। এতে জনসাধারণ এবং যজ্ঞ বিনষ্ট হওয়ায় দেবতারা অত্যন্ত বিরা বোধ করলেন।

একবার বলরাম পত্নী রেবতী এবং অন্যান্য নারীদের সঙ্গে রৈবত পর্বতের পাদদে স্থিত উদ্যানে বসে সুরাপান করছিলেন। সেই দ্বিবিদ সেখানে এসে বলরামের হল এব মুষল নিয়ে তাঁরই সামনে বিশ্রী আচরণ করতে লাগল; পানপাত্রসমূহ লাথি মে ফেলে দিল। বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করলেন, তাতে সেই দ্বিবিদ কিলকিল ধ্বনি করে তাঁকে অবজ্ঞা করল। বলরাম তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মুষল নিয়ে তাকে আঘা করতে উদ্যত হলেন; সেই দ্বিবিদও বিরাট পাথরের চাঁই নিয়ে তাঁর দিকে নিক্ষেপ করল বলরাম মুষলের আঘাতে তা ভেঙে ফেললেন। তারপর বলরাম তার মাথায় সজো আঘাত করলেন, তাতে সে রক্তবমি করতে করতে মারা গেল। দেবতারা বলরামের উপ পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁর কার্যের প্রশংসা করলেন; কারণ সে যজ্ঞ বিঘ্ন করত।

—'দ্বিবিদবানরবধবর্ণন' নামক অধ্যায়

অধ্যায়ঃ দুশো দশ

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—জগতের কল্যাণসাধনে কৃষ্ণ এভাবে বলরামে সাহায্যে দৈত্যদের এবং দুষ্ট রাজাদের বধ করেন। অর্জুনের সহায়তায় সমস্ত কৌরবসৈন ধ্বংস করে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করেন। পৃথিবীতে সমস্ত অত্যাচারী রাজাদের বধ কে ব্রাহ্মণের অভিশাপ ছলে তিনি নিজের বিখ্যাত যদুকুলকেও ধ্বংস করেন। তারপর মনুষ দেহ পরিত্যাগ করে নিজেরই বিষ্ণুময় অংশে পুনরায় সংস্থিত হন। মুনিরা ব্যাসদেবকে তখন সাগ্রহে জিগ্যেস করেন—সেই ভগবান বিষ্ণু কি ভাবে মানবী-তনু পরিত্যাগ করেন কি ভাবেই ব্রাহ্মণের অভিশাপচ্ছলে নিজ বংশের ধ্বংস সাধন করেন? এ সমস্ত বিবর আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই; দয়া করে আমাদের শ্রোত্রবৃত্তি চরিতার্থ করুন

মুনিদের অনুরোধে ব্যাস সেই অতি পবিত্র কথা বলতে আরম্ভ করলেন—একবা পিণ্ডারক মহাতীর্থে বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ পরস্পর আলাপে রত ছিলেন। যৌবনোন্ম যদুকুমারগণ জাম্ববতীর গর্ভে জাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে স্ত্রীসাজে সজ্জিত করে সেই মুনিদের কাছে গিয়ে উপহাসচ্ছলে তাঁদের জিগ্যেস করল—এই নারী আসন্নপ্রসবা আপনারা তো ক্রান্তদর্শী, ইনি সন্তান বা সন্ততি প্রসব করবেন দয়া করে বলে দিন সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বিজ্ঞ মুনিগণ ধ্যানযোগে সমস্ত কথা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে যদু কুমারদের উদ্দেশে এই কথা বললেন—এই নারী মুষল প্রসব করবে, আর সেই মুষলই যদ বংশের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদুকুমারগণ সমস্ত কথা উগ্রসেনের কাছে গিয়ে নিবেদন করল। মুনিবাক্যকে অভ্রান্ত প্রমাণ করবার জন্য যথাসময়ে শাম্বের গর্ভে একটি মুষল উৎপন্ন হল। উগ্রসেন সেই লোহার মুষলটিকে গুঁড়ো করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। কিছু গুঁড়ো পড়ল সাগরের তীরদেশে, সেগুলো নল খাগড়া রূপে আত্মপ্রকাশ করল। সেই মুষলের চূর্ণ অংশের মধ্যে অল্প পরিমাণ বিশিষ্ট যা রয়ে গেল

কালক্রমে তা একটি মাছের পেটে গেলে, জেলেরা ওই মাছটিকে ধরল। জরা নামক এক ব্যাধ তীর তৈরি করার জন্য তাদের কাছ থেকে সেই মুষলের অবশিষ্টাংশ নিয়ে নিল। কৃষ্ণ এ সমস্ত ঘটনাই জানতেন, তবু কোন প্রতিকারের চেষ্টাই তিনি করলেন না। বিধির বিধানের অন্যথা করার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না।

এদিকে দেবতাদের কাছ থেকে এক দূত এসে কৃষ্ণকে জানাল যে, পৃথিবীতে তিনি প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন। পৃথিবীর ভার অবতারণের জন্য যা যা করবার দরকার ছিল, সে-সবই করা হয়েছে। এখন তিনি যদি চান তো স্বর্গে ফিরে আসতে পারেন, দেবতারা সাগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। আর যদি তিনি মনে করেন যে এখনো তাঁর পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে তিনি থাকতে পারেন। দেবদূতের কথা শুনে কৃষ্ণ তাকে বললেন—তুমি দেবতাদের গিয়ে বল যে, আমি যাদবদের সংহার করে কিছু দিনের মধ্যেই স্বর্গে ফিরে যাচ্ছি। এই যাদবগণই পৃথিবীর ভারস্বরূপ ; এদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যাব। দেবদূত কৃষ্ণের কথা বহন করে নিয়ে চলল দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। এদিকে ভগবানও দ্বারকাপুরীতে বিভিন্ন অশুভ উৎপাত দেখতে পেলেন। তিনি তখন যাদবপ্রধানদের ডেকে বললেন—দ্বারকাপুরীতে এই সব মহান উৎপাত দেখা যাচ্ছে ; এর প্রশমনের জন্য চলুন আমরা প্রভাসে যাই। ভক্ত উদ্ধব তখন বিষ্ণুকে প্রণাম করে বললেন—আমার মনে হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, দ্বারকা-পুরী ধ্বংস হোক ; কারণ, এই অশুভ লক্ষণসমূহ দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—তুমি গন্ধমাদন পর্বতে পবিত্র বদরিকাশ্রমে যাও ; আমার বরে তুমি সেখানে ঈশ্বর-আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে। আমি এই যদুবংশ ধ্বংস করব, দ্বারকাপুরী সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যাবে। তারপর আমি স্বর্গে ফিরে যাব। কৃষ্ণের কথায় উদ্ধব তখন সেই বদরি-কাশ্রমে চলে গেলেন।

এদিকে কৃষ্ণের কথানুসারে যাদবপ্রধানগণও দ্রুতগামী রথে চড়ে প্রভাসে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে সমুদ্রে স্নান করলেন এবং সুরাপান করতে লাগলেন। সুরাপানে মত্ত হয়ে তাঁরা পরস্পর বিবাদ করতে লাগলেন। নিজেদের মধ্যে তাঁরা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তায় ভীষণভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা তখন সমুদ্রতীরে জাত সেই নলখাগড়ার বনে গিয়ে তা দিয়েই আক্রমণ করলেন পরস্পরকে। আসলে সেই নল-খাগড়ার উৎপত্তি শাম্বের গর্ভে জাত সেই মুষলের অবশিষ্টাংশ থেকে। কৃষ্ণ এ সব কাণ্ড দেখে নিজেই কিছু নলখাগড়া তুলে নিয়ে তাদের প্রহার করতে লাগলেন। সেই নল-খাগড়া তাঁর হাতে পড়ে যেন লোহার মতো শক্ত এবং ভারী হয়ে উঠল। সে সময় কৃষ্ণের প্রসিদ্ধ জৈত্ররথ তাঁর সারথি দারুকের চোখের সামনেই সমুদ্রে চলে গেল। কৃষ্ণের বিখ্যাত সেই অস্ত্রসমূহ চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ধনু, শঙ্খ প্রভৃতিও তাঁকে প্রদক্ষিণ করে আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। একমাত্র কৃষ্ণ ও দারুক ছাড়া সমস্ত যাদবগণ সেই যুদ্ধে নিহত হল। তাঁরা উভয়ে প্রভাসে সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করতে করতে দেখলেন যে, বলরাম বৃক্ষমূলে যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর মুখ দিয়ে একটা বিরাট সাপ বেরিয়ে সমুদ্রের জলে প্রবেশ করতে লাগল। তখন স্বয়ং সমুদ্র এসে সেই সর্পকে বরণ করে নিয়ে গেল। বলরামের মহানির্বাণ দেখে কৃষ্ণ সারথি দারুককে বললেন—বলরামের মহানির্বাণ এবং যাদবদের ক্ষয়ের কথা তুমি বসুদেব ও উগ্রসেনকে জানিও। এ কথাও বলো যে, আমিও যোগ অবলম্বন করে দেহত্যাগ করব। দ্বারকাবাসী জনগণকে বলবে যে সমুদ্র দ্বারকাকে

প্লাবিত করবে। সবাই যেন প্রস্তুত থাকে। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন এসে দ্বারকা থেকে তাদের নিয়ে যাবে। তুমি অর্জুনের কাছে গিয়ে আমার নাম করে বলবে যে, সে যেন যাদবদের সাধ্যমতো রক্ষা করে। অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে তুমি দ্বারকায় যাবে; দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও। সে-ই যদুবংশের রাজা হবে।

—শ্রীকৃষ্ণচরিতে 'শ্রীকৃষ্ণনিজধামগমননিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো এগারো

কৃষ্ণের কথামতো দারুক দ্বারকায় এসে সমস্ত কাজই করলেন। অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে এলেন, বজ্রকে যদুবংশের রাজা করলেন। ভগবান বাসুদেবও আত্মাতে বাসুদেবাত্মক পরব্রহ্মের সংযোগ করে সমাধি অবলম্বন করলেন। দুর্বাসা পূর্বে যা বলেছিলেন সেই মতো জানুতে চরণ স্থাপন করে যোগযুক্ত হলেন। সেই সময় জরা নামক ব্যাধ মুষলের অবশিষ্টাংশ থেকে নির্মিত বাণ ধারণ করে সেখানে এসে উপস্থিত হল। কৃষ্ণের চরণতলকে মৃগ মনে করে সে সেই বাণ দিয়ে তা বিন্ধ করল। পরে কাছে এসে বিষ্ণুকে দেখে লজ্জিত হল এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল। কৃষ্ণ তাকে বললেন—তোমার কোন দোষ নেই; বিধির বিধানই এই। তুমি আমার বরে স্বর্গলোক লাভ করবে। সেই সময় স্বর্গ থেকে এক বিমান সেখানে এসে পৌঁছল, এবং তা জরাকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেল। কৃষ্ণ তখন ব্রহ্মভূত অব্যয়, অচিন্ত্য, অজর, অবিনাশী, অপ্রমেয় আত্মাতে আত্মার সংযোগ করে মানবদেহ পরিত্যাগ করলেন এবং পরমজ্যোতির সঙ্গে মিলিত হলেন।

—'কৃষ্ণমানুষোৎসর্গকথন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো বারো

কৃষ্ণকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—দ্বারকায় এসে অর্জুন, কৃষ্ণ, বলরাম প্রমুখ যাদব-প্রধানদের দেহ খুঁজে বের করে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের যে পত্নীদের কথা আগে বলেছি, তাঁরা কৃষ্ণের দেহ আলিঙ্গন করে আগুনে প্রবেশ করলেন এবং তাতেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন। কৃষ্ণের মৃত্যুর কথা শুনে উগ্রসেন, বসুদেব, দেবকী প্রভৃতিরাও আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। সকলের পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করে অর্জুন দ্বারকার রত্নস্বরূপ সহস্র সহস্র কৃষ্ণ-পত্নীদের দ্বারকা থেকে নিয়ে চললেন। কৃষ্ণ পৃথিবীতে যে সুধর্মা নামক সিংহাসন এবং পারিজাত তরু নিয়ে এসেছিলেন কৃষ্ণের মৃত্যুর পর সে-সব স্বর্গেই ফিরে গেল। হরি যেদিন পৃথিবী পরিত্যাগ করে স্বর্গে গেলেন, কলিও সেদিন থেকেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হল। মহাসমুদ্র জনশূন্য সেই দ্বারকা নগরীকে প্লাবিত করল। একমাত্র কৃষ্ণ যে গৃহে থাকতেন, মহাসমুদ্রের গ্রাস থেকে সেইটিই বেঁচে গেল। আজও সমুদ্র সেই কৃষ্ণ-ভবন অতিক্রম করে না। তারপর অর্জুন বহু ধান্য এবং ধনযুক্ত পঞ্চনদের দেশে সেই দ্বারকাবাসী জনগণকে এনে রাখলেন। অর্জুন সেই পঞ্চনদের দেশে কৃষ্ণপত্নীদেরও রাখলেন। সেই দেশ ছিল আভীর নামক দস্যুদের দ্বারা অধ্যুষিত। তারা কৃষ্ণের সুন্দরী পত্নীদের হরণ করবার জন্য সেখানে এসে হাজির হল। কারণ, তারা দেখল যে এতগুলো সুন্দরী নারীর রক্ষক একজন পুরুষ।

তারা কাছাকাছি এলে অর্জুন তাদের সাবধান করে দিলেন, যাতে তারা সে কাজ থেকে বিরত হয়, কিন্তু আভীর দস্যুরা সে কথা না শুনে অর্জুনের সমক্ষেই কৃষ্ণ-পত্নীদের একে একে ধরে নিয়ে চলল। তাদের সেই দুর্বিনীত আচরণে অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে গাণ্ডীব ধনু নিয়ে তাতে শর যোজনা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। যদিও অতিকষ্টে করলেন, সেই শর কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারল না। তিনি যে সব দিব্য অস্ত্র যুদ্ধে প্রয়োগ করতেন, সে সব স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। কিছুই করতে না পেরে নারীদের সম্ভ্রম রক্ষায়, অর্জুন ধনুকের দণ্ড দিয়েই তাদের প্রহার করতে লাগলেন, কিন্তু সেই দস্যুরা তাতে মোটেই বিচলিত হল না। অর্জুন তখন চরম আত্ম-গ্লানিতে কৃষ্ণের জন্য বিলাপ করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করায় তিনিও নির্বীর্য হয়ে পড়েছেন। অর্জুন তখন তাঁর বীরত্বকে ধিক্কার দিয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করলেন। তারপর ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে বজ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। অর্জুন যখন এ রকম মনোবেদনায় নিদারুণ কষ্টভোগ করছেন, তখন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি আমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলে পর আমি তাকে জিগ্যেস করি—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে এমন শ্রীহীন দেখছি কেন? তুমি কি ব্রহ্মহত্যা বা এ রকম কোন গুরুতর পাপ কাজ করেছ? উত্তরে অর্জুন যা যা ঘটেছিল আমাকে সব কথা খুলে বলল। সে আরও বলল—আমাদের যিনি বল, যিনি বীর্য, যিনি তেজ, যিনি পরাক্রম, যিনি ঐশ্বর্য, যিনি শ্রী, সেই হরি আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। সেজন্যই আমি এ রকম হীনবল হয়ে পড়েছি। পূর্বে তাঁরই সহায়তায় বিস্ময়জনক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান আমি করেছি; কিন্তু আজ তাঁর বিরহে আমি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছি। তা না হলে আমার সামনে থেকে অনাথা রমণীদের দস্যুরা কখনও কি নিয়ে যেতে পারত? আমার এই হীনদশা বিচিত্র নয়, নীচ ব্যক্তির অপমানেও আমি যে বেঁচে আছি, এইটেই আশ্চর্যের বিষয়।

অর্জুনের কথা শেষ হলে পর আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—তোমার লজ্জিত হওয়ার কোন অর্থ নেই। কালের গতিই এ রকম। তুমি শোক করো না। কালক্রমে সমস্ত বস্তুরই ক্ষয় হয়—এ কথা তো তুমি জানো। কৃষ্ণের মহিমার কথা যে তুমি বললে, সে সবই বড় অদ্ভুত। পৃথিবীকে ভারমুক্ত করার জন্যই তিনি এসেছিলেন; কাজ শেষ হওয়ায় যথাস্থানে চলে গেছেন। তোমার পরাজয়ের জন্য তুমি শোক করো না। অভ্যুদয়ের সময় পুরুষদের পরাক্রম পরিলক্ষিত হয়। তুমি যে একাই ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অন্যান্য নৃপতিদের পরাজিত করেছ, সে কি তাঁদের কালকৃত পরাভব নয়? বিষ্ণুর প্রভাবে তাঁরা যেমন তোমার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, তুমিও যে দস্যুদের কাছে পরাজিত হলে, সেও তাঁরই প্রভাবে। তুমি যে কৌরবদের পরাজিত করেছ, আর সেই তুমিই যে আভীরদের কাছে পরাজিত হয়েছ—এ সবই সেই ভগবানের লীলা। সুতরাং তুমি শোক করো না। আর সম্ভ্রান্ত সেই কৃষ্ণ-পত্নীদের যে দস্যুরা হরণ করল, তারও কারণ রয়েছে, বলছি শোন। পুরাকালে অষ্টাবক্র মুনি সনাতন পরব্রহ্মের উপাসনায় বহু বর্ষ অতিবাহিত করেন। একবার অসুরেরা পরাজিত হলে পর মেরুপৃষ্ঠে দেবতারা এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। সেই মহোৎসবে যোগদান করতে যাওয়ার সময় সুরনারীরা অষ্টাবক্রকে দেখতে পান। তাঁরা দেখলেন যে, জলের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে এক জটাজুটধারী মুনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তখন রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাগণ তাঁকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করতে লাগল।

অষ্টাবক্র তাদের স্তবে প্রীত হয়ে তাদের ইচ্ছামতো বর গ্রহণ করতে বললেন। তারা তখন সবিনয়ে অষ্টাবক্রকে বলল—আমাদের প্রার্থনা একটিই, আপনি আমাদের এমন বর প্রদান করুন যাতে আমরা পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে পতি রূপে লাভ করতে পারি। অষ্টাবক্র তাদের সেই বরই দান করলেন। তারপর তিনি জল থেকে যেই উঠেছেন, অমনি তাঁর বিকৃতাকার দেখে সেই স্বর্গীয় রমণীরা হেসে উঠল। অষ্টাবক্র তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের অভিশাপ দিলেন। তিনি বললেন—তোমরা এই যে গর্হিত কাজ করলে এ জন্য তোমাদের ফল ভোগ করতে হবে। তোমরা আমার বরে বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করবে সত্যি, তবে শেষে তোমরা দস্যু কর্তৃক অপহৃত হবে। তারা তখন ভীত হয়ে নানা উপায়ে অষ্টাবক্রকে প্রসন্ন করায় তিনি এই বিধান দিলেন যে, পরিণামে তারা স্বর্গে যেতে পারবে। কিন্তু তাঁর বাক্য মিথ্যা হবে না। সুতরাং সেজন্য তোমার শোক করার কোন যুক্তি নেই। তোমরা পাণ্ডবেরাও অচিরেই কালের কবলে পতিত হবে। যা জন্মে তার মৃত্যু অবধারিত, উন্নতিরও পতন রয়েছে, সংযোগ বিয়োগ ছাড়া হয় না, আর সঞ্চয়ের সঙ্গে তো ক্ষয়ের চিরকালীন সহবাস এ সব কথা জেনে বিজ্ঞ লোকেরা আনন্দ বা শোক কিছুই করেন না। তোমরাও রাজ্য পরিত্যাগ করে তপস্যার জন্য বনে যাও। যুধিষ্ঠিরকেও এ কথা জানিয়ে দিও। তারপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে সব কথা জানায়। তখন পাণ্ডবগণ অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে বনে চলে যান। যদুবংশে উৎপন্ন বাসুদেবের এই আচরণ বিস্তৃত ভাবে আপনাদের কাছে পরিবেশন করলাম।

—'শ্রীকৃষ্ণচরিতসমাপ্তিকথন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ দুশো তেরো

শ্রীকৃষ্ণের চরিত কথা শোনার পর মুনিরা ব্যাসদেবকে বললেন—ভগবৎকথা শ্রবণে আমাদের আকাঙ্খার নিবৃত্তি হচ্ছে না ; তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি ভগবান বিষ্ণুর আরও কীর্তিকথা আমাদের শোনান। বিষ্ণু একবার বরাহমূর্তি ধারণ করেছিলেন বলে শুনেছি, কিন্তু বিস্তৃত ভাবে সে ঘটনা জানি না। কি ভাবে তিনি বরাহমূর্তি ধারণ করে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সে-কথা শুনতে আমাদের খুব ইচ্ছে হচ্ছে ; আপনি দয়া করে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের কথা আমাদের শোনান। মুনিদের অনুরোধে ব্যাসদেব সেই পবিত্র কথা বলতে আরম্ভ করলেন। যে সহস্রমুখ, সহস্রজিহ্বা সহস্রচক্ষু, সহস্রচরণ, সহস্রমস্তক, সহস্রকর ও সহস্রমুকুট বিশিষ্ট, অব্যয়, জ্যোতির্ময় দেবকে বেদবিদগণ যজ্ঞে হবন, হোতা, যাবতীয় যজ্ঞীয় দ্রব্য এবং উপকরণ এবং সোমভোজী অস্ত্রধারী রূপে বর্ণনা করেন, সেই পরমপুরুষ বিষ্ণু পৃথিবীর প্রয়োজনে মানুষের কল্যাণ সাধন করতে অসংখ্যবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই জগৎপতি সহস্র যুগ নিদ্রিত থাকার পর সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে ব্রহ্মা, শিব, দেবতাগণ, সপ্তর্ষি, নাগগণ অপ্সরাগণ, সনৎকুমার, মনু প্রভৃতি মুনিগণ এবং অগ্নি প্রভৃতি সৃষ্টি করার পর পুর নগর, রাষ্ট্র প্রভৃতিও সৃষ্টি করেন। তারপর কালক্রমে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ বিনষ্ট হলে পর পরমপুরুষ বিষ্ণু সাগরজলে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। বিষ্ণুর নাভিকমলে ব্রহ্মার জন্ম হয়। বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যের উৎপত্তি হয় ভগবান বিষ্ণু তাদের বর দিয়ে নিজেই তাদের সংহার করেন। বিষ্ণুর এই কার্যাবলী

পৌষ্করক অবতারেই নাকি হয়। তারপর তিনি বরাহ অবতারে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। বিষ্ণু যে বরাহমূর্তি ধারণ করেন তাতে তার চারটে পা হল চার বেদ, তার খড়্গ হল যূপ, দাঁত হল যজ্ঞ, মুখ হল চিন্তাশীল মন, জিহ্বা হল অগ্নি, রোম হল কুশ, মাথা হল ব্রহ্মা, দুই চোখ হল দিন ও রাত, কর্ণালংকার হল বেদাঙ্গসমূহ, নাক হল আজ্য বা ঘৃত, স্বর হল সামধ্বনি, নখসমূহ প্রায়শ্চিত্ত, পায়ু হল পশু, অস্ত্র হল উদ্গাতা, লিঙ্গ হল হোম, মুখজাত ধ্বনি হল মন্ত্রসমূহ, রক্ত হল সোম, কাঁধ হল বেদি, গন্ধ হল হবি, বেগ হল হব্য কব্য, দেহ হল প্রাগ্বংশ, হৃদয় হল দক্ষিণা, আসন হল উপনিষৎসমূহ। সেই বরাহমূর্তিধারী বিষ্ণু নিজ পত্নী ছায়ার সঙ্গে সাগরসলিলে নিমগ্ন পৃথিবীকে নিজের দংষ্ট্রা অর্থাৎ খড়্গ দিয়ে উদ্ধার করেন। এর পর নৃসিংহ অবতার। পুরাকালে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রায় বারো হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করে। ভগবান শঙ্কর তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হন। ব্রহ্মা তাঁর হংসযুক্ত বিমানে করে সেই অসুরপতির সামনে এসে তাকে বর গ্রহণ করতে বলেন। হিরণ্যকশিপু তখন ব্রহ্মাকে বলল—আপনি আমাকে এমন বর দিন যাতে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা, পর্বত, গাছ বা শুকনো কোন পদার্থের দ্বারা কিংবা আকাশে বা ভূমিতে আমাকে কেউ হত্যা করতে না পারে ; যে কেবল এক হাতের আঘাতে ভৃত্য, বল এবং বাহন-সহ আমাকে নাশ করতে পারবে, সে-ই আমার হত্যাকারী হবে। সূর্য, চন্দ্র, দেবতা, যক্ষ প্রভৃতি সবাই যেন আমার প্রভুত্ব মেনে চলে। ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে প্রার্থিত সমস্ত বরই প্রদান করলেন। এদিকে ব্রহ্মার বরে হিরণ্যকশিপু দুর্বার হয়ে উঠল। দেবতারা এবং মুনিরা তখন ব্রহ্মার কাছে এসে তাঁকে বললেন—আপনার বরে হিরণ্যকশিপু আমাদের উৎপীড়ন করবে। আপনি এর বধের উপায় চিন্তা করুন। ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন—তোমাদের কোন ভয় নেই। তপস্যার যে ফল সেই ফল হিরণ্যকশিপুকে দিতেই হবে, তবে তপস্যা ক্ষয় হলে ভগবান বিষ্ণুই একে বধ করবেন। ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা নিশ্চিন্ত হয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

এদিকে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে সেই হিরণ্যকশিপু জগতের অমঙ্গল সাধন করতে লাগল। মুনিদের অপমানিত করল ; দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই স্বর্গে বাস করতে লাগল। দেবতাদের যজ্ঞভাগহীন করে দৈত্যদের যজ্ঞভাগ পাইয়ে দিল। তখন তার উৎপীড়নে পীড়িত হয়ে সূর্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব এবং মরুৎগণ বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালেন। তাঁরা বিষ্ণুকে বললেন—হিরণ্যকশিপুর হাত থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর। তুমি আমাদের পরম দেবতা, তুমিই আমাদের পরম গুরু। তুমি আমাদের রক্ষা কর। বিষ্ণু তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমি তোমাদের বলছি, কোন ভয় নেই তোমাদের। অচিরেই সেই অত্যাচারী দৈত্যকে অনুচর-সহ বধ করব। তিনি তারপর নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করলেন ; সেই নৃসিংহের অর্ধেক শরীর মানুষের মতো বাকী অর্ধেক সিংহের মতো। ওই নৃসিংহ মূর্তির দেহের কান্তি ঘন মেঘের মতো, এর স্বরও ঘন মেঘের মতো গম্ভীর, তেজও ঘন মেঘের দীপ্তির মতো এবং বেগও মেঘের মতোই দ্রুত। তিনি হিরণ্যকশিপুর সামনে আবির্ভূত হয়ে এক হাতের একবার মাত্র আঘাতের দ্বারাই তাকে মেরে ফেললেন।

এর পর বামন অবতারের কথা। পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু দৈত্যবিনাশক বামনমূর্তি ধারণ করে দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞসভায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেই যজ্ঞস্থলে বিপ্রচিত্তি, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, হয়গ্রীব, কেতুমান, পুষ্কর, প্রহ্লাদ, কুম্ভ, সংহ্লাদ, নমুচি শম্বর, বৃত্র, বিরোচন,

প্রলম্ব, নরক, বাতাপি, অসিলোমা, বাষ্কল, কেশি, রাহু প্রভৃতি প্রখ্যাত দানবগণ ছাড়াও কূর্ম, উলূক, উট, কম্বুগ্রীব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শী দানবগণ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র-সহ বিষ্ণুকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। বামনমূর্তিধারী বিষ্ণু তখন বিরাট আকৃতি ধারণ করে সেই অসুরদের নিহত করলেন। তাঁর মূর্তি এতই দীর্ঘাকৃতি হয়ে উঠল যে, চন্দ্র এবং সূর্য পর্যন্ত তাঁর বুক থেকে নামতে নামতে ক্রমশ জানুদেশের সমান স্থানে বিরাজ করতে লাগল। বিষ্ণু এ ভাবে সেই বলিকে নিহত করে ধনরত্ন পূর্ণ সমগ্র পৃথিবী ইন্দ্রকে দান করেন বলে শোনা যায়।

এবার তাঁর দত্তাত্রেয় অবতারের কথা বলব। কালবশে অধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় ধর্ম যখন শিথিল হয়ে আসে, বেদ, যজ্ঞ এবং উপাসনা বিলুপ্ত হয়, বর্ণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে সত্য বিলুপ্ত হয়, তখন সেই মহাত্মা বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে যজ্ঞ এবং প্রক্রিয়া-সহ বেদসমূহের পুনরুদ্ধার করেন। সেই দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ কার্তবীর্যকে এই বর প্রদান করেন যে, তার দুই হাত ক্রমে এক হাজার হাতে পরিণত হবে। সে সমগ্র পৃথিবীকেই পালন করবে।

এর পর পরশুরাম অবতারের কথা বলছি। ভৃগুর পুত্র পরশুরাম-রূপে সনাতন পুরুষ বিষ্ণু যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা অর্জুনকে তাঁর কুঠারের আঘাতে নিহত করেন। তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে তিনি কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবীই দক্ষিণারূপে দান করেন। তিনি আজও মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যায় নিরত। তারপর রাম অবতারের কথা শোনাচ্ছি। চতুর্বিংশযুগে ভগবান বিষ্ণু অযোধ্যার মহারাজ দশরথের পুত্র রামরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ অবতারে নিজেকে তিনি চারভাগে বিভক্ত করেই উৎপন্ন হন। পিতার আজ্ঞা পালনের জন্য সেই রাম ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনবাসে থেকে তপস্যা করেন। লক্ষ্মীই সীতারূপে আবির্ভূত হয়ে রামের সঙ্গে তপশ্চারণ করেন। তিনি জগতের অহিতকারী রাক্ষসরাজ রাবণকে হত্যা করেন। সুগ্রীবের অনুরোধে তিনি বানর-রাজ বালীকে হত্যা করে সেই সুগ্রীবকেই কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসান। তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারী দানব মারীচ এবং সুবাহুকে নিহত করেন। বিশ্বামিত্র ছিলেন তাঁদের গুরু। তিনি রাম এবং লক্ষ্মণকে অনেক অস্ত্র দান করেন। মিথিলার রাজা জনকের সভায় গিয়ে বিখ্যাত হরধনু তিনিই ভেঙে ফেলেন। রামের রাজত্বকালে সবাই পরম সুখে বাস করত। সে সময় দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘটে নি, তেমনি রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি কোন মানুষিক দুর্যোগও ঘটে নি। রামরাজত্বে প্রজারা দীর্ঘ দিন সুখেই বেঁচে ছিল। রোগ-শোকের কোন বালাই ছিল না সে সময়। পুরাণপ্রাজ্ঞগণ বলেন রাম নাকি দশ হাজার বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে হত্যা করে স্বর্গে ফিরে যান।

তারপর কৃষ্ণ অবতারের কথা। কৃষ্ণ অবতারে তিনি মথুরায় জন্মগ্রহণ করে কংসবধ প্রভৃতি যে সব বিস্ময়জনক কার্য করেছেন, সে তো আপনাদের একটু আগেই শোনালাম। এর পর কল্কী অবতারের কথা। শোনা যায় শম্ভল গ্রামে বিষ্ণু কল্কীরূপে জন্মাবেন। ব্রহ্মবাদিরা এ ছাড়াও অনান্য অবতারের কথা বলেন। বিষ্ণুর সমস্ত অবতারের কথা সংক্ষেপে আপনাদের শোনালাম। যারা এই পবিত্র কথা ভক্তিভরে শোনে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

—'প্রাদুর্ভাবানুকীর্তন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো চৌদ্দ

মুনিরা পুনরায় ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—প্রাণীসমূহের উৎপত্তি, প্রলয় এবং কর্মের গতি সমস্তই আপনি বিদিত আছেন। আমরা শুনেছিলাম যে যমলোকের পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং সে পথের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে ভয়ের সম্ভাবনা। তবু কি করে প্রাণীসমূহ সে পথে যায়? মানুষ কোন্ উপায়ে, কি রকম দান, ধর্ম বা নিয়ম পালন করলে নরকযাতনা ভোগ করে না? আবার কোন্ কোন্ কর্ম করলেই বা মানুষ স্বর্গে যেতে পারে? মনুষ্যলোক থেকে যমলোকের দূরত্বই বা কত? এ সমস্ত কথাই আপনি জানেন; দয়া করে আমাদের বলুন। আমরা এ কথা আপনার কাছ থেকে শোনার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে পড়েছি।

মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বললেন—যা কখনোই স্থির থাকে না সেই অজর সংসারচক্রের কথা আপনাদের শোনাচ্ছি। মনুষ্যলোক থেকে যমলোকের দূরত্ব ছিয়াশি হাজার যোজন পরিমিত। এই পথ তপ্ত তামার মতো সর্বদাই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। আয়ু ফুরিয়ে গেলে প্রত্যেক প্রাণীকে ঐ পথে অবশ্যই যেতে হয়। যারা পুণ্য কর্ম করে তারা সুখে এবং যারা পাপ কর্ম করে তারা দুঃখে সেই পথ অতিক্রম করে থাকে। যমরাজ্যে বাইশটি নরক আছে—রৌরব, রৌদ্র, শূকর, তাল, কুম্ভীপাক, শল্মিল, বিমোহন, কীটাদ, কৃমিভক্ষ, লালাভক্ষ, ভ্রম, অগ্নিজ্বাল, সন্দংশ, শুনভোজন প্রভৃতি এবং পুয়বহা, রুধিরাম্ভ এবং বৈতরণী প্রভৃতি নদী এবং অসিপত্রবন প্রভৃতি বিভিন্ন যাতনাময় স্থান রয়েছে। যে পথে যমলোকে যেতে হয় সেপথে এমন কোন বিশ্রামস্থান নেই যাতে প্রাণীরা খানিক স্বস্তি বোধ করতে পারে। পরমায়ু শেষ হয়ে গেলে সবাইকেই আত্মীয় পরিজন ছেড়ে সেই পথে যেতে হয়। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোন জীব যে কোন সময়ে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সবাইকেই মৃত্যু আক্রমণ করে। বিদেশে থাকুক, কিংবা নিজের বাড়িতে থাকুক, পর্বতে থাকুক কিংবা স্থলদেশে থাকুক, কিংবা জলেই থাকুক—সমস্ত অবস্থাতেই সমস্ত প্রাণীকে ইহলোকে নির্দিষ্ট আয়ু ফুরিয়ে গেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণত্যাগ করে সেই পথে যেতে হয়। যে কোন কারণেই হোক আয়ু যখন শেষ হয়ে আসে, তখন দেহ প্রাণহীন হয়ে পড়ে। প্রাণীগণ তখন সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করে নিজের কর্মানুযায়ী দুঃখ অথবা সুখভোগের জন্য অন্য দৃঢ় শরীর ধারণ করে। সেই দেহকে বলা হয় যাতনা দেহ। প্রবল বায়ুবশে শরীরের উষ্ণতা ক্ষীণ হয়ে আসে। তাতে উদান নামক বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়ে গৃহীত খাদ্যের স্বাভাবিক কাজকে ব্যাহত করে দেয়; তাতেই জীব প্রাণত্যাগ করে। যে কখনো মিথ্যা কথা বলে না, কাউকে কষ্ট দেয় না, যে শ্রদ্ধাবান, তার সুখমৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি দেবতা এবং ব্রাহ্মণের পূজা করে, যে শুদ্ধাচারসম্পন্ন, অসূয়াহীন, বদান্য, তার সুখমৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ বা দ্বেষবশে ধর্ম পরিত্যাগ করে না, তারও সুখমৃত্যু হয়। যারা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে জলদান করে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্নদান করে, তাদের মৃত্যু হয় সুখের। ধনদানকারী ব্যক্তিরা শীত এবং চন্দনপ্রদানকারী ব্যক্তিরা তাপ জয় করতে পারে। জ্ঞানদানকারী ব্যক্তিরা মোহহীন হয় আর দীপদানকারী ব্যক্তিরা সেই যজ্ঞপথের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পরিত্রাণ পায়। যে গুরু যথোপযুক্তভাবে শিক্ষা দান করেন না এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তারা সকলেই মৃত্যুকালে মোহে অভিভূত হয়। তাদের নিয়ে যাবার জন্য যখন ভীষণাকার

যমদূতেরা আসে তখন তারা সেই যমদূতদের দেখে ভীত হয়ে পড়ে এবং পরিজনদের পরিত্রাণ করার জন্য ডাকতে থাকে। কিন্তু দুরন্ত কাশি এসে তাদের বাকরুদ্ধ করে দেয়। তখন সে দেহ পরিত্যাগ করে বায়ুময় এক দেহ ধারণ করে; কৃতকর্মের ফল ভোগের জন্যই সে দেহ ধারণ করতে হয়। যমদূতগণ তখন তাকে ভীষণ পাশে বেঁধে সেই দুর্গম এবং ভয়ংকর পথ দিয়ে যমরাজের কাছে নিয়ে যায়। নানা হিংস্র পশুকে বাহনরূপে সঙ্গে নিয়ে ভীষণাকার যমদূতগণ ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র সহ মৃতব্যক্তিকে যমরাজের কাছে নিয়ে যেতে আসে। জীব যে স্বকর্মজনিত যাতনা-দেহ ধারণ করে, যমদূতগণ সেই দেহকেই যমভবনে নিয়ে যায়। যমলোকে যাওয়ার পথ কুশ, কাঁটা, উইপোকা, পাথর. কাঁকর প্রভৃতিতে ভর্তি হয়ে থাকে। যারা বিশ্বস্ত প্রভু. বন্ধু বা স্ত্রীলোককে হত্যা করে. তারা যমদূতদের অস্ত্রের আঘাত সহ্য করতে করতে সেই পথে যায়। নিরপরাধ প্রাণীদের যারা হত্যা করে. সেই পথে যেতে যেতে রাক্ষসরা তাদের উৎপীড়ন করে। যারা পরনারীর গায়ের কাপড় কেড়ে নেয়, তাদেরকে প্রেতের আকারে উলঙ্গ হয়ে সেই পথ অতিক্রম করতে হয়। যারা কাপড়-চোপড়, ধান, সোনা, ক্ষেতের শস্য এবং ঘর চুরি করে, তারা যমদূতদের লাঠির ভীষণ আঘাত খেতে খেতে যমলোকের পথ অতিক্রম করে। যারা ব্রাহ্মণের বিত্ত চুরি করে কিংবা ব্রাহ্মণকে প্রহার করে. তাদেরকে কাঠের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে তাদের চোখ, কান ও নাক কেটে নেয় যমদূতেরা।

এভাবে যমদূতগণ প্রাণীদের শেষে যমনগরে পেঁছে দেয়। সেই নগরের আয়তন প্রায় এক লক্ষ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। তার মধ্যে একটি সুন্দর প্রাসাদ রয়েছে; ঐ প্রাসাদের চারটি দ্বার। ইন্দ্রনীল, মহানীল এবং পদ্মরাগ প্রভৃতি বিভিন্ন মণির দ্বারা ভূষিত সেই প্রাসাদ। তার পূর্বদিকের দ্বারটি অত্যন্ত মনোরম। হীরা, ইন্দ্রনীল এবং বৈদূর্য প্রভৃতি মণি-মুক্তায় ভূষিত; দেবতা. যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি ঐ দ্বারে রয়েছে, অপ্সরাদের গীতধ্বনিতে সেই স্থান মুখরিত হয়ে আছে। সেই দ্বার দিয়ে দেবতা, ঋষি. যোগী, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, যক্ষ, বিদ্যাধর ও মহান সর্পগণ প্রবেশ করেন। উত্তর দিকের দ্বারটি ঘণ্টা, চামর, ছত্র প্রভৃতির দ্বারা ভূষিত, নানা রত্নে অলংকৃত, বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনিতে মুখরিত এবং বেদধ্বনিতে মন্দ্রিত হয়ে থাকে। যারা গ্রীষ্মকালে জল দেয়, শীতে অগ্নি দান করে, যারা প্রিয় বাক্য বলে, মাতাপিতার সেবাশুশ্রূষা করে এবং যারা সত্য কথা বলে, সেই সব ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রবেশের জন্য এই উত্তর দ্বার নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। পশ্চিম দিকের দ্বারটি রত্নখচিত এবং মধুর ধ্বনিতে মুখরিত। শিবের যারা ভক্ত, তাদের প্রবেশের জন্য এই দ্বার নির্দিষ্ট। যে সব ব্যক্তি সমস্ত তীর্থে পবিত্রচিত্তে স্নান করে, কিংবা যারা প্রভু. বন্ধু বা সৎলোকের জন্য অথবা গোরক্ষার জন্য নিহত হয়, তারা ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে থাকে। যারা পঞ্চ অগ্নির সেবায় তৎপর. কালঞ্জর পর্বতে যারা প্রাণ ত্যাগ করে কিংবা মহৎ উদ্দেশ্যে অনশনব্রত অবলম্বন করে মারা যায়, তারাও ঐ পশ্চিম-দিকের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে। ঐ প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে যে দ্বারটি রয়েছে, তা সমস্ত প্রাণীরই ভয় উৎপাদন করে। ঐ দ্বার অন্ধকারে আবৃত থাকে; নানা হিংস্র প্রাণী ও সাপ প্রভৃতি ঐ দ্বারে সর্বদাই প্রাণীসমূহের ভয় উৎপাদন করে। যারা দুষ্কর্ম করে তাদের প্রবেশের জন্যই সেই দ্বার নির্দিষ্ট। যারা ব্রাহ্মণ, গরু, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, শরণাগত. বিশ্বস্ত স্ত্রী বা বন্ধু অথবা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করে, যারা নিজের কন্যা এবং পুত্রবধূর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত থাকে, কাউকে বিষ দেয়, যারা সর্বদাই অপরের দোষ দেখে,

অপরের ভূমি, কাপড়-চোপড়, অলংকার প্রভৃতি অপহরণ করে, যারা কন্যাকে বিক্রি করে, মাতাপিতাকে অবমাননা করে এবং যারা কূট সাক্ষ্য প্রদান করে তাদের প্রবেশের জন্যই এই দক্ষিণ দিকের দ্বার নির্দিষ্ট।

—'যমলোকমার্গস্বরূপনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো পনেরো

মুনিরা ব্যাসকে অনুরোধ করলেন—পাপীগণ দক্ষিণ পথ দিয়ে কিভাবে সেই যব ভবনে প্রবেশ করে, আমরা তা শুনতে চাই ; দয়া করে আমাদের সে-কথা বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—সেই দক্ষিণ দ্বার অতি ভীষণ। ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষসেরা সেই দ্বারে সর্বদাই বিরাজ করে। যে পথ দিয়ে সেখানে আসতে হয়, সেই পথ তীব্র কণ্টকযুক্ত, ক্ষুরের ধারের মতো তীক্ষ্ন এবং কাঁকরে পরিপূর্ণ। কোথাও গভীর খাত, কোথাও হিমশৈল, কোথাও প্রচণ্ড উত্তাপ, কোথাও হিংস্র শ্বাপদ প্রাণীসমূহ সেই পথের সর্বত্র জুড়ে রয়েছে। পাপী ব্যক্তিরা ভীষণাকার যমদূতদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে এই পথেই দক্ষিণ দ্বারে পেঁছিয়। সেই পথের কোথাও বিশ্রামের স্থান নেই, এককণা খাবার কিংবা এক বিন্দু জল বা প্রাণভরে একমুঠো নিশ্বাস নেওয়ার মতো মুক্ত বাতাসও থাকে না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, উৎপীড়নে কাতর হয়ে যখন সেই পাপীরা যমদূতের কাছে এককণা খাবার কিংবা এক আঁজলা জল চায়, ভীষণাকৃতি এবং নিষ্ঠুর যমদূতগণ তখন তাদের কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করে। শুধু তিরস্কার করেই তারা ক্ষান্ত হয় না, ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে পাপীদের প্রহার করতে থাকে। শ্বাপদ, নরমাংসাশী প্রাণীরাও তাদের লোভী রসনা দিয়ে পাপীদের মাংসের আস্বাদ লাভ করতে আসে। এভাবে সেই যমদূতগণ পাপীদের যমরাজের কাছে নিয়ে আসে। পাপী ব্যক্তিরা যমরাজের মূর্তি দেখে আরও ভয় পেয়ে যায়। সেই যমরাজের চোখ ভ্রূকুটি কুটিল, চুল উপর দিকে ওল্টানো, তাঁর আঠারোটি হাত, সেই হাতে রয়েছে ভীষণ অস্ত্রসমূহ, তিনি মহিষের উপর বসে রয়েছেন। প্রলয়-কালীন মেঘের গর্জনের মতো কণ্ঠস্বর। তিনি যেন সমুদ্রকেও পান করতে উদ্যত, যেন ত্রৈলোক্য গ্রাস করতে তিনি উদ্যম করছেন, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। তাঁর সামনে রয়েছে কালানলের মতো ভীষণ মৃত্যু, প্রলয়ানলের মতো দীপ্তিমান ভয়ংকর কৃতান্ত, মারী, মহামারী, কালরাত্রি এবং ভয়ানক রূপধারী বিবিধ ব্যাধি। যমরাজের চারদিকে রয়েছে ভীষণাকার যমদূতেরা ; তাদের হাতে ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র। চিত্রগুপ্ত তাঁর কাছেই বসে রয়েছেন। চিত্রগুপ্ত তাদের পাপকাজের জন্য ভর্ৎসনা করেন। পাপী ব্যক্তিদের কর্ম অনুযায়ী যমরাজ তাদের যথাযোগ্য নরকসমূহে পাঠিয়ে দেন ; যমদূতেরা তাদের সেই সেই নির্দিষ্ট নরকে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে উৎপীড়ন করে। এভাবে সেই যমদূতেরা বিভিন্ন পাপকর্মের অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিদের যমের কাছে নিয়ে যায় এবং তাদের কৃতকর্মের কথা বলে। যম তাদের জন্য নির্দিষ্ট যে যে নরক আছে, সেখানে তাদের পাঠিয়ে দেন। পাপী ব্যক্তিরা সেই সেই নরকে গিয়ে নিদারুণ যম-যন্ত্রণা ভোগ করে।

এবার আপনাদের বিভিন্ন নরকের নাম, স্বরূপ প্রভৃতি বর্ণনা করছি এবং মানুষ কি কাজ করলে সেই সেই নরকে যায়, সে-কথাও বলছি। মহাবীচি নামে এক বিখ্যাত নরক আছে ; গোহত্যাকারী ব্যক্তিরা সেই নরকে গিয়ে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে। কুম্ভীপাক

নামে যে নরক আছে, তা লক্ষ যোজন বিস্তৃত। এই নরক তপ্ত বালি এবং জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিপূর্ণ; যারা ব্রাহ্মণদের হত্যা করে, অন্যায়ভাবে ভূমি আহরণ করে এবং গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ করে, তারাই এই নরকে গিয়ে দগ্ধ হয়। রৌরব নামক নরক জ্বলন্ত বজ্র এবং নারাচ নামক অস্ত্রে পরিপূর্ণ এবং দৈর্ঘে ও প্রস্থে তা ষাট হাজার যোজন পরিমিত; যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে, তারাই এই ভীষণ নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। মঞ্জুষ নামক যে নরক আছে তা জ্বলন্ত লোহার মতো সর্বদাই উত্তপ্ত রয়েছে; যারা অন্যায়ভাবে কোন প্রাণীকে আবদ্ধ করে, তারাই এই নরকে দগ্ধ হয়। অপ্রতিষ্ঠ নামে যে নরক আছে তা পূয, মূত্র এবং বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ; যারা ব্রাহ্মণদের পীড়ন করে, তারাই এই নরকে গিয়ে কষ্ট ভোগ করে। বিলোপন নামক যে নরক আছে, তা জ্বলন্ত লাক্ষা পূর্ণ; মদ্যপান-কারী ব্যক্তি ঐ নরকে কষ্ট ভোগ করে। মহাপ্রভ নামে যে নরক আছে, তা প্রদীপ্ত এবং দীর্ঘ শূলে আকীর্ণ; যারা পতি ও পত্নীর পারস্পরিক প্রেমে ফাটল ধরায়, তারাই ঐ নরকে গিয়ে যমযন্ত্রণা ভোগ করে। জয়ন্তী নামক নরক লৌহ এবং শিলায় পরিপূর্ণ; যে সব ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত, তারাই ঐ নরকে যায় এবং নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করে। শাল্মল নামে যে নরক আছে তা কাঁটায় ভর্তি; যে নারী বহু পুরুষকে দেহ দান করে, তারাই ঐ নরকে যায় এবং কষ্ট ভোগ করে। যারা অসত্য কথা বলে যমদূতেরা সাঁড়াশী দিয়ে তাদের জিভ ছিঁড়ে নেয়, তাদের গতিও এই নরকেই হয়। মহারৌরব নামে যে নরক রয়েছে, তা চৌদ্দ হাজার যোজন বিস্তৃত। যারা মা, বোন, কন্যা বা পুত্রবধূর সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং যারা স্ত্রী, বালক বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অকারণে হত্যা করে, তারা অনন্তকাল এই ভীষণ নরকে থেকে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। তাছাড়া যারা গ্রাম, ঘর-বাড়ি বা শস্যক্ষেত্র আগুনে পুড়িয়ে দেয় তারাও এই নরকে যায়। তামিস্র নামে যে নরক রয়েছে, তা লক্ষ যোজন বিস্তৃত; যারা পরদ্রব্য চুরি করে, তাদের গতি হয় এই নরকে। মহাতামিস্র নামক নরক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে এবং ভীষণাকৃতি জোঁক এবং সাপ এই নরকে সর্বদাই বিচরণ করে। যারা পিতামাতাকে হত্যা করে এবং যারা বিশ্বাসঘাতক, তারাই এই নরকে যায় এবং নিদারুণ যমযন্ত্রণা ভোগ করে। অসিপত্রবন নামক নরক অত্যন্ত দুঃখদায়ক; অযুত যোজন পরিমিত স্থানে এই নরক অবস্থান করে। যারা বন্ধুদের হত্যা করে, তাদের এই নরকেই গতি হয়। করম্ভবালুকা নামে যে নরক আছে, তা জ্বলন্ত অঙ্গার, তপ্ত বালুকা এবং কাঁটায় পরিপূর্ণ; যারা মিথ্যা উপায়ে জনসাধারণকে উৎপীড়ন করে, তাদের এই নরকেই গতি হয়। কাকোল নামক নরক কৃমি ও পূযে পরিপূর্ণ। যারা অপরের সামনে একাই স্বার্থপরের মতো ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করে, তাদের গতি হয় এই নরকে। কুড্মল নামক নরক পূয, বিষ্ঠা, মূত্র ও রক্তে পরিপূর্ণ। যারা অতিথি সেবা করে না, পিতামাতার সেবা করে না, শাস্ত্রানুমোদিত কর্তব্য সম্পাদন করে না, তাদেরই এই নরকে গতি হয়। মহাবট নামে যে নরক রয়েছে, তা শর ও কৃমি কীট প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ; যারা কন্যা বিক্রয় করে, সেই নরাধম ব্যক্তিরা এই নরকে যায় এবং নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে। তিলপাক নামে যে নরক আছে, তাতে যারা অযথা অপরকে পীড়া দেয়, সেই সব ব্যক্তিরাই যায় এবং যমযন্ত্রণা ভোগ করে। তৈলপাক নামক নরক জ্বলন্ত তেলে পরিপূর্ণ থাকে। যারা শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করে, তারাই ঐ নরকে যায়। বজ্রকপাট নামে যে নরক আছে, তাতে দুধ বিক্রয়কারী ব্যক্তিদের গতি হয়। নিরুচ্ছ্বাস নামক নরকে বাতাস খুব কম এবং তা অন্ধকারে সমাবৃত। ব্রাহ্মণদের কোনো

বস্তু দানের সময় দানকারীকে যারা বাধা দেয়, তাদের গতি এই নরকেই হয়। অঙ্গারোপচয় নামক নরক জ্বলন্ত অঙ্গারে সমুজ্বল। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কোন কিছু দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রাখে না, তারাই ঐ নরকে যায়। মহাপাতী নামে যে ভীষণ নরক আছে, মিথ্যাবাদী লোকদের গতি হয় সেখানেই।

মহাজ্বাল নামক নরকে পাপবুদ্ধি ব্যক্তিদের গতি হয়। যারা নিষিদ্ধ রমণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রচনা করে তারা ক্রকচ নামক নরকে গমন করে। গুড়পাক নামে যে ভীষণ নরক আছে, তা জ্বলন্ত গুড়হ্রদসমূহে পরিপূর্ণ। চতুর্বর্ণ ব্যবস্থাকে যারা অবমাননা করে তারাই ঐ নরকে নিপতিত হয়। ক্ষুরধার নামক নরক তীক্ষ্ন ক্ষুরসমূহে পরিপূর্ণ। যারা ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করে, তাদের এই নরকেই গতি হয়। অম্বরীষ নামক নরক প্রলয়কালীন ভীষণ অগ্নির মতো প্রদীপ্ত; যারা সোনা চুরি করে, তারাই ঐ নরকে গমন করে। বজ্রকুঠার নামে যে নরক আছে, তা বজ্র দ্বারা সমাকুল। যারা বিনা প্রয়োজনে গাছ কেটে ফেলে, তাদের এই নরকেই গতি হয়। পরিতাপ নামক নরকে বিষদানকারী এবং মধুহরণকারী ব্যক্তিরাই গমন করে। কালসূত্র নামক যে নরক আছে তাতে অপরের শস্যলুণ্ঠনকারী ব্যক্তিদের গতি হয়। শ্লেষ্মা এবং থুৎকার পরিপূর্ণ কশ্মল নামক যে নরক আছে, তাতে যারা বৃথাই প্রাণী হত্যা করে, তাদেরই গতি হয়। উগ্রগন্ধ নামে যে নরক আছে, তা লালা, মূত্র ও পুরীষে পরিপূর্ণ। যারা পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করে না তারাই ঐ নরকে যায়। দুর্দ্ধর নামক নরক জোঁক ও বিছেয় ভর্তি; যারা ঘুষ নেয়, তারাই ঐ নরকে দীর্ঘদিন দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। বজ্রমহাপীড়া নামে যে নরক আছে, তা বজ্র দ্বারা নির্মিত। যারা অপরের ধন, ধান বা সোনা চুরি করে, তাদের ঐ নরকেই গতি হয়। যারা প্রাণী হত্যা করে খায়, যমদূতগণ তাদের দীর্ঘদিন নিজেদের মাংসই খাওয়ায়।

যে সব ব্যক্তিরা অপরের শয্যা, বস্ত্র প্রভৃতি অপহরণ করে, যমদূতেরা তাদের ক্ষুরধার অস্ত্রে পীড়া দেয়। যারা অপরের ফল অথবা পত্র হরণ করে, যারা কায়মনোবাক্যে ধর্মাচরণে বিমুখ, তারা যমলোকে ঘোর যাতনা ভোগ করে। ইহলোকে স্বল্পমাত্র পাপকর্ম করলেও যমলোকে কষ্ট পেতে হয়। যারা মূর্খ, বলদৃপ্ত তারা সাধু ব্যক্তির উপদেশ গ্রাহ্য না করে পাপাচরণ করে; অবশেষে যমলোকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। নরকবাস ভীষণ কষ্টকর, স্বর্গবাস সুখজনক; ইহলোকে পুণ্যজনক কর্ম করে মানুষ স্বর্গ লাভ করে আর পাপাচরণ করে নরকে যাতনা ভোগ করে।

—'নরকগতপৃথকযাতনাকীর্তন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ দুশো ষোল

মুনিরা তারপর ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—যমপথের ঘোর দুঃখ, যমনগরের দ্বার এবং নরকসমূহের বিবরণ আমাদের শুনিয়েছেন। মানুষ যাতে অক্লেশে সেই ভীষণ যমপথ অতিক্রম করতে পারে, এমন কোন উপায় যদি থাকে, তবে তাই বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—ইহলোকে যারা অহিংসাপরায়ণ, গুরুসেবায় তৎপর, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের যারা পূজা করে তারা সুখেই সেই ঘোর দুর্গম যমপথ অতিক্রম করতে পারে। যারা ব্রাহ্মণদের ভক্তিভরে দান করে, তারা সুখেই ওই পথ অতিক্রম করতে পারে। যারা অন্তরে

এবং বাইরে নির্মল থেকে সত্যবাদী হয়, সেই সব দেবোপম ব্যক্তিরাও সুন্দর বিমানযোগে যমলোকে যায়। যারা গো দান করে, বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশে সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করে তারাও মণিচিত্রিত বিমানে আরোহণ করে যমলোকে যায়। যারা ছাতা, বিছানা, কাপড়-চোপড় কিংবা আভরণ দান করে, তারা সোনার বা রুপোর ছাতাযুক্ত উজ্জ্বল রথে করে যমলোকে গমন করে। যারা সুগন্ধি ফুল এবং ফল ব্রাহ্মণদের দান করে তারা হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করে যমলোকে যায়।—যারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গো দান করে, তারা চন্দ্রমণ্ডলের মতো নির্মল যানে আরোহণ করে যমপুরে গমন করে। যাদের তৈরি কুয়ো, পুকুর, সরোবর প্রভৃতির শীতল জল সাধারণ প্রাণীমাত্রেই পান করে, তারা চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল সোনার যানে আরোহণ করে জ্যোতির্ময় দেহে যমলোকে গমন করে। যারা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য দেবতার মন্দির নির্মাণ করে দেয়, তারা পরিণামে বাতাসের মতো বেগবান বিমানে আরোহণ করে যমলোকে যায়। সমস্ত প্রাণীর উপভোগের জন্য যারা পানীয় দান করে, তাদের উত্তম গতি লাভ হয়। যারা সর্বসাধারণের উপকারের জন্য পুষ্প ও ফলযুক্ত বিচিত্র উদ্যান নির্মাণ করে, তারা অতি সুখেই যমলোকে যায়। যারা সোনা, রুপো বা মুক্তো প্রভৃতি দান করে, তারা সোনার মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে যমপুরে যেতে পারে। যে সমস্ত ব্যক্তিরা ভূমি দান করে তারা ইহলোকে সমস্ত কামনা চরিতার্থ করে শেষে সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে করে যমভবনে যায়। যারা নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের গৃহদান করে, তারা সুখেই যমলোকে পেঁছয়। যে ব্যক্তি 'নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায়' —ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি—এ কথা বলে বিষ্ণুকে প্রণাম করে ও 'পাপহর' এ কথা বলে গাভীকে প্রণাম করে, সে অক্লেশে ভীষণ, দুর্গম যমপথ অতিক্রম করে। দম্ভ এবং মিথ্যাভাষণ বর্জন করে যারা একদিন অন্তর খাদ্য গ্রহণের দ্বারা ব্রত পালন করে, তারা উত্তম বিমানে করে যমলোকে পেঁছয়। শঠতা ও দম্ভ বর্জন করে যারা দিনে একবার মাত্র আহার গ্রহণের দ্বারা ব্রত পালন করে, যারা জিতেন্দ্রিয় হয়ে ব্রত পালন করে, তারাও সুখেই সেই পথ পাড়ি দেয়। যারা এক পক্ষকাল উপবাসী থেকে ব্রত পালন করে তারা ব্যাঘ্রযুক্ত যানে আরোহণ করে যমরাজপুরে যায়। যারা একমাস উপবাসী থেকে ব্রত পালন করে, তারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল যানে আরোহণ করে যমালয়ে যায়।

যে ব্যক্তি বিষ্ণুধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করে, সে অগ্নিবর্ণ রথে চড়ে দেবলোকে যায়। যে জলের অভ্যন্তরে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে চন্দ্রমণ্ডলের মতো সুন্দর যানে আরোহণ করে সুখে যমভবনে যায়। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোক বা গো রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করে, সে সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেহ লাভ করে যমলোকে গমন করে। যে সব বৈষ্ণবজন জিতেন্দ্রিয়ভাবে তীর্থযাত্রা করে, তারা সেই ঘোর যমপথ সুখেই অতিক্রম করে। অপরের পীড়া না হয় এমন ভাবে যারা ভৃত্য প্রভৃতির ভরণপোষণ করে, তারা সোনার মতো উজ্জ্বল রথে চড়ে সুখেই যমলোকে যায়। যারা সমস্ত প্রাণীতে ক্ষমাশীল, ক্রোধ, গর্ব এবং মোহহীন, যারা অভেদজ্ঞানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আরাধনা করে, তারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে যমলোকে গমন করে। ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যে মাংসের চেয়ে মধুরতর এবং আস্বাদ্য আর কিছুই নেই; তাই মাংস সর্বদাই ত্যাগ করবে, কারণ, মধুর দ্রব্যের দ্বারা সুখলাভ হয় না। যে ব্যক্তি সহস্র গো দান করে আর যে মাংস খায় না—উভয়েই সমান ফল ভোগ করে। সমস্ত তীর্থ দর্শন করলে যে ফল লাভ করা যায় এবং সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে যে পুণ্য লাভ করা যায় মাংস ভক্ষণ

বর্জনেও সেই একই ফল পাওয়া যায়। দান এবং ব্রতপরায়ণ ধার্মিক জনগণ উত্তম যানে আরোহণ করে যমলোকে পৌঁছয়। যমরাজ স্বয়ং পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানান এবং তাদের কৃতকার্যের প্রশংসা করে স্বর্গলোকে পাঠিয়ে দেন। তাই বলি, সর্বদাই ধর্মাচরণে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। ধর্ম থেকেই অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ হয়। ধর্মই প্রাণীদের মাতা, পিতা, বন্ধু, পালক, পোষক এবং বিধাতা; এই ধর্ম থেকেই অখণ্ড ঐশ্বর্য লাভ হয়ে থাকে। ধর্মাচরণের দ্বারা দেবত্ব কিংবা ব্রাহ্মণত্বও লাভ করা যেতে পারে। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করেও যারা ধর্মাচরণ করে না, তারা বঞ্চিত হয়ে থাকে। ইহলোকে যারা কুৎসিত, যারা দরিদ্র, যারা বিকৃত আকারবিশিষ্ট, যারা ব্যাধিগ্রস্ত, যারা পরের আজ্ঞাবহ—তারা নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে ধর্মানুষ্ঠান করে নি। ধার্মিক ব্যক্তিরা উত্তম গতি লাভ করে, আর অধর্মের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিরা মনুষ্যেতর প্রাণী-রূপে জন্মায়। যে ব্যক্তিরা বিষ্ণুর শরণ নেয়, তারা স্বপ্নেও নরক দর্শন করে না, যারা প্রত্যেক দিন বিষ্ণুকে প্রণাম করে তাদের তো কথাই নেই। যারা কায়মনোবাক্যে বিষ্ণুর শরণ নেয়, যমের আধিপত্য তাদের উপর চলে না। মোহবশে অনেক পাপ করেও যারা বিষ্ণুর শরণ নেয়, তারা মুক্তিলাভ করে। অত্যন্ত ক্রোধী বা পাপী লোকও যদি হরিনাম কীর্তন করে, তবে সে শিশুপালের মতো দোষী হলেও মুক্তিলাভ করে।

—'সুগতিনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দু'শো সতেরো

নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনিরা এতক্ষণ ধরে লোমহর্ষণের মুখ থেকে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে পুরাণ-কথা শুনছিলেন। তবু তাঁদের শোনার আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হয় নি। তাই তাঁরা লোমহর্ষণকে অনুরোধ করলেন সেই পবিত্র কথা আরও বেশী করে শোনাবার জন্য। লোমহর্ষণ বললেন—ব্যাসদেবের মুখে যমপথ ও নরকযাতনার বিষয়ে অনেক কথা শোনার পর মুনিরা তাঁকে বললেন—আপনি সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী। একটা বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় আছে। পৃথিবীবাসিদের প্রকৃত সহায় কে, পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয় পরিজন অথবা অন্য কেউ? দেহত্যাগ করে মানুষ যখন যমালয়ে যায়, তখন কে তাদের অনুসরণ করে? মুনিদের সংশয় নিরসনকল্পে ব্যাস তাঁদের বললেন—এই পৃথিবীতে কেউ কারুর সহায় হয় না। জীব একাই জন্মায়, একাই মারা যায় এবং অন্তিমে একাই যমলোকে যায়। পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র বা অন্য কেউই তার সহায় হয় না। আত্মীয় পরিজন মৃতের জন্য খানিকক্ষণ কান্নাকাটিই করে মাত্র। একমাত্র ধর্মই তাদের অনুগমন করে। সুতরাং সর্বথা ধর্মাচরণ করাই প্রতিটি জীবের কর্তব্য। ধর্মাচরণ করলে স্বর্গলাভ এবং অধর্মাচরণে নরকবাস হয়। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি কখনই পাপাচরণ করবেন না। বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিও অনেক সময় লোভ, মোহ, দয়া বা ভয়বশত অধর্মাচরণ করে থাকেন। ধর্মাচরণের দ্বারাই পৃথিবীতে অর্থ ও কাম লাভ করা যায়।

মুনিরা তারপর ব্যাসদেবকে জিগ্যেস করলেন—আপনার কথা শুনে আমাদের মনে আরেকটি সংশয় দেখা দিয়েছে। মৃত ব্যক্তির যে সূক্ষ্ম দেহ হয়, তা তো অব্যক্ত—চোখে দেখা যায় না। তবে ধর্ম কি ভাবে তার অনুগমন করে? ব্যাস বললেন—সমস্ত প্রাণীরই দেহগত সাক্ষিভূত পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, মন বুদ্ধি ও আত্মা রাত্রিদিন

ধর্মকে দর্শন করে থাকে। ধর্ম এদের সঙ্গেই সেই জীবের অনুগমন করে। ত্বক, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিত—এরাই প্রাণহীন শরীরকে পরিত্যাগ করে ; পরে সেই জীব ধর্মাচরণের দ্বারা ইহ বা পরলোকে সুখভোগ করে থাকে। আপনারা আর কি বিষয়ে জানতে চান, বলুন। মুনিরা তখন ব্যাসদেবকে জিগ্যেস করলেন—রেতঃপ্রবৃত্তি মানুষের কিভাবে হয়, সে কথা দয়া করে বলুন।

ব্যাসদেব—প্রাণীর শরীরস্থ দেবতারা যে অন্ন ভোজন করেন, তার দ্বারা পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি ও মন তৃপ্তিলাভ করে। পঞ্চভূত ও মন এভাবে পরিতৃপ্ত হলে বিশুদ্ধ মহান আত্মা রেতঃ আকারে পরিণত হয়ে থাকেন। তারপর স্ত্রী-পুরুষের সংযোগবশে শ্লেষ্মা বা কফের সঙ্গে মিলিত হয়ে রেতঃ গর্ভরূপে পরিণত হয়ে থাকে।

মুনিগণ—যেভাবে গর্ভ উৎপন্ন হয় এবং জীব যেভাবে এতে আবিষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে, দয়া করে সেই কাহিনী এবার আমাদের শোনান।

ব্যাসদেব—পুরুষ পঞ্চভূতের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। তখন পঞ্চভূতে যে যে দেবতারা অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁরা সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্মসমূহ দেখে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

মুনিগণ—সেই জীব ত্বক, অস্থি, মাংস প্রভৃতি পরিত্যাগ করে পঞ্চভূত বর্জিত হয়ে কোথায় থেকে সুখ-দুঃখ ভোগ করে?

ব্যাস—জীব কর্মবশে সত্বর রেতঃবস্তুতে প্রবেশ করে ; পরে কালক্রমে স্ত্রীপুষ্পসহযোগে গর্ভরূপে পরিণত হয়ে থাকে। সুদুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করেও মানুষ পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে প্রবেশ করে। ধর্মানুষ্ঠান করলে পৃথিবীতে সুখভোগ সুনিশ্চিত, অধর্মসংযুক্ত কর্ম করলেই মানুষ মনুষ্যতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জীব মোহবশে যে যে কর্ম করে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, সে কথাই এখন আপনাদের বলছি। বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহে এই ঘোর মর্ত্যলোককে যমের রাজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে দেবলোকের মতো পবিত্র এবং রমণীয় স্থান যেমন আছে, তেমনই পাপভোগের জন্য দুঃসহ এবং যাতনাময় স্থানও আছে। জীব যে যে ভাবে যে যে কর্মানুসারে ঘোর গতি লাভ করে, এরপর সে কথাই বলছি আপনাদের। বেদবিদ ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির কাছ থেকে দান গ্রহণ করলে কিংবা পতিত ব্যক্তিদের কার্যে পৌরোহিত্য করলে গর্দভযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সেই গর্দভ পনেরো বছর জীবিত থাকে, তারপর মরে গিয়ে সাত বছর ধরে মহিষরূপে জীবিত থাকে ; তারপর আবার মারা গিয়ে ব্রহ্মরাক্ষসরূপে জন্মায় এবং তিন মাস বেঁচে থাকে। এর পরের জন্মে আবার সে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। যে ছাত্র অধ্যাপকের অনিষ্টাচরণ করে, সে প্রথমে কুকুর, পরে মাংসাশী জীব, তারপর গর্দভ হয়ে থাকে। পুনরায় সে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায়। যে শিষ্য মনে মনেও গুরুপত্নীকে কামনা করে, সে সেই পাপের জন্য কুকুররূপে তিন বছর, কৃমিরূপে এক বছর কষ্টভোগ করে শেষে ব্রাহ্মণরূপে জন্মায়। গুরু যদি শিষ্যকে অকারণে প্রহার করেন, তবে তাঁকেও হিংস্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। যে পুত্র পিতামাতাকে অপমান করে সে দশ বছর গর্দভ হয়ে পরে একবছর কুমীর জন্ম ভোগ করে, তারপর মানুষ হয়ে জন্মায়। যে পুত্রের প্রতি পিতামাতা উভয়েই রুষ্ট থাকেন, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর গর্দভ হয়ে চোদ্দ মাস এবং বিড়ালরূপে সাত মাস বেঁচে থাকার পর মানুষ জন্ম লাভ করে। যারা মাতাপিতাকে ভর্ৎসনা বা প্রহার করে তারা দশ বছর কচ্ছপ, তিন বছর শজারু এবং ছ'মাস সাপরূপে কাটানোর পর মানুষ হয়ে

জন্মায়। বেতনভোগী হয়ে যারা প্রভুর বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ করে, তারা মৃত্যুর পর বানর হয়ে দশ বছর, ইঁদুর হয়ে সাত বছর এবং কুকুর হয়ে সাত বছর বেঁচে থাকার পর শেষে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে। গচ্ছিত ধন যারা হরণ করে নেয়, তারা যমপুরে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করার পর কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে পনেরো বছর কাটায়; পরে মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে। বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তি মাছ হয়ে জন্মায়। আট বছর মাছ হয়ে বেঁচে থাকার পর চার মাস মৃগরূপে, এক বছর ছাগলরূপে এবং পরে কীট হয়ে মৃত্যুর পর মনুষ্য জন্ম ল্যাভ করে। যারা শসা চুরি করে, তারা মৃত্যুর পর শূকররূপে জন্মায়, তারপর রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়; শেষে বোবা কুকুররূপে পাঁচ বছর বেঁচে থাকে, তারপর মানুষ হয়ে জন্মায়। যারা পরস্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে তারা যথাক্রমে ভালুক, কুকুর, শেয়াল, শকুনি, সাপ, সারস ও বকরূপে জন্মগ্রহণ করে থাকে। যে মোহবশত ভ্রাতৃবধূর উপর বলাৎকার করে, সে মৃত্যুর পর পুংস্কোকিলরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং সেভাবে এক বছর কাটায়। কামের তাড়নায় যারা বন্ধুর স্ত্রী, গুরুজনের স্ত্রী ও রাজার স্ত্রীকে বলাৎকার করে মৃত্যুর পর তারা শূকর হয়ে পাঁচ বছর, বক হয়ে দশ বছর, পিঁপড়ে হয়ে তিন মাস, কীটরূপে এক মাস এবং কৃমিযোনিতে চোদ্দ মাস অতিবাহিত করে; শেষে মানুষ হয়ে জন্মায়। প্রথমে একজনকে কন্যাদান করবে বলে কথা দিয়ে, অন্যজনকে কন্যা সম্প্রদান করলে সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর কৃমিযোনিতে জন্মে তের বছর অতিবাহিত করে। যারা দেবতা এবং পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য দেবকার্য এবং পিতৃকার্য করে না, তারা মৃত্যুর পর কাক হয়ে জন্মায় এবং সেভাবে একশো বছর কাটিয়ে মোরগরূপে এবং সাপরূপে এক এক মাস জীবিত থাকে, শেষে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। পিতার মতো শ্রদ্ধেয় বড় ভাইকে যে অবমাননা করে, সে মৃত্যুর পর ক্রৌঞ্চযোনিতে জন্মায় এবং সেভাবে দশ বছর বেঁচে থাকে; শেষে মানুষরূপে জন্মায়। কোন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সহবাস করে, তাহলে মৃত্যুর পর সে কৃমিযোনিতে জন্মায়। পরে মৃত্যুর পর শূকর হয়ে জন্মায় এবং রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়; তারপর কুকুররূপে অনেক দিন অতিবাহিত করার পর পাপভোগ শেষ হলে পর মানুষ হয়ে জন্মায়। আর যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে পুত্র বা কন্যা উৎপাদন করে, তবে সে মৃত্যুর পর ইঁদুর হয়ে জন্মায়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয়ে সুদুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে; তারপর সংসারচক্রে পড়ে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে পনেরো বছর কাটানোর পর মনুষ্য যোনিতে গর্ভের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে বহুবার গর্ভের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে শেষে কূর্মরূপে জন্মায়; কূর্মরূপে অনেক কাল কাটানোর পর মানুষ হয়ে জন্মায়। দই চুরি করলে বক হয়ে জন্মাতে হয়। মাছ চুরি করলে ব্যাঙ হয়ে জন্মাতে হয়। মধু চুরি করলে কীট হয়ে জন্মাতে হয়। ফল, মূল প্রভৃতি চুরি করলে পিঁপড়ে হয়ে জন্মায়। পায়স চুরি করলে তিত্তির পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করে। পিঠে চুরি করলে ভুতুম পেঁচা হয়ে জন্মায়। জল চুরি করলে কাক হয়ে জন্মাতে হয়। কাঁসার জিনিস চুরি করলে পায়রা হয়ে জন্মাতে হয়। রুপোর পাত্র বা রুপো থেকে তৈরি জিনিস চুরি করলে কপোত হয়ে জন্মাতে হয়। সোনার পাত্র বা সোনার তৈরি জিনিস চুরি করলে কৃমিযোনিতে জন্মাতে হয়। কৌশেয় বা সিল্কের কাপড় চুরি করলে বর্তক পাখি হয়ে জন্মাতে হয়। সাধারণ বস্ত্র চুরি করলে শুক পাখি হয়ে জন্মাতে হয়। সূক্ষ্ম সুতোর তৈরি বস্ত্র অপহরণ করলে মৃত্যুর পর মানুষ হাঁস হয়ে জন্মায়। কার্পাস বস্ত্র অপহরণ করলে ক্রৌঞ্চ এবং পট্টবস্ত্র কিংবা তসরের কাপড় চুরি করলে মশা হয়ে জন্মায়। ময়দা বা চন্দনচূর্ণ হরণ করলে মানুষ

মৃত্যুর পর ময়ূর হয়ে জন্মায়। চিত্রিত ছবি চুরি করলে মানুষ ইঁদুর হয়ে জন্মায়। সেভাবে পনেরো বছর কাটানোর পর পুনরায় মানুষ হয়ে জন্মায়। দুগ্ধ হরণ করলে বক হয়ে জন্মাতে হয়। ধনলোভে বা শত্রুতাবশত যে যে পুরুষাধম স্বয়ং সশস্ত্র হয়ে নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করে, সে মৃত্যুর পর গর্দভ হয়ে জন্মায় এবং সেভাবে দু'বছর কাটাতে হয়; তারপর মৃগ হয়ে জন্মায়, মৃগের পর কীট হয়ে, কীটের পর মাছ হয়ে চার মাস কাটায়। তারপর হিংস্র পশুরূপে জন্মায়; সেভাবে সে দশ বছর কাটায়। তারপর বাঘরূপে জন্মায় এবং সেভাবে পাঁচ বছর কাটিয়ে মনুষ্য জন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি বাদ্যযন্ত্র চুরি করে সে লোমশ পুরুষ হয়ে জন্মায়। ঘি চুরি করলে পানকৌড়ি বা কাক হয়েও জন্মায়।

যারা পাপাচরণ করেও ব্রত প্রভৃতি পালনের দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রয়াস পায়, তারা মনুষ্যেতর প্রাণী হয়ে জন্মায় না বটে; কিন্তু মনুষ্যজন্ম লাভ করে দুঃখ ও সুখ উভয়ই ভোগ করে কিংবা তারা রোগগ্রস্তও হয়ে থাকে। যারা সর্বদাই ধর্মাচরণ করে, তারা নীরোগ, রূপবান ও ধনী হয়ে জন্মায়। ব্রহ্মা এ সব কথা দেবর্ষিদের বলেছিলেন। আমি যে রকম শুনেছি, সেভাবেই আপনাদের বললাম।

—'সংসারচক্রনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো আঠারো

মুনিরা ব্যাসকে অনুরোধ করলেন—আমরা আপনার কাছ থেকে এবার সৎকর্মের দ্বারা মানুষ কি গতি লাভ করে সে-কথা শুনতে চাই, দয়া করে আমাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—মানুষ পাপাচরণ করলে সে অধর্মের বশীভূত হয়ে পড়ে, তখন তার চিত্ত বিকৃত হয়। সে তার প্রতিকারের কথা চিন্তা করে না বলেই নরকে গমন করে। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি মোহবশত অধর্ম আচরণ করে পুনরায় সংযত-চিত্তে সেজন্য অনুতাপ করে, তাকে আর নরকে যেতে হয় না। অনুশোচনার আগুনে তার পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাপী ব্যক্তি যদি ধার্মিক ব্রাহ্মণদের কাছে নিজের পাপাচরণের কথা, দুষ্কর্মের কথা বলে, তবে সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই অধর্মের হাত থেকে মুক্ত হয়। মানুষ ধার্মিক ব্যক্তিদের কাছে তার আচরিত পাপজনক কাজের কথা বললে, সাপ যেমন ধীরে ধীরে তার খোলস পরিত্যাগ করে, তেমনি করেই তার পাপ বিদূরিত হয়। যে সব কাজ করে বা যা যা দান করে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়, সে-কথা এবার আপনাদের শোনাচ্ছি। সমস্ত রকম দানের মধ্যে অন্নদানই শ্রেষ্ঠ। ধর্মকামী মানুষের পক্ষে অন্নদানই প্রশস্ত। অন্নই মানুষের প্রাণ; অন্নের দ্বারাই মানুষ বেঁচে থাকে। দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ এবং মানবসমূহ সবাই অন্নের প্রশংসা করেন। যার দেওয়া অন্ন দশজন ব্রাহ্মণ আনন্দে গ্রহণ করেন, সে কখনো মনুষ্যেতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। কোন অধার্মিক ব্যক্তি যদি দশহাজার ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে তবে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি ভিক্ষার দ্বারাও অন্ন সংগ্রহ করে অধ্যয়ন-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান করে, তবে সে সুখলাভ করতে পারে। ক্ষত্রিয় রাজা ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করে যদি তার উপার্জিত বিত্ত থেকে ব্রাহ্মণদের ভোজন করান, তবে তিনিও দুষ্কর্মজনিত পাপ থেকে মুক্ত হন। বৈশ্যেরা যদি কৃষিকর্ম এবং বাণিজ্য থেকে উপার্জিত বিত্ত ব্রাহ্মণদের দান করেন এবং পর্যাপ্তভাবে ব্রাহ্মণদের ভোজন করান তবে তারাও পাপ থেকে মুক্ত হতে

পারেন। ন্যায় পথে অর্জিত অন্ন যদি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তবে পাপের স্খালন ঘটে।

জ্ঞান অর্জন করে মানুষ যে গতি লাভ করে, অন্নদানকারী ব্যক্তিও সেই একই গতি লাভ করতে পারে। অন্নদানের প্রভাবে মানুষ পরম গতি লাভ করে এবং মৃত্যুর পরও সুখ ভোগ করতে পারে। গৃহী মানুষের পক্ষে প্রত্যেক দিন খাওয়ার আগে অতিথি অভ্যাগত কিংবা দরিদ্র ব্যক্তিদের অন্ন দান করা কর্তব্য। যারা ন্যায়পথে থেকে জীবন-যাপন করে তারা যদি প্রতিদিন ধর্মতত্ত্বজ্ঞ এবং বেদবিদ একশো ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তবে তাদের আর নরকে যেতে হয় না, সংসারেও আবদ্ধ থাকতে হয় না। অন্নদানের মতো শ্রেষ্ঠ দান পৃথিবীতে আর নেই।

—'অন্নদানপ্রশংসন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো উনিশ

তারপর মুনিরা ব্যাসকে জিগ্যেস করলেন—নিজ নিজ কর্মানুসারে বিভিন্ন স্থানে স্থিত পরলোকগত ব্যক্তিদের আত্মীয় পরিজনগণ কি ভাবে শ্রাদ্ধ দান করবে? এ কথা জানবার জন্য আমরা নিতান্ত উৎসুক হয়ে পড়েছি, দয়া করে আমাদের বলুন। মুনিদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্যাসদেব বরাহদেব বিষ্ণুকে প্রণাম করে শ্রাদ্ধবিধি বলতে আরম্ভ করলেন। ত্রেতা ও যুগের সন্ধি সময়ে দিব্য ও মানুষ পিতৃগণ বিশ্বদেবগণের সঙ্গে মেরুগিরির পৃষ্ঠে অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁদের সামনে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে এসে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াল। পিতৃগণ তার পরিচয় জিগ্যেস করায় সে বলল—আমি চান্দ্রমসী কলা। সোমের কাছ থেকেই আমার জন্ম হয়েছে। প্রথমে আমার নাম ছিল ঊর্জা, পরে 'স্বধা' নামে আমি পরিচিত হই; আর এখন আপনারা আমাকে 'কো ভবত্যাঃ প্রভুঃ' কে তোমার প্রভু এবং কাসি' 'কে তুমি'—এ রকম প্রশ্ন করায় আমার নাম নির্ধারিত হল 'কোকা'। আপনারা যদি সম্মত হন, তবে আপনাদের আমি প্রভুত্বে বরণ করি। সেই দিব্য এবং মানুষ পিতৃগণ তখন তার কথা শুনে সতৃষ্ণ নয়নে সেই চান্দ্রমসী কলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই সোম কন্যা তখন যোগভ্রষ্ট সেই পিতৃগণকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল।

এদিকে চন্দ্র কন্যা ঊর্জাকে না দেখতে পেয়ে ধ্যানে বসলেন। ধ্যানযোগে তিনি সবই বুঝতে পারলেন। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পিতৃগণকে এই অভিশাপ দিলেন—যেহেতু তোমরা আমার অনূঢ়া কন্যাকে কামবশে প্রার্থনা করেছ, সেজন্য তোমরা যোগভ্রষ্ট হবে। তিনি কন্যা ঊর্জাকেও অভিশপ্ত করলেন। বললেন—যেহেতু তুমি পিতার বর্তমানে স্বাধীন ভাবে ধর্ম বিসর্জন করে পতি বরণ করেছ, সেজন্য তুমি হিমালয়ে কোকা নামক নদীরূপে পরিণত হও। চন্দ্রের অভিশাপে পিতৃগণ যোগভ্রষ্ট হলেন। হিমালয়ের পাদদেশে তাঁরা বাস করতে লাগলেন। ঊর্জাও সপ্ত সমুদ্র তীর্থের কাছে কোকা নামক নদীরূপে প্রবাহিত হল। সেই নদী বেগবশে গিরিশৃঙ্গ প্লাবিত করে শত শত তীর্থে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় সর্পণ অর্থাৎ গমন হেতু 'সরিৎ' বলে প্রসিদ্ধ হয়। পিতৃগণ যোগভ্রষ্ট হওয়ায় সেই মহানদীকে দেখেও চিনতে পারলেন না। পরে এক সময় পিতৃগণকে ক্ষুধাকাতর দেখে হিমালয় তাঁদের জন্য বদরী ফল, মধু এবং দুধের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা হিমালয়ের দেওয়া সেই খাদ্য এবং কোকা নদীর জলে তাঁদের আহার এবং তৃষ্ণা মেটাতেন।

এদিকে পিতৃগণ এবং স্বধার অভাবে পৃথিবীতে রাক্ষস ও দৈত্যগণ বলবান হয়ে উঠল পিতৃগণ যোগভ্রষ্ট হওয়ায় বিশ্বদেবগণও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। ফলে সহজেই রাক্ষস এবং দৈত্যেরা পিতৃগণকে আক্রমণ করল। পিতৃগণও ক্রুদ্ধ হয়ে কোকাতীরস্থিত প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হল। কিন্তু কোকা নদী তখন সবেগে জল দিয়ে তাঁদের প্লাবিত করল। রাক্ষস ও দৈত্যরা পিতৃগণকে দেখতে না পেয়ে আহারের অভাবে বিভীতক গাছে অন্তর্হিত হল। পিতৃগণ তখন জলের মধ্যে ক্ষুধায় এবং বিষণ্নতায় ভেঙে পড়লেন। তাঁরা নিরুপায় হয়ে তখন জগৎপতি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তাঁর বিষ্ণুর স্তব করলেন। বললেন—তুমি গোবিন্দ, জলের মধ্য থেকে আমাদের রক্ষা কর তোমার নাম সংকীর্তন করলে ক্ষণমাত্রেই নিশাচরেরা বিনষ্ট হয়, ভূতগণ পলায়ন করে, শত্রু নাশ পায়, আর ধর্ম উৎপন্ন হয়, সত্য হয় প্রকাশিত। আমাদের তুমি রক্ষা কর। পিতৃগণের সেই স্তবে বিষ্ণু প্রীত হলেন। তিনি বরাহমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে তাঁর খড়্গের দ্বারা প্রস্তর খণ্ড সরিয়ে পিতৃগণকে জলের ভেতর থেকে উদ্ধার করলেন। কোকামুখস্থ বিষ্ণুতীর্থ নামক স্থানে বরাহদেব পিতৃগণকে উদ্ধার করেন এবং লোহার্গল তীর্থে তাঁদের জল দান করেন।

পরে বরাহরূপী বিষ্ণু নিজের রোম থেকে জাত কুশ, এবং ঘাম থেকে জাত তিল দিয়ে সেখানে আগুন জ্বাললেন। সেই স্থান তখন সূর্যালোকের মতো আলোকিত হয়ে উঠল। ইচ্ছানুযায়ী তীর্থকেই পাত্র করে পবিত্র গঙ্গাজল সেই পাত্রে নিলেন এবং তা কোটিবটের তলদেশে স্থাপন করলেন। তিনি তুঙ্গকূট থেকে যজ্ঞীয় ওষধিরস, মধু, দুধ গন্ধদ্রব্য, ফুল, ধূপ এবং অনুলেপন প্রভৃতি সংগ্রহ করলেন; একটি গাভী এবং সমুদ্র থেকে বিবিধ রত্নও নিয়ে এলেন। পরে দংষ্ট্রা অর্থাৎ খড়্গ দিয়ে সেখানকার মাটিতে প্রয়োজনীয় আঁকার কাজ শেষ করে কুশ দিয়ে তা পরিমার্জন করলেন এবং সেই আগুন দিয়ে সেই স্থান পরিশোধন করলেন। তারপর কুশ নিয়ে পূর্বদিকে মুখ করে পিতৃগণকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতৃতর্পণ করব?' ঋষিগণ তখন 'করুন' এই কথা বলে অনুজ্ঞা প্রদান করলে সেই বিষ্ণু বেদকথিত বিধান অনুসারে বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করে মন্ত্রোচ্চারণ সহযোগে তাঁদের সেবার জন্য কুশাসন দিলেন। তারপর অক্ষত দিয়ে দেবতাদের রক্ষা বিধান করলেন। ওষধিদের মধ্যে যবকেই অক্ষত বলা হয়; সমস্ত দেবতাদের অংশেই যব উৎপন্ন হয়। যব সমস্ত দিক রক্ষার জন্য বিহিত হয়। দেব, দানব যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি কেউই যব ক্ষয় করতে পারে না, তাই এদের 'অক্ষত' এ রকম নামকরণ করা হয়েছে। পূর্বে বিষ্ণুই দেবতাদের রক্ষার জন্য এদের নিযুক্ত করেছেন। সেই বরাহরূপী বিষ্ণু তখন বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে কুশ, গন্ধদ্রব্য, যব এবং ফুল দিয়ে অর্ঘ্য প্রস্তুত করে তাঁদের প্রশ্ন করলেন—যাঁরা দিব্য এবং যাঁরা মানুষ, সেই পিতৃগণকে আমি আহ্বান করব কি? পিতৃগণ তখন 'আবাহন করুন' এ রকম অনুজ্ঞা প্রদান করায় তিনি জানুতে ডান হাত দিয়ে বাম হাতে তিলযুক্ত কুশ আসনরূপে দান করলেন। আগের মতোই আবার তিনি পিতৃগণকে এবং ব্রাহ্মণদের 'আয়ান্তু নমঃ' আপনারা আসুন—এই মন্ত্রে আবাহন করে 'অপহত'—রাক্ষসেরা বিনষ্ট হয়েছে এই মন্ত্রে রক্ষা বিধান করলেন তারপর গোত্র উল্লেখ করে 'মনের মতো বেগে গমনকারী পিতৃগণ সংবৎসর এখানে আগমন করুন'—এ কথা বলে পিতৃগণকে আবাহন করলেন, পরে তাঁদের উদ্দেশে অর্ঘ্য রচনা করে সমাহিত চিত্তে 'আমার পিতার, পিতামহের ও প্রপিতামহের যে অমৃতময় বাক্য আছে'—এই

মন্ত্র পাঠ করলেন এবং মাতামহদের একই মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করলেন। তারপর ভক্তিভরে গন্ধ, ধূপ প্রভৃতির দ্বারা তাঁদের অর্চনা করে 'আদিত্য, বসু, রুদ্রগণ' এই মন্ত্রে, ঘি, তিল এবং কুশযুক্ত অন্ন নিয়ে পাত্রে স্থাপন করে মুনিগণকে 'অগ্নিতে করব' এই কথা জিগ্যেস করায় তাঁরাও 'করুন' বলে অনুজ্ঞা প্রদান করলেন। তখন তিনি সোম, অগ্নি এবং যমকে তিনটি আহুতি দিলেন। পরে 'যারা আমার' প্রভৃতি সাতটি মন্ত্র পাঠ করে, নাম গোত্র উল্লেখ করে পিতৃগণের প্রত্যেককে অবশিষ্ট অন্ন দিয়ে তিন তিনটি আহুতি দিলেন। অবশিষ্ট অন্ন পিণ্ডপাত্রে নিক্ষেপ করলেন। তারপর অল্প শাক, অনেক ফল এবং পায়স প্রভৃতি উপকরণ-সহ সরস স্বাদু অন্ন নিয়ে ঘি ও মধু মিশিয়ে পিণ্ডপাত্রে স্থাপন করলেন; 'পৃথিবী' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করে প্রথমে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের এবং পরে পিতৃগণকে দান করলেন এবং 'মধুবাতা ঋতায়তে' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করলেন। তাঁরা ভোজন করতে থাকলে সেই প্রভু বরাহ 'যত্রে প্রকার' প্রভৃতি পাঁচটি মন্ত্র, 'ত্রিমধু', 'ত্রিসুপর্ণ', 'বৃহদারণ্যক', 'সৌর সূক্ত', 'পুরুষ সূক্ত' প্রভৃতি পাঠ করলেন। তাঁদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে প্রশ্ন করলেন—'আপনারা তৃপ্ত হলেন তো?' তাঁরা বললেন—'হ্যাঁ, তৃপ্ত হয়েছি।' তারপর পিণ্ডপাত্র নিয়ে তিনি নিজপত্নী ছায়াকে দিলেন; ছায়া সেই অন্ন দু'ভাগে ভাগ করে তাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করলেন। বরাহদেব সেই ভূমি পরিস্কার করে দক্ষিণ-দিকে মুখ করে মূলসহ তিল সংযুক্ত কুশ দিয়ে সেই ভূ-ভাগ আচ্ছাদন করলেন; তার উপর আসন স্থাপন করে গন্ধদ্রব্য এবং ফুল প্রভৃতি দিয়ে ভক্তিভরে 'পৃথিবী দধীঃ' এই মন্ত্র পাঠ করে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রত্যেককে স্পর্শ না করেই প্রদান করলেন এবং মাতামহদেরও সেই একই ভাবে পিণ্ড দান করলেন। পরে সেই পিণ্ডের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে পিতৃদের দান করে ভক্তিযুক্ত চিত্তে 'এতদ্বঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে নিজেরই বোনা সাদা এবং অখণ্ড বস্ত্রখণ্ড দান করলেন। তারপর নিজে আচমন করে প্রথমে পিতৃগণকে এবং পরে ব্রাহ্মণদের আচমনীয় দানে আচমন করিয়ে সেই ভূমির উপর কুশ দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলেন; শেষে ফুল ও যবযুক্ত জল দান করলেন। তারপর পিতৃপক্ষে তিলসহ জল এবং দেবপক্ষে অক্ষতসহ জল দিয়ে 'অক্ষয্য নোঽস্তু'—আমাদের এ দান অক্ষয় হোক—এই মন্ত্র উচ্চারণ করে অক্ষয্য দান করলেন এবং 'প্রীয়ন্তাম্' বলে দেবতাদের প্রীতি সাধন করে তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করলেন। পরে 'যস্মে নাম' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করে 'পিতৃগণ আমাদের গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ করে দিন' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং পিণ্ডসমূহের মধ্যে অর্ঘ্যপাত্র নিক্ষেপ করলেন, শেষে 'ঊর্জং বহন্তীঃ' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করে কোকা-জলের ধারা প্রদান করলেন। তারপর সেই বিকেল বেলায় মধু এবং তিলযুক্ত অতি স্নিগ্ধ জল দিয়ে পিতৃগণের তর্পণ করে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণারূপে রূপো দান করলেন। ব্রাহ্মণেরা তখন স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করলে বরাহরূপধারী বিষ্ণু 'স্বদিত' এ কথা বললেন এবং মানুষদের অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি দিয়ে প্রশ্ন করলেন—অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে কি? ব্রাহ্মণ-গণ তাতে অনুমোদন করলেন। তখন বরাহদেব বিষ্ণু ব্রাহ্মণগণকে 'অভিরম্যতাম্' বললে তাঁরাও 'অভিরতাঃ স্ম' এ কথা বললেন। তারপর তিনি তাঁদের প্রশ্ন করলেন—অবশিষ্ট অন্ন কি করব? তাঁরা তখন বিষ্ণুকে বললেন—অবশিষ্ট অন্ন ইষ্টজনের সঙ্গে ভক্ষণ কর। পরে তিনি ব্রাহ্মণদের হাত ধরে 'বাজে বাজে' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করে বেদির বাইরে গেলেন। পরে কোটি তীর্থের জল দিয়ে ডানদিকের ভূমি পবিত্র করে স্নান করলেন। স্নানের পর 'আমাদের দাতার সমুন্নতি হোক' এ কথা বলে আশীর্বাদ প্রার্থনা

করলে ব্রাহ্মণগণ তা অনুমোদন করলেন। তিনি তখন ব্রাহ্মণদের প্রদক্ষিণ করে তাঁদের প্রণাম করলেন এবং আসন ও আচ্ছাদন প্রভৃতি দান করলেন। পরে মধ্যম পিণ্ডটি গ্রহণ করে ছায়াময়ী পত্নী মহীকে তা দান করলেন ; রূপবতী মহীও 'পিতৃগণ গর্ভাধান করুন' এ কথা বলে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন। পরে বরাহরূপী বিষ্ণু পিতৃগণের বিসর্জনে উদ্যম করলে কোকা এবং পিতৃগণ তাঁকে বললেন—চন্দ্র আমাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন ; তাই আমরা যোগভ্রষ্ট ও স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে পাতালেই যাচ্ছিলাম, আপনি আমাদের ত্রাণ করেছেন। যোগরক্ষক বিশ্বদেবগণ আমাদের ত্যাগ করায় আমরা যোগভ্রষ্ট হয়েছি। আপনার কাছে আমাদেব এই প্রার্থনা যে, বিশ্বদেবগণ যেন আমাদের রক্ষা করেন এবং আমরা যেন স্বর্গে যেতে পারি। যোগশালী যমরাজ আমাদের অধিপতি হোন আর যোগাধার সোম যেন সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন। যোগসামর্থ্যে আমাদের স্বর্গে এবং ভূতলে বাস করবার শক্তি হোক। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেন এক মাস কাল পর্যন্ত আকাশমণ্ডলে বাস করতে পারে। স্বধা নামে বিখ্যাত এই ঊর্জা আমাদের পত্নী হোন ; ইনি যেন যোগমাতা ও আকাশচারিণী হন।

বিষ্ণু তখন তাঁদের বললেন—আপনারা যা যা প্রার্থনা করেছেন, সে সবই হবে। যম আপনাদের অধিপতি হবেন, সোম স্বাধ্যায় এবং অগ্নি অধিযজ্ঞ হবেন। আপনারা পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে এবং স্বর্গে থাকতে পারবেন। আপনারা যোগী ; যোগাধার এবং যোগদেহ হবেন ; আপনারা ইচ্ছানুযায়ী সর্বত্রই বিচরণ করতে পারবেন। এই চন্দ্র কন্যা ঊর্জা স্বধারূপে আপনাদের পত্নী হবে। এই কোকা নদী পবিত্র ; আমার প্রসাদে এই নদী কোটি তীর্থের ফল দান করবে। আমি আজ থেকে এখানে অবস্থান করব। আমার বরাহ-মূর্তি দর্শন করলে মানুষের পাপক্ষয় হবে। কোকার জলপান মহাপাপ নাশ করে, জলে স্নান পুণ্য বর্ধন করবে, এই তীর্থে উপবাস করলে তা স্বর্গফল দান করবে, এই তীর্থে দান করলে, তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। আপনারা মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে একাদশী থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পাঁচ দিন এই কোকামুখে এসে বাস করবেন। সেই সময় যে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করবে, সে সমস্ত ফলই লাভ করবে—যে ফলের কথা আগেই আমরা বলেছি। একাদশী ও দ্বাদশীতে আমিও এখানে থাকব। যে ব্যক্তি তখন এখানে এসে উপবাস করবে, সে-ও ঐ সমস্ত ফলই লাভ করবে। এ কথা বলেই বরাহরূপী বিষ্ণু অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বরাহপত্নী ছায়ারূপিণী পৃথিবী সেই পিণ্ড ভোজন করায় গর্ভবতী হয়ে কিছু দিন পরে সেই পর্বতেই পুত্র প্রসব করেন, সে-ই নরকাসুর নামে পরিচিত। বিষ্ণু তাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামক সমৃদ্ধ স্থান দান করেন। এই বরাহচরিত যে ভক্তিভরে শোনে সে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে।

—'শ্রাদ্ধবিধিনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো কুড়ি

মুনিরা তখন ব্যাসদেবের কাছ থেকে আরও বিস্তৃত তথ্য জানতে চাইলে ব্যাসদেব বললেন—কুলধর্মাচরণ পরায়ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ মন্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করবে। আর ব্রাহ্মণদের অনুশাসন অনুযায়ী স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণ বিধিসম্মতভাবে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করবে ; তাতে মন্ত্রের উচ্চারণ থাকবে না, থাকবে না অগ্নিতে পাক করে কোন দ্রব্য নিবেদন

করার ব্যাপার। পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থস্থান, পুণ্যতোয়া নদী, নদ, সরোবর, নদীসঙ্গম, সপ্তসমুদ্র, নিজের ঘর কিংবা অপরের অনুমতি নিয়ে তার ঘরে, দেবতা অধিষ্ঠান করেন এমন গাছের মূলে, যজ্ঞিয়স্থলে এবং হ্রদ প্রভৃতিতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা যেতে পারে। কিরাত, কলিঙ্গ, কোঙ্কণ, কৃমি, দশার্ণ, কুমার্য, তঙ্গণ, ক্রথ, সিন্ধুনদের উত্তর তীর, নর্মদার দক্ষিণ-তীর এবং করতোয়ার পূর্ব তীর—এ সমস্ত জায়গায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা চলবে না। প্রত্যেক মাসে অমাবস্যা তিথিতে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। নক্ষত্রবিশেষের যোগে পূর্ণিমাতেও শ্রাদ্ধ করা যেতে পারে। শ্রাদ্ধ তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তার মধ্যে নিত্যশ্রাদ্ধে দেবপক্ষ ও ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি না করলেও দোষ হয় না। নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ আবশ্যক। এই তিন প্রকার শ্রাদ্ধের মধ্যে কাম্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণদের প্রত্যেক বছরই করা দরকার। জাতকর্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। সূর্য কন্যারাশিস্থ হলে পূর্ববিধান মতোই পনেরো দিন শ্রাদ্ধ বিহিত আছে। প্রতিপৎ তিথিতে শ্রাদ্ধ করলে ধনলাভ, দ্বিতীয়াতে জনলাভ, তৃতীয়াতে পুত্রলাভ, চতুর্থীতে শত্রুনাশ, পঞ্চমীতে স্ত্রীলাভ, ষষ্ঠীতে সম্মানলাভ, সপ্তমীতে আধিপত্য, অষ্টমীতে উত্তম বুদ্ধি, নবমীতে স্ত্রী, দশমীতে কামনা, একাদশীতে বেদজ্ঞান, দ্বাদশীতে জয় এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করলে মানুষ প্রচুর সন্তান, পশু, মেধা, স্বাধীনতা, পুষ্টি, দীর্ঘ আয়ু ও ঐশ্বর্য লাভ করে। যথাসম্ভব অন্নের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করলেও উপরোক্ত সমস্ত ফলই পাওয়া যায়। যার পিতা অল্পবয়সে শস্ত্রের আঘাতে বা অন্য কোন কারণে মারা গেছে, সেই পিতার তৃপ্তির জন্য চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিহিত। পবিত্র ব্যক্তি অমাবস্যাতে সযত্নে শ্রাদ্ধ করলে সমস্ত কামনা লাভ করে অনন্তকাল স্বর্গভোগ করে।

এরপর যে সময় যা দান করলে পিতৃগণ তৃপ্ত হন, সে-কথাই আপনাদের বলছি। হবিষ্যান্ন দান করলে পিতৃগণের একমাস তৃপ্তি হয়, মাছ এবং মাংস দান করলে দু'মাস, হরিণ-মাংস দান করলে তিন মাস, খরগোসের মাংসে চার মাস, পাখির মাংসে পাঁচ মাস, বুনো শুয়োরের মাংস দান করলে ছ'মাস, ছাগমাংসে সাত মাস, 'এণ' নামক মাংস দান করলে আট মাস, রুরু অর্থাৎ চিত্রমৃগের মাংস দান করলে ন'মাস, গবয় অর্থাৎ এক ধরণের বৃষের মাংস দান করলে দশ মাস, ভেড়ার মাংসে এগারো মাস, এবং ঘি, দুধ এবং পায়স দান করলে পিতৃগণ এক বছর পর্যন্ত তৃপ্ত হয়ে থাকেন। গণ্ডার মাংস, লোহপাখির মাংস, কালশাক, মধু এবং রুইমাছ যুক্ত অন্ন দান করলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়, শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তিরও এতে সুখবৃদ্ধি হয়ে থাকে। শ্রাদ্ধে গুড় বা মধুমিশ্রিত তিল বা কেবলমাত্র মধু দান করলেও তার ফল হয় অনন্ত। পিতৃগণ এ রকম কামনা করেন যে, আমাদের কুলে কি এমন সন্তান জন্মাবে যে, আমাদের প্রতি দিন জলাঞ্জলি দান এবং বর্ষাকালে ও মঘা নক্ষত্রে মধুযুক্ত পায়স দান করবে? সকলেরই একাধিক পুত্র কামনা করা কর্তব্য; কারণ, তাদের মধ্যে যদি কেউ গয়ায় যায়, গৌরী অর্থাৎ আট বছরের কন্যা সম্প্রদান করে কিংবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে, তাহলে আমাদের অনন্তকাল তৃপ্তিলাভ হয়।

কৃত্তিকানক্ষত্রে পিতৃগণের অর্চনা করলে মানুষ স্বর্গলাভ করে। রোহিণীনক্ষত্রে পিতৃ-গণের অর্চনা করলে সন্তান, মৃগশিরাতে তেজস্বিতা, আর্দ্রায় শৌর্য, পুনর্বসুতে ক্ষেত্র, পুষ্যায় অক্ষয় ধন, অশ্লেষায় দীর্ঘ আয়ু, মঘায় সন্তান সন্ততি ও পুষ্টি, পূর্বফাল্গুনীতে সৌভাগ্য, উত্তরফাল্গুনীতে প্রাধান্য ও অপত্য, হস্তায় শাস্ত্রজ্ঞান, চিত্রায় রূপ, তেজ ও সম্মান, স্বাতীতে বাণিজ্য লাভ, বিশাখায় পুত্র, অনুরাধায় রাজত্ব, জ্যেষ্ঠায় আধিপত্য,

মূলায় আরোগ্য, পূর্বাষাঢ়ায় যশ, উত্তরাষাঢ়ায় শোকাভাব, শ্রবণায় শুভলোক, ধনিষ্ঠায় বহু ধন, অভিজিৎ নক্ষত্রে বেদজ্ঞান, শতভিষায় চিকিৎসকত্ব, পূর্বভাদ্রপদে ছাগ প্রভৃতি পশু, উত্তরভাদ্রপদে কান্তি, রেবতীতে সোনা ও রূপো ছাড়া অন্য ধাতু, অশ্বিনীতে ঘোড়া এবং ভরণীতে শ্রাদ্ধ করলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করা যায়। বিশেষ ফলকামী মানব সূর্য কন্যা-রাশিস্থ হলে শ্রাদ্ধ করবে। তখন যে যে কামনায় শ্রাদ্ধ করা হয়, সফল হয়ে থাকে। বরাহ-দেব বলেছেন—সূর্য কন্যারাশিস্থ হলে পূর্ণিমায় নান্দীমুখ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। সূর্য কন্যারাশিস্থ হলে দিব্য, পৃথিবীস্থ এবং অন্তরীক্ষগত সমস্ত পিতৃপুরুষই পিণ্ড কামনা করেন। ওই সময় পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত ষোলো দিন শ্রাদ্ধ করলে যজ্ঞের মতোই ফল পাওয়া যায়। নারায়ণ বলেছেন—যে ব্যক্তি রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল কামনা করে সে সূর্য কন্যারাশিস্থ হলে শাক এবং জল দিয়েও পিতৃগণের অর্চনা করবে। সূর্য উত্তরফাল্গুনী এবং হস্তানক্ষত্রস্থ হলে যে জন ভক্তিভরে পিতৃগণের অর্চনা করে, সে স্বর্গে বাস করার যোগ্যতা অর্জন করে। সূর্য হস্তানক্ষত্রে গিয়ে যত দিন বৃশ্চিকরাশিতে উদিত না হন, তত দিন পর্যন্ত যমরাজের আদেশে পিতৃপুরী শূন্য থাকে। ওই সময় শ্রাদ্ধ না করলে সূর্য বৃশ্চিকরাশিগত হলে পিতৃগণ দেবতাদের সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শ্রাদ্ধকারীদের নিদারুণ অভিশাপ দান করেন। অষ্টকা, অন্বষ্টকা এবং মন্বন্তরাতেও শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য; এই শ্রাদ্ধে মাতৃগণকে আগে অর্ঘ্যদান করতে হয়। গ্রহণ, ব্যতীপাত, অমাবস্যা, জন্মনক্ষত্র এবং গ্রহপীড়ায় পার্বণশ্রাদ্ধ করতে হয়। দুই অয়ন সংক্রান্তি, দুই বিষুব সংক্রান্তি এবং সংক্রান্তি মাত্রেই যথাবিধি শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া এবং কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে সংক্রান্তি বিধানে শ্রাদ্ধ করবে। ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশী ও মাঘ মাসের অমাবস্যাতে পায়স দ্বারা দক্ষিণায়নের মতো শ্রাদ্ধ করা উচিত। বেদবিদ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ঘরে এলে একমাত্র তাঁর জন্যই শ্রাদ্ধ করা দরকার। প্রত্যেক বছর মাতা, পিতা, পুত্র, কাকা এবং ভাইয়েরও শ্রাদ্ধ কর্তব্য। পার্বণশ্রাদ্ধ দেবযুক্ত এবং একোদ্দিষ্ট দেবপক্ষহীন করবে। দেবপক্ষে দুজন, পিতৃপক্ষে তিনজন অথবা উভয় অনুষ্ঠানেই এক একটি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করবে; মাতামহ পক্ষেও সমস্ত অনুষ্ঠান পিতৃপক্ষের মতোই হয়। ব্রাহ্মণগণ তৃতীয় দিনে প্রেতের অস্থি সংগ্রহ করবে। ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয়েরা বারো দিনে, বৈশ্য পনেরো দিনে এবং শূদ্রেরা এক মাসে আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত অশৌচ থেকে মুক্ত হয়। অশৌচের শেষে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ঘরেই করবে। ব্রাহ্মণেরা বারো দিনে, এক মাসে, ত্রিপক্ষে অর্থাৎ দেড় মাসে এবং এক বছর পর্যন্ত প্রতি মাসেই ওই শ্রাদ্ধ করবে। এরপর সপিণ্ডীকরণ করতে হয়; সপিণ্ডীকরণের পর পার্বণশ্রাদ্ধ করা উচিত। এ সব করা হলে পর সেই ব্যক্তি প্রেতত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পিতৃত্ব লাভ করেন। পিতৃগণ দ্বিবিধ—অমূর্ত এবং মূর্তিমান; নান্দীমুখ পিতৃগণ অমূর্ত, পার্বণ পিতৃগণ মূর্তিমান, এ ছাড়া একোদ্দিষ্টভোজী পিতৃগণকে নিয়ে সর্বসাকুল্যে প্রেত পিতৃলোক তিন প্রকার।

মুনিরা তখন ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—প্রেতত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিরও সপিণ্ডীকরণ কি ভাবে করতে হয়, দয়া করে তা বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাসদেব বললেন—সপিণ্ডী-করণ একোদ্দিষ্ট ও দেবপক্ষরহিত, এবং এক অর্ঘ্য ও এক পবিত্রযুক্ত করতে হয়। এতে অগ্নৌকরণ নেই, আচ্ছাদনও নেই; সমস্ত কাজই দক্ষিণ দিকে করতে হয়। এতে বিজোড় সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হয়। পিতৃগণের তিনটি ও প্রেতের জন্য একটি, এই চারটি তিলগন্ধজলযুক্ত পাত্র স্থাপন করবে। 'যে সমানা' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করে প্রেতপাত্র

থেকে অর্ধেক জল পিতৃপাত্রে সেচন করতে হয়। অন্যান্য কাজ আগের মতোই করতে হয়। স্ত্রীলোকের একোদ্দিষ্টও একই রকম। যাদের পুত্র নেই তাদের সপিণ্ডকরণ করতে হয় না। পুত্রের অভাবে যথাক্রমে পৌত্র, প্রপৌত্র, সপিণ্ড বা সহোদরগণ এই বিধানমতো কাজ করবে। দৌহিত্রগণ এবং দ্ব্যামুষ্যায়ণ সংজ্ঞক পুত্রিকাপুত্রগণও মাতামহ ও পিতামহদের নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করবে। অন্য অধিকারীর অভাবে স্ত্রীগণ ওই সব কার্য করবে মন্ত্র উচ্চারণ না করেই। সকলের অভাবে রাজা দাহ প্রভৃতি সমস্ত কার্য করাবেন; কারণ, রাজা সমস্ত বর্ণেরই বান্ধব। শ্রাদ্ধবিষয়ক নিত্য ও নৈমিত্তিক বিধানের কথা বললাম; এবার নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসমূহের কথা বলছি। অমাবস্যাকেই নিমিত্ত বলে জানবে; নির্দিষ্ট কালই নিত্য। এই নির্দিষ্ট কালেই শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহ করতে হয়। সপিণ্ডী-করণের পর পিতামহের পিতামহ পিতৃপিণ্ড থেকে বঞ্চিত হয়ে লেপভুজত্ব লাভ করেন। সে পর্যন্ত লেপভুজ চতুর্থ পুরুষ লেপভুজত্বে হীন হয়ে থাকেন। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষ লেপভুজ; পিণ্ডদাতাকে নিয়ে সাত পুরুষ পর্যন্ত সম্বন্ধ থাকে। পিণ্ডদাতা থেকে আরম্ভ করে সাত পুরুষের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ সকলেই অনু-লেপভুজ। এবার তাঁদের শ্রাদ্ধবিধানের কথা বলছি।

মানুষেরা পৃথিবীতে যে অন্ন ছড়ায় তার দ্বারা পিশাচত্ব লাভ করেছেন এমন পিতৃগণ তৃপ্ত হন। স্নানবস্ত্রের যে জল মাটিতে পড়ে, তার দ্বারা যারা গাছ রূপে পরিণত হয়েছেন এমন পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করেন। গন্ধজলের যে কণা পৃথিবীতে পড়ে, তার দ্বারা দেবত্ব লাভ করেছেন এমন পিতৃগণ তৃপ্ত হয়ে থাকেন। বংশের মধ্যে যারা তির্যকযোনিতে জন্ম-গ্রহণ করেছেন এমন পিতৃগণ পিণ্ডের উদ্ধারকালে যে কণিকা পড়ে, তাতেই তৃপ্ত হন। বংশে দাঁত ওঠার আগেই যে বালকের মৃত্যু হয়েছে, তাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয় না, সম্মার্জনের জলেই তাদের তৃপ্তি হয়। ব্রাহ্মণদের ভোজনের পর আচমনকালে এবং পা ধোয়ার সময় যে জল মাটিতে পড়ে, তাতেই তাদের তৃপ্তি হয়ে থাকে। অন্যায়ভাবে উপার্জিত ধনের দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে বংশের যারা চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ যোনিতে জন্মেছেন, তাদের তৃপ্তি হয়। তাই ভক্তিভরে যে কোন দ্রব্য দিয়েই শ্রাদ্ধ করা উচিত। জিতেন্দ্রিয়, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে বিশেষত বিদ্বান এবং বেদবিদ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধ দান করা কর্তব্য। ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গবিদ্, পিতামাতার সেবাপরায়ণ, ভাগিনেয়, সামবেদবিদ, ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য, উপাধ্যায়, মামা, শ্বশুর, শ্যালক, কুটুম্ব, দ্রোণপাঠক, ব্রাহ্মণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পুরাণজ্ঞ, ভোজ্যহীন, দান গ্রহণ করেন না এমন এবং পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা উচিত। শ্রাদ্ধদান এবং শ্রাদ্ধভক্ষণ করে যে ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করে, তার পিতৃগণ সেই শুক্রমধ্যে এক মাস পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকেন। স্ত্রী-সহবাস করে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে বা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে, তার পিতৃগণ একমাস পর্যন্ত শুক্র এবং মূত্র ভোজন করে থাকেন। তাই ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধের পূর্বদিনেই নিমন্ত্রণ করা উচিত। যদি পূর্বদিনে নিমন্ত্রণ করা না হয়, তবে স্ত্রীসঙ্গ-বর্জিত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা উচিত। শ্রাদ্ধকালে ভিক্ষা গ্রহণ করতে যে সব সন্ন্যাসীরা আসবেন তাঁদেরও খাওয়াবে। পিতৃগণ যোগাধার; এজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি যোগীদেরও শ্রাদ্ধে খাওয়াবে। সহস্র ব্রাহ্মণের চেয়েও একজন যোগী শ্রেষ্ঠ; তাই তাঁকে ভোজন করালে তিনি জলের অভ্যন্তরস্থিত নৌকোর মতো শ্রাদ্ধকর্তা ও তাঁর পিতৃগণকে রক্ষা করে থাকেন। পুরাকালে পিতৃগণ রাজা ঐলের কাছে যে গাথা গান করেছিলেন, ব্রহ্মবাদীরা শ্রাদ্ধকালে সেই পিতৃগাথাও গান করে

থাকেন। সেই গাথা হল—আমাদের মধ্যে কার কোন্ সময় এমন এক সংযত সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে সন্তান যোগীজনের গৃহীত অন্নের শেষ অংশ দিয়ে ভূতলে আমাদের পিণ্ড প্রদান করবে? অথবা আমাদের তৃপ্তির জন্য গয়ায় পিণ্ডদান, গণ্ডারের মাংস, হবি, কালশাক, তিলমেশানো ঘি, কিংবা মৃগমাংস দান করবে? কোন্ ব্যক্তি ত্রয়োদশীতে ও মঘাতে যথাবিধি শ্রাদ্ধ দান করবে? কোন্ বংশধর দক্ষিণায়নে আমাদের মধু এবং ঘি দিয়ে পায়স দান করবে? পিতৃগণ যদি শ্রাদ্ধের দ্বারা তৃপ্ত হন, তাহলে বসু, রুদ্র, আদিত্য নক্ষত্র, গ্রহ—সকলেই তৃপ্ত হয়ে থাকেন। শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হলে পিতৃগণ আয়ু, সন্তানসন্ততি, ধন, বিদ্যা, সুখ, রাজ্য, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্যন্ত দান করেন।

পিতৃকার্যে পূর্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণ প্রশস্ত। শ্রাদ্ধকর্তা যথাবিধি শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণদের খাওয়াবেন, তারপর প্রণাম করে তাঁদের বিদায় জানাবেন। তারপর নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে অতিথিদের খাওয়াবেন। কেউ কেউ এমন অভিমত পোষণ করেন যে, পিতৃক্রিয়ার পূর্বেই নিত্য কর্ম করা উচিত। আবার কেউ কেউ এর বিপরীতটাই করতে উপদেশ দেন। সবশেষে ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনদের সঙ্গে সবাই মিলে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করবে। বন্ধুবিদ্বেষী, বিকৃত নখবিশিষ্ট, ক্লীব, ক্ষয়রোগী, শ্বেতরোগী, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, কদাকার দন্তবিশিষ্ট, টাকযুক্ত, অন্ধ, বধির, মূক, জড়, বিকলাঙ্গ, পিঙ্গল নয়নবিশিষ্ট, কুশ্রী ত্বক বিশিষ্ট, দীর্ঘরোমযুক্ত, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, রক্তচক্ষুবিশিষ্ট, কুব্জ, বামনাকৃতিবিশিষ্ট, অলস, নীচকুলে জাত, পশুপালক, কদাকার, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্তমানে বিবাহকারী, শূদ্রজাতীয় স্ত্রীর পতি এবং সে-রকম পিতার পুত্র—এরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের পক্ষে যোগ্য নয়। আর যারা শূদ্র পুত্রের সংস্কারকারী, অবিবাহিত, বেতন নিয়ে যারা অধ্যাপনা করেন, নবজাতকের জন্ম-জনিত কারণে অন্ন অপবিত্র হওয়ায় সেই অন্ন যিনি ভোজন করেন সেই ব্রাহ্মণ, মৃগ বিক্রয় করা যাঁর পেশা তিনি, সোমবিক্রয়কারী, সমাজনিন্দিত, চোর, পতিত, সুদখোর, কুটিলমনা, বেদত্যাগী, অগ্নিত্যাগী, দানত্যাগী, নিষ্ঠুর, রাজপুরোহিত, ঈর্ষাপরায়ণ, রাজভৃত্য, বন্ধু-বিদ্বেষী, দুরন্ত, নক্ষত্রসূচক, গর্হিত, অযাজ্যযাজী, এবং অন্যান্য অধম ব্রাহ্মণগণ পংক্তি-দূষক, এদের শ্রাদ্ধে ভোজন করাবে না। যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধান লংঘন করে মূর্খকে ভোজন করায়, সেই দাতা ধর্মহীন হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি আশ্রিত ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করে অন্যকে ভোজন করায়, সেই দাতা আশ্রিতের দীর্ঘশ্বাসে বিনষ্ট হয়। তার যজ্ঞ, বেদ ও তপস্যা প্রভৃতি কোন কর্মই সিদ্ধ হয় না। সমস্ত কার্যেই, বিশেষত শ্রাদ্ধকালে বস্ত্র দান করা উচিত। নূতন কৌশেয়, অর্থাৎ সিল্কের কাপড়, ক্ষৌম অর্থাৎ সূক্ষ্ম কাপড়, কার্পাস বস্ত্র এবং দুকূল বস্ত্র—শ্রাদ্ধে এ সব দান করলে দানকারীর সমস্ত কামনা পূরণ হয়। অনেক গাভীর মধ্য থেকে বাছুর যেমন তার মাকে চিনে নেয়, তেমনি জীব যেখানে থাকুক, শ্রাদ্ধে পিতৃগণের শ্রাদ্ধকালে প্রথম বিশ্রামের সময় অর্থাৎ আসন দানের পর এবং পিণ্ডদান সময়ে 'দেবতা ও মহাযোগী পিতৃগণকে নমস্কার; স্বাহা ও স্বধাকে নমস্কার; তাঁরা এখানে উপস্থিত হোন'—এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করবে। এই মন্ত্র পাঠ করলে রাক্ষসেরা পলায়ন করে, পিতৃগণ শীগগির শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত হন এবং তাঁরা প্রীত হয়ে থাকেন। দাতাকে ও ওই মন্ত্র পরিত্রাণ করে থাকে। নূতন ক্ষৌম্য, শণনির্মিত, কার্পাস থেকে জাত এবং পট্ট ও ঊর্ণামিশ্রিত পট্টসূত্র দান করবে; কৌশেয় বস্ত্র বর্জন করবে। এ ছাড়া আঁচলবিহীন বস্ত্রও বর্জন করবে; পিতৃগণ তাতে প্রীত হন না, দাতারও তা অনিষ্ট উৎপাদন করে। পিতৃগণের মধ্যে কেউ যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁকে পিণ্ডদান করবে না। তাঁকে বরং

ভালোভাবে খাওয়াবে। ভোগকামী মানুষ সর্বদাই অগ্নিতে পিণ্ড দান করবে। সন্তান-কামী ব্যক্তি মধ্যম পিণ্ডটি মন্ত্র উচ্চারণ করে পত্নীকে দেবে। সৌন্দর্যকামনায় গোগণকে পিণ্ড দান করবে। প্রজ্ঞা, যশ এবং কীর্তি কামনায় জলে পিণ্ড দান করবে। গৃহ এবং পুত্র প্রভৃতি কামনায় কুক্কুটগণকে পিণ্ড দান করবে। পূর্বতন ঋষিগণ যেমন যেমন বিধান দিয়েছেন, সেভাবেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা উচিত। অন্যথায় তা পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক তো হয়ই না, উপরন্তু দোষ উৎপাদন করে থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তি যব, ধান, তিল, মাষ, গম, চানা, মুগ, শ্যামাক ধান, নীবার বা তৃণধান্য, প্রিয়ঙ্গু, তিল প্রভৃতি দ্রব্য শ্রাদ্ধে দান করবে। আম, আমড়া, বেল, দাড়িম, আমলকী, নারকেল, নারঙ্গ, খেজুর, আঙুর প্রভৃতি ফল শ্রাদ্ধে দান করবে। গুড়, চিনি, দুধ, দই, ঘি, তিলের তেল, সরষের তেল, সৈন্ধব লবণ, সমুদ্র লবণ, সারস লবণ, আখের রস, গন্ধদ্রব্য, চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কালশাক, মুল, বুনো শাক প্রভৃতি দান করবে। জাতি, চাঁপা, লোধ্র, মল্লিকা, বাণ, বর্বরী, বৃন্ত, অশোক, তুলসী, তিলক, পাবন্তী, দূর্বা, শেফালী, টগর, বুনো কেয়া, যূথিকা, পদ্ম, কুমুদ এবং কহ্লার ফুল শ্রাদ্ধে দান করবে। কুড়, জটামাংসী, বালা, কুক্কুটী, জাতিপত্র, নালিকা, উশীর, মুস্তক, গ্রন্থিপর্ণী সুন্দরী প্রভৃতি এবং গুগ্‌গুল, চন্দন, অগুরু, ধূপ প্রভৃতিও শ্রাদ্ধে দান করা উচিত। রাজমাষ, চানা, মসুর, কোরদূষক, বিদ্রুষ, মর্কট প্রভৃতি শ্রাদ্ধে বর্জন করা উচিত। মোষ, চমরী, হরিণ, ভেড়া, এক খুরওয়ালা পশু, স্ত্রীলোক, উট এবং ছাগী—এদের দুধ, দই, ঘি প্রভৃতি শ্রাদ্ধে বর্জন করবে। তাল, বরুণ, কাকোল, বহুপত্র, অর্জুনী ফল, জাম, লাল বেল, ও শালফল শ্রাদ্ধে বর্জন করবে। মাছ, শুয়োর, কূর্ম এবং গোরুর মাংস বিশেষভাবে পরিত্যাগ করবে। পূতিকা, মৃগনাভি, রোচনা, পদ্মচন্দন, কালেয়ক, উগ্রগন্ধ, তুরুস্ক—এ সমস্তও শ্রাদ্ধে বর্জন করবে। পালং, ঘৃতকুমারী, কিরাত, পিণ্ডমূলক, গৃঞ্জন, চুক্রিকা, চুক্র, বরুণা, চণ-পত্রিকা, জীব, শতপুষ্পা, নালিকা, শূকর-গন্ধা, হলভৃত্য, সরষে, পেঁয়াজ, রশুন, মানকচু, বিষকচু, গদাস্থিক, পুরুষাল্ব, পিণ্ডালু, লাউ, তিক্তপুর্ণা, কুষ্মাণ্ড, ত্রিকটু, বেগুন, শিবজাত, লোমশ বট, কালীয়, রক্তবাণ, বলাকা, লকুচ, বিভীতক ফল—এ সব শ্রাদ্ধে বর্জন করবে। আরনাল, সুক্ত, শীর্ণ, বাসী, কোবিদার এবং উগ্রগন্ধযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে দান করা উচিত নয়। অতি অম্ল, পিচ্ছিল, শুষ্ক বা সূক্ষ্ম দ্রব্যও বর্জনীয়। যে দ্রব্য প্রস্তুত হওয়ার পর এক প্রহর অতীত হয়েছে এবং যা মদ্যগন্ধ-যুক্ত, তাও শ্রাদ্ধে দেবে না। আখ, উগ্রগন্ধ, কর্ণিশ, ভূনিম্ব, নিম, রাজিকা, কলিঙ্গোথ, কুস্তম্বুরু, অম্লবেতস, দাড়িম, মাগধী, নাগর, আর্দ্রক, তেঁতুল, আমড়া, জীবক, তম্বুরু—এ সব দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। পায়স, শিমুল, মুগ ও মিষ্টি জিনিস ভক্তিসহকারে প্রদান করবে। পানক, দই এবং গরুর দুধ শ্রাদ্ধে নিবেদন করবে। এ রকম আরো যা স্বাদু ও স্নিগ্ধ, ঈষৎ অম্ল বা কটুরসযুক্ত খাদ্য আছে, সে সবই শ্রাদ্ধে বিহিত। অতি টক, অতি নোনা বা অতি কটু দ্রব্য আসুর খাদ্য ; অতএব তা শ্রাদ্ধে পরিহার করবে। স্নিগ্ধমধুর রসযুক্ত এবং ঈষৎ কটু অম্লরসবিশিষ্ট স্বাদু দ্রব্য দেবভোজ্য ; অতএব তা শ্রাদ্ধে দান করবে। ছাগল, তিত্তির, খরগোস, শিবা, লাবক, রাজীব, গণ্ডার, রক্তশিব, শল্কযুক্ত, লোহ, সিংহতুণ্ড, খড়্গ—এই সকলের মাংস শ্রাদ্ধে প্রদান করবে। মনু যে শ্রাদ্ধে রুই মাছ দিতে বলেছেন, হব্যে এবং কব্যে তা প্রদান করবে বটে, কিন্তু কখনো কাপিল অর্থাৎ বাদামী রঙের রুই মাছ দেবে না।

বরাহদেব পূর্বে যে রকম শ্রাদ্ধ করেছিলেন, সেই বিধানই আপনাদের কাছে বিবৃত

করলাম। আমি যে সব নিষিদ্ধ দ্রব্যের উল্লেখ করলাম, বরাহদেব সে-সব নিষিদ্ধ বলে বর্জন করেছেন ; এ সমস্ত ভোজন করলে রৌরব নরকে যেতে হয়। এ সব ব্রাহ্মণদের খাওয়ার যোগ্য নয়, পিতৃগণকে এ সব দ্রব্য দেওয়া উচিত নয়। চক্রবাক, মৃগ, আঁশহীন মাছ, হাড়হীন প্রাণী, কুক্কুট, কলবিঙ্ক, বাসহাত, ময়ূর, ভারদ্বাজ, শার্ঙ্গক, নকুল, পেঁচা, বিড়াল, টিট্টিভ, শেয়াল, বাঘ, ভালুক, তক্ষক প্রভৃতি যারা ভক্ষণ করে; সেই মহাপাপী মানব রৌরব নরকে যায়। যে পিতৃগণকে এই সব মাংস প্রদান করে সে-ও নরকে পতিত হয়। কুসুম্ভ শাক, জম্বীর, সিগ্রু, পিণ্যাক, বিপ্রুষ, মসুর, শণ, কোদ্রব, চুক্র, পদ্মক, চকোর, কম্বুক, বাজপাখির মাংস, গোল লাউ এবং তাল প্রভৃতি খেলে নরকগামী হয়। যারা পিতৃগণকে এই সব দ্রব্য প্রদান করে, তারা পূযবহ নরকে গমন করে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি এ সব যত্নের সঙ্গে বর্জন করবে। বরং নিজের মাংসও খাওয়া ভালো, কিন্তু নিষিদ্ধ দ্রব্য খাওয়া সর্বদাই অনুচিত। যদি অজ্ঞানতা বা ভুল করে এই সব নিষিদ্ধ দ্রব্য খেয়েও ফেলা হয়, তবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন যথাক্রমে ফল, মূল, দুধ, দই, ঘোল, গোমূত্র ও যব খেয়ে থাকবে। নিষিদ্ধ বস্তু খাওয়ার ফলে শরীর যে দূষিত হয়, এতে শরীরের শোধন হয়। মানুষ নিজের সামর্থ্যানুসারে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত জগতের তৃপ্তিসাধন করে।

মুনিরা ব্যাসদেবকে তখন জিগ্যেস করলেন—যদি কোন ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকেন এবং তাঁর পিতা এবং পিতামহ মারা যান, তবে সেখানে কি রকম শ্রাদ্ধ হবে ? ব্যাস বললেন—পিতা যাদের শ্রাদ্ধদান করতেন, পুত্রও তাঁদেরই শ্রাদ্ধ করবে। এ রকম করলে লৌকিক ও বৈদিক ধর্মের হানি হয় না। মুনিরা ব্যাসদেবকে আবার জিগ্যেস করলেন—যার পিতামহ জীবিত আছেন, কিন্তু পিতার মৃত্যু হয়েছে, সে কি রকম শ্রাদ্ধ করবে ? ব্যাস বললেন—এ রকম ক্ষেত্রে পিতাকে পিণ্ড দেবে, কিন্তু পিতামহকে ভোজন করাবে। এটাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। মৃতব্যক্তিকে পিণ্ডদান করবে আর জীবিত ব্যক্তিকে ভোজন করাবে ; পরন্তু সেক্ষেত্রে সপিণ্ডীকরণ হবে না। পার্বণও করা উচিত নয়। এই পিতৃমেধ সম্পর্কীয় আচার যে ব্যক্তি প্রতিপালন করে, সে আয়ু, ধন, এবং পুত্র-পৌত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই পিতৃমেধ অধ্যায় পাঠ করে, তার পিতৃলোক তার দেওয়া অন্ন তিন যুগ পর্যন্ত ভোজন করেন। পিতৃমেধকল্পের কথা বিস্তৃতরূপে আপনাদের বললাম।

—'শ্রাদ্ধকল্পনিরূপণ' নামক অধ্যায়

অধ্যায় : দুশো একুশ

শ্রাদ্ধবিষয়ক সমস্ত কথা বলার পর ব্যাসদেব মুনিদের বললেন—সাধু গৃহস্থ হব্য এবং কব্য দান করে দেবতা এবং পিতৃগণের এবং অন্ন দান করে অতিথি, বন্ধু, ভিক্ষুক, পথিক, সদাচারী ব্যক্তি, পশু, পাখি এবং পিপীলিকা প্রভৃতির তৃপ্তিবিধান করবে। নিত্য এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়া উল্লংঘন করলে পাপভাগী হতে হয়। মুনিরা তখন ব্যাসদেবকে জিগ্যেস করলেন—আপনি নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম বিধান করলেন ; কিন্তু পুরুষদের কর্ম তো তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য। মানুষ যে কর্ম করে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ লাভ করতে পারে, সে-কথা শুনতে চাই ; দয়া করে আমাদের সে-কথা বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে সর্বদাই আচার প্রতিপালন করা

কর্তব্য। যে ব্যক্তি সদাচার লংঘন করে যজ্ঞ, দান বা তপস্যা করে, তার কোন কাজই সুখদায়ক বা ফলদায়ক হয় না। এখন আপনাদের সেই সদাচারের লক্ষণ এবং স্বরূপ বর্ণনা করছি। গৃহস্থ ব্যক্তি ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম সাধনে যত্নপরায়ণ হবে ; ত্রিবর্গ সাধিত হলেই গৃহস্থ ইহকালে এবং পরকালে সুখলাভ করে। উপার্জিত অর্থের চার ভাগের দ্বারা গৃহস্থ নিজের পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের উপযোগী অনুষ্ঠান করবে। উপার্জিত অর্থের অর্ধেক অংশে নিজের পরিপোষণ এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান করবে। অবশিষ্ট যে চারভাগ থাকবে, তাকে মূলধনরূপে রেখে বাড়িয়ে তুলবে। এভাবে ব্যবহার করলে অর্থের সফলতা হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি পাপ নিবারণের জন্য ধর্মাচরণও করবেন। বিপদের ভয়ে কাম এবং অর্থ ও ধর্মের অবিরোধে উপার্জন করাই উচিত। ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এদের পরস্পরসাপেক্ষ বলে জানবে। ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিরোধ করে না, বরং এ দুয়ের সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে। অর্থ, ধর্ম এবং কাম—এই উভয়েরই সাধক এবং কামও ধর্ম এবং অর্থের সম্পাদক। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে স্নান করে পবিত্র এবং সংযতচিত্ত হয়ে ধর্ম এবং অর্থের চিন্তা করবে। আকাশে নক্ষত্র থাকতে থাকতেই প্রাতঃসন্ধ্যার এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সায়ংসন্ধ্যার যথাবিধি অনুষ্ঠান করবে ; এর ব্যতিক্রম যেন কখনোই না হয়। অসৎ আলাপ, মিথ্যা বলা এবং কঠোর কথা বলা যথাসম্ভব বর্জন করবে। অসৎ শাস্ত্র, অসৎ তর্ক এবং অসৎ সেবাও পরিত্যাগ করবে। সংযতচিত্ত হয়ে সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে হোম করবে। উদয়ের সময় বা অস্ত যাওয়ার সময় সূর্যকে দর্শন করবে না। চুলের পরিচর্যা, আয়নায় মুখ দেখা, দাঁত মাজা, চোখে অঞ্জন ধারণ করা এবং দেবতাদের তর্পণ—এ সব ক্রিয়া পূর্বাহ্ণেই করবে। বাসস্থান, তীর্থক্ষেত্রের পথের পাশে, লাঙ্গল করা জমিতে, গোচারণক্ষেত্রে কখনো মলমূত্র ত্যাগ করবে না। নগ্ন পরনারী কিংবা নিজের বিষ্ঠা কখনই দেখবে না, রজঃস্বলা নারীকে দেখবে না, তাকে স্পর্শ করবে না এবং তার সঙ্গে কথাও বলবে না। জলের ভেতর মলমূত্র ত্যাগ কিংবা স্ত্রীসঙ্গম করবে না। মল, মূত্র, চুল, ছাই, মাথার খুলি, তুষ, আঙরা, দড়ি, কাপড় বা গলিত দ্রব্যের উপর দাঁড়াবে না। পথে বা মাটিতে পড়া পাতার ওপর বসবে না। গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে সামর্থ্য অনুযায়ী পিতৃগণ, দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণের যথোচিত সৎকার করে তারপর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। আচমন করে পবিত্র হয়ে পূর্ব দিকে বা উত্তর দিকে মুখ করে হাঁটু মুড়ে বসে খাদ্যগ্রহণ করবে ; সে সময় কথা না বলাই উচিত। অন্ন গ্রহণ করার সময় কাঁচা নুন খাবে না এবং অপরের উচ্ছিষ্ট অন্ন সর্বদাই বর্জন করবে। যেতে যেতে বা দাঁড়ানো অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করবে না ; আচমন কিংবা কোন কিছু খাবেও না। অশুচি অবস্থায় কারো সঙ্গে কথা বলবে না বা কোন কিছু পাঠও করবে না। বিনা প্রয়োজনে সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্র দর্শন করবে না। ভাঙা বা ছেঁড়া আসন, বিছানা ও পাত্র বর্জন করবে। গুরুজন ব্যক্তিকে আসতে দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করবে এবং বসার জন্য আসন দেবে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলবে এবং যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তরীয় না নিয়ে এক কাপড়ে ভোজন এবং দেবতার অর্চনা করবে না এবং অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার সময় সেই কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণকে ডাকবে না। কখনই নগ্ন হয়ে স্নান বা শয়ন করবে না, দুই হাত দিয়ে মাথা চুলকাবে না। বিনা করণে বার বার মাথা ধোবে না। মাথা ধোওয়ার পর গায়ে তেল মাখবে না।

যে যে দিনে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ সেদিন অধ্যয়ন করবে না। ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি এবং

সূর্যকে কখনো অবমাননা করবে না। মলমূত্র ত্যাগ করার সময় দিনের বেলা উত্তর দিকে এবং রাতে দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকবে। গুরুজন কোন খারাপ কাজ করলেও তার সমালোচনা করবে না। কারুর মুখে কারুর নিন্দাই শুনবে না। ব্রাহ্মণ, রাজা, দুঃখার্ত, বিদ্বান, গর্ভিণী, রোগার্ত, মান্য, মূক, অন্ধ, বধির এবং উন্মত্ত ব্যক্তিকে পথ ছেড়ে দেবে; দেবালয়, চতুষ্পথ, বিদ্ধান এবং গুরুজনকে প্রদক্ষিণ করবে। অপরের ব্যবহৃত জুতো, কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার করবে না। চতুর্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অন্যান্য পর্বদিনে গায়ে তেল মাখবে না এবং স্ত্রীসঙ্গ করবে না। হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকা কিংবা বসে থেকে হাত-পা ছোড়া—এ সব বর্জন করবে। বেশ্যা, কৃতকার্য ব্যক্তি, বালক এবং পতিত ব্যক্তির মর্মে আঘাত দেবে না, এদের সম্পর্কে কোন কুৎসাও কখনো ছড়াবে না। দম্ভ, অভিমান এবং রূঢ়তা সর্বদাই পরিত্যাগ করবে। মূর্খ, উন্মত্ত, ব্যাসনাসক্ত, বিরূপ, অঙ্গহীন এবং দীনজনকে উপহাস করবে না। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পুত্র এবং শিষ্য ছাড়া অন্য কারুর প্রতি দন্ড উত্তোলন করবে না। পাদ দিয়ে টেনে আসনে কখনোই বসবে না। নিজের তৃপ্তির জন্য তিলমিশ্রিত অন্ন ও মাংস প্রস্তুত করবে না। বাকসংযম করে পূর্ব দিকে বা উত্তর দিকে মুখ করে দাঁত মাজবে; কিন্তু নিষিদ্ধ গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজবে না। উত্তর দিক বা পশ্চিম দিকে মাথা করে শোবে না। দুর্গন্ধ বা জলযুক্ত ভূমিতে শোবে না; ভোরবেলায়ও বিছানায় পড়ে থাকবে না। দিনের বেলাতেই স্নান করবে, তবে গ্রহণ হলে রাত্রেও স্নানের বিধান আছে। কাপড় বা হাত দিয়ে গা মুছবে না। স্নানের আগে কখনই অনুলেপন করবে ন্য। লাল রঙের, কালো রঙের এবং বিচিত্র রঙের কাপড় কখনই পরবে না। যে কাপড়ের পাড় নেই এমন কাপড় ব্যবহার করবে না। চুল বা পোকা পড়ে গেছে, কুকুর মুখ দিয়েছে, এবং যার আসল অংশ নিয়ে নেওয়া হয়েছে এমন খাবার কখনই খাবে না। কোন পশুর পিঠের দিকের মাংস, যথেচ্ছ সংগৃহীত মাংস এবং নিষিদ্ধ মাংস সর্বদাই বর্জন করবে। সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তের সময় কখনই শোবে না।

স্নান না করে শোবে না; অন্যমনস্ক হয়ে বিছানায় বা শুধু মাটিতে বসে, ভৃত্যদের না দিয়ে কিংবা শব্দ করতে করতে ভোজন করবে না। বিবেচক ব্যক্তি কখনই পরস্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবে না। এর মতো নীচ ব্যাপার পৃথিবীতে আর কিছু নেই। এই পাপের ফলে মানুষের আয়ু কমে যায়। দেবতা, অগ্নি ও পিতৃলোকের কার্য করার আগে, গুরুবন্দনা করার আগে এবং অন্ন গ্রহণের আগে যথাবিধি আচমন করবে। পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে গন্ধ ও ফেনাহীন স্বাদু জল দিয়ে নিঃশব্দে আচমন করবে। জলের তলার মাটি, বাসস্থানের মাটি, ইঁদুরের খোঁড়া মাটি বা অপরের শৌচাবশিষ্ট মাটি কখনই গ্রহণ করবে না। তিনবার বা চারবার আচমন করা দরকার। দুই ঠোঁট দু'বার ধুয়ে মাথা এবং ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রসমূহ স্পর্শ করে পবিত্রভাবে আচমন করতে হয়। হাঁচি হলে, বায়ু ত্যাগ করলে, অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করলে কিংবা থুথু ফেললে পুনরায় আচমন করবে অথবা সূর্য দর্শন করবে অথবা ডান কান স্পর্শ করবে। এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কালে আগেরটি করতে চেষ্টা করবে, না পারলে পরেরটিই করবে। দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে ঘর্ষণ করবে না। শুয়ে কিংবা পথ চলতে চলতে কিংবা খেতে খেতে পড়াশোনা করা উচিত নয়। সন্ধ্যার সময় কোথাও যাওয়া বা স্ত্রী-সহবাস করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অপরাহ্ণে শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃতর্পণ, স্নান এবং দেবতা ও পিতৃকার্য করবে।

সৎ কুলে জাত কন্যাকেই বিয়ে করবে। বিকলাঙ্গ বা রোগগ্রস্ত কন্যাকে বিয়ে করবে না। স্ত্রীদের সর্বদাই রক্ষা করা উচিত। কাউকে ঈর্ষা করবে না। দিনের বেলা ঘুমাবে না এবং স্ত্রী-সহবাসও করবে না। চার রাত পর্যন্ত ঋতুমতী নারীর সংস্পর্শ বর্জন করবে ; কন্যার জন্ম যদি অনভিপ্রেত হয়, তবে পাঁচ রাতও বাদ দেবে। ঋতু হওয়ার পর ছ' দিনের রাত থেকে স্ত্রী-সহবাস করা যেতে পারে। ঋতু হওয়ার পর জোড় দিনের রাতে (দুই, চার, ছয় ইত্যাদি) স্ত্রী-সহবাস করলে পুত্র এবং বিজোড় দিনের রাতে স্ত্রী-সঙ্গ করলে কন্যা জন্মায়। পর্ব প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিনে স্ত্রী-সহবাস করলে বিধর্মী সন্তান হয় এবং সন্ধ্যাবেলা স্ত্রী-সহবাস করলে ক্লীব সন্তান জন্মায়। বিচক্ষণ ব্যক্তি ক্ষৌরকার্যে রিক্তা তিথি বর্জন করবেন। ক্ষৌরকার্য যেখানে হয় সেখানে, স্ত্রী সংসর্গ যেখানে হয় সেখানে কিংবা মাদুর নির্মাণ যেখানে হয় সেখানে গেলে স্নান করা উচিত। বেদের, দেবতাদের, ব্রাহ্মণদের, সাধু এবং মহাত্মা ব্যক্তিদের পতিব্রতা স্ত্রীলোকের, গুরুর, ঈশ্বরের এবং তপস্বী ব্যক্তির কুৎসা রটাবে না বা তাদের উপহাস করবে না। সাদা কাপড়ই পরতে চেষ্টা করবে ; অমঙ্গলজনক কাপড়-চোপড় পরবে না। পতিত ব্যক্তি, উদ্ধত, উন্মত্ত, মুর্খ, কমবয়স্ক নীচজাতি, অবিনীত, দুঃস্বভাব, অতি ব্যয়শীল, শত্রু, কার্যে অক্ষম, নিন্দিত, লম্পটের সঙ্গী, নিঃস্ব, বিবাদপরায়ণ এবং অধমজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না। বন্ধু, দীক্ষিত ব্যক্তি, রাজা, স্নাতক এবং শ্বশুর—এঁরা বাড়িতে এলে এঁদের যথোচিত সৎকার করবে। এক বছরের শেয়ে বাড়িতে কোন সম্মানীয় অতিথি এলে সামর্থ অনুযায়ী অর্চনা করবে এবং আহুতি দেবে। প্রথম আহুতি ব্রাহ্মণকে, দ্বিতীয় প্রজাপতিকে, তৃতীয় গৃহ্যদের, চতুর্থ কশ্যপকে এবং পঞ্চম আহুতি অনুমতিকে দান করবে। পূর্বে নিত্যক্রিয়া প্রকরণে যে সব অনুষ্ঠানের কথা বলেছি, সে সবের অনুষ্ঠানের পর বৈশ্বদেব করবে। স্থানবিভাগ অনুসারে দেবতাদের উদ্দেশে এই অনুষ্ঠান করবে। পূর্ব দিকে পর্জন্য, আপ্ ও ধরিত্রীকে, বায়ুকোণে বায়ুকে, পূর্ব প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে দিকসমূহকে, উত্তর দিকে ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষ, সূর্য, বিশ্বদেব, বিশ্বভূত, ঊষা ও ভূতপতিকে এবং দক্ষিণ দিকে 'পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে পিতৃগণকে বলিদান করবে। পরে বায়ুকোণে 'যক্ষ্মৈতত্তে' এ কথা বলে অন্নের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে মিশ্রিত জল প্রদান করবে। তারপর দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের প্রণাম করবে। দক্ষিণ পাণির নীচের দিকে যে রেখা, তা ব্রহ্মতীর্থ ; আচমনের জন্য তা বিহিত। তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ পিতৃতীর্থ ; এই তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের দ্বারাই নান্দীমুখ ছাড়া অন্যান্য পিতৃগণের তর্পণ করবে। আঙুলের অগ্রভাগসমূহ দৈবতীর্থ ; এ সব দিয়ে দৈবকার্যের অনুষ্ঠান করবে। কনিষ্ঠার মূল কায়তীর্থ ; এ দিয়ে প্রজাপতির কাজ করবে। ব্রহ্মতীর্থের দ্বারা আচমন, পৈত্রতীর্থের দ্বারা পিতৃকার্য, দৈবতীর্থের দ্বারা দৈবকর্ম, প্রাজাপত্য তীর্থের দ্বারা নান্দীমুখ, পিতৃগণের পিণ্ড এবং উদকদান প্রভৃতি কর্ম প্রশস্ত। বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও একই সঙ্গে অগ্নি ও জল ধারণ করবে না। গুরু, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের দিকে পা ছড়িয়ে দেবে না। গাভীকে জলপান থেকে নিবৃত্ত করবে না। আঁজলা ভরে জলপান করবে না।

ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবে না। যেখানে ঋণদাতা, চিকিৎসক, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং সজলা নদী নেই, সেখানে বাস করবে না। যাঁর অনুচরগণ বশীভূত এবং যিনি বলবান ও ধর্মপরায়ণ, সে-রকম রাজার রাজ্যেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাস করেন। পুরবাসী জনগণ যেখানে যথাযোগ্য দলবদ্ধ, সর্বদাই ন্যায়পরায়ণ, শান্ত প্রকৃতির এবং ক্রোধহীন, সেখানে

বাস করলেই সুখলাভ হয়। যে রাজ্যে কৃষকেরা অহংকারী নয় এবং যেখানে অনেক রকম ওষুধ পাওয়া যায়, সেখানেই বাস করা উচিত। যেখানে জয়কামী ব্যক্তি, পূর্বতন শত্রু এবং সর্বদাই উৎসবে মেতে রয়েছে এমন লোক বাস করে, সেখানে বাস করা উচিত নয়। যেখানকার রাজা অপরাজেয়, ভূমি শস্যশালিনী এবং অধিবাসীরা চরিত্রবান—সেখানেই বাস করা উচিত। এখন ভক্ষ্য এবং ভোজ্যের বিধান বলছি। দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া যায় এমন ঘি, তেল এবং স্নেহদ্রব্যমিশ্রিত খাদ্য বাসী হলেও খাওয়া উচিত। স্নেহশূন্য দ্রব্যের মধ্যেও যব, গম এবং দুধ থেকে জাত দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত। খরগোস, কচ্ছপ, গোধা, শ্বাবিধ এবং মাছ ভক্ষণযোগ্য। গ্রাম শুয়োর এবং মোরগ খাওয়ার অযোগ্য। পিতৃগণ এবং দেবগণকে যে মাংস দেওয়া হয়, তার অবশিষ্ট অংশ খাওয়া যায়। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হয়ে কিংবা ব্রাহ্মণের অনুরোধেও মাংস ভক্ষণে দোষ হয় না। শাঁখ, পাথর, সোনা, রুপো, দড়ি, কাপড়, শাক, মূল, ফল, চামড়া, মণি; প্রবাল, মুক্তো, পাত্র এবং চমস প্রভৃতি দ্রব্য জলের দ্বারাই পবিত্র হয়। জল এবং পাথর দিয়ে ঘষলে প্রস্তর পাত্রের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। গরম জলের দ্বারা স্নিগ্ধ পাত্রের পবিত্রতা সম্পন্ন হয়। শূর্প, অজিন, মুষল উদুখল, স্তূপীকৃত দ্রব্য এবং এক জায়গায় জড়ো করা প্রচুর কাপড় প্রোক্ষণের দ্বারাই পবিত্র হয়। সমস্ত রকম বল্কলের জল এবং মাটির দ্বারাও কোন দ্রব্য পবিত্র হয়। এই সব দ্রব্য অত্যন্ত অপবিত্র হলে তিলকল্প বা সর্ষপকল্পের দ্বারা শোধন করা কর্তব্য। সমস্ত রকম মোষলোমজ এবং কেশজ দ্রব্যেরও এভাবেই শুদ্ধি হয়। কার্পাস বস্ত্রের শুদ্ধি জল এবং ভস্মের দ্বারা হয়। কাঠ, প্রাণীর দাঁত, হাড় এবং শিঙে তৈরি জিনিসের শুদ্ধ তক্ষণের দ্বারা হয়। মৃৎপাত্রসমূহের পুনরায় দাহ দ্বারাই বিশুদ্ধি ঘটে। ভিক্ষালব্ধ জিনিস, শিল্পকারের হাত, পণ্য দ্রব্য, রমণীজনের মুখ, পথ, যার শুচিতা বা অশুচিতা সম্পর্কে কিছু জানা নেই এমন বস্তু, ভৃত্য প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত দ্রব্য, পূর্বে যা প্রশংসিত হয়েছে এমন দ্রব্য, যা অশুচি হওয়ার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে, অনেক বস্তুর ব্যবধানে যার অশুচিতা ঘটেছে, লঘু দ্রব্য, বৃদ্ধ ব্যক্তির আচরণ, কর্মকারের বাড়ি এবং স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়—এ সব পবিত্র বলেই জানবে। দুর্গন্ধবর্জিত ধারাজলও সর্বদাই পবিত্র। দাহ, মার্জন এবং গোবিচরণে ভূমি শুদ্ধ হয়। অনুলেপন, লিখন, জলসেচ, এবং সম্মার্জনের দ্বারা ঘর পবিত্র হয়। চুল, পোকা, মাছি অন্নে পড়লে কিংবা গোরু অন্নের আঘ্রাণ নিলে সেই অন্নের বিশোধনের জন্য মাটি, ছাই ও জল নিক্ষেপ করা কর্তব্য। তামার পাত্র অম্লসংযোগে, রঙ্গ এবং সীসার পাত্র জলে, কাঁসার পাত্র ছাই ও জলে এবং কঠিন বস্তু জল দিয়ে ধুলেই শুদ্ধ হয়। সাধারণ অপবিত্র বস্তু মৃত্তিকা এবং জলের সংযোগে শুদ্ধ হয়।

চণ্ডাল এবং ব্যাধ কর্তৃক নিহত পশুর মাংস পবিত্র। পথে পতিত তেল এবং একটি গোরু স্নান করে বা জল খেয়ে তৃপ্ত হয়, এমন জলও পবিত্র। ধুলো, আগুন, ঘোড়া, গোরু, ছায়া, কিরণ, বায়ু ভূমি, বায়ুচালিত জলকণা, মাছি প্রভৃতি পতঙ্গ, কখনই অপবিত্র হয় না। ছাগলের এবং ঘোড়ার মুখ বিশুদ্ধ, গোরুর মুখ পবিত্র নয়। বাছুরের মুখ মায়ের স্তন্যপান বিষয়ে পবিত্র। ফলপাতন ব্যাপারে পাখিও পবিত্র। আসন, বিছানা, যান, নদীর তীর, ঘাস—এ সব চাঁদ ও সূর্যের কিরণ এবং বায়ুর দ্বারাই পবিত্র হয়। পথভ্রমণ, স্নান, পান এবং ভোজন প্রভৃতি কার্যে যথাবিধি আচমন করা উচিত। পথের কাদা, অপবিত্র বস্তুর স্পর্শে যা অপবিত্র হয়েছে এবং যা ইট দিয়ে তৈরি, তা

বায়ুর স্পর্শেই পবিত্র হয়। রাশীকৃত অন্ন কোন কারণে অপবিত্র হলে আচমন করে উপরের অংশ ফেলে দিয়ে মাটি এবং জল দিয়ে প্রোক্ষণ করলেই বিশুদ্ধ হবে। না জেনে এই রকম অপবিত্র খাদ্য খেলে তিন রাত উপবাস করা কর্তব্য। অপবিত্র বলে জানতে পারলে যথাবিধি শোধন করে পরে তা ভক্ষণ করলে কোন দোষ হবে না। রজস্বলা, সূতিকা, নীচ জাতি এবং শববাহীদের স্পর্শ করলে যে অশুচিতা হয়, স্নান করলেই তা কেটে যায়। স্নেহযুক্ত মানুষের হাড় স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণ স্নানের দ্বারাই পবিত্র হয়। স্নেহহীন মানুষকে স্পর্শ করলে আচমন করে গোরুকে স্পর্শ করবে বা সূর্যকে দর্শন করবে। মলমূত্র এবং পা-ধোবার জল—এ সব ঘর থেকে দূরে ফেলে দেবে। অপরের জলাশয়ে যদি কখনো কোন কারণে স্নান করতে হয় তবে প্রথমে পাঁচবার সেই জলাশয়ের মাটি হাতে তুলবে, তারপর স্নান করবে। দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত জলাশয়, গঙ্গা, হ্রদ, ও নদীতে স্নান করতে হলে অবশ্য এ সব কিছুই করতে হবে না। অসময়ে উদ্যান প্রভৃতিতে থাকা উচিত নয়। যে সব ব্যক্তি সাধারণ ভাবে বিদ্বেষপরায়ণ হিসেবে চিহ্নিত তাদের সঙ্গে এবং অল্পবয়স্ক বিধবার সঙ্গে কথা বলবে না। যারা দেবতা, পিতৃলোক, সজ্জন, শাস্ত্র, যজ্ঞকর্তা বা সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিন্দা করে, তাদের সঙ্গে কথা বললে যে পাপ হয় সূর্যদর্শনেই তা বিদূরিত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও যদি রজঃস্বলা নারী, পড়ে থাকা মৃতদেহ, বিধর্মী, সূতিকা, ক্লীব, বিবস্ত্র ব্যক্তি, নীচ জাতি, শববাহক এবং পরস্ত্রীর সঙ্গে সহবাসকারী ব্যক্তিকে দেখেন, তবে আত্মশোধনের জন্য তাকেও সূর্যদর্শন করতে হবে। অখাদ্য দ্রব্য, ভিক্ষুক, পাষণ্ড, বিড়াল, গাধা, মোরগ, পতিত, জাতিচ্যুত, চণ্ডাল, শববাহক—এ সব স্পর্শ করলে যে অপবিত্রতা জন্মে স্নান করলেই তা বিদূরিত হয়। সূতিকা, গেঁয়ো শুয়োর এবং নিষিদ্ধ কর্মকারী ব্যক্তিকে স্পর্শ করলেও স্নানের দ্বারা পবিত্রতা সম্পাদিত হয়।

নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান প্রত্যেক দিনই করতে হয়; কেবলমাত্র বংশে কারো জন্ম বা মৃত্যু হলে তা করতে নেই। জন্ম এবং মৃত্যু উপলক্ষে ব্রাহ্মণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় বারো দিন এবং বৈশ্য এক পক্ষকাল পর্যন্ত দান, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করবে না। শূদ্র এক মাস পর্যন্ত নিজের কর্তব্য বর্জন করবে। মৃতব্যক্তির সগোত্রগণ বাইরে গিয়ে তার উদ্দেশে জলদান করবে। সগোত্র ব্যক্তি প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা নবম দিনে মৃতব্যক্তির অস্থি সঞ্চয় করবে। অস্থি সংগৃহীত হলে দেহের অস্পৃশ্যতা আর থাকে না। এরপরই সগোত্রগণ মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কাজ করবে। আত্মহত্যার কামনায় কেউ যদি অস্ত্রের বা দড়ির বা বন্ধনের বা আগুনের সাহায্যে মৃত্যুবরণ করে কিংবা উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, তাহলে মৃতের আত্মীয়রা সঙ্গে সঙ্গেই শৌচ করবে, কেবলমাত্র মৃতের সপিণ্ডগণ তিন দিন অশৌচ পালন করবে। শিশু মারা গেলে, দেশান্তরে থাকতে থাকতে কেউ মারা গেলে কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণের পর মারা গেলে, তাদের আত্মীয়গণ এবং সপিণ্ডগণও একই ভাবে শৌচ করবে। এক সপিণ্ডের মৃত্যুজনিত অশৌচের মধ্যে অন্য সপিণ্ড মারা গেলে পূর্বের অশৌচই হবে। তারপর বিহিত কার্য করতে হবে। পুত্রের জন্ম হলে পিতা অবগাহন স্নান করবে। জন্মাশৌচের মধ্যে অন্য জন্মাশৌচ হলেও পূর্বের অশৌচই বহাল থাকবে; পূর্বের অশৌচের শেষেই শুদ্ধিকার্য করতে হবে। জন্মাশৌচে ব্রাহ্মণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় বারো দিন, বৈশ্য এক পক্ষকাল এবং শূদ্রগণ এক মাস পর্যন্ত অশুচি থাকবে; তারপর বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করবে। মৃতাশৌচের ক্ষেত্রে প্রেতের

উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট কর্তব্য। বিজ্ঞ ব্যক্তি ওই কাজে ব্রাহ্মণকে বিবিধ দান করবেন। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ইহকালে তার যে যে দ্রব্য প্রিয় এবং বাঞ্ছিত ছিল, সেই সবই পরলোকে তার অক্ষয় তৃপ্তি বিধানের জন্য দান করবে। অশৌচকাল পূর্ণ হলেই প্রেতের পিণ্ড দান ও তর্পণ প্রভৃতি করে জল, বাহন এবং অস্ত্র প্রভৃতি স্পর্শ করে পবিত্র হবে।

বেদ পাঠ প্রত্যেক দিনই করা উচিত। ধর্মানুসারে ধন অর্জন করে যত্নপূর্বক যজ্ঞ করবে। যে কাজ করলে নিজেকে লজ্জিত হতে হয় না এবং যা সবার কাছেই বুক ফুলিয়ে বলার মতো—এমন কাজই করবে। এতক্ষণ ধরে যে সব কথা আপনাদের বললাম, তা অতি পবিত্র এবং পাপনাশক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের এই বিধান অনুসারেই আচরণ করা উচিত। শ্রুতি এবং স্মৃতির যে নির্যাসকথা আপনাদের কাছে পরিবেশন করলাম, তা নাস্তিক, দুষ্ট, দাম্ভিক এবং মূর্খকে বলতে নেই; এতে শাস্ত্রের অসম্মান হয়।

—'সদাচারনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ দুশো বাইশ

মুনিরা এবার ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—আমরা এবার আপনার কাছ থেকে চার প্রকার বর্ণ এবং চার রকম আশ্রমের ধর্মবিধি শুনতে চাই। দয়া করে আমাদের তা বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাসদেব বললেন—ব্রাহ্মণ প্রতি দিন দান, দয়া, তপস্যা, দেবপূজা, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তর্পণপরায়ণ এবং সাগ্নিক হবেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য লোকের যাজন এবং অধ্যাপনাও করবেন। যজ্ঞের হোতা হিসেবে দানও গ্রহণ করবেন। সমস্ত প্রাণীর হিতসাধনে সর্বদাই সচেষ্ট থাকবেন। সমস্ত প্রাণীতে মিত্রতাই ব্রাহ্মণের পরম সম্পদ। অপরের ভূমি বা রত্নে তিনি কোন লোভ করবেন না। ব্রাহ্মণের পক্ষে ঋতুকালেই স্ত্রীসঙ্গ প্রশস্ত। ক্ষত্রিয় ব্যক্তি ইচ্ছানুযায়ী ব্রাহ্মণদের দান করবেন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং অধ্যয়নও ক্ষত্রিয়ের করা দরকার। যুদ্ধের জন্য অস্ত্রধারণ এবং পৃথিবী রক্ষা—এই দুইই ক্ষত্রিয়ের জীবিকা; তার মধ্যে আবার পৃথিবী পালনই শ্রেষ্ঠ। রাজা দুষ্টের শাসন এবং শিষ্টের পালন করলে বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষিত হয়; রাজাও অভিনন্দিত হন। পিতামহ ব্রহ্মা পশুপালন, বাণিজ্য, এবং কৃষিকার্য—বৈশ্যদের জন্য এই তিনটি বৃত্তি নির্দেশ করে দিয়েছেন। এ ছাড়া দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, অন্যান্য ধর্মকার্য এবং নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানও বৈশ্যেরা করবে। ব্রাহ্মণদের আশ্রয়ে তাদের কাজ করে কিংবা কেনা-বেচার কাজ করে বা শিল্প কর্মে উপার্জিত ধনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। শূদ্রও দান করবে এবং পাকযজ্ঞ করবে; তা দিয়েই তারা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পিতৃকার্য করবে। পোষ্যদের পরিপালনের জন্য সমস্ত বর্ণেরই ধন উপার্জন করা দরকার। ঋতুকালেই পত্নী-সহবাস করা উচিত। সমস্ত প্রাণীতে দয়া, ক্ষমা, সত্য পবিত্রতা, প্রিয়বাদিতা, বন্ধুত্ব, লোভহীনতা, অকার্পণ্য, ঈর্ষাহীনতা এবং হিতসাধনের ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্ত আশ্রমের, সমস্ত বর্ণেরই সাধারণ গুণ।

যদিও বর্ণসমূহের এই ধর্মের কথা বলা হল, প্রয়োজন বিশেষে কিন্তু এর ব্যতিক্রমও হয়। বিপদের সময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের কাজ করতে পারবেন। এভাবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের কাজ, এবং বৈশ্যও শূদ্রের কাজ করবেন। একমাত্র আপৎকালের জন্যই এই ব্যবস্থা। এবার আশ্রমধর্মের কথা আপনাদের শোনাই। বালক উপনয়নের পর বেদাধ্যয়নে তৎপর হয়ে গুরুগৃহে বাস করবে। তখন তাকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

সে তখন সমাহিতচিত্তে গুরুর শুশ্রূষা করবে এবং বিবিধ ব্রত আচরণ করে মনোযোগের সঙ্গে বেদাধ্যয়ন করবে। প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যায় সূর্য এবং অগ্নির উপাসনা সমাহিত ভাবে করবে এবং গুরুকে প্রণাম করবে। শিষ্য কোন প্রকারেই গুরুর প্রতিকূল আচরণ করবে না। গুরুর আচরণের অনুসরণ করবে এবং গুরুর আদেশক্রমেই নিবিষ্টচিত্তে তাঁর সামনে থেকে বেদপাঠ করবে। তারপর গুরুর অনুমতিক্রমে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করবে। প্রতি দিন প্রাতঃকালে গুরুর উপাসনার জন্য সমিধ্, কুশ প্রভৃতি আহরণ করে আনবে। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হলে পর গুরুর অনুমতি নিয়ে তাঁকে দক্ষিণা দেবে এবং পরে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করবে। যথাবিধি বিবাহ করে ক্ষমতানুসারে ধনার্জন করবে এবং গৃহস্থের যা যা করা উচিত বিধিমতো সে সবের অনুষ্ঠান করবে। পিণ্ডদানের দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণের, অন্নের দ্বারা অতিথিগণের, বেদাধ্যয়নের দ্বারা মুনিগণের, পুত্র উৎপাদনের দ্বারা প্রজাপতির, বলি প্রদানের দ্বারা ভূতগণের, এবং সত্য ও প্রিয়বাক্যের দ্বারা সমগ্র জগতের তৃপ্তি বিধান করবে। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি—সবাই গৃহস্থাশ্রমকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে ; সুতরাং গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। যে সব ব্রাহ্মণ বেদের আহরণের জন্য বা তীর্থ পর্যটনের জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, এবং যারা বাসস্থানশূন্য ও আহারহীন সেই সায়ংগৃহগণ অর্থাৎ যেতে যেতে যেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানেই বাস করেন যাঁরা—এই ব্যক্তিরা গৃহস্থ জনগণের একমাত্র অবলম্বন। এঁরা বাড়িতে এলে, এঁদের অভ্যর্থনা জানাবে এবং মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করবে, বিছানা, আসন এবং খাদ্য দান করবে। অতিথি যদি নিরাশ হয়ে কারো বাড়ি থেকে ফিরে যান, তবে গৃহস্থের পুণ্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায় এবং যাবতীয় পাপ গৃহস্বামীকে স্পর্শ করে। অবজ্ঞা, অহংকার, দম্ভ, পরিবাদ প্রহার, কঠোরতা—গৃহস্থের পক্ষে প্রশস্ত নয়। গৃহস্থ ব্যক্তি নিজের সমস্ত কর্তব্য পালন করার পর পরিণত বয়সে পুত্রদের হাতে স্ত্রীকে ন্যস্ত করে বা স্ত্রীর সঙ্গেই বনে প্রবেশ করবে। বনের মধ্যে গাছের নীচেই তাকে শুতে হবে, খেতে হবে ফল, মূল ও পাতা প্রভৃতি। চুল, দাড়ি কাটা চলবে না এবং সাধ্যমতো সকলের আতিথ্য করবে। চামড়া, কুশ বা কাশ দিয়ে পরবার কাপড় এবং উত্তরীয় তৈরি করবে। বনবাসী ব্যক্তির পক্ষে তিন সময়ে স্নান প্রশস্ত। দেবতার অর্চনা, হোম, অভ্যাগতদের যথাযোগ্য পূজা, ভিক্ষা এবং বলিপ্রদান—এ সমস্ত কর্মও বিশেষ প্রশস্ত। বনে যে স্নেহজাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা দিয়েই গায়ে মাথার কাজ করবে। শীত এবং গ্রীষ্মকে সমানভাবে সহ্য করার ক্ষমতাই বনবাসীদের পক্ষে পরম তপস্যা। যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রমে থেকে মুনিদের বৃত্তি অবলম্বন করে সংযত চিত্তে এই সব আচার পালন করেন, তিনি অগ্নির মতো সমস্ত দোষ দগ্ধ করে শাশ্বত লোকে যেতে পারেন। সন্ন্যাসাশ্রমকে মুনিরা ভিক্ষুকাশ্রম বলেন। পুত্র-পরিজন এবং সম্পৎসমূহ পরিত্যাগ করে চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। ত্রিবর্ণের যে যে আচার বিহিত হয়েছে ; সে-সব পরিত্যাগ করে শত্রু মিত্র সমস্ত জীবেই সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হবে। যথাসম্ভব সকলেরই মঙ্গল করতে চেষ্টা করবে। সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে সর্বদা সংযতচিত্তে থাকবে। সন্ন্যাসী গ্রামে একরাত এবং নগরে পাঁচ রাত পর্যন্ত বাস করতে পারেন। যখন গৃহস্থের ঘরে রান্নার আগুন নিভে যাবে এবং জনগণের ভোজন শেষ হয়েছে বলে বুঝবেন, তখন তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রশস্ত বর্ণের বাড়িতে ভিক্ষা করতে যাবেন। ভিক্ষা পেলে তুষ্ট হবেন না, আবার না

পেলেও রুষ্ট হবেন না। কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের জন্যই ভিক্ষা করবেন। পরিব্রাজক ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, মোহ প্রভৃতি যে সব দোষ আছে, সে সমস্তই বর্জন করবেন। যে সন্ন্যাসী চিতাগ্নিতে শয়ন করে নিজের দেহেই অগ্নিহোত্র স্থাপন করেন এবং দেহস্থ অগ্নিকে ভিক্ষালব্ধ ঘিয়ের দ্বারা নিজের মুখে হোম করেন, তিনি দিব্যলোকে যেতে সক্ষম হন। যিনি আশ্রম ধর্মসমূহ যথাবিধি পালন করেন, তিনি প্রশান্ত হয়ে ব্রহ্মলোক লাভ করেন।

—'বর্ণাশ্রমধর্মবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো তেইশ

মুনিরা এরপর ব্যাসদেবকে জিগ্যেস করলেন—বর্ণচতুষ্টয়ের কোন্ কর্মের দ্বারা অধম গতি এবং কোন্ কর্মের দ্বারা উত্তম গতি লাভ হয়, তা বলুন। শূদ্র কোন্ কর্ম করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, আর ব্রাহ্মণই বা কোন্ কর্ম করে শূদ্রত্ব লাভ করে? আপনি সর্বজ্ঞ ; কিছুই আপনার অবিদিত নেই। দয়া করে আমাদের সংশয় নিরসন করুন। মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব বললেন—পুরাকালে হিমালয় পর্বতে অবস্থিত ভগবান শংকরকে উমাদেবী এই একই কথা জিগ্যেস করেছিলেন। ভগবান মহাদেব উমাদেবীকে যে যে কথা বলেছিলেন সেই কথাই আপনাদের বলছি, শুনুন। ব্রাহ্মণত্ব অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও দুষ্কৃতির ফলে তা থেকে ভ্রষ্ট হয়। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণধর্ম অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে, তবে সে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়ত্ব অবলম্বন করে, সে ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যুর পর ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করে। দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করে যে বৈশ্যকর্ম করে, সে বৈশ্যত্ব লাভ করে। এ রকম হীন কর্ম করলে বৈশ্যও শূদ্রত্ব লাভ করে। স্বধর্মচ্যুত ব্রাহ্মণও এভাবে শূদ্র হয়ে পড়ে। সে বর্ণধর্মচ্যুত হয়ে ব্রহ্মলোকে যেতে পারে না, নরকে গমন করে ; পরে শূদ্র হয়ে জন্মায়। কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য—সকলেই নিজের কর্ম পরিত্যাগ করে শূদ্রের কাজ করলে শূদ্রত্ব লাভ করে থাকে। তারা নিজ নিজ স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বর্ণশংকরতা লাভ করে এবং ক্রমে শূদ্রত্ব লাভ করে। যে শূদ্র নিজের ধর্ম পালন করে জ্ঞানী, পবিত্র, ধর্মজ্ঞ এবং ধর্মনিরত হয়, সে অবশ্যই সেই ধর্মফল ভোগ করে থাকে।

ব্রহ্মা বলেছেন যে, উগ্রজাতির অন্ন, গণান্ন অর্থাৎ হোটেলের খাবার, শ্রাদ্ধের অন্ন, বিতরণ করা হবে বলে যে অন্ন নির্দিষ্ট হয়েছে, এমন অন্ন এবং শূদ্রের অন্ন কখনো খাবে না। দেবতারা শূদ্রান্নের নিন্দা করে থাকেন। শূদ্রান্ন খাওয়ার পর তা পেটে থাকতে থাকতেই যদি মৃত্যু হয় তবে কি আহিতাগ্নি, কি যাগকারী ব্যক্তি, সকলেরই অবশ্যই শূদ্রত্ব লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণ যার অন্ন উদরস্থ করে মারা যায়, সেই যোনি লাভ করে। দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করে যে ব্যক্তি অবহেলা ভরে নিষিদ্ধ বস্তু ভোজন করে, সে ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়। সুরাপানকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, চোর, ব্রতত্যাগী, অপবিত্র, বেদাধ্যয়নবর্জিত, পাপী, লোভী, হিংসুক, শঠ, শূদ্রকন্যা বিবাহকারী, সোমবিক্রেতা এবং হীন ব্যক্তির সেবাকারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ গুরুপত্নীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়, গুরুকে হিংসা করে, গুরুর কুৎসা রটনা করে এবং ব্রাহ্মণদের দ্বেষ করে সে-ও ব্রাহ্মণত্ব থেকে চ্যুত হয়। শূদ্র যথাবিধি সমস্ত কর্ম করবে ; বাড়িতে যে অতিথিই আসুক

না কেন, সাধ্যমত তাকে অভ্যর্থনা জানাবে, তার সেবা করবে ; তারপর নিজে সবার শেষে খাদ্য গ্রহণ করবে। সযত্নে শ্রেষ্ঠ তিন বর্ণের যথাযোগ্য পরিচর্যা করবে। সর্বদাই সৎপথে থেকে ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ করবে, সাধু সঙ্গ ভজনা করবে এবং বৃথা মাংস পরিত্যাগ করবে—এ রকম আচরণ করলে শূদ্রও বৈশ্যত্ব লাভ করতে পারে। বৈশ্য যদি সত্যবাদী, নিরহঙ্কারী মধুরভাষী, বেদাধ্যয়নকারী, পবিত্র এবং সংযতচিত্ত হয় এবং সে যদি শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখকে সমান ভাবে সহ্য করতে পারে, ব্রাহ্মণদের যথোচিত সৎকার করে, দু'বেলা মাত্র আহার করে, কাউকে ঈর্ষা না করে, ব্রত পালন করে, যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং দক্ষিণ, গার্হপত্য এবং আহবনীয় এই ত্রিবিধ বৈদিক অগ্নির উপাসনা করে অতিথিসেবার পর ভোজন করে, তবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। এ রকম আচরণকারী বৈশ্য মহান ক্ষত্রিয় বংশে নিষ্ঠাবান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যথাকালে উপনয়ন হওয়ার পর সমৃদ্ধ এবং বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং আর্তজনের পরিত্রাতা, ধর্মানুসারে প্রজাপালক, সত্যবাদী এবং ন্যায়মার্গগামী রাজা হয়। ধর্মকার্যে ব্যাপৃত থেকে প্রজাদের কাছ থেকে পাওয়া ষষ্ঠভাগ করের দ্বারাই নিজের বৃত্তি নির্বাহ করে। ঋতুকালেই নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে। উপবাস এবং বেদাধ্যয়ন করে ; অতিথিপরায়ণ হয়। স্বার্থ বা কামবশে কোন কর্তব্য কার্যে অবহেলা করে না। পিতৃকার্য এবং দৈবকার্যে অবহেলা করে না। দিনে দু'বার অগ্নিহোত্র উপাসনা করে। শেষে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে সম্মুখযুদ্ধে বা মন্ত্রপূত ত্রেতাগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করে এবং মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায়।

যথাবিধি জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কারে সংস্কৃত এবং বেদজ্ঞ হলে ধর্মপ্রাণ বৈশ্যও নিজের কর্মফলে ক্ষত্রিয় হতে পারে। নীচ কুলে জাত শূদ্রও যথাবিধি সংস্কারযুক্ত ও বেদজ্ঞ হলে এ সব কর্মের ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। অসচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ অন্যান্য বর্ণের যে কর্ম, সেই কর্মের অনুষ্ঠান করলে ব্রাহ্মণত্ব থেকে চ্যুত হয়ে শূদ্রত্ব লাভ করে। যে শূদ্র সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে, যে স্বভাবতই পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণের মতোই তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। যে শূদ্র স্বাভাবিক কর্ম করে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে, আমার মনে হয় সে সাধারণ ব্রাহ্মণদের থেকেও পবিত্র। বংশসংস্কার, বেদজ্ঞান, কিংবা সন্তানবাহুল্য—কোন কিছুর দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায় না ; একমাত্র সুচরিত্রই ব্রাহ্মণত্ব লাভে সহায়ক। জগতে যত প্রকৃত ব্রাহ্মণ দেখা যায়, সদাচারই তাদের ব্রাহ্মণত্বের কারণ। সদাচারপরায়ণ শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। সমস্ত প্রাণীতে সমদর্শনই ব্রাহ্মণের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তির মধ্যে নির্গুণ, বিমল ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। মর্ত্যলোকে ব্রাহ্মণ একটি মহৎ ক্ষেত্রস্বরূপ ; ওই ক্ষেত্রে যে বীজ পতিত হয়, সেই বীজই পরকালে বিশেষ ফল প্রদান করে। তাই প্রত্যেকেরই উচিত ব্রাহ্মণোচিত আচার পালন করা। গৃহস্থ ব্যক্তি প্রতি দিনই বেদ পাঠ করবে। বেদাধ্যয়নকে জীবিকা না করে, যে সর্বদাই সদাচারপরায়ণ এবং অধ্যয়নসম্পন্ন হয়, সে ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারে।

মহাদেব উমাকে এই যে গুহ্য বিষয় বলেছিলেন, সেই কথাই আপনাদের এতক্ষণ ধরে শোনালাম।

—'সঙ্করজাতিলক্ষণবর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো চব্বিশ

ব্যাস বললেন—হিমালয়ে সুখাসীন মহাদেবকে উমাদেবী জিগ্যেস করলেন—দেহিগণ সর্বদা কর্ম, মন ও বাক্যজনিত ত্রিবিধ বন্ধনে কি ভাবে বন্ধ হয় ? আর কি ভাবেই বা মুক্তিলাভ করে ? মানুষ কেমন স্বভাব, কোন্ কর্ম, কি রকম আচার এবং কোন্ গুণে স্বর্গলাভ করতে পারে, আমাকে বিস্তৃতরূপে তা বলুন। উমার প্রশ্নের উত্তরে শিব বললেন—যারা সমস্ত সংশয় ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, সেই সত্য, ধর্মরত এবং শান্ত ব্যক্তিরা ধর্ম বা অধর্মের দ্বারা বন্ধ হন না। যারা কর্ম, মন এবং বাক্যের দ্বারা হিংসা আচরণ করেন না, যারা কোথাও আসক্ত হন না, তাদেরও কর্মবন্ধন ঘটে না। যিনি শত্রু মিত্রে সমান ব্যবহার করেন তিনিও কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। সমস্ত প্রাণীতে দয়াবান, সমস্ত প্রাণীরই বিশ্বাসযোগ্য, সদাচারসম্পন্ন মানুষ স্বর্গে যায়। যারা নিয়ত পরধনে লোভহীন এবং ধর্মানুসারে লব্ধ ধনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে সেই সব মানুষেরাও স্বর্গে গমন করে। যারা পরনারীতে মায়ের মতো আচরণ করে, বোনের মতো এবং কন্যার মতো তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে, সেই সব মানুষেরাও স্বর্গে গমন করে। যারা নিজ পত্নীর সঙ্গে ঋতুকালেই সহবাস করে এবং তাতেই অনুরক্ত থাকে, তারাও স্বর্গে যেতে পারে। এই পথ সমস্ত মানুষেরই অবলম্বনযোগ্য। উমা এবার মহাদেবকে জিগ্যেস করলেন—যে বাক্য প্রয়োগে মানুষ বন্ধ হয় এবং যে বাক্য প্রয়োগে মুক্তিলাভ করতে পারে, আমাকে সে-কথা বলুন। শিব উমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন—যারা নিজের জন্য কিংবা পরের জন্য মিথ্যা কথা বলে না, তারা স্বর্গে গমন করে। বৃত্তি, ধর্ম বা কামনা সাধনের জন্য যারা মিথ্যা কথা বলে না, তারাও স্বর্গে গমন করে। যারা অভ্যাগত ব্যক্তির সঙ্গে মধুর এবং প্রিয় কথা বলে, কঠোর বা নিষ্ঠুর কথা বলে না এবং যারা শত্রুতা আচরণ করে না, তারা স্বর্গে যেতে পারে। অপরের দুঃখ হয় কিংবা নিন্দা হয় এমন কথা যারা বলে না, তারাও স্বর্গগামী হয়। ধীমান ব্যক্তি মিথ্যা আচরণ এবং মিথ্যা কথা বলা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবেন। উমা এরপর শিবকে অনুরোধ করলেন - এবার যে যে মানস কর্মের দ্বারা মানুষ বন্ধ হয়, সে-কথা আমাকে বলুন। উমার অনুরোধে মহাদেব বললেন—মন দুষ্কর্মে নিযুক্ত হলে অন্তঃকরণও দুষ্ট হয়ে পড়ে ; সুতরাং মানুষ তাতে আবন্ধ হয়ে পড়ে। যারা নির্জন বনের মধ্যে পরকীয় ধনসম্পদ দেখে মনে মনেও তা গ্রহণ করে না, সেই মানুষেরা স্বর্গগামী হয়। যারা সুন্দরী পরনারী দেখেও মনে মনে তাকে কামনা করে না, সেই মানুষেরাও স্বর্গগামী হয়। যারা শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন এবং নিজের সম্পদে পরিতুষ্ট, সেই মানুষেরাও স্বর্গে গমন করতে পারে। পাপকর্ম বর্জন করে যারা দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সেবা করে, তারা স্বর্গগামী হয়।

উমা শিবকে এরপর জিগ্যেস করলেন—কোন্ কর্মের ফলে মানুষ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে ? আর কোন্ কর্ম করলে মানুষের আয়ু ক্ষীণ হয় ? দয়া করে সে কথা আমাকে বলুন। পৃথিবীতে অনেক রকমের মানুষ দেখা যায়। কেউ ভাগ্যবান, কেউ মন্দ ভাগ্য-সম্পন্ন, কেউ কুলীন, কেউ বা অকুলীন, কেউ নির্বোধ, কেউ পণ্ডিত, কেউ অল্পভাষী কেউ বা বহুভাষী। এর কারণ কি আমাকে বলুন। শিব তখন উমাকে বললেন—কর্মফলেই মানুষের মধ্যে এই বৈচিত্র্য দেখা যায়। যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীতে এমন কি কীটপতঙ্গ প্রভৃতিতেও নির্দয়, সমস্ত উপায়ে প্রাণীহিংসা করে, সকলকেই পীড়িত করে, তারা

রকে যায়। যারা এর বিপরীত আচরণ করে, তারাই স্বর্গে যেতে পারে। মানুষ হিংস্র
র্মের দ্বারা নরকে গিয়ে ক্লেশ ভোগ করার পর যদিও বা মানুষ হয়ে জন্মায় তাহলেও
। বেশি দিন বাঁচে না। সমস্ত প্রাণীতে সমদর্শী, সর্বথা হিংসাত্যাগকারী মানুষ দেবত্ব
াভ করেন। মৃত্যুর পর কাঙ্খিত লোকে গমন করেন। তারপর তিনি মানুষ হয়ে
ন্মালেও দীর্ঘায়ু হয়ে থাকেন।

—'ধর্মনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ দুশো পঁচিশ

াসকে উমা-মহেশ্বরের কথোপকথনের সারাংশ মুনিদের বলতে লাগলেন। উমা মহেশ্বরকে
িজ্ঞেস করলেন—পুরুষ কি রকম আচার, কি রকম ব্যবহার এবং কি রকম দান করলে
র্গলাভ করে, সে-কথা আমাকে বলুন। উমার অনুরোধে মহাদেব বললেন-যে ব্যক্তি
রিদ্র, আর্ত এবং বিপন্ন জনগণকে ভোজ্য, পানীয় এবং বস্ত্র দান করে, সাধারণের জন্য
সস্থান, সভা, পুকুর প্রভৃতি নির্মাণ করে, পবিত্র এবং সংযত ভাবে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান
রে, ধন-রত্ন, শয্যা, ভূমি প্রভৃতি প্রশান্ত মনে দান করে, সে দেবলোকে বাস করে পর্যাপ্ত
খভোগের পর স্বর্গচ্যুত হয়ে মহান বংশে জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা বলেছেন যে, দানশীল
োকেরা ইহলোকে মহাভাগ এবং প্রিয়দর্শন হয়ে জন্মায়। যারা বিত্তবান হয়েও প্রার্থীদের
ান কিছুই দান করে না, যারা স্বার্থরক্ষায় অত্যন্ত যত্নবান, লোভী এবং নাস্তিক, তারা
রকে গমন করে। কালবিপর্যয়ে তারা দরিদ্র এবং অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট হয়ে জন্মায়। তারা
ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পায়, অধর্মাচরণের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। যারা অহংকারী তারাও
নান কষ্ট ভোগ করে। যারা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে আসন দান করে না, সম্মানীয়কে সম্মান
ন করে না, গুরুজনকে অভ্যর্থনা জানায় না এবং বৃদ্ধদের অবজ্ঞা করে, তারা নরক-
ন্ত্রণা ভোগ করে। এরা চণ্ডাল প্রভৃতি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে। অপর পক্ষে যারা
নিরহঙ্কার, সম্মাননীয় ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান দান করে, হিংসাচরণ করে না, অতিথি-
অভ্যাগতের সেবা করে, তারা স্বর্গে গমন করে থাকে। মৃত্যুর পর এরা বিশিষ্ট বংশে
জন্মলাভ করে বিপুল সুখ ভোগ করে এবং ধর্মপরায়ণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরূপে
পরিচিত হয়। জ্ঞাতি বন্ধুদের মধ্যে কে পাপী কে-ই বা পুণ্যাত্মা—এভাবেই তা জানা যায়।
সৌম্যদর্শন, সংযতেন্দ্রিয়, অহিংসক এবং দয়াবান ব্যক্তিই স্বর্গে বাস করতে পারে।
সেখানে দেবতার মতো সুখ ভোগ করার পর মর্ত্যলোকে মহান বংশে জন্মগ্রহণ করে।
পূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফলে এ জন্মেও সে সুখ ভোগ করে।

উমা মহাদেবকে জিগ্যেস করলেন—পৃথিবীতে দেখা যায় যে, কেউ কেউ জ্ঞান-
বিজ্ঞানবান, বুদ্ধিমান এবং অর্থের উপযুক্ত ব্যবহারে অভিজ্ঞ, অবার কেউ কেউ বা নির্বোধ
এবং মূর্খ, কেউ জন্মান্ধ, রোগগ্রস্ত, কেউ বা ক্লীব হয়ে থাকে, এর কারণ কি আমাকে
বলুন। মহাদেব উমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন—যারা বেদজ্ঞ এবং ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের
পরামর্শে অশুভ কর্ম বর্জন করে শুভ কর্মের আচরণ করে তারা ইহলোকে সুখভোগ
করার পর মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে। তারপর পুণ্যক্ষয়ে মনুষ্যলোকে বুদ্ধিমান হয়ে
জন্মায় এবং শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে। যারা পরস্ত্রীর প্রতি
কামার্ত হয়ে পড়ে, তাদের দিকে কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তারা জন্মান্ধ হয়। যারা কামবশে

নগ্ন পরস্ত্রী দর্শন করে, তারা রোগার্ত হয়। যে সব মূর্খ ব্যক্তি নীচবংশীয় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সহবাস করে কিংবা সমকামী হয় তারা ক্লীব হয়ে জন্মায়। যারা পশুর সঙ্গে রমন করে, গুরুপত্নীর সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হয়, তারাও ক্লীব হয়ে জন্মায়।

উমা এবার মহাদেবকে জিগ্যেস করলেন—কোন্ কর্ম নিন্দনীয় আর কোন্ কর্ম প্রশস্ত,—সে কথা আমাকে বলুন। মহাদেব উমাকে বললেন—যারা ধর্মপরায়ণ তারা স্বর্গ-লাভ করে। তারা কালান্তরে মনুষ্যত্ব লাভ করলেও ধীমান, মেধাবী এবং প্রতিভাসম্পন্ন হয়ে জন্মায়। এই আমি তোমাকে কর্মফলের বিচিত্র কথা শোনালাম। উমা বললেন—কত অল্পবুদ্ধি এবং ধর্মবিদ্বেষী মানুষ আছে যারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে যায় না, ব্রত পালন করে না, যজ্ঞ করে না ; আবার কেউ কেউ এর বিপরীত আচরণ করে, এর কারণ কি আমাকে বলুন। উমার প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বললেন—পুরাকালে লোক সকলের মর্যাদা নিরূপণের জন্য আগমসকল বিরচিত হয়েছে ;—সদবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণ সেই আগমকে প্রমাণরূপে সম্মান করে থাকে। যারা মোহাচ্ছন্ন, ব্রতহীন এবং যারা ঐ আগমমর্যাদা লঙ্ঘন করে এবং অধর্মকে ধর্ম বলে উল্লেখ করে, তারা ব্রহ্মরাক্ষস বলে পরিচিত। যারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে না, তারা কালপ্রভাবে ইহলোকে নরাধম হয়ে জন্মায়। এই নিগূঢ় ধর্মতত্ত্ব তোমার কাছে ব্যক্ত করলাম।

—'ধর্মনিরূপণ' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ দুশো ছাব্বিশ

ব্যাসদেব বললেন—জগন্মাতা উমা মহাদেবের কাছ থেকে এই ধর্মতত্ত্ব জেনে আনন্দিত হলেন। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে যে মুনিগণ হিমালয়ে শিবের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁরা বিনীত ভাবে মহেশ্বরকে জিগ্যেস করলেন—অল্পবুদ্ধি পুরুষেরা এই মহাঘোর এবং লোমহর্ষ সংসারে সুচিরকাল ভ্রমণ করে থাকে, তারা কোন্ উপায়ে এই জন্ম-সংসার দায় থেকে মুক্ত হয়, দয়া করে সে-কথা আমাদের বলুন। মহাদেব তাঁদের বললেন—কর্মপাশনিব দুঃখভাগী মানুষের পক্ষে একমাত্র বাসুদেব ছাড়া অন্য কোন পরম আশ্রয় নেই। যাঁরা সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণুকে কায়মনোবাক্যে পূজো করে, তারা পরম গতি লা করে। মুনিরা তখন মহাদেবকে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে অনুরোধ করলে বললেন—শাশ্বত পুরুষ হরি পিতামহ ব্রহ্মার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। নির্মল আকাশে সূর্যের মতো তিনি দীপ্ত পান। দেবশত্রুনাশক সেই হৃষীকেশ দশবাহু বিশিষ্ট। ব্রহ্ম তাঁর উদর থেকে জন্মেছেন, আমি জন্মেছি তাঁর মাথা থেকে। তাঁর কেশ থেকে জ্যোতি পদার্থসমূহ উদ্ভূত হয়। তিনিই পিতামহ ব্রহ্মার গৃহ এবং সমস্ত দেবতার বাসভবন তিনিই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এর প্রতিপালন এবং ধ্বংসসাধন তিনিই করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বস্রষ্টা, সর্বত্রগামী এবং সর্বতোমুখ ; তাঁর থেকে। শ্রে কোন কিছুই নেই। তিনি দেবতাদের কার্যসাধনের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে জন্মাবেন এবং পাপাচারী ব্যক্তিদের বিনাশ সাধন করবেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া দেবতা কোন কাজই করতে পারে না। কর্ম এবং কারণরূপী, ব্রহ্মভূত, ব্রাহ্মণ এবং ঋষিগণে শরণ সেই ভগবানের নাভিদেশে ব্রহ্মা বাস করেন ; আমি তাঁর শরীরে বাস করি দেবতারাও তাঁর শরীরে বাস করেন। গরুড় তাঁর বাহন। তিনি বিরূপাক্ষ হবে

যোগমায়ার প্রভাবে সহস্রচক্ষুবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হন। তিনি জ্ঞানী, বন্ধুজনের প্রিয়, অহঙ্কারহীন, মুক্তিদাতা, ভয়ার্তদের ভয়হারী, মিত্রদের আনন্দবিধানকারী, সমস্ত প্রাণীর রক্ষক, দীনজনের পালক, আশ্রিতের উপকারক, শত্রুদের ভয়োৎপাদক শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্মসংস্কৃত। দেবতাদের কার্য সাধনের জন্য তিনি মহাত্মা মনুর বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। মনুর পুত্র অংশ, তাঁর পুত্র অন্তর্ধাম, অন্তর্ধামের পুত্র হবির্ধাম, সেই হবির্ধাম প্রজাপতি। তাঁর পুত্র প্রাচীনবর্হি; প্রাচীনবর্হির প্রচেতা প্রভৃতি দশটি পুত্র জন্মাবে। সেই প্রচেতাদের পুত্ররূপে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করবেন। দক্ষের কন্যা অদিতি থেকে আদিত্য এবং আদিত্য থেকে মনু জন্মাবেন। মনুরই বংশধর সুদ্যুম্ন-ইলা। বুধের সংসর্গে ইলার পুত্ররূপে পুরূরবার জন্ম হবে। পুরূরবার পুত্র আয়ু, তার পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির পুত্ররূপে জন্মাবে যদু, সেই যদুর পুত্র ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টার পুত্র বৃজিনীবান, বৃজিনীবানের পুত্র উষঙ্গু। উষঙ্গুর দুই পুত্র—চিত্ররথ এবং শূর। বিখ্যাতবীর্য, চরিত্রগুণমণ্ডিত, যাগশীল রাজগণের বংশে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সেই শূর বসুদেব নামক পুত্র উৎপাদন করবেন; এঁর অপর নাম আনকদুন্দুভি। এঁরই পুত্র বাসুদেব; ইনি চতুর্বাহুবিশিষ্ট, দাতা, ব্রাহ্মণদের সম্মানকারী এবং ঈশ্বরস্বরূপ হবেন। সেই যাদব জরাসন্ধ রাজাকে পরাজিত করে পৃথিবীতে খ্যাতিমান হবেন। তিনি দ্বারকায় বাস করে দুষ্টদের শাসন করবেন। আপনারা তখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে শাশ্বত ব্রহ্মের মতো যথাবিধি অর্চনা করবেন। সেই ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করলেই আমাকে এবং পিতামহ ব্রহ্মাকেও দেখা হয়। পৃথিবীতে যারাই সেই কেশবকে আশ্রয় করে, তাদের কীর্তি, যশ এবং স্বর্গ লাভ হয়। তিনি ধর্মের নিয়ামক হবেন; তাঁকে অর্চনা করলেই ধর্ম সঞ্চিত হয়। সেই মহাতেজা পুরুষব্যাঘ্র প্রজাগণের হিতসাধনের জন্য বহু কোটি ঋষি সৃষ্টি করেন। তাঁরই সৃষ্ট সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্বতে বাস করছেন। তাঁকে দর্শন করলে তিনি সর্বদাই দর্শন দিয়ে থাকেন; তাঁকে আশ্রয় করলে, তিনিও আশ্রয় দিয়ে থাকেন। সেই আদিদেবতা বিষ্ণুর মহিমাই এই রকম। সজ্জনগণ তাঁর আচরণেরই অনুসরণ করে থাকেন। আমিও সেই জগৎপতিকে প্রতি দিনই প্রণাম করে থাকি। তাঁকে দর্শন করলেই ত্রিলোক দর্শনের ফল লাভ করা যায়। তাঁর অগ্রজ ভাই 'বলরাম' নামে প্রসিদ্ধ হবেন। অনন্তনাগই বলরামরূপে জন্মগ্রহণ করবেন। কাশ্যপপুত্র বলবান গরুড়ও যে পরমাত্মারূপী অনন্তনাগকে নিজ তপস্যার গুণে দেখতে সক্ষম হন নি, তিনি বলরামরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করবেন; আবার পাতালেও সর্পরূপে নিজের ফণায় পৃথিবীকে ধারণ করবেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই পৃথিবীধারণকারী অনন্ত; যিনি বলরাম, তিনিই সমস্ত জগতের আধার বিষ্ণু। শ্রীভগবানের পুণ্যকথা আপনাদের বললাম। আপনারা সযত্নে সেই যদুশ্রেষ্ঠকে অর্চনা করবেন।

—ঋষিমহেশ্বরসংবাদে 'ভগবানমাহাত্ম্যকীর্তন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো সাতাশ

মুনিরা ব্যাসদেবকে বললেন—আমরা আপনার কাছ থেকে পবিত্র বিষ্ণুকথা শুনলাম। কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের সংশয় জন্মেছে। বাসুদেবকে যথাবিধি পূজা করে মানুষ স্বর্গ না মোক্ষ—কোন্ গতি লাভ করে? আপনি দয়া করে আমাদের এই সংশয় ছেদন

করুন। মুনিদের সংশয় নিরসন কল্পে ব্যাসদেব বললেন—মানুষ যখনই কৃষ্ণ উপাসনায় দীক্ষিত হয়, তখনই সে মোক্ষলাভে সক্ষম হয়। যারা সর্বদা ভক্তিভরে কৃষ্ণের অর্চনা করেন, তাদের স্বর্গ বা মোক্ষ কিছুই দুর্লভ নয়। বৈষ্ণবগণ যা যা কামনা করে, দুর্লভ হলেও তারা তা লাভ করে বিষ্ণুর অনুগ্রহে। রত্নপর্বতে আরোহণ করে মানুষ যেমন স্বেচ্ছাক্রমে রত্ন সংগ্রহ করে, কৃষ্ণের অনুগ্রহে তেমনি তারা তাদের মনোরথসমূহ লাভ করতে পারে। পুরুষ কল্পবৃক্ষের কাছে গিয়ে যেমন স্বেচ্ছানুসারে ফল গ্রহণ করে, কৃষ্ণের অনুগ্রহেও সে রকমই তাদের বাঞ্ছিত ফল পায়। বাসুদেবকে পূজা করলে মানুষ ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ—সবই লাভ করে! বাসুদেবকে সর্বদাই যাঁরা অনুচিন্তন করেন তাঁরাই জগতে ধন্য। বিষ্ণুসেবক জনগণ জরামরণযুক্ত, জলবুদ্বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী, মাংস এবং রক্তের দুর্গন্ধযুক্ত, অপবিত্র মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করে দিব্য লোকপাল ভবনসমূহে গমন করেন। লোকপাল ভবনসমূহে পৃথক পৃথক ভাবে তাঁরা এক এক মন্বন্তর করে মোট দশ মন্বন্তর কাল অতিবাহিত করেন। সেখান থেকে তাঁরা গন্ধর্বলোকে যান; সেখানে কুড়ি মন্বন্তর সুখে কাটাবার পর তাঁরা আদিত্যলোকে যান। সেই আদিত্যলোকে তিরিশ মন্বন্তর কাটানোর পর সুখভোগান্তে চন্দ্রলোকে যান; সেখানে চল্লিশটি মন্বন্তর কাটানোর পর তাঁরা দিব্য নক্ষত্রলোকে যান। সেখানে পঞ্চাশটি মন্বন্তর সুখে কাটানোর পর তাঁরা সুদুর্লভ দেবলোকে যান। সেখানে ষাটটি মন্বন্তর সুখে কাটিয়ে ইন্দ্রলোকে যান। ইন্দ্রলোকে সত্তরটি মন্বন্তর কাটানোর পর প্রাজাপত্য লোকে গমন করেন। প্রাজাপত্য লোকে আশী মন্বন্তর যাবৎ সুখে কাটানোর পর তাঁরা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেই ব্রহ্মলোকে নব্বইটি মন্বন্তর কাল সুখে কাটিয়ে বেদজ্ঞ যোগী হয়ে জন্মান। বৈষ্ণবগণ প্রতি জন্মেই একশো বছর ধরে সুখভোগ করে লোকান্তরে গমন করেন। এভাবে দশ জন্ম পূর্ণ হলে পর সেই বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মলোক থেকে দিব্য হরিলোকে গমন করেন। সেখানে একশো মন্বন্তর কাল ধরে সুখভোগ করে বরাহলোকে যান। সেখানে তাঁরা চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন তারপর তাঁরা নরসিংহপুরে গিয়ে অযুত কোটি বছর বিচরণ করেন। নরসিংহপুর থেকে তাঁরা বিষ্ণুলোকে গমন করেন। সেখানে দীর্ঘ দিন কাটানোর পর পুনরায় ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ব্রহ্মলোকে দীর্ঘদিন সুখভোগ করে নারায়ণপুরে গমন করেন। নারায়ণপুরে অনেক দিন কাটিয়ে দিব্যরূপ ধারণ করে তাঁরা অনিরুদ্ধপুরে গমন করেন। সেখান থেকে প্রদ্যুম্নপুরে যান। সেই প্রদ্যুম্নপুরে মহাসুখে অনেক দিন কাটানোর পর স্বচ্ছন্দগামী বৈষ্ণব যোগীগণ প্রভু সংকর্ষণ অর্থাৎ বলরাম যেখানে বিরাজমান, সেই পুরে গিয়ে দীর্ঘ দিন সুখভোগ করেন। তারপর তাঁরা জরা-মরণ বর্জিত, নাম-রূপহীন বাসুদেব পদবাচ্য নিরঞ্জন পরতত্ত্বে প্রবেশ করে মুক্তিলাভ করেন।

—'বৈষ্ণবগতিখ্যাপন' নামক অধ্যায়

অধ্যায় ঃ দুশো আটাশ

ব্যাস বললেন—শুক্ল এবং কৃষ্ণ-এই উভয় পক্ষের একাদশী তিথিতে বিধানানুসারে জিতেন্দ্রিয় হয়ে উপবাস করে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং অন্যান্য উপহার, জপ হোম, প্রদক্ষিণ, নানাবিধ দিব্য স্তোত্র, মনোহর গীতবাদ্য প্রভৃতির দ্বারা বিষ্ণুকে পূজ

রবে। তারপর রাতের বেলা বিষ্ণুবিষয়ক কথা বা গানের দ্বারা রাত্রি জাগরণ করবে।
। রকম করলেই সেই ব্যক্তি বিষ্ণুপুরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। মুনিরা
খন ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—গান করে রাত্রি জাগরণ করলে যে ফল হয়, তা
শানার জন্য আমাদের কৌতূহল হচ্ছে, আপনি দয়া করে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত
রুন। ব্যাস মুনিদের অনুরোধে সেই পবিত্র কথা বলতে আরম্ভ করলেন। পৃথিবীতে
বন্তী নামে এক বিখ্যাত নগরী ছিল ; সেখানে ভগবান বিষ্ণু ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। সেই
গরীর প্রান্তভাগে এক বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল বাস করত। সে ভালো গান করতে পারত।
দাচারেরর দ্বারা ধনার্জন করে পরিবার প্রতিপালন করত সেই চণ্ডাল। সে নিয়মপূর্বক
তোক মাসের একাদশীতে উপবাসী থেকে সেই বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে বিষ্ণুর আবির্ভাব-
ষয়ক বিষ্ণুনামসম্বলিত গীতিকা সারা রাত ধরে গান করত। গানের দ্বারা সমস্ত
ত্রি জাগরণ করে দ্বাদশীর দিন সকালে বিষ্ণুকে প্রণাম করত ; তারপর বাড়ি ফিরে
য়ে, জামাই, ভাগ্নে, এদের খাইয়ে সবার শেষে সে নিজে খেত। এভাবে অনেক দিন
টে গেল। একবার চৈত্র মাসের একাদশী তিথিতে বিষ্ণুপূজার জন্য দ্রব্য আহরণ
রতে সে ক্ষিপ্রা নদীর তীরে এক বহেড়া গাছের কাছে পৌঁছল। সেই গাছে এক রাক্ষস
স করত। চণ্ডালকে দেখেই সেই রাক্ষস তাকে খাওয়ার জন্য এলো। চণ্ডাল তখন
ক্ষসকে বলল—দেখ, আজ তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। কাল সকালে আমি অবশ্যই এখানে
রে আসব ; তখন আমাকে যা খুশি তাই করো। বিষ্ণুর প্রীতিসাধনের জন্য আমি
ত্রি জাগরণ ব্রত করে থাকি ; আমার সেই ব্রতে বিঘ্ন ঘটিও না। চণ্ডালের কথা শুনে
ক্ষস বলল—দেখ, দশ দিন ধরে আমার কিছু খাওয়া হয় নি। ক্ষুধায় আমি অত্যন্ত
তর ; তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। চণ্ডাল তখন রাক্ষসকে অনুরোধ করে
লল—শোন, এই সমগ্র জগৎ সত্যমূলক। আমি সেই সত্য অবলম্বনে প্রতিজ্ঞা করছি
, আবার আমি এখানে ফিরে আসব। সূর্য, চন্দ্র, আগুন, বাতাস, ভূমি, জল, মন,
ন, রাত্রি, যম এবং প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা—এঁরা মানুষের সমস্ত আচরণ অবগত
াছেন। পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হলে, পরদ্রব্য অপহরণ করলে, ব্রহ্ম হত্যা
রলে, সুরাপান করলে, গুরুপত্নীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রচনা করলে, উপযুক্ত সময়ে
ধ্যা উপাসনা না করলে, শূদ্রাজাতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করলে, মাছ মাংস খেলে, বন্ধুহত্যা
রলে, অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করলে মানুষের যে পাপ হয় এবং অমাবস্যা, অষ্টমী, ষষ্ঠী,
ভয় পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে স্ত্রী সহবাস করলে, ব্রাহ্মণ রজস্বলা নারীর সঙ্গে রমণে
প্ত হলে, শ্রাদ্ধ করার পর স্ত্রী সহবাস করলে, বন্ধুপত্নীর সঙ্গে সহবাস করলে, ব্রাহ্মণকে
তিশ্রুত দ্রব্য দান না করলে, স্ত্রীহত্যা, বালক হত্যা করলে, বেদ, দেবতা, সজ্জন এবং
তী স্ত্রীর নিন্দা করলে, ঘরে আগুন দিলে, গোহত্যা করলে, ভ্রূণ হত্যা করলে, সত্য
তিপালন না করলে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, নিজের কন্যার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হলে,
ন্যাস গ্রহণের পর পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলে যে পাপ হয়, সে সমস্ত পাপেই যেন
ামি লিপ্ত হই ; যদি আমি ফিরে না আসি।

চণ্ডালের কথা শুনে ব্রহ্মরাক্ষস বিস্মিত হয়ে তাকে বলল—ঠিক আছে, এখন তুমি
ও ; প্রতিজ্ঞা কিন্তু পালন করো। সেই চণ্ডাল তখন ফুল নিয়ে বিষ্ণুমন্দিরে গেল।
ূজক ব্রাহ্মণকে সেই ফুল দেওয়ায় তিনি জল দিয়ে তা শোধন করে নিয়ে বিষ্ণুকে পূজা
রলেন। চণ্ডাল কিন্তু উপবাসী থেকে সেই মন্দিরের বাইরে বসে গান করতে করতে

রাত কাটিয়ে দিল। সকালে স্নান করে বিষ্ণুকে প্রণাম করল; তারপর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সেই ব্রহ্মরাক্ষসের কাছে চলল। পথে কোন ব্যক্তি তাকে গন্তব্যস্থল জিগ্যেস করায় সে তাকে সমস্ত কথা বলল। চণ্ডালের কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে সেই ব্যক্তি বলল—দেখ, সর্বপ্রযত্নে শরীর রক্ষা করাই প্রাণীদের প্রধান ধর্ম; কারণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শরীরই প্রধান সাধন। শরীর ধারণ করলেই উত্তম কর্মের দ্বারা কীর্তিলাভ করা যায়। মানবজন্ম লাভ করে যদি পৃথিবীতে কীর্তিস্থাপন না করা যায়, তবে সেভাবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? সে কথা শুনে চণ্ডাল বলল—তুমি যা বলছ, সে-কথা সত্য। কিন্তু আমি যে শপথ করে এসেছি; আমাকে তো যেতেই হবে। সেই ব্যক্তি চণ্ডালকে আবার বলল—তুমি এমন নির্বোধ কেন? মনু যা বলেছেন, তুমি কি সে-কথা শোন নি? গো, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য, বিবাহকালে, রমণীসঙ্গবিষয়ে, প্রাণসংশয়ে বা সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায়—এই পাঁচ জায়গায় মিথ্যা ব্যবহারে কোন পাপ হয় না। স্ত্রীলোক, বিবাহ, শত্রু, অর্থহানি, আত্মবিনাশ বা প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটলে এবং মিথ্যাবাদী লোকের কাছে ধর্মবাক্য পালন না করলেও কোন দোষ হয় না। এ কথা শুনে চণ্ডাল বলল—এ কথা বলো না। পৃথিবীতে একমাত্র সত্যই পূজিত হয়। সত্যের দ্বারাই জগতের যা কিছু সুখলাভ হয়। সত্যের অনুরোধেই সূর্য তাপ প্রদান করেন, জল রসাত্মক হয়, অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সত্যের দ্বারাই লাভ করা যায়। সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই সমস্ত যজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তাই সত্য ত্যাগ করা কখনই উচিত নয়। এ কথা বলেই চণ্ডাল সেই ব্রহ্মরাক্ষসের কাছে গিয়ে হাজির হল। চণ্ডালকে দেখে সেই রাক্ষস আনন্দিত হয়ে বলল—তুমি সত্যই সত্যপরায়ণ। তোমাকে আমি চণ্ডাল বলে মনে করি না। তোমাকে পবিত্র এবং সদাচাররত ব্রাহ্মণ বলেই মনে হয়। তাই তোমাকে কিছু ধর্মকথা জিগ্যেস করি। রাত্রে বিষ্ণুমন্দিরে তুমি কি করেছ সে-কথা আমাকে বল। চণ্ডাল তখন সেই রাক্ষসকে বলল—আমি বিষ্ণুমন্দিরের বাইরে থেকে ভক্তিনম্রচিত্তে বিষ্ণুবিষয়ক গীতিকা গান করে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি।

ব্রহ্মরাক্ষস : তুমি কত দিন এভাবে বিষ্ণুমন্দিরে রাত্রিজাগরণ করছ?

চণ্ডাল : কুড়ি বছর ধরে প্রতি মাসের একাদশী তিথিতে এভাবে রাত্রি জাগরণ করেছি।

ব্রহ্মরাক্ষস : আমি তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি একটি রাত্রি জাগরণের ফল আমাকে দান কর। আমি পাপী, আমাকে দয়া কর।

চণ্ডাল : ও সব কথা শুনতে চাই না। তোমাকে আমার এই দেহ দান করেছি; তুমি আমায় ভক্ষণ কর।

ব্রহ্মরাক্ষস : ঠিক আছে, আমাকে না হয় ওই রাত্রি জাগরণের দুই প্রহরের পুণ্য দান কর।

চণ্ডাল : কি অন্যায় আবেদন করছ? তুমি আমাকে খাও বা না খাও, রাত্রি জাগরণের পুণ্য তোমায় দিতে পারব না।

ব্রহ্মরাক্ষস : তোমার সুকর্মই তোমাকে রক্ষা করছে। আমার সাধ্য কি, আমি তোমার ক্ষতি করি। তবে আমার নিবেদন এই যে, আমি নিতান্ত পাপগ্রস্ত; আমাকে অন্তত এক প্রহরের জাগরণের পুণ্য দান কর। না করলেও বলবার কিছু নেই। তুমি বাড়ি যেতে পারো।

চণ্ডাল : আমি বাড়িও যাব না, তোমাকে কোন মতে একপ্রহর জাগরণের পুণ্যও দেব না।

ব্রহ্মরাক্ষস : তবে শেষ রাত্রে তুমি যে হাস্যোদ্দীপক গান করেছ, তার ফল দান কর।

আমাকে দয়া কর ; পাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

চণ্ডাল : তুমি কি এমন হীন কাজ করেছ, যে জন্য তোমাকে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে এভাবে কাল কাটাতে হচ্ছে ? সব কথা আমাকে খুলে বল।

চণ্ডালের প্রশ্নে ব্রহ্মরাক্ষস তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করল। আমার নাম সোমশর্মা ; বাবার নাম দেবশর্মা। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, অধ্যয়নশীল এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমার উপনয়ন হওয়ার আগেই আমাদের এক যজমান রাজার যজ্ঞে আমি লোভ এবং মোহবশে যূপকর্ম এবং অগ্নীধ্রের কর্ম করি। তারপর সেই রাজা দ্বাদশাহসাধ্য মহাযাগ করতে প্রবৃত্ত হন। সেই যজ্ঞেও আমি ঋত্বিক রূপে কাজ করি। এক এক করে ন'দিন কেটে গেল। দশদিনের রাতের বেলা যখন রাক্ষসক্ষণে বিরূপাক্ষের আহুতি দিতে উদ্যত হয়েছি, তখনই আমার মৃত্যু হয়। সেজন্যই আমি ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছি। আমি মূর্খ, মন্ত্র এবং উপদেশরহিত, স্বরজ্ঞানহীন, উপনয়নবর্জিত, যজ্ঞবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এমন অবস্থায় যজ্ঞকর্ম করেছি, সেজন্যই আমার আজ এই দশা। আমাকে তোমার শেষ-রাতে-করা একটি মাত্র জাগরণ গীতিকার ফল প্রদান কর ; এ পাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর। ব্রহ্মরাক্ষসের কথা শুনে চণ্ডাল তাকে বলল, তুমি যদি প্রাণীবধ না কর, তবে শেষ গানের একটির ফল তোমাকে দিতে পারি। ব্রহ্মরাক্ষস চণ্ডালের শর্তে সম্মত হলে চণ্ডাল কথামতো তাই দান করল। তখন ব্রহ্মরাক্ষস হৃষ্টচিত্তে চণ্ডালকে প্রণাম করে পৃথূদক তীর্থে চলে গেল। সেখানে অনশন ব্রত অবলম্বন করে সে প্রাণ পরিত্যাগ করল এবং গীতিকা-ফলের প্রভাবে ব্রহ্মরাক্ষসত্ব থেকে মুক্ত হল। তারপর পৃথূদক মাহাত্ম্যে দুর্লভ ব্রহ্মলোকে গিয়ে দশ হাজার বছর সুখে বাস করল। তারপর পুণ্যক্ষয়ে জ্ঞানবান এবং সংযমী ব্রাহ্মণ হয়ে সে জন্মায়। এর কথা পরে বলব। এখন চণ্ডালের কথা বলি। চণ্ডাল তার পর বাড়ি ফিরে এসে পুত্রের হাতে স্ত্রীর ভার ন্যস্ত করে পৃথিবী পর্যটন করতে বেরোল। সে কোকামুখ তীর্থ থেকে আরম্ভ করে স্কন্দতীর্থ পর্যন্ত ভ্রমণ করে ধারাতীর্থে গিয়ে উপস্থিত হল। তারপর বিন্ধ্যগিরিতে গিয়ে পাপপ্রমোচন তীর্থে হাজির হল। সেই চণ্ডাল সেখানে স্নান করে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে সক্ষম হল। সে পূর্বজন্মে কায়মনোবাক্যে সংযমশালী, বেদবেদাঙ্গপারগ বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী ছিল। একবার চোরেরা নগর থেকে যখন অনেক গোরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, সন্ন্যাসী তখন ভিক্ষা করে ফিরছিলেন। গোরুদের খুরে যে ধুলো উঠেছিল, তাতে তার ভিক্ষাপাত্র তথা ভিক্ষালব্ধ অন্ন নোংরা হয়ে যায়। তখন সন্ন্যাসী ক্রোধবশে সেই ভিক্ষা ফেলে দেয়। এই অধর্মের ফলেই সে চণ্ডাল হয়ে জন্মায়। তারপর সেই চণ্ডাল পাপপ্রমোচনতীর্থে স্নান করে নর্মদা নদীর তীরে মারা যায়।

এরপর সে মূর্খ ব্রাহ্মণরূপে বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করে। তিরিশ বছর সে সুখে শান্তিতে সেখানে কাটিয়ে দেয়। একবার এক সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয়। সিদ্ধপুরুষ বিকৃতরূপ এবং যোগসিদ্ধ ছিলেন। মূর্খ ব্রাহ্মণ সেই সিদ্ধপুরুষকে উপহাস করার জন্য তাঁকে অভিবাদন করে জিগ্যেস করে—আপনার কুশল তো ? তা, কোথা থেকে আপনি আসছেন ? সিদ্ধপুরুষ এ রকম সম্ভাষণ শুনে ভাবলেন যে সে বোধ হয় তাঁকে চিনতে পেরেছে। তাই মূর্খ ব্রাহ্মণকে তিনি মিথ্যা করেই বললেন—আমি স্বর্গ থেকে আসছি। তোমার কি দরকার বল। মূর্খ ব্রাহ্মণ তখন তাঁকে জিগ্যেস করল—ভালো কথা, নারায়ণের উরু থেকে উৎপন্ন সেই শ্রেষ্ঠ অপ্সরা উর্বশীকে আপনি

চেনেন কি? সিদ্ধপুরুষ সম্মতিসূচক উত্তর দিলে সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ তাঁকে বলল-তাহলে আপনি তাকে আমার কথা বলবেন। তাতে সে যা বলে, সে কথা শুনে এসে আমাকে জানাবেন। সিদ্ধপুরুষ ব্রাহ্মণের কথায় সম্মতি জানিয়ে মেরুপর্বতের উপরে দেবলোকে গিয়ে উর্বশীকে সব কথা জানালেন। উর্বশী সব কথা শুনে তাঁকে বললেন-বিশ্বাস করুন, আমি কাশীর সেই ব্রাহ্মণকে সত্যিই চিনতে পারছি না। সিদ্ধপুরুষ সে-কথা শুনে চলে এলেন। অনেক দিন পরে বারাণসীতে এলে সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখেই উর্বশীর কথা জিগ্যেস করল। সিদ্ধপুরুষ তাকে সব কথা জানালে মূর্খ ব্রাহ্মণ বলল–সে আমাকে কি ভাবে চিনতে পারবে এ কথা আপনি উর্বশীকে জিগ্যেস করবেন। সিদ্ধপুরুষ স্বর্গে গিয়ে উর্বশীকে সে কথা বলায় উর্বশী বলল–সেই ব্রাহ্মণ এমন কোন নিয়ম অবলম্বন করুন, যাতে আমি তাঁকে চিনতে পারি। সিদ্ধপুরুষ মূর্খ ব্রাহ্মণকে সে-কথা জানালেন। মূর্খ ব্রাহ্মণ তখন সিদ্ধপুরুষকে সাক্ষী রেখে বলল–আজ থেকে আমি এই প্রতিজ্ঞাই করছি যে, কখনো শকট ভক্ষণ করব না। সিদ্ধ আবার স্বর্গে গিয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞার কথা উর্বশীকে জানালেন। উর্বশী এ-কথা শুনেই বুঝতে পারল যে ব্রাহ্মণ তাকে উপহাস করছে।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। একবার উর্বশী বারাণসীতে গিয়ে মৎস্যোদরীর জলে স্নান করছে, এমন সময় সেই মূর্খ ব্রাহ্মণও সেখানে স্নান করতে এসে তাকে দেখতে পেল। উর্বশীকে দেখেই কামের তাড়নায় সে যে সব আচরণ করতে লাগল উর্বশী তা বুঝতে পারল এবং সেই ব্রাহ্মণকে চিনতে পেরে হেসে জিগ্যেস করল–তুমি আমার কাছে কি চাও বল। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তবে তুমি যা বলবে তাই আমি করব। মূর্খ ব্রাহ্মণ উর্বশীর এ-কথা শুনে বলল–আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চাই; তুমি আমাকে সঙ্গ দান কর। উর্বশী তখন সেই ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করতে বলে স্বর্গে চলে গেল। এক মাস পর সে সেখানে এসে দেখল যে, সেই ব্রাহ্মণ নদীতীরে নিরাহারে রয়েছে; তার শরীর ক্ষীণ হয়ে গেছে। উর্বশী তখন এক বৃদ্ধার মূর্তি ধারণ করে চিনির সঙ্গে ঘি এবং মধু মিশিয়ে একটি শকট বা রথ তৈরি করল। মৎস্যোদরীতে স্নান করে সেই ব্রাহ্মণের কাছে এসে বলল–দেখুন, আমি সৌভাগ্য লাভের জন্য কঠোর ব্রত পালন করেছি; এখন তার দক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে এই শকট দান করছি, দয়া করে গ্রহণ করুন। সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হলেও পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে তাকে বলল–সিদ্ধপুরুষকে সাক্ষী রেখে উর্বশীর জন্য আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, কখনো শকট ভক্ষণ করব না। তুমি অন্য কাউকে তোমার দক্ষিণা দান কর। সে-কথা শুনে উর্বশী বলল–কাঠের শকট সম্বন্ধেই আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন; এটা তো কাঠের নয়। সুতরাং অক্লেশে এই শর্করাসংযুক্ত রথ খেতে পারেন। উত্তরে ব্রাহ্মণ বলল–আমি প্রতিজ্ঞা করার সময় কোন বিশেষণ আরোপ করি নি; সুতরাং আমি গ্রহণ করতে পারি না। উর্বশীও নাছোড়বান্দা। সে বলল–আপনি যদি না খান, তবে বাড়িতে নিয়ে যান, আপনার পরিবার পরিজন খাবে। সে-কথায় ব্রাহ্মণ বলল–আমাকে তুমি বেশী অনুরোধ করো না। আমি বাড়ি যাব না। সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি উর্বশী এখানে এসেছিল। আমি কামার্ত হয়ে তাকে প্রার্থনা করায় সে আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলে গেছে। প্রায় এক মাস হয়ে গেল আমি এখানে রয়েছি। উর্বশী সে-কথা শুনে নিজের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে ব্রাহ্মণকে হেসে বলল–আমার কথামতো তুমি এখানে ব্রত পালন করে

য়েছ ; সেজন্য তোমায় সাধুবাদ জানাই। আমিই উর্বশী ; তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। শূকরতীর্থের কাছে রূপতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। তুমি সেখানে যাও—সেখানেই তুমি আমাকে পাবে। উর্বশী এ কথা বলেই আকাশপথে চলে গেল। উর্বশীর কথামতো সেই ব্রাহ্মণও রূপতীর্থে গেল। সে সেখানে পবিত্র হয়ে ব্রত অবলম্বন করে পরে দেহত্যাগ করল। গন্ধর্বলোকে তার গতি হয়। সেখানে একশো মন্বন্তর কাল সুখে কাটানোর পর সে পৃথিবীতে কোন এক সদ্বংশে প্রজানুরঞ্জক রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করল। প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে শেষে শূকর-তীর্থে গেল এবং রূপতীর্থে প্রাণত্যাগ করে ইন্দ্রলোকে গমন করল। সেখানে একশো ন্বন্তর কাল সুখে কাটানোর পর পুণ্যক্ষয়ে প্রতিষ্ঠানপুরে বুধের পুত্র পুরূরবা হয়ে জন্মাল। এই জন্মেই উর্বশীর সঙ্গে তার মিলন হয়েছিল। যে মূর্খ ব্রাহ্মণের কথা এতক্ষণ রে বলেছি, তার নাম সত্যতপা। সেই সত্যতপা এভাবেই রূপতীর্থে বিষ্ণুর আরাধনা করে মুক্তি লাভ করে।

—'প্রজাগরগীতিকার প্রশংসন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো উনত্রিশ

ুনিরা ব্যাসদেবকে বললেন—কৃষ্ণবিষয়ক জাগরণ গীতিকার ফল আমরা আপনার কাছে ুনলাম। কোন্ কর্ম করলে বিষ্ণুভক্তি জন্মে, এখন সে-কথাই আমরা আপনার মুখ থেকে ুনতে চাই। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—দেখুন, এই মহাঘোর সংসারে দেহিগণ হস্র সহস্র জন্মলাভের পর মনুষ্যজন্ম লাভ করে। মনুষ্যত্বে ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণত্বে বিবেকিত্ব, ববেকিত্বে ধর্মবুদ্ধি জন্মালেই সেই ধর্মবুদ্ধির দ্বারা শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়। জন্ম জন্ম সঞ্চিত াপের ক্ষয় যত দিন না হয়, তত দিন মানুষের বিষ্ণুভক্তি জাগে না। দেবতার প্রতি ভক্তির দয় হলে মানুষ যজ্ঞ করে। সে তখন অগ্নির প্রতি ভক্তিমান হয়। অগ্নি তুষ্ট হলে সূর্যে গার ভক্তি জন্মায় ; সূর্য প্রসন্ন হলে শঙ্করের প্রতি তার ভক্তির উদয় হয়। শংকর তার ুজায় তুষ্ট হলে পর কেশবের প্রতি তার ভক্তির উদয় হয়। তখন সেই ব্যক্তি বাসুদেব ামক অব্যয় দেবকে যথাশক্তি অর্চনা করে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ করে। মুনিরা তখন ব্যাস-দবকে জিগ্যেস করলেন—পৃথিবীতে দেখা যায় যে অবৈষ্ণব লোকেরা বিষ্ণুর অর্চনা করে া ; এর কারণ কি বলুন। মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বললেন—দেখুন, ইহলোকে দব ও আসুর—এই দ্বিবিধ প্রাণী দেখা যায়। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাই এদের সৃষ্টি করেছেন। দৈবী ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিরা অচ্যুতের উপাসনা করে, আর আসুরী প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীহরির নন্দা করে থাকে। বিষ্ণুমায়ার প্রভাবেই ওই আসুরী প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান আচ্ছন্ন য়ে থাকে। এই বিষ্ণুমায়া সুরাসুরগণেরও দুর্বিজ্ঞেয়। মুনিরা ব্যাসদেবের কাছ থেকে সই বিষ্ণুমায়ার কথা শুনতে চাইলে ব্যাসদেব বললেন—এই বিষ্ণুমায়া লোকসমূহকে াকর্ষণ করেন ; তিনি স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালের মতো। স্বয়ং বিষ্ণু ছাড়া অন্য কেউই এই ায়ার তত্ত্ব জানতে পারে না। এই মায়ার জন্যই পূর্বে নারদের যে বিড়ম্বনা ঘটেছিল, স-কথাই এখন আপনাদের শোনাব।

পুরাকালে আগ্নীধ্র নামে এক রাজা ছিলেন ; তাঁর পুত্রের নাম কামদমন। কামদমন ুশ্বজ্ঞ, ধর্মনিষ্ঠ এবং প্রজানুরঞ্জক ছিলেন ; পিতা-মাতার সেবাশুশ্রূষায় তিনি প্রাণপাত

করতেন। ক্রমে কামদমনের বিয়ের সময় হলে পিতা আগ্নীধ্র তার বিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। কিন্তু কামদমন কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হলেন না। আগ্নীধ্র তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন—লোকে পত্নী কামনা করে; পত্নীই সুখের মূল। সুতরাং তুমিও পত্নী গ্রহণ করে বংশ রক্ষা কর। কামদমন কিন্তু পিতার কথার কোন উত্তর দিলেন না। আগ্নীধ্র তাকে একই কথা বারবার বলতে থাকলে কামদমন বিনীতভাবে পিতাকে জানালেন—ক্ষমা করবেন, আমি আমার নামের সার্থকতা সাধন করতে চাই। আমি বৈষ্ণবী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছি। সে-কথার উত্তরে পিতা আগ্নীধ্র বললেন—তুমি যা বলছ, সে কোন ধর্মের কথা নয়। আমি তোমার পিতা—প্রভু; বংশ রক্ষা কর। তা না হলে এই বংশ নরকে নিমজ্জিত হবে। পিতার কথা শুনে কামদমন বললেন—নামের যথাযথ সার্থকতা সম্পাদন করা সকলেরই কর্তব্য। দেখুন, আমি অসংখ্যবার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেছি; সংসারে সুখ, দুঃখ সবই ভোগ করেছি। মনুষ্যেতর যোনি থেকে আরম্ভ করে তৃণ, গুল্ম প্রভৃতি রূপেও বহুবার জন্মগ্রহণ করেছি। আমার এই জন্মের তিন জন্ম আগে যা ঘটেছিল, সে কথা শুনুন। অনেক জন্মের পর আমি মহর্ষিবংশে সুতপা নামে জন্মগ্রহণ করি। বিষ্ণুর পূজা করে তাঁকে আমি সন্তুষ্ট করেছিলাম। আমার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে বর দান করতে চাইলে আমি তাঁর কাছে এই আবেদন রাখি যে, আমি যেন তাঁর বৈষ্ণবী মায়াকে জানতে পারি। আমার প্রার্থনার উত্তরে বিষ্ণু বলেন—তোমাকে আমি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং পুত্র ও ধনরত্ন দান করছি। বৈষ্ণবী মায়া জেনে তোমার কি হবে? আমি তবুও তাঁর কাছে সেই একই আবেদন রাখি। তখন বিষ্ণু বলেন—আমার মায়াকে যথার্থ রূপে কেউই জানে না। পুরাকালে নারদও তোমার মতোই একই প্রার্থনা করেছিলেন। আমার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি পুনঃ পুনঃ সেই বৈষ্ণবী মায়াকে জানতে চান। তখন নারদকে আমি বলি—তুমি এক কাজ কর; জলের মধ্যে নিমগ্ন হও; তাহলেই তুমি আমার মায়াকে জানতে পারবে। আমার কথামতো নারদ জলের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে কাশীরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর নাম হয় সুশীলা। কাশীরাজ বিদর্ভরাজের পুত্র সুধর্মার সঙ্গে সুশীলার বিয়ে হয়। কালক্রমে সুধর্মার পিতা মারা যান এবং সুধর্মা রাজা হন। তাঁদের অনেক পুত্র পৌত্র জন্মায়। কয়েক বছর পর কাশিরাজের সঙ্গে বিদর্ভরাজের যুদ্ধ বাধে; সেই যুদ্ধে উভয়েই সবংশে নিহত হন। সুশীলা মৃত আত্মীয় পরিজনদের শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করেন এবং নিজেও সেই চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেন। প্রাণত্যাগের পর তিনি আবার স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন সেই চিতাগ্নিও অমল জলপূর্ণ সরোবর রূপে পরিণত হয়। নারদকে মৃত আত্মীয় পরিজনদের জন্য শোক করতে দেখে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর ভুলটা ধরিয়ে দিই। তিনি লজ্জিত হয়ে বলেন—আমাকে আপনি ভক্তিদান করুন। অন্তকালে আপনার স্মৃতি যেন হৃদয়ে থাকে। আপনাকে যেন সর্বদাই দর্শন করতে পারি। আমার প্রার্থনা এই যে, যেখানে আমি চিতায় আরোহণ করেছিলাম, সে-স্থান তীর্থরূপে পরিণত হোক। ব্রহ্মার সঙ্গে আপনিও সেখানে যেন নিত্যই বিরাজ করেন। আমি তখন নারদকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—তোমার এই চিতাস্থান সিতোদ নামে প্রসিদ্ধ হবে। আমি এখানে নিত্যই বিরাজ করব। এর উত্তর দিকে মহেশ্বর অধিষ্ঠান করবেন। মহেশ্বর যখন দুর্বাক্যভাষী ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করবেন, তখন তিনি সেই ব্রহ্মকপালকে পবিত্র করতে এই তীর্থেই আসবেন; তাঁর হাত থেকে সেই কপাল এখানে

পড়বে। তারপর থেকে এই তীর্থ 'কপালমোচন' নামে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করবে। এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ করতে পারবে না। বিষ্ণু এই তীর্থ কখনো পরিত্যাগ করেন না বলে দেবতারা একে বিমুক্ততীর্থ নামে অভিহিত করবেন। এই তীর্থে শুদ্ধভাবে আমাকে চিন্তা করলে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারবে। পাপী ব্যক্তি এখানে প্রাণ পরিত্যাগ করলে রুদ্রপিশাচ রূপে জন্মে নানান দুঃখ ভোগ করে; পরে পাপক্ষয় হলে ব্রাহ্মণ রূপে জন্মায়। সে তখন শুচি ও সংযতচিত্ত হয়ে থাকে। রুদ্র অন্তিম কালে তাকে তারক মন্ত্র উপদেশ দেন। আমি নারদকে এ কথা বলে দুগ্ধ সমুদ্রে আমার বাসস্থানে চলে যাই। নারদও স্বর্গে গিয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। তোমাকে বোঝানোর জন্যই এই বৃত্তান্ত বললাম। এখনো যদি তুমি আমার বৈষ্ণবী মায়াকে জানতে চাও, তবে জলের মধ্যে প্রবেশ কর।

সেই ব্রাহ্মণ হরির কথামতো জলের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর সে কোকামুখে এক চণ্ডালের বাড়িতে তার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করল। কালক্রমে সেই চণ্ডাল কন্যা রূপবতী হয়ে উঠল। সুবাহু নামক এক রূপহীন চণ্ডালের সঙ্গে তার বিয়ে হল। কালক্রমে তার দুটি অন্ধ পুত্র এবং একটি বধির কন্যা জন্মায়। একবার সে কলসী নিয়ে স্নানের জন্য নদীতে গেল। তীরে কলসী রেখে যেই সে জলে ডুব দিয়েছে, অমনি সে তার আগের রূপ ফিরে পেল; সে ব্রাহ্মণ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল। এদিকে স্ত্রী ফিরে না আসায় সুবাহু খোঁজ করতে করতে সেই নদীতীরে এসে বিলাপ করতে লাগল। তার দুই অন্ধ পুত্র এবং বধির কন্যাটিও সেখানে এসে পৌঁছল। তারাও তাদের মায়ের জন্য বিলাপ করতে লাগল। চণ্ডাল নদীতীরে স্থিত ব্রাহ্মণদের তার স্ত্রীর কথা জিগ্যেস করলে তারা জানাল যে, তারা এক রমণীকে জলে ডুবতে দেখেছেন বটে কিন্তু জল থেকে উঠতে দেখেন নি। এ কথা শুনে সুবাহু আরো জোরে বিলাপ করতে লাগল। তাদের দুঃখ দেখে সেই ব্রাহ্মণের দুঃখ হল। সে তখন স্মরণ করতে পারল যে, সে-ই চণ্ডালের স্ত্রী ছিল। সেই ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে সান্ত্বনা দেওয়া সত্ত্বেও সে বিলাপ করতে লাগল। সেই ব্রাহ্মণ তখন সুবাহু নামক চণ্ডালকে তার জন্মবৃত্তান্ত বলল। চণ্ডাল সে-কথা শুনে দুঃখিতচিত্তে কোকামুখতীর্থে চলে গেল। সেখানে কোকামুখে প্রবেশ করতেই সেই তীর্থের প্রভাবে পাপহীন হয়ে দেবলোকে চলে গেল। চণ্ডাল স্বর্গগমন করলে পর ব্রাহ্মণরূপী আমারও মোহ উপস্থিত হল। আমিও কোকামুখের জলে প্রবেশ করে স্বর্গে চলে গেলাম। তারপর বৈশ্যবংশে জন্মগ্রহণ করলাম। কোকাতীর্থের প্রসাদে আমি তখন জাতিস্মর হয়েছিলাম। পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে আমি বাক্য, মন সংযত করে আবার কোকামুখ তীর্থে গিয়ে ব্রত পালন করে স্বর্গে গমন করলাম। স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছি এবং হরির অনুগ্রহে এ জন্মেও আমি জাতিস্মর হয়েছি। এরপর কামদমন পিতাকে প্রণাম করে কোকামুখ তীর্থে গিয়ে বরাহরূপী বিষ্ণুর আরাধনা করলেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহে কামদমন সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে স্বর্গে গমন করেন। এই সেই বৈষ্ণবী মায়া, এরই কথা আপনাদের বললাম।

—'মায়াপ্রাদুর্ভাবনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো তিরিশ

মুনিরা তারপর ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—আপনার কাছ থেকে বিষ্ণুমায়ার কথা শুনলাম। কল্পান্তকালে মহাপ্রলয় নামে জগতের যে সংহার ব্যাপার হয়, আমরা সে-কথা শুনতে চাই, দয়া করে বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাসদেব বললেন- মানুষের হিসাবে যা এক মাস, পিতৃগণের তা অহোরাত্র অর্থাৎ পুরো একদিন। সে হিসাবে পিতৃগণের এক বছরে দেবগণের পুরো একদিন হয়। সে হিসাবে দেবতাদের চার হাজার যুগের শেষে ব্রহ্মার পুরো একদিন হয়ে থাকে। কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—যুগ এই চারটি। দৈবমানের বারো হাজার বছর এদের স্থিতিকালের পরিমাণ। প্রত্যেক বারেই যুগ-চতুষ্টয়ের পরিমাণ সমান থাকে। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা সত্যযুগের প্রথমে সৃষ্টি করেন এবং কলিযুগের শেষে সংহার করে থাকেন। মুনিরা তখন ব্যাসদেবের কাছ থেকে কলির স্বরূপ জানতে চাইলেন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাসদেব কলির স্বরূপ বলতে আরম্ভ করলেন। কলিকালে মানুষের বেদে আস্থা থাকবে না; বর্ণাশ্রমধর্মেরও কোন ব্যবস্থা থাকবে না। ধর্মবিবাহ থাকবে না; শিষ্যেরা গুরুর অনুগত থাকবে না, ধার্মিক সন্তানের জন্ম হবে না; যজ্ঞাদি ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান হ্রাস পাবে। যে কোন কুলে যে কোন ব্যক্তি বলবান এবং প্রধান হবে, সে অপর যে কোন কুল থেকে কন্যা সংগ্রহ করে বিবাহ করবে। ব্রাহ্মণ-গণ যে কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন। শাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘিত হবে, যে কোন বাক্যকেই শাস্ত্র বলে স্বীকার করা হবে। সোনা, মণি, মুক্তো এবং রত্ন প্রভৃতির অভাবে স্ত্রীগণ কেশের দ্বারাই সৌন্দর্যবতী বলে পরিগণিত হবে। রমণীরা বিত্তহীন পতিকে পরিত্যাগ করবে; যে ধনবান, সমাজে তারই প্রতিষ্ঠা হবে। ভোগের মধ্যেই অর্থের সমস্ত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে। কলিতে স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী এবং বিলাসিনী হবে। স্ত্রীগণ পরপুরুষে বেশী করে আসক্ত হবে। পৌরুষ গর্বে সবাই গর্বিত হয়ে উঠবে। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রায়ই হবে; ফলে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকবে। মানুষ ফল, মূল, পাতা প্রভৃতি খেয়ে বেঁচে থাকবে. ক্ষুধার জ্বালায় অনেকেই আবার আত্মহত্যা করবে। অগ্নি. দেবতা বা অতিথি সেবা করবে না। স্ত্রীলোকেরা লোলুপ ও হ্রস্ব দেহ হবে; তারা বহু সন্তানের জন্ম দেবে, ঘোমটা মাথায় দেবে না এবং গুরুজনের আদেশ লঙ্ঘন করবে। গৃহস্থেরা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করবে না; রাজারা রক্ষক না হয়ে ভক্ষক হবে। প্রজাপীড়ন করবে, প্রজার বিত্ত পর্যন্ত রাজারা প্রকাশ্যেই কেড়ে নেবে। যার ঘোড়া, হাতী এবং রথ প্রভৃতি থাকবে, সে-ই রাজা হবে। এ কালে বৈশ্যেরা কৃষিকার্য এবং বাণিজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করে শূদ্র-বৃত্তি অবলম্বন করবে। শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে। সাধারণ লোক অসংস্কৃত হয়ে পাষণ্ড বৃত্তি অবলম্বন করবে। অধর্মের আধিক্যে লোকেরা অল্পায়ু হয়ে পড়বে। দুর্ভিক্ষে, ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে অন্নের খোঁজে, জীবিকার অনুসন্ধানে মানুষ দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। পাঁচ, ছয় বা সাত বছর বয়সেই রমণীরা সন্তান প্রসব করবে। আট, নয় বা দশ বছর বয়সেই পুরুষেরা সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হবে। বারো বছর বয়সেই মানুষ বৃদ্ধ হয়ে পড়বে এবং কুড়ি বছরের বেশী কেউ বাঁচবে না। ধার্মিক ব্যক্তির সংখ্যা কমে যাবে। ধার্মিক ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম যখন বারবার বিঘ্নিত হবে, তখন বুঝতে হবে কলি প্রবল হয়ে উঠছে। যখন বেদের অসম্মান হবে, বিষ্ণুর পুজো হবে না, তখন বুঝতে হবে যে কলি প্রবল হয়ে উঠেছে। বেদবাক্যের পরিবর্তে পাষণ্ড ধর্মের প্রতিই মানুষের অনুরাগ পরিলক্ষিত হবে।

বৃষ্টির পরিমাণ কলিকালে কমে যাবে, ফলে শস্য খুবই কম উৎপন্ন হবে ; ফলের মধুরতাও যাবে কমে। কলিযুগে শূদ্রবর্ণের আধিক্য দেখা যাবে। ধানের পরিমাণ এবং আকৃতি হ্রাস পাবে, ছাগলের দুধই বেশী পরিমাণে পাওয়া যাবে, যে কোন স্ত্রীলোকই পত্নীরূপে পরিগণিত হবে। মানুষ শ্বশুরের অনুগত থেকে নিজের পিতাকে অবহেলা করবে। যে সব কাজ পরিণামে দুঃখজনক, সেই কাজের প্রতিই মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক কর্ম লুপ্ত হবে, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণও পাওয়া যাবে না। সত্যযুগে সুদীর্ঘ তপস্যার দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে অল্পকালেই সেই ফল পাওয়া যায়। কলিকালে অল্প ক্লেশেই মহা ফল লাভ হবে, স্ত্রী এবং শূদ্রেরাও ধন্য হবে। কলিকালে পুরুষেরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য এবং জপ প্রভৃতি কার্যের বিশিষ্ট ফল লাভ করবে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চনা করলে যে ফল লাভ হয়, কলিতে শ্রীবিষ্ণুর নাম সংকীর্তন করলেই সেই ফল পাওয়া যায়। কলিকালে লোকসকল অল্প আয়াসেই ধর্মোৎকর্ষ লাভ করে ; এজন্যই আমি কলিকালের প্রতি সন্তুষ্ট। ব্রাহ্মণদের প্রথমত ব্রহ্মচর্যপরায়ণ হয়ে বেদ অভ্যাস করা কর্তব্য। পরে ধর্ম লাভের জন্য উপার্জিত ধনের দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হয়। বৃথা বাক্যালাপ, বৃথা ভোজন, বৃথা ধন ব্যয়—এ সবই পতনের কারণ। ভোজ্যবস্তু ইচ্ছানুরূপ পাওয়া যায় না, তাই কষ্ট করে সে-সব অর্জন করতে হয়। কলিতে শূদ্রেরাই ধন্য ; কারণ, ব্রাহ্মণদের সেবা করলেই তারা যজ্ঞের অধিকারী হয়। এদের খাদ্যাখাদ্য, পাপপুণ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায়, এদের সাধু বলে উল্লেখ করেছি। মানুষ ন্যায়পথে থেকে ধন উপার্জন করবে এবং সৎ পাত্রে দান ও যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করবে। কিন্তু ধনার্জনে প্রচুর ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। যারা এই কষ্ট স্বীকার করে ধনার্জন করে তারা প্রাজাপত্য প্রভৃতি লোক জয় করতে পারে। রমণীগণ কায়মনোবাক্যে পতিশুশ্রূষার দ্বারা এই সব ফল লাভ করতে পারে। পুরুষদের তুলনায় নারীদের কম কষ্ট ভোগ করতে হয় বলে আমি তাদের সাধু বলে নির্দেশ করেছি। কলিকালে মানুষ নিজ গুণরূপ জলের দ্বারা অখিল পাপক্ষালন করে অল্প প্রযত্নেই ধর্ম সাধনে সমর্থ হয়। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ সেবার দ্বারা এবং নারীগণ পতিশুশ্রূষার দ্বারাই বাঞ্ছিত ফল লাভ করে ; এজন্যই আমি এদের ধন্যতম বলে নির্দেশ করেছি। কলিকালে অল্প তপস্যার দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ ধর্ম লাভ করে থাকেন। এজন্যই কলিকাল ধন্য। আপনাদের কাছে এই কলিকথা পরিবেশন করলাম। আর কি জানবার আছে বলুন।

—'ভবিষ্যকথন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো একত্রিশ

মুনিরা এর পর ব্যাসকে জিগ্যেস করলেন—কলিযুগের উপস্থিতি কোন্ কোন্ লক্ষণের দ্বারা জানা যায়, দয়া করে তা বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাসদেব বললেন—কলিকালে রাজারা কর গ্রহণ করবেন বটে, কিন্তু প্রজাগণের রক্ষা করবেন না। তখন রাজারা অক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রোপজীবী এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণাচারসম্পন্ন হবেন। হবিঃসমূহ অকার্যেই ব্যয়িত হবে ; সকলেই এক পংক্তিতে ভোজন করবে। তখন অশিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থশালী এবং মানুষেরা মদে আসক্ত হয়ে পড়বে। চোরেরা রাজার বৃত্তি অবলম্বন করবে, রাজারা

চোরদের স্বভাব লাভ করবে। ধনই তখন সম্মানের বিষয় বলে বিবেচিত হবে; সচ্চরিত্র ব্যক্তি সম্মানভাজন হবে না। পতিত ব্যক্তিকেও কেউ নিন্দা করবে না। জনগণ হ্রস্বদেহ এবং বিকৃতাকার হবে। রমণীরা ষোল বছরের আগেই সন্তান প্রসব করবে। সবাই ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করবে। শূদ্রের মতো হীনজনেরাই বেদবক্তা হবে. ব্রাহ্মণেরা নীচজনের সেবা করবে। শূদ্রেরা তখন কৌশলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে ধর্মের উপদেশ করবে। কলিযুগে শ্বাপদ প্রাণীসমূহ বৃদ্ধি পাবে. গোগণের ক্ষয় হবে এবং সাধু ব্যক্তিদের বৃত্তিবিপর্যয় ঘটবে। প্রজারা নির্লজ্জ এবং দুরাচারী হবে। কলিকালে ঋতুসমূহ বিপরীত ভাব ধারণ করবে. বৃষ্টিপাত কম হবে, পুত্রেরা পিতার বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে. ভাইদের সঙ্গে সম্পত্তি বিভাগে প্রবৃত্ত না হয়ে অযথা মারামারি করবে. কেউই ধর্মাচরণ করবে না। তখন ভূমি হবে অনুর্বর, পথে পথে চোর-ডাকাতের উপদ্রব থাকবে এবং জনগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ী হবে। কলিযুগে পুরুষদের কাছে স্ত্রীর মতো প্রিয়তম বস্তু আর কিছুই থাকবে না। তখন পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে. অপর পক্ষে রমণীর সংখ্যাই হবে সমধিক—কলিযুগের এটা একটা বড় লক্ষণ। রাজা, চোর, অগ্নি ও শাসনের তীব্রতার জন্য লোকসমূহ ক্ষয় পাবে. শস্যসমূহ সারহীন হবে। দুশ্চরিত্র লোকেরাই তখন সুখী হবে। পরলোক সম্বন্ধে সকলেই তখন সন্দিহান হবে উঠবে, কেউ কারুর মঙ্গল করতে চেষ্টা করবে না, ঋণ করেও কেউ নম্র হবে না। তখন নক্ষত্রসমূহ বিবর্ণ হবে. দিকসমূহ বিপরীত ভাব ধারণ করবে। মানুষ অগ্নিতে হোম না করে এবং পিতৃগণকে আগে না দিয়েই খেয়ে ফেলবে; নিদ্রিত পতিদের বঞ্চনা করে রমণীরা অন্যত্র গমন করবে।

মুনিরা ব্যাসদেবকে তখন জিগ্যেস করলেন—ধর্মের যখন এ রকম বিড়ম্বনা ঘটবে তখন মানুষ কোথায় বাস করবে?—কি রকম কাজই বা করবে? মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব বললেন—ধর্মবিচ্যুত হলে গুণহীন প্রজাগণ ব্যসনাসক্ত হয়ে পড়বে; তাতে তাদের আয়ু যাবে কমে। আয়ুর হানি হলে শক্তি কমে যাবে, তার ফলে ব্যাধি দেখা দেবে। ব্যাধিগ্রস্ত হলে মানুষ চিন্তান্বিত হয়ে পড়বে; চিন্তা করতে করতে তারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে. তখন ধর্মে তাদের অনুরাগ জন্মাবে। এভাবে দুরবস্থার চরম সীমায় পৌঁছলেই সত্যযুগ আরম্ভ হবে। কেউ কেউ ধর্মশীল, কেউ কেউ ধর্ম বিষয়ে উদাসীন, কেউ কেউ অধর্মশীল হয়ে উঠবে। অনেকে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির দ্বারা ধর্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাইবে। অনেকে ধর্ম অপ্রমাণ বলে সে বিষয়ে উপেক্ষা দেখাবে। ধর্মের এ রকম বিপর্যয় ঘটলে কিছু ধর্মশীল লোকের সহায়তায় অনেকেই সুশীল এবং দানপরায়ণ হবে. শুভ আচরণও করবে। লোকেরা যখন নির্দয় এবং নির্লজ্জ হয়ে উঠবে, জ্ঞান যখন বিলুপ্ত হবে, ব্রাহ্মণের বৃত্তি যখন হীনজনেরা আশ্রয় করবে, সেই সময় কষায়কাল বলে পরিচিত হবে। তখন মহাযুদ্ধ. মহাবৃষ্টি, প্রবল বাতাস এবং প্রখর সূর্যতাপে মানুষের নিদারুণ কষ্ট হবে। ব্রাহ্মণেরা তখন যক্ষের মতো আচরণ করবে। নেতারা অসচ্চরিত্র এবং স্বার্থপরায়ণ হবে, ব্রাহ্মণেরা মিথ্যাবাদী, নীচাশয়, অধার্মিক এবং সর্বভক্ষ্য হয়ে উঠবে। তখন শস্যচোর, বস্ত্রচোর, খাদ্যচোর প্রভৃতি সব রকমের চোরের প্রাচুর্য দেখা দেবে। চোরেরাও চোরের বাড়িতে চুরি করবে, ঘাতক ব্যক্তিকেও অন্য লোক হত্যা করবে। করভারে পীড়িত হয়ে জনগণ বনে গিয়ে বাস করবে। মঙ্গল, সুভিক্ষা, আরোগ্য, বন্ধুত্ব, মহত্ত্ব প্রভৃতি তখন কথামাত্রেই পর্যবসিত হবে। কলিকালের প্রভাবে

ধনহীন মানুষ ক্ষুধায় এবং ভয়ে পীড়িত হয়ে সন্তানসন্ততি সহ কৌশিকী নদী পার হয়ে পলায়ন করবে। তারা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, কোশল এবং ঋষিগণ অধ্যুষিত গিরি-গুহা আশ্রয় করবে। তারা হিমালয়ের পাশে এবং সমগ্র সাগরকূলেও বাস করতে থাকবে। গাছের বাকল প্রভৃতি পরিধান করবে, অনেকে আবার ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বনে বাস করবে। পৃথিবী তখন একেবারে শূন্য হবে না বটে, তবে নানান জায়গায় নতুন নতুন বন দেখা দেবে। মানুষ তখন মধু, শাক, ফল, মূল, মৃগ, মাছ, পাখি, শ্বাপদ প্রাণী, সাপ এবং কীটপতঙ্গের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। বিবিধ বীজ থেকে নিজেরাই তেল প্রভৃতি স্নেহ পদার্থ উৎপাদন করে ব্যবহার করবে। তারা ছাগল, ভেড়া, উট প্রভৃতি পশু পালন করবে। জল আহরণের জন্য তীরে থেকেই নদীসমূহের স্রোত অবরোধ করবে। সবাই অধর্মজীবী এবং কদাচারসম্পন্ন হয়ে কোন রকমে জীবন যাপন করবে। সবাই দুর্বল, বিত্তহীন এবং জরা, শোক প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হয়ে থাকবে। তিরিশ বছরের বেশী কেউ বাঁচবে না।

কলিকালে যখন বুঝবে যে মৃত্যু আসন্ন, তখন সমস্ত বিষয় কামনা পরিহার করবে এবং সাধু ব্যক্তিদের সেবা-শুশ্রূষায় নিজেকে নিয়োজিত করবে। সর্বপ্রকারে সত্যপথ অবলম্বন করবে। ক্রমে যখন অনেকেই দান, দয়া ও সত্যপরায়ণ হবে, জানবেন তখনই ধর্মের একপাদ পূর্ণ হল। ধর্মের সামান্য প্রবৃত্তি হলেই তাদের মঙ্গল ঘটবে। তখন তারা বিভিন্ন কাজের গুণাগুণ বিচারের দ্বারা ধর্মই শ্রেষ্ঠ এ কথা বুঝতে পারবে। ক্রমে তারা ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হবে। এই যুগই কৃতযুগ বা সত্যযুগ নামে কথিত হয়। সত্যযুগে সদাচার এবং কষায়কালে বা কলিযুগে কদাচারের প্রাবল্য দেখা যায়। বস্তুত এক, অখণ্ড কালই চন্দ্রের মতো তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কথিত হয়। তমোগুণে আচ্ছন্ন কালই কলিযুগ। বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের এ সকল অর্থবাদ মাত্র, বস্তুত কালের তত্ত্বকে জানা যায় না। তপস্যাকে ইষ্টবাদ বলা যায়, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের দ্বারা তপস্যা স্থিরীকৃত হয়; ঐ সকল গুণের দ্বারা আবার কর্মের নিবৃত্তি ঘটে। কর্মের দ্বারা গুণের শোধন হয়।···যুগে যুগে ঋষিদের আশীর্বাদে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করে মানুষ। বিধাতার ইচ্ছানুযায়ী যুগের পরিবর্তন ঘটে; জীবলোকও উদয় এবং লয়ের মাধ্যমে নিয়তই পরিবর্তিত হয়।

—'ভবিষ্যকথন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ দুশো বত্রিশ

ব্যাস বললেন—সমস্ত প্রাণীরই নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক এবং আত্যন্তিক নামে তিন প্রকার লয় হয়। ব্রহ্মকল্পের শেষে যে লয় হয়, তা নৈমিত্তিক, দ্বিপরার্ধ বৎসরের শেষে যে লয় হয়, তা প্রাকৃত; এবং মোক্ষকে আত্যন্তিক বলা যায়। মুনিরা তখন ব্যাসদেবকে বললেন—আপনি যে দ্বিগুণীকৃত পরার্ধপরিমিত কালে প্রাকৃত লয়ের কথা বললেন, সেই পরার্ধ সংখ্যাটি কি, তা যথাযথ ভাবে বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—প্রথম সংখ্যা থেকে পর পর সংখ্যাকে দশগুণিত করে গণনা করলে আঠারোপূরক সংখ্যাকে পরার্ধ বলা হয়। পরার্ধ সংখ্যাকে দ্বিগুণিত করলেই প্রাকৃত লয় কাল হয়। তখন অব্যক্ত ব্রহ্মেই জগতের লয় হয়ে থাকে। মানুষের এক নিমেষকে মাত্রা

বলা হয় ; পনেরো মাত্রায় এক কাষ্ঠা ও তিরিশ কাষ্ঠায় এক কলা হয়। পনেরো কলায় এক নাড়িকা—জলপ্রমাণে সেই নাড়িকাই সাড়ে তের পল। চার আঙুল পরিমিত হেমমাষের দ্বারা চারটি ছিদ্র করলে মাগধ প্রমাণে এক নাড়িকা মধ্যে একপ্রস্থ জল ক্ষরিত হয়। দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত এবং তিরিশ মুহূর্তে পুরো একটা দিন হয়। বারো মাসে এক বছর হয়, এই এক বছরই দেবপরিমাণে পুরো একটা দিন। এই হিসাবে তিনশো ষাট বছরে দেবতাদের এক বছর হয়। বারো হাজার বছরে চার যুগ হয়ে থাকে। চার হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়, একেই কল্প বলে। এই কল্পেই চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়ে থাকে। এরই শেষে ব্রহ্মার নৈমিত্তিক লয় হয় ; এর স্বরূপ অতি উগ্র। আগে এই নৈমিত্তিক লয়ের কথা বলি, পরে প্রাকৃত লয়ের কথা বলব। চার হাজার যুগের শেষে পৃথিবী ক্ষীণপ্রায় হয়ে পড়লে একশো বছর ধরে অতি ঘোর অনাবৃষ্টি হয়ে থাকে। তাতে অল্প সময়ে প্রাণীগণ বিনষ্ট হয়। তখন রুদ্ররূপী ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত জীবকে আত্মসাৎ করার জন্য যত্নবান হন। ভগবান বিষ্ণু সূর্যের সপ্তরশ্মিতে আবিষ্ট হয়ে জগতের সেই সমগ্র জল পান করতে থাকেন। তিনি তখন সমগ্র পৃথিবীতল, সমুদ্র, সরিৎ, এমন কি পাতালের জলরাশিও শোষণ করেন। তখন জলাহারে পুষ্ট হয়ে রশ্মিশালী সপ্ত সূর্যের উদয় হয়। সেই সপ্ত সূর্য প্রদীপ্ত হয়ে রসাতল সহ সমগ্র ত্রিভুবনের দাহ করেন। তাতে ত্রিভুবনের সব কিছুই শুকিয়ে যায়। পরে কালাগ্নি রুদ্র শেষনাগের নিশ্বাসে উত্তপ্ত পাতালতলকে দাহ করতে থাকেন। ক্রমে সেই মহান অগ্নি পৃথিবীকেও দগ্ধ করে। ভূলোক দগ্ধ হলে ভুবর্লোক এবং তারপর স্বর্গলোককেও দগ্ধ করে সেই অগ্নি অতি ভয়ানকরূপে জ্বলতে থাকেন। ভূলোক এবং স্বর্গলোকবাসী তেজস্বী মুনিরা তখন মহর্লোকে চলে যান। সেখানেও সেই অগ্নির তাপে উত্তপ্ত হয়ে তাঁরা জনলোকে গমন করেন। রুদ্ররূপী ভগবান এভাবে সমগ্র জগৎ দগ্ধ করে মুখনিশ্বাস থেকে মেঘের সৃষ্টি করেন। সেই মেঘগণ বিদ্যুৎ সহযোগে আকাশে ভীষণ গর্জন করে ফিরতে থাকে ; এরাই সম্বর্তক মেঘ নামে পরিচিত। বিচিত্রবর্ণের এবং বিচিত্র আকৃতির এই মেঘগণ মুষলধারায় বর্ষণ করে সেই ত্রিভুবনবিস্তারী সুদারুণ অগ্নিকে নির্বাপিত করে। আগুন নেভার পরও সেই মেঘ থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হতে থাকে ; তাতে অখিল জগৎ প্লাবিত হয়ে যায়। তখন স্থাবর, জঙ্গম সমস্তই বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সবকিছুই গাঢ় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। একশো বছর ধরে মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়ার পর মেঘ কেটে যায়।

—'সংহারলক্ষণ কথন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো তেত্রিশ

ব্যাস বললেন—জলরাশি যখন সপ্তর্ষি স্থান প্লাবিত করল, তখন এই নিখিল ত্রিভুবন একার্ণবীকৃত হয়ে গেল। বিষ্ণুর নিশ্বাসজাত বায়ু সেই ভয়ঙ্কর মেঘসমূহ বিনষ্ট করে ফেলল। ভগবান বিষ্ণু তখন একার্ণবসলিলে শেষশয্যায় শয়ন করলেন। তখন জনলোক-বাসী সিদ্ধগণ, এবং ব্রহ্মলোকবাসী সনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁকে স্তব করতে লাগলেন। এই সময় পরমেশ্বর হরি নিজেকে বাসুদেব রূপে চিন্তা করতে করতে যোগনিদ্রাকে অবলম্বন করলেন। একেই নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। ব্রহ্মরূপধারী হরির যে শেষশয্যায় শয়ন, তাই এর নিমিত্ত। ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ চার হাজার যুগ, তাঁর রাত্রিপরিমাণও সেই

একই রকম। জগৎ যখন একার্ণবীকৃত হয়, তখন ব্রহ্মার এ রকম পরিমাণের একটি রাত্রির অবসানেই সেই বিষ্ণু জাগরিত হয়ে সৃষ্টি বিস্তার করতে থাকেন। ভগবান বিষ্ণুই যে ব্রহ্মস্বরূপ ধারণ করেন, এ কথা আপনাদের আগেই বলেছি।

এরপর প্রাকৃত প্রলয়ের কথা বলছি শুনুন। এই প্রলয়ে যাবতীয় সৃষ্টি অনল প্রভৃতির দ্বারা সমাবৃত হয়; মহৎ প্রভৃতি বিকারসমূহের বিশেষ ক্ষয় হয়। তখন প্রথমেই জলরাশি ভূমির গন্ধ নামক গুণকে গ্রাস করে ফেলে। ভূমি গন্ধহীন হয়ে প্রলয়োন্মুখ হয়। গন্ধ নষ্ট হয়ে গেলে পৃথিবী জলময় হয়ে ওঠে। তখন বেগবান জলরাশি গভীর শব্দে সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং সমস্ত কিছুকেই প্লাবিত করে। এই সময়ে তেজ জলের গুণ পান করে; তাতে রসের ক্ষয় হয়। রসের অনুপস্থিতিতে জলরাশি তপ্ত হয়ে ক্ষীণ হয়ে যায়। তারপর অমৃতময় জলরাশি শীগগিরই তেজরূপে পরিণত হয়। সেই তেজের দ্বারা সমস্ত বিশ্ব সমাবৃত হয়। তখন তেজের পরম রূপ সূর্যকে বায়ু গ্রাস করে ফেলে। ক্রমে সমস্ত তেজই নষ্ট হয়ে যায়; সমস্তই বায়ুস্বরূপ হয়ে ওঠে। রূপ নষ্ট হলে পর অগ্নি প্রশমিত হয়; তখন কেবলমাত্র প্রবল বায়ুই প্রবাহিত হতে থাকে। তেজ বায়ুতে প্রবিষ্ট হওয়ায় সমগ্র জগৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। বায়ু তখন সমস্ত দিককে আলোড়িত করতে থাকে। তারপর আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করে। বায়ু প্রশমিত হয়ে গেল, একমাত্র অনাবৃত আকাশই তখন অবস্থান করতে থাকে। রূপ, রস, স্পর্শ বা গন্ধ—কিছুই তখন থাকে না; আকাশই কেবলমাত্র পরিমণ্ডলক্রমে অবস্থান করে। তারপর আকাশের গুণ শব্দকে ভূত প্রভৃতি গ্রাস করে; ভূত প্রভৃতিকে আবার মহাবুদ্ধি গ্রাস করে। জগতের প্রান্তে, মধ্যে ও বহির্দিকে তখন পৃথিবী ও মহান বিরাজ করে। এভাবে ক্রমশ সমস্ত মহাবুদ্ধি ও সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যাহার পরম্পরায় পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে। যাতে আবৃত হয়ে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর, সপ্তলোক এবং সপ্ত-কুলপর্বত-সহ জলের মধ্যে প্রলীন হয়, সেই জলের আবরণকে তখন তেজ পুনরায় পান করে থাকে। ক্রমে তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ভূত প্রভৃতিতে এবং ভূত প্রভৃতি মহতে প্রলীন হয়ে যায়। প্রকৃতি তখন মহানকে গ্রাস করে এবং গুণসাম্যের অবস্থা লাভ করে অবস্থান করতে থাকে; ওই প্রকৃতিই প্রধান বা পরম কারণ নামে অভিহিত হয়। এই রূপে ওই প্রকৃতি সমস্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপে বিরাজ করে। তাঁর অব্যক্তরূপে সমস্ত ব্যক্তস্বরূপই প্রলীন হয়ে যায়। তিনিই পরমাত্মার এক, অদ্বয়, নিত্য, শুদ্ধ, সর্বব্যাপী এবং অক্ষয় অংশস্বরূপ। নাম, জাতি প্রভৃতি সবকিছুই সেই সত্তাত্মক জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থেই বিলীন হয়ে যায়। তিনি ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এবং তিনিই বিষ্ণু; এ সমস্তই তাঁর রূপ। তাঁকে লাভ করলে কাউকেই আর সংসারের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয় না। আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপিণী প্রকৃতির কথা বললাম, তিনি এবং পুরুষ—উভয়েই পরমাত্মায় প্রলীন হয়ে থাকেন। পরমেশ্বর পরমাত্মা সকলেরই আধার। বেদ এবং বেদান্তসমূহে তিনিই বিষ্ণু নামে গীত হয়ে থাকেন। মনুষ্যগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিবিষয়ক দ্বিবিধ বৈদিক কর্মের দ্বারাই সেই যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণুর উপাসনা করে থাকে। প্রবৃত্তি পথবর্তী পুরুষগণ ঋক্‌, যজু ও সাম মন্ত্রের দ্বারা সেই যজ্ঞমূর্তি পুরুষোত্তমের আরাধনা করেন। নিবৃত্তিপথবর্তী যোগিগণ মুক্তিফলদাতা জ্ঞানমূর্তি বিষ্ণুকে জ্ঞানযোগের দ্বারা উপাসনা করে থাকেন। হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুতক্রমে যে কিছু বস্তু অভিহিত এবং যা বাক্যের বিষয়ীভূত হয় না, সে সমস্তই সেই অব্যয় বিষ্ণুস্বরূপ।

তিনিই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত পুরুষ এবং তিনিই পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা এবং বিশ্বরূপধারী হরি। ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপ প্রকৃতি তাঁর মধ্যেই প্রলীন হয়ে থাকে। অব্যাকৃত পরমাত্মায় পুরুষও প্রলীন হয়ে যায়। যে দ্বিপরার্ধ কাল পরিমাণের কথা বলেছি, সেই কালই বিষ্ণুর একদিন। প্রকৃতিতে ব্যক্ত এবং পুরুষে প্রকৃতি প্রলীন হয়ে সেই উভয়ই পরমাত্মা বিষ্ণুতে অবস্থিত হলে তাঁর দিনের পরিমাণে এক রাত্রি উপস্থিত হয়। পরমাত্মা নিত্য বস্তু; প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাত্রিও নেই, দিনও নেই। তাঁর সম্পর্কে রাত্রিদিনের ব্যবহার কেবল উপচার মাত্র। এই প্রাকৃত প্রলয়ের কথা আপনাদের শোনালাম।

—'প্রাকৃতপ্রলয়নিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো চৌত্রিশ

ব্যাস বললেন- পণ্ডিত ব্যক্তি আধ্যাত্মিক প্রভৃতি তাপত্রয়ের বিষয় বিদিত হয়ে জ্ঞান ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হলে আত্যন্তিক লয় লাভ করেন। শারীর ও মানস ভেদে আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ; তার মধ্যে শারীরিক তাপ আবার অনেক। বিবিধ রোগভেদের জন্য শারীরিক তাপ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এখন মানস তাপের কথা বলছি, শুনুন। কাম, ক্রোধ ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষা, অভিভব প্রভৃতির দ্বারা মানস তাপ অনেক ভাগে বিভক্ত। মৃগ, পক্ষী, মানুষ, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস এবং সরীসৃপ প্রভৃতি থেকে মানুষের যে তাপ জন্মায়, তাকেই আধিভৌতিক বলা হয়। শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষার জল, বিদ্যুতের অগ্নি প্রভৃতি থেকে যে তাপ উদ্ভূত হয়, তা আধিদৈবিক নামে পরিচিত। গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু এবং নরকভোগ প্রভৃতি যে সব দুঃখ আছে, তাও আধিদৈবিক নামে পরিচিত। জীব যখন বহু মলপূর্ণ গর্ভের মধ্যে বাস করে, তখন সে অতি যাতনা ভোগ করে। গর্ভধারিণী যা কিছু অম্ল, উষ্ণ এবং লবণাক্ত বস্তু ভোজন করে, সেই সব বস্তুর তীব্র রস জঠরের ভেতর প্রবেশ করে; ফলে গর্ভস্থ জীবের প্রদাহ উৎপন্ন হয়। জীব ওই অবস্থায় তার আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রসারণ বা আকুঞ্চন কিছুই করতে পারে না। সে তখন দারুণ কষ্টের মধ্যে থেকে তার অতীত জন্মের ঘটনাপরম্পরা স্মরণ করতে থাকে। পরে যখন তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন তার মুখমণ্ডল বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত এবং বীর্যের দ্বারা প্লাবিত হয়। প্রবল সূতি-মারুত তাকে অধোমুখে চালিত করে; তখন অতি কষ্টে আতুর জীব মাতৃজঠর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। সে ভূমিষ্ঠ হয়েই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, বহির্জগতের বায়ু তাকে স্পর্শ করলে, তার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সদ্যোজাত শিশুকে দেখে মনে হয় যেন তার সর্বাঙ্গ কাঁটায় বিঁধে রয়েছে। জীব তখন পাশ ফিরতে পারে না, একমাত্র মাতৃস্তন্যই তখন তার আহার্য হয়। এই সময় সে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বালভাবে সে কিছুই বুঝতে পারে না। কি তার পরিচয়, কোত্থেকে সে এলো, তার কর্তব্য, অকর্তব্য, ধর্ম, অধর্ম—কিছুই জানতে পারে না। পশুর মতো সে বেড়ে উঠতে থাকে এবং খাদ্য ও বংশবৃদ্ধি করাই হয় তার এক মাত্র ধ্যান জ্ঞান। মহর্ষিরা বলেন—কর্মলোপেই মানুষকে নরকফল ভোগ করতে হয়; সুতরাং দেখা যায় যে ইহকাল এবং পরকালে অজ্ঞানীদের দুঃখভোগ অনিবার্য। তারপর ক্রমে মানুষ যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে, দাঁত পড়ে যায়, কোমর যায় বেঁকে। ওঠা, শোয়া, বসা, হাঁটা—সব

কিছুই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি কমে যায়, শোনার ক্ষমতা লোপ পায়। স্মৃতিভ্রংশ ঘটে, ঘুম হয় না এবং সব ব্যাপারেই তাকে পরের ওপর নির্ভর করতে হয়। তখন আহারের প্রতি তাদের অত্যধিক আসক্তি দেখা যায়, বিত্তের প্রতি অত্যধিক মমত্ব দেখা যায়। রোগের আক্রমণে তখন তাদের কঠিন অবস্থা হয়। তখন তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়, উদান শ্বাসে সে পীড়িত হয়। তখন যমদূতদের হাতে অতি কষ্টে তার প্রাণবায়ু তার শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। জীব তখন যাতনাদেহ লাভ করে। মৃত্যুর পর নরকে গিয়ে তারা নিদারুণ দুঃখভোগ করে। পাপী ব্যক্তিরা নরকে গিয়ে যে সব দুঃখ ভোগ করে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। স্বর্গে গিয়েও সেখান থেকে পতনের আশঙ্কায় ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তির নিবৃত্তি লাভ ঘটে না। স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে জীব পুনরায় গর্ভবাসে অবস্থান করে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়—এভাবেই সংসারচক্র চলতে থাকে। জীবিত অবস্থায় যে যে বস্তু পুরুষের অতি প্রীতিকর হয়, পরবর্তী কালে তাই তার দুঃখ-রূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ হয়ে থাকে। সংসার দুঃখ-রূপ দিবাকরের তাপে তাপিতচিত্ত জনগণের পক্ষে মুক্তিপাদপের ছায়া ব্যতীত আর কি সুখ আছে? ভগবৎ সান্নিধ্য লাভই এই দুঃখের মহৌষধি ; তাই ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা উচিত। এই ঔষধ পাওয়ার জন্য প্রথমেই যা দরকার, তা জ্ঞান ও কর্ম। তার মধ্যে এই জ্ঞান আবার দ্বিবিধ—আগমোৎপন্ন ও বিবেকজ। আগমজ জ্ঞান শব্দব্রহ্ম এবং বিবেকজ জ্ঞান পরমব্রহ্ম। অজ্ঞান যেন অন্ধকার ; বিবেকজাত জ্ঞান তাতে সূর্যের মতো প্রকাশ পায়।

মনু এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, সে কথা আপনাদের জানাই। ব্রহ্ম দ্বিবিধ বলে পরিকীর্তিত ; এক শব্দব্রহ্ম এবং অন্য পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের বিষয় বিদিত হলে পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পরাবিদ্যার দ্বারা অপর ব্রহ্মকে লাভ করা যায় ; অপর বিদ্যা হল ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞান। যিনি অব্যক্ত, অরূপ, অপাণি, অপাদ, নিত্য, সর্বত্রগামী, কারণ, ব্যাপ্ত এবং ব্যাপ্য, তিনিই পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম। পণ্ডিতগণ তাঁকেই ধ্যান করে থাকেন। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য এবং তেজ প্রভৃতি ভগবত্তত্ত্ব প্রতিপাদক বাক্যসমূহের তিনিই একমাত্র বাচ্য। তিনিই বাসুদেব ; সেই বাসুদেব ভূতসমূহের অন্তরে বাস করেন এবং ভূতগণও তাঁতেই অবস্থান করে। তিনি সগুণ হয়েও সমস্ত দোষগুণের অতীত। তাঁর কণামাত্র শক্তিবিকাশে ভূতবর্গ অভিব্যক্ত হয় ; তিনি আপন ইচ্ছায় বিরাট দেহ ধারণ করেন। সমস্ত গুণ, সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের তিনিই একমাত্র আধার। তিনিই ব্যষ্টি এবং সমষ্টিরূপে ঈশ্বর ; ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপে তিনি বিরাজমান। তিনি সর্বেশ্বর, সর্বদর্শী, সর্ববিদ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। তিনিই একমাত্র জ্ঞান, তিনি ছাড়া আর সবই অজ্ঞান।

—'আত্যন্তিকলয়নিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো পঁয়ত্রিশ

মুনিরা ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—যার প্রভাবে আমরা সেই অব্যয় পুরুষোত্তমকে বিদিত হয়ে তাঁতেই বিলীন হতে পারি, সেই যোগতত্ত্ব আমাদের উপদেশ দিন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—প্রথমত যোগশাস্ত্র শ্রবণ এবং ভক্তিপূর্বক গুরুর আরাধনা করে ইতিহাস, পুরাণ ও বেদবিদ্যায় বিচক্ষণ হতে হয়। তারপর আহার, যোগদোষ, এবং

দেশকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে যোগাভ্যাসে নিরত হতে হয়। ছাতু, ঘোল, ফলমূল, দুধ প্রভৃতি খাদ্য যোগসাধনের পক্ষে উত্তমরূপে সহায়ক হয়। যেখানে মন বিকল হয়, অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা থাকে, অত্যধিক শীত বা গ্রীষ্ম থাকে, এমন স্থানে যোগাভ্যাস করতে নেই। এ ছাড়া জলের কাছে, শব্দসঙ্কুল স্থানে, চতুষ্পথে, সরীসৃপময় প্রদেশে, শ্মশানে, নদী মধ্যে, উই মাটি আছে এমন জায়গায়, কূপের কাছে কিংবা শুকনো পাতা পরিপূর্ণ জায়গায়ও যোগভ্যাস করা ঠিক নয়। এ সবের বিবেচনা না করে যে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে যে যে দোষে যুক্ত হয়, সে সব দোষের কথা বলছি। নিষিদ্ধ স্থানে যোগ করলে বধিরতা, জড়তা, স্মৃতিভ্রংশ, মূকত্ব, অন্ধতা এবং অজ্ঞানজাত জ্বর উপস্থিত হয়। অতএব যোগজ্ঞ জন সর্বদা আত্মরক্ষা করে চলবেন; কারণ, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের শরীরই একমাত্র সাধন। বিজন আশ্রমে, নির্ভয়, নিঃশব্দ পার্বত্যপ্রদেশে, নিভৃত দেবালয়ে, রাত্রির পূর্ব এবং শেষ প্রহরে, মধ্যাহ্নে বা পূর্বাহ্ন কালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আহার সমাপ্ত করে পূর্বদিকে মুখ করে স্থিরভাবে আসনে বসবেন। তিনি নিজের দেহ, চরণ এবং মস্তক সমভাবে স্থাপন করে নাভিদেশে দুহাত রাখবেন এবং শান্তচিত্তে পদ্মাসনে সমাসীন হবেন। আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন ও প্রাণায়াম করে মৌনী, জিতেন্দ্রিয় ও নিশ্চল হয়ে মুখ বন্ধ করে হৃদয়মধ্যে প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকবেন। যোগীপুরুষ এভাবে থেকে হৃৎপদ্মে স্থিত সর্বব্যাপী, নিরঞ্জন পুরুষোত্তমকে ধ্যান করতে থাকবেন। প্রথমে কর্মেন্দ্রিয় সকল ক্ষেত্রজ্ঞে এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে পরম ব্রহ্মে যোজিত করে যোগবিদ ব্যক্তি যোগযুক্ত হবেন। এ রকম অভ্যাস করতে যার চঞ্চল মন পরমাত্মায় প্রলীন হয়, সেই বিষয়নিস্পৃহ যোগীরই যোগসিদ্ধি হয়। যখন নির্বিষয় চিত্ত পরমব্রহ্মে লীন হয়, সমাধিমগ্ন যোগযুক্ত পুরুষ তখনই পরমপদ লাভ করে থাকেন। যোগীর চিত্ত যখন সর্বদা সমস্ত কর্মে অসংসক্ত হবে, তখনই তিনি নির্বাণ লাভ করতে পারবেন। যোগপ্রভাবে যোগী যখন সেই গুণাতীত বিশুদ্ধ তুর্যাখ্য পুরুষোত্তমকে লাভ করেন, তখনই তিনি মুক্ত হয়ে থাকেন। যিনি নিস্পৃহ, ইন্দ্রিয়কে যিনি সংযত করেন, সর্বদাই যোগাভ্যাস করেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন। পদ্মাসনে অবস্থান করলে কিংবা নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখলেই যোগানুষ্ঠান হয় না; ইন্দ্রিয় এবং মনের যে সম্যক্ নিরোধন, তাকেই প্রকৃত অর্থে যোগ বলা হয়। এই আমি আপনাদের কাছে যোগতত্ত্ব বিবৃত করলাম।

—'যোগাভ্যাসনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো ছত্রিশ

মুনিরা ব্যাসকে বললেন—আপনার মুখরূপ সাগর থেকে উদ্ভূত বাক্যরূপ অমৃত পানে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। তাই অনুরোধ করছি মুক্তিদায়ক যোগবিবরণ আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, জ্ঞান বা সাংখ্যযোগ—এ সবের মধ্যে কোনটির দ্বারা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়, সে কথাও বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—জ্ঞান, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সর্বস্বত্যাগ—এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মুক্তিলাভ হয় বলে আমার জানা নেই। স্বয়ম্ভু কর্তৃক প্রথম সৃষ্ট পঞ্চ মহাভূত সমস্ত প্রাণী শরীরে থাকে। ভূমি থেকে দেহ, জল থেকে স্নেহ, জ্যোতি থেকে চক্ষু, বায়ু থেকে

প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু এবং আকাশ থেকে দেহমধ্যগত অবকাশ উৎপন্ন হয়। গমনে বিষ্ণু এবং বলে ইন্দ্র বর্তমান। অগ্নি উদরে থেকে খাওয়ার ইচ্ছা জাগান। কর্ণে দিকসমূহ এবং জিহ্বায় সরস্বতী অবস্থান করেন। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়; এদের আহারের জন্য দশটি ছিদ্র আছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের আহার্য বিষয়। এদের ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক বলে জানবেন। মন অবশীভূত অশ্বের মতো ইন্দ্রিয়দের নিয়ত পরিচালিত করে। হৃদয়স্থিত ভূতাত্মা, সেই মনকে বিষয়ে নিযুক্ত করে থাকেন। মনই এই ইন্দ্রিয়সমূহের ঈশ্বর, মনের প্রয়োগ এবং সংযম বিষয়ে আবার ভূতাত্মাই কর্তা। দেহিগণের দেহে ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থ নিচয়, স্বভাব, চেতনা, মন, প্রাণাপান এবং জীব এরা সর্বদাই বাস করে। সত্ত্ব নিজেই নিজের আশ্রয়, 'গুণ' শব্দে চেতনাকে বোঝায় না। সত্ত্ব থেকে চেতনার উদ্ভব হয়; কিন্তু গুণের উৎপত্তি হয় না। এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত দেহ ষোড়শ গুণের দ্বারা সমাবৃত। মনীষী মানব মনের দ্বারা এ রকম আত্মাকে আত্মাতেই দর্শন করে থাকেন। সেই আত্মা চক্ষুর দর্শনীয় নন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না; প্রদীপ্ত মনের দ্বারাই সেই মহান আত্মা দৃষ্ট হন। তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অতীত। তিনি সমস্ত প্রাণীতেই অব্যক্তরূপে বর্তমান। যে ব্যক্তি তাঁকে দর্শন করে, সে ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যা এবং বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডাল—সমস্ত কিছুকেই সমানভাবে দর্শন করেন। সেই মহান আত্মা সমস্ত প্রাণীতেই বাস করেন। আত্মাতে সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত প্রাণীতেই আত্মা বিরাজিত আছেন—যখন এই জ্ঞান জন্মে, তখন জীবাত্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। জীবাত্মাতে যত জ্ঞানাত্মা, পরমাত্মাতেও তত আত্মাই বর্তমান। যিনি সর্বদা এই তত্ত্ব চিত্তে ধারণ করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। আকাশে পাখিদের এবং জলের মধ্যে মাছেদের গতির মতো যোগীদের গতি বোঝা যায় না। কাল আত্মাতে অবস্থিত হয়ে সমস্ত প্রাণীকেই আত্মা দ্বারা পরিপাক করে থাকেন; কিন্তু সেই কালের যাতে পরিণাম ঘটে, সে তত্ত্ব কেউই জানে না। তাঁতেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। তিনি সামনে থাকলেও ধনুর্গুণ থেকে মুক্ত বাণের মতো কিংবা মনের মতো বেগগামী হয়েও কেউই সেই কারণের স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হয় না। তাঁর থেকে স্থূলতর আর কিছুই নেই। তিনি সমগ্র জগৎ ব্যেপে রয়েছেন। তিনি অণু থেকে অণুতর, মহৎ থেকে মহত্তর এবং সমস্ত প্রাণী তাঁতেই লীন হয়ে যায়। এই আত্মার অক্ষর ও ক্ষর—এই দু'প্রকার ভাব। ক্ষর আত্মা সমস্ত প্রাণীতেই বিরাজ করেন, অক্ষর আত্মা পরমাশ্চর্য এবং মুক্তির কারণ। হংসসংজ্ঞক ক্ষর আত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমধ্যে নিয়ত বাস করেন। তিনি স্থাবর এবং জঙ্গম—সমস্ত প্রাণীরই হানি ও সঞ্চয় সাধন করেন বলে পারদর্শীরা সেই অজ আত্মাকে 'হংস' শব্দে অভিহিত করেন। ক্ষর পুরুষ হংস এবং অক্ষর পুরুষ কূটাস্থ। এই কূটাস্থকে জানতে পারলে জন্মমৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আপনাদের অনুরোধে সাংখ্যযোগের কথা এতক্ষণ ধরে বললাম। এর পর যোগকৃত্য বিষয়ে বলছি। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং সর্বব্যাপী আত্মার একত্ব জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। শান্ত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাঁচ প্রকার যোগদোষের উচ্ছেদ করে এঁকে জানবে। যোগদোষ পাঁচটি—কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও নিদ্রা। শম দ্বারা ক্রোধ, সংকল্প বর্জনের দ্বারা কাম এবং সত্ত্বসেবার দ্বারা নিদ্রাকে জয় করতে হয়। ধৈর্যের দ্বারা জননেন্দ্রিয় এবং উদর, চক্ষু দ্বারা হাত এবং পা,

মনের দ্বারা চক্ষু এবং কর্ণ, এবং কর্মের দ্বারা মন ও বাক্য জয় করবে। অপ্রমাদের দ্বারা ভয় এবং বিজ্ঞজনের সঙ্গ দ্বারা অহঙ্কার জয় করা কর্তব্য। ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ, আত্মশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ—এ সবের দ্বারা তেজের বৃদ্ধি হয়। সমস্ত প্রাণীতেই সমান ব্যবহারের দ্বারা, যথেচ্ছভাবে প্রাপ্ত আহারের দ্বারা যোগী ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করবে; কাম এবং ক্রোধ জয় করে ব্রহ্মপদের সেবা করবে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি কোন ইন্দ্রিয় বিকল হয় তাহলে পর্বতের পাদদেশ থেকে যেমন জল ক্ষরিত হয়, তেমনি প্রাণীর প্রজ্ঞাও ক্ষরিত হয়। অতএব যোগবিদ ব্যক্তি কূর্মের অঙ্গসমূহের মতো ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করবে; পরে সংকল্প সকল পরিহার করে মনকে আত্মাতে নিবেশিত করবে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন যখন আত্মাতে অবস্থিত হয়, তখন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। যোগী তখন হৃদয়ে ধূমহীন অগ্নির মতো, আকাশের সূর্যের মতো এবং বিদ্যুতের মতো দীপ্তিমান আত্মাকে নিজ আত্মাতেই দর্শন করে থাকেন। ব্যাপকত্ব হেতু সেই আত্মাতে সমস্ত পদার্থই দৃষ্ট হয়। মনীষী ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দেখতে পান। যোগী ব্যক্তি নির্জনে এ রকম আচরণ করলে অক্ষর পুরুষে বিলীন হয়ে থাকেন। যোগী যোগপ্রভাবে সমস্ত বাধা, সমস্ত উপসর্গ সমজ্ঞানের দ্বারাই দূর করবেন। সংসারের যাবতীয় পদার্থে নিস্পৃহ হয়ে মুনিজন ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত করে গিরিশৃঙ্গ, চৈত্যতরু এবং বৃক্ষমূলে বসে একাগ্রমনে প্রতি দিন চিন্তা করেন। তিনি নিজ উদরকেই পাত্র বলে মনে করবেন। যোগী ব্যক্তি নির্জন স্থানে বাস করবেন; কর্ম, মন এবং বাক্যের দ্বারা অপরের উদ্বেগ জন্মাবেন না। লাভে-অলাভে, সম্মানে-অপমানে সমান থাকবেন, কারুর শুভ কিংবা অশুভ কামনা করবেন না। বায়ুর মতো সমস্ত প্রাণীর প্রতিই সমান ব্যবহার করবেন। এ রকম সুস্থাত্মা, সর্বত্র সমদর্শী এবং নিত্য যোগযুক্ত সাধু ব্যক্তি ছ'মাসেই শব্দব্রহ্মকে লাভ করেন। যোগী ব্যক্তি প্রস্তরখণ্ড এবং সোনায় সমজ্ঞান করবেন; পরের দুঃখে দুঃখিত হবেন না। যোগাভ্যাস থেকে কখনো বিরত হবেন না। ধর্মশীল রমণী বা শূদ্র ব্যক্তিও এ রকম যোগ অবলম্বন করলে পরমগতি লাভ করতে পারবেন। এভাবে যোগাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি পরমপুরুষকে দর্শন করে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মের সঙ্গে সমানরূপতা লাভ করেন।

—'সাংখ্যযোগনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ দুশো সাঁইত্রিশ

মুনিরা বললেন—'কর্ম কর' এবং কর্ম ত্যাগ কর'—এই উভয় প্রকার বেদবাক্যই শোনা যায়। এই দুই পরস্পর প্রতিকূল বিধির তাৎপর্য কি? কর্ম দ্বারাই বা কোন্ গতি লাভ হয়? আর বিদ্যা দ্বারাই বা কি হয়? এ সব কথা দয়া করে আমাদের বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাসদেব বললেন—ক্ষর এবং অক্ষর ব্রহ্ম—এঁরা কর্মময় ও বিদ্যাময়। 'ধর্ম আছে' এ কথা যে বলে, আর 'ধর্ম নেই' এ কথা যে বলে—উভয়ের উক্তিই সত্য; 'এটি যক্ষের মতো' আর 'এটি যক্ষের' এই উভয় উক্তিই যেমন যক্ষ সম্বন্ধীয় এই অর্থ প্রতিপাদন করে, ঠিক তেমনি 'ধর্ম আছে' আর 'ধর্ম নেই' এই দুই বাক্যেও ধর্মের সত্তা স্বীকার করা হয়ে থাকে। 'ধর্ম নেই' এ কথা বললে প্রথমত ধর্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে তার পর এর নিষেধ করা হয়; 'নেই' এ কথা বললে অব্যক্ত অবস্থা বোঝায়, আকাশকুসুমের মতো আদৌ অস্তিত্বহীন কোন বস্তুকে বোঝায় না। যা অব্যক্ত, কোন কালে তা অবশ্যই ব্যক্ত ছিল বা হবে। প্রবৃত্তিলক্ষণ

ও নিবৃত্তিলক্ষণ—ধর্মের এই দ্বিবিধ পথ। কর্মের দ্বারা জীবগণ বদ্ধ হয়, বিদ্যার দ্বারা মুক্তিলাভ করে। এ জন্যই বিদ্বান সন্ন্যাসীগণ কর্ম করেন না। কর্ম করলে ষোড়শ অবয়বযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়, বিদ্যার দ্বারা নিত্য অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। অল্পবুদ্ধি মানুষেরা কর্মের প্রশংসা করে, সেজন্য তারা সানন্দে উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। অপর পক্ষে ধর্মতত্ত্বনিপুণ জ্ঞানবান জনগণ ধর্মের প্রশংসা করেন না, যেমন, যারা নদীর জল পান করে তারা কখনো কূপের প্রশংসা করে না। কর্মের ফলে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু লাভ হয়; অপর পক্ষে, বিদ্যার দ্বারা এমন বস্তু পাওয়া যায় যা পেলে কখনই আর শোক করতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেখানেই গমন করেন, যেখানে গেলে জন্ম-মৃত্যু, হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই থাকে না এবং যেখানে অব্যক্ত, অচল, অপরিবর্তনশীল, অপরিমেয়, সর্বজ্ঞ, অমৃতপদবাচ্য পরমব্রহ্ম সর্বদাই বিরাজ করেন। বিদ্যাময় পুরুষ এবং কর্মময় পুরুষ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। কর্মময় পুরুষ চন্দ্রের মতো সুখস্পর্শ, তিনি সূক্ষ্ম অংশরূপে বিরাজ করেন; আকাশগত রাশিচক্রে স্থিত সূক্ষ্ম তন্তুর মতো এর স্বরূপ দেখতে বা বলতে পারা যায় না। সেই কর্মময় পুরুষ, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং জীবাংশসমূহে পরিপুষ্ট এবং মূর্তিমান। সাগর মধ্যে চন্দ্রের মতো হৃৎপদ্ম মধ্যে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, সেই দেব ক্ষেত্রজ্ঞ বলে পরিচিত। যোগবলে তাঁকে লাভ করা যায়।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তম—এই তিনটি জীবের গুণ। জীব আত্মার গুণ, আত্মা পরমাত্মার গুণ। জীবগুণ সচেতন; এর দ্বারাই যাবতীয় চেষ্টা নিষ্পাদিত হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এর দ্বারাই সপ্ত ভুবনের কল্পনা করে থাকেন। প্রকৃতির বিকারসমূহ ক্ষেত্রজ্ঞ নামে উল্লিখিত হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞেরা এই আত্মাকে জানে না এবং আত্মাও ক্ষেত্রজ্ঞদের জানেন না। সারথি যেমন সুশিক্ষিত অশ্বের দ্বারা অভীষ্ট স্থানে গমন করে আত্মাও সে-রকম মনের সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞদের দ্বারা আপন অভীষ্ট কার্য সাধন করেন। ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি পর, ঐ ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ থেকে মন পর; মন অপেক্ষা বুদ্ধি পর; বুদ্ধি অপেক্ষা মহান আত্মা পর। মহানের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর অমৃত; অমৃতের পর আর কিছুই নেই। তিনিই চরম স্থান এবং তিনিই পরম গতি। সূক্ষ্মদর্শী জনগণ বিশুদ্ধ সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে দর্শন করে থাকেন। প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা মনের কলুষতা দূর করে বাহ্য বিষয় থেকে মনকে প্রত্যাহার করবেন; পরে ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হয়ে বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ ও মনকে অন্তরাত্মাতে বিলীন করবেন। তখন তিনি পরম পদ লাভ করবেন। সমস্ত সংকল্প পরিহার করে সত্ত্বে চিত্তনিবেশ করলে কালকৃত জন্ম-মৃত্যু ভোগ করতে হয় না। সুখের কারণ না থাকা সত্ত্বেও চিত্তের যে সুখানুভব কিংবা বায়ুহীন প্রদেশে স্থিত দীপের মতো চিত্তের অচঞ্চল অবস্থা, তাই প্রসাদের লক্ষণ। লঘু আহারকারী বিশুদ্ধাত্মা সন্ন্যাসী এভাবে প্রথম ও শেষ রাত্রে যোগানুষ্ঠান করলে জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করতে পারেন। দীর্ঘদিনের চর্যায় ও চর্চায় শাস্ত্রসমূহ মন্থন করে এই অমৃত উদ্ধৃত হয়েছে। বিদ্বানগণের মুক্তিসাধন এই সাংখ্যজ্ঞান দই থেকে যেমন মাখন হয় এবং কাঠ থেকে যেমন আগুনের উৎপত্তি হয়, সেভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এই রহস্যবিদ্যা যার তার কাছে ব্যক্ত করবে না। শান্ত, দান্ত, তপস্বী, বেদবিদ, অনুগত প্রিয় পুত্র এবং শিষ্যকে এই রহস্যবিদ্যার উপদেশ দান করবে।

মুনিরা ব্যাসদেবকে বললেন—এই অধ্যাত্ম শাস্ত্র যাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, সেভাবে বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—

এই পাঁচটি মহাভূত ; সৃষ্টিকর্তা এদের মধ্যেই বাস করেন। মুনিরা তখন ব্যাসকে জিগ্যেস করলেন—পঞ্চভূতের আকার আছে, কিন্তু শরীর নেই ; তাহলে সেই অশরীরী পঞ্চভূতের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা কি করে বাস করেন ? তাছাড়া, পঞ্চভূতের কতকগুলো আবার ইন্দ্রিয়গুণ ; সুতরাং এদের পৃথকভাবে উপলব্ধির সম্ভাবনাই বা কোথায় ? মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বললেন—আমি যেভাবে এই তত্ত্ব জেনেছি, আমার জ্ঞান এবং বুদ্ধি মতো সেভাবেই আপনাদের বলছি। শব্দ, কর্ণ এবং ছিদ্র—এ তিনটি আকাশের গুণ ; প্রাণ, চেষ্টা ও স্পর্শ—এ তিনটি বায়ুর গুণ। তেজের গুণও তিনটি—রূপ, চক্ষু এবং বিপাক ; জলের গুণ—রস, জিহ্বা এবং ঘাম ; ভূমির গুণ—গন্ধ, নাসিকা ও শরীর। বায়ুর স্পর্শ, জলের রস, তেজের রূপ, আকাশের শব্দ, এবং ভূমির গন্ধ—এ ক'টি প্রধান প্রধান গুণ। মন, বুদ্ধি এবং স্বভাব—এই তিনটি প্রাণীর বিশিষ্ট গুণ। কূর্ম যেমন নিজের শরীরকে আকুঞ্চিত এবং প্রসারিত করে, বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত আত্মাও তেমনি ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। গুণের দ্বারা বুদ্ধি পরিচালিত হয় ; বুদ্ধি মনের ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করে। সুতরাং বুদ্ধির অভাবে গুণের ক্রিয়াভাব ঘটে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়, ষষ্ঠ মন, সপ্তম বুদ্ধি এবং অষ্টম ক্ষেত্রজ্ঞ ; এই আটটি দেহের প্রধান অবয়ব। চক্ষুর দ্বারা বাহ্যগজতের বস্তু দর্শন করা হয়, মন সংশয় এবং বুদ্ধি নিশ্চয় করে ; ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষীমাত্র। সত্ত্ব, রজঃ এবং তম—এই তিনটি গুণ স্বয়ংজাত ; সমস্ত প্রাণীতেই এরা সমভাবে বর্তমান থাকে। আত্মাতে প্রীতি এবং প্রশান্ত ভাব দেখলে বুঝতে হবে যে তা সত্ত্বগুণের জন্যেই হয়েছে। শরীরে বা মনে যে দুঃখ-সুখ ভাব, তা রজোগুণের জন্যই হয়। যা মোহসংযুক্ত, অব্যক্ত ও বিষম তাকেই তমোগুণজাত বলে জানবে। আনন্দ, স্বাধীনতা, সুস্থচিত্ততা—এ সব সাত্ত্বিক গুণ ; অভিমান, মিথ্যাকথন, লোভ, গর্ব, ক্রোধ—এ সমস্ত রাজস গুণ এবং মোহ, প্রমাদ, তন্দ্রা, নিদ্রা, অজ্ঞানতা—এ সব তামস গুণ। মন ভাবের উৎপাদক, বুদ্ধি নিশ্চয়-বিধায়ক। ইন্দ্রিয়ের থেকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তার থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি থেকে আত্মা শ্রেষ্ঠ। বস্তুত বুদ্ধিই জীবগণের আত্মা। এই বুদ্ধি যখন বিকারপ্রাপ্ত হয়, তখনই তাকে মন বলা যায়। বুদ্ধিই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করে বিভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করে। শ্রবণ করে বলে শ্রোত্র, স্পর্শ করে বলে স্পর্শ, দর্শন করে বলে দৃষ্টি, রস গ্রহণ করে বলে রসনা, আঘ্রাণ করে বলে ঘ্রাণ—এভাবে এক বুদ্ধিই বিভিন্ন নাম ধারণ করে। এদের বলা হয় ইন্দ্রিয় ; এরা বুদ্ধির বৃত্তি মাত্র। ওই বুদ্ধি-বলেই জীব কখনো সুখ, কখনো দুঃখ ভোগ করে। সাগর যেমন সরিৎসমূহের আশ্রয় হয়েও কখনো বেলা অতিক্রম করতে পারে না, সর্বভাববতী বুদ্ধিও তেমনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিনটি ভাব কখনো পরিত্যাগ করে না। বস্তুত একই পদার্থের অধিষ্ঠান ভেদে মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি পৃথক সংজ্ঞা লাভ করেছে ; ইন্দ্রিয়সকল যন্ত্র মাত্র। বুদ্ধিই সমস্ত কাজ সম্পাদন করে ; এমন কি সত্ত্ব বা রজোগুণকেও ঐ বুদ্ধিই স্বায়ত্ত করে থাকে। অরসমূহ যেন রথনেমির অধীন, গুণসকলও তেমনি ভাবানুসারে বুদ্ধিরই অনুগত থেকে ক্রিয়ার আকারে প্রবৃত্ত হয়। মন একটি প্রদীপের মতো ; ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় যন্ত্রের মতো ; বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোক যেমন পৃথক আকার ধারণ করে, বুদ্ধিও তেমনি চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানে সেই সেই নাম লাভ করে।

অসংযত ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে আত্মাকে দেখতে সমর্থ হয় না। পরন্তু মনের দ্বারা এদের রশ্মি যথাযোগ্য রূপে নিয়োগ করলে দীপালোকে আকৃতির

মতো আত্মার প্রকাশ হয়ে থাকে। জলচর পাখি যেমন জলে ভেজে না, বিমুক্তাত্মা যোগীও তেমনি গুণ বা দোষে লিপ্ত হন না। যিনি সমস্ত বস্তুতেই আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সংসারে বন্ধ হন না। আত্মা স্বয়ং গুণগণকে প্রসব করে, কিন্তু গুণগণ সেই আত্মাকে জানতে পারে না। গুণসকল আত্মাকে আবৃত করে, আত্মা কিন্তু দ্রষ্টা মাত্র। সত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য এই, একটি গুণ সৃষ্টি করে, অন্যটি তা করে না। এরা সর্বদাই মিলিত থাকে অথচ প্রকৃতি থেকে থাকে স্বতন্ত্রভাবে। রত্নসম্মিলিত স্বর্ণ এবং মুঞ্জসহ ইষিকা যেমন পরস্পর মিলিত অথচ পৃথক, এরাও তেমনি অন্যোন্যাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত।

—'যোগোপায়বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো আটত্রিশ

সাংখ্যযোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাস বলে চললেন—সত্ত্বই সমস্ত গুণ সৃষ্টি করে; ঈশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞ উদাসীনের মতো এতে অধিষ্ঠান করেন মাত্র। মাকড়সা যেমন সূত্র সৃষ্টি করে, স্বভাবযুক্ত আত্মাও তেমনি গুণসমূহের সৃষ্টি করে থাকেন। প্রবৃত্তিমার্গানুগামী জনগণ সংসারে পুনরাবৃত্ত হন না;—এ রকম মনে করে কেউ কেউ প্রবৃত্তিপথেই যত্ন করেন; আবার কেউ কেউ নিবৃত্তিরই অনুশীলন করে থাকেন। বস্তুত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পথই অবলম্বনীয়—এ কথা বুঝেই কাজ করতে হবে। অনাদিনিধন আত্মাকে জেনে মানুষ ক্রোধ, আনন্দ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করে নিয়ত বিহারপরায়ণ হবেন। সেই নিত্য সমাসীন, শোকসংস্রবহীন আত্মাকে জানলে সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। নদী পার হয়ে যেমন অভীষ্ট স্থানে যাওয়া যায়, এই তত্ত্বশাস্ত্রে অবগাহন করলেও তেমনই শান্তি লাভ করা যায়। জ্ঞানময় আত্মাকে এভাবে জেনে জ্ঞানী মানুষ সংসারে নির্লিপ্তভাবে বিচরণ করেন। এই তত্ত্ব বুঝতে পারলেই মানুষ বুদ্ধ হয়; এ ছাড়া বুদ্ধের আর কি লক্ষণ হতে পারে? যাঁরা আত্মতত্ত্ব সম্যকভাবে জানেন, তাঁরা অনুষ্ঠিত কার্যমাত্রই কৃত ও অকৃত বলে বোঝেন; সুতরাং শোক করেন না।

মুনিরা ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—যে ধর্মের চেয়ে ইহলোকে আর পরম ধর্ম নেই, এবং প্রাণীদের মধ্যে যা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের সেই ধর্মের বিষয়ে বলুন। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—আমি আপনাদের সমস্ত ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ঋষিগণ প্রশংসিত পুরাণধর্মের কথা শোনাচ্ছি। পিতা যেমন সন্তানগণকে একত্রিত করেন, সে-রকম তত্ত্বজ্ঞানবলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে মনের সঙ্গে যুক্ত করবেন। মনের এবং ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা সাধনই পরম তপস্যা। সমস্ত ধর্মের মধ্যে এই ধর্মই শ্রেষ্ঠ। মন যখন যাবতীয় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে স্বীয় স্থানে অবস্থান করবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তখনই আত্মা দ্বারা শাশ্বত পরমাত্মাকে দেখতে সমর্থ হবেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সেই মহান আত্মাকে ধূমহীন অগ্নির মতো দর্শন করেন। পুষ্পফলযুক্ত বৃক্ষ যেমন তার পুষ্প এবং ফল ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানে না, তেমনি আত্মাও তাঁর নিজের বিষয়ে কিছুই জানেন না। এই আত্মার আবার অন্য এক অন্তরাত্মা আছেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন। প্রদীপ্ত জ্ঞানপ্রদীপের সাহায্যে জীবাত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে দেখা যায়। আপনারাও সেই আত্মাকে দর্শন করে বৈরাগ্য লাভ করুন; তাহলে সাপ যেমন তার খোলস পরিত্যাগ করে, আপনারাও সে-রকম সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত

হবেন। যার সমস্ত দিকে স্রোত প্রবাহিত, লোকসমূহ যার প্রবাহ, পঞ্চেন্দ্রিয় জলজন্তু, মনের সংকল্প কূল, কাম, ক্রোধ সরীসৃপ, সত্য অবতরণ স্থান, মিথ্যা জলক্ষোভ, ক্রোধ পাঁক এবং লোভ-মোহ তৃণে আচ্ছন্ন, সেই প্রখরস্রোতা নদী আপনারা বুদ্ধির সাহায্যে পার হোন। পূতাত্মা মানুষ উত্তম বুদ্ধির দ্বারা সেই নদী পার হয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। আপনারা প্রাণীদের উৎপত্তি ও লয় দেখবেন ; কিন্তু তাতে দুঃখিত বা সুখী হবেন না। সত্যদর্শী পণ্ডিতগণ একেই সমস্ত ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এই যে ব্রহ্ম, ইনি পুরুষও নন, ক্লীবও নন ; এঁর সুখ-দুঃখের বোধ নেই ; যে এঁকে এভাবে জানে তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

মুনিরা তখন ব্যাসদেবকে বললেন—পিতামহ ব্রহ্মা বলেছেন যে, উপায়ের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় ; উপায় ছাড়া হয় না। আমরা সেই উপায়ের কথা শুনতে চাই। ব্যাস তখন মুনিদের বললেন—দেখুন, ঘটের উপকরণে যে রকম বুদ্ধি থাকে, ঘটের উৎপত্তি বিষয়ে সে-রকম বুদ্ধি থাকে না ; ধর্ম প্রভৃতির উপায় সম্বন্ধেও সে-কথাই বুঝতে হবে। পূর্ব-সমুদ্রে যেতে যে পথ, পশ্চিম-সমুদ্রে যেতে সে পথের প্রয়োজন হয় না ; কিন্তু মোক্ষ সম্বন্ধে একটিই পথ। ধীর মানব ক্ষমার দ্বারা ক্রোধের উচ্ছেদ করবে ; সংকল্প বর্জনের দ্বারা কামকে বিনষ্ট করবে, আর সত্ত্বসেবার দ্বারা নিদ্রাকে জয় করবে। ইচ্ছা, দ্বেষ ও কামকে ধৈর্যের দ্বারা নিবারিত করবে। তত্ত্ববিদ মানব নিদ্রা ও চাঞ্চল্যকে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা দূরীভূত করবে। লোভ ও মোহকে সন্তোষের দ্বারা, বিষয়াসক্তিকে তত্ত্বানুশীলনের দ্বারা, অধর্মকে দয়ার দ্বারা এবং ধর্মকে উপেক্ষা দ্বারা নিরাকৃত করবেন। পণ্ডিত ব্যক্তি ভাবিকালের ভাবনা পরিহারের দ্বারা আশাকে, সংসারের অনিত্যতা চিন্তার দ্বারা স্নেহকে এবং যোগবলে ক্ষুধাকে জয় করবেন ; কারুণ্যের দ্বারা স্বভাব, পরিতোষের দ্বারা তৃষ্ণা, উদ্যমের দ্বারা তন্দ্রা এবং নিশ্চয়ের দ্বারা বিতর্ক দূর করবেন। বাক্য ও মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে জ্ঞানে, জ্ঞানকে মহৎ আত্মাতে এবং তাকে পরমাত্মাতে বিলীন করলে শান্তি লাভ হয়। শান্ত ব্যক্তি কবিগণকথিত পঞ্চবিধ যোগদোষের সমুচ্ছেদ করে এই তত্ত্ব অবধারণ করবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় এবং নিদ্রা—এই পাচটি যোগদোষ পরিত্যাগ করে যথা-বিধি তত্ত্বালোচনা করতে হয়। ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্য লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ, শুদ্ধাচার ও ইন্দ্রিয় সংযম—এই দশটি দ্বারা পাপনাশ এবং তেজের বৃদ্ধি, সংকল্পের সিদ্ধি এবং জ্ঞানের প্রবৃত্তি হয়। লঘুভোজী, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ ও তেজস্বী যোগী কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করে ব্রহ্মপদে প্রবেশ করতে পারেন। সঙ্গ পরিত্যাগ করে, কাম ক্রোধকে জয় করে, বাক্য দেহ এবং মনের সংযম করেই মোক্ষলাভ করা যায়—এই পথই মোক্ষলাভের বিশুদ্ধ এবং বিমল পথ।

—'সাংখ্যযোগনিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো উনচল্লিশ

মুনিরা ব্যাসদেবকে বললেন—সাংখ্য ও যোগ সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব আমাদের বিস্তৃতভাবে বলুন। ব্যাস বললেন—নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য বিশেষ কারণ প্রদর্শন করে সাংখ্য-বিদগণ সাংখ্যের এবং যোগীরা যোগেরই প্রশংসা করে থাকেন। যোগীরা 'ঈশ্বর ছাড়া কিভাবে মুক্তি হবে' এ কথা বলে যোগকেই প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চান ; সাংখ্যবিদগণ

বেদকেই কারণ বলে থাকেন। যিনি জগতের সমস্ত বিষয় জেনে বিষয়ে বিরক্ত হন, তিনি দেহত্যাগের পর অবশ্যই মুক্ত হবেন, এতে কোন সন্দেহই নেই। প্রাজ্ঞগণ একেই মোক্ষ-দর্শন সাংখ্য বলে নির্দেশ করেন। যোগসমূহ প্রত্যক্ষ আর শাস্ত্রের দ্বারা সাংখ্য নিরূপিত হয়। উভয় মতই যথার্থ, উভয় মত জেনে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করলে পরম গতি লাভ করা যায়। এই দুই মতে শৌচ, তপ এবং প্রাণীগণের প্রতি দয়াব্রত তুল্য, কেবল দর্শনই পৃথক পৃথক। মুনিরা তখন ব্যাসদেবকে জিগ্যেস করলেন—যদি এদের ব্রত, শৌচ, দয়া প্রভৃতি সমানই হয়, তবে এদের দর্শনও এক হল না কেন? উত্তরে ব্যাস বললেন—রাগ, মোহ, স্নেহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দোষ যোগীদের বাধা দেয়। মাছ যেমন জাল কেটে জলের মধ্যে পালিয়ে যায়, বলবান মৃগ যেমন ব্যাধের ফাঁদ কেটে পালায়, মানুষও তেমনি সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগ করে বিমল মুক্তি লাভ করে। যোগবলহীন পাপী মানব দুর্বল মৃগের মতো বিনষ্ট হয়। দুর্বল পাখিরাই সাধারণত ব্যাধের পাতা জালে ধরা পড়ে, বলবান এবং চতুর পাখিরা তা থেকে মুক্ত হয়; অনুরূপভাবে যোগবলশালী ব্যক্তিগণ কর্মজ বন্ধনে বদ্ধ হয়েও মুক্ত হয়, আর যাদের সেই যোগবল নেই, তারা মুক্ত হতে পারে না। অল্পমাত্র আগুন বায়ুর সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যেমন সমগ্র পৃথিবী দগ্ধ করতে পারে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন যোগী ব্যক্তিও মহাবলশালী এবং দীপ্ততেজা হয়ে যুগান্তকালের সূর্যের মতো সমগ্র জগতের শোষণ করতে সমর্থ হন। দুর্বল মানুষকে প্রবল স্রোত যেমন ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি দুর্বল যোগীও বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। যোগবল-শালী মানুষের দেহে ক্রুদ্ধ যম, অন্তক এবং ভীমবিক্রম মৃত্যুও প্রবেশ করতে পারে না। সূর্যের তেজোগুণের মতো যোগী কখনও বিষয় গ্রহণ করেন, কখনও উগ্র তপশ্চারণ করেন। যোগী ব্যক্তি মোক্ষহেতু বিষ্ণুকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করেন। এতক্ষণ যা বলেছি, সে সবই যোগলভ্য স্থূল সামর্থ্যের বিষয়, এখন সূক্ষ্ম সামর্থ্যের কথা বলা হচ্ছে। এর দ্বারা আত্মার ধারণা লাভ হয়। ধনুর্ধারী যেমন নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য ভেদ করে, সম্যক যোগযুক্ত যোগীও সে-রকম মোক্ষ লাভ করেন। স্নেহপদার্থপূর্ণ পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে মানুষ যেমন ধীরে ধীরে সোপান আরোহণ করে, যোগীও সে-রকম সাবধানে যোগমার্গে অগ্রসর হয়ে থাকেন এবং ক্রমে নির্মল সূর্যের মতো দীপ্তিমান হয়ে মুক্তিলাভ করেন। সারথি যেমন অশ্ব পরিচালনার দ্বারা ধনুর্ধর পুরুষকে অভীষ্ট দেশে নিয়ে যায়, যোগীও সে-রকম ধারণা অবলম্বন করে লক্ষ্যের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত বাণের মতো স্বল্প সময়েই পরম স্থানে যেতে পারেন। মনের দ্বারা আত্মাতে আবিষ্ট হয়ে যিনি নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন, মাছ যেমন জাল কেটে তার অভীষ্ট স্থানে চলে যায় তেমনি তিনি অজর পদ লাভ করেন। যে যোগী নাভি, মস্তক, কুক্ষি, হৃদয়, বক্ষ, পার্শ্বদেশ, চক্ষু, কর্ণ এবং নাসিকা—এ সমস্ত স্থানে মনের দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে স্থাপন করে স্থিরভাবে সমাধিস্থ হন, তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যেই উত্তম যোগপ্রভাবে ইচ্ছানুসারে মুক্তিলাভ করতে পারেন।

মুনিরা ব্যাসকে তখন জিগ্যেস করলেন—যোগী কি রকম আহার এবং কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ জয় করে যোগবল লাভ করেন? দয়া করে আমাদের সে-কথা বলুন। মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বললেন—যোগী ব্যক্তি কণামাত্র শস্য খেলে এবং স্নেহ পদার্থ বর্জন করলে যোগবল লাভ করতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরে প্রতি দিন একবারমাত্র রুক্ষ যব ভক্ষণ করলে সেই বিশুদ্ধাত্মা যোগী যোগবল লাভ করে থাকেন। দুধ পান করে পক্ষ, মাস এবং ঋতুতে গুহায় বিচরণ করলে যোগী ব্যক্তির যোগবলের বৃদ্ধি হয়।

সম্পূর্ণ একমাস উপবাস করে শুদ্ধাত্মা যোগী যোগবল লাভ করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কাম ক্রোধ প্রভৃতি জয় করে ধ্যানের দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে দর্শন করেন। এই পথ অতীব দুর্গম : এই পথের দুধারে ছড়ানো রয়েছে অজস্র বাধা। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার মতো এই যোগমার্গে অবস্থান অত্যন্ত কঠিন। যিনি ধারণাবলম্বনে যথাবিধি যোগানুষ্ঠান করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু, সুখদুঃখ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। এই যোগবিধান অবলম্বনে মহাত্মা যোগী ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মময় হয়ে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত বস্তু, সমস্ত গুণ, সমস্ত দেবতা, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এদেরও অতিক্রম করে অচিরকালমধ্যেই মুক্তিলাভ করেন। যোগী ব্যক্তি ক্রমে নারায়ণে বিলীন হয়ে যান।

—'যোগবিধিনিরূপণ' নামক অধ্যায়

অধ্যায় : দুশো চল্লিশ

মুনিরা এরপর ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—আপনার কাছ থেকে আমরা শিষ্টসম্মত যোগমার্গ শুনলাম ; এবার আপনি সাংখ্যসম্মত যে ধর্মবিধি সে-কথা বলুন। আপনার অবিদিত তো কিছুই নেই। মুনিদের অনুরোধে ব্যাস বললেন—কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ আত্মজ্ঞানপরায়ণ জনগণের জন্য যে রকম বিধান করেছেন, সে সবই আমি আপনাদের কাছে বলছি। সাংখ্যজ্ঞান যাঁরা সম্যকভাবে জানতে চান তাঁরা মনুষ্য, পিশাচ, সর্প গন্ধর্ব, তির্যক জাতি, পিতৃলোক মহর্ষি, রাজর্ষি, অসুর বিশ্বদেব, যোগেশ্বর ব্রহ্মা—এদের যাবতীয় বিষয় অবগত হবেন। লোকতত্ত্ব অনুসন্ধান করে আয়ুর ও সুখের পরবর্তী কালতত্ত্ব জানবেন। স্বর্গ, বেদবাক্য, বৈদিক অনুষ্ঠান, জ্ঞানযোগ, সাংখ্যজ্ঞান—এ সমস্তের দোষগুণ জানবেন। দশগুণ সত্ত্ব, নবগুণ রজঃ, অষ্টগুণ তম, সপ্তগুণ বুদ্ধি, ষড়গুণ আকাশ, ত্রিগুণ তম, দ্বিগুণ রজঃ, একগুণ সত্ত্ব এবং প্রলয়ের রীতি—এ সমস্ত বিশেষরূপে জেনে বিশুদ্ধ চিত্তে সূক্ষ্ম পদার্থ যেমন আকাশে বিলীন হয়, সেভাবে পরমব্রহ্মে মিলিত হয়ে থাকেন। রূপে দৃষ্টি, গন্ধগুণে নাসিকা, শব্দে কর্ণ, রসে জিহ্বা, এবং স্পর্শে ত্বক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধযুক্ত। ত্বক, স্পর্শ এবং বায়ু—এরা পরস্পর সংসক্ত। তমোগুণে মোহ আছে মোহে আছে লোভ। গমনাগমনে বিষ্ণু, বলে ইন্দ্র এবং জঠরে অগ্নি বিদ্যমান। জলে পৃথিবী, তেজে জল, বায়ুতে তেজ, আকাশে বায়ু এবং মহত্তত্ত্বে আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে বলে জানবে। এ রকম তমোগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব রজোগুণে, রজঃ সত্ত্বে, সত্ত্ব আত্মায় এবং আত্মা ঈশ্বর নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত। সেই দেব নারায়ণই মোক্ষে প্রতিষ্ঠিত। মোক্ষ নিরাকার। সত্ত্বগুণময় দেহ ষোড়শ গুণে সমাবৃত। দেহে স্বভাব ও ভাবনা—এই দুটি ধর্ম সর্বদাই থাকে। আত্মা মধ্যস্থ, কিছুই করেন না, কিছুতেই লিপ্ত হন না। বিষয়াসক্ত জনগণের কর্মময় দ্বিতীয় আত্মা যাবতীয় ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থের আধার। দেহগত প্রাণ অপান, সমান, উদান ব্যান, সৃষ্টিবায়ু এবং লয়বায়ু—এই সাত প্রকার বায়ু প্রত্যেকে আবার সাতভাগে বিভক্ত। প্রজাপতি অনেক, ঋষি অনেক, সৃষ্টিও অনেক। কাল কর্তৃক কত লোক ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হয়েছে। পাপীরা হীন ব্যক্তিরই আদর করে। বৈতরণীতে জীবগণের মহাদুঃখ হয়, যমলোকে নরকেও অনেক যাতনা, বিচিত্র যোনিতে জন্মগ্রহণেও কত ক্লেশ। এ সব দারুণ যন্ত্রণার বিষয় বিবেচনা করে ধীমান মানব যোগাসক্ত হবেন। দেহিগণ অতি অল্প কালই সত্ত্বগুণে মন্দ্রিত থাকে ; সহস্র লোকের মধ্যে কেউ হয়তো মোক্ষ-বিষয়ক

বুদ্ধির আশ্রয় করে। পাপী ব্যক্তির বিভিন্ন দুর্গতি, ঋতুর বিপর্যয়, বছরের ক্ষয়, পক্ষসমূহের পরিবর্তন, চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধি, সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, যুগসকলের বিচিত্র সংযোগবিয়োগ, দেহের বৈক্লব্য—এ সব নিপুণভাবে চিন্তা করে ধীমান ব্যক্তি বৈরাগ্য অবলম্বন করবেন।

মুনিরা ব্যাসকে জিগ্যেস করলেন—আপনি দেহে কোন্ কোন্ বিঘ্ন অবলোকন করেন, সে কথা আমাদের বলুন। মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বললেন—কপিলমতানুযায়ী যোগাভিজ্ঞ সাংখ্য ব্যক্তিবর্গ দেহে পাচটি দোষের উল্লেখ করেন—কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস। ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে, সংকল্প বর্জনের দ্বারা কামকে, সত্ত্বসেবার দ্বারা নিদ্রাকে, সাবধানতার দ্বারা ভয়কে এবং অল্প আহারের দ্বারা শ্বাসকে জয় করবে। সাংখ্য যোগীরা বিষ্ণুমায়াবিরচিত জলবুদ্বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী, ইন্দ্রজালের মতো অলীক, নলতৃণের মতো নিঃসার এই সংসারকে মহা কষ্টদায়ক, সুখের মতো প্রতীয়মান এবং পাঁকের মধ্যে হাতীর মতো রজঃ এবং তমোগুণের মধ্যে নিমগ্ন মনে করে পুত্র পরিজনে মমত্ব বোধ পরিত্যাগ করবেন। তাঁরা তপস্যারূপ দণ্ডের দ্বারা রাজস ও তামস দোষ দূর করবেন। দুঃখরূপ জলে পূর্ণ শোকাত্মক হ্রদকে তাঁরা অনাসক্ত চিত্তে অতিক্রম করবেন। ওই হ্রদ ব্যাধি এবং মৃত্যুতে অতি ভয়ংকর; এতে মহাসর্পরূপ মহাভয়, কূর্মরূপ তমোগুণ, মৎস্যরূপ রজোগুণ এবং পাঁকরূপ স্নেহ রয়েছে। সাংখ্যজ্ঞানীরা প্রজ্ঞার সাহায্যে ঐ হ্রদ অনায়াসে অতিক্রম করেন। যাতে জরা দুর্গ, স্পর্শ দ্বীপ, কর্ম গভীরতা, সত্য তীর, হর্ষ মহাবেগ, নানা রস তরঙ্গকল্লোল, বিবিধ প্রীতি মহারত্ন, শোক ও তৃষ্ণা মহা আবর্ত, তীব্র ব্যাধি কূলভঙ্গ, শ্লেষ্মা ফেনা, দান মুক্তার আকর ঝিনুক, বিবিধ জ্ঞান দুর্গমতা, অহিংসা এবং সত্য সীমা, প্রাণস্পন্দন ঢেউ, সমস্ত প্রাণী জলস্বরূপ, যোগী ব্যক্তিরা জ্ঞানের দ্বারা সে-রকম মহাসমুদ্র অতিক্রম করে থাকেন। তাঁরা সেই দুস্তর জন্ম-সাগর পার হয়ে নির্মল নভোমণ্ডলে বিচরণ করতে থাকেন। সূর্য তখন তাঁদের নিজের রশ্মির সাহায্যে আকর্ষণ করে প্রবহ বায়ুর স্তর পর্যন্ত নিয়ে যান; পরে প্রবহ বায়ু তাঁদের গ্রহণ করে। সপ্ত বায়ুর প্রধান সেই প্রবহ বায়ু তাঁদের তমোমণ্ডল পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়; তখন তমোগুণ রজোগুণ পর্যন্ত, রজঃ সত্ত্বগুণ পর্যন্ত, সত্ত্ব পরম প্রভু নারায়ণ পর্যন্ত সেই সাংখ্যজ্ঞানীদের বহন করে নিয়ে যায়। নারায়ণ তাঁদের পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ ঘটিয়ে দেন। তাঁরা তখন পরমাত্মাতে একীভূত হয়ে অমৃতত্ব লাভ করেন; তাঁদের আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না।

মুনিরা তখন ব্যাসদেবকে জিগ্যেস করলেন—সেই স্থিরব্রত মহাত্মারা পরমাত্মায় লীন হয়ে চিরকালই কি ঐভাবে থাকেন? ঐ অবস্থায় তাঁদের সুখের অনুভূতি থাকে কি? যদি ঐ অবস্থায় পৃথকভাবে তাঁদের আত্মানুভূতি না থাকে, তবে তাতে সুখ কোথায়? এ বিষয়ে আপনি সম্যকভাবে বুঝিয়ে বলুন। মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বললেন—আপনারা অতি কঠিন প্রশ্ন করেছেন। এ বিষয়ে কপিলমতানুসারে মহাত্মাদের অনুমোদিত তত্ত্বকথা বলছি। দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণও বোধযুক্ত হয়, এরা আত্মার করণ মাত্র; এদের সাহায্যেই আত্মা সূক্ষ্মরূপে দর্শন করে থাকেন। আত্মা এদের ত্যাগ করলে এরা কাঠ বা পাথরের মতো জড় হয়ে যায়। সেই আত্মা, নিদ্রিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আকাশে সমীরণের মতো সূক্ষ্মভাবে বিচরণ করে থাকেন। তিনি তখন বিষয়সমূহের স্মরণ এবং দর্শন করে থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ সে সময় বিষহীন সাপের মতো

পরাধীনভাবে নিজের নিজের স্থানে অবস্থান করে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী—এই সমস্ত বস্তুর এবং গুণের সমগ্র গুণকে আবৃত করে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ক্ষেত্রমধ্যে বিচরণ করেন। শিষ্যগণ যেমন গুরুর আনুগত্য করে, ইন্দ্রিয়গণও তেমনি আত্মার অনুসরণ করে থাকে। মোক্ষসাধক এই যে সাংখ্যযোগ আপনাদের বললাম, এর সাহায্যে অল্পকালের মধ্যেই গুণ অতিক্রম করে শান্তি লাভ করা যায়। মহাপ্রাজ্ঞ সাংখ্যেরা পরম গতি লাভ করেন। সাংখ্যজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। পূর্বে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলেছি, তিনি সনাতন, স্থির, সুখদুঃখহীন, আদি-মধ্য-অন্তরহিত, কূটস্থ এবং কর্তা। তিনিই সৃষ্টি, সংহার সমস্ত কার্য করেন। মূর্তিহীন সেই পরমপুরুষের সাংখ্য শাস্ত্রই মূর্তি—এ রকম শ্রুতিবাক্যও পাওয়া যায়। ভূতসমূহ দ্বিবিধ—গম্য এবং অগম্য ;—এদের মধ্যে গম্যই শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞান বেদ, পুরাণ, সাংখ্য, যোগ, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র এবং লৌকিক যা কিছু জ্ঞান আছে, সে সকলের সারভূত। সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত উপায়ে তপস্যার দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দেবত্ব লাভ করেন ; পুনরায় সংসারে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। পরিণামে তাঁরা মোক্ষলাভ করেন। সর্বশাস্ত্রের সারভূত এই সাংখ্যশাস্ত্রের অনুশীলন করে আপনারা পরম ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণকে আশ্রয় করুন।

—'সাংখ্যবিধি নিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো একচল্লিশ

মুনিরা ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন—যাঁকে লাভ করলে পুনরায় সংসারে ফিরে আসতে হয় না, সেই অক্ষর এবং যাঁকে লাভ করলে পুনরায় সংসারে ফিরে আসতে হয়, সেই ক্ষর কাকে বলা হয়? এঁদের স্বরূপই বা কি? দয়া করে আমাদের এই তত্ত্ব বুঝিয়ে দিন। মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব বললেন—আমি এ বিষয়ে বশিষ্ঠ ও করালজনকবিষয়ক এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করছি। মহামুনি বশিষ্ঠকে একবার রাজা জনক জিগ্যেস করেন—যাঁকে লাভ করলে মনীষিগণ সংসারে আর ফিরে আসেন না, সেই সনাতন পরম-ব্রহ্মের বিষয় শুনতে চাই। যা ক্ষর নামে অভিহিত এবং যা অক্ষর নামে পরিচিত, সেই অনাময় বস্তুদ্বয়ের কথা আমাকে বলুন। জনকের অনুরোধে বশিষ্ঠ বললেন—সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি যুগচতুষ্টয়ের বারো হাজার বছর পরিমিত কালকে এক কল্প বলে জানবে। এক হাজার কল্পকাল হলে ব্রহ্মার একদিন হয় ; তাঁর রাত্রিও দিনের মতোই পরিমাণবিশিষ্ট। এই রাত্রির অবসানেই ব্রহ্মা প্রতিবুদ্ধ হন এবং প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করেন। অমূর্তাত্মা শিব এই মূর্তিমান বিশ্বকে বিস্তারিত করে থাকেন। যিনি অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশত্ব ও অব্যয়জ্যোতিস্বরূপ, যাঁর পাণিপাদ সমস্ত দিকে প্রসারিত, যাঁর চোখ, মুখ এবং মস্তক সর্বত্র বিরাজিত এবং যিনি সমস্ত বিশ্বব্যেপে বিরাজ করেন ; তিনিই ভগবান হিরণ্যগর্ভ এবং এই হিরণ্যগর্ভই বুদ্ধি বলে পরিচিত। যোগ ও সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে ইনিই মহান ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি বিবিধ নামে বহুরূপে পঠিত বা গীত হয়ে থাকেন। এই বিচিত্ররূপ বিশ্বাত্মাই একাক্ষর নামে নিরূপিত। ইনিই সমগ্র ত্রিভুবনকে আত্মা দ্বারা ধারণ করেন। এঁর সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ ঘটলে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। যিনি অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হন, তিনি বিদ্যাসর্গ নামে অভিহিত। মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতি অবিদ্যাসর্গ নামে নির্দিষ্ট। সমস্ত চরাচর একই কর্মতত্ত্ব থেকে সমুৎপন্ন। বেদতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এভাবে বিদ্যা ও অবিদ্যা-

সর্গ নির্দেশ করেছেন। ভূতসর্গ অহংকার থেকে তৃতীয় ; বৈকৃতসৃষ্টিকে চতুর্থ বলেই জানবেন। বায়ু, জ্যোতি, আকাশ, জল, পৃথিবী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই দশটি বর্গ একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়। ভৌতিক সর্গকে পঞ্চম বলে জানবেন। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক, হস্ত, পাদ, পায়ু ও জননেন্দ্রিয়—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। এরা মনের সঙ্গে একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়। এভাবেই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ এ কথা জেনে কখনো শোক-মোহের বশীভূত হন না। স্বর্গ, নরক, সমুদ্র, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহাসর্প, চারণ, পিশাচ, দেবতা, ঋষি, রাক্ষস, কীট, মশক, কৃমি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অন্যান্য যে সব জীব আছে সর্বত্রই সৃষ্টি নিদর্শন বিদ্যমান। আমরা শুনেছি যে, প্রলয়ে জল, ভূতল, আকাশ বা অন্য কোথাও শরীরিদের কোন স্থান ছিল না। যিনি প্রতিনিয়ত ভূতগণের আত্মস্বরূপে বিরাজ করেন, তিনি 'অক্ষর' নামে অভিহিত হন। তাঁর ইচ্ছা থেকেই নিখিল সৃষ্টিপরম্পরা ক্ষরিত হয় ; এজন্য তিনি ক্ষর আখ্যায়ও অভিহিত হন। এই অক্ষরকে লাভ করলে পুনরায় আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। ওই অক্ষর পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসংজ্ঞক নিত্য অমূর্ত বস্তু। কেবলমাত্র সত্ত্বের সঙ্গে সংস্পর্শবশত ওই তত্ত্বকে মনীষিগণ সত্ত্ব বলেই ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্ব মূর্তিহীন হয়েও নিজেরই সৃষ্ট ব্যক্তমূর্তিতে বিরাজ করেন। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ব্যক্ত ; পরন্তু পঞ্চবিংশ তত্ত্ব অব্যক্ত বা মূর্তিবর্জিত। তিনিই আত্মবান রূপে সর্ব মূর্তিতে সর্ব হৃদয়ে বিরাজ করেন। প্রাণীদের চেতন ব্যাপার তিনিই নিয়ত সম্পাদন করেন। তিনি সমস্ত মূর্তিতে বিরাজ করেন অথচ তাঁর কোন মূর্তিই নেই। তাঁর গুণ নেই, অথচ তিনি গুণসংজ্ঞক। সেই মহাত্মা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এভাবে কোটি কোটি সৃষ্টি-প্রলয় বিস্তার করেন। কিন্তু সেই বুদ্ধিমান কখনো অভিমান আশ্রয় করেন না। তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণান্বিত নিখিল জীব পরম্পরায় প্রবোধরূপে অবুদ্ধজনের সংসর্গে বাস করেন। সে সময় তিনি তমোগুণে বিবিধ তামস ভাব, রজোগুণে রাজসভাব, এবং সত্ত্ব সংশ্রয়ে সাত্ত্বিকভাব লাভ করেন। তাঁর এই গুণত্রয়ের রূপ শুক্ল, লোহিত এবং কৃষ্ণ ভেদে ত্রিবিধ। তাঁর এই রূপকে প্রাকৃত বলেই জানবে। তামসগণ নরক ভোগ করে, রাজসগণ মনুষ্যলোকে বিচরণ করে এবং সাত্ত্বিকগণ সুখভোগের জন্য দেবলোকে যান। পাপ ও পুণ্যজনক কাজ করলে মনুষ্যত্ব লাভ হয় এবং কেবলমাত্র পুণ্যজনক কর্ম করলে দেবত্ব লাভ হয়। মনীষিগণ অব্যক্ত বিষয়কেই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত করেছেন। এই যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কথা বললাম এ কিন্তু জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয়।

—'ক্ষরাক্ষরবিচার নিরূপণ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো বিয়াল্লিশ

সাংখ্য মহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ জনককে বলে চললেন—জীব প্রতিবুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে বিবিধ অজ্ঞানমূলক কাজ করে বলে এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাতায়াত করে এবং এভাবে সে সহস্র দেহ পরিভ্রমণ করে। মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব, তার থেকে পুনরায় মনুষ্যত্ব, এবং তা থেকে নরকগমণ ইত্যাদিরূপে জীবও গুণত্রয়ে জড়িত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সে নিজে নির্দ্বন্দ্ব হলেও আপনাকে সুখী দুঃখী ইত্যাদি রূপে দ্বন্দ্বযুক্ত বোধ করে। বিভিন্ন প্রাকৃত পীড়ায় তাকে কষ্ট পেতে হয় ; আত্মা অজ্ঞান

বশত সমস্ত বস্তুতে মমত্ব বোধ করে। পার্থিব বিষয়ে মমত্ব বোধ হলে মানুষ মত্ত হয়ে সুকৃত, দুষ্কৃত প্রভৃতি কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সিদ্ধি কামনায় শয়নে কঠোরতা, পরিধানে কঠোরতা, খাদ্যে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করে। তারা বিবিধ চান্দ্রায়ণ, লিঙ্গের উপাসনা, আশ্রমচতুষ্টয় এবং অন্যান্য নিন্দিত পথও অবলম্বন করে; দীন দরিদ্রদের বিবিধ দান করে। আত্মা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম, সত্ত্ব, রজঃ ও তম ইত্যাদি গুণের বিচিত্র সংযোগের ফলে নিজেই সেই পৃথক পৃথক ভাবে আপনাকেই বিভক্ত করে থাকেন। সূর্য যেমন দিবাবসানে নিজের রশ্মিকে গুটিয়ে নেন, প্রকৃতি দেবীও তেমনি ক্রীড়াবশে গুণত্রয়ের পরিবর্তন দ্বারা এই সকলের সৃষ্টি ও সংহার করে থাকেন। প্রকৃতির রজঃ এবং তমোগুণে এই জগৎ অধীভূত হয়ে আছে। জীব ত্রিবিধ গুণে আবদ্ধ হয়ে সংসারের সুখভোগকেই চরম বলে মনে করে। পার্থিব সুখভোগ করার জন্য সে বারংবার মনুষ্য জন্মকেই আকাঙ্খা করে। মানুষ এভাবে বারংবার সংসার চক্রে আবর্তিত হয়। প্রকৃতিই শুভাশুভ নানা কর্ম করে। তির্যকজাতি, মনুষ্যত্ব, এবং দেবত্ব-এই তিনটি স্থান প্রাকৃত। এই চিহ্নের দ্বারাই প্রকৃতিকে জানা যায়। পুরুষের কোনো চিহ্নই নেই, কেবল অনুমানের দ্বারাই তাঁকে জানা যায়। জীব নিজে দোষহীন হয়েও নানা দোষযুক্ত কর্মসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন তার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ গুণের সঙ্গ লাভ করার জন্য নিজের কার্যে প্রবৃত্ত হয়। নিরিন্দ্রিয় নির্দোষ আত্মা তখন 'আমি এ সব করছি', এ কথা ভেবে বৃথা অভিমান করে থাকেন। তিনি তখন নিজেকে অসত্ত্ব হয়েও সত্ত্ববান্, অমৃত হয়ে মৃত, অমৃত্যু হয়ে মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হয়ে চঞ্চল, অক্ষেত্র হয়ে ক্ষেত্র, অসঙ্গ হয়ে সঙ্গপ্রাপ্ত, অতত্ত্ব হয়ে তত্ত্বের আশ্রয়, জন্মহীন হয়ে জন্মবান, অক্ষয় হয়ে ক্ষয়শীল এবং বুদ্ধ হয়েও আপনাকে অবুদ্ধ এবং কালাধীন বলে মনে করেন। চন্দ্র ষোড়শকলাত্মক, তাঁর পঞ্চদশ কলা পঞ্চদশ যোনি মাত্র। এই সকল কলাতে তিনি নিত্য আবির্ভূত হন। ষোড়শী কলাই প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র, সেই অংশ নিত্যই বিদ্যমান থাকে, দেবতারা তা ভোগ করেন না। অজ্ঞানমোহিত জীব এ রকম নানান যোনিতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির মমতা পরিহার করতে পারলে গুণসমূহকে অতিক্রম করে মুক্তি লাভ করা যায়।

—'সাংখ্যমাহাত্ম্য বর্ণন' নামক অধ্যায়।

অধ্যায়ঃ দুশো তেতাল্লিশ

জনক বশিষ্ঠকে বললেন—ক্ষর ও অক্ষরের মধ্যে সম্পর্ক কি স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মতো? আপনি এর প্রকৃত তত্ত্ব বলুন। স্ত্রী-পুরুষের গুণসংযোগে দেহ উৎপন্ন হয়; অস্থি, স্নায়ু, মজ্জা—এগুলো পিতার কাছ থেকে এবং ত্বক, মাংস ও রক্ত—এগুলো মায়ের কাছ থেকে উৎপন্ন হয়। বেদশাস্ত্রানুমোদিত ধর্মই এই। প্রকৃতি ও পুরুষ স্ত্রী-পুরুষের মতোই নিত্য মিলিত থাকেন; তাহলে মোক্ষধর্মের আর অস্তিত্ব কোথায়? আমাদের মনে হয় এর মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। আপনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, দয়া করে এর রহস্য আমাদের কাছে ব্যক্ত করুন। জনকের কথার উত্তরে বশিষ্ঠ বললেন—আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ আপনি নিপুণভাবে অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব এখনো আপনি বুঝতে পারেন

ন। পুস্তক পাঠ করেও যিনি তার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তিনি কেবল গ্রন্থের ভারই বহন করে থাকেন, গ্রন্থ পাঠ তাঁর কোন কাজেই লাগে না। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে যে ব্যক্তি তর্কে প্রবৃত্ত হয়, তার নরকে গমন সুনিশ্চিত। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জেনে যে তার যথাযথ উপদেশ পালন করে না, তারও সে জ্ঞান বৃথা। এ বিষয়ে আমি আপনাকে সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রসম্মত যে ব্যাখ্যা, সে কথাই বলছি। মূলত

দুই শাস্ত্রই এক এবং অভিন্ন। আপনি আমাকে ত্বক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, সে বিষয়ে বলি—মাংস, রক্ত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু—এগুলো ইন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। দ্রব্য থেকে দ্রব্য, বীজ থেকে বীজ, দেহ থেকে দেহ এবং ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়। নির্গুণ মহাত্মা দেহী নিরিন্দ্রিয় ও নির্বীজ; সুতরাং তাঁর গুণোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? গুণগণ গুণেতেই জন্মে এবং গুণেই লীন হয়; এই প্রাকৃতিক গুণসমূহ বস্তুত জন্মেও না, মরেও না। ত্বক, মাংস, রক্ত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু—এই আটটি প্রাকৃত শুক্র থেকেই জন্মে; প্রকৃতি থেকে স্ত্রীত্ব এবং রস নামক বায়ু থেকে পুরুষত্ব হয়। প্রকৃতি লিঙ্গহীন হলেও তিনি যে স্ত্রী সৃষ্টি করেন তার লিঙ্গের দ্বারাই ওই প্রকৃতিকে চেনা যায়। ফুল এবং ফল দেখে যেমন গাছ চেনা যায়, তেমনি অনুমানের দ্বারাই প্রকৃতির উপলব্ধি ঘটে থাকে। গুণের সঙ্গে সংস্পর্শ থাকায় চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত পঞ্চবিংশক পুরুষকে গুণবান বলে মনে হয়, কিন্তু বস্তুত তিনি অনাদি, অনন্ত, অজর এবং সমস্ত দর্শনের মতে সর্বদাই একরূপ। গুণবানেরই গুণ থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে নির্গুণ, তার গুণ কোথায়?

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে বুদ্ধির পরবর্তী, অপ্রবুদ্ধ ঈশ্বর স্বকীয় গুণে পরিবদ্ধ, কিন্তু অধিজ্ঞানরূপী পরমেশ্বর নির্গুণ। সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মনীষীরা প্রকৃতির এবং গুণগণের অতীত পঞ্চবিংশতিতম পুরুষেরই অনুধ্যান করে থাকেন। প্রবুদ্ধ ভাব যতক্ষণ অব্যক্ত থাকে, ততক্ষণ না-বোঝার একটা অস্পষ্ট ভাব অনুভূত হয়; এর কিছু সময় পরেই পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটে। লোকে যখন সেই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে এক বলে জানে, তখন তিনি অক্ষর নামে অভিহিত হন, যখন তাঁকে নানান মূর্তিতে অভিব্যক্ত বলে জানে, তখন তিনি ক্ষর নামে পরিচিত হন—এই-ই প্রকৃত তত্ত্ব। কোন কোন মনীষী বলেন—পুরুষকে নিয়ে সর্বসাকুল্যে তত্ত্বসংখ্যা পঞ্চবিংশতি; পঞ্চবিংশের পরবর্তী পুরুষ তত্ত্বহীন। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের যিনি কারণস্বরূপ, তাঁকে তত্ত্ব এবং তাঁরও যিনি কারণ সেই ষড়বিংশ পুরুষকে সনাতন শব্দে নির্দেশ করা হয়।

করালজনক তখন বশিষ্ঠকে বললেন—দেখুন, আমি নিতান্তই স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট; তাই যে তত্ত্বকথা আপনি শোনালেন, তা বুঝতে পারছি না। অপ্রবুদ্ধ, বুধ্যমান এবং বুদ্ধ—এদের মধ্যে পার্থক্য কী, ক্ষর এবং অক্ষরের প্রকৃত স্বরূপই বা কি; এ সব আমি বুঝতে পারছি না। আপনি ক্ষর, অক্ষর, বিদ্যা এবং অবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে এমনভাবে বলুন, যাতে আমি তাদের স্বরূপ ভালোভাবেই বুঝতে পারি। জনকের কথা শুনে বশিষ্ঠ বললেন—আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর অবশ্যই আমি দেব। কিন্তু তার আগে পৃথক ভাবে যোগকৃত্যসমূহ শুনুন। যোগকৃত্যসমূহের মধ্যে ধ্যানই প্রধান। যোগবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিরা প্রাণায়াম ও মনের একাগ্রতা—এই দ্বিবিধ যোগের উল্লেখ করেন। প্রাণায়াম সগুণ, নির্গুণ এবং মানস—এই তিন রকম; প্রস্রাব, মলত্যাগ এবং ভোজের সময় এর অনুভব হয়। যাঁরা প্রাণায়াম করেন, তাঁরা দিনে একবার মাত্র আহার করবেন।

দশবার, বারোবার বা চব্বিশবার প্রাণায়াম করে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ার্থ থেকে মনকে পৃথ
করবেন। যোগী স্থির থেকে বিশ্বাত্মার চিন্তা করবেন ; সমস্ত বিষয় থেকে মনকে নিবৃ
করে বিশ্বাত্মার ধ্যানে রত হলে সিদ্ধি লাভ হয়। সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে যোগ
ব্যক্তি লঘু আহার করবেন ; ইন্দ্রিয়কে সংযত করে প্রথম ও শেষ রাত্রে হৃদয়ে মনে
ধারণা করবেন। যোগী ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের এবং বুদ্ধির দ্বারা মনে
স্থিরতা সাধন করে পাষাণের মতো নিশ্চল, স্থাণুর মতো নিষ্কম্প এবং কাঠের মত
ঋজু হয়ে যোগাভ্যাস করবেন। এ ভাবে যখন শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ, আঘ্রাণ, সঙ্কল্প
মনন এবং অনুভব প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করে যোগী প্রকৃতিস্থ হন, মনীষী
সেই অবস্থাকেই মুক্ত বলেন। যোগী তখন ধূমহীন অগ্নি, দীপ্তিমান সূর্য এ
বিদ্যুতের অগ্নির মতো প্রদীপ্ত আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করে থাকেন। তিনি অণু থেকে
অণুতর, মহৎ থেকে মহত্তর, স্থির এবং সমস্ত প্রাণীতে বিরাজ করেন। সাধারণ চো
তাঁকে দেখা যায় না ; কিন্তু বুদ্ধিরূপ তৈলযুক্ত মনরূপ প্রদীপের দ্বারা তাঁকে দর্শ
করা যায়। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে সেই আত্মা তমোগুণের অতীত, বিমল মননহী
অলিঙ্গ এবং সংজ্ঞাশূন্য। লোকসমাজে এই তত্ত্বই 'যাগ' নামে পরিচিত। এতক্ষ
আপনাকে যোগদর্শনেব কথা বললাম, এবার সাংখ্যদর্শনের কথা বলছি। নাম, রূ
প্রভৃতি কল্পনার হেতুভূত অব্যক্ত ভাবকেই আত্মার পরা প্রকৃতি বলা যায়। সেই প
প্রকৃতি থেকেই দ্বিতীয় তত্ত্ব মহতের উৎপত্তি হয় ; মহৎ থেকে তৃতীয় তত্ত্ব অহংক
জন্মে, অহংকার থেকে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। এই আটটিকে সাংখ্যদর্শনে প্রকৃ
নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও ষোলটি বিকার আছে। পঞ্চবিকার এ
পঞ্চেন্দ্রিয়ও এরই অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে যা জন্মায়, তাতেই তার লয় হয়। পরমাত্মা প্রতি
লোম ক্রমে লয় এবং অনুলোমক্রমে সৃষ্টি করে থাকেন। সাগরতরঙ্গের মতো গুণে
গুণগণ প্রতিলোমক্রমে লীন এবং অনুলোমক্রমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রকৃতি সৃষ্টি
সময় বহু মূর্তি ধারণ করেন কিন্তু সংহারের সময় তাঁর একটিই মূর্তি থাকে। পঞ
বিংশতিতম মহান আত্মা প্রকৃতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থেকে প্রকৃতিকে বহুধা বিভক্ত করেন
প্রকৃতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন বলেই তিনি অধিষ্ঠাতা। ক্ষেত্রকে যিনি জানে
তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সেই অব্যক্ত পুরে যিনি শয়ন করেন তাঁকে পুরুষ বলা হয়
ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পরস্পর পৃথক ; ক্ষেত্র অব্যক্ত এবং তার জ্ঞাতা পঞ্চবিংশতিত
পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ। জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ও পৃথক পৃথক জ্ঞান অব্যক্ত, পঞ্চবিংশ পুরু
জ্ঞেয়। ক্ষেত্র অব্যক্ত, সত্ত্ব ঈশ্বর এবং তত্ত্বের অতীত পঞ্চবিংশক পুরুষ ঈশ্বর নন
এই-ই সাংখ্যদর্শনের সার-সংক্ষেপ। এই প্রকৃতিকে অনেকে অনেক সংখ্যক বলে উল্লে
করেন, কিন্তু যেহেতু প্রকৃতি অনন্ত, তাই তার সুনির্দিষ্ট স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভব হ
না। জীবের যখন সম্যক আত্মবোধ হয়, তখন সে ব্রহ্মময় হয়ে যায়। এই সাংখ
নির্দেশিত পথে কর্ম করলে জীবকে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। যা
ক্ষর পুরুষকে অবলম্বন করে, সংসারচক্রে তাদের নিয়তই আবর্তিত হতে হয়। 'স
শব্দে অব্যক্ত এবং 'অসব' শব্দে পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে বুঝতে হবে। এই তত্ত্ব যা
জানেন, তাঁদের সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

—'ক্ষরাক্ষরবিবরণ' নামক অধ্যায়

অধ্যায়ঃ দুশো চুয়াল্লিশ

বসিষ্ঠ জনককে বললেন এ পর্যন্ত আপনাকে আমি সাংখ্যদর্শনের কথা বললাম। এখন আপনি বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা শুনুন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা অব্যক্তকে অভেদ্য বলেন। সৃষ্টি, প্রলয় এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয় নামেই পরিচিত হন। সাংখ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ ঋষিরা বলেন—যাবতীয় সৃষ্টিই পরস্পর পরস্পরের বিদ্যা। সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ের বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়; বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিদ্যা বিষয়সমূহ; বিষয়ের বিদ্যা মন; মনের বিদ্যা পঞ্চভূত; পঞ্চভূতের বিদ্যা অহংকার; অহংকারের বিদ্যা বুদ্ধি, বুদ্ধির বিদ্যা অব্যক্ত প্রকৃতি; চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক যে প্রকৃতি, তার বিদ্যা পরমপুরুষ। অব্যক্তকে অপর বলা যায়; পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ 'পর' শব্দবাচ্য। তিনিই পরম বিদ্যার আশ্রয়। এই তত্ত্ব জানলে জীব জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বিষয়ে পারদর্শী হতে পারে। অব্যক্তই জ্ঞান, পঞ্চবিংশতিতম পুরুষই জ্ঞেয়। আবার জ্ঞান অব্যক্ত, পঞ্চবিংশ পুরুষ জ্ঞাতা। এই বিদ্যাতত্ত্ব আপনাকে বিশেষভাবে বললাম। পূর্বে যে অক্ষর এবং ক্ষরের কথা বলেছি, সে সম্পর্কে বিশেষ কথা বলছি, শুনুন। বিদ্যা এবং অবিদ্যাত্মক পুরুষই ক্ষর এবং অক্ষর নামে পরিচিত হন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই উভয়কেই তত্ত্বসংজ্ঞায় ভূষিত করেন। সৃষ্টি এবং প্রলয় ধর্ম আছে বলে অব্যক্তকে অব্যয় বলা হয়; এই অব্যক্ত গুণসঙ্গবশত নিরন্তর বিকার লাভ করে, এতেই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির উৎপত্তি ঘটে। এর অধিষ্ঠানক্ষেত্র পঞ্চবিংশক পুরুষ। এই অব্যয় পুরুষের অধিষ্ঠানের জন্য অব্যক্ত গুণগণ ব্যক্তত্বে সংসৃষ্ট হয়। অহংকার সেই গুণসমূহের সঙ্গে পঞ্চবিংশ পুরুষে লীন হয়ে থাকে। গুণসমূহের এভাবে আবির্ভাব এবং তিরোভাবই প্রকৃতি নামে পরিচিত হয়। এই অবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞানবান হন। গুণময়ী প্রকৃতি যখন অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করেন, তখন গুণসমূহ আর পরিবর্তিত হয় না; ফলে ঐ প্রকৃতি গুণহীন হয়ে পড়েন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষও ক্ষেত্রজ্ঞানহীন হলেই নির্গুণ হন। গুণবতী প্রকৃতি যখন গুণে আসক্ত থাকেন, তখন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিকে গুণময়ী এবং নিজেকে নির্গুণ বলে অবধারণ করতে পারেন। তিনি যখন প্রকৃতিকে বর্জন করে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য বুঝতে পারেন তখন তাঁর আত্মবোধ জন্মে। যখন পরমাত্মার দর্শন ঘটে, তখন তিনি আর সৃষ্টি ব্যাপারে আসক্ত হন না। তখন তাঁর এ রকম চিন্তা হয় যে, আমি না বুঝে বিভিন্ন জনের অনুবর্তন করেছি, আত্মার স্বতন্ত্রতা না বুঝতে পেরে বৃথাই কষ্ট-ভোগ করেছি। পরমাত্মাই আমার বন্ধু, এর সঙ্গেই আমার বসবাস। অজ্ঞানময়ী প্রকৃতির তাড়নায় আমি এতদিন নানান সংসর্গে কাল কাটিয়েছি। আমার কোন বিকার নেই, একথা সত্যি; কিন্তু বিকার না থাকলেও সেই বিকারযুক্ত প্রকৃতি আমাকে বঞ্চনা করেছে। কিন্তু সেই দোষ আমারই; কারণ আমি আত্মার চিন্তায় বিমুখ হয়ে তাতেই বরং আসক্ত ছিলাম। আমি মূর্তিহীন হলেও মমত্ববশে বহু মূর্তি ধারণ করেছি; মমতাহীন হয়েও প্রকৃতির তাড়নায় বিভিন্ন যোনিকে অবলম্বন করায় বিকার লাভ করেছি। এখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছি; প্রকৃতির সেই মায়া পরিত্যাগ করে পরমাত্মার সঙ্গেই মিলিত হব। পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ ক্ষরত্ব পরিত্যাগ করে অক্ষরত্ব লাভ করে।

অব্যক্ত ও ব্যক্ত—এই দুই পুরুষ সগুণ ও নির্গুণ। সেই নির্গুণ পরমপুরুষকে দর্শন করলে জীব তখনই তাঁর সঙ্গে লীন হয়ে যায়। এই যে সাংখ্যযোগের কথা বললাম, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা একে 'বৃহৎ' নামে অভিহিত করে থাকেন। এই শাস্ত্রে পুনর্জন্ম সহ যোগ এবং

পঞ্চবিংশের পরবর্তী তত্ত্ব পঠিত হয়। সাংখ্যশাস্ত্রে আলোচিত পরতত্ত্বের কথা আগেই বলেছি। বুদ্ধ, অপ্রতিবুদ্ধ এবং বুধ্যমান—এরা যোগের নিদর্শনস্বরূপ। আপনি বুধ্যমান হয়েছেন, এখন এই তত্ত্ব আলোচনার ফলে আশা করি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করবেন।

—'বসিষ্ঠকরালজনকসংবাদ' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় ঃ দুশো পঁয়তাল্লিশ

আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রসঙ্গে বসিষ্ঠ জনককে বলে চললেন--এই যে অপ্রবুদ্ধ এবং অব্যক্ত পুরুষ ইনিই সৃষ্টি ও সংহার করেন। এই অজ পুরুষই নিজের লীলাবশে বিকারপ্রাপ্ত হয়ে নিজেকে বহুধা বিভক্ত করেন। আত্মাতে যে গুণসমূহ রয়েছে, তার দ্বারা সেই পুরুষ সৃষ্টি ও সংহার প্রভৃতি কার্য সাধন করেন। তখন তিনি এতই মোহিত হয়ে থাকেন যে, তিনি যে অব্যক্ত এবং নির্গুণ এ কথা বুঝিয়ে দিলেও তিনি বোঝেন না। যখন সেই আত্মা অব্যক্ত পঞ্চবিংশকত্ব বোঝেন, তখন তাঁকে প্রতিবুদ্ধ বলা যায়। মমতার দ্বারা আবদ্ধ পঞ্চবিংশক পুরুষ প্রতিবুদ্ধ হয়ে যখন অব্যক্তকেও বোধিত করেন ; তখন তাঁকে বুধ্যমান বলা যায়। ষড়বিংশতত্ত্ব বিমল, বুদ্ধ, অপ্রমেয় এবং সনাতন। সেই চতুর্বিংশতত্ত্বই বুধ্যমান হলে নিজেকে পঞ্চবিংশ বলেই বুঝতে পারেন ; আর তিনি যখন অজ্ঞানবশে নিজেকে প্রকৃতিমান মনে করেন, তখন তিনি অব্যক্ত। বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে আশ্রয় করলে সেই আত্মা ষড়বিংশকে জানতে পারেন, গুণযুক্ত অচেতন প্রকৃতিকে তখন নির্গুণ বলে বোঝেন। সুতরাং অব্যক্তকে দর্শন করার জন্য কেবলধর্মা হয়ে থাকেন, তারপর কেবলের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিন্ময়াত্মা রূপে প্রতীয়মান হন। এ পর্যন্তই তত্ত্ব ; এর পর তত্ত্বহীন ; তা অজর এবং অমর। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কখনই সংসারে আবদ্ধ হয় না। এই ষড়বিংশ-তত্ত্বকে চিত্তে ধারণ করলে, সেই প্রবুদ্ধ ষড়বিংশতত্ত্বের সমতা লাভ করা যায়। ইনি যদিও নিঃসঙ্গ, তবু প্রয়োজনে তিনি সঙ্গ কামনা করেন। নিঃসঙ্গ আত্মাকে নিয়ে ষড়বিংশ পুরুষকে 'কর্মজ' নামে অভিহিত করা যায়। শ্রুতিসিদ্ধান্ত অনুসারে আমি এই বুদ্ধ, বুধ্যমান ও অবুদ্ধের কথা আপনাকে বললাম। মশা এবং ডুমুরের মতো, মাছ এবং জলের মতো এঁদেরও একত্ব এবং নানাত্ব অবধারণ করা দরকার। বস্তুত সেই জীব পরপুরুষের সঙ্গে মিলনে পরধর্মী হন ; বিশুদ্ধের সংযোগে বিশুদ্ধধর্মা, বুদ্ধের সংযোগে বিমুক্তধর্মা, বিয়োগধর্মীর সংসর্গে বিমুক্তাত্মা, বিমোক্ষধর্মার সংসর্গে বিমোক্ষ, শুচি সংযোগে শুচিধর্মা, বিমল আত্মার সঙ্গে মিলনে বিমলাত্মা, কেবলের সংসর্গে কেবলাত্মা এবং স্বতন্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বতন্ত্রতা লাভ করেন।

যে ব্যক্তি বেদনিষ্ঠ, তার কাছেই এই তত্ত্ব প্রকাশ করা চলে ; প্রকৃত শিষ্যকে তার জ্ঞানবুদ্ধির জন্য এই তত্ত্বের উপদেশ করা যায়। কিন্তু যারা মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, ক্লীব বা কুটিলবুদ্ধি--এ রকম ব্যক্তিকে এই তত্ত্বের উপদেশ কখনই দেবেন না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু, গুণবান, পরস্ত্রীর প্রতি যে সততই বিমুখ, যোগী, ক্ষমাবান, পরের কল্যাণে যে নিরত এবং প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তিকে এই গোপনীয় তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া উচিত। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে কখনই এই বিশুদ্ধ পরম ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া চলে না। এই বিধি লঙ্ঘন করে যদি কেউ অদেয় ব্যক্তিকে এই তত্ত্বের উপদেশ দেন, তবে তিনি শ্রেয় লাভ করতে পারেন না। এই রত্নপূর্ণ পৃথিবীকে বরং অপাত্রে দান করা যেতে পারে, কিন্তু সে-রকম

দেয় ব্যক্তিকে এই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া চলবে না। আমি এই সংসারকে মোহের হিমা বলে বুঝতে পেরেছিলাম। স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আমার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভাবে আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছিলেন সেভাবেই আপনাকেও সেই তত্ত্বের পদেশ দিলাম। এ কথা জানবেন যে, এই এক মহাজ্ঞানই মোক্ষবিদগণের একমাত্র বলম্বনীয়।

এতক্ষণ ধরে এই ব্রহ্মতত্ত্বের কথা মুনিদের বলার পর ব্যাস তাঁদের বললেন—পুরাকালে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার কাছ থেকে বশিষ্ঠ ঋষি এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করেছিলেন। বশিষ্ঠের কাছ থেকে নারদ এই তত্ত্ব লাভ করেন। নারদই এই সনাতন তত্ত্ব আমার কাছে প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব যিনি জানেন সংসারে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না। মূর্খ মানুষ অজ্ঞানতার ফলে বারংবার সংসার-চক্রে ঘুরে মরে। এই অজ্ঞানসাগর যদি সে পার হতে পারে, তাহলেই তার মুক্তিলাভ হয়। এই যে মোক্ষতত্ত্ব আপনারা জানলেন, এতে সংসারে ফিরে আসবার ভয় আর আপনাদের রইল না। একমাত্র শ্রদ্ধাবান এবং আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিকেই এই তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া চলে; নাস্তিক, দুষ্টচিত্ত বা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে এর উপদেশ কখনই দেওয়া যায় না।

—'বসিষ্ঠকরালজনকসংবাদসমাপ্তি' নামক অধ্যায়।

অধ্যায় : দুশো ছেচল্লিশ

নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনিদের লোমহর্ষণ বললেন—পুরাকালে মুনিদের অনুরোধে বেদব্যাস তাঁদের পবিত্র পুরাণকথা শুনিয়েছিলেন। নানা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ ঐ আদি পুরাণের কথা শুনে মুনিরা অত্যন্ত আনন্দিত হন; প্রশংসা-সূচক বাক্যে তাঁরা ব্যাস-দেবকে বলেন—দেবসমাজে বৃহস্পতির মতো আপনি সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, সমস্ত ব্যাকরণ এবং অঙ্গ সহ সমস্ত বেদ আপনি অধ্যয়ন করেছেন; আপনি মহাভারতে সেই বেদের অর্থ-সমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই বিচিত্র পদসম্পন্ন পুরাণপ্রবন্ধ আমরা আপনার কাছে শুনলাম। আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ; মহাভারতের মতো মূল্যবান গ্রন্থ আপনি প্রণয়ন করেছেন। আপনি মহাভারতরূপ তৈলে পূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন; জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকার দ্বারা আপনি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ মানুষের নয়ন উন্মীলিত করেছেন। মুনিরা ব্যাসদেবের প্রশংসা করে নিজেদের আশ্রমে ফিরে গেলেন। ব্যাসদেব যেমন পূর্বতন মুনিদের এই আদি মহাপুরাণের কথা শুনিয়েছিলেন, আমিও আপনাদের সেই পুরাণের কথাই এতক্ষণ ধরে শোনালাম। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী প্রত্যেকেরই এই পুরাণ শ্রবণ করা উচিত। ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সুসংযত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণের লোকই মঙ্গল-কামনায় ভক্তি ভরে এই পুরাণ শ্রবণ করবেন।

এই পুরাণ শ্রবণ করলে ব্রাহ্মণ বিদ্যা, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে জয়, বৈশ্য অক্ষয় ধন এবং শূদ্র সুখ ও সম্পদ লাভ করতে পারে। পবিত্র চিত্তে যে যা কামনা করে এই পুরাণ শ্রবণ করে, তার সে কামনা অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে। এই বৈষ্ণবপুরাণ সমস্ত পাপ নাশ করে; সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রয়াগে, পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে কিংবা অর্বুদ তীর্থে উপবাস করে যে ফল পাওয়া যায় এই পুরাণ শ্রবণ করলেও অনায়াসেই সেই ফল পাওয়া যায়। এক বছর ধরে যথাযথভাবে অগ্নিহোত্র যাগ করলেও যে ফল পাওয়া যায়

না, এই পুরাণ একবার মাত্র শ্রবণ করলেই সেই ফল পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন যমুনায় স্নান করে মথুরায় হরিকে দর্শন করলে যে ফল পাওয়া যায়, ভক্তি ভরে এই পুরাণকথা কীর্তন করলে সেই ফল পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি প্রতি দিনই এই বেদ-সম্মিত পুরাণ পাঠ করে বা শ্রবণ করে, হরির সদনে তার গতি হয়ে থাকে। যে ব্রাহ্মণ সংযত হয়ে একাদশী ও দ্বাদশী প্রভৃতি প্রত্যেক পর্বে এই বৈষ্ণবপুরাণ শ্রবণ করান, বিষ্ণুলোকে তাঁর গতি হয়। এই যশস্কর, আয়ুবর্ধক, সুখপ্রদ পুরাণ যে ব্যক্তি সুসমাহিত চিত্তে ত্রিসন্ধ্যা শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে তার সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়। এই পুরাণ সংযত হয়ে শ্রবণ করলে রোগী রোগ থেকে, বদ্ধ বন্ধন থেকে, আপন্ন ব্যক্তি আপদ থেকে মুক্ত হয় এবং জাতিস্মরত্ব, বিদ্যা, পুত্র, পশু, মেধা, ধৃতি, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রণাম করার পর একাগ্রচিত্তে এই পুরাণ শ্রবণ করে সে নিষ্পাপ হয়ে ইহলোকে সুখভোগ করার পর স্বর্গে গমন করে এবং পরে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। অতএব মুক্তিকামী মানবগণ প্রতিদিন এই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ফলের সাধন পবিত্র মহাপুরাণ শ্রবণ করেন।

আপনারা পুরুষশ্রেষ্ঠ, ধর্মে আপনাদের বুদ্ধি অবিচল হোক ; ধর্মই পরলোকগত পুরুষের একমাত্র বন্ধু। মানুষ ধর্মবলেই রাজ্যলাভ করে, ধর্মবলেই স্বর্গলাভ করে, আয়ু, কীর্তি, তপস্যা, ধর্ম, এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত ধর্মবলেই মানুষ লাভ করে থাকে। ধর্মই মানুষের পিতামাতা, ধর্মই ইহকালের এবং পরকালের বন্ধু। এই বেদসম্মিত শ্রেষ্ঠ পুরাণ অতি গোপনীয়, নাস্তিক ব্যক্তির কাছে কখনই এর তত্ত্ব প্রকাশ করা উচিত নয়। আপনারা তো এই পরম রহস্য কথা শুনলেন ; আমাকে অনুমতি করুন, আমি আমার আশ্রমে ফিরে যাই।

—আদি ব্রাহ্ম মহাপুরাণে লোমহর্ষণ মুনিসংবাদে
'পুরাণ প্রশংসন' নামক অধ্যায় সমাপ্ত।